تفسير انوار القرآن

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন

৪

[১৬তম পারা থেকে ২০তম পারা পর্যন্ত]

রচনা ও সংকলনে

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
তাফসীরে জালালাইন শরীফের অনুবাদক
লেখক, গবেষক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين. والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد! : فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم "وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون" وقال رسول الله ﷺ : تركت فيكم امرين ماتمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا : كتاب الله وسنتي.

প্রথমে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি রহমান ও রহীম। যার দয়া অফুরন্ত ও অসীম। যিনি আমাদের উপর আপন অনুগ্রহে বেহিসাব নায-নিয়ামত দান করেছেন। বিশেষ করে অধম কে স্বীয় কালামে পাকের ব্যখ্যাগ্রন্থ 'তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন' রচনার তৌফিক দিয়েছেন।

আম্মা বাদ :

দুনিয়াবি ও উখরবি জিন্দেগিতে মানবতার শাশ্বত মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যুগে যুগে বহু নিদর্শনাবলি পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। কখনো বা পৃথিবীবাসীকে অপার দয়া-রহমত আবার কখনো বেদনাদায়ক আজাব-শাস্তির স্বাদ চাখিয়েছেন। কখনো বা নিজ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলির অবলোকন করিয়েছেন। সময়ে সময়ে আদেশ-নিষেধ সম্বলিত সহীফা ও কিতাব অবতারণ করেছেন। এতসব কিছুর লক্ষ্য একটাই, মানুষের বিকার মস্তিষ্কে যেন বোধের উদয় ঘটে। দুনিয়া, নফস ও শয়তানের ফাঁদ এড়িয়ে এক ইলাহে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। মহিয়ান গরিয়ান রাব্বুল আ'লামীনের মানশা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখেরাতে সিদ্ধকাম হতে পারে। কিন্তু কোনটি যে তামাম জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ– তা তো এই নগণ্য জিন ও ইনসান সম্প্রদায়ের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়! তাহলে এখন উপায় কী হবে? এরই ধারাবাহিকতায় আখেরি উম্মতের জন্য রাব্বানার পক্ষ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ অবতীর্ণ করা হয় খোলাচিঠি 'আল-কুরআন'।

এই আল-কুরআনকে বলা হয় আদর্শ জীবন বিধান। এর মাঝে রয়েছে বৈচিত্র্যময় ও শতবাকধারী জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা। বিশ্বাসগত, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক– সকল বিষয়ে রয়েছে সর্বযুগের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য মৌলিক নীতিমালা। এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি যুগের সমসাময়িক সমস্যার সমাধানও তো কুরআনের মূলনীতি থেকেই উদ্ভাবিত হয়। তাছাড়া নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া শুদ্ধ হয় না। শুধু তাই না কুরআনের অনুকরণ ছাড়া জিন্দেগির সফলতাও সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন– 'তোমাদের মাঝে আমি এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা ধরে থাকলে আমার পরে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত।' (মুসনাদে আহমাদ : ৪/৫০)

- বলা বাহুল্য, আমল, আখলাক, কথাবার্তা, চাল-চলন তথা বৈষয়িক জীবনে অনুপম আদর্শে সাহাবায়ে কেরামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের মূল হেতু কিন্তু এই আল কুরআনের অনুধাবন ও অনুকরণ। এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন–

كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشَرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ وَالْعَمَلَ بِهِنَّ

"আমাদের মাঝে কেউ যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি সেগুলোর অর্থ অনুধাবন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ব্যতীত সেগুলোকে অতিক্রম করতেন না। (তাফসীরে তাবারী : ১/ ২৭; বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৬ হিজরি)। সাহাবায়ে কেরাম তো আখেরি নবীর সোহবত পেয়ে ধন্য হয়েছেন। সময়ে সময়ে কুরআনের আয়াত অবতারণের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট আলোকন করেছেন। তার উপর আবার অবোধগম্য বিষয়াবলি নিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে আলোচনা করে সমাধান করে নিতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা কীভাবে কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করব? সংকীর্ণ মেধাতে ইলাহী কালাম অনুধাবন করার সাধ্য কার? এর প্রেক্ষিতেই তাফসীর শাস্ত্রের বিকাশ। এর সূচনাটাও হয়েছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে। প্রথমত হযরত মুহাম্মদ ﷺ তো ছিলেন কুরআনেরই জীবন্ত ব্যাখ্যাপুরুষ। তাঁর পবিত্র জীবনে এই কুরআনই তো নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত হয়েছিল। তাই তো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন– 'তিনি তো সাক্ষাৎ কুরআন।' দ্বিতীয়ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআনকে মানুষের সামনে তুলে ধরা তো ছিল রাসূল ﷺ-এর গুরুদায়িত্বসমূহের অন্যতম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ -

"আমি তোমার প্রতি এক স্মরণিকা (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, যেন তা তুমি মানুষের জন্য বয়ান তথা ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা : নাহল; আয়াত : ৪৪; পারা : ১৪)

সারকথা, তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমেই সূচিত হয়েছে এবং এটাও উপলব্ধ যে, তাফসীর হলো আল-কুরআনেরই বিশ্লেষিত রূপ। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআনের মর্ম মর্মে অনুধাবন করা অতঃপর তদনুযায়ী অনুকরণ, অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই তো আল্লামা যারকাশী (র.) আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন (১/৩৩) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন-

هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَبَيَانُ مَعَانِيْهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ -

অর্থাৎ এটা এমন এক বিজ্ঞানের নাম, যার দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব অনুধাবন, তার অর্থের ব্যাখ্যা ও আয়াতের বিধি-বিধান এবং এর রহস্য জানা যাবে।

আর ড. মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী (র.) আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসিসরূন (১/১৫-১৬; কায়রো : মাকতাবা ওয়াহাবা; ১৪১৬ হি.) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন– بَيَانُ كَلَامِ اللّٰهِ أَوْ أَنَّهُ الْمُبَيِّنُ لِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَمَفْهُوْمَاتِهَا অর্থাৎ (এটা) আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা অথবা এটা কুরআনের শব্দমালা ও ভাবসমূহের সুস্পষ্টকারী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানব জীবনে দু'জাহানের শান্তি-সুখ ও সফলতা লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আল-কুরআনের, ঠিক তেমনি কুরআন অনুধাবনের জন্য তাফসীর শাস্ত্রে প্রয়োজন।

- ইসলামিয়া কুতুবখানা -এর উদ্যোগে ইতঃপূর্বে আনওয়ারুল কুরআন নামক পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সূরা বাকারা, নিসা, মায়িদা, আন'আম, আ'রাফ, আনফাল ও তাওবা -এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু সূরার সরল অনুবাদ, শাব্দিক অনুবাদ, ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং শানে নুযূলসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এর আঙ্গিকে গ্রন্থটি সাজানো হয়েছিল। সহজ ও সরল পাঠে প্রয়োজনীয় তবে নির্ভুল তত্ত্বে উপস্থাপিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আনওয়ারুল কুরআন পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাদের আকুলিত হৃদয়ের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কুরআনের একটি যুগোপযোগী তাফসীর গ্রন্থ রচনার বিষয়টি সামনে আসে। এরই প্রেক্ষিতে ইসলামিয়া কুতুবখানার সত্ত্বাধিকারী আলহাজ্ব মাওলানা মোস্তফা সাহেব (দা. বা.) কুরআনের খেদমত করার মনস্থ করত আমাকে

আনওয়ারুল কুরআনের আদলে একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানান। কিন্তু কুরআনের এত বড় খেদমত করতে গিয়ে না জানি কলঙ্কের ছোঁয়া লাগে– এই ভয়ে আমি অনুরোধে সাড়া দিচ্ছিলাম না। কিন্তু মাওলানা সাহেবও খেদমত করার সুযোগ হাতছাড়া করার ব্যক্তি নন। অবশেষে তাঁর অনুরোধকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানালাম। মূলত তাঁর দিলের তড়পেই আমি এ খেদমতে হাত লাগালাম। তাফসীর গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আনওয়ারুল কুরআনের রচনা কাঠামোর আলোকে রচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আশরাফ আলী থানবী (র.) -এর তরজমার অনুকরণ করা হয়েছে। এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) এর মা'আরিফুল কুরআন কে অনুসরণ করা হয়েছে। আর তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) -এর মা'আরিফুল কুরআনকে সামনে রাখা হয়েছে। এছাড়াও তাফসীরে নূরুল কুরআন, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী, ইবনে কাছীর ও তাফসীরে মাজহারীর গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনাও সমভাবে উপাত্ত হয়েছে। দীর্ঘদিনের মেহনতের বদৌলতে তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন আজ প্রকাশের পথে, তাই এ আনন্দঘন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি পাবলিকেশনের জগতে অনুকরণীয় আদর্শ আলেমে দীন আলহাজ মাওলানা মোস্তাফা সাহেব (দা. বা.) -এর জন্য দোয়া করি– 'আল্লাহ! হযরতকে সিহহাত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর সমস্ত দীনি খেদমত ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন।' এবং যারা আমাকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা, মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্যও দোয়া করি– 'হে আল্লাহ! তাদেরকে উত্তম জাযা ও খায়ের দান করুন এবং এই তাফসীর গ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে সর্বস্তরের পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে কবুল করে নিন।' পরিশেষে কবিতার চরণে ইতি টানছি–

ওফাতের পরে আমি, জাহানের একক স্বামী,
তোমারি আদালতে, হাজির হব যবে।
হিসেবের খাতায় লিখে, রেখো গো যতন করে,
অধমের গ্রন্থখানি, হে দয়াময়! তবে।

মোহাম্মাদ আবুল কালাম মাসূম
সেভভিউ– ১
হাসনাবাদ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
০৭/০৭/২০১৪ ইং
৮ রমাজানুল মুবারক

যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এ আনওয়ারুল কুরআনটি আলোর মুখ দেখেছে

- মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম
  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ আনওয়ারুল হক
  সিনিয়র সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- মাওলানা আব্দুল আলীম
  উস্তাদ, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইদারাতুল উলূম, আফতাব নগর, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ আকবর হোসাইন
  ফাযেল দারুল উলূম হাটহাজারী চট্টগ্রাম।
- মাওলানা রফিকুল ইসলাম সিরাজী
  ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত;
  সাবেক উস্তাদ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
  ৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ মাহমূদ হাসান
  উস্তাদ, মাদরাসা উলূমে শরী'আহ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ এনামুল হাসান
  উস্তাদ, মাদরাসা নূরুল কুরআন, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন
  মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া মোহাম্মাদিয়া মোহাম্মদনগর, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান
  ফাযেলে দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- মাওলানা হাফেজ ইমাম উদ্দীন
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ মোবারক হোসাইন
  সাবেক শিক্ষক, আল ফারুক ইসলামিয়া একাডেমি চাটখিল, নোয়াখালী।

সূচিপত্র

পারা : ১৭, পৃষ্ঠা : ১৫৮–২৬৫

সূরা আম্বিয়া—১৫৮

সূরা হাজ্জ—২১৫

পারা : ১৮, পৃষ্ঠা : ২৬৬–৪১২

সূরা মু'মিনূন

সূরা নূর—৩১০

সূরা ফুরকান—৪০২

পারা : ১৯, পৃষ্ঠা : ৪১৩-৫৩১

সূরা শু'আরা—৪৪৮

সূরা নামল—৪৯৯

পারা : ২০, পৃষ্ঠা : ৫৩২-৬৩৬

সূরা কাসাস—৫৫৯

সূরা আনকাবূত—৬১২

পারা : ১৬

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

৭৫. তিনি বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না।

قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾

৭৬. মূসা বললেন, এর পরও যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, তবে আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন না, নিঃসন্দেহে আপনি আমার পক্ষ হতে আপত্তির সীমানায় পৌঁছেছেন।

فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهْلَ قَرْيَةِ ٍۨ اسْتَطْعَمَاۤ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾

৭৭. পুনরায় উভয় চলতে লাগলেন। এ পর্যন্ত যে, যখন তাঁরা কোনো এক গ্রামবাসীদের নিকট উপনীত হলেন, তখন তার অধিবাসীদের নিকট খাবার চাইলেন; কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল, ইতোমধ্যে তাঁরা তথায় একটি প্রাচীর পেলেন– যা পতনোন্মুখ হয়েছিল, তখন তিনি তাকে খাড়া করে দিলেন; মূসা (আ.) বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে এতে কিছু মজুরি নিতে পারতেন।

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

৭৮. তিনি বললেন, এটাই আমার ও আপনার মধ্যে পৃথক হওয়ার সময়, আমি আপনাকে সেই সমস্ত বিষয়ের হাকীকত বলে দিচ্ছি যার উপর আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৫. قَالَ তিনি বললেন اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ আমি কি আপনাকে বলিনি যে اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না।

৭৬. قَالَ মূসা বললেন اِنْ سَاَلْتُكَ যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি عَنْ شَيْءٍ কোনো বিষয়ে بَعْدَهَا এর পরও فَلَا تُصٰحِبْنِيْ তবে আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন না قَدْ بَلَغْتَ নিঃসন্দেহে আপনি পৌঁছেছেন مِنْ لَّدُنِّيْ আমার পক্ষ থেকে عُذْرًا আপত্তির সীমানায়।

৭৭. فَانْطَلَقَا পুনরায় উভয়ে চলতে লাগলেন حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهْلَ قَرْيَةِ এ পর্যন্ত যে, যখন তারা কোনো এক গ্রামবাসীদের নিকট উপনীত হলেন اسْتَطْعَمَاۤ اَهْلَهَا তখন তার অধিবাসীদের নিকট খাবার চাইলেন فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا ইতোমধ্যে তারা তথায় একটি প্রাচীর পেলেন يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ যা পতনোন্মুখ হয়েছিল فَاَقَامَهٗ তখন তিনি তাকে খাড়া করে দিলেন قَالَ মূসা বললেন لَوْ شِئْتَ আপনি ইচ্ছা করলে لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا এতে কিছু মজুরি নিতে পারতেন।

৭৮. قَالَ তিনি বললেন هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ এটাই আমার ও আপনার মধ্যে পৃথক হওয়ার সময় سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ আমি আপনাকে সে সমস্ত বিষয়ের হাকীকত বলে দিচ্ছি مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا যার উপর আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি।

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

৭৯. সে যে নৌকা, বস্তুত তা ছিল কতিপয় দরিদ্র লোকের, (যা দ্বারা) তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত, সুতরাং তাতে খুঁত সৃষ্টি করতে চাইলাম এবং তাদের সম্মুখ দিকে ছিল এক রাজা, যে প্রত্যেক [নিখুঁত] নৌকা বলপূর্বক কেড়ে নিত।

وَأَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ أَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾

৮০. আর ঐ যে বালক, বস্তুত তার পিতামাতা ছিল ঈমানদার, সুতরাং আমার আশঙ্কা হলো যে, সে তাদের উপর অবাধ্যতা ও কুফরের ছায়াপাত করে।

فَأَرَدْنَآ أَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

৮১. অতএব, আমার ইচ্ছা হলো যে, তাদের রব তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন সন্তান দেন, যে পবিত্রতায় তার চেয়ে উত্তম হয় এবং মহব্বতে তা অপেক্ষা অধিক হয়।

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

৮২. আর ঐ যে প্রাচীর, বস্তুত তা ছিল দুটি এতিম বালকের, যারা ঐ শহরেই থাকে এবং সেই প্রাচীরের নীচে তাদের জন্য কিছু ধন পোঁতা ছিল এবং তাদের পিতা সৎ লোক ছিলেন, সুতরাং আপনার প্রতিপালক স্বীয় অনুগ্রহে ইচ্ছা করলেন, তারা যেন যৌবনে উপনীত হয় এবং নিজেদের প্রোথিত ধন বের করে নেয়, আর আমি কোনো কাজ নিজের মতে করিনি; এটা হলো সে সমস্ত বিষয়ের তাৎপর্য যাতে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৯. أَمَّا السَّفِينَةُ সেই যে নৌকা فَكَانَتْ لِمَسٰكِينَ বস্তুত তা ছিল কতিপয় দরিদ্র লোকের يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ (যা দ্বারা) তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيبَهَا সুতরাং তাতে খুঁত সৃষ্টি করতে চাইলাম وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ এবং তাদের সম্মুখ দিকে ছিল এক রাজা يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا যে প্রত্যোকে (নিখুঁত) নৌকা বলপূর্বক কেড়ে নিত।

৮০. وَأَمَّا الْغُلٰمُ আর ঐ যে বালক فَكَانَ أَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ বস্তুত তার পিতামাতা ছিল ঈমানদার فَخَشِينَآ সুতরাং আমার আশঙ্কা হলো। أَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا সে তাদের উপর অবাধ্যতা ও কুফরের ছায়াপাত করে।

৮১. فَأَرَدْنَآ অতএব আমার ইচ্ছা হলো যে أَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا তাদের রব তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন সন্তান দেন। خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً যে পবিত্রতায় তার চেয়ে উত্তম হয় وَّأَقْرَبَ رُحْمًا এবং মহববতে তা অপেক্ষা অধিক হয়।

৮২. وَأَمَّا الْجِدَارُ আর ঐ যে প্রাচীর فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ বস্তুত তা ছিল দুটি এতিম বালকের فِي الْمَدِينَةِ যারা ঐ শহরেই থাকে وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا এবং সেই প্রাচীরের নিচে তাদের জন্য কিছু ধন পোঁতা ছিল وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا এবং তাদের পিতা সৎলোক ছিলেন فَأَرَادَ رَبُّكَ সুতরাং আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন أَنْ يَّبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا তারা যেন যৌবনে উপনীত হয় وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا এবং নিজেদের প্রোথিত ধন বের করে নেয় رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ স্বীয় অনুগ্রহে وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي আর আমি কোনো কাজ নিজের মতে করিনি ذٰلِكَ تَأْوِيلُ এটা হলো সে সমস্ত বিষয়ের তাৎপর্য। مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا যাতে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ط قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

৮৩. আর এরা আপনাকে যুলক্বারনাইনের অবস্থা জিজ্ঞাসা করে; আপনি বলে দিন, আমি এখনই তোমাদের সম্মুখে তাঁর বিবরণ বর্ণনা করছি।
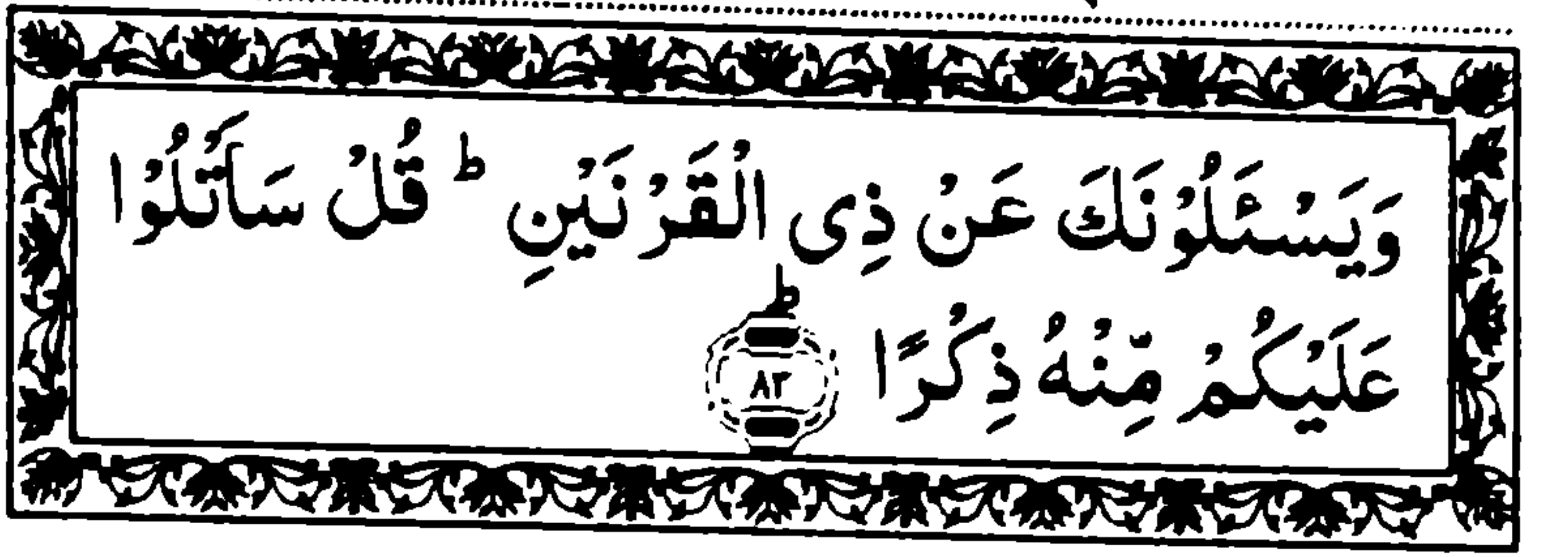
শাব্দিক অনুবাদ :

৮৩. وَيَسْـَٔلُوْنَكَ এরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ যুলক্বারনাইনের অবস্থা قُلْ আপনি বলে দিন سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا আমি এখনই তোমাদের সম্মুখে তার বিবরণ বর্ণনা করছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَهْلَ قَرْيَةٍ : হযরত খিজির (আ.) যে জনপদে পৌছেন এবং যার অধিবাসী তাঁর আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে সেটিকে এন্তাকিয়া ও ইবনে সিরীনের রেওয়ায়েতে 'আইকা' বলা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সেটি ছিল উন্দুলূসের একটি জনপদ। -(মাযহারী)

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ : হযরত কা'ব আহবার থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এই নৌকাটি যে দরিদ্রদের ছিল, তারা ছিল দশ ভাই। তন্মোধ্যে পাঁচ জন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত মজুরি করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। নদীতে নৌকা চালিয়ে ভাঁড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরি।

মিসকিনের সংজ্ঞা : কারও কারও মতে মিসকিন এমন ব্যক্তি, যার কাছে কিছুই নেই। কিন্তু আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকিনের সঠিক সংজ্ঞা এই জানা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নেসাব পরিমাণ মাল অবশিষ্ট থাকে না, সেও মিসকিনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতে যাদেরকে মিসকিন বলা হয়েছে, তাদের কাছে কমপক্ষে একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নেসাবের চাইতে কম নয়। কিন্তু নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকিন বলা হয়েছে।-(মাযহারী)

فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاۤءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا : আল্লামা বগভী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালেম বাদশাহ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত খিযির (আ.) এ কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়ে দেন, যাতে জালেম বাদশাহের লোকেরা ভাঙ্গা দেখে নৌকাটি ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়।

وَاَمَّا الْغُلٰمُ : হযরত খিযির (আ.) যে বালকটি হত্যা করেন, তার স্বরূপ এই বর্ণনা করেছেন যে, তার প্রকৃতিতে কুফরও পিতা-মাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার পিতা-মাতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ লোক। হযরত খিযির (আ.) বলেন : আমার আশঙ্কা ছিল যে, ছেলেটি বড় হয়ে সৎকর্মপরায়ণ পিতা-মাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফরে লিপ্ত হয়ে পিতা-মাতার জন্য ফেৎনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালোবাসায় পিতা-মাতার ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

فَاَرَدْنَا اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا : অর্থাৎ এজন্য আমি ইচ্ছা করলাম যে, আল্লাহ তা'আলা এই সৎকর্মপরায়ণ পিতা -মাতাকে এ ছেলের পরিবর্তে তার চাইতে উত্তম সন্তান দান করুক, যার কাজকর্ম ও চরিত্র হবে পবিত্র এবং সে পিতা-মাতার হকও পূর্ণ করবে।

আয়াতে خَشِيْنَا ও اَرَدْنَا ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, হযরত খিযির (আ.) এ দু'টি ক্রিয়াপদকে নিজের এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধ করেছেন। আর এটাও সম্ভব যে, নিজের দিকেই সম্বন্ধ করেছেন। এমতাবস্থায় اَرَدْنَا -এর অর্থ হলো, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম। কেননা এক ছেলের পরিবর্তে অন্য ছেলে দান করা একান্তভাবেই আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে খিযির অথবা অন্য কেউ শরীক হতে পারে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, ছেলেটি কাফের হবে এবং পিতামাতাকে পথভ্রষ্ট করবে- এ বিষয়টি যদি আল্লাহর জ্ঞানে ছিল তবে তাই বাস্তবায়িত হওয়া জরুরি ছিল। কেননা আল্লাহর জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোনো কিছু হতে পারে না।

উত্তর এই যে, আল্লাহর জ্ঞান এই শর্তসহ ছিল যে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে কাফের হবে এবং পিতামাতার জন্য বিপদ হবে। এরপর যখন সে পূর্বেই নিহত হয়েছে, তখন এই ঘটনা আল্লাহর জ্ঞানের বিপক্ষে নয়।-[মাযহারী]

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম আতিয়্যার বাচনিক বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতা-মাতাকে আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, পরবর্তীকালে যার গর্ভে দু'জন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তাঁর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একটি বিরাট উম্মতকে হেদায়েত দান করেন।

وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا : হযরত আবুদদারদা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রাচীরের নীচে রক্ষিত এতিম বালকদের গুপ্তধন ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার।-(তিরমিযী, হাকিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সেটি ছিল স্বর্ণের একটি ফলক। তাতে নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্যসমূহ লিখিত ছিল। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)- ও এই রেওয়ায়েতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।-[কুরতুবী]

১. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
২. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তাকদীরে বিশ্বাস করে অথচ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়।
৩. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ তা'আলাকে রিজিকদাতারূপে বিশ্বাস করে; এরপর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।
৪. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখে; অথচ আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে।
৫. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস রাখে, অথচ সৎকাজে গাফেল হয়।
৬. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও নিশ্চিত হয়ে বসে থাকে।
৭. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

পিতা-মাতার সৎকর্মের উপকার সন্তান -সন্ততিরাও পায়

وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আ.) -এর মাধ্যমে এতিম বালকদের জন্য রক্ষিত গুপ্তধনের হেফাজত এজন্য করানো হয় যে, তাদের পিতা একজন সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তার সন্তান-সন্ততির উপকারার্থে এ ব্যবস্থা করেন। মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেন : আল্লাহ তা'আলা এক এক বান্দার সৎকর্মপরায়ণতার কারণে তার পরবর্তী সন্তান-সন্ততি, বংশধর ও প্রতিবেশীদের হেফাজত করেন।-[মাযহারী]

হযরত শিবলী (র.) বলতেন : আমি এই শহর এবং সমগ্র এলাকার জন্য শান্তির কারণ। তাঁর ওফাতের পর তাঁর দাফন-সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে দায়লামের কাফেররা দাজলা নদী অতিক্রম করে বাগদাদ নগরী অধিকার করে। তখন সবাই বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ চেপেছে, অর্থাৎ শিবলীর ওফাত ও কাফেরদের হাতে বাগদাদের পতন -(কুরতুবী, ১১ খণ্ড, ২৯ পৃ:)

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলেমও সৎকর্মপরায়ণদের সন্তান-সন্ততিদের খাতির করা এবং তাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়া উচিত, যে পর্যন্ত না তারা পুরোপুরি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا - اَشُدٌّ শব্দটি شِدَّةٌ এর বহুবচন। অর্থ শক্তি এবং সে বয়স, যাতে মানুষ পূর্ণ শক্তি অর্জন এবং ভালমন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। ইমাম আবূ হানীফার (র.)-এর মতে পঁচিশ বছর বয়ঃক্রম এবং কারও কারও মতে চল্লিশ বছর বয়ঃক্রম। কেননা কুরআন পাকে রয়েছে- حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً (মাযহারী)

পয়গম্বরসুলভ অলংকার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত : এ দৃষ্টান্তটি বোঝার আগে একটি জরুরি বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা এই যে, দুনিয়াতে কোনো ভালো অথবা মন্দ কাজ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ হতে পারে না। ভালোমন্দ সবই আল্লাহর সৃজিত এবং তাঁরই ইচ্ছার অধীন। যে সব বিষয়কে মন্দ বলা হয়, সেগুলো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই মন্দ কথিত হওয়ার যোগ্য , কিন্তু সামগ্রিক বিশ্বের প্রকৃতির জন্য সবই জরুরি এবং আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে সবই উত্তম ও রহস্যের উপর নির্ভরশীল।

کوئی برائی نہیں قدرت کی کارخانے میں

মোটকথা দুনিয়াতে যেসব বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত ঘটতে পারে না। এদিক দিয়ে প্রত্যেক ভালো মন্দের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সৃষ্টির দৃষ্টিকোণে কোনো মন্দই মন্দ নয়। তাই আল্লাহ তা'আলাকে মন্দের স্রষ্টা না বলা আদব। কুরআনে উল্লিখিত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বাক্য এ আদবই শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন,

اَلَّذِيْ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ -এতে তিনি পানাহার করানোকে আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন, কিন্তু মাঝখানে অসুস্থ হওয়াকে নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করে اِذَا مَرِضْتُ বলেছেন অর্থাৎ যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন। এরূপ বলেননি যে, যখন আল্লাহ আমাকে অসুস্থ করে দেন তখন আরোগ্যও দান করেন।

এবার হযরত খিযির (আ.)-এর বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। নৌকা ভাঙার ইচ্ছা বাহ্যত একটি দূষণীয় ও মন্দ ইচ্ছা। তাই এ ইচ্ছাকে নিজের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে اَرَدْتُ বলেছেন। অতঃপর বালক হত্যা ও তার পরিবর্তে উত্তম সন্তান দান করার মধ্যে হত্যা ছিল মন্দ কাজ এবং উত্তম সন্তান দান করা ছিল ভালো কাজ। তাই এতদুভয়ের ইচ্ছার ক্ষেত্রে বহুবচন প্রয়োগ করে اَرَدْنَا অর্থাৎ 'আমরা ইচ্ছা করলাম' বলেছেন; যাতে বাহ্যিক মন্দ কাজটি নিজের সাথে এবং ভালো কাজটি আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। তৃতীয় ঘটনায় প্রাচীর সোজা করা এতিমের গুপ্তধনের হেফাজত করা একটি সম্পূর্ণ ভালো কাজ। তাই একে পুরোপুরি আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করে فَاَرَادَ رَبُّكَ অর্থাৎ 'আপনার পালনকর্তা ইচ্ছা করলেন' বলেছেন।

হযরত খিযির (আ.) জীবিত আছেন, না ওফাত হয়ে গেছে :

হযরত খিযির (আ.) জীবিত আছেন না তাঁর ওফাত হয়ে গেছে; এ বিষয়ের সাথে কুরআনে বর্ণিত ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টত এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কোনো কোনো রেওয়ায়েত ও উক্তি থেকে অদ্যাবধি তাঁর জীবিত থাকার কথা জানা যায়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে এর বিপরীত বিষয় জানা যায়। ফলে এ ব্যাপারে সর্বকালেই আলেমদের বিভিন্নরূপ মতামত পরিদৃষ্ট হয়েছে। যাদের মতে তিনি জীবিত আছেন, তাদের প্রমাণ হচ্ছে মুস্তাদরাক হাকিম কর্তৃক হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত। তাতে বলা হয়েছে : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয়ে যায়, তখন সাদাকালো দাড়িওয়ালা জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং ভিড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে কান্নাকাটি করতে থাকে। এই আগন্তুক সাহাবায়ে কেরামের দিকে মুখ করে বলতে থাকে।

اِنَّ فِى اللّٰهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَعِوَضًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ فَاِلَى اللّٰهِ فَاَنِيْبُوْا وَاِلَيْهِ فَارْغَبُوْا فَاِنَّمَا الْمَحْرُوْمُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ-

"আল্লাহর দরবারেই প্রত্যেক বিপদ থেকে সবর আছে, প্রত্যেক বিলুপ্ত বিষয়ের প্রতিদান আছে : এবং প্রত্যেক ধ্বংসশীল বস্তুর স্থলাভিষিক্ত রয়েছে। তাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। এবং তাঁর কাছেই আগ্রহ প্রকাশ কর। কেননা যে ব্যক্তি বিপদের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত।"

আগন্তুক উপরিউক্ত বাক্য বলে বিদায় হয়ে গেলে হযরত আবূ বকর (রা.) ও আলী (রা.) বললেন : ইনি হযরত খিযির (আ.)। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে যে, দাজ্জাল মদিনার নিকটবর্তী এক জায়গায় পৌঁছলে মদিনা থেকে এক ব্যক্তি তার মোকাবিলার জন্য বের হবেন। তিনি তৎকালীন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হবেন কিংবা শ্রেষ্ঠতম লোকদের অন্যতম হবেন। আবূ ইসহাক বলেন : এ ব্যক্তি হবেন হযরত খিযির (আ.)।

ইবনে আবিদদুনিয়া 'কিতাবুল হাওয়াতিফে' বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা.) হযরত খিযির (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁকে একটি দোয়া বলে দেন। যে ব্যক্তি এই দোয়া প্রত্যক নামাজের পর পাঠ করবে : সে বিরাট ছওয়াব, মাগফেরাত ও রহমত পাবে। দোয়াটি এই :

يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَيَا مَنْ لَا تَغْلُطُهُ الْمَسَائِلُ وَيَا مَنْ لَا يَبْرَمُ مِنْ اِلْحَاحِ الْمُلِحِّيْنَ اَذِقْنِيْ بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ مَغْفِرَتِكَ-

"হে ঐ সত্তা , যার এক কথা শোনা অন্য কথা শোনার প্রতিবন্ধক হয় না । হে ঐ সত্তা যাকে একই সময়ে লাখো লাখো কোটি কোটি প্রশ্ন বিভ্রান্ত করে না এবং ঐ সত্তা যিনি দোয়ায় পীড়াপীড়ি করলে এবং বারবার বললে বিরক্ত হন না আমাকে তোমার ক্ষমার স্বাদ আস্বাদন এবং তোমর মাগফিরাতের স্বাদ দান কর ।

অতঃপর এ গ্রন্থেই হুবহু এই ঘটনা, এই দোয়া এবং হযরত খিযির (আ.)- এর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা হযরত ওমর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে ।

পক্ষান্তরে যারা হযরত খিযির (আ.)- এর জীবদ্দশা অস্বীকার করেন, তাদের বড় প্রমাণ হচ্ছে সহীহ মুসলিম । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (আ.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস । হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনের শেষ দিকে এক রাত্রে আমাদেরকে নিয়ে এশার নামাজ পড়েন । নামাজ শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন-

اَرَاَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهٖ فَاِنَّ عَلٰى رَاْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَايَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدٌ-

"তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে নিয়ে (আগামী) একশ' বছর তাদের কেউই শুরুতে জীবিত থাকবে না আজ যারা পৃথিবীতে জীবিত আছে ।"

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন : এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন । কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, একশ' বছর অতীত হলে এ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে । মুসলিমে এ রেওয়ায়েতটি হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকেও প্রায় এমনি বর্ণিত আছে । কিন্তু রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করার পর আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন এর ভাষায় তাদের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, যারা হযরত খিযির (আ.)-এর জীবদ্দশাকে অস্বীকার করে । কেননা এতে যদিও সমগ্র মানবজাতির জন্য ব্যাপক ভাষা তাগিদ সহকারে প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক আদম সন্তানই এই ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত নয় । কারণ আদম সন্তানদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.)-ও একজন । তিনি ওফাত পান নি । এবং নিহতও হননি । কাজেই হাদীসে ব্যবহৃত عَلَى الْاَرْضِ শব্দের মধ্যে যে আলিফ-লাম রয়েছে, বাহ্যত তা عَهْد-এর অর্থ দেয় । এবং এর অর্থ আরব ভূমি ইয়াজুজ-মাজুজের দেশ, প্রাচ্যদেশ ও দীপপুঞ্জ-যেগুলোর নামও আরবরা কোনোদিন শোনেনি । এগুলোসহ সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ হাদীসে বোঝানো হয়নি! এ হচ্ছে আল্লামা কুরতুবীর বক্তব্য । কেউ কেউ হযরত খিযির (আ.)-এর জীবিত থাকার বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে জীবিত থাকলে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করা তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিল । কেননা হাদীসে বলা হয়েছে لَوْكَانَ مُوْسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ اِلَّا اتِّبَاعِىْ অর্থাৎ মূসা (আ.)- জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না । (কারণ আমার আগমনের ফলে তাঁর ধর্ম রহিত হয়ে গেছে) । কিন্তু এটা অসম্ভব যে, হযরত খিযির (আ.) -এর জীবন ও নবুয়ত সাধারণ পয়গম্বরদের থেকে ভিন্নরূপ হবে । তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টিগত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে । তাই তিনি সাধারণ মানুষ থেকে আলাদাভাবে নিজের কাজে নিয়োজিত আছেন । শরিয়তে মুহাম্মদীর অনুসরণের ব্যাপারে এটা সম্ভব যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের পর এ শরিয়তের অনুরসণ করে চলেছেন ।

আবূ হাইয়্যান বাহরে-মুহীত গ্রন্থে খিযির (আ.)-এর সাথে কয়েকজন বুযুর্গের সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন । কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, وَالْجُمْهُوْرُ عَلٰى اَنَّهُ مَاتَ -অর্থাৎ সাধারণ আলেমগণের মতে তাঁর ওফাত হয়ে গেছে । (ষষ্ঠ খণ্ড ১৪৭)

তাফসীর মাযহারীতে কাজী সানাউল্লাহ বলেন : হযরত সাইয়্যেদ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁর কাশফের মাধ্যমে যে কথা বলেছেন, তার মধ্যেই সব বিতর্কের সমাধান নিহিত আছে । তিনি বলেন : আমি নিজে কাশফ জগতে হযরত খিযির (আ.) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি । তিনি বলেছেন : আমি ও ইলয়াস (আ.) উভয়ই জীবিত নই । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এরূপ ক্ষমতা দান করেছেন যে, আমরা জীবিত মানুষের বেশ ধারণ করে বিভিন্নভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারি ।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, হযরত খিযির (আ.) -এর মৃত্যু ও জীবদ্দশার সাথে আমাদের কোনো বিশ্বাসগত অথবা কর্মগত বিষয় জড়িত নয় । এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কোনো কিছু বলা হয়নি । তাই এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আলোচনা ও খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন নেই । কোনো একদিকের উপর বিশ্বাস রাখাও আমাদের জন্য জরুরি নয় । কিন্তু প্রশ্নটি জনগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত, তাই উল্লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে ।

وَيَسْئَلُوْنَكَ অর্থাৎ তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। কারা প্রশ্ন করেছিল– এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা ছিল মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায়। মদিনার ইহুদিরা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও সততা যাচাই করার জন্য তিনটি প্রশ্ন বলে দিয়েছিল : রূহ, আসহাবে কাহ্‌ফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে। তন্মধ্যে দু'টি প্রশ্নের জওয়াব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াব বর্ণিত হচ্ছে যে, যুলকারনাইন কে ছিল এবং তার কি অবস্থা ছিল?– (বাহরে মুহীত)

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِسْتَطْعَمَا : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطْعَامُ মূলবর্ণ (ط - ع - م) জিনস صحيح অর্থ–তারা খাবার চাইলেন।

فَاَبَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اِبَاءٌ ও اِبَاءَةٌ মূলবর্ণ (ا - ب - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- তারা অস্বীকার করল।

شِئْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ- আপনি ইচ্ছা করলে।

سَاُنَبِّئُكَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْبِئَةٌ মূলবর্ণ (ن - ب - ء) জিনস مهموز لام অর্থ- আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি।

اَنْ اَعِيْبَهَا : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عَيْبٌ মূলবর্ণ (ع - ى - ب) জিনস اجوف يائى অর্থ- আমি তাতে খুঁত সৃষ্টি করতে।

فَخَشِيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সুতরাং আমার আশঙ্কা হলো।

يَسْتَخْرِجَا : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِخْرَاجٌ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ– তারা বের করে নেয়।

سَاَتْلُوْا : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ আমি এখনই বর্ণনা করছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا : এখানে فَاء হরফটি عطف -এর হরফ اَرَدْتُّ فعل এবং تُ ফায়েল এবং اَنْ اَعِيْبَهَا মাসদারে মুআউওয়াল হয়ে اَرَدْتُّ ফে'লের مفعول অতঃপর হরফটি واو حالية এবং كَانَ ফে'লে নাকেস وَرَآءَهُمْ যরফ হয়ে উহ্য خبر مقدم -এর সাথে متعلق এবং এটা أمام ও خلف উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। আর مَلِكٌ হলো كان ফে'লের اسم مؤخر আর يَاْخُذُ বাক্যটি হলো صفة আর كُلَّ মুযাফ এবং سَفِيْنَةٍ মুযাফ ইলাই; এখন মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مفعول আর غَصْبًا হলো اخذ -এর نوع বর্ণনা করার কারণে মাফউলে মুতলাক, আবার এটা حال হওয়াও বৈধ আছে। (ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড; পৃ. ৫৩০)

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

৮৪. আমি তাঁকে ভূপৃষ্ঠে রাজত্ব দিয়েছিলাম এবং তাঁকে প্রত্যেক প্রকারের আসবাব দান করেছিলাম।

فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

৮৫. অনন্তর তিনি এক পথ ধরে চললেন।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾

৮৬. চলতে চলতে যখন তিনি সূর্যাস্তের দেশে [পশ্চিম দিকের জনপদের শেষ সীমায়] পৌছলেন, তখন তিনি সূর্যকে এক কালো বর্ণের পানির মধ্যে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি তথায় এক জাতিকে দেখতে পেলেন [যারা বিধর্মী ছিল]; আমি বললাম, হে যুলক্বারনাইন! হয় [হত্যাদি দ্বারা] শাস্তি দিন, না হয় এদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন।

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴿٨٧﴾

৮৭. যুলক্বারনাইন বললেন, হাঁ, যে ব্যক্তি অনাচার করতে থাকবে, বস্তুত তাকে তো [দুনিয়াতে] শাস্তি প্রদান করব, অতঃপর [মৃত্যুর পর] তাকে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে, তখন তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন।

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

৮৮. আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, তার জন্য বিনিময়ে রয়েছে কল্যাণ এবং আমরা আমাদের আচরণে তার সাথে নম্র কথা বলব।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৪. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ আমি তাকে ভূপৃষ্ঠে রাজত্ব দিয়েছিলাম وَآتَيْنَاهُ এবং তাকে দান করেছিলাম مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا প্রত্যেক প্রকারের আসবাব।

৮৫. فَأَتْبَعَ سَبَبًا অনন্তর তিনি এক পথ ধরে চললেন।

৮৬. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ চলতে চলতে যখন তিনি পৌছলেন مَغْرِبَ الشَّمْسِ সূর্যাস্তের দেশে وَجَدَهَا, তখন তিনি সূর্যকে দেখলেন تَغْرُبُ অস্ত যেতে فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ এক কালো বর্ণের পানির মধ্যে وَوَجَدَ عِنْدَهَا এবং তিনি তথায় দেখতে পেলেন قَوْمًا এক জাতিকে قُلْنَا আমি বললাম يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ হে যুলক্বারনাইন إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ হয় শাস্তি দিন وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا না হয় এদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন।

৮৭. قَالَ যুলক্বারনাইন বললেন أَمَّا مَنْ ظَلَمَ যে ব্যক্তি অনাচার করতে থাকবে فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ বস্তুত তাকে তো শাস্তি প্রদান করব ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ অতঃপর তাকে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে। فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا তখন তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন।

৮৮. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে وَعَمِلَ صَالِحًا এবং নেক কাজ করবে فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ তার জন্য বিনিময় রয়েছে কল্যাণ। وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا এবং আমরা আমাদের আচরণে তার সাথে নম্র কথা বলব।

৮৯. অতঃপর তিনি [পূর্ব দিকে] অপর এক পথ ধরে চললেন।	ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۝٨٩
৯০. এক পর্যায়ে যখন তিনি সূর্যোদয়ের স্থানে পৌছলেন, তখন সূর্যকে এমন এক সম্প্রদায়ের [বসতির] উপর উদিত হতে দেখলেন, যাদের জন্য আমি সূর্যের সম্মুখে কোনো আবরণ রাখিনি।	حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ۝٩٠
৯১. ঘটনা এরূপই; আর যুলক্বারনাইনের নিকট যা ছিল, ঐ বিষয়ে আমার পূর্ণ খবর আছে।	كَذٰلِكَ ؕ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝٩١
৯২. অতঃপর তিনি [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জয় করে] অন্য এক পথ ধরে চললেন।	ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۝٩٢
৯৩. অবশেষে যখন দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছলেন, তখন তিনি সেই পর্বতদ্বয়ের সম্মুখে এমন এক সম্প্রদায়কে দেখলেন, যারা (তার কথা) একেবারেই বুঝতে পারছিল না।	حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝٩٣
৯৪. তারা বলল, হে যুলক্বারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায় এ দেশে বড় উৎপাত করে, অতএব, আমরা কি আপনাকে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করে দিব– এ শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন।	قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝٩٤

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৯. ثُمَّ অতঃপর اَتْبَعَ سَبَبًا তিনি অপর এক পথ ধরে চললেন।

৯০. حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ এক পর্যায়ে যখন তিনি পৌছলেন مَطْلِعَ الشَّمْسِ সূর্যোদয়ের স্থানে وَجَدَهَا তখন সূর্যকে দেখলেন تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হতে لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ যাদের জন্য আমি রাখিনি مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا সূর্যের সম্মুখে কোনো আবরণ।

৯১. كَذٰلِكَ ঘটনা এরূপই وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا আর যুলক্বারনাইনের নিকট যা ছিল ঐ বিষয়ে আমার পূর্ণ খবর আছে।

৯২. ثُمَّ অতঃপর اَتْبَعَ سَبَبًا তিনি অন্য এক পথ ধরে চললেন।

৯৩. حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ অবশেষে যখন পৌছলেন بَيْنَ السَّدَّيْنِ দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا তখন তিনি সেই পর্বতদ্বয়ের এমন সম্মুখে এক সম্প্রদায়কে দেখলেন لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا তারা (তার কথা) একেবারেই বুঝতে পারছিল না।

৯৪. قَالُوْا তারা বলল يٰذَا الْقَرْنَيْنِ হে যুলক্বারনাইন اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায় مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ এদেশে বড় উৎপাত করে فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا আমরা কি আপনাকে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করে দিব عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ এ শর্তে যে, আপনি নির্মাণ করে দিবেন بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ আমাদের ও তাদের মধ্যে سَدًّا একটি প্রাচীর।

৯৫. যুলক্বারনাইন বললেন, আমার প্রতিপালক আমাকে যে সম্পদের অধিকারী করেছেন তাই প্রচুর। অতএব, তোমরা কেবল দৈহিক শক্তি দ্বারা আমার সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে অতিশয় মজবুত প্রাচীর গড়ে দিব।

قَالَ مَا مَكَّنِّیْ فِیْهِ رَبِّیْ خَیْرٌ فَاَعِیْنُوْنِیْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْمًا ﴿۹۵﴾

৯৬. তোমরা আমাকে লোহার পাতসমূহ এনে দাও; অবশেষে যখন দুই পর্বতশৃঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানকে [স্তরে স্তরে লৌহপাত সাজিয়ে] পর্বতদ্বয়ের সমান করে ফেলল, তখন আদেশ দিলেন যে, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক; এমনকি যখন তারা তাকে অগ্নির মতো উত্তপ্ত করে ফেলল, তখন বললেন, এখন আমার নিকট প্রগলিত তামা নিয়ে এসো,– তাতে ঢেলে দেই।

اٰتُوْنِیْ زُبَرَ الْحَدِیْدِ ؕ حَتّٰۤی اِذَا سَاوٰی بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِیْۤ اُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا ﴿۹۶﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৫. قَالَ যুলক্বারনাইন বললেন مَا مَكَّنِّیْ فِیْهِ رَبِّیْ خَیْرٌ আমার প্রতিপালক আমাকে যে সম্পদের অধিকারী করেছেন তাই প্রচুর فَاَعِیْنُوْنِیْ بِقُوَّةٍ অতএব তোমরা কেবল দৈহিক শক্তি দ্বারা আমার সাহায্য কর اَجْعَلْ আমি দিব بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ তোমাদের ও তাদের মধ্যে رَدْمًا অতিশয় মজবুত প্রাচীর।

৯৬. اٰتُوْنِیْ তোমরা আমাকে এনে দাও زُبَرَ الْحَدِیْدِ লোহার পাতসমূহ حَتّٰۤی اِذَا سَاوٰی অবেশেষে যখন সমান করে ফেলল بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ দুই পর্বতশৃঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানকে قَالَ তখন আদেশ দিলেন انْفُخُوْا তোমরা দম হাঁপরে দিতে থাক حَتّٰۤی اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا এমনকি যখন তারা তাকে অগ্নির মতো উত্তপ্ত করে ফেলল قَالَ তখন বললেন اٰتُوْنِیْۤ اُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا এখন আমার নিকট প্রজ্বলিত তামা নিয়ে এসো তাতে ঢেলে দেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যুলকারনাইন কে ছিলেন, কোন যুগে ও কোন দেশে ছিলেন এবং তার নাম যুলকারনাইন হলো কেন? যুলকারনাইন নামকরণের হেতু সম্পর্কে বহু উক্তি ও তীব্র মতভেদ পরিদৃষ্টি হয়। কেউ বলেন : তাঁর মাথার চুলে দু'টি গুচ্ছ ছিল। তাই যুলকারনাইন, (দুই গুচ্ছওয়ালা) আখ্যায়িত হয়েছেন। কেউ বলেন : পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশসমূহ জয় করার কারণে যুলকারনাইন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। কেউ এমনও বলেছেন যে, তার মাথায় শিঙ এর অনুরূপ দু'টি চিহ্ন ছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তাঁর মাথায় দু'টি ক্ষতচিহ্ন ছিল। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, কুরআন স্বয়ং তাঁর নাম যুলকারনাইন রাখেনি, বরং ইহুদিরা এ নাম বলেছিল। বোধ হয় তিনি তাদের কাছে এ নামেই খ্যাত ছিলেন। যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে কুরআন পাক যা বর্ণনা করেছেন তা এই :

তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম দান করা হয়েছিল। তিন দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌঁছেছিলেন-পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্তে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। এখানেই তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি সুবিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইয়াজূজ মাজূজের লুটতরাজ থেকে এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন উত্থাপনকারী ইহুদিরা এই জওয়াব শুনে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তারা আর অতিরিক্ত কোনো প্রশ্ন করেনি যে, তাঁর নাম কেন যুলকারনাইন ছিল এবং তিনি কোন দেশে কোন যুগে বিদ্যমান ছিলেন? এতে বোঝা যায় যে, এসব প্রশ্নকে স্বয়ং ইহুদিরাও অনাবশ্যক ও অনর্থক মনে করেছে। বলাবাহুল্য, কুরআন পাক ইতিহাস ও কাহিনীর ততটুকু অংশই উল্লেখ করে, যতটুকুর সাথে কোনো ধর্মীয় বা পার্থিব উপকার জড়িত থাকে অথবা যার উপর কোনো জরুরি বিষয় নির্ভরশীল থাকে। তাই এসব বিষয় কুরআন পাক বর্ণনা করেনি এবং কোনো সহীহ হাদীসেও এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। যেহেতু কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত বোঝা এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়, তাই পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেননি।

এখন এসব প্রশ্ন সমাধানের একমাত্র সম্বল হচ্ছে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অথবা বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জীল। বলা বাহুল্য, উপর্যুপরি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে বর্তমান তাওরাত এবং ইঞ্জীলও তাদের ঐশী গ্রন্থের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। এগুলো এখন বলতে গেলে পুরানা কাহিনীর পর্যায়ভুক্ত। এগুলো বর্তমানে প্রাচীন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত এবং ইসরাঈলী কিস্‌সা-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এসব কাহিনীর কোনো সনদ নেই এবং কোনো জমানার সুধীবৃন্দের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য পরিগণিত হয় 'নি। তাফসীরবিদগণও এ ব্যাপারে যা কিছু লিখেছেন, তাও এক ধরনের ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের সমষ্টি মাত্র। ফলে তাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। বর্তমানকালে ইউরোপীয়রা ইতিহাসকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছে। তারা এ বিষয়ের গবেষণায় অপরিসীম অধ্যবসায় ও পরিশ্রম নিয়োজিত করেছে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে সেখান থেকে বিভিন্ন শিলালিপি উদ্ধার করেছে এবং সেগুলোর সাহায্যে পুরাতত্ত্বের স্বরূপ আবিষ্কারে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে প্রাপ্ত শিলালিপির মাধ্যমে কোনো ঘটনার সমর্থনে সাহায্য পাওয়া গেলেও সেগুলো দ্বারা ঘটনার পাঠোদ্ধার সম্ভবপর নয়। এর জন্য ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহের অবস্থা একটু আগেই জানা গেছে যে, এগুলোর মর্যাদা কিস্‌সা-কাহিনীর চাইতে অধিক নয়। প্রাচীন ও আধুনিক তাফসীরবিদগণ নিজ নিজ গ্রন্থে এসব রেওয়াতে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই উদ্ধৃত করেছেন। এখানেও দৃষ্টিভঙ্গিতেই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু লেখা হচ্ছে। মাওলানা হিফজুর রহমান (র.) 'কাসাসুল-কুরআন' গ্রন্থে এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের কৌতুহলী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকারী চার জন সম্রাট অতিক্রান্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে দু'জন ছিলেন মুমিন এবং দু'জন কাফের। মুমিন দু'জন হলেন হযরত সোলায়মান (আ.) ও যুলকারনাইন এবং কাফের দু'জন হলো নমরুদ ও বখতে নসর।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুলকারনাইন নামে পৃথিবীতে একাধিক ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেছেন এবং এটাও আশ্চর্যের ব্যাপারে যে, প্রতি যুগের যুলকারনাইনের সাথেই সিকান্দার (আলেকজাণ্ডার) উপাধিটিও যুক্ত রয়েছে। খ্রিস্টের প্রায় তিনশ' বছর পূর্বে সিকান্দার নামে একজন সম্রাট প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিলেন তাকে সিকান্দার গ্রীক, মকদুনী, রুমী ইত্যাদি উপাধিতেও স্মরণ করা হতো। তার মন্ত্রী ছিলেন এরিস্টটল এবং তিনি দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে তার রাজ্য জয় করেন। সিকান্দার নামে খ্যাতি লাভকারী সর্বশেষ ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। তার কাহিনী জগতে অধিক প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ তাকে কুরআনে উল্লিখিত যুলকারনাইন বলে অভিমত দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা তিনি অগ্নিপূজারী মুশরিক ছিলেন। কুরআন পাকে যে যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে, তার নবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। কুরআনের আয়াত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

হাফেজ ইবনে কাসীর 'আল বেদায়াহ ওয়ান-নেহায়াহ' গ্রন্থে ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে তার পূর্ণ বংশ তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন, যা উপরে পৌঁছে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সাথে মিলে যায়। তিনি বলেছেন : এই সিকান্দারই গ্রীক, মিসরী মকদুনী নামে পরিচিত। তিনি নিজের নামে আলেকজান্দ্রিয়া শহর পত্তন করেন। রোমের ইতিহাস তার আমল থেকেই আরম্ভ হয়। তার আমল প্রথম সিকান্দার যুলকারনাইন থেকে দু'হাজার বছরেরও অধিককাল পর। তিনিই দারাকে হত্যা করেন এবং পারস্য সম্রাটদেরকে পরাভূত করে তাদের দেশ জয় করেন। কিন্তু এই ব্যক্তি ছিল মুশরিক। তাকে কুরআনে উল্লিখিত যুলকারনাইন বলা নিতান্তই ভুল। ইবনে কাসীরের ভাষা এরূপ :

فَأَمَّا ذُوالْقَرْنَيْنِ الثَّانِي فَهُوَ إِسْكَنْدَرُ بْنُ فَيْلَبْسِ بْنِ مَصْرَيْم بْنِ هَرْمَسِ بْنِ مَيْطُونِ بْنِ رُومِي بْنِ لَنْطِي بْنِ يُونَانِ بْنِ يَافِثِ بْنِ يُونَهِ بْنِ شَرْخُونِ بْنِ رُومَةَ بْنِ شَرْفَطِ بْنِ تَوْفِيلِ بْنِ رُومِي بْنِ الْأَصْفَرِ بْنِ يَقْزِ بْنِ الْعِيْصِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَذَا نَسَبَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ الْمَقْدُونِي الْيُونَانِي الْمِصْرِي بَانِي اسْكَنْدَرِيَّةَ الَّذِي يُؤَرِّخُ بِأَيَّامِهِ الرُّومُ وَكَانَ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْأَوَّلِ بِدَهْرٍ طَوِيلٍ وَكَانَ هٰذَا قَبْلَ الْمَسِيحِ بِنَحْوٍ مِنْ ثُلُثِمِائَةِ سَنَةٍ وَكَانَ أَرْطَاطَالِيس الْفَلِيسُوف وَزِيرَهُ وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ دَارَا بْنَ دَارَا وَأَذَلَّ مُلُوكَ الْفُرْسِ وَأَوْطَأَ أَرْضَهُمْ وَإِنَّمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ وَأَنَّ الْمَذْكُورَةَ فِي الْقُرْآنِ هُوَ الَّذِي كَانَ أَرْطَاطَالِيس وَزِيرَهُ فَيَقَعُ بِسَبَبِ ذٰلِكَ خَطَاءٌ كَبِيرٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ طَوِيلٌ فَإِنَّ الْأَوَّلَ كَانَ عَبْدًا مُؤْمِنًا صَالِحًا وَمَلِكًا عَادِلًا وَكَانَ وَزِيرُهُ الْخَضِرَ وَقَدْ كَانَ نَبِيًّا عَلٰى مَا قَرَّرْنَاهُ قَبْلَ هٰذَا وَأَمَّا الثَّانِي فَكَانَ مُشْرِكًا كَانَ وَزِيرُهُ فَيْلَسُوفًا وَقَدْ كَانَ بَيْنَ زَمَانَيْهِمَا أَزْيَدُ مِنْ أَلْفَيْ سَنَةٍ فَأَيْنَ هٰذَا مِنْ هٰذَا لَا يَسْتَوِيَانِ وَلَا يَشْتَبِهَانِ إِلَّا عَلٰى غَبِيٍّ لَا يَعْرِفُ حَقَائِقَ الْأُمُورِ-

হাদীস ও ইতিহাসবিদ ইবনে-কাসীরের বক্তব্যে প্রথমত জানা যায় যে, সিকান্দার বাদশাহ যিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর তিন শত বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন, দারা ও পারস্য সম্রাটদের সাথে যার যুদ্ধ হয়েছে এবং যিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন নন।

কতিপয় বড় বড় তাফসীরবিদও এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। আবূ হাইয়্যান বাহরে-মুহীতে এবং আল্লামা আলূসী রূহুল মা'আনীতে তাকে কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন বলে দিয়েছেন

দ্বিতীয় وَإِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا বাক্য থেকে জানা গেল যে, ইবনে -কাসীরের মতে তাঁর নবী হওয়ার ধারণাটি প্রবল। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি স্বয়ং ইবনে কাসীর আবূ তোফায়েলের রেওয়ায়েতক্রমে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন নবী বা ফেরেশতা ছিলেন না; বরং একজন সৎকর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন। তাই কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, إِنَّهُ এর সর্বনাম দ্বারা যুলকারনাইনকে নয় হযরত খিযির (আ.) -কে বোঝানো হয়েছে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, তবে কুরআন বর্ণিত যুলকারনাইন কে এবং কোন যুগে ছিলেন? এ সম্পর্কেও আলেমদের উক্তি -বিভিন্নরূপ। ইবনে কাসীরের মতে তার যুগ ছিল সিকান্দারে গ্রীক মকদুনী থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগ। তার উজির ছিলেন হযরত খিযির (আ.)। ইবনে কাসীর 'আল-বেদায়াহ ওয়ান-নেহায়াহ গ্রন্থে এ রেওয়ায়েতও বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন পদব্রজে হজের উদ্দেশ্যে আগমন করলে হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কা থেকে বের হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, তাঁর জন্য দোয়া করেন এবং কিছু উপদেশও প্রদান করেন। তাফসীরে ইবনে কাসীরে আযরকীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, যুলকারনাইন হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সাথে তওয়াফ করেন এবং কুরবানি করেন।

আবূ রায়হান আল-বেরুনী 'কিতাবুল আসরিল বাকিয়া আনিল কুরূনিল খালীয়া' গ্রন্থে বলেন, কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন হচ্ছে আবূ বকর ইবনে সুমাই ইবনে ওমর ইবনে আফরীকায়স হিমইয়ারী। তিনি দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তুব্বা হিমইয়ারী ইয়ামেনী তার কবিতা তাঁর জন্য গর্ববোধ করে বলেছেন : আমার দাদা যুলকারনাইন মুসলমান ছিলেন। কবিতা এই–

قَدْ كَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ جَدِّيْ مُسْلِمًا
مَلِكًا عَلَانِي الْأَرْضِ غَيْرَ مُبَعَّدِ
بَلَغَ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ يَبْتَغِي
أَسْبَابَ مُلْكٍ مِنْ كَرِيمٍ سَيِّدٍ

আবূ হাইয়্যান বাহরে-মুহীতেও রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরও 'আল-বেদায়াহ ওয়ান-নেহায়াহ' গ্রন্থে এর উল্লেখ করার পর বলেন : এই যুলকারনাইন তিন জন ইয়ামেনী সম্রাটের মধ্যে প্রথম সম্রাট ছিলেন। সে-ই সাবা' কূপের মোকদ্দমায় হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর পক্ষে ন্যায় ফয়সালা দিয়েছিলেন। এ সমুদয় রেওয়ায়েতে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব, সুনাম ও বংশপরম্পরা সংক্রান্ত মতভেদ সত্ত্বেও তাঁর যুগ হযরত ইবরাহীম (আ.) এর যুগ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

মওলানা হিফযুর রহমান কাসাসুল কুরআনে যুলকারনাইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সারমর্ম এই যে, কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন হচ্ছেন পারস্যের সে সম্রাট, যাকে ইহুদিরা খোরাস, গ্রীকরা সায়রাস, পারসিকরা গোরশ এবং আরবরা কায়খসরু নামে অভিহিত করে। তার আমল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনেক পরে বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গম্বর দানিয়াল (আ.)-এর যুগ বর্ণনা করা হয়। এ যুগ দারার হত্যাকারী সিকান্দার মকদুনীর যুগের কাছাকাছি হয়ে যায়। কিন্তু মাওলানা সাহেবও ইবনে কাসীর প্রমুখের ন্যায় কঠোর ভাষায় বিরোধিতা করে বলেছেন যে, যুলকারনাইন সে সিকান্দার মকদুনী হতে পারে না, যার উজির ছিলেন দার্শনিক এরিস্টটল। কারণ তিনি ছিলেন মুশরিক এবং যুলকারনাইন ছিলেন মু'মিন, সৎ কর্মপরায়ণ। মাওলানা সাহেবের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ এই যে, সূরা বনী ইসরাঈলে বনী ইসরাঈলের দু'বার দুষ্কর্ম ও হাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করে দুই বারের শাস্তি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। হাঙ্গামা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ
(অর্থাৎ তোমাদের হাঙ্গামার শাস্তিস্বরূপ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু সংখ্যক কঠোর যোদ্ধা বান্দাকে প্রেরণ করব। তারা তোমাদের ঘরে ঘরে অনুপ্রবেশ করবে।) এখানে কঠোর যোদ্ধা বলে বখতে নসর ও তার দলবলকে বুঝানো হয়েছে। তারা বায়তুল মোকাদ্দাসে চল্লিশ হাজার এবং কোনো রেওয়ায়েত মতে সত্তর হাজার ইহুদিকে হত্যা করে এবং লক্ষাধিক বনী ইসরাঈলকে বন্দী করে গরু-ছাগলের মতো হাঁকিয়ে বাবেল নিয়ে যায়। এরপর কুরআন পাক বলেন : ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ (অর্থাৎ আমি পুনরায় তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধ জয়ী করলাম।) বিজয়ের এই ঘটনাটি সম্রাট কায়খসরু তথা খোরাসের হাতে সংঘটিত হয়। সে ছিল ঈমানদার, সৎকর্মপরায়ণ। সে বখতে নসরের মোকাবিলা করে বন্দী বনী ইসরাঈলকে তার অধিকার থেকে মুক্ত করে পুনরায় ফিলিস্তীনে পুনর্বাসিত করে এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত বায়তুল মোকাদ্দাসকেও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। বায়তুল-মোকাদ্দাসের যেসব গুপ্তধন গুরুত্বপূর্ণ সাজসরঞ্জাম বখতে নসর এখান থেকে বাবেলে স্থানান্তিরত করেছিল, সে সেগুলোও উদ্ধার করে বনী ইসরাঈলের অধিকারে সমর্পণ করে। এভাবে বনী ইসরাঈলের কাছে ইহুদিদের ত্রাণকর্তারূপে পরিগণিত হয়।

নবুয়ত পরীক্ষা করার জন্য মদিনার ইহুদিরা কুরাইশদের জন্য যে প্রশ্নপত্র বাছাই করে, তাতে যুলকারনাইন সম্পর্কিত প্রশ্নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহুদিরা তাকে তাদের ত্রাণকর্তারূপে সম্মান ও ভক্তিশ্রদ্ধা করত।

মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব তাঁরও বক্তব্যের স্বপক্ষে বর্তমানে তাওরাত থেকে, বনী ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে এবং ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত থেকে প্রচুর দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন। কেউ আরও বেশি জানতে চাইলে মাওলানা সাহেবের পুস্তকটি পাঠ করতে পারেন। এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করার মাধ্যমে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব ও তার যুগ সম্পর্কে ইতিহাস ও তাফসীরবিদদের সবগুলো উক্তি বর্ণনা করে দেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে কার উক্তি প্রবল এ সিদ্ধান্তে নেওয়া আমার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা কুরআন যেসব বিষয়ের দাবি করেনি এবং হাদীসও যেসব বিষয় বর্ণনা করেনি, সেগুলো নির্ণয় ও নির্দিষ্ট করার দায়িত্বও আমার উপর বর্তায় না। তন্মধ্যে যে উক্তিই প্রবল ও নির্ভুল প্রমাণিত হবে, তাতেই কুরআনের লক্ষ্য অর্জিত হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا : এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, কুরআন পাক ذِكْرَهُ সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে مِنْهُ ذِكْرًا এ দু'টি শব্দ কেন ব্যবহার করল? চিন্তা করলে দেখা যাবে, এ দু'টি শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কুরআন পাক যুলকারনাইনের আদ্যপান্ত কাহিনী বর্ণনা করার ওয়াদা করেনি, বরং তার আলোচনার একাংশ উল্লেখ করার কথা বলেছে। উপরে যুলকারনাইনের নামও বংশপরম্পরা সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কুরআন পাক একে অনাবশ্যক মনে করে বাদ দেওয়ার কথা প্রথমেই ঘোষণা করে দিয়েছে।

وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا : আরবি অভিধানে سَبَبْ শব্দের অর্থ এমন বস্তু যা দ্বারা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপায়াদি, জ্ঞানবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। –(বাহরে মুহীত)

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একজন সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যেসব বিষয় অত্যাবশ্যকীয় مِنْ كُلِّ شَيْءٍ বলে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়েরই জন্য সে যুগে যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, তার সবই দান করেছিলেন।

فَاَتْبَعَ سَبَبًا : অর্থাৎ সব রকম ও দুনিয়ার সর্বত্র পৌঁছার উপকরণাদি তাঁকে দান করা হয়েছিল, কিন্তু সে সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত পৌঁছার উপকরণাদি কাজে লাগায়।

حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ : অর্থাৎ তিনি পশ্চিম প্রান্তে সে সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন যার পরে কোনো জনবসতি ছিল না।

فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ : حَمِئَة এর শাব্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা। এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো রয়েছে, যার নীচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। সূর্যকে এরূপ জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শক দেখা মাত্রই অনুভব করে যে, সূর্য এ জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে। কেননা এরপর কোনো বসতি অথবা স্থলভাগ ছিল না। আপনি যদি সূর্যাস্তের সময় এমন কোনো ময়দানে উপস্থিত থাকেন, যার পশ্চিম দিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোনো পাহাড়, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে যেন সূর্যটি মাটির অভ্যন্তরেই প্রবেশ করছে।

وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا : অর্থাৎ ঐ কালো জলাশয়ের কাছে যুলকারনাইন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে জানা যায় যে, সম্প্রদায়টি ছিল কাফের। তাই আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনকে ক্ষমতা দান করলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই সবাইকে তাদের কুফরের শাস্তি প্রদান কর এবং ইচ্ছা করলে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর অর্থাৎ প্রথমে দাওয়াত তাবলীগ ও উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ও ঈমান কবুল করতে সম্মত কর। এরপর যারা মানে তাদেরকে প্রতিদান এবং যারা না মানে তাদেরকে শাস্তি দাও। প্রত্যুত্তরে যুলকারনাইন দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করে বললেন,: আমি প্রথমে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে সরলপথে আনার চেষ্টা করব। এরপরও যারা কুফরে দৃঢ়পদ থাকবে, তাদেরকে শাস্তি দিব। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিব।

قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ : এ থেকে জানা যায় যে, যুলকারনাইনকে আল্লাহ তা'আলা নিজেই সম্বোধন করে একথা বলেছেন। যুলকারনাইনকে নবী সাব্যস্ত করা হলে এতে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাঁকে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নবী না মানলে কোনো পয়গম্বরের মধ্যস্থতায়ই তাঁকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে। যেমন, রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আ.) তাঁর সাথে ছিলেন। এছাড়া এতে নবুয়তের ওহী না হয়ে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

যেমন হযরত মূসা (আ.) এর জননীর জন্য কুরআনে وَاَوْحَيْنَا বলা হয়েছে। অথচ তিনি যে নবী ও রাসূল ছিলেন না– সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবূ হাইয়্যান বাহরে মুহীতে বলেন : এখানে যুলকারনাইনকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে গণহত্যা ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুয়তের ওহী ব্যতীত দেওয়া যায় না-কাশফ, ইলহাম অথবা অন্য কোনো উপায়ে তা হতে পারে না। তাই হয় যুলকারনাইনকে নবী মানতে হবে, না হয় তাঁর যুগে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যার মাধ্যমে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনাই বিশুদ্ধ নয়।

যুলকারনাইন পূর্বপ্রান্তে যে জাতিকে বসবাস করতে দেখেছেন, কুরআন পাক তাদের সম্পর্কে বলেছে যে, তারা গৃহ, তাবু পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির দ্বারা রোদ থেকে আত্মরক্ষা করত না, কিন্তু তাদের ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কিছুই বলেনি এবং যুলকারনাইন তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, তাও ব্যক্ত করেনি। বলাবাহুল্য তারাও কাফেরই ছিল এবং যুলকারনাইন তাদের সাথেও এমন ব্যবহারই করেছেন, যা পশ্চিমা জাতির সাথে করেছেন বলে উপরে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করা হয় নি। কারণ পূর্ববর্তী ঘটনার আলোকেই তা বোঝা যায়।–(বাহরে মুহীত)

بَيْنَ السَّدَّيْنِ : যে বস্তু কোনো কিছুর জন্য বাধা হয়ে যায়, তাকে سَدٌّ বলা হয়। তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড়ে হোক কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে سَدَّيْنِ বলে দুই পাহাড় বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াজুজ -মাজুজের পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। যুলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

زُبَرَالْحَدِيْدِ : এখানে زُبَرٌ শব্দটি زُبْرَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ পাত। এখানে লৌহখণ্ড বোঝানো হয়েছে। গিরিপথ বন্ধ করার জন্য নির্মিতব্য প্রাচীর ইট -পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল।

اَلصَّدَفَيْنِ দুই পাহাড়ের বিপরীতমুখী দুই দিক :

قِطْرًا অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারো কারো মতে গলিত লোহা অথবা রাঙতা।- (কুরতুবী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَكَّنَّا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيل মাসদার تَمْكِيْنٌ মূলবর্ণ (م ـ ك ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– আমি রাজত্ব দিয়েছিলাম। ক্ষমতাধর বানানো, প্রতিষ্ঠিত করা।

اٰتَيْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– আমি তাকে দান করেছিলাম।

لَا يَكَادُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার مَكَادٌ ـ كَوْدٌ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা পারছিল না, বুঝার উপক্রম হচ্ছিল না।

فَاَعِيْنُوْنِيْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعَانَةٌ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– অতএব তোমরা আমাকে সাহায্য কর, সাহায্য করা।

اٰتُوْنِيْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ তোমরা আমাকে দাও। তোমরা আমাকে এনে দাও।

سَاوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُسَاوَاةٌ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সমান করে ফেলল, সমান হওয়া।

اُنْفُخُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَفْخٌ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ خ) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক, ফুঁক দেওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا : এখানে ثُمَّ হলো عطف -এর হরফ এবং تَرَاخِى -এর জন্য হয়েছে يُرَدُّ হলো فعل مضارع مجهول এবং هو উহ্য যমীর এর نائب فاعل এবং اِلٰى رَبِّهٖ হলো يُرَدُّ -এর সাথে متعلق অতঃপর فاء হরফে আতফ এখানে يُعَذِّبُ ফেল এবং এর ضمير ফায়েল। আর ه হলো مفعول به আর عَذَابًا আর মাফউলে বিহী মওসূফ আর نُكْرًا হলো সিফত সব মিলে جملة فعلية হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
৯৭. অতঃপর তারা তার উপর আরোহণও করতে পারত না এবং তাতে কোনো ছিদ্রও করতে পারত না।	فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾
৯৮. তিনি বললেন, এটা আমার প্রতিপালকেরই রহমত, অতঃপর যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি উপনীত হবে, তখন একে ধ্বংস করত সমতল করে দিবেন এবং আমার রবের প্রত্যেক প্রতিশ্রুতিই সত্য।	قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٨﴾
৯৯. আর সেদিন আমি তাদের অবস্থা এরূপ করে দিব যে, তারা একে অন্যের সাথে এলোমেলো হয়ে যাবে এবং সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, অতঃপর আমি তাদের সকলকে একত্র করব।	وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾
১০০. এবং সেদিন আমি দোজখকে ঐ কাফেরদের সম্মুখে উপস্থিত করব।	وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ﴿١٠٠﴾
১০১. আমার স্মরণ হতে যাদের চক্ষুর উপর পর্দা পড়েছিল এবং তারা শ্রবণ করতেও পারত না।	الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾
১০২. তবুও কি কাফেররা এ ধারণা করে যে, আমাকে ছেড়ে আমার বান্দাগণকে স্বীয় কার্যনির্বাহকরূপে স্থির করবে? নিশ্চয় আমি দোজখকে কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি।	اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ অতঃপর তারা তার উপর আরোহণও করতে পারত না وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا এবং তাতে কোনো ছিদ্রও করতে পারত না।

৯৮. قَالَ তিনি বললেন। هٰذَا এটা رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ আমার প্রতিপালকেরই রহমত فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ অতঃপর যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি উপনীত হবে جَعَلَهٗ دَكَّآءَ তখন এটাকে ধ্বংস করে সমতল করে দিবেন وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا এবং আমার প্রতিপালকের প্রত্যেক প্রতিশ্রুতিই সত্য।

৯৯. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ, আর সেদিন আমি তাদের অবস্থা এরূপ করে দিব যে, يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ তারা একে অন্যের সাথে এলোমেলো হয়ে যাবে, وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ, এবং সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا অতঃপর আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব।

১০০. وَّعَرَضْنَا, এবং আমি উপস্থিত করব جَهَنَّمَ দোজখকে يَوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ঐ কাফেরদের সম্মুখে

১০১. الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ যাদের চক্ষুর উপর পর্দা পড়েছিল عَنْ ذِكْرِيْ আমার স্মরণ হতে وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا এবং তারা শ্রবণ করতেও পারত না।

১০২. اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا তবুও কি কাফেররা এই ধারণা করে যে اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ আমার বান্দাগণকে স্থির করবে مِنْ دُوْنِيْٓ আমাকে ছেড়ে اَوْلِيَآءَ স্বীয় কার্যনির্বাহকরূপে اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ নিশ্চয় আমি দোজখকে প্রস্তুত করে রেখেছি لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের সম্বন্ধে অবহিত করব–যারা আমলের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. এরা সে সমস্ত লোক যাদের কৃত সকল পরিশ্রম দুনিয়াতে বিফল হয়েছে, অথচ তারা [মূর্খতাবশত]-এ ধারণা করে যে, তারা উত্তম কাজ করছে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. তারা এমন লোক–যারা স্বীয় প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে এবং তাঁর সম্মুখীন হওয়াকে অস্বীকার করছে, ফলে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং আমি কিয়ামত দিবসে তাদের জন্য কোনো ওজনই স্থাপন করব না।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. তাদের শাস্তি তাই হবে, অর্থাৎ দোজখ, যেহেতু তারা কুফরি করেছিল এবং আমার আয়াতসমূহ ও রাসূলদেরকে বিদ্রূপের পাত্র স্বরূপ গ্রহণ করেছিল।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

১০৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্য ফেরদাউসের উদ্যানসমূহ হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৩. قُلْ আপনি বলুন هَلْ نُنَبِّئُكُمْ আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا এমন লোকদের সম্বন্ধে যারা আমলের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

১০৪. اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ এরা সে সমস্ত লোক যাদের কৃত সকল পরিশ্রম বিফল হয়েছে فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا দুনিয়াতে وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ অথচ তারা (মূর্খতাবশত) এ ধারণা করে যে اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا তারা উত্তম কাজ করছে।

১০৫. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তারা এমন লোক যারা অস্বীকার করছে بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ স্বীয় প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে وَلِقَآئِهٖ এবং তার সম্মুখীন হওয়াকে فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ফলে তাদের কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ সুতরাং আমি তাদের জন্য স্থাপন করব না يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে وَزْنًا কোনো ওজনই।

১০৬. ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ তাদের শাস্তি তাই হবে جَهَنَّمُ অর্থাৎ দোজখ بِمَا كَفَرُوْا যেহেতু তারা কুফরি করেছিল وَاتَّخَذُوْٓا এবং গ্রহণ করেছিল اٰيٰتِيْ আমার আয়াতসমূহ وَرُسُلِيْ এবং রাসূলগণকে هُزُوًا বিদ্রূপের পাত্রস্বরূপ।

১০৭. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে كَانَتْ لَهُمْ তাদের জন্য হবে جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ ফেরদাউসের উদ্যানসমূহ نُزُلًا মেহমানদারির।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে এবং তথা হতে অন্যত্র যেতে চাইবে না।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

১০৯. আপনি বলে দিন, যদি আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ লিখার জন্য সমুদ্র [-এর পানি] কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ পরিসমাপ্তির পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে, যদিও ঐ সমুদ্রের অনুরূপ আরো সমুদ্রকে [তার] সাহায্যার্থে আনয়ন করি।

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

১১০. আপনি [এটাও] বলে দিন, আমি তো তোমাদেরই মতো মানুষ। আমার নিকট কেবল এই ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বূদ হচ্ছেন একই মা'বূদ। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখে, তবে সে যেন নেক কাজ করতে থাকে এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে অপর কাউকেও শরিক না করে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৮. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا এবং তথা হতে অন্যত্র যেতে চাইবে না।

১০৯. قُلْ আপনি বলে দিন لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا সমুদ্র (-এর পানি) কালি হয় لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ লিখার জন্য لَنَفِدَ الْبَحْرُ তবে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ পরিসমাপ্তির পূর্বেই وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا যদিও ঐ সমুদ্রের অনুরূপ আরও সমুদ্রকে (তার) সাহায্যার্থে আনয়ন করি।

১১০. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আমি তো তোমাদের মতো মানুষ يُوْحٰٓى اِلَيَّ আমার নিকট কেবল এই ওহী আসে যে اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তোমাদের মা'বূদ হচ্ছেন একই মা'বূদ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا সুতরাং যে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা রাখে لِقَآءَ رَبِّهٖ নিজ প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভের فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا তবে সে যেন নেক কাজ করতে থাকে وَّلَا يُشْرِكْ এবং শরিক না করে بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে اَحَدًا অপর কাউকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا [١٠٩]

শানে নুযূল : ইহুদিরা রাসূল ﷺ কে লক্ষ্য করে বলেছিল, হে মুহাম্মদ! আমাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে তো অধিক ইলম রয়েছে। আপনি কিভাবে এ মন্তব্য করেছেন যে, তোমাদেরকে যৎসামান্য ইলম দেওয়া হয়েছে। এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল রাসূল ﷺ কে অস্বীকার করা এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণিত করা। তাদের এমন উক্তির পরিপেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন (সাভী– ৩০/৩) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ইহুদিরা রাসূল ﷺ কে বলেছিল যে, আপনি নিজেকে সকল মানবের প্রতি প্রেরিত নবী বলে কিভাবে দাবি করেন? অথচ অন্য মানুষেরা জ্ঞান গর্বের জন্য যেভাবে মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে আপনিও তো অনুরূপভাবে মুখাপেক্ষী রয়েছেন বরং আপনি আরো অধিক

মুখাপেক্ষী। কেননা রূহ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কিন্তু আপনি তো উত্তর দিতে পারেন নি। তখন আল্লাহর জ্ঞানের বিশালতা এবং অপরিসীমতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[বাহরে মুহীত্ব ১৫৭/৬]

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًا [١١٠]

শানে নুযূল :- আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন তাবারী হযরত তাউস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা কোনো এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট এসে বলল হে আল্লাহর নবী আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে প্রাণ ভরে ভালোবাসি। বেহেশতে আমার ঘর ও বাসস্থানটি আমাকে দেখোনো হোক আমি এ কামনা করছি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। আলোচ্য আয়াত সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর আর কোনো হুকুম রহিত হয়নি। –(তাবারী ৩০০/৮, ইবনে কাছীর ১১২/৩)

এতে বুঝা যায় যে, আমলের প্রতিদান দেখার আবেদন করা অসঙ্গত ছিল বরং সঙ্গত ছিল কি আমল করবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন যে, বেহেশতে অবস্থান অপেক্ষা আল্লাহর দিদারই হচ্ছে বান্দার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং আল্লাহর দিদার প্রত্যাশিত ব্যক্তিদের জন্য সকল নেক কাজই করণীয়।

ইয়াজুজ -মাজুজ কারা এবং কোথায়? যুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত : ইয়াজুজ -মাজুজ সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও ঐতিহাসিক কিস্‌সা-কাহিনীতে অনেক ভিত্তিহীন অলীক কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদও এগুলোকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাঁদের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআন পাক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন। ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় ততটুকুই, যতটুক কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধও হতে পারে এবং অশুদ্ধও হতে পারে। ইতিহাসবিদগণের বিভিন্নমুখি উক্তিগুলো নিছক ইঙ্গিত ও অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হলেও তার কোনো প্রভাব কুরআনের বক্তব্যের উপর পড়ে না।

আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ করছি। এরপর প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত ও বর্ণনা করা হবে।

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা : কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য মানবের মতো তারাও হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান-সন্ততি। কুরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে : وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ অর্থাৎ নূহের মহাপ্লাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই হযরত নূহ (আ.) -এর সন্তান-সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত এ ব্যাপারে একমত যে, তারা ইয়াফেসের বংশধর। একটি দুর্বল হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবিশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.)-এর হাদীসটি। এটি সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য সব নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাজ্জালের আবির্ভাব, হযরত ঈসা (আ.) এর অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ আছে। হাদীসটির অনুবাদ নিম্নরূপ :

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ভোর বেলা দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যা দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে নেহায়েতই তুচ্ছ ও নগণ্য (উদাহরণত সে কানা হবে।) পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যা দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফেতনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর হবে। (উদাহরণগত জান্নাত ও দোজখ তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য আরো অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে।) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনার ফলে (আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম) যেন দাজ্জাল খর্জূর বৃক্ষের ঝড়ের মধ্যেই রয়েছে। (অর্থাৎ অদূরেই বিরাজমান রয়েছে) বিকালে যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি বুঝেছ? আমরা আরজ করলাম : আপনি দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন, যাতে বোঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহায়েতই তুচ্ছ এবং আরও কিছু কথা বলেছেন, যাতে মনে হয়, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফেতনা হবে খুব গুরুতর। এখন আমাদের

মনে হয়েছে যে, যেন সে আমাদের নিকটেই খর্জুর বৃক্ষের ঝড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফেতনার আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে দাজ্জালের তুলনায় অন্যান্য ফেতনা এতটুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ।) যদি আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, তবে আমি নিজে তার মোকাবিলা করব। (কাজেই তোমাদের চিন্তান্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।) পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী। (তার লক্ষণ এই যে,) সে যুবক, ঘন কোঁকড়ানো চুলওয়ালা হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উত্থিত হবে। (এবং অপর চক্ষুটি হবে কানা।) যদি আমি (কুৎসিত চেহারার) কোনো ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে হচ্ছে আবদুল ওযযা ইবনে-কুতনা। (জাহেলিয়াত আমলে কুৎসিত চেহারায় 'বনু-খোযাআ' গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।) যদি কোনো মুসলমান দাজ্জালের সম্মুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। (এতে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।) দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা তার মোকাবিলায় সুদৃঢ় থাক।

আমরা আরজ করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সে কতদিন থাকবে? তিনি বললেন : সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবিশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতোই হবে। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে শুধু এক দিনের (পাঁচ ওয়াক্ত) নামাজই পড়ব? তিনি বললেন না; বরং সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামাজ পড়তে হবে। আমরা আবার আরজ করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কেমন দ্রুতগতিতে সফর করবে? তিনি বললেন সে মেঘখণ্ডের মতো দ্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকে। দাজ্জাল কোনো সম্প্রদায়ের কাছে পৌছে তাকে মিথ্যা ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে, বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং মাটিকে আদেশ দেবে; ফলে সে শস্য-শ্যামলা হয়ে যাবে। (তাদের চতুষ্পদ জন্তু তাতে চরবে।) সন্ধ্যায় যখন জন্তুগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কুঁজ পূর্বের তুলনায় হবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর দাজ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকেও কুফরের দাওয়াত দেবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। তাদের কাছে কোনো অর্থ কড়ি থাকবে না। সে শস্যবিহীন অনুর্বর ভূমিকে সম্বোধন করে বলবে: তোর গুপ্তধন বাইরে নিয়ে আয়। সে মতে ভূমির গুপ্তধন পেছনে পেছনে চলবে; যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাজ্জাল একজন ভরপুর যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তার উভয় খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবে; যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে। সে (জীবিত হয়ে) দাজ্জালের কাছে প্রফুল্ল চিত্তে চলে আসবে। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) কে নামিয়ে দেবেন। তিনি দু'টি রঙিন চাদর পরে দামেস্ক মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মস্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। (মনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন।) তিনি যখন মস্তক উঁচু করবেন, তখনও মোমবাতির মতো স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফেরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌছাবে। হযরত ঈসা (আ.) দাজ্জালকে খুঁজতে খুঁজতে বাবুললুদ্দে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন। (এই জনপদটি এখনও বায়তুল-মোকাদ্দাসের অদূরে এ নামেই বিদ্যামান।) সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আসবেন, স্নেহভরে মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ শোনাবেন। এমতাবস্থায় আ'ল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন : আমি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে এমন লোক বের করব, যাদের মোকাবিলা করার শক্তি কারও নেই। কাজেই আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তূর পর্বতে চলে যান। (সেমতে তিনিই তাই করবেন।) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নীচে এসে পড়েছে। তাদের প্রথম দলটি তবরিয়া উপসাগরের কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোনো দিন পানি ছিল– একথা বিশ্বাস করতে পারবে না।

হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তককে একশ' দীনারের চাইতে উত্তম মনে করা হবে। হযরত ঈসা (আ.) ও অন্যান্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। (আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন।) তিনি মহামারী আকারে রোগব্যাধি পাঠাবেন। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তূর পর্বত থেকে নীচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত পরিমিত স্থানও খালি নেই এবং (মৃতদেহ পচে) অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। (এ অবস্থা দেখে পুনরায়) হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। (যেন এই বিপদও দূর করে দেওয়া হয়।) আল্লাহ তা'আলা এ দোয়াও কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মতো। তারা (মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোনো নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেন : তোমার পেটের সমুদয় ফল -ফুল উদগীরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। (ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,) একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্যে যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরি করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রির দুধ একদল লোকের জন্যে, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্যে এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারে জন্যে যথেষ্ট হবে। (চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকার পর যখন কেয়ামতের সময় সমাগত হবে, তখন) আল্লাহ তা'আলা একটি মনোরম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলমানের বগলের নীচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে, শুধু কাফের ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা ভূপৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মতো খোলাখুলি অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কেয়ামত আসবে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের রেওয়ায়েতে ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরও অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে– তবরিয়া উপসাগরে অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল মোকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল-খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে, আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি'। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহর আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে (যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।)

দাজ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গ হযরত আবূ সাইদ খুদরীর (রা.) রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, দাজ্জাল মদিনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে থাকবে। মদিনার পথসমূহে আসাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মদিনার নিকটবর্তী একটি লবণাক্ত ভূমিতে আগমন করবে। তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তুই সেই দাজ্জাল, যার সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দিয়েছিলেন। (একথা শুনে) দাজ্জাল বলবে : লোক সকল! যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেই তবে আমি যে খোদা এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করবে কি? সবাই উত্তর দেবে না! অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দিবে। লোকটি জীবিত হয়ে দাজ্জালকে বলবেন : এবার আমার বিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে যে, তুই-ই সে দাজ্জাল। দাজ্জাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে, কিন্তু সমর্থ হবে না। -[মুসলিম]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর একটি বাচনিক হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে বলবেন : আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি আরজ করবেন, হে পরওয়ারদেগার! তারা কারা? আল্লাহ তা'আলা বলবেন : প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ 'আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেন : চিন্তা করো না। এই নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী তোমাদের মধ্যে থেকে এক এবং ইয়াজুজ- মাজুজের মধ্যে থেকে এক হাজারের হিসাবে হবে। মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বাচনিক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে দশ ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নয় ভাগে রয়েছে ইয়াজুজ -মাজুজের লোক, আর অবিশিষ্ট এক ভাগে সারা বিশ্বের মানুষ। (রূহুল-মা'আনী)

ইবনে কাসীর " আল -বেদায়া-ওয়ান-নেহায়াহ" গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেন :

বোঝা যায় যে, ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চাইতে অনেক বেশি হবে। মুসনাদে আহমদ ও আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হযরত ঈসা (আ.) অবতরণের পর চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে সাত বছরের কথা বলা হয়েছে।

'ফতহুল বারী' গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার একে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে চল্লিশ বছর মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ শান্তিতে অতিবাহিত হবে এবং অসংখ্য বরকত প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার লেশমাত্র থাকবেনা : দু'ব্যক্তির মধ্যে কোনো সময় ঝগড়া-বিবাদ হবে না।- (মুসলিম ও আহমদ)

বুখারী হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর (রা.) রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে ইয়াজূজ -মাজূজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহ হজ্জ ও ওমরা অব্যাহত থাকবে।-(মাযহারী)

বুখারী ও মুসলিম হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভা এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিল :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ اَلْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوْجَ وَمَا جُوْجَ مِثْلَ هٰذَا وَحَلَّقَ تِسْعِيْنَ-

আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। আজ ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী মিলিয়ে বৃত্ত তৈরি করে দেখান।

হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) বলেন, একথা শুনে আরজ করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে সৎকর্ম পরায়ণ লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, ধ্বংস হতে পারে; যদি অনাচারের আধিক্য হয়। (আল বেদায়া ওয়ান-নেহায়াহ) ইয়াজূজ -মাজূজের প্রাচীরের বৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থেও হতে পারে এবং রূপক হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থেও হতে পারে। (ইবনে কাসীর, আবূ হাইয়্যান)

মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াজূজ-মাজূজ প্রত্যহ যুলকারনাইনের দেয়ালটি খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ লৌহ-প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছাকাছি পৌঁছে যায় যে, অপর পার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা এ কথা বলে ফিরে যায় যে, বাকি অংশটুকু আগামীকাল খুঁড়ব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। পরের দিন ইয়াজূজ- মাজূজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ পাক থেকে তা মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজূজ- মাজূজকে বন্ধ রাখা আল্লাহর ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবে: আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে ওপারে চলে যাব। (আল্লাহর নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তাওফীক হয়ে যাবে।) অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট তেমনি অবস্থায় পাবে তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে। তিরমিযী এই রেওয়ায়েতটি اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ সূত্রে বর্ণনা করে বলেন : غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ-ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন اِسْنَادُهٗ جَيِّدٌ قَوِيٌّ وَلٰكِنْ مَتْنَهٗ فِيْ رَفْعِهٖ نَكَارَةٌ এর সনদ উত্তম ও শক্তিশালী, কিন্তু মূল বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিনা, তা সুবিদিত নয়। ইবনে-কাসীর '' আল-বেদায়া-ওয়ান-নেহায়াহ' গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন : যদি মেনে নেওয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নয়; বরং কা'ব আহবারের বর্ণনা, তবে এটা যে ধর্তব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি একে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজূজ -মাজূজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা, যখন যুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া আরো বলা যায় যে, কুরআনে ছিদ্র বলে এপার -ওপার ছিদ্র বোঝানো হয়েছে। হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার-ওপার হবে।-(বেদায়া, ২য় খণ্ড, ১১২পৃ:)

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ''ফাতহুল বারী' গ্রন্থে এই হাদীসটি আবদ ইবনে হুমায়দ ও ইবনে হিব্বানের বরাত দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন: তাঁরা সবাই হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোনো কোনো হাদীসে সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ্ বোখারীর ব্যক্তিবর্গ। তিনি হাদীসটি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি– এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তিনি ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মু'জিযা রয়েছে।

এক. আল্লাহ তা'আলা তাদের চিন্তাধারা এদিকে নিবিষ্ট হতে দেননি যে, প্রাচীর খননের কাজ অবিরাম দিবারাত্র অব্যাহত রাখবে। নতুবা দিন ও রাত্রির কর্মসূচি আলাদা আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় জাতির পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না।

দুই. আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরের উপরে উঠার পরিকল্পনা থেকেও তাদের চিন্তাধারাকে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ ওয়াহাব ইবনে-মুনাব্বেহের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা কৃষিশিল্পে পারদর্শী ছিল। সব রকম যন্ত্রপাতি তাদের কাছে ছিল। তাদের ভূখণ্ডে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষও ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ করার উপায় সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না।

তিন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মনে 'ইনশাআল্লাহ' বলার কথা জাগ্রত হলো না। তাদের বের হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই কেবল তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত হবে।

ইবনে-আরাবী (র.) বলেন : এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, ইয়াজূজ -মাজূজের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখে। এটাও সম্ভব যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত করিয়ে দেবেন এবং এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করবে।-(আসারাতুস সায়া, সৈয়দ মুহাম্মদ, ১৫৪, পৃ:) কিন্তু বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাদের কাছেও পয়গম্বরদের দাওয়াত পৌঁছেছে। নতুবা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের জাহান্নামের শাস্তি না হওয়াই উচিত। কুরআন বলে وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا এতে বোঝা যায় যে, তারাও ঈমানের দাওয়াত লাভ করেছে। কিন্তু তারা কুফরকে আঁকড়ে রেখেছে। তাদের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী হবে। তবে রেসালত ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু এতটুকু বিশ্বাসই ঈমানের জন্যে যথেষ্ট নয়। মোটকথা, ইনশাআল্লাহ কালেমা বলার পরও কুফরের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

হাদীসের বর্ণনা থেকে অর্জিত ফলাফল : উল্লিখিত হাদীসমূহে ইয়াজূজ -মাজূজ সম্পর্কে ﷺ নিম্নলিখিত বিষয়াদি প্রমাণিত হয়েছে।

১. ইয়াজূজ -মাজূজ সাধারণ মানুষের মতোই মানুষ এবং হযরত নূহ (আ.) -এর সন্তান-সন্ততিই। অধিকাংশ হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদগণ তাদেরকে ইয়াসেফ ইবনে নূহের বংশধর সাব্যস্ত করেছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, ইয়াফেসের বংশধর হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকে যুলকারনাইনের আমল পর্যন্ত দূর-দূরান্তরে বিভিন্ন গোত্রে ও বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব সম্প্রদায়ের নাম ইয়াজূজ মাজূজ, জরুরি নয় যে, তারা সবাই যুলকারনাইনের প্রাচীরের ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের কিছু গোত্র ও সম্প্রদায় প্রাচীরের এপারেও থাকতে পারে। কিন্তু ইয়াজূজ-মাজূজ শুধু তাদেরই নাম, যারা বর্বর, অসভ্য ও রক্তপিপাসু, জালিম। মোগল তুর্কী অথবা মঙ্গোলীয় জাতি যারা সভ্যতা লাভ করেছে, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা নামের বাইরে।
২. ইয়াজূজ -মাজূজের সংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার চাইতে অনেক গুণ বেশি, কমপক্ষে এক ও দশের ব্যবধান।-(২নং হাদীস)
৩. ইয়াজূজ- মাজূজের যেসব সম্প্রদায় ও গোত্র যুলকারনাইনের প্রাচীরের কারণে ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তারা কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত এ ভাবেই আবদ্ধ থাকবে। তাদের বের হওয়ার সময় ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব, অতঃপর দাজ্জালের আগমনের পরে হবে, যখন হযরত ঈসা (আ.) অবতরণ করে দাজ্জালের নিধন কার্য সমাপ্ত করবেন। (১নং হাদীস)
৪. ইয়াজূজ-মাজূজের মুক্ত হওয়ার সময় যুলক্বারনাইনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে সমতলভূমির সমান হয়ে যাবে। (কুরআন) তখন ইয়াজূজ-মাজূজের অগণিত লোক একযোগে পর্বতের উপর থেকে অবতরণের সময় দ্রুতগতির কারণে মনে হবে যেন তারা পিছলে পিছলে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। এই অপরিসীম বর্বর মানবগোষ্ঠী সাধারণ জনসবতি ও সমগ্র পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজের মোকাবিলা করার সাধ্য কারও থাকবে না। আল্লাহর রাসূল হযরত ঈসা (আ.)ও আল্লাহর আদেশে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে তুর পর্বতে আশ্রয় নিবেন এবং যেখানে যেখানে কেল্লা ও সংরক্ষিত স্থান থাকবে, সেখানেই আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা করবেন। পানাহারের রসদ- সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ার পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাবে। এই বর্বর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে খতম করে দেবে এবং নদ-নদীর পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে। (১ নং হাদীস)
৫. হযরত ঈসা (আ.) ও তার সঙ্গীদের দোয়ায় এই পঙ্গপাল সদৃশ অগণিত লোক নিপাত হয়ে যাবে। তাদের মৃতদেহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং দুর্গন্ধের কারণে পৃথিবীতে বাস করা দূরহ হয়ে পড়বে।-(১ নং হাদীস)
৬. অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের দোয়ায় তাদের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অথবা অদৃশ্য করে দেওয়া হবে এবং বিশ্বব্যাপী বৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে ধুয়ে পাক-সাফ করা হবে।– (১নং হাদীস)
৭. এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ভূপৃষ্ঠ তার বরকতসমূহ উদ্‌গীরণ করে দিবে। কেউ দরিদ্র থাকবে না এবং কেউ কাউকে বিব্রত করবে না। সর্বত্রই শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে। (৩নং হাদীস)
৮. শান্তি ও শৃঙ্খলার সময় কা'বা গৃহের হজ ও ওমরাহ অব্যাহত থাকবে। (৪নং হাদীস)

হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) -এর ওফাত হবে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রওজা মোবারকে সমাহিত হবেন। অর্থাৎ তিনি হজ ও ওমরার উদ্দেশ্যেই হেজায সফর করার সময় ওফাত পাবেন। -[মুসলিম]

৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনের শেষভাগে স্বপ্ন -ওহীর মাধ্যমে তাকে দেখানো হয় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরে একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। তিনি একে আরবদের ধ্বংস ও অবনতির লক্ষণ বলে সাব্যস্ত করেন। প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়াকে কেউ কেউ প্রকৃত অর্থেও নিয়েছেন এবং কেউ কেউ রূপক অর্থে বোঝেছেন যে, প্রাচীরটি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইয়াজূজ-মাজূজের বের হওয়ার সময় নিকটে এসে গেছে এবং এর আলামত আরব জাতির অধঃপতনরূপে প্রকাশিত হবে। والله اعلم

১০. হযরত ঈসা (আ.) অবতরণের পর পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। (৩নং হাদীস) তাঁর পূর্বে হযরত মাহদী (আ.)- এর অবস্থানকাল চল্লিশ বছর হবে। তন্মধ্যে কিছু কাল হবে উভয়ের সহযোগিতায়। সৈয়দ শরীফ বরযঞ্জী "আসারাতুস সায়াহ" গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লেখেন : দাজ্জালের হত্যা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত ঈসা (আ.) চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে পয়ঁতাল্লিশ বছর । ১১২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : হযরত মাহদী (আ.) হযরত তাঁর ঈসা (আ.)-এর ত্রিশের উপর কয়েক বছর আগে আবির্ভূত হবেন এবং তার মোট অবস্থানকাল হবে চল্লিশ বছর। এভাবে পাঁচ অথবা সাত বছর পর্যন্ত উভয়ে একত্রে বসবাস করবেন। এই উভয়কালের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ন্যায় ও সুবিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ভূপৃষ্ঠ তার সব বরকতও গুপ্তধন উদগীরণ করে দেবে। কেউ ফকির-মিসকিন থাকবে না। পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার লেশমাত্র থাকবে না। অবশ্য ইমাম মাহদী (আ.) -এর শেষ আমলে দাজ্জাল এসে মক্কা-মদিনা বায়তুল-মোকাদ্দাস ও তুর পর্বত ব্যতীত সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফেতনা ছড়িয়ে দিবে। এই ফেতনাটি হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফেতনা। দাজ্জালের অবস্থান ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাত্র চল্লিশ দিন স্থায়ী হবে। তন্মধ্যে প্রথম দিন এক বছরের, দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনেরই মতো। এখানে প্রকৃতপক্ষেই দিনগুলো এমন দীর্ঘ করে দেওয়া যেতে পারে। কেননা শেষযুগে প্রায় সব ঘটনাই অভ্যাস বিরুদ্ধে ঘটবে। এমনও সম্ভব যে, দিন তো প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিকই থাকবে, কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায় যে, দাজ্জাল হবে অসাধারণ যাদুকর। কাজেই তার জাদুর প্রভাবে দিবারাত্রির পরিবর্তন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা না-ও পড়তে পারে। তারা এক একই দিন দেখবে ও মনে করবে। হাদীসে সেদিনে সাধারণ দিন অনুযায়ী অনুমান করে নামাজ পড়ার আদেশ বর্ণিত রয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে দিবারাত্র পরিবর্তিত হতে থাকবে, কিন্তু মানুষ তা অনুভব করবে না। তাই এই এক বছরের দিনে তিনশ' ষাট দিনের নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুবা দিনটি প্রকৃতপক্ষে একদিন হলে শরিয়ত নীতি অনুযায়ী তাতে একদিনের নামাজই ফরজ হতো। মোটকথা, দাজ্জালের মোট অবস্থানকাল এমনি ধরনের চল্লিশ দিন হবে এরপর হযরত ঈসা (আ.) অবতরণ করে দাজ্জালের হত্যা করার মাধ্যমে তার ফেতনারও অবসান ঘটাবেন। কিন্তু এর সাথে সাথেই ইয়াজূজ-মাজূজও বের হবে। তারা ভূপৃষ্টের সর্বত্র হত্যা ও লুটতরাজ করবে। তাদের অবস্থানকালও কয়েকদিন মাত্র হবে। এরপর হযরত ঈসা (আ.) এর দোয়ায় তারা সবাই একযোগে মারা যাবে। মোটকথা, হযরত মাহদীর আমলের শেষভাগে এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলের শুরুভাগে দাজ্জাল ও ইয়াজূজ-মাজূজের দু'টি ফেতনা সংঘটিত হবে এগুলো সারা বিশ্বের মানুষকে তছনছ করে দিবে। এই কয়েকদিন পূর্বে এবং পরে সমগ্র বিশ্বে ন্যায় এবং সুবিচার, শান্তি ও বরকত এবং ফল ও শস্যের অভূতপূর্ব আধিক্য হবে। হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলে ইসলাম ব্যতীত কোনো কালেমা ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না, কোনো দীন -দুঃখী থাকবে না। হিংস্র এবং বিষাক্ত জীব-জন্তু কাউকে কষ্ট দিবে না।

ইয়াজূজ -মাজূজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কিত এসব তথ্য কুরআন ও হাদীস উম্মতকে অবিহিত করেছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরি এবং বিরোধিতা করা নাজায়েজ। যুলকারনরাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত ? ইয়াজূজ -মাজূজ কোন জাতি? তারা কোথায় বসবাস করে ? এসব ভৌগোলিক আলোচনার উপর ইসলামের কোনো আকীদা বিশ্বাস এবং কুরআনের কোনো আয়াতের মর্ম এ ব্যাখ্যা নির্ভরশীল নয়। এতদসত্ত্বেও বিরোধী পক্ষের আবোল তাবোল বকাবকির জওয়াব এবং অতিরিক্ত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আলেমরা এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

কুরতুবী স্বয়ং তফসীর গ্রন্থে সুদ্দীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজূজ-মাজূজের বাইশটি গোত্রের মধ্যে থেকে একুশটি গোত্রকে যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একটি গোত্র প্রাচীরের এপারে রয়ে গেছে। আর সে গোত্রটি হলো তুর্ক। এরপর কুরতুবী (র.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তুর্কদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো ইয়াজূজ মাজূজের সাথে খাপ খায়। শেষ জমানায় তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের কথা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর কুরতুবী বলেন, বর্তমান সময় তুর্ক জাতির বিপুল সংখ্যক লোক মুসলমানদের মোকাবিলা করার জন্য অগ্রসরমান।

তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তিনি মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে পারেন। মনে হয় যেন তারাই ইয়াজূজ -মাজূজের অথবা কমপক্ষে তাদের অগ্রসেনাদল। (কুরতুবী, একাদশ খণ্ড, ৫৮.) কুরতুবীর সময়কাল ষষ্ঠ হিজরি। তখন তাতারীদের ফেতনা প্রকাশ পায় এবং তারা ইসলামি খেলাফতকে তছনছ করে দেয়। ইসলামের ইতিহাসে তাদের এই ফেতনা সুবিদিত। তাতারীরা যে মোগল তুর্কদের বংশধর, তাও প্রসিদ্ধ।) কিন্তু কুরতুবী তাদেরকে ইয়াজূজ-মাজূজের সমতুল্য অগ্রসেনাদল সাব্যস্ত করেছেন। তাদের ফেতনাকে ইয়াজূজ -মাজূজের আর্বিভাব বলেননি, যা কেয়ামতের অন্যতম আলামত। কেননা মুসলিমে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) অবতরণের পর তাঁর আমলে ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব হবে।

এ কারণেই আল্লামা আলুসী (র.) তাফসীরে রুহুল-মা'আনীতে যারা তাতারীদেরকে ইয়াজূজ-মাজূজ সাব্যস্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেন : এরূপ ধারণা করা প্রকাশ্য রকমের পথভ্রষ্টতা এবং হাদীদের বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ। তবে তিনিও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদের ফেতনা ইয়াজূজ-মাজূজের ফেতনার সমতুল্য।-(১৬শ খণ্ড, ৪৪ পৃ:) বর্তমান যুগে কিছু সংখ্যক ইতিহাসবিদ বর্তমান রাশিয়া অথবা চীন উভয়কেই ইয়াজূজ -মাজূজ সাব্যস্ত করেন। তাদের উদ্দেশ্য যদি কুরতুবী ও আলূসীর মতোই হয় যে, তাদের ফেতনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনার সমতুল্য, তবে তা ভ্রান্ত হবে না। কিন্তু তাঁরা যদি তাদেরকেই কিয়ামতের আলামতরূপে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব হিসাবে সাব্যস্ত করেন, যার সময় হযরত ঈসা (আ.) -এর অবতরণের পরে বলা হয়েছে, তবে তা নিশ্চিতই ভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা ও হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ হবে।

খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ইবনে খলদূন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় সপ্ত ভূখণ্ডের মধ্যে থেকে ষষ্ঠ ভূখণ্ডের আলোচনা ইয়াজূজ-মাজূজ, যুলকারনাইন প্রাচীর এবং অবস্থান সম্পর্কে ভৌগলিক দৃষ্টিকোণজনিত নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেন :

সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশ পশ্চিমদিকে তুর্কীদের কাপ্তাক ও চর্কস নামে অভিহিত গোত্রসমূহ বসবাস করে এবং পূর্বদিকে ইয়াজূজ-মাজূজের বসতি বিদ্যমান। তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে ককেশাস পর্বতমালা অবস্থিত। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই পর্বতমালা চতুর্থ ভূখণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু হয়ে এই ভূখণ্ডের শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর ভূমধ্যসাগর থেকে পৃথক হয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়ে পঞ্চম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ লাভ করেছে। এখান থেকে তা আবার প্রথম দিকে মোড় নিয়েছে এবং সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ-লাভ করেছে। এখানে পৌঁছে তা দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম হয়ে চলে গেছে"। এই পর্বতমালা মাঝখানে সিকান্দারী প্রাচীর অবস্থিত, আমরা এই মাত্র যার উল্লেখ করেছি এবং কুরআনও যার সংবাদ দিয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে খরদিযবাহ্ স্বীয় ভূগোল গ্রন্থে আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহর একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, প্রাচীর খুলে গেছে। এতে তিনি অস্থির হয়ে উঠে বসেন এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর মুখপাত্র সাল্লামকে প্রেরণ করেন। সে ফিরে এসে এই প্রাচীরের অবস্থা বর্ণনা করে।-(ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দামা' ৭৯ পৃ:)

আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ' কর্তৃক যুলকারনাইনের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্যে একটি দল প্রেরণ করা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসার কথা ইবনে-কাসীরও " আল–বেদায়া ওয়ান-নেহায়াহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, এই প্রাচীর লৌহনির্মিত। এতে বড় বড় তালাবদ্ধ দরজাও আছে এবং একটি উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তাফসীরে কাবীর ও তাবারী এই ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন : যে ব্যক্তি এই প্রাচীর পরিদর্শন করে ফিরে আসতে চায়, গাইড তাকে এমন লতা-পাতাবিহীন প্রান্তরে পৌঁছে দেয়, যা সমরকন্দের বিপরীত দিকে অবস্থিত।-(তাফসীরে কাবীর, ৫ম খণ্ড ৫১ পৃ)

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরি (র.) "আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতে ঈসা (আ.)" গ্রন্থে ইয়াজূজ -মাজূজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যতটুকু বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়ায়েতের মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের। তিনি বলেন : দুষ্কৃতিকারী ও বর্বর মানুষদের লুণ্ঠন থেকে আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীতে এক নয়-বহু জায়গায় প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন বাদশাহগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর। এর দৈর্ঘ্য আবূ হাইয়্যান উন্দুলূসী (ইরানের শাহী দরবারের ঐতিহাসিক) বার শ' মাইল বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন চীন সম্রাট 'ফগফুর'। এর নির্মাণের তারিখ হযরত আদম (আ.)-এর অবতরণের তিন হাজার চার শ' ষাট বছর পর বর্ণনা করা হয়। এই চীন প্রাচীরকে মোগলরা 'আনকুদাহ' এবং তুর্কীরা 'বুরকুরকা' বলে থাকে। তিনি আরও বলেন : এমনি ধরনের আরও কয়েকটি প্রাচীর বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। মাওলানা হিফজুর রহমান সিহওয়ারবী (র.) কাসাসুল কুরআনে বিস্তারিতভাবে শাহ সাহেবের উপরিউক্ত বর্ণনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছে। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

ইয়াজূজ-মাজূজের লুণ্ঠন ও ধ্বংসকাণ্ড সাধনের পরিধি বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার পাদদেশে বসবাসকারীরা তাদের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিল এবং অপরদিকে তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরাও ছিল সর্বক্ষণ

তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। এই ইয়াজূজ-মাজূজের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীর হচ্ছে চীনের প্রাচীর। উপরে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য-এশিয়ার বুখারা ও তিরমিযের নিকটে অবস্থিত। এর অবস্থানস্থলের নাম দরবন্দ। এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোগল সম্রাট তৈমুরের আমলে বিদ্যমান ছিল। রোম সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বর্জর জর্মেনীও তার গ্রন্থে এর কথা উল্লেখ করেছেন। উন্দুলূসের সম্রাট কাষ্টাইলের দূত ক্ল্যাফছুও তার ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ করেছেন। ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসেবে তৈমুরের দরবারে পৌছেন, তখন এ স্থান অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন : বাবুল হাদীসের প্রাচীর মুসেলের ঐ পথে অবস্থিত, যা সমরখন্দ ও ভারতের মধ্যস্থলে বিদ্যমান।- (তাফসীরে জাওয়াহেরুল-কুরআন, তানতাভী, ৯ম খণ্ড ১৯৮ পৃ.)

তৃতীয় প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিস্তানে অবস্থিত। এটিও দরবন্দ ও বাবুল আবওয়াব নামে খ্যাত। ইয়াকুত হমভী 'মু'জামুল বুলদানে' ইদরীসী 'জুগরাফিয়া'য় এবং বুস্তানী 'দায়েরাতুল মা'আরিফে' এর অবস্থান বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

দাগিস্তানে দরবন্দ রাশিয়ার একটি শহর। শহরটি কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এটি ৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। একে দরবন্দে নওশেরওয়াঁ নামেও অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল আবওয়াব নামে তা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ প্রাচীর বাবুল-আবওয়াব থেকে পশ্চিম দিকে ককেশিয়ার সুউচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দুটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়াল নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ রয়েছে। এই চতুর্থ প্রাচীরটি এখানে কাফকায অথবা জাবালে-কোফা অথবা কাফ পর্বতমালার প্রাচীর নামে খ্যাত। বুস্তানী এ সম্পর্কে বলেন :

এবং এরই (অর্থাৎ, বাবুল-আবওয়াব প্রাচীরের) নিকটে আরও একটি প্রাচীর রয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটি নির্মাণ করেছে। এর নির্মাতা সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ কোনো বর্ণনা জানা যায়নি। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কেউ কেউ একে সিকান্দারের প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়াঁর প্রতি এর সম্বন্ধ নির্দেশ করেছে। ইয়াকুত বলেন : গলিত তামা দ্বারা এটি নির্মিত হয়েছে।

-[দায়েরাতুল -মা'আরিফ ৭ম খণ্ড, ৬৫ পৃ.]

এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে। তাই এগুলোর মধ্যে যুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি, তা নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দু'টি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে। কেননা উভয়স্থানের নাম দরবন্দ এবং উভয় স্থলে প্রাচীরও বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখিত চারটি প্রাচীরের মধ্যে সবচাইতে বড় ও সবচাইতে প্রাচীন চীনের প্রাচীর যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়, এ বিষয়ে সবাই একমত। এটি উত্তরদিকে নয়- দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত। কুরআন পাকের ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে অবিস্থত।

এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যলোচনা বাকি রয়ে গেল। তন্মধ্যে মাসউদী, ইসতাখরী, হমভী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান অথবা ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দ নামক স্থানে কাস্পিয়ানের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিযির দরবন্দে অবস্থিত প্রাচীরকে যারা যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবত দরবন্দ নাম দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। এখন যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানকাল প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ দু'টি প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে গেছে'। এক দাগিস্তান ককেশিয়ার এলাকা বাবুল -আবওয়াবের দরবন্দের প্রাচীর এবং দুই আরও উচ্চে কাফকায অথবা কাফ অথবা ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীর : উভয় স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত রয়েছে।

হযরত মওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) " আকীদাতুল ইসলাম' গ্রন্থে উভয় প্রাচীরের মধ্যে থেকে ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এটি যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর।

যুলকারনাইনের প্রাচীর এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে, না ভেঙ্গে গেছে : ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরিউক্ত প্রাচীরসমূহের কোনোটির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তারা একথাও স্বীকার করেন না যে, ইয়াজূজ-মাজূজের পথ অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কোনো মুসলমান ইতিহাসবিদও একথা বলতে লিখতে শুরু করেছেন যে, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজূজ-মাজূজ বহু পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঝটিকার বেগে উত্থিত তাতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া, চীন ও ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজূজ- মাজূজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাঙ্গ করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরে রূহুল

মা'আনীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সহীহ হাদীসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারে না। কুরআন পাক ইয়াজূজ-মাজূজের অভ্যুত্থানকে কেয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওয়াস ইবনে সামআন প্রমুখ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইয়াজূজ -মাজূজের ঘটনাটি ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হযরত ঈসা– এর অবতরণ ও দাজ্জাল হত্যার পরে। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হযরত ঈসা (আ.) -এর অবতরণ যে আজো পর্যন্ত হয়নি, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে যুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইয়াজূজ -মাজূজের কোনো কোনো গোত্র এপারে চলে এসেছে এখানে একথা বলাও কুরআন ও হাদীসের কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থি নয় -যদি মেনে নেওয়া হয় যে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণতকারী সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনও হয়নি ; বরং তা উপরে বর্ণিত দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হযরত ঈসা (আ.)- এর অবতরণের পরে হবে।

এ ব্যাপারে হযরত হযরত উস্তাদ আল্লামা কাশ্মীরি (র.)-এর সুচিন্তিত বক্তব্য এই : ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোনো গুরুত্ব নেই যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে, কোথাও এই প্রাচীরের অস্তিত্ব নেই। কেননা স্বয়ং তাদেরই এধরনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অন্বেষণের উচ্চতম শিখরে পৌঁছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, সমুদ্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। এছাড়া এরূপ সম্ভাবনাও দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে। কিয়ামতের পূর্বে প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজূজ-মাজূজের কিছু গোত্র এসে যাবে- কুরআন ও হাদীসের কোনো অকাট্য প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থি নয়। যুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে -এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কুরআন পাকের আয়াত- فَاِذَا جَاۤءَ وَعۡدُ رَبِّیۡ جَعَلَهٗ دَکَّآءَ অর্থাৎ যুলকারনাইনের এই উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি এসে যাবে (অর্থাৎ ইয়াজূজ-মাজূজের বেরিয়ে আসার সময় হবে,) তখন আল্লাহ তা'আলা এই লৌহ প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে ভূমিস্যাৎ করে দিবেন। এ আয়াতে وَعۡدُ رَبِّیۡ (আমার পালনকর্তার ওয়াদা) এর অর্থ কিয়ামত নেওয়া হয়েছে। অথচ কুরআনের ভাষ্য এই অর্থ অকাট্য নয় ; বরং এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যুলকারনাইন ইয়াজূজ-মাজূজের পথরুদ্ধ করার যে ব্যবস্থা করেছে, তা সদাসর্বদা যথাযথ থাকা জরুরি নয়। যখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ-মাজূজের পথ খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা কিয়ামতের একান্ত নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই জরুরি নয়। সে মতে সব তাফসীরবিদই وَعۡدُ رَبِّیۡ এর অর্থে উভয় সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। তাফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে : وَالْوَعْدُ يَحْتَمِلُ اَنْ يُرَادَ بِهٖ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَاَنْ يُرَادَ بِهٖ وَقْتُ خُرُوْجِ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ

এটা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে গেছে এবং ইয়াজূজ- মাজূজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ হিজরির তাতারী ফেতনাকে এর সূচনা সাব্যস্ত করা হোক কিংবা ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের আধিপত্যকে সাব্যস্ত করা হোক ; কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এসব সভ্যজাতির আবির্ভাব ও এদের সৃষ্ট ফেতনাকে কুরআন হাদীস বর্ণিত ফেতনা আখ্যা দেওয়া যায় না ; কারণ তাদের আবির্ভাব আইন, কানুনের পন্থায় হচ্ছে। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই ফেতনা এমন অকৃত্রিম হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ রক্তপাতের মাধ্যমে হবে, যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলীকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দিবে। বরং এর সারমর্ম আবার এই দাঁড়ায় যে, দুষ্কৃতকারী ইয়াজূজ-মাজূজেরই কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য হয়ে গেছে ; তারাই ইসলামি দেশসমূহের জন্যে নিঃসন্দেহে বিরাট ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু ইয়াজূজ-মাজূজের যেসব বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না, তারা এখন পর্যন্ত আল্লাহর বাণীর তাফসীর অনুযায়ী এপারে আসে নি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশি। তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদের একটি হাদীস তাতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ইয়াজূজ-মাজূজ প্রত্যহই প্রাচীরটি খনন করে ; প্রথমত : এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে مَعْلُوْلٌ দ্বিতীয়ত : এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইয়াজূজ-মাজূজ যেদিন 'ইনশাআল্লাহ' বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনটি কিয়ামতের কাছাকাছিই হবে এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোনো প্রমাণ নেই যে, ইয়াজূজ-মাজূজের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পশ্চাতে আবদ্ধ থাকবে কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এসে গেছে ; আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ একথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজূজ-মাজূজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরিউক্ত হাদীস এর পরিপন্থি নয় মোটকথা, কুরআন ও হাদীসে এরূপ কোনো প্রকাশ্য ও অকাট্য প্রমাণ নেই যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত

অক্ষয় থাকবে অথবা কিয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামুলি আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত, ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কিয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতঃপূর্বে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। মূলকথা এই যে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না, তেমনি একথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকা জরুরি। উভয়দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ

بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ : এখানে بَعْضَهُمْ এর সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত ইয়াজূজ-মাজূজকেই বোঝানো হয়েছে, তাদের একদল অপর দলের মধ্যে ঢুকে পড়বে। বাহ্যত এই অবস্থা তখন হবে, যখন তাদের পথ খুলে যাবে এবং তারা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে দ্রুতবেগে নীচে অবতরণ করবে। তাফসীরবিদগণ অন্যান্য সম্ভাবনাও লিখেছেন।

فَجَمَعْنٰهُمْ এর সর্বনাম দ্বারা সাধারণ জিন ও মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের মাঠে জিন ও মানবজাতিকে একত্রিত করা হবে।

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَاۤءَ : তাফসীরে বাহরে -মুহীতে বর্ণিত আছে যে, এক্ষেত্রে বাক্য উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فَيَجِدُ بِهِمْ نَفْعًا وَّيَنْتَفِعُوْنَ بِذٰلِكَ الْاِتِّخَاذِ উদ্দেশ্য এই যে, এসব কাফেররা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছে। তারা কি মনে করে যে, একাজ তাদেরকে উপকৃত করবে এবং এ দ্বারা তাদের কিছুটা কল্যাণ হবে? এই জিজ্ঞাসা অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ এরূপ মনে করা ভ্রান্তি ও মূর্খতা।

عِبَادِىْ (আমার দাস) বলে এখানে ফেরেশতা এবং সেসব পয়গম্বরগণকে বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ও আল্লাহর শরিকরূপে স্থির করা হয়েছে; যেমন হযরত ওযায়ের ও ঈসা (আ.)। কিছু সংখ্যক আরব ফেরেশতাদেরও উপাসনা করত। পক্ষান্তরে ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর শরিকরূপে গ্রহণ করেছে। তাই আয়াতে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا বলে কাফেরদের এসবদলকেই বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে "আমার বান্দা" অর্থ নিয়েছেন। সুতরাং اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا এর অর্থ হবে যারা শয়তান ও জিনের উপাসনা করে। কেউ কেউ "আমার বান্দা" অর্থ ও সৃজিত এবং মালিকানাধীন বস্তু গ্রহণ করে একে ব্যাপকাকার করে দিয়েছেন। ফলে আগুন, মূর্তি, তারকা ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্য এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। বাহরে মুহীত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম তাফসীরকেই প্রবল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

اَوْلِيَاۤءُ এটি وَلِىٌّ এর বহুবচন। আরবি ভাষায় এ শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে এর অর্থ কার্যনির্বাহী, অভাব, পূরণকারী, যা সত্য উপাস্যের বিশেষগুণ। উদ্দেশ্য, তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা।

بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا এখানে প্রথম দুই আয়াত এমন ব্যক্তি ও দলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যারা কোনো কোনো বিষয়কে সৎ মনে করে তাতে পরিশ্রম করে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তাদের সে পরিশ্রম বৃথা এবং সে কর্মও নিষ্ফল। কুরতুবী বলেন, এ অবস্থা দু'টি কারণে সৃষ্টি হয়। (এক) ভ্রান্তবিশ্বাস এবং (দুই) লোক দেখানো মনোবৃত্তি। অর্থাৎ সব বিশ্বাস ও ঈমান ঠিক নয়, সে যত ভালো কাজই করুক, যত পরিশ্রমই করুক, পরকালে সবই বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হবে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্যে লোক দেখানো মনোবৃত্ত নিয়ে কাজ করে সে-ও তার সে কাজের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এই ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে কোনো কোনো সাহাবী খারেজী সম্প্রদায়কে এবং কোনো কোনো তাফসীরবিদ মু'তাযেলা, রাওয়াফেয ইত্যাদি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়কে আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে সেসব কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলি এবং কিয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে।

اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاۤئِهٖ : তাই কুরতুবী, আবু হাইয়্যান, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সেসব কাফের সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ, কিয়ামত ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করে। কিন্তু বাহ্যত তারাও এর ব্যাপক অর্থের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না, যাদের অপবিশ্বাস তাদের কর্মকে বরবাদ ও পরিশ্রম নিষ্ফল করে দেয়। হযরত আলী (রা.) ও সা'দ (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে এ ধরনের উক্তি বর্ণিত আছে। (কুরতুবী)

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا অর্থাৎ তাদের আমল বাহ্যত বিরাট বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাঁড়ি -পাল্লায় তার কোনো ওজন হবে না। কেননা কুফর ও শিরকের কারণে তাদের আমল নিষ্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে।

বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েত মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন জনৈক দীর্ঘদেহী স্থূলকায় ব্যক্তি আসবে, আল্লাহর কাছে মাছির ডানার সমপরিমাণও তার ওজন হবে না। অতঃপর তিনি বলেন, যদি এর সমর্থন চাও তবে কুরআনের এই আয়াতে পাঠ কর : فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন : কিয়ামতের দিন এমন এমন কাজকর্ম করা হবে, যেগুলো স্থূলতার দিক দিয়ে মদিনার পাহাড়সমূহের সমান হবে, কিন্তু ন্যায়বিচারের দাঁড়ি -পাল্লায় এগুলোর কোনো ওজনই থাকবে না।

جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ : এখানে فِرْدَوْس এর অর্থ সবুজে ঘেরা উদ্যান। এটি আরবি শব্দ, না অনারব এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যারা অনারব বলেন তারাও ফারসী, রোমী, না সুরইয়ানী ইত্যাদি সম্পর্কে নানা মত পোষণ করেন।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের প্রার্থনা কর। কেননা এটা জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরেই আল্লাহর আরশ এবং এখানে থেকেই জান্নাতের সব নহর প্রবাহিত হয়েছে।-(কুরতুবী)

لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا : উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের এ স্থানটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ আদেশ জারি করে দিবেন, যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনও বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশঙ্কা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জান্নাতও একটি কয়েদখানার মতো মনে হতে থাকবে। আলোচ্য আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতকে অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মূর্খতা বৈ নয়। যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, জান্নাতের নিয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোনো সময় মনে জাগবে না।

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا হাদীসে বর্ণিত শানে-নুযূল থেকে সূরা কাহফের শেষ আয়াতে উল্লিখিত এ বাক্য সম্বন্ধে জানা যায় যে, এখানে উল্লেখিত শিরক দ্বারা" গোপন শিরক" অর্থাৎ, রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি বোঝানো হয়েছে।

ইমাম হাকেম তার মুস্তাদরাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুসলমান আল্লাহর পথে জিহাদ করত এবং মনে মনে কামনা করত যে, জনসমাজে শৌর্য-বীর্য প্রচারিত হোক। তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এ থেকে জানা গেল যে, এরূপ নিয়ত করলে জিহাদের ছওয়াব পাওয়া যায় না।

'ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া' কিতাবুল ইখলাসে' তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বললেন : আমি মাঝে মাঝে যখন কোনো সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা ইবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি, তখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্য; কিন্তু সাথে সাথে এ কামনাও মনে জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনে চুপ করে রইলেন। অবশেষে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আবূ নঈম 'তারীখে-আসাকির' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর রেওয়ায়েতে লিখেছেন : জুনদুব ইবনে সুহায়েব যখন নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন অথবা দান-খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে দেখতেন, তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরও বাড়িয়ে দিতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে রিয়াকারীর গোপন শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহর উদ্দেশ্যে হলেও যদি তার সাথে কোনোরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব -প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও এক প্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ এবং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ্ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা যায়। উদাহরণত তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন : একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ভিতরে জায়নামাজে (নামাজ রত) থাকি। হঠাৎ কোনো ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভালো লাগে যে, সে আমাকে নামাজরত অবস্থায় দেখেছে। এটা কি রিয়া হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আবূ হুরায়রা, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। এমতাবস্থায় তুমি দু'টি ছওয়াব পাবে। একটি তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্যে যা লোকটি আসার পর হয়েছে। (এটা রিয়া নয়)

সহীহ্-মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন : এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোনো সৎকর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা শোনে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ অর্থাৎ এটা তো মুমিনের নগদ সুসংবাদ (যে তার আমল আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন।)

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতের তাৎপর্য এই যে, নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টির সাথে সৃষ্ট জীবের সন্তুষ্টি অথবা নিজের সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তকে শরিক করে নেওয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা শুনে আমল আরও বাড়িয়ে দেওয়া। এটা নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক।

তিরমিযী ও মুসলিমে বর্ণিত শেষোক্ত রেওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হলো সে অবস্থার সাথে যে, আমল খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্যেই হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে রিয়ার সাথে এ আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা মুমিনের জন্যে (আমল কবুল হওয়ার) অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।

রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্যে হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী : হযরত মাহমূদ ইবনে লবীদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয় সর্বাধিক আশঙ্কা করি, তা হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, ছোট শিরক কি? তিনি বললেন : রিয়া।-(আহমদ)

বায়হাকী শো'আবুল-ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করে তাতে অতিরিক্ত আরও বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দিবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেন : তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেওয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্যে কোনো প্রতিদান আছে কি না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি শরিকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উর্ধ্বে।

যে ব্যক্তি কোনো সৎকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরিক করে, আমি সেই আমল শরিকের জন্য ছেড়ে দেই। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত : সে আমলকে খাঁটিভাবে আমি তার জন্যই করে দেই যাকে সে আমার সাথে শরিক করেছিল।-(মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎকর্ম করে আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন ; যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়।-(আহমদ, বায়হাকী, মাযহারী)

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে হযরত হাসান বসরী (র.) -কে এখলাস ও রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : এখলাসের দাবি হচ্ছে সৎ ও ভালো কর্মের গোপনীয়তাকে পছন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তাকে পছন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল : হে আল্লাহ, এটা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা; আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়।

হাকিম, তিরমিযী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন : هُوَ فِيْكُمْ اَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ অর্থাৎ পিপড়ার নিঃশব্দ গতির মতোই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে। তিনি আরও বললেন : আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিরক (অর্থাৎ রিয়া) থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমারা দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُهٗ

সূরা কাহফের কতিপয় ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য : হযরত আবুদদারদা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। -[মুসলিম, আহমদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও নাসায়ী আবুদদারদার এই রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করবে, তার জন্য আপাদমস্তক এক নূর হবে।- (ইবনুস-সুন্নী, আহমদ)

হযরত আবূ সাঈদের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি জুমার দিন পূর্ণ সূরা কাহফ পাঠ করে, পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তার জন্য নূর হয়ে যায়।-[হাকিম, মাযহারী]

জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে বলল : আমি মনে মনে ঘুম থেকে জেগে নামাজ পড়তে ইচ্ছা করি ; কিন্তু ঘুম প্রবল হয়ে যায়। তিনি বললেন : তুমি যখন ঘুমাতে যাও তখন সূরা কাহফের শেষ আয়াতগুলো قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর। এর ফলে তুমি যখন জাগার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তা'আলা তখনই তোমাকে জাগিয়ে দিবেন (ছা'লবী)

মুসনাদে-দারেমীতে আছে, যির ইবনে হুবায়শ হযরত আবদাহকে বললেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের এই শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে ঘুমাবে, সে যে সময় জাগার নিয়ত করবে, সে সময়ই জেগে যাবে। আবদাহ বলেন : আমি বারবার আমলটি পরীক্ষা করে দেখেছি, ঠিক তাই হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ : ইবনে আরাবী বলেন : আমাদের শায়খ কুরতুবী বলতেন : তোমার মূল্যবান জীবনের সময়গুলো যেন সমসাময়িকদের সাথে প্রতিযোগিতা ও বন্ধু -বান্ধবের মেলামেশার মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে না যায়। দেখ, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدً -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে যেন কাউকে শরিক না করে। -(কুরতুবী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَمَااسْطَاعُوْا : সীগাহ বহছ جمع مذكر غائب معروف ماضى فعل نفى বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ- অতঃপর তারা পারত না।

دَكَّاءَ : ইসম একবচন এর বহুবচন হলো دَكَّاوَاتٌ অর্থ- সমতল, বরাবর, সমান।

لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ : সীগাহ বহছ جمع مذكر غائب معروف منفى مضارع বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ- তারা পারত না।

اَنْ يَّتَّخِذُوْا : সীগাহ বহছ جمع مذكر غائب منصوب بان مضارع বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (ا - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- তারা স্থির করবে, বানানো স্থির করা, সাব্যস্ত করা।

لاَ نُقِيْمُ : সীগাহ বহছ جمع متكلم منفى بلا مضارع বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি স্থাপন করব না, কায়েম করা, দাড় করা, স্থাপন করা।

لاَ يَبْغُوْنَ : সীগাহ বহছ جمع مذكر غائب منفى بلا مضارع বাব ضَرَبَ মাসদার بَغْيَةٌ ও بَغَاءٌ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা চাইবে না, চাওয়া ,তলব করা।

يُوْحٰى : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب مجهول مضارع বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْحَاءٌ মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- ওহী আসে, প্রত্যাদেশ করা, নির্দেশ পাঠানো।

فَلْيَعْمَلْ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب معروف امر حاضر বাব سَمِعَ মাসদার عَمَلٌ মূলবর্ণ (ع - م - ل) জিনস صحيح অর্থ- সে যেন কাজ করতে থাকে, আমল করা।

لاَ يُشْرِكْ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب معروف نهى غائب বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِشْرَاكٌ মূলবর্ণ (ش - ر - ك) জিনস صحيح অর্থ- সে যেন শরিক না করে, শরিক করা, অংশীদার সাব্যস্ত করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَيُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا এখানে فاء হলো استئنافية আর اسم শর্ত ইসমে مَنْ ; كَانَ ফেলে নাকেস তার ইস ম হলো من আর يَرْجُوْ তার খবর আর لِقَاءَ رَبِّهٖ হলো مفعول به আর فَلْيَعْمَلْ -এর فاء টি হলো جزائية ; لِيَعْمَلْ হলো ফেল عَمَلاً হলো مفعول مطلق অথবা مفعول به صَالِحًا সিফত। وَلاَ يُشْرِكْ ফেল بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ হলো لاَيُشْرِكُ এর সাথে মুতাআল্লিক اَحَدًا হলো মাফউল।

- [ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ. পৃ. ৫৬২]

سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ

সূরা মারইয়াম

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৯৮, রুকু'–৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. কাফ-হা-ইয়া-'আঈন-সোয়াদ।	كٓهٰيٰعٓصٓ ۚ ﴿١﴾
২. এটা আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বর্ণনা– যা স্বীয় বান্দা যাকারিয়ার প্রতি হয়েছে।	ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۚ ﴿٢﴾
৩. যখন তিনি নিজ প্রতিপালককে গোপনে ডাকলেন।	اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿٣﴾
৪. প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং মস্তকের কেশের শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে, আর হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার সমীপে প্রার্থনা করে বিফল হইনি।	قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾
৫. এবং আমার [মৃত্যুর] পর স্বজনবর্গ হতে [দীনি খেদমত পূর্ণ না হওয়ার] আশঙ্কা করছি এবং আমার স্ত্রী [ও] বন্ধ্যা। অতএব, আপনি খাসভাবে আপনার পক্ষ হতে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন।	وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. كٓهٰيٰعٓصٓ কাফ-হা, ইয়া- আইন-সোয়াদ।

২. ذِكْرُ এটা বর্ণনা رَحْمَتِ অনুগ্রহের رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا স্বীয় বান্দা যাকারিয়ার প্রতি হয়েছে।

৩. اِذْ نَادٰى যখন তিনি ডাকলেন رَبَّهٗ নিজ প্রতিপালককে نِدَآءً خَفِيًّا গোপনে।

৪. قَالَ প্রার্থনা করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ আমার অস্থিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়েছে وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا এবং মস্তকের কেশের শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا হে আমার প্রতিপালক আমি আপনার সমীপে প্রার্থনা করে বিফল হই নি।

৫ وَاِنِّىْ خِفْتُ এবং আশঙ্কা করছি الْمَوَالِىَ স্বজনবর্গ হতে مِنْ وَّرَآءِىْ আমার (মৃত্যুর) পর وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا এবং আমার স্ত্রী (ও) বন্ধ্যা فَهَبْ لِىْ অতএব আপনি আমাকে দান করুন مِنْ لَّدُنْكَ খাসভাবে আপনার পক্ষ হতে وَلِيًّا একজন উত্তরাধিকারী/ওয়ারিশ।

অনুবাদ	আয়াত
৬. যেন সে আমার উত্তরাধিকারী এবং ইয়াকূব বংশের উত্তরাধিকারী হয়, আর হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাকে [ধর্ম-কর্মে] পছন্দনীয় করুন।	يَرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾
৭. হে যাকারিয়া! আমি আপনাকে একটি পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া, ইতঃপূর্বে আমি তার সমগুণ বিশিষ্ট কাউকেও সৃষ্টি করিনি।	يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾
৮. যাকারিয়া আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! কিরূপে আমার সন্তান হবে? অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের চরমে পৌছেছি।	قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾
৯. আল্লাহ তা'আলা বললেন, অবস্থা এরূপই থাকবে, আপনার প্রতিপালক বলেন যে, তা আমার পক্ষে সহজ, আমি এর পূর্বে আপনাকে সৃষ্টি করেছি, অথচ আপনি কিছুই ছিলেন না।	قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ﴿٩﴾
১০. জাকারিয়া বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কোনো নিদর্শন স্থির করে দেন; আল্লাহ তা'আলা বললেন, আপনার নিদর্শন এই যে, আপনি তিন রাত্রি পর্যন্ত লোকের সাথে কথা বলতে পারবেন না অথচ সুস্থই থাকবেন।	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ۗ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾
১১. অতঃপর তিনি প্রকোষ্ঠ হতে আপন সম্প্রদায়ের নিকট বের হয়ে আসলেন এবং ইঙ্গিতে বললেন, তোমরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর সকাল ও সন্ধ্যায়।	فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. يَرِثُنِىْ যেন সে আমার উত্তরাধিকারী হয় وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ এবং ইয়াকূব বংশের উত্তরাধিকারী হয় وَاجْعَلْهُ আপনি তাকে করুন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক رَضِيًّا পছন্দনীয়।

৭. يٰزَكَرِيَّا হে যাকারিয়া اِنَّا نُبَشِّرُكَ আমি আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি بِغُلٰمِ একটি পুত্র সন্তানের اسْمُهٗ يَحْيٰى তার নাম হবে ইয়াহইয়া لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ইতঃপূর্বে আমি তার সমগুণবিশিষ্ট কাউকেও সৃষ্টি করিনি।

৮. قَالَ যাকারিয়া আরজ করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ কিরূপে আমার সন্তান হবে وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা وَقَدْ بَلَغْتُ এবং আমি পৌছেছি مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا বার্ধক্যের চরমে।

৯. قَالَ আল্লাহ বললেন كَذٰلِكَ অবস্থা এরূপই থাকবে قَالَ رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক বলেন هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ তা আমার পক্ষে সহজ وَقَدْ خَلَقْتُكَ আমি আপনাকে সৃষ্টি করেছি مِنْ قَبْلُ এর পূর্বে وَلَمْ تَكُ شَيْئًا অথচ আপনি কিছুই ছিলেন না।

১০. قَالَ যাকারিয়া বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً আমার জন্য কোনো নিদর্শন স্থির করে দিন قَالَ আল্লাহ বললেন اٰيَتُكَ আপনার নিদর্শন এই যে اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ আপনি লোকের সাথে কথা বলতে পারবেন না ثَلٰثَ لَيَالٍ তিন রাত্রি পর্যন্ত سَوِيًّا অথচ সুস্থই থাকবেন।

১১. فَخَرَجَ অতঃপর তিনি বের হয়ে আসলেন عَلٰى قَوْمِهٖ আপন সম্প্রদায়ের নিকট مِنَ الْمِحْرَابِ প্রকোষ্ঠ হতে فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ এবং তাদেরকে ইঙ্গিতে বললেন। اَنْ سَبِّحُوْا তোমরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর بُكْرَةً وَّعَشِيًّا সকাল ও সন্ধ্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণ : যেহেতু এ সূরায় হযরত মারইয়াম (আ.) এর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে এজন্য মারইয়াম নামে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যখন সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করে আবিসিনিয়া গমন করে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হযরত জাফর ইবনে আবূ তালেব (রা.)-কে বললেন, তোমাদের রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার কিছু আমাদেরকে শুনাও! তখন হযরত জা'ফর (রা.) সূরা মারইয়ামের প্রথম আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ শুনে নাজ্জাশী এত ক্রন্দন করলেন যে, তার দাড়িগুলো ভিজে গেল এবং তার সঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মের আলেমগণও ক্রন্দন করলেন তাদের অশ্রু বিসর্জনের কারণে কিতাবগুলো পর্যন্ত ভিজে গেল। নাজ্জাশী বললেন, এই মহান বাণী অবিকল তাই যা নিয়ে এসেছিলেন হযরত ঈসা (আ.)। এটা তো একই কেন্দ্রের আলো। –[আহমদ, বায়হাকী, ইবনে আবি হাতেম]

এরপর নাজ্জাশী রাসূল আকরাম ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। কিছুদিন পর যখন তার ইন্তেকাল হয়, তখন রাসূল ﷺ তার গায়েবানা জানাযার নামাজ আদায় করলেন।

রাসূল ﷺ-এর মু'জিযা : বর্ণিত আছে যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ ইন্তেকাল করেন, তখন রাসূল ﷺ এর মু'জিযা স্বরূপ বাদশাহ নাজ্জাশীর জানাযা তার সম্মুখে রাখা হয়; এ প্রসঙ্গে হাদীসের বর্ণনা নিম্নরূপ-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَخَاكُمُ النَّجَاشِيُّ تُوُفِّيَ فَقُوْمُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفُّوْا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَهُمْ لَا يَظُنُّوْنَ اِلَّا اَنَّ جَنَازَةً بَيْنَ يَدَيْهِ-

'হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাশীর ইন্তেকাল হয়েছে। অতএব তোমরা দাঁড়াও এবং তার উপর জানাযার নামাজ পড়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে কাতারবন্দি হলেন, অতঃপর তিনি চার তাকবীর দিলেন আর সাহাবায়ে কেরামের ধারণা হলো, (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুজিযা স্বরূপ) জানাযা তাঁর সম্মুখেই রাখা হয়।'

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমরা তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করছি, যদিও আমরা জানাযা দেখতে পাইনি, যা আমাদের সম্মুখে রাখা ছিল। [ফাতহুল বারী খ. ৩. পৃ. ১৫১]

গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে : এই ঘটনা দ্বারা একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ গায়েবানা জানাযার নামাজ আদায় করেছেন। তবে আর কারো গায়েবানা জানাযা আদায়ের কোনো প্রমাণ হাদীস শরীফে পাওয়া যায় না। এর দ্বারা কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন এটি নাজ্জাশীর বৈশিষ্ট্য। একারণেই ইমাম আযম ও ইমাম মালেক (র.) গায়েবানা জানাযার পক্ষে মত প্রকাশ করেননি। তবে অন্যান্য ইমামগণ গায়েবানা জানাযার পন্থাকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় অনেক বিস্ময়কর ঘটনাবলির উল্লেখ রয়েছে। যেমন আসহাবে কাহফ, যুলকারনাইন, ইয়াজূজ-মাজূজ প্রভৃতি। এই সূরায় কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, হযরত যাকারিয়া (আ.) এর দোয়া এবং তার ফলশ্রুতিতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের ঘটনা। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলিও এই সূরায় উল্লিখিত হয়েছে। এর দ্বারা তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, প্রিয়নবী ﷺ-এর রেসালত, দুনিয়ার এই জীবন ও পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের অনেক জরুরি কথা ইরশাদ হয়েছে। এসব ঘটনা দ্বারা পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবতাকে এই সত্য উপলব্ধি করার আহবান জানিয়েছে যে, দেখ যারা আল্লাহ তা'আলার বিধান মেনে চলে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি বরকত নাজিল করেন, আর কত নিয়ামত তিনি তাদেরকে দান করেন। অতএব তোমাদের কর্তব্য হলো- আল্লাহ তা'লার নেককার বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কেননা এ জীবন ও পরজীবনের সাফল্য এতেই নিহিত রয়েছে।

সূরা কাহফে ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাশ্চর্য একটি বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত এসম্পর্কের কারণেই সূরা কাহাফের পরে সূরা মারইয়ামকে স্থান দেওয়া হয়েছে। হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন বনী ইসরাঈলের অন্যতম নবী। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত যাকারিয়া (আ.)- সুতারের কাজ করতেন। তিনি নিজের হাতে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন, তার কোনো সন্তান ছিল না। তাঁর অন্তরে এই আশঙ্কা ছিল যে, আমার পরবর্তীকালে যাদের উপর সত্য দীনের প্রচার প্রসারের দায়িত্ব অর্পিত হবে, হয়তো তারা সঠিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করবে না। হয়তো এর মধ্যে তারা পরিবর্তন পরিবর্ধন করবে। যেমন বনী ইসরাঈলে তা ইতঃপূর্বেও হয়েছে। এজন্য তিনি রাতের শেষ প্রহরে অত্যন্ত বিনীতভাবে একটি পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দোয়া করেন। সূরা মারইয়ামের শুরু থেকেই আল্লাহ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ.) -এর প্রতি তার বিশেষ রহমত নাজিল করার কথা বর্ণনা করেছেন।

كٓهٰيٰعٓصٓ : এ অক্ষরগুলোকে 'মুকাত্তা'আত' বলা হয়।

পবিত্র কুরআনের বহু সূরার প্রারম্ভে এমনি অক্ষর স্থান পেয়েছে। এর সঠিক অর্থ মানুষের বোধগম্য নয়। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর রহস্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। এ জাতীয় অক্ষরগুলো সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছেন, প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু গোপন বিষয় রয়েছে, পবিত্র কুরআনের গোপন বিষয় হলো 'হুরূফে মুকাত্তা'আত 'যা সূরার প্রারম্ভে স্থান পেয়েছে। আর হযরত আলী (রা.) বলেন, প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু বিশেষ কথা থাকে পবিত্র কুরআনের বিশেষ কথা হলো এ অক্ষরসমূহ। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন : খ. ১৬ পৃ. ১৮৩-১৮৪.]

ইবনে মারদূভিয়া কালবী (র.) এর সূত্রে উম্মে হানী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন । তাতে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, এই হরফে মুকাত্তা'আতের অর্থ হলো - كَافٍ هَادٍ عَالِمٌ صَادِقٌ

এ বাক্যটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ হলো - كٓهٰيٰعٓصٓ অন্য একটি বর্ণনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রয়েছে সে, ك দ্বারা كَرِيْمٌ -ه দ্বারা هَادٍ -ى দ্বারা حَكِيْمٌ -ع দ্বারা عَلِيْمٌ এবং ص দ্বারা صَادِقٌ বুঝানো হয়েছে।

কালবী (র.) বলেছেন-

كَافٍ لِخَلْقِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট।

هَادٍ لِعِبَادِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী।

يَدُهٗ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তাঁর হাত তাদের [মু'মিনদের] হাতের উপর।

عَالِمٌ بِبَرِيَّتِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাত।

صَادِقٌ فِىْ وَعْدِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর ওয়াদায় সত্য।

দারিমী, ইবনে মাজাহ এবং ইবনে জারীরে ফাতেমা বিনতে আলী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) তার দোয়ায় বলতেন - يَا كٓهٰيٰعٓصٓ اِغْفِرْلِىْ অর্থাৎ হে কাফ-হা ইয়া আইন -সোয়াদ। আমাকে মাফ করুন! –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৮ পারা ১৬. পৃ. ৫৭.]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে এই অক্ষরসমূহ আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নাম। এবিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এরও একটি বর্ণনা রয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে- هُوَ اسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎ এগুলো আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ নাম। -[তাফসীরে মাজেদী, খ, ১. প.৬২৩]

نِدَاءً خَفِيًّا : এতে জানা গলে যে, দোয়া অনুচ্চস্বরে ও গোপনে করাই উত্তম। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اِنَّ خَيْرَ الذِّكْرِ الْخَفِىُّ وَخَيْرَ الرِّزْقِ مَا يَكْفِىْ অর্থাৎ অনুচ্চ জিকিরই সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন জীবিকাই শ্রেষ্ঠ। (অর্থাৎ যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয় না এবং কমও হয় না।) –[কুরতুবী]

اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا : অর্থাৎ অস্থির দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ অস্থিই দেহের খুঁটি। অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর। اِشْتِعَالٌ -এর শাব্দিক অর্থ প্রজ্বলিত হওয়া। এখানে চুলের শুভ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি বুঝানো হয়েছে।

দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগ্রস্ততা প্রকাশ করা মোস্তাহাব : এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আ.) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ হলো– এমতাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ততা উল্লেখ করা দোয়া কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক। একারণেই আলেমগণ বলেন, দোয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও নিজের অভাবগ্রস্ততা বর্ণনা করা উচিত।

مَوَالِيَ : এটা مَوْلٰى -এর বহুবচন। আরবি ভাষায় এর অর্থ বহুবিধ। তন্মধ্যে এক অর্থ চাচাতো ভাই ও স্বজন। এখানে তা-ই উদ্দেশ্য।

পয়গম্বরগণের ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারত্ব চলে না : يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوبَ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা প্রথমত হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর কাছে এমন কোনো অর্থ সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে! একজন পয়গম্বরের পক্ষে এরূপ চিন্তা করাও অবান্তর। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সম্বলিত একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে :

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَادِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَهُ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

"নিশ্চয়ই আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ। পয়গম্বরগণ কোনো দীনার ও দিরহাম রেখে যান না ; বরং তাঁরা ইলম ও জ্ঞান ছেড়ে যান। যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করে সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে।" –(আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

এ হাদীসটি কাফী, ফুলায়নী ইত্যাদি শিয়াগ্রন্থেও বিদ্যমান। বুখারীতে হযরত আয়েশা (আ.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً আমাদের (অর্থাৎ পয়গম্বরগণের) অধিক উত্তরাধিকারিত্ব কেউ পায় না। আমরা যে ধন-সম্পদ ছেড়ে যাই, তা সবই সদকা।

স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে يَرِثُنِي এর পর وَيَرِثُ مِنْ مِنْ اٰلِ يَعْقُوبَ বাক্যের যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয় নি। কেননা যে পুত্রের জন্মলাভের জন্য দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়াটা বাহ্যিকভাবেও সম্ভব নয়। কেননা ইয়াকূব বংশের আর্থিক উত্তরাধিকারী তো তাঁর নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনরাই হবে এবং তারা হচ্ছে সে সমস্ত مَوَالِيَ তথা স্বজন, যাদের উল্লেখ আয়াতে করা হয়েছে। তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তার দিক দিয়ে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) থেকে অধিক নিকটবর্তী। আর নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের বর্তমানে দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজনদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করাটা উত্তরাধিকার আইনের পরিপন্থি।

রূহুল মা'আনীতে শিয়াগ্রন্থ থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে :

رَوَى الْكَيْنِيُّ فِى الْكَافِىْ عَنْ اَبِى الْبُخْتَرِىْ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ دَاوُدَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ وَرِثَ سُلَيْمَانَ-

হযরত সোলায়মান (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-এর ওয়ারিশ হন এবং মুহাম্মদ ﷺ সোলায়মান এর ওয়ারিশ হন।

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হযরত সোলায়মান (আ.) -এর সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবেন, এ বিষয়ের কোনো সম্ভাবনাই নেই। এখানে নবুয়তের জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্বই বোঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ আয়াতেও সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি।

لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا : এখানে سَمِيٌّ শব্দের অর্থ সমনামও হয় এবং সমতুল্যও হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তাঁর পূর্বে 'ইয়াহইয়া' নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। নামের এই অনন্যতা ও অভূতপূর্বতাও কতক বিশেষ গুণে তার অনন্যতার ইঙ্গিতবহ ছিল। তাই তাঁকে তার বিশেষ গুণে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় অর্থ নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর কতক বিশেষ গুণ ও অবস্থা পূর্ববর্তী পয়গম্বগণের কারও মধ্যে ছিল না। সেসব বিশেষ গুণে তিনি তুলনাহীন ছিলেন। উদাহরণত চিরকুমার হওয়া ইত্যাদি। এতে জরুরি নয় যে, হযরত ইয়াহইয়া (আ.) পূর্ববর্তী পগম্বরগণের চাইতে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ও মূসা কালীমুল্লাহ (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও সুবিদিত। –(মাযহারী)

عِتِيًّا : শব্দটি عَتُوٌّ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রভাবাম্বিত না হওয়া। এখানে অস্থির শুষ্কতা বোঝানো হয়েছে। سَوِيًّا শব্দের অর্থ সুস্থ। শব্দটি একথা বোঝানোর জন্য যুক্ত করা হয়েছে যে, হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর কোনো মানুষের সাথে কথা না বলার এ অবস্থাটি কোনো রোগবশত ছিল না। এ কারণেই আল্লাহর জিকির ও ইবাদতে তাঁর জিহ্বা তিন দিনই পূর্ববৎ খোলা ছিল ; বরং এ অবস্থা মু'জিযা ও গর্ভসঞ্চারের নিদর্শনস্বরূপই প্রকাশ পেয়েছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَادٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُنَادَاةٌ মূলবর্ণ (ن - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি ডাকলেন।

وَهَنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَهْنٌ মূলবর্ণ (و - ه - ن) জিনস مثال واوى অর্থ- দুর্বল হয়ে পড়েছে।

اِشْتَعَلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِشْتِعَالٌ মূলবর্ণ (ش - ع - ل) জিনস صحيح অর্থ- ছড়িয়ে পড়েছে, প্রজ্বলিত হয়েছে।

اَلْمِحْرَابُ : ইসম, একবচন, এর বহুবচন হলো مَحَارِيْبُ অর্থ– প্রকোষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম ও পৃথক স্থান, ঘরে সদর স্থান।

سَبِّحُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْح মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা তাসবীহ পাঠ করো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا : এখানে ذكر হলো উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هٰذَا الْمَتْلُوُّ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ অথবা টা খবর এর উহ্য মুবতাদা অর্থাৎ فِيْمَا يُتْلٰى عَلَيْكَ ذِكْرُ আর ذكر হলো رَحْمَتِ رَبِّكَ -এর মুযাফ ইলাইহি। এটা মাসদার তার মাফউলের দিকে ইযাফত হওয়ার প্রকারভুক্ত। আর فاعل হচ্ছে উহ্য অর্থাৎ ذَكَرَ اللّٰهُ আর عَبْدَهٗ হলো رَحْمَةَ -এর মাফউলে বিহী زَكَرِيَّا হলো عَبْدَهٗ থেকে بدل অথবা عَبْدَهٗ এর আতফে বয়ান। –[ই'রাবুল কুরআন ৪/৫৬৫]

অনুবাদ	আয়াত
১২. হে ইয়াহইয়া! কিতাবকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করুন; আর আমি তাকে শৈশবকালেই দান করেছিলাম বিচার জ্ঞান।	يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾
১৩. এবং বিশেষ করে নিজের তরফ থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; এবং তিনি ছিলেন অতি পরহেজগার,	وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾
১৪. এবং স্বীয় পিতা-মাতার [একনিষ্ঠ] সেবক, আর তিনি উদ্ধত এবং নাফরমান ছিলেন না।	وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾
১৫. তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর জন্মদিবসে ও তাঁর মৃত্যু দিবসে এবং পুনরুত্থান দিবসে।	وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾
১৬. আর [হে মোহাম্মদ!] বর্ণনা করুন, এ কিতাবে মারইয়ামের [ঘটনা]। যখন তিনি স্বীয় পরিজন হতে পৃথক হয়ে পূর্বদিকস্থ এক স্থানে [গোসলের জন্য] গেলেন।	وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾
১৭. অতঃপর তিনি তাদের সম্মুখে পর্দা করে নিলেন। তৎপর আমি তাঁর নিকট আমার ফেরেশতাকে পাঠালাম, বস্তুত সে এক পূর্ণ মানবাকৃতি ধারণ করে তাঁর সম্মুখে প্রকাশিত হলো।	فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۗ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. يٰيَحْيٰى হে ইয়াহইয়া خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ কিতাবকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করুন وَاٰتَيْنٰهُ আর আমি তাকে দান করেছিলাম الْحُكْمَ বিচার জ্ঞান صَبِيًّا শৈশবকালেই

১৩. وَّحَنَانًا এবং বিশেষ করে হৃদয়ের কোমলতা مِّنْ لَّدُنَّا নিজের তরফ থেকে وَزَكٰوةً ও পবিত্রতা وَكَانَ تَقِيًّا এবং তিনি ছিলেন অতি পরহেজগার।

১৪. وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ স্বীয় পিতামাতার (একনিষ্ঠ) সেবক وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا আর তিনি উদ্ধত ও নাফরমান ছিলেন না।

১৫. وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক يَوْمَ وُلِدَ তাঁর জন্ম দিবসে وَيَوْمَ يَمُوْتُ ও তাঁর মৃত্যু দিবসে وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا এবং পুনরুত্থান দিবসে।

১৬. وَاذْكُرْ আর বর্ণনা করুন فِي الْكِتٰبِ এই কিতাবে مَرْيَمَ মারইয়ামের (ঘটনা) اِذِ انْتَبَذَتْ যখন তিনি পৃথক হয়ে গেলেন مِنْ اَهْلِهَا স্বীয় পরিজন হতে مَكَانًا شَرْقِيًّا পূর্বদিকস্থ এক স্থানে (গোসলের জন্য)

১৭. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا অতঃপর তিনি তাদের সম্মুখে পর্দা করে নিলেন فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا তৎপর আমি তাঁর নিকট পাঠালাম رُوْحَنَا আমার ফেরেশতাকে فَتَمَثَّلَ لَهَا বস্তুত সে তাঁর সম্মুখে প্রকাশিত হলো بَشَرًا سَوِيًّا এক পূর্ণ মানবাকৃতি ধারণ করে।

১৮. মারইয়াম বলতে লাগলেন, আমি তোমার হতে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাচ্ছি, যদি তুমি আল্লাহর ভয় রাখ।	قَالَتْ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾
১৯. ফেরেশতা বলল, আমি তো আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছি, আপনাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।	قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾
২০. তিনি বললেন, আমার পুত্র হবে কিরূপে! অথচ কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শও করেনি, আর আমি দুশ্চরিত্রাও নই।	قَالَتْ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾
২১. ফেরেশতা বলল, এরূপেই হবে, আপনার প্রতিপালক বলেছেন এটা আমার পক্ষে সহজ, আর এভাবে সৃষ্টি এ জন্য করব, যেন তাঁকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন করে দেই এবং আমার রহমতস্বরূপ, আর এটা একটি স্থিরীকৃত বিষয়।	قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾
২২. অনন্তর তিনি তাকে গর্ভে ধারণ করলেন, তৎপর তিনি তদবস্থায় দূরবর্তী কোনো নির্জন স্থানে চলে গেলেন।	فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. قَالَتْ মারইয়াম বলতে লাগলেন إِنِّيْ أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ আমি তোমার হতে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় চাচ্ছি إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا যদি তুমি আল্লাহর ভয় রাখ।

১৯. قَالَ ফেরেশতা বলল إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ আমি তো আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছি لِأَهَبَ لَكِ আপনাকে দান করার জন্য غُلٰمًا زَكِيًّا একটি পবিত্র পুত্র।

২০. قَالَتْ তিনি বললেন أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ আমার পুত্র হবে কিরূপে وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ অথচ কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শও করেনি وَّلَمْ أَكُ بَغِيًّا আর আমি দুশ্চরিত্রাও নই।

২১. قَالَ ফেরেশতা বলল كَذٰلِكِ এরূপই হবে قَالَ رَبُّكِ আপনার প্রতিপালক বলেছেন هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ আমার পক্ষে সহজ وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ আর এভাবে সৃষ্টি এ জন্য করব, যেন তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন করে দেই وَرَحْمَةً مِّنَّا এবং আমার রহমতস্বরূপ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا আর এটা একটি স্থিরীকৃত বিষয়।

২২. فَحَمَلَتْهُ অনন্তর তিন তাঁকে গর্ভধারণ করলেন فَانْتَبَذَتْ بِهٖ তৎপর তিনি তদবস্থায় চলে গেলন مَكَانًا قَصِيًّا দূরবর্তী কোনো নির্জন স্থানে।

২৩. অনন্তর প্রসব বেদনা তাকে একটি খেজুর বৃক্ষের মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল, আর তিনি বলতে লাগলেন, হায়! এর পূর্বেই যদি আমি মরে যেতাম এবং (মানুষের) স্মরণ হতে একেবারে বিস্মৃত হয়ে যেতাম।	فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾
২৪. পরক্ষণে জিবরাঈল তাঁর নিম্ন [ভূমি] হতে তাঁকে ডেকে বললেন, আপনি বিষণ্ন হবেন না, আপনার প্রতিপালক আপনার নিম্নদিকে একটি নহর সৃষ্টি করে দিয়েছেন।	فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾
২৫. এবং ঐ খেজুর বৃক্ষের-কাণ্ড ধরে নিজের দিকে ঝাঁকুন [নাড়া দিন] আপনার নিকট সদ্য পক্ক খেজুর ঝরে পড়বে।	وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ অনন্তর প্রসব বেদনা তাকে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ একটি খেজুর বৃক্ষের মূলে قَالَتْ আর তিনি বলতে লাগলেন। يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا হায় এর পূর্বেই যদি আমি মরে যেতাম وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا এবং মানুষের স্মরণ হতে একেবারে বিস্মৃত হয়ে যেতাম।

২৪. فَنَادٰىهَا পরক্ষণে জিবরাঈল তাঁকে ডেকে বললেন مِنْ تَحْتِهَآ তার নিম্ন (ভূমি) হতে اَلَّا تَحْزَنِىْ আপনি বিষণ্ন হবেন না قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا আপনার প্রতিপালক আপনার নিম্ন দিকে একটি নহর সৃষ্টি করে দিয়েছেন

২৫. وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ এবং নিজের দিকে ঝাঁকুন بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ঐ খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড ধরে تُسٰقِطْ عَلَيْكِ আপনার নিকট ঝড়ে পড়বে رُطَبًا جَنِيًّا সদ্য পক্ক খেজুর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حَنَانًا -এর শাব্দিক অর্থ হৃদয়ের কোমলতা ও দয়ার্দ্রতা। এটা হযরত ইয়াহইয়া (আ.) -কে স্বতন্ত্রভাবে দান করা হয়েছিল। اِنْتَبَذَتْ শব্দটি نَبْذٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ দূরে নিক্ষেপ করা। اِنْتِبَاذٌ এর অর্থ হলো জনসমাবেশ থেকে সরে দূরে চলে যাওয়া। مَكَانًا شَرْقِيًّا -অর্থাৎ পূর্বদিকের কোনো নির্জন স্থানে চলে গেলন। নির্জন স্থানে যাওয়ার কি কারণ ছিল, সে সম্পর্কে সম্ভাবনা ও উক্তি বিভিন্নরূপে বর্ণিত আছে। কেউ বলেন, গোসল করার জন্য নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন, অভ্যাস অনুয়ায়ী ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য কক্ষের পূর্বদিকস্থ কোনো নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। কুরতুবীর মতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এ কারণেই খ্রিস্টানরা পূর্বদিকে তাদের কেবলা করেছে এবং তারা পূর্বদিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا -সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদদের মতে রূহ বলে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, স্বয়ং ঈসা (আ.) কেই বোঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী মানবের প্রতিকৃতি তাঁর সামনে উপস্থিত করে দেন। কিন্তু এখানে প্রথম উক্তি অগ্রগণ্য। পরবর্তী বাক্যাবলি থেকে এরই সমর্থন পাওয়া যায়।

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا : ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখা মানুষের জন্য সহজ নয়-এতে কঠিন ভীতির সঞ্চার হয়; যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা গিরিগুহায় এবং পরবর্তীকালেও এরূপ ভয় ভীতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ কারণে হযরত জিবরাইল (আ.) মারইয়ামের সামনে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মারইয়াম যখন পদার্র ভেতর আপত একজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসৎ বলে আশঙ্কা করলেন। তাই বললেন :

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ : আমি তোমার থেকে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) একথা শুনে। (আল্লাহর কথা শুনে) আল্লাহর নামের সম্মানার্থে কিছুটা পেছনে সরে গেলেন।

إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا : এ বাক্যটি এমন, যেমন কেউ কোনো জালিমের কাছে অপারগ হয়ে এভাবে ফরিয়াদ করে : যদি তুমি ঈমানদার হও, তবে আমার প্রতি জুলুম করো না। এ জুলুমে বাধা দেওয়ার জন্যে তোমার ঈমান যথেষ্ট হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহকে ভয় করা এবং এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্য সমীচীন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : এ বাক্যটি আতিশয্য বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে?। অর্থাৎ, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও, তবুও আমি তোমার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। এর বিপরীত হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। –[মাযহারী]

لِأَهَبَ لَكِ : এখানে পুত্র সন্তান প্রদানের কাজটি জিবরাঈল নিজের বলে ব্যক্ত করেছেন। কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মারইয়ামের বুকের উন্মুক্ত স্থানে ফুঁ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এই ফুঁ দেওয়া পুত্র সন্তান প্রদানের উপায় হয়ে যাবে। যদিও প্রকৃতপক্ষে এ দান আল্লাহ তা'আলারই কাজ।

মৃত্যু কামনার বিধান : মারইয়ামের মৃত্যু-কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগের প্রাধান্যকে এর ওজর বলা হবে। এক্ষেত্রে মানুষ সর্বোতভাবে আল্লাহর আদেশ নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি মারইয়াম ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন, অর্থাৎ মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবত এর মোকাবিলায় আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে বেসবর হওয়ার গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলেও এ গোনাহ থেকে বেঁচে যেতাম। তবে এরূপ মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মারইয়ামকে বলা হয়েছে : তুমি বলে দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে মারইয়াম কোনো মানত করেনি। এটা মিথ্যা বলার শিক্ষা নয়? উত্তর এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও।

মৌনতার রোজা ইসলামি শরিয়তে রহিত হয়ে গেছে : ইসলাম-পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার রোজাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালিগালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরি করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোনো ইবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েজ নয়। আবূ দাউদের রেওয়ায়েত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ অর্থাৎ সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতিম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোনো ইবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী। আহার ও পান করার আদেশ বাহ্যত অনুমতি প্রদানের অর্থে বোঝা যায়। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান যুক্তি বিরুদ্ধ নয় : পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মু'জিযা। মু'জিযায় যত অসম্ভাব্যতা থাকুক, তাতে দোষ নেই, বরং এতে অলৌকিকতা গুণটি আরও বেশি করে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে তেমন কোনো অসম্ভাব্যতাও নেই। কারণ চিকিৎসা শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্যে ধারণশক্তির সাথে সাথে কারক শক্তি রয়েছে। তাই যদি এই কারক শক্তি আরও বেড়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়। –[বয়ানুল কুরআন]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামকে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনোরূপ নাড়া ছাড়াই আপনা-আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আল্লাহর কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বোঝা যায় যে, রিজিক হাসিলের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। –[রূহুল মা'আনী]

سَرِيًّا আর আভিধানিক অর্থ ছোট নহর। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরত দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারি করে দেন, অথবা জিবরাঈলের মাধ্যমে জারি করিয়ে দেন। উভয় প্রকার রেওয়ায়েতই রয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মারইয়ামের সান্ত্বনার উপকরণাদি উল্লেখ করার প্রথমে সময় পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

خُذْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ امر বাব نَصَرَ মাসদার أَخْذٌ মূলবর্ণ (ا - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- গ্রহণ করুন।

اٰتَيْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم ماضى معروف বহছ ماضى বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ- আমি তাঁকে দান করেছিলাম।

يَمُوْتُ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ مضارع বাব نَصَرَ মাসদার مَوْتٌ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اجوف واوى অর্থ- মৃত্যুবরণ করবে।

يُبْعَثُ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع مجهول বহছ مضارع বাব فَتَحَ মাসদার بَعْثٌ মূলবর্ণ (ب - ع - ث) জিনস صحيح অর্থ- উঠানো হবে, পুনরুত্থিত করা হবে।

اِنْتَبَذَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب ماضى معروف বহছ ماضى বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِنْتِبَاذٌ মূলবর্ণ (ن - ب - ذ) জিনস صحيح অর্থ- পৃথক হলেন।

فَتَمَثَّلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ ماضى বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَمَثُّلٌ মূলবর্ণ (م - ث - ل) জিনস صحيح অর্থ– সে আকৃতি ধারণ করল।

لَمْ يَمْسَسْنِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب নফী জহদ বলম دفعل مستقبل معروف বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَسٌّ মূলবর্ণ (م - س - س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আমাকে স্পর্শও করেনি।

هُزِّىْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر امر حاضر معروف বহছ امر বাব نَصَرَ মূলবর্ণ هَزٌّ জিনস (ه - ز - ز) অর্থ- আপনি ঝাঁকুন।

تُسَاقِطْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب مضارع معروف বহছ مضارع বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُسَاقَطَةٌ মূলবর্ণ (س - ق - ط) জিনস صحيح অর্থ- ঝড়ে পড়বে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالَتْ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا : এখানে قَالَتْ ফেল এবং هى এর ন্যায় উহ্য যমীর তার ফায়েল اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল এবং ياء للمتكلم তার اسم এবং اَعُوْذُ ... الخ জুমলা তার خبر আর সম্পূর্ণ বাক্য একত্রে قَالَتْ ফে'লের مقول ; আর بِالرَّحْمٰنِ হলো اَعُوْذُ-এর মুতাআল্লিক ও مِنْكَ টা اَعُوْذُ দ্বিতীয় متعلق আর اِنْ হলো হরফে শর্ত كُنْتَ ফে'ল নাকেস ت হলো كان এর اسم আর تَقِيًّا তার খবর। আর جواب شرط উহ্য রয়েছে এর অর্থ হলো– اِنْ كَانَ يُرْجٰى مِنْكَ اَنْ تَتَّقِى اللّٰهَ وَتَخْشَاهُ وَتَحْفِلُ بِالْاِسْتِعَاذَةِ بِهٖ فَاِنِّىْ عَائِذَةٌ بِهٖ مِنْكَ

-[ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৪]

২৬. অতঃপর আপনি খান ও পান করুন এবং চক্ষু জুড়ান, অনন্তর আপনি লোকদের মধ্যে কাউকেও দেখলে [ইশারায়] বলে দিন, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোজা মানত করেছি, অতএব, আজ কারো সঙ্গে কথা বলব না।	فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۙ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾
২৭. অতঃপর সে তাকে কোলে করে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট আনল; লোকেরা বলল, হে মারইয়াম! তুমি গুরুতর কাজ করেছ।	فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾
২৮. হে হারূনের ভগ্নী! তোমার পিতা কোনো খারাপ লোক ছিলেন না, আর তোমার মাতাও অসতী ছিলেন না।	يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾
২৯. তখন তিনি শিশুর দিকে ইঙ্গিত করেন; তারা বলল, আমরা এমন ব্যক্তির সঙ্গে কিরূপে কথা বলব– যে এখনো কোলের শিশু।	فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾
৩০. ঐ শিশু বলে উঠল! আমি আল্লাহর বান্দা; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।	قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. فَكُلِي অতঃপর আপনি খান وَاشْرَبِي ও পান করুন وَقَرِّي عَيْنًا এবং চক্ষু জুড়ান فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا অনন্তর আপনি লোকদের মধ্যে কাউকে দেখলে فَقُولِي বলে দিন إِنِّي نَذَرْتُ আমি মানত করেছি لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا আল্লাহর উদ্দেশ্য রোজা فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا অতএব আজ কারও সঙ্গে কথা বলব না।

২৭. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ অতঃপর সে তাঁকে কোলে করে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট আনল قَالُوا লোকেরা বলল يَا مَرْيَمُ হে মারইয়াম لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا তুমি গুরুতর কাজ করেছ।

২৮. يَا أُخْتَ هَارُونَ হে হারূনের ভগ্নী مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ তোমার পিতা কোনো খারাপ লোক ছিল না وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا আর মাতাও অসতি ছিলেন না।

২৯. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ তখন তিনি শিশুর দিকেই ইঙ্গিত করলেন قَالُوا তারা বলল كَيْفَ نُكَلِّمُ আমরা এমন ব্যক্তির সাথে কিরূপে কথা বলব مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا যে এখনো কোলের শিশু।

৩০. قَالَ ঐ শিশু বলে উঠল إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ আমি আল্লাহর বান্দা آتَانِيَ الْكِتَابَ তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন وَجَعَلَنِي نَبِيًّا এবং আমাকে নবী করেছেন।

অনুবাদ	আয়াত
৩১. আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময়, আমি যেখানেই থাকি না কেন? আর তিনি আমাকে নামাজ ও জাকাতের আদেশ করেছেন, যে পর্যন্ত আমি জীবিত থাকি।	وَّجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا ﴿۳۱﴾
৩২. আর আমাকে আমার মাতার সেবক করেছেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য বানাননি।	وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِیْ ؗ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا ﴿۳۲﴾
৩৩. আর আমার উপর শান্তি– যেদিন আমি জন্মেছি এবং যে দিন মরব, আর যেদিন আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে।	وَالسَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ﴿۳۳﴾
৩৪. ইনি হলেন ঈসা ইবনে মারইয়াম, আমি [সম্পূর্ণ] সত্য বলছি, যে সম্বন্ধে তারা ঝগড়া করছে।	ذٰلِكَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِیْ فِیْهِ یَمْتَرُوْنَ ﴿۳۴﴾
৩৫. আল্লাহর শান এরূপ নয় যে, সন্তান গ্রহণ করেন, তিনি পবিত্র; যখন তিনি কোনো কাজ করতে চান, তখন তিনি তার উদ্দেশ্যে এটুকুই বলেন যে, হয়ে যাও, তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়;	مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ یَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ ﴿۳۵﴾ ؕ
৩৬. আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব, কেবল তাঁরই ইবাদত কর; এটাই সরল পথ।	وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ﴿۳۶﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময় اَیْنَ مَا كُنْتُ আমি যেখানেই থাকিনা কেন وَاَوْصٰنِیْ আর তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ নামাজ ও জাকাতের مَا دُمْتُ حَیًّا যে পর্যন্ত আমি জীবিত থাকি।

৩২. وَبَرًّا بِوَالِدَتِیْ আর আমাকে আমার মাতার সেবক করেছেন وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ আর তিনি আমাকে বানাননি جَبَّارًا شَقِیًّا উদ্ধত ও হতভাগ্য।

৩৩. وَالسَّلٰمُ عَلَیَّ আর আমার উপর শান্তি یَوْمَ وُلِدْتُّ যেদিন আমি জন্মেছি وَیَوْمَ اَمُوْتُ এবং, যেদিন মরব وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا আর যেদিন আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে।

৩৪. ذٰلِكَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ ইনি হলেন ঈসা ইবনে মারইয়াম قَوْلَ الْحَقِّ আমি (সম্পূর্ণ) সত্য বলছি الَّذِیْ فِیْهِ یَمْتَرُوْنَ যে সম্বন্ধে তারা ঝগড়া করছে।

৩৫. مَا كَانَ لِلّٰهِ আল্লাহর শান এরূপ নয় যে اَنْ یَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ সন্তান গ্রহণ করেন سُبْحٰنَهٗ তিনি পবিত্র اِذَا قَضٰۤی اَمْرًا যখন তিনি কোনো কাজ করতে চান فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ তখন তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে এতটুকুই বলেন যে كُنْ হয়ে যাও فَیَكُوْنُ তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

৩৬. وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبُّكُمْ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমারও প্রতিপালক তোমাদেরও প্রতিপালক فَاعْبُدُوْهُ অতএব কেবল তাঁরই ইবাদত কর هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ এটাই সরল পথ।

৩৭. কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলো পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করল, সুতরাং এ কাফেরদের জন্য এক মহা দিবসের আগমনে ভীষণ দুর্দশা রয়েছে।	فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾
৩৮. যেদিন এ সমস্ত লোক [হিসাব-নিকাশ ও কর্মফলের জন্য] আমার নিকট উপস্থিত হবে, সেদিন তারা কতই না শ্রবণকারী হবে এবং কতই না প্রত্যক্ষকারী, অথচ এ অনাচারীরা আজ স্পষ্ট ভ্রমে রয়েছে।	أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. فَاخْتَلَفَ কিন্তু মতভেদ সৃষ্টি করে নিল الْأَحْزَابُ বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলো مِنْ بَيْنِهِمْ পরস্পর فَوَيْلٌ সুতরাং ভীষণ দুর্দশা রয়েছে। لِّلَّذِينَ كَفَرُوا এই কাফেরদের জন্য مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ এক মহা দিবসের আগমনে।

৩৮. أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ তারা কতইনা শ্রবণকারী হবে এবং কতইনা প্রত্যক্ষকারী يَوْمَ يَأْتُونَنَا সেদিন, যেদিন এসমস্ত লোক আমার নিকট উপস্থিত হবে لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ অথচ এই অনাচারীরা الْيَوْمَ আজ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ স্পষ্ট ভ্রমে রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣٧)

শানে নুযূল : আব্দুর রাজ্জাক ও ইবনে আবী হাতেম হযরত কাতাদা (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, বনী ইসরাঈলরা এক সাথে একত্রিত হয়ে তাদের থেকে চারজন আলেমকে নির্বাচন করে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাদের সন্দেহ সংশয়ের সমাধান চায়। তখন তাদের থেকে একজন বলল যে, তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ, ভূ-পৃষ্ঠে তিনি অবতরণ করেছিলেন। যাদের জীবন দান করার ছিল, তাদেরকে জীবন দান করেছেন। যাদেরকে মৃত্যু দান করার ছিল, তাদেরকে মৃত্যু দান করে তিনি আকাশে উঠে গিয়েছিলেন। খ্রিস্টানদের থেকে ইয়াকূবিয়া সম্প্রদায় তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে তাকে অনুসরণ করে নিল। কিন্তু বাকি তিনজন বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তিনজনের একজন বলল যে, তিনি হলেন আল্লাহর পুত্র। বাকি দু'জন তাকে বলল যে, তুমি মিথ্যুক। তবে খ্রিস্টান নাস্তুরিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত যারা, তারা তাকে অনুসরণ করে নিল। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি দু'জনের একজন বলল যে, তিনি হলেন তিন ইলাহের একজন অর্থাৎ : ১. ইলাহ আল্লাহ ২. ইলাহ ঈসা ৩. ইলাহ তাঁর মাতা মারিয়াম। তাকে অনুসরণকরীরা হলো ইসরাঈলিয়া মালকানীয়া খ্রিস্টান। চতুর্থজন যিনি ছিলেন তিনি বললেন যে, তিনি হলেন আল্লাহর বান্দা ও তদীয় রাসূল এবং তার পক্ষ থেকে প্রেরিত আত্মা। তাঁকে অনুসরণ করে নিল ঈমানদারগণ। বলা বাহুল্য এবার প্রত্যেকেরই অনুসারী ও দলবল হয়ে গেল। ফলে পারস্পরিক বিরোধ দেখা দিল। এতে ঈমানদারের বিজয় হলো। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ পারস্পরিক বিরোধের স্বরূপকেই বর্ণনা করার জন্য আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-[ফাতহুল কাদীর ৩৩৪/৮, তাবারী ৩৪৩/৩, বহরে মুহীত্ব ১৭৯/৬, সাভী ৩৭/৩, ইবনে কাছীর ১২৪/৩, রূহুল মা'আনী ৭৯২/ ৮]

فَكُلِي وَاشْرَبِي : কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে। **বিশেষত** ঐ খাদ্যের বেলায় যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবস্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে।-[রূহুল মা'আনী]

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ : বাক্য থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে মারইয়াম যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। কতদিন পর ফিরে এলেন, এ সম্পর্কে ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মারইয়াম সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক হয়ে ঘরে ফিরে আসেন।-(রূহুল-মা'আনী)

شَيْئًا فَرِيًّا আরবি ভাষায় فَرِيٌّ শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা ও চিরে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে فَرِيٌّ বলা হয়। আবূ হ্যাইয়্যান বলেন : প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে فَرِيٌّ বলা হয়। ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যই শব্দটির ব্যবহার সুবিদতি।

يَاأُخْتَ هَارُونَ : হযরত মূসা (আ.) এর ভাই ও সহচর হযরত হারূন (আ.) মারইয়ামের আমলের শত শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এখানে মারইয়ামকে হারূন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) কে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কুরআনে হযরত মারইয়ামকে হারূন-ভগিনী বলা হয়েছে। অথচ হযরত হারূন (আ.) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত মুগীরা (রা.) এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন : তুমি বলে দিলে না কেন যে, বরকতের জন্য পয়গম্বরদের নামে নাম রাখা এবং তাঁদের প্রতি সম্বন্ধ করা ঈমানদারদের সাধারণ অভ্যাস। (মুসলিম -তিরমিযী, নাসায়ী।) এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে। (এক) হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত হারূন (আ.)-এর বংশধর ছিলেন বলেই তাঁর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে, যেমন আরবদের রীতি রয়েছে যে, তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে أَخَا تَمِيمٍ এবং আরবের লোককে أَخَا عَرَبٍ বলে অভিহিত করে। (দুই) এখানে হারূন বলে হযরত মূসা (আ.)-এর সহচর হারূন বোঝানো হয়নি, বরং মারইয়ামের ভ্রাতার নামও ছিল হারূন এবং এ নাম হারূন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়াম কে হারূন-ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ।

مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ : কুরআনে এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী-আল্লাহও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দকাজের তুলনায় বেশি গোনাহ হয়। কারণ, এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বুযুর্গদের সন্তানদের উচিত, সৎকাজেও আল্লাহভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা।

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ : এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন মারইয়ামকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করে তখন হযরত ঈসা (আ.) মায়ের বুকের দুধ পান করেছিলেন। তিনি তাদের ভর্ৎসনা শুনে স্তন্য ছেড়ে দেন এবং বামদিকের পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে বলেন :

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ অর্থাৎ আমি আল্লাহর বান্দা। এই প্রথম বাক্যেই হযরত ঈসা (আ.) এই ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করে দেন যে, যদিও আমি অলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছি; কিন্তু আমি আল্লাহ নই- আল্লাহর দাস। অতএব, কেউ যেন আমার উপাসনায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا : এ বাক্যে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর দুগ্ধপানের জমানায় আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোনো পয়গম্বর চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত ও কিতাব লাভ করেননি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি যথা সময়ে আমাকে নবুয়ত ও কিতাব দান করবেন। এটা হুবহু এমন যেমন মহানবী বলেছেন ঃ আমাকে নবুয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন হযরত আদম (আ.) -এর জন্মই হয়নি- তার খামির তৈরি হচ্ছিল মাত্র। বলা বাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, নবুয়ত দানের ওয়াদা মহানবী ﷺ এর জন্য অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে "নবী করেছেন" শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী করার কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা আমার নবী হওয়া এবং রেসালত লাভ করা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, আমার জন্মে কোনো গোনাহের দখল থাকতে পারে না।

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ : তাকিদ সহকারে কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে وَصِيَّتْ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। হযরত ঈসা (আ.) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামাজ ও জাকাতের অসিয়ত করেছেন। তাই এর অর্থ এই যে, খুব তাগিদ সহকারে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামাজ ও রোজা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষনবী ﷺ পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসূলের শরিয়তেই ফরজ রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরিয়তে এগুলোর আকার-আকৃতি ও খুটিনাটি বিষয়াদি বিভিন্নরূপ ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তেও নামাজ ও জাকাত ফরজ ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত ঈসা (আ.) কোনো সময় মালদার হননি। তিনি গুহা নির্মাণ করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি। এমতাবস্থায় তাঁকে জাকাতের আদেশ দেওয়ার অর্থ কি? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের উপর জাকাত ফরজ- এটা ছিল তাঁর শরিয়তের আইন। হযরত ঈসা (আ.)ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন যে, কোনো সময় নেসাব পরিমাণ মাল একত্রিত হলে তাকেও জাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থি নয়। -[রূহুল মা'আনী]

مَا دُمْتُ حَيًّا : অর্থাৎ নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ আমার জন্য সর্বকালীন, যে পর্যন্ত জীবিত থাকি। বলাবাহুল্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থাকালীন জীবন বোঝানো হয়েছে। কেননা এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আকাশে উঠানোর পর অবরতণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতির জমানা।

وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ : এখানে শুধু মাতার কথা বলা হয়েছে, পিতা- মাতার কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের এহেন অলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ : হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অলীক চিন্তাধারার মধ্যে বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খ্রিস্টার্নরা তাঁর সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে খোদার বেটা' বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদিরা তাঁর অবমাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, তাঁকে ইউসুফ মিস্ত্রির জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করে। (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তি বর্ণনা করে তাঁর সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।- [কুরতুবী]

قَوْلَ الْحَقِّ : লামের উপর যবরযোগে। এর ব্যাকরণিক রূপ হলো এরূপ اَقُوْلُ قَوْلَ الْحَقِّ কোনো কোনো কেরাতে লামের উপর পেশ যোগেও বর্ণিত রয়েছে। তখন অর্থ এই যে, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং قَوْلُ الْحَقِّ (সত্য উক্তি) যেমন তাঁকে كَلِمَةُ اللّٰهِ (আল্লাহর উক্তি) উপাধিও দেওয়া হয়েছে। কারণ তাঁর জন্ম বাহ্যিক কারণের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আল্লাহর উক্তির মাধ্যমে হয়েছে। -[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَكُلِيْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَكْلٌ মূলবর্ণ (ا ـ ك ـ ل) জিনস مهموز فاء অর্থ- আপনি খান।

اِشْرَبِيْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার شُرْبٌ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ب) জিনস صحيح অর্থ- পান করুন।

تَرَيِنَّ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ مضارع بانون ثقيلة বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ- তুমি অবশ্যই দেখবে।

لَنْ اُكَلِّمَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ نفى تاكيد بلن در فعل مستقبل معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تكليم মূলবর্ণ (ك ـ ل ـ م) জিনস صحيح অর্থ- আমি কথা বলব না।

فَاَتَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ- সে আনল।

فَاَشَارَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِشَارَةٌ মূলবর্ণ (ش ـ و ـ ر) জিনস اجوف واوى অর্থ- তিনি ইঙ্গিত করেন।

اَوْصٰنِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْصَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ص ـ ى) জিনস মুরাক্কাব لفيف مفروق অর্থ-তিনি আমাকে আদেশ করেছেন।

وُلِدْتُّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার وِلَادَةٌ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ- আমি জন্ম লাভ করেছি, আমি সৃষ্টি হয়েছি।

يَمْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِمْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (م ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা ঝগড়া করছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا : এখানে قَالَتْ ফেল এবং هِىَ -এর ন্যায় উহ্য যমীর তার ফায়েল, এখন ফেল ও ফায়েল মিলে قول ; আর পরবর্তী বাক্য مقول ; يا হরফে নেদা এবং মুনাদা উহ্য রয়েছে অথবা শুধু تنبيه -এর জন্য يا لَيْتَ হরফে মুশাব্বাহ ফেল আর نِىْ হলো তার اسم আর مت হলো তার খবর আর তা ফেল ফায়েল এবং منصوب الظرف তথা قَبْلَ শব্দ مِتُّ -এর সাথে متعلق হয়েছে قَبْلَ হলো মুজাফ এবং هٰذَا মুজাফ ইলাইহি خبر كان نَسْيًا আর اسم كان হলো ت এবং فعل হলো كُنْتُ হলো হরফে আতফ واو -এর وَكُنْتُ এর এবং مَنْسِيًّا টা একই অর্থবোধক হওয়ার কারণে نَسْيًا -এর تاكيد হয়েছে আবার এটাকে সিফাতও বলা যেতে পারে। –(ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯১)

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৩৯. আর আপনি তাদেরকে পরিতাপ-দিবস সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন শেষ মীমাংসা করে দেওয়া হবে। আর তারা গাফলতেই রয়েছে এবং তারা ঈমান আনে না।	وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ ۘ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾
৪০. আর আমিই সমগ্র দুনিয়ার ও দুনিয়াবাসীদের ওয়ারিশ থেকে যাব এবং এরা সকলে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।	إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾
৪১. আর আপনি বর্ণনা করুন! এ কিতাবে ইবরাহীমের [ঘটনাও]; তিনি অতি সত্যনিষ্ঠ নবী ছিলেন।	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾
৪২. যখন তিনি স্বীয় পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা, আপনি কেন এমন বস্তুর উপাসনা করেন– যে বস্তু না কিছু শুনে আর না কিছু দেখে, আর না আপনার কোনো কাজে আসে?	إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾
৪৩. হে আমার পিতা! আমার নিকট এমন জ্ঞান [ওহী] এসেছে যা আপনার নিকট আসেনি, অতএব, আপনি আমার কথামতো চলুন, আমি আপনাকে সরল পথ দেখাব।	يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. وَأَنذِرْهُمْ আর আপনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন يَوْمَ الْحَسْرَةِ পরিতাপ দিবস সম্বন্ধে إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ যেদিন শেষ মীমাংসা করে দেওয়া হবে وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ আর তারা গাফলতেই রয়েছে وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ এবং তারা ঈমান আনে না।

৪০. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ আর আমি ওয়ারিশ থেকে যাব الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا সমগ্র দুনিয়ার ও দুনিয়াবাসীদের وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ এবং এরা সকলে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৪১. وَاذْكُرْ, আর আপনি বর্ণনা করুন فِي الْكِتَابِ এই কিতাবে إِبْرَاهِيمَ ইবরাহীমের (ঘটনাও) إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا তিনি অতি সত্যনিষ্ঠ নবী ছিলেন।

৪২. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ যখন তিনি স্বীয় পিতাকে বললেন يَا أَبَتِ হে আমার পিতা لِمَ تَعْبُدُ আপনি কেন এমন বস্তুর উপাসনা করেন مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ যে বস্তু না কিছু শুনে আর না কিছু দেখে وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا, আর না আপনার কোনো কাজে আসতে পারে।

৪৩. يَا أَبَتِ হে আমার পিতা إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ আমার নিকট এমন জ্ঞান (ওহী) এসেছে مَا لَمْ يَأْتِكَ যা আপনার নিকট আসেনি فَاتَّبِعْنِي অতএব আপনি আমার কথা মতো চলুন أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا আমি আপনাকে সরল পথ দেখাব।

৪৪. হে আব্বা! আপনি শয়তানের উপাসনা করবেন না; নিশ্চয় শয়তান হচ্ছে করুণাময় আল্লাহর নাফরমান।	يٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿۴۴﴾
৪৫. হে আব্বা! আমি আশঙ্কা করছি যে, করুণাময় আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার উপর কোনো আজাব এসে না পড়ে, ফলত আপনি শয়তানের সাথি হয়ে যাবেন।	يٰاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿۴۵﴾
৪৬. পিতা উত্তর করল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার মা'বূদগণ হতে ফিরে আছ? [এবং আমাকেও বারণ করছ? স্মরণ রেখো,] যদি তুমি এটা হতে নিবৃত্ত না হও, তবে আমি নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলব, আর দূর হয়ে যাও আমার হতে চিরতরে।	قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿۴۶﴾
৪৭. ইবরাহীম বললেন, আমার সালাম গ্রহণ করুন, এখন আমি আপনার জন্য আমার প্রতিপালকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করব; নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।	قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿۴۷﴾
৪৮. আর আমি আপনাদের হতে এবং আপনারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা করছেন তাদের হতেও সরে যাচ্ছি এবং আমি স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করব, আশা করি যে, আমার প্রতিপালকের ইবাদত করে বঞ্চিত হব না।	وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ڮ عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَاۗءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ﴿۴۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. يٰاَبَتِ হে আব্বা لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ আপনি শয়তানের উপাসনা করবেন না اِنَّ الشَّيْطٰنَ নিশ্চয় শয়তান হচ্ছে كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا করুণাময় আল্লাহর নাফরমান।

৪৫. يٰاَبَتِ হে আব্বা اِنِّيْٓ اَخَافُ আমি আশঙ্কা করছি যে اَنْ يَّمَسَّكَ আপনার উপর এসে না পড়ে عَذَابٌ কোনো আজাব مِّنَ الرَّحْمٰنِ করুণাময় আল্লাহর পক্ষ হতে فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ফলত আপনি শয়তানের সাথি হয়ে যাবেন।

৪৬. قَالَ পিতা উত্তর করল اَرَاغِبٌ اَنْتَ তুমি কি ফিরে আছ عَنْ اٰلِهَتِيْ আমার মা'বূদগণ হতে يٰٓاِبْرٰهِيْمُ হে ইবরাহীম لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ যদি তুমি এটা হতে নিবৃত্ত না হও لَاَرْجُمَنَّكَ আমি নিশ্চয়ই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলব وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا আর দূর হয়ে যাও আমার হতে চিরতরে।

৪৭. قَالَ ইবরাহীম বললেন سَلٰمٌ عَلَيْكَ আমার সালাম গ্রহণ করুন سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ এখন আমি আপনার জন্য আমার প্রতিপালকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করব اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।

৪৮. وَاَعْتَزِلُكُمْ আর আমি আপনাদের থেকে সরে যাচ্ছি وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এবং আপনারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা করছেন তাদের হতেও وَاَدْعُوْا رَبِّيْ এবং আমি স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করব عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَاۗءِ رَبِّيْ شَقِيًّا আশা করি যে, আমার প্রতিপালকের ইবাদত করে বঞ্চিত হব না।

৪৯. অনন্তর যখন তিনি তাদের এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করে তাদের হতে পৃথক হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব; এবং আমি প্রত্যেককে নবী করলাম।	فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۙ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾
৫০. আর আমি তাঁদের সকলকে আমার রহমতের অংশ দান করলাম এবং আমি তাঁদের নাম– নেক ও সমুন্নত করে দিলাম।	وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾
৫১. আর আপনি বর্ণনা করুন এ কিতাবে মূসার [ঘটনা]-ও, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার বিশিষ্ট [বান্দা] ছিলেন এবং তিনি রাসূলও ছিলেন, নবীও ছিলেন।	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৯. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ অনন্তর যখন তিনি তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করে তাদের থেকে وَهَبْنَا لَهُ, তখন আমি তাকে দান করলাম إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ইসহাক ও ইয়াকূব وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, এবং আমি প্রত্যেককে নবী করলাম।

৫০. وَوَهَبْنَا لَهُمْ আর আমি তাদের সকলকে দান করলাম مِنْ رَحْمَتِنَا আর রহমতের অংশ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا এবং আমি তাদের নাম নেক ও সমুন্নত করে দিলাম।

৫১. وَاذْكُرْ,আর আপনি বর্ণনা করুন فِي الْكِتَابِ এই কিতাবে مُوسَىٰ মূসার (ঘটনা) ও إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট (বান্দা) ছিলেন وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, এবং তিনি রাসূলও ছিলেন নবীও ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَوْمَ الْحَسْرَةِ কেয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত, কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আজাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জান্নাতীদেরও হবে। হযরত মু'আযের রেওয়ায়েতে তাবারানী ও আবূ ই'য়ালা বর্ণিত হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : যেসব মুহূর্ত আল্লাহর জিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্য পরিতাপ করা ছাড়া জান্নাতীদের আর কোনো পরিতাপ হবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে বগভী বর্ণিত হাসীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন এই পরিতাপ কিসের কারণে হবে? তিনি বললেন : সৎকর্মশীলদের পরিতাপ হবে এই যে, তারা আরও বেশি সৎকর্ম কেন করল না, যাতে জান্নাতের আরও উচ্চস্তর অর্জিত হতো। পক্ষান্তরে কুকর্মীরা পরিতাপ করবে যে, তারা কুকর্ম থেকে কেন বিরত হলো না।

সিদ্দীক কাকে বলে? صِدِّيقًا نَبِيًّا - صِدِّيْق শব্দটি কুরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে আলেমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন : যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, তিনি সিদ্দীক। কেউ বলেন : যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী। অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস পোষণ করে, মুখে ঠিক তদ্রূপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও উঠা বসা এই বিশ্বাসের প্রতীক হয়, সে সিদ্দীক। রুহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি গ্রন্থে শেষোক্ত অর্থই অবলম্বন করা হয়েছে। সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিদ্দীক নবী রাসূলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও রাসূলের জন্য সিদ্দীক হওয়া একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীতে যিনি সিদ্দীক হন, তাঁর জন্য নবী ও রাসূল হওয়া জরুরি নয়। বরং নবী নয়– এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রাসূলের অনুরসণ করে সিদ্দীকের স্তর অর্জন করতে পারেন, তবে তিনিও সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন। হযরত মারইয়ামকে স্বয়ং কুরআন পাক 'সিদ্দীক' (وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ) উপাধি দান করেছে। সাধারণ উম্মতের সংখ্যাধিক্যের মতো তিনি নবী নন এবং কোনো নারী নবী হতেও পারেন না।

বড়দেরকে নসিহত করার পন্থা ও আদব : يَٰٓأَبَتِ আরবি অভিধানের দিক দিয়ে এ শব্দটি পিতার জন্য সম্মান ও ভালোবাসাসূচক সম্বোধন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলা সর্বগুণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা মেজাযের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শিরকে শুধু লিপ্তই নয়-এর উদ্যোক্তা রূপেও দেখেন। এই কুফর ও শিরক মিটানোর জন্যই তিনি সৃজিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহত্ত্ব ও ভালোবাসা। এ দু'টি বিপরীতমুখী বিষয় হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) চমৎকারভাবে সমন্বিত করেছেন।

يَٰٓأَبَتِ শব্দটি পিতার দয়া ও ভালোবাসার প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এরপর কোনো বাক্যে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করেননি, যা পিতার অবমাননা, অথবা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত; অর্থাৎ পিতাকে 'কাফের' গোমরাহ' ইত্যাদি বলেননি, বরং পয়গম্বরসুলভ প্রজ্ঞার সাথে শুধু তার দেব দেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত নবুয়তের জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কুফর ও শিরকের সম্ভাব্য অশুভ পরিণতি সম্পর্কে পিতাকে হুশিয়ার করেছেন। এরপরও পিতা চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল। হযরত খলীলুল্লাহ يَٰٓأَبَتِ বলে মিষ্ট ভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় يَابُنَيَّ (হে বৎস) প্রয়োগ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু আযর তাঁর নাম নিয়ে يَا إِبْرَاهِيمُ বলে সম্বোধন করল।

অতঃপর তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এক্ষেত্রে হযরত খলীলুল্লাহ এর কি জওয়াব দেন, তা শোনা ও স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন :

سَلَٰمٌ عَلَيْكَ এখানে سَلَامٌ শব্দটি দ্বিবিধ অর্থের জন্য হতে পারে। (এক) বয়কটের সালাম; অর্থাৎ কারও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভদ্রজনোচিত পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে সালাম বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। কুরআন পাক আল্লাহর প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলে :

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَٰهِلُونَ قَالُوا سَلَٰمًا অর্থাৎ মূর্খরা যখন তাদের সাথে মূর্খসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাঁরা মোকাবিলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। (দুই), এখানে প্রচলিত সালামই বোঝানো হয়েছে। এতে আইনগত খটকা এই যে, কোনো কাফেরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন لَا تَبْدَؤُا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ অর্থাৎ খ্রিস্টান ও ইহুদিদের প্রথমে সালাম করো না।' কিন্তু এর বিপরীতে কোনো কোনো হাদীসে কাফের, মুশরিক ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত উসামার রেওয়ায়েতে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এ কারণেই কাফিরকে সালাম করার বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ফিকহ্‌বিদগণ মতভেদ করেছেন। কোনো কোনো সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামের কথা ও কার্য দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং কারও কারও কথা ও কার্য দ্বারা অবৈধতা বোঝা যায়। কুরতুবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম নাখঈর সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কোনো কাফের ইহুদি ও খ্রিস্টানের সাথে দেখা করার ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাকে প্রথমে সালাম করায় দোষ নেই। বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এভাবে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায়।– (কুরতুবী)

سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي : এখানেও উপরিউক্ত খটকা বিদ্যমান রয়েছে যে, কোনো কাফেরের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরিয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ। একবার রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর চাচা আবূ তালেবকে বলেছিলেন : وَاللّٰهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ أُنْهَ عَنْهُ 'আল্লাহর কসম, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়।' এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয় :- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ অর্থাৎ নবী ও ঈমানদারদের মুশরিকদের জন্য ইস্তেগফার করা বৈধ নয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচার জন্য ইস্তেগফার পরিত্যাগ করেন। খটকার জওয়াব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর পিতার সাথে ওয়াদা করা যে, আপনার জন্য ইস্তেগফার করব– এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়। সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করে এ বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন। إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ সূরা তওবার مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا আয়াতের পরবর্তী আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا

تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ এ থেকে জানা যায় যে, এই ইস্তেগফার ও ওয়াদা পিতার কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আল্লাহর শত্রু প্রমাণিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। এই সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি ইস্তেগফার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي : একদিকে তো হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) পিতার আদব ও মহব্বতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে; অপরদিকে সত্য-প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কলঙ্কিত হতে দেননি। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে আদেশ পিতা দিয়েছেন, আলোচ্য বাক্যে তা তিনি সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, আমি তোমার দেব দেবীকে ঘৃণা করি এবং শুধু আমার পালনকর্তার ইবাদত করি।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

পূর্ববর্তী বাক্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হব না। বাহ্যত এখানে গৃহও পরিবার ত্যাগ করার পর নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া বোঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন আল্লাহর জন্য নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেব দেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও 'ইয়াকূব ' (পৌত্র) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। পুত্র দান থেকে বোঝা যায় যে, ইতঃপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

كَانَ مُخْلَصًا : আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তিকে নিজের জন্য খাঁটি করে নেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অপর কোনো কিছুর দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না এবং নিজের সমস্ত কামনা -বাসনাকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে দেয়, তাকে مُخْلَص বলা হয়। পয়গম্বরগণই বিশেষভাবে এ গুণে গুণান্বিত হন, যেমন -কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে : إِنَّا أَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ অর্থাৎ আমি পয়গম্বরদেরকে পরকাল স্মরণ করার কাজের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছি। উম্মতের মধ্যে যেসব কামেল পুরুষ পয়গম্বরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তারাও আংশিকভাবে এই মর্তবা লাভও করেন। এর আলামত এই যে, তাঁদেরকে গোনাহ ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয় এবং তারা আল্লাহর হেফাজতে থাকেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَنْذِرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَال মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ- আপনি ভয় প্রদর্শন করুন।

يُرْجَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার رُجُوْعٌ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ- তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।

لَمْ يَأْتِكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- আপনার নিকট আসেনি।

لَمْ تَنْتَهِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اِنْتِهَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ-তুমি নিবৃত্ত না হও।

لَأَرْجُمَنَّكَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার رَجْمٌ মূলবর্ণ (ر - ج - م) জিনস صحيح অর্থ- আমি অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলব।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا : এখানে واو টি হলো استئنافية আর اُذْكُرْ হলো ফে'ল তন্মধ্যস্থ উহ্য انت হলো ফায়েল আর اِبْرٰهِيْمَ হলো مفعول به আর فِى الْكِتٰبِ হলো اُذْكُرْ -এর সাথে متعلق আর اِنَّهُ -এর اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর ه হলো اسم اِنَّ আর كَانَ হলো خَبَر اِنَّ আর كَانَ হলো ফে'লে নাকেস আর তার উহ্য যমীর হলো اسم كان আর صِدِّيْقًا হলো كَانَ -এর প্রথম খবর আর نَبِيًّا হলো كَانَ - এর দ্বিতীয় খবর।

-[ইরাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০৭-৬০৮]

৫২. আর আমি তাঁকে তূর পর্বতের ডান পার্শ্ব হতে আহ্বান করলাম এবং আমি তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে তাঁকে স্বীয় সান্নিধ্য প্রদান করলাম।	وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾
৫৩. আর আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর ভ্রাতা হারূনকে নবী বানিয়ে তাঁকে দান করলাম।	وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾
৫৪. আর আপনি বর্ণনা করুন এ কিতাবে ইসমাঈলেরও, নিঃসন্দেহে তিনি অঙ্গীকারে সত্যপরায়ণ ছিলেন এবং তিনি রাসূলও ছিলেন, নবীও ছিলেন,	وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾
৫৫. আর তিনি আপন সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে নামাজ ও জাকাতের আদেশ করতেন, এবং তিনি নিজ পরওয়ারদেগারের সমীপে পছন্দনীয় ছিলেন।	وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾
৫৬. আর আপনি বর্ণনা করুন এ কিতাবে ইদরীসেরও, নিশ্চয় তিনি অতি সত্যনিষ্ঠ নবী ছিলেন।	وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾
৫৭. আমি তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম।	وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. وَنَادَيْنٰهُ আর আমি তাঁকে আহবান করলাম مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ তূর পর্বতের ডান পার্শ্ব হতে وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا এবং আমি তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে তাকে স্বীয় সান্নিধ্য প্রদান করলাম।

৫৩. وَوَهَبْنَا لَهٗ আর আমি তাঁকে দান করলাম مِنْ رَّحْمَتِنَآ স্বীয় অনুগ্রহে اَخَاهُ هٰرُوْنَ তাঁর ভ্রাতা হারূনকে نَبِيًّا নবী বানিয়ে।

৫৪. وَاذْكُرْ আর আপনি বর্ণনা করুন فِى الْكِتٰبِ এই কিতাবে اِسْمٰعِيْلَ ইসমাঈলেরও اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ নিঃসন্দেহে তিনি অঙ্গীকারে সত্যপরায়ণ ছিলেন وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا এবং তিনি রাসূলও ছিলেন, নবীও ছিলেন।

৫৫. وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ আর তিনি আপন সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে আদেশ করতেন بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ নামাজ ও জাকাতের وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا এবং তিনি নিজ পরওয়ারদেগারের সমীপে পছন্দনীয় ছিলেন।

৫৬. وَاذْكُرْ আর আপনি বর্ণনা করুন فِى الْكِتٰبِ এই কিতাবে اِدْرِيْسَ ইদরীসেরও اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا নিশ্চয় তিনি অতি সত্যনিষ্ঠ নবী ছিলেন।

৫৭. وَرَفَعْنٰهُ আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম مَكَانًا عَلِيًّا উচ্চ মর্যাদায়।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

৫৮. এরা ঐ সকল লোক যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অনুগৃহীত করেছেন, তাঁরা সকলেই নবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আদমের বংশধর হতে এবং তাঁদের কতক ছিলেন সে লোকদের বংশ হতে যাঁদেরকে আমি নূহের সাথে [নৌকায়] আরোহণ করিয়েছিলাম, আর [কতক ছিলেন] ইবরাহীম ও ইয়াকূবের বংশধর হতে, আর সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁদেরকে আমি হেদায়েত দান করেছিলাম এবং নির্বাচিত করেছিলাম; যখন তাঁদের সম্মুখে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন তাঁরা সেজদায় পড়ে যেতেন এবং কাঁদতে থাকতেন।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

৫৯. অনন্তর তাঁদের পরে এমন নালায়েক লোক জন্মিল যারা নামাজ বিনষ্ট করে দিল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল, সুতরাং তারা শীঘ্রই বিপদ দেখবে,

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

৬০. অবশ্য যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, বস্তুত তারা বেহেশতে যাবে এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না।

جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾

৬১. চির অবস্থানের সে উদ্যানসমূহে, আল্লাহ যার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন আপন বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে; তাঁর প্রতিশ্রুত বস্তুতে এরা অবশ্যই পৌঁছবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ এরা ঐ সকল লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অনুগৃহীত করেছেন مِنَ النَّبِيِّينَ তাঁরা সকলেই নবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ আদমের বংশধর হতে وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ, আর তাঁদের কতক ছিলেন সেই লোকদের বংশ হতে যাঁদেরকে আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ, আর (কতক ছিলেন) ইবরাহীম ও ইয়াকূবের বংশধর হতে وَمِمَّنْ هَدَيْنَا আর সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আমি হেদায়েত দান করেছিলাম وَاجْتَبَيْنَا, এবং নির্বাচিত করেছিলাম إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ যখন তাঁদের সম্মুখে পাঠ করা হতো آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ خَرُّوا سُجَّدًا তখন তাঁরা সেজদায় পড়ে যেতেন وَبُكِيًّا এবং কাঁদতে থাকতেন।

৫৯. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ অনন্তর তাদের পরে এমন নালায়েক লোক জন্মিল أَضَاعُوا الصَّلَاةَ যারা নামাজ বিনষ্ট করে দিল وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا সুতরাং তারা শীঘ্রই বিপদ দেখবে।

৬০. إِلَّا مَنْ تَابَ অবশ্য যারা তওবা করেছে وَآمَنَ, এবং ঈমান আনয়ন করেছে وَعَمِلَ صَالِحًا, এবং নেক কাজ করেছে فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ বস্তুত তারা জান্নাতে যাবে وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا, এবং তাদের উপর সামান্যতমও জুলুম করা হবে না।

৬১. جَنَّاتِ عَدْنٍ চির অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহে الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ আল্লাহ যার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন عِبَادَهُ আপন বান্দাদেরকে بِالْغَيْبِ অদৃশ্যভাবে إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا তার প্রতিশ্রুত বস্তুতে এরা অবশ্যই পৌঁছবে।

৬২. সেখানে তারা সালাম ব্যতীত কোনো অযথা কথাই শুনতে পাবে না: এবং সেখানে তারা তাদের খাদ্য সকালে ও সন্ধ্যায় পেতে থাকবে।	لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٦٢﴾
৬৩. এটা সেই বেহেশত- যার মালিক আমার এমন বান্দাগণকে করে দেব যারা আল্লাহকে ভয় করে।	تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬২. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا সেখানে তারা শুনতে পাবেনা لَغْوًا কোনো অযথা কথাই إِلَّا سَلَامًا সালাম ব্যতীত وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا এবং সেখানে তাঁরা তাদের খাদ্য পেতে থাকবে بُكْرَةً وَعَشِيًّا সকালে ও সন্ধ্যায়।

৬৩. تِلْكَ الْجَنَّةُ এটা সেই বেহেশত الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا যার মালিক আমার এমন বান্দাগণকে করে দেব مَنْ كَانَ تَقِيًّا যারা আল্লাহকে ভয় করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩)

শানে নুযূল- ১ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর মতে আলোচ্য আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মুকাতিল বলেন যে, আলোচ্য আয়াত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সুদ্দীর বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত উম্মতে মুহাম্মদীর একশ্রেণির মানুষ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা তাদের সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা মৃত্যুবরণ করার পর জেনা ও ব্যভিচারি প্রতিযোগিতায় লেগে যাবে। একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।

শানে নুযূল- ২ : মুজাহিদ, কাতাদা, আতা, মুহাম্মদ ইবনে কা'আব আল কুরাযী ও ওহাব হতে বর্ণিত। তারা বলেন, যারা মদ্যপায়ী হয়ে যাবে। যারা নামাজ ও জিকরুল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়বে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলবে। এ সকল মানুষ ও মানুষের চরিত্র সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[বাহরে মুহীত্ব ১৮৯/৬, ফাতহুল কাদীর ৩৩৯/৩]

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (٦٢)

শানে নুযূল : ইবনুল মুনযির ইয়াহইয়া ইবনে কাছীরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আরবদের জন্য এক বেলা খাবার অভ্যাসগত ছিল। তবে যদি কেউ দু'বেলা খেয়ে নিত, তখন তাকে فُلَانٌ الْمُنَاعِمُ পরিতৃপ্ত জীবন ধারণকারী বলে সম্বোধন করা হতো। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ১১২/১৬/৮]

مِنْ جَانِبِ الطُّورِ : এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি মিসর ও মাদাইনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এ নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন।

الْأَيْمَنِ : তূর পাহাড়ের ডানদিক হযরত মূসা (আ.)-এর দিক হিসাব বলা হয়েছে। কেননা তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তূর পর্বতের বিপরীত দিকে পৌঁছার পর তূর পাহাড় তাঁর ডান দিকে ছিল।

نَجِيًّا : কানাকানি ও বিশেষ কথাবার্তাকে مُنَاجَاتٌ এবং যার সাথে এরূপ কথাবার্তা হয়, তাকে نَجِيٌّ বলা হয়।

هِبَةٌ : وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ শব্দের অর্থ দান। হযরত মূসা (আ.) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যের জন্য হারূনকেও নবী করা হোক। এই দোয়া কবুল করা হয়। আয়াতে وَوَهَبْنَا বলে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি মূসাকে 'হারূন' দান করেছি। একারণেই হযরত হারূন (আ.) -কে هِبَةُ اللهِ (আল্লাহর দান)- ও বলা হয়। [- মাযহারী]

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ বাহ্যত এখানে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আ.)-কেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা ইবরাহীম ও ভ্রাতা ইসহাকের সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং মাঝখানে হযরত মূসা (আ.)-এর কথা উল্লেখ করার পর তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তাঁর কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণকালের ক্রম অনুসারে পয়গম্বরদের উল্লেখ করা হয়নি কেননা হযরত ইদরীস (আ.)-এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিনি সবার অগ্রে।

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ : ওয়াদা পূরণ করা একটি চারিত্রিক গুণ। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একে জরুরি মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর লক্ষণ বলা হয়েছে। এজন্যই আল্লাহর প্রত্যেক নবী ও রাসূলই ওয়াদা পালনে অবিচল ছিলেন; কিন্তু এই বর্ণনার পরম্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এই গুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই, বরং এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর মধ্যে এই গুণটি একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণত এইমাত্র হযরত মূসা (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ এ গুণটিও সব পয়গম্বরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মূসা (আ.) বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন, তাই তাঁর আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাঈল (আ.)- এর স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহর সাথে কিংবা কোনো বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্ন সহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাইয়ের জন্য পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে এক স্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু লোকটি সময়মতো আগমন না করায় তিনি সেখানে তিন দিন এবং কোনো রেওয়ায়েত মতে এক বছর অপেক্ষা করতে থাকেন। (মাযহারী) ইবনে উবাই-এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীতে মহানবী ﷺ প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সে স্থানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে। [কুরতুবী]

ওয়াদাপূরণ করার গুরুত্ব ও মর্তবা : ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মনীষীদের বিশেষ গুণ এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন العدة دين ওয়াদা একটি ঋণ। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করা যেমন, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্নবান হওয়াও জরুরি। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে : মুমিনের ওয়াদা ওয়াজিব।

ফিকহবিদগণ বলেছেন : ওয়াদার ঋণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এই যে, শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা গোনাহ। কিন্তু ওয়াদা এমন ঋণ নয় যে, তজ্জন্যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিংবা জবরদস্তি আদায় করা যায়। ফিকহবিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মত : ওয়াজিব -বিচারে নয়। -(কুরতুবী)

পরিবার-পরিজন থেকে সংস্কার কাজ শুরু করা সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য :

وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ : হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর আরও একটি বিশেষ গুণ এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার পরিজনকে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দিতেন। এখানে প্রশ্ন হলো যে পরিবার পরিজনকে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দেওয়া হতো প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের দায়িত্বে ওয়াজিব। কুরআন পাকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে : قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর বৈশিষ্ট্য কি? জওয়াব এই যে, বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে সব মুসলমানের করণীয়, কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.) এ কাজের জন্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ও সর্বপ্রযত্নে চেষ্টিত ছিলেন, যেমন মহানবী ﷺ -এর প্রতিও বিশেষ নির্দেশ ছিল যে, وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দেরকে আল্লাহর আজাব সম্পর্কে সতর্ক করুন। এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে একত্রিত করে বিশেষ ভাষণ দেন।

এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গম্বরগণ সবাই সমগ্র জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়েছেন, খোদায়ী নির্দেশের অনুগামী করেছেন। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ কি? জওয়াব এই যে, পয়গম্বরগণের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হেদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হেদায়েত মেনে নেওয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাশোনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন কোনো বিশেষ রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা হচ্ছে, একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক ভালো অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশের চাইতে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে।

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ : হযরত ইদরীস (আ.) হযরত নূহ (আ.) এর এক হাজার বছর পূর্বে তাঁর পিতৃপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। (মুস্তাদরাক হাকিম) হযরত আদম (আ.)-এর পর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ত্রিশটি সহীফা নাজিল করেন। (যমখশারী) হযরত ইদরীস (আ.) সর্বপ্রথম মানব যাকে মু'জিযা হিসাবে জ্যোতিবিজ্ঞান ও অংক বিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। (বাহরে মুহীত) তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বস্ত্র সেলাই আবিষ্কার করেন। তার পূর্বে মানুষ সাধারণত পোশাকের স্থলে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতি ও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্র -শাস্ত্রের আবিষ্কার তার আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন। –(বাহরে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, রূহুল মা'আনী)

وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا : অর্থাৎ আমি ইদরীস (আ.) কে উচ্চ মর্তবায়ে সমুন্নত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুয়ত, রিসালাত ও নৈকট্যের বিশেষ মর্তবা দান করা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ইদরীস (আ.) কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাছীর বলেন :

অর্থাৎ এটা কা'ব আহবারের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এর কোনো কোনোটি বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা স্বীকৃত নয়। কুরআন পাকের আলোচ্য বাক্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না যে, এখানে মর্তবা উচ্চ করা বোঝানো হয়েছে, না জীবিত অবস্থায় তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়া বোঝানো হয়েছে। কাজেই আকাশে তুলে নেওয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাট্য নয়। কুরআনের তাফসীর এর উপর নির্ভরশীল নয়। -[বয়ানুল কুরআন]

রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক : বয়ানুল কুরআন থেকে উদ্ধৃতি : রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উম্মতের কাছে নতুন শরিয়ত প্রচার করেন, তিনি রাসূল। এখন শরিয়ত টি স্বয়ং রাসূলের দিক দিয়ে নতুন হোক, যেমন তাওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উম্মতের দিক দিয়েই নতুন হোক, যেমন হযরত ইসমাঈল (আ.) শরিয়ত, এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর প্রাচীন শরিয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহুম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ শরিয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত না হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর মাধ্যমে তারা এ শরিয়ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রাসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরি নয়, যেমন ফেরেশতা রাসূল, কিন্তু নবী নন। অথবা যেমন - হযরত ঈসা (আ.) -এর প্রেরিত দূত। আয়াতে তাদেরকে اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ বলা হয়েছে, অথচ তাঁরা নবী ছিলেন না।

যার কাছে ওহী আগমন করে, তিনি নবী; তিনি নতুন শরিয়ত প্রচার করুন কিংবা প্রাচীন শরিয়ত। উদাহরণত বনী - ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী হযরত মূসা (আ.) এর শরিয়ত প্রচার করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রাসূল শব্দটি নবী শব্দের চাইতে ব্যাপক এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রাসূল শব্দের চাইতে ব্যাপক। যে আয়াতে উভয় শব্দ একক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন উল্লিখিত আয়াতসমূহে رَسُوْلًا نَّبِيًّا বলা হয়েছে; সেখানে কোনো খটকা নেই। কেননা বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ অযৌক্তিক নয়; কিন্তু যেখানে উভয় শব্দ পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ বাক্যে বলা হয়েছে; সেখানে স্থানের ইঙ্গিতে নবীর অর্থ হবে এমন ব্যক্তি যিনি, পূর্ববর্তী শরিয়ত প্রচার করেন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ : এখানে শুধু হযরত ইদরীস (আ.) কে বোঝানো হয়েছে. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ এখানে শুধু হযরত ইবরাহীম (আ.) কে বোঝানো হয়েছে. وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ এখানে ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে এবং وَإِسْرَائِيلَ এখানে হযরত মূসা, হারুন, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ.) -কে বোঝানো হয়েছে।

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন প্রধান পয়গম্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির আশঙ্কা ছিল, যেমন ইহুদিরা হযরত ওযায়েরকে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহ-ই বানিয়ে দিয়েছে, তাই এই সমষ্টির পর তারা যে আল্লাহর সামনে সিজদাকারী এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত ছিলেন একথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়িও না হয় এবং অবমাননাও না হয়।-(বয়ানুল-কুরআন)

কুরআন তেলাওয়াতের সময় কান্না অর্থাৎ অশ্রুসজল হওয়া পয়গম্বরদের সুন্নত : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং পয়গম্বরদের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও ওলী-আল্লাহদের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

কুরতুবী বলেন : কুরআন পাকে সেজদার যে আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তার সাথে মিল রেখে সেজদায় দোয়া করা আলেমগণের মতে মোস্তাহাব। উদাহরণত সূরা সিজদায় এই দোয়া করা উচিত :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ لِوَجْهِكَ الْمُسَبِّحِيْنَ بِحَمْدِكَ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ عَنْ اَمْرِكَ

সূরা বনী ইসরাঈলের সেজদায় এরূপ দোয়া করা উচিত :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْبَاكِيْنَ اِلَيْكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ

আলোচ্য আয়াতের সিজদায় নিম্নরূপ দোয়া করা দরকার :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الْمُنْعِمِ عَلَيْهِمُ الْمَهْدِيِّيْنَ السَّاجِدِيْنَ لَكَ الْبَاكِيْنَ عِنْدَ تِلَاوَةِ اٰيَاتِكَ-

خَلْفٌ : লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসুরি, মন্দ সন্তান-সন্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসুরি এবং উত্তম সন্তান-সন্ততি। (মাযহারী) মুজাহিদ বলেন : কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন এরূপ ঘটনা ঘটবে। তখন নামাজের প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না এবং প্রকাশ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে।

নামাজ অসময়ে অথবা জামাত ছাড়া পড়া নামাজ নষ্ট করার শামিল এবং বড় গোনাহ :

আয়াতে' নামাজ নষ্ট করা' বলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, নখয়ী, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) প্রমুখ বিশিষ্ট তাফসীরবিদের মতে, সময় চলে যাওয়ার পর নামাজ পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ বলেন : সময়সহ নামাজের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনোটিতে ত্রুটি করা নামাজ নষ্ট করার শামিল। আবার, কারো কারো মতে 'নামাজ নষ্ট করা বলে জামাত ছাড়া নিজ গৃহে নামাজ পড়া, বোঝানো হয়েছে।-(কুরতুবী, বাহরে মুহীত)

খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) সকল সরকারি কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন :

اِنَّ اَهَمَّ اَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلٰوةُ فَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ

'আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামাজ নষ্ট করে, সে দীনের অন্যান্য বিধি-বিধান আরও বেশি নষ্ট করবে। -(মুয়াত্তা মালেক)

হযরত হুযায়ফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে সে নামাজের আদব ও রোকন ঠিকমতো পালন করছেন না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কবে থেকে এভাবে নামাজ পড়ছ। লোকটি বলল : চল্লিশ বছর ধরে। হযরত হুযায়ফা (রা.) বললেন : তুমি একটি নামাজও পড়নি। যদি এ ধরনের নামাজ পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আনীত আদর্শের বিপরীত তোমার মৃত্যু হবে।

তিরমিযীতে হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত বাচনিক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : ঐ ব্যক্তির নামাজ হয় না, যে নামাজে 'একামত' করে না। অর্থাৎ যে, ব্যক্তি রুকু ও সেজদায়, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সেজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার নামাজ হয় না।

মোটকথা এই যে, যে ব্যক্তি অজুতে ত্রুটি করে অথবা নামাজের রুকু-সেজদায় তড়িঘড়ি করে, ফলে রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ায় না কিংবা দুই সেজদার মধ্যস্থলে সোজা হয়ে বসে না, সে নামাজকে নষ্ট করে দেয়।

হযরত হাসান (রা.) নামাজ নষ্টকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে বলেন : লোকেরা মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবং, শিল্প, বাণিজ্য ও কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

ইমাম কুরতুবী এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন : আজ জ্ঞানী ও সুধী সমাজের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যারা নামাজের আদব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধু উঠাবসা করে। এটা ছিল ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর অবস্থা। তখন এ ধরনের লোক কদাচিৎ পাওয়া যেত। আজ নামাজিদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে,

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ

وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ : شَهَوَاتٌ (কুপ্রবৃত্তি) বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে গাফেল করে দেয়। হযরত আলী (রা.) বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লিখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।-(কুরতুবী)

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا : আরবি ভাষায় غَيّ শব্দটি رَشَاد এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رَشَاد এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে غَيّ বলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : 'গাই' জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চাইতে অধিক নানা রকম আজাবের সমাবেশ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : 'গাই জাহান্নামের একটি গুহার নাম। জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা যাদের জন্য এই গুহা প্রস্তুত করেছেন তারা হচ্ছে, যে জেনাকার জেনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে মদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে সুদখোর সুদ গ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে। -[কুরতুবী]

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا : لَغْو বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা, গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসীগণ এ থেকে পবিত্র থাকবে। কোনোরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না।

اِلَّا سَلٰمًا : এটা পূর্ববাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথাই শোনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে। -[কুরতুবী]

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا : জান্নাতে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদা-সর্বদা এক প্রকার আলো বিকীর্যমাণ থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন, রাত্রি ও সকাল -সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই রকম সকাল -সন্ধ্যায় জান্নাতবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবে। একথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতীগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে। যেমন এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে : وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ

এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল -সন্ধ্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল - সন্ধ্যায় আহারে অভ্যস্ত। আরবরা বলে : যে ব্যক্তি সকাল -সন্ধ্যায় পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন : এ থেকে বোঝা যায় যে, মুমিনদের আহার দিনে দু'বার হয়- সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : আয়াতে সকাল -সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোঝানো হয়েছে, যেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব - পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খাহেশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সদাসর্বদা উপস্থিত থাকবে وَاللّٰهُ اَعْلَمُ।-(কুরতুবী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَادَيْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُنَادَاةٌ মূলবর্ণ (ن - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- আমি তাকে আহবান করলাম।

قَرَّبْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيل মাসদার تَقْرِيْب মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ- আমি তাকে সান্নিধ্য প্রদান করলাম।

مَرْضِيًّا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব سَمِعَ মাসদার رِضًى، رِضْوَانٌ মূলবর্ণ (ر - ض - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- পছন্দনীয়

اِجْتَبَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِجْتِبَاءٌ মূলবর্ণ (ج - ب - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– নির্বাচিত করেছিলাম।

تُتْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- পাঠ করা হতো।

اَضَاعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِضَاعَةٌ মূলবর্ণ (ض - ى - ع) জিনস اجوف يائى অর্থ- যারা বিনষ্ট করে দিল

يَلْقَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার لَقْيٌ ও لِقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা দেখবে/সাক্ষাৎ করবে।

تَابَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার تَوْبَةٌ মূলবর্ণ (ت - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- সে তওবা করেছে।

يَدْخُلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُخُوْلٌ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ- তারা যাবে, তারা প্রবেশ করবে।

لَا يُظْلَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার ظُلْمٌ মূলবর্ণ (ظ - ل - م) জিনস صحيح অর্থ- তাদের উপর জুলুম করা হবে না।

نُوْرِثُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْرَاثٌ মূলবর্ণ (و - ر - ث) জিনস مثال واوى অর্থ- আমি মালিক করে দেই, উত্তরাধিকার বানানো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا : وَنَادَيْنٰهُ এখানে পূর্বের উপর আতফ হয়েছে যা ফে'ল ফায়েল ও مفعول به এর সমন্বয়ে গঠিত وَمِنْ جَانِبِ হলো نَادَيْنٰهُ-এর সাথে متعلق আর الطُّوْرِ হলো جَانِبِ এর মুযাফ ইলাইহি আর اَيْمَنِ হলো جَانِبِ-এর সিফত। কারণ মাদইয়ান থেকে প্রস্থানকালে তূর পর্বত হযরত মূসা (আ.)-এর ডান পার্শ্বে পড়েছিল। وَقَرَّبْنٰهُ হলো نَادَيْنٰهُ এর উপর আতফ, আর نَجِيًّا হলো نَادَيْنٰهُ বা قَرَّبْنٰهُ যমীর থেকে حال আর এটা فعيل ওযনে فاعل -এর অর্থে হয়েছে অর্থাৎ مُنَاجِيًا –[ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬১৯]

৬৪. এবং আমরা [ফেরেশতারা] আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত বার বার আসতে পারি না, তাঁরই জন্য রয়েছে–যা কিছু আমাদের সম্মুখে আছে এবং যা কিছু আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে, আর আপনার প্রতিপালক ভুলে যান– এমন নন।	وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾
৬৫. তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের প্রতিপালক এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যে আছে, সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে কায়েম থাক; তুমি কি কাউকেও তাঁর সমগুণসম্পন্ন মনে কর?	رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ۭ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾
৬৬. আর মানুষ এরূপ বলে যে, যখন আমি মরে যাব, তখন কি পুনরায় জীবিত করে বের করা হবে?	وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾
৬৭. মানুষ কি এ কথা বুঝে না যে, ইতঃপূর্বে আমিই তাকে অস্তিত্ব দান করেছি অথচ সে কিছুই ছিল না।	اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾
৬৮. তবে আপনার প্রতিপালকের শপথ! আমি তাদেরকেও একত্র করব, আর শয়তানদেরকেও, অতঃপর আমি অবশ্যই তাদেরকে দোজখের চারপাশে নতজানু অবস্থায় সমবেত করব।	فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৪. وَمَا نَتَنَزَّلُ এবং আমরা বার বার আসতে পারিনা اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত لَهٗ তারই জন্য রয়েছে مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا যা কিছু আমাদের সম্মুখে আছে وَمَا خَلْفَنَا এবং যা কিছু আমাদের পশ্চাতে আছে وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ যা কিছু এর মধ্যে আছে وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا আর আপনার প্রতিপালক ভুলে যান– এমন নন।

৬৫. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের প্রতিপালক وَمَا بَيْنَهُمَا এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যে আছে فَاعْبُدْهُ সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত কর وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ এবং তাঁর ইবাদতে কায়েম থাক هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا তুমি কি কাউকেও তার সমগুণসম্পন্ন মনে কর?

৬৬. وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ আর মানুষ এরূপ বলে যে ءَاِذَا مَا مِتُّ যখন আমি মরে যাব لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا তখন কি পুনরায় জীবিত করে বের করা হবে?

৬৭. اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ মানুষ কি একথা বুঝে না যে اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ ইতঃপূর্বে আমিই তাকে অস্তিত্ব দান করেছি وَلَمْ يَكُ شَيْئًا অথচ সে কিছুই ছিলনা।

৬৮. فَوَرَبِّكَ আপনার শপথ لَنَحْشُرَنَّهُمْ আমি তাদেরকেও একত্রিক করব وَالشَّيٰطِيْنَ, এবং শয়তানদেরকেও ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ অতঃপর আমি অবশ্যই তাদেরকে সমবেত করব حَوْلَ جَهَنَّمَ দোজখের চারপাশে جِثِيًّا নতজানু অবস্থায়।

৬৯. অনন্তর প্রত্যেক দল হতে সেই লোকদেরকে পৃথক করে ফেলব যারা তাদের মধ্যে আল্লাহর সাথে সবচেয়ে অধিক বিরুদ্ধাচরণ করত।	ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ۚ ﴿٦٩﴾
৭০. আর আমি সে লোকদেরকে ভালোরূপে জানি যারা দোজখে যাবার অধিক উপযোগী।	ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾
৭১. আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই– যে তা অতিক্রম করবে না, এটা আপনার প্রতিপালকের অনিবার্য নির্দেশ যা সম্পন্ন হবেই।	وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۚ ﴿٧١﴾
৭২. অনন্তর আমি সেসব লোককে মুক্ত করে দেব যারা আল্লাহকে ভয় করত এবং অনাচারী লোকদেরকে তাতে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।	ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾
৭৩. আর যখন ঐ সকল লোকদের সম্মুখে আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে কাফেররা মুসলমানদেরকে বলে, [বল দেখি!] উভয় দলের মধ্যে কার বাসস্থান উৎকৃষ্টতর এবং কার মজলিস শ্রেষ্ঠতর?	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا ۙ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৯. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ অনন্তর পৃথক করে ফেলব مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ প্রত্যেক দল হতে সেই লোকদেরকে اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا যারা তাদের মধ্যে আল্লাহর সাথে সবচেয়ে অধিক বিরুদ্ধাচারণ করত।

৭০. ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ আর আমি সেই লোকদেরকে ভালোরূপে জানি هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا যারা দোজখে যাবার অধিক উপযোগী।

৭১. وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তা অতিক্রম করবেনা كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا এটা আপনার প্রতিপালনের অনিবার্য নির্দেশ যা সম্পন্ন হবেই।

৭২. ثُمَّ نُنَجِّي অনন্তর আমি সে সকল লোককে মুক্ত করে দেব الَّذِيْنَ اتَّقَوْا যারা আল্লাহকে ভয় করত وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ এবং অনাচারী লোকদেরকে ছেড়ে দেব فِيْهَا তাতে جِثِيًّا নতজানু অবস্থায়।

৭৩. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ আর যখন ঐ সকল লোকদের সম্মুখে পাঠ করা হয় اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তখন সেই কাফেররা বলে لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মুসলমানদেরকে اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ উভয় দলের মধ্যে কার خَيْرٌ مَّقَامًا বাসস্থান উৎকৃষ্টতর وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا এবং কার মজলিস শ্রেষ্ঠতর।

৭৪. আর আমি তাদের পূর্বে এমন বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যারা আসবাবপত্র ও জাঁকজমকে তাদের চেয়েও উত্তম ছিল।	وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾
৭৫. আপনি বলে দিন যে, যারা গোমরাহীতে আছে, আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকেন, যতক্ষণ না তারা দেখে নেয় তাদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুত বস্তু– শাস্তি কিংবা কিয়ামতকে; তখন তারা জানতে পারবে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল?	قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰۤى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ۗ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৪. وَكَمْ اَهْلَكْنَا আর আমি ধ্বংস করেছি قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ তাদের পূর্বে এমন বহু সম্প্রদায়কে هُمْ اَحْسَنُ যারা তাদের চেয়েও উত্তম ছিল اَثَاثًا وَّرِءْيًا আসবাবপত্র ও জাঁকজমকে।

৭৫. قُلْ আপনি বলে দিন যে مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ যারা গোমরাহীতে আছে فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকেন حَتّٰۤى اِذَا رَاَوْا যতক্ষণ না তারা দেখে নেয় مَا يُوْعَدُوْنَ তাদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুত বস্তু اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ শাস্তি কিংবা কিয়ামতকে فَسَيَعْلَمُوْنَ তখন তারা জানতে পারবে مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট وَّاَضْعَفُ جُنْدًا কে দলবলে দুর্বল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤)

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে রাসূল ﷺ কে যখন আসহাবে কাহফ, যুলনারনাইন ও রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ -এর নিকট আগমন করা থেকে বিরত থাকেন। সুতরাং রাসূল ﷺ কিভাবে তাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন, সে জন্যে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও দুঃখিত হয়ে পড়েন। মুশরিকরা বলতে ছিল যে, মুহাম্মদের প্রতিপালক মুহাম্মদকে ছেড়ে দিয়েছে, তাকে ভুলে গিয়েছে। সুতরাং হযরত জিবরাঈল (আ.)! যখন রাসূল ﷺ -এর নিকট আগমন করেন, তখন রাসূল ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.) কে বললেন, হে জিবরাঈল আমার নিকট আসা বন্ধ করে দিলে এতে তো আমি হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়লাম এবং আমি তোমার অপেক্ষায় অধীর হয়ে থাকলাম। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন যে, আমি তো তদাপেক্ষা অধিক আগ্রহী ছিলাম, তবে আমি হলাম নির্দেশ পালনে কর্তব্যনিষ্ঠ বান্দা। আমাকে যখন পাঠানো হয়, তখন আমি অবতরণ করি। আমাকে যখন আটকে রাখা হয়, তখন আমি আসা থেকে বিরত থাকি। সে প্ররিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত এবং সূরা وَالضُّحٰى নাজিল করেন।

-[রূহুল মা'আনী ১১৩/২৬/১৩, বাহরে মুহীত্ব ১৯১/৬]

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ اَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا (٦٦)

শানে নুযূল– ১ : ইবনুল মুনযির ইবনে জুরাইজের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত আস ইবনে ওয়ায়েল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারো মতে আবূ জাহল সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল -২ : কালবী বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত উবাই বিন খালফ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে, উবাই ইবন খালফ একদা পুরাতন হাড় হাতে নিয়ে হাত দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগল যে, অমুক (মুহাম্মদ) বলে থাকে যে, আমি মৃত্যুবরণ করার পর এমন হয়ে যাওয়ার পরও নাকি পুনরায় জীবিত হব। এমন তো হতে পারে না কখনো। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী ১১৬/২, বাহরে মুহীত্ব ১৯৪/৬]

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا [٧٤]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত নযর ইবনে হারেছ ও তার সাথি-সঙ্গীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনার প্রেক্ষাপট হচ্ছে এই যে, সাহাবীগণ দরিদ্রতার কষাঘাতে পিষ্ট হচ্ছিল। আর মুশরিক সম্প্রদায় পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা পত্রে ভোগ সম্ভারে জীবন যাপন করত। তখন কাফেররা ঈমানদারদেরকে বলল যে, তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে মান-মর্যাদায় কোন দলটি অতি উত্তম হবে বলতো? কারণ তোমরা দরিদ্রতার কষাঘাতে জীবন যাপন করছ ঈমানদারের দাবিদার হয়ে। তোমাদের মতামতে আমরা মুশরিক ও পাপী অথচ আমরা অত্যন্ত আমোদ প্রমোদে জীবন যাপন করছি। তাদের এহেন বিভ্রান্তি ছড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(বাহরে মুহীত্ব ১৯৮/৬)

وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ : এখানে اِصْطِبَارٌ শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে দৃঢ় থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদতের স্থায়িত্ব পরিশ্রম সাপেক্ষ। ইবাদতকারীর এ জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا : এখানে سَمِيٌّ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সমনাম। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে অনেক মানুষ, ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে 'ইলাহ' তথা উপাস্য বলত, কিন্তু কেউ কোনো দিন কোনো মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোনো মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ নামে অভিহিত হয় নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহর কোনো সমনাম নেই।

মুজাহিদ, ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ, ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে এস্থলে سَمِيٌّ শব্দের অর্থ অনুরূপও সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গুণাবলিতে আল্লাহ তা'আলার কোনো সমতুল্য, সমকক্ষ অথবা নজির নেই।

لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ : এখানে وَالشَّيٰطِيْنَ এর وَاوْ টি مَعَ (সহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফেরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেধে উত্থিত করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি হবে শুধু কাফেরদেরকে সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মুমিন ও কাফের ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার মর্মার্থ হবে এই যে, প্রত্যেক কাফের তো তার শয়তানের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই এবং মুমিনগণও এই মাঠে আলাদা থাকবে না, ফলে সবার সাথে শয়তানদের সহঅবস্থান হবে। –(কুরতুবী)

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا : হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মুমিন, কাফের, ভাগ্যবান ও হতভাগা সবাইকে জাহান্নামের চারদিকে সমবেত করা হবে। সবাই ভীতবিহ্বল নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মুমিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশি, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাত লাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ - شِيْعَةٍ শব্দের আসল অর্থ কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। -(মাযহারী)

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا অর্থাৎ জাহান্নামে পৌঁছবে না, এমন কোনো মুমিন ও কাফের থাকবে না। এখানে পৌঁছার অর্থ প্রবেশ নয়-আতিক্রম করা। হযরত ইবনে মাসউদের এক রেওয়ায়েতে مُرُوْر (অতিক্রম করা) শব্দও বর্ণিত রয়েছে। যদি প্রবেশ অর্থ নেওয়া হয়, তবে মুমিন ও পরহেজগারদের প্রবেশ এভাবে হবে যে, জাহান্নাম তাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, তারা কোনোরূপ কষ্ট অনুভব করবে না। হযরত আবূ সুমাইয়ার রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোনো সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন মুমিন ও মুত্তাকীদের জন্য জাহান্নাম শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) এর জন্য নমরুদের অগ্নিকুণ্ডকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর মুমিনদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। আয়াতের পরবর্তী ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا বাক্যের অর্থ তাই। এই বিষয়বস্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আয়াতে যে وُرُوْد শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ প্রবেশ নেওয়া হলেও অতিক্রমের আকারে প্রবেশ হবে তাই কোনো বৈপরীত্য নেই।

خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا : এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাফেররা মুসলমানদের সামনে দু'টি বিষয় উপস্থাপন করেছে। (এক) পার্থিব ধন-দৌলত ও সাজ-সরঞ্জাম এবং (দুই) চাকর-নওকর, দলবল ও পারিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের কাছে বেশি ছিল। এ দু'টি বস্তুই মানুষের জন্যে নেশা হিসাবে কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভালো ভালো জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্মৃতি করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণ গরিমার ফল এবং স্থায়ী শান্তির উপায়রূপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কুরআনি শিক্ষা অনুযায়ী পার্থিব ধন-দৌলত মান সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত গুণ-গরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাথি মনে করে না; সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত ব্যয় করার কাজেও আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোনো সময় গাফেল হয় না। তারাই শুধু পার্থিব ধন -দৌলতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণ: অনেক পয়গম্বর, যেমন হযরত সোলায়মান (আ.) হযরত দাউদ (আ.) এবং অনেক বিত্তশালী সাহাবী, উম্মতের মধ্যকার অনেক ওলী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অতুল বিত্তবৈভব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহ ভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাফেরদের এই বিভ্রান্তি কুরআন পাক এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ায় ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত ও সম্পদ আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোনো ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মূর্খও এগুলোকে জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনের চাইতেও বেশি লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও বেশি ধন- দৌলত স্তূপীকৃত হয়েছে।

চাকর- নওকর, বন্ধু -বান্ধব ও পারিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথমত দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে অর্থাৎ বিপদের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন কোনো কাজে আসে না।

দ্বিতীয়ত : যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিত থাকে, তবুও তা কয়দিনের জন্য? মৃত্যুর মাঠে কেউ কারো সঙ্গী-সাথি হবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَا نَتَنَزَّلُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع منفى بـ ـا বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَنَزُّلٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ- আমরা বার বার আসতে পারি না।

مِتُّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَوْتٌ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি মরে যাব।

لَنَحْشُرَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مستقبل معروف در لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার حَشْرٌ মূলবর্ণ (ح ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- আমি অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে একত্র করব।

لَنُحْضِرَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مستقبل معروف در لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْضَارٌ মূলবর্ণ (ح ـ ض ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে সমবেত করব।

لَنَنْزِعَنَّ : সীগাহ جمع متلكم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله مضارع বাব ضَرَبَ মাসদার نَزْعٌ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- পৃথক করে ফেলব, পৃথক করে ফেলা।

اَشَدُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার شِدَّةٌ মূলবর্ণ (ش ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- সবচেয়ে অধিক, অধিক কঠোর।

مَقْضِيًّا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার قَضَاءٌ মূলবর্ণ (ق ـ ض ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নির্দেশ যা সম্পন্ন হবেই।

فَلْيَمْدُدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَدُّ মূলবর্ণ (م ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- অবকাশ দিতে থাকেন।

يُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার عِدَةٌ، وَعْدٌ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– তাদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুত বস্তু।

اَضْعَفُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার ضُعْفٌ মূলবর্ণ (ض ـ ع ـ ف) জিনস صحيح অর্থ- অধিক দুর্বল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا : এখানে ثُمَّ আতফ যা ترتيب এবং تراخى জন্য হয়েছে, আর لام হলো ابتدائية আর نَحْنُ হলো মুবতাদা هم এবং متعلق এর সাথে اَعْلَمُ টা بِالَّذِيْنَ খবর اَعْلَمُ الخ মুবতাদা হলো اَوْلٰى بِهَا খবর صِلِيًّا শব্দটি কেউ কেউ বলেন تمييز হলো صِلِيًّا আর متعلق এর সাথে اَوْلٰى- এর صال- এর বহুবচন যা حال হিসাবে মানসূব হয়েছে। –(ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩০)

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
৭৬. আর [মুসলমানদের অবস্থা এই যে,] আল্লাহ্ হেদায়েতপ্রাপ্তদেরকে হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন; এবং যে সকল নেক কাজ চিরন্তন থাকবে, তা আপনার প্রতিপালকের সমীপে ছওয়াব হিসেবেও ভালো এবং পরিণাম হিসেবেও ভালো।	وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾
৭৭. আচ্ছা, আপনি কি তাকেও লক্ষ্য করেছেন– যে ব্যক্তি আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করা হবে।	اَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٧٧﴾
৭৮. তবে কি এ ব্যক্তি অদৃশ্য বিষয় জানতে পেরেছে, নাকি আল্লাহ হতে কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?	اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾
৭৯. কখনো নয়; আমি তার উক্তিসমূহ [সঙ্গে সঙ্গে] লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছি এবং আমি তার জন্য শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।	كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾
৮০. আর তার কথিত বস্তুসমূহের মালিক আমিই থাকব এবং সে আমার নিকট একাকী চলে আসবে।	وَّنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَاْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾
৮১. আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য উপাস্য নির্ধারিত করে নিয়েছে, যেন তারা তাদের জন্য সম্মানের উপলক্ষ্য হয়।	وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৬. وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى আর আল্লাহ হেদায়েতপ্রাপ্তদেরকে হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ এবং যে সকল নেক কাজ চিরন্তন থাকবে خَيْرٌ তা ভালো عِنْدَ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের সমীপে ثَوَابًا ছওয়াব হিসেবেও وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا এবং পরিণাম হিসাবেও ভালো।

৭৭. اَفَرَءَيْتَ আচ্ছা, আপনি কি তাকেও লক্ষ্য করেছেন الَّذِي كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا যে ব্যক্তি আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে وَقَالَ এবং বলে لَاُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি প্রদান করা হবে।

৭৮. اَطَّلَعَ الْغَيْبَ তবে কি এ ব্যক্তি অদৃশ্য বিষয় জানতে পেরেছে اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا নাকি আল্লাহ হতে কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?

৭৯. كَلَّا কখনও নয় سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ আমি তার উক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছি وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا এবং আমি তার জন্য শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।

৮০. وَّنَرِثُهُ مَا يَقُولُ আর তার কথিত বস্তুসমূহের মালিক আমিই থাকব وَيَاْتِينَا فَرْدًا এবং সে আমার নিকট একাকী চলে আসবে।

৮১. وَاتَّخَذُوا আর তারা নির্ধারিত করে নিয়েছে مِنْ دُونِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে اٰلِهَةً অন্য উপাস্য لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا যেন তারা তাদের সম্মানের উপলক্ষ্য হয়।

৮২. কখনো নয়; তারা তো এদের উপাসনাই অস্বীকার করে বসবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে।	كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾
৮৩. আপনি কি অবগত নন যে, আমি শয়তানদেরকে কাফেরদের উপর ছেড়ে রেখেছি– তারা তাদেরকে খুব উত্তেজিত করতে থাকে।	اَلَمْ تَرَ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ﴿٨٣﴾
৮৪. অতএব, আপনি তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না; আমি তাদের বিষয়াদি নিজেই হিসাব রাখছি।	فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾
৮৫. যে দিন আমি মুত্তাকীদেরকে করুণাময়ের সমীপে মেহমানরূপে সমবেত করব।	يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾
৮৬. আর পাপীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় দোজখের দিকে তাড়িয়ে নেব।	وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾
৮৭. [সেদিন] করুণাময়ের নিকট অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত কারো সুপারিশ করার অধিকার থাকবে না।	لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾
৮৮. আর এসব লোক বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. كَلَّا কখনো নয় سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ তারা তো এদের উপাসনাই অস্বীকার করে বসবে وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا এবং তাদের জন্য বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে।

৮৩. اَلَمْ تَرَ আপনি কি অবগত নন যে اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ আমি শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি عَلَى الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের উপর تَؤُزُّهُمْ اَزًّا তারা তাদের উত্তেজিত করতে থাকে।

৮৪. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ অতএব আপনি তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا আমি তাদের বিষয়াদি নিজেই হিসাব রাখছি।

৮৫. يَوْمَ যেদিন نَحْشُرُ আমি একত্রিত করব الْمُتَّقِيْنَ মুত্তাকীগণকে اِلَى الرَّحْمٰنِ করুণাময়ের সমীপে। وَفْدًا মেহমানরূপে।

৮৬. وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ আর পাপীদেরকে তাড়িয়ে নেব اِلٰى جَهَنَّمَ দোজখের দিকে। وِرْدًا তৃষ্ণার্ত অবস্থায়।

৮৭. لَا يَمْلِكُوْنَ কারও অধিকার থাকবেনা الشَّفَاعَةَ সুপারিশ করার اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا করুণাময়ের নিকট অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত।

৮৮. وَقَالُوْا আর এ সকল লোক বলে اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ আল্লাহ গ্রহণ করেছেন وَلَدًا সন্তান।

৮৯. তোমরা তো একটি গুরুতর বিষয় উদ্ভাবন করেছ।	لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾
৯০. যদ্দরুন অসম্ভব নয় যে, আসমান ফেটে যাবে, আর জমিন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে উড়ে যাবে এবং পর্বত ভেঙ্গে পড়বে।	تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾
৯১. এ জন্য যে, তারা আল্লাহর প্রতি সন্তানের সম্বন্ধ আরোপ করেছে।	أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾
৯২. অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়।	وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾
৯৩. আসমানসমূহ ও জমিনে যতকিছু আছে, সমস্তই আল্লাহর সমক্ষে দাসরূপে উপস্থিত হয়।	كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾
৯৪. [আর] তিনি সকলকে বেষ্টন করে আছেন এবং সকলকে গণনা করে রাখছেন।	لَقَدْ أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾
৯৫. আর কিয়ামতের দিন তারা সকলে তাঁর সমীপে একাকী উপস্থিত হবে।	وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾
৯৬. নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে, আর নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি [সকলের অন্তরে] মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন।	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৯. لَقَدْ جِئْتُمْ তোমরা তো উদ্ভাবন করেছ شَيْئًا إِدًّا একটি গুরুতর বিষয়।

৯০. تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ যদ্দরুন অসম্ভব নয় যে, আসমান ফেটে যাবে وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ আর জমিন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে উড়ে যাবে وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا এবং পর্বত ভেঙ্গে পড়বে।

৯১. أَنْ دَعَوْا এজন্য যে, তারা আরোপ করেছে لِلرَّحْمٰنِ আল্লাহর প্রতি وَلَدًا সন্তানের সম্বন্ধ।

৯২. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ অথচ দয়াময়ের জন্য শোভন নয় أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا তিনি সন্তান গ্রহণ করেন।

৯৩. كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনে যত কিছু আছে إِلَّا آتِي الرَّحْمٰنِ সমস্তই আল্লাহর সমক্ষে উপস্থিত হয় عَبْدًا দাসরূপে।

৯৪. لَقَدْ أَحْصٰهُمْ তিনি সকলকে বেষ্টন করে আছেন وَعَدَّهُمْ عَدًّا এবং সকলকে গণনা করে রাখছেন।

৯৫. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ আর তারা সকলে তার সমীপে উপস্থিত হবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন فَرْدًا একাকী।

৯৬. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ আর নেক কাজ করেছে سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সৃষ্টি করে দেবেন وُدًّا মহব্বত।

৯৭. সুতরাং আমি কুরআনকে আপনার [আরবি] ভাষায় এ জন্য সহজ করে দিয়েছি, যেন আপনি তাঁর সাহায্যে পরহেজগারদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেন এবং তার দ্বারা ঝগড়াটে লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন।	فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾
৯৮. আর তাদের পূর্বে আমি বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি; আপনি তাদের মধ্যকার কাউকেও দেখতে পান কি? কিংবা তাদের কোনো মৃদু শব্দ শুনতে পান কি?	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًۢا ﴿٩٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ সুতরাং আমি কুরআনকে এজন্য সহজ করে দিয়েছে بِلِسَانِكَ আপনার ভাষায় لِتُبَشِّرَ بِهِ যেন আপনি তাঁর সাহায্যে সুসংবাদ প্রদান করেন ٱلْمُتَّقِينَ পরহেজগারদেরকে وَتُنذِرَ بِهِ এবং তা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেন قَوْمًا لُّدًّا ঝগড়াটে লোকদেরকে।

৯৮. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ আর তাদের পূর্বে আমি বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ আপনি তাদের মধ্যকার কাউকেও দেখতে পান কি। أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا কিংবা তাদের কোনো মৃদু শব্দ শুনতে পান কি?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (٧٧)

শানে নুযূল : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী তাবারানী ও ইবনে হাব্বান প্রমুখ হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম। আস ইবনে ওয়ায়েলের নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। সুতরাং আমি পরিশোধ করে আনার জন্যে তার নিকট গিয়ে তা আদায় করে দিতে বললাম। তখন সে বলল, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি মুহাম্মদের কুফরি করবে আমি তোমার পাওনা দেব না। আমি জবাবে বললাম, আল্লাহর শপথ! তুমি মৃত্যুবরণ করে পূর্ণ জীবিত হলেও আমি মুহাম্মদ ﷺ -এর কুফরি করব না। তখন সে নরাধম বলল যে, তাহলে আমি মৃত্যুবরণ করে যখন জীবিত হব তখনই আসবে। সে সময় আমার নিকট আমার মালামাল ও সন্তান-সন্ততি থাকবে তখনই আমি তোমার মাল পরিশোধ করব। অপর এক বর্ণনায় রয়েছেন, খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) একজন কর্মকার ছিলেন, তিনি আস ইবনে ওয়ায়েলের অধীনে কাজ করতেন। আস ইবনে ওয়ায়েল তার প্রাপ্য পরিশোধে বিলম্ব করত। একদা তিনি তার নিকট গিয়ে পাওনার টাকা চাইলে সে বলে, তোমার পাওনা পরিশোধ করার মতো কোনো কিছুই আজকে আমার কাছে নেই। তখন তিনি বললেন, তুমি পাওনা পরিশোধ না করলে আমি আর যাচ্ছি না। তখন আস বলল, হে খাব্বাব! তোমার কি হলো? তুমি তো এমন ছিলে না! তুমি তো সুন্দর করেই চাইতে। তখন খাব্বাব বললেন, এটা তো সে সময়ের কথা। যখন আমি তোমার ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলাম আর এখন, আমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি। তখন সে বলল, বেহেশতে স্বর্ণ, রৌপ্য, রেশমী পোশাক ও হরেক রকমের ফল থাকবে বলে কি তোমাদের বিশ্বাস নেই? তিনি বললেন হ্যাঁ! সে প্রেক্ষিতে সে বলল যে, আমাদের আরেকটু সুযোগ দাও। আমি জান্নাতে গিয়ে তা পরিশোধ করে দিব। আল্লাহর শপথ! তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমি সেখানে তোমার চেয়েও বেশি ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হব। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[আসবাবে নুযূল পৃ : ১৫, তাবারী ৩৭৫/৮]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا (٩٦)

শানে নুযূল : আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বলেন যে, আমি যখন মক্কা থেকে মদিনা অভিমুখে

হিজরত করে চলে গেলাম, তখন মক্কার সাথি সঙ্গীদের বিচ্ছেদ বেদনা উপলব্ধি করতে লাগলাম। সেই সাথি সঙ্গীরা হলো শাইবা ইবনে রবীআ, উতবা ইবনে রবীআ ও উমাইয়্যা ইবনে খালফ। তার এ অসঙ্গত পীড়া উপলব্ধি করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[তাবারী ৩৮৬/১০]

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا-

بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ : এর তাফসীর সম্পর্কে নানাজনের নানামত বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সূরা কাহফে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ বলে যেসব ইবাদত ও সৎকর্মের উপকারিতা স্থায়ী, তাই বোঝানো হয়েছে। مَرَدًّا শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। এখানে পরিণাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মই আসল সম্পদ। সৎকর্মের ছওয়াব বিরাট এবং পরিণাম চিরস্থায়ী শান্তি।

لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا : বুখারী মুসলিমে হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি' আস ইবনে ওয়ালের কাফেরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সে বলল : তুমি মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। হযরত খাব্বাব (রা.) জওয়াব দিলেন : এরূপ করা আমার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়, চাই কি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আস বলল : ভালো তো ' আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব? এরূপ হলে তাহলে তোমার ঋণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে। (কুরতুবী)

কুরআন পাক এই আহাম্মক কাফেরের জওয়াবে বলেছে : সে কিরূপে জানতে পারল যে, পুনরায় জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে? اِطَّلَعَ الْغَيْبَ সে কি উঁকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে? اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا অথবা সে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততির কোনো প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বলাবাহুল্য, এরূপ কোনো কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে মনে এমন ধারণা কিভাবে বদ্ধমূল করে নিয়েছে?

وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ : অর্থাৎ সে যে ধন-দৌলত ও সন্তান -সন্ততির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা, দুনিয়াতে সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।

وَيَاتِيْنَا فَرْدًا : কিয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান-সন্ততি এবং না থাকবে ধন-দৌলত।

وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا : অর্থাৎ এই স্বহস্তনির্মিত মূর্তি এবং মিথ্যা উপাস্য, সহায় হওয়ার আশায় কাফেররা যাদের ইবাদত করত, তারা এই আশার বিপরীতে তাদের শত্রু হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে : ইয়া আল্লাহ! এদেরকে শাস্তি দিন। কেননা এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য করে নিয়েছিল।

تَؤُزُّهُمْ اَزًّا আরবি অভিধানে حَضَّ-فَزَّ-اَزَّ-هَزَّ শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ কোনো কাজের জন্যে উৎসাহিত করা। লঘুতা, তীব্রতা ও কম-বেশির দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। اَزٌّ শব্দের অর্থ পূর্ণ শক্তি, কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোনো কাজের জন্য প্রস্তুত বরং বাধ্য করে দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানরা কাফেরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না।

اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا : উদ্দেশ্য এই যে, আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। শাস্তি সত্বরই হবে। কেননা আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্যে যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই শাস্তি। نَعُدُّ لَهُمْ অর্থাৎ আমি তাদের জন্যে গণনা করছি। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোনো কিছুই বল্গাহীন নয়। তাদের বয়সের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে রয়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের চলাফেরার এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দ ও তাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপর আজাব ঝাঁপিয়ে পড়বে।

খলীফা মামুনূর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলেম ও ফিকহবিদগণের মধ্যে থেকে ইবনে সাম্মাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : এ সম্পর্কে কিছু বলুন। ইবনে সাম্মাক আরজ করলেন : আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই যেখানে গুণতিকৃত, তখন তো তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। জনৈক কবি বলেছেন :

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا • مَضٰى نَفَسٌ مِنْكَ اِنْتَقَصَ بِهٖ جُزْءٌ

অর্থাৎ তোমার জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস গুণতিকৃত। একটি শ্বাস পেছনে চলে গেলে তোমার জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়। কথিত রয়েছে, মানুষ দিবারাত্রে চব্বিশ হাজার শ্বাস গ্রহণ করে। -[কুরতুবী]

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন : وَكَيْفَ يَفْرَحُ بِالدُّنْيَا وَلَذَّتِهَا • فَتًى يُعَدُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالنَّفَسُ

অর্থাৎ সে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার আনন্দে কিরূপে বিভোর ও নিশ্চিত হতে পারে, যার কথা ও শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে। -[রূহুল মা'আনী]

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا : যারা বাদশাহ অথবা কোনো শাসনকর্তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে وَفْد বলা হয়। হাদীসে রয়েছে : তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ করত। উদাহরণত উট, ঘোড়া প্রভৃতি। কেউ কেউ বলেন, তাদের সৎকর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا : وِرْد -এর শাব্দিক অর্থ পানির দিকে যাওয়া। বলা বাহুল্য, পিপাসা লাগলেই মানুষ অথবা জন্তু পানির দিকে যায়। তাই وِرْدًا -এর অনুবাদ পিপাসার্ত করা হলো।

مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : عَهْد (অঙ্গীকার) বলে 'লা -ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য বোঝানো হয়েছে। কেউ বলেন : عَهْد বলে কুরআনের হিফজ বোঝানো হয়েছে। মোটকথা, সুপারিশ করার অধিকার প্রত্যেকেই পাবে না। যারা ঈমান ও অঙ্গীকারে অটল থাকে, শুধু তারাই পাবে।-[রূহুল মা'আনী]

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا : এসব আয়াতে থেকে জানা যায় যে মৃত্তিকা, পাহাড় ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলি প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বুদ্ধি ও চেতনার কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহর নামের তসবীহ পাঠ করে। যেমন -কুরআন বলে : وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করে না, এমন কোনো বস্তু দুনিয়াতে নেই। বস্তুসমূহের এই বুদ্ধি ও চেতনাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করলে বিশেষত আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জিন ও মানব ছাড়া সমস্ত সৃষ্টবস্তু শিরকের ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।-[রূহুল মা'আনী]

وَعَدَّهُمْ عَدًّا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবমণ্ডলীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের পদক্ষেপ, তাদের লোকমা ও ঢোক আল্লাহর কাছে গণনাকৃত। এতে কম -বেশি হতে পারে না।

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا : অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্মে দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করলে এবং বাহিরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হলে ঈমানদার সৎকর্মশীলদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি পয়দা হয়ে যায়। একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টজীবের মনেও আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন জিবরাঈলকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস। অতঃপর জিবরাঈল সব আকাশে একথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালোবাসতে থাকে। এরপর এই ভালোবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে থাকে। তিনি আরও বলেন : কুরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

(রূহুল -মা'আনী) হারেম ইবনে হাইয়্যান বলেন, যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ঈমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন। -[কুরতুবী]

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহর নির্দেশে মক্কার শুষ্ক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁদের জন্যে দোয়া করে বলেছিলেন : فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ হে আল্লাহ আমার নিঃসঙ্গ পরিবার পরিজনের প্রতি আপনি কিছু লোকের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবসীদের প্রতি মহব্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপ্লুত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দূরতিক্রম্য বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌঁছে এবং বিশ্বের কোণে কোণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

اَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا : বোধগম্য নয়-এমন ক্ষীণতম শব্দকে رِكز বলা হয়; যেমন মরণোন্মুখ ব্যক্তি জিহবা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সব রাজ্যাধিপতি, জাঁক-জমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ তা'আলার আজাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোনো ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ন আর শোনা যায় না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِهْتَدَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِهْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- স্বেচ্ছায় চেষ্টা করে সোজা রাস্তা ধরা, হেদায়েত অর্জন করা।

لَاُوْتَيَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع مجهول لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- অবশ্যই আমাকে দেওয়া হবে।

تَؤُزُّهُمْ : সীগাহ واحد مونث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَزٌّ মূলবর্ণ (ا - ز - ز) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা তাদেরকে উত্তেজিত করতে থাকে।

يَتَفَطَّرْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَفَطُّرٌ মূলবর্ণ (ف - ط - ر) জিনস صحيح অর্থ- তা ফেটে যায়।

اَحْصٰهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْصَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ص - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ-তিনি তাদেরকে গণনা করেছেন।

عَدَّهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَدٌّ মূলবর্ণ (ع - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তিনি তাদেরকে গণনা করে রাখছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا : এ বাক্যে ان হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। اٰمَنُوْا- এর الَّذِيْنَ الخ হলো ইসমে ان আর اٰمَنُوْا বাক্যটি হলো صلة আর عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ বাক্যটি আতফ হলো উপর। আর سيجعل الخ হলো خبر ان আর لَهُمْ টা উহ্য কোনো শিবহে ফেলের সাথে متعلق হয়ে يَجْعَلُ এর দ্বিতীয় মাফউল আর الرَّحْمٰنُ হলো يَجْعَلُ এর ফায়েল এবং وُدًّا হলো يَجْعَلُ -এর প্রথম মাফউল।

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا : এ বাক্যে هَلْ শব্দটি استفهام انكارى -এর জন্য। আর تُحِسُّ হলো ফে'ল আর তার ফায়েল হলো উহ্য যমীর انت ; আর مِنْهُمْ হলো حال কেননা তা اَحَدٍ এর সিফাত হয়েছে। আর مِنْ হলো অতিরিক্ত; আর اَحَدٍ হলো মাজরূর مِنْ দ্বারা শাব্দিকভাবে আর স্থানগত হিসেবে مفعول به আর حرف جار আর اَوْ হরফে আতফ আর تَسْمَعُ হলো تُحِسُّ -এর উপর আতফ আর لَهُمْ হলো حال এবং رِكْزًا হলো মাফউলে বিহী।

– [ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৫১]

سُوْرَةُ طٰهٰ مَكِّيَّةٌ

সূরা ত্বা-হা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ১৩৫, রুকূ'- ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ	আয়াত
১. ত্বা-হা।	طٰهٰ ﴿١﴾
২. আমি আপনার প্রতি কুরআন এ জন্য নাজিল করিনি যে, আপনি কষ্ট ভোগ করেন।	مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ﴿٢﴾
৩. বরং এমন ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়ার জন্য, যে ভয় করে।	اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٣﴾
৪. এটা সেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতারিত হয়েছে- যিনি জমিন ও উচ্চ আকাশসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।	تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ﴿٤﴾
৫. তিনি পরম করুণাময়, আরশের উপর কায়েম আছেন।	اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿٥﴾
৬. তাঁরই অধিকারে রয়েছে- যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু জমিনে আছে, আর যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যে আছে, আর যা কিছু মাটির অন্তঃস্থলে আছে।	لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. طٰهٰ ত্বা-হা।

২. مَآ اَنْزَلْنَا আমি নাজিল করিনি عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ আপনার প্রতি কুরআন لِتَشْقٰٓى এ জন্য যে, আপনি কষ্ট ভোগ করেন।

৩. اِلَّا تَذْكِرَةً বরং এমন ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়ার জন্য لِّمَنْ يَّخْشٰى যে ভয় করে।

৪. تَنْزِيْلًا এটা সেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষে থেকে অবতারিত হয়েছে مِّمَّنْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى জমিন ও উচ্চ আকাশসমূহকে।

৫. اَلرَّحْمٰنُ তিনি পরমকরুণাময় عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى আরশের উপর কায়েম আছেন।

৬ لَهٗ তাঁরই অধিকারে রয়েছে مَا فِى السَّمٰوٰتِ যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে وَمَا فِى الْاَرْضِ এবং যা কিছু জমিনে আছে وَمَا بَيْنَهُمَا, আর যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যে আছে وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى আর যা কিছু মাটির অন্তঃস্থলে আছে।

অনুবাদ	আয়াত
৭. আর যদি তুমি উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, তিনি তো নীরবে কথিত কথা এবং তদপেক্ষা অধিক প্রচ্ছন্ন কথাও জানেন।	وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ۝٧
৮. আল্লাহ্ এমন যে, তিনি ভিন্ন কোনো মা'বূদ নেই; তাঁর উত্তম উত্তম নাম আছে।	اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۝٨
৯. আর আপনার নিকট এসেছে কি মূসার বৃত্তান্তও?	وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝٩
১০. যখন তিনি এক অগ্নি দেখতে পেলেন, তখন তিনি স্বীয় পরিজনবর্গকে বললেন, তোমরা থাম, আমি আগুন দেখেছি, হয়তো আমি তা হতে তোমাদের নিকট আগুনের কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব অথবা তাঁর নিকট পথের সন্ধান পেতে পারি।	اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝١٠
১১. অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন আওয়াজ দেওয়া হলো, হে মূসা!	فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ۝١١
১২. আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব, তোমার পাদুকাদ্বয় খুলে ফেল, তুমিতো এক পবিত্র ময়দানে অর্থাৎ তুওয়া উপত্যকায় রয়েছ।	اِنِّيْۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ আর যদি তুমি উচ্চৈঃস্বরে কথা বল فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ তিনি তো জানেন السِّرَّ নীরবে কথিত কথা وَاَخْفٰى এবং তদপেক্ষা অধিক প্রচ্ছন্ন কথাও ।

৮. اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আল্লাহ এমন যে, তিনি ভিন্ন কোনো মা'বূদ নেই لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى তাঁর উত্তম উত্তম নাম আছে।

৯. وَهَلْ اَتٰىكَ, আর আপনার নিকট এসেছে কি حَدِيْثُ مُوْسٰى মূসার বৃত্তান্তও।

১০. اِذْ رَاٰ نَارًا যখন তিনি এক অগ্নি দেখতে পেলেন فَقَالَ তখন তিনি বললেন لِاَهْلِهِ স্বীয় পরিজনবর্গকে امْكُثُوْۤا তোমরা থাম اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا আমি আগুন দেখেছি لَعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ হয়তো আমি তা হতে তোমাদের নিকট আগুনের কিছু জ্বলন্ত আঙ্গার আনতে পারব اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى অথবা তাঁর নিকট পথের সন্ধান পেতে পারি।

১১. فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى তখন আওয়াজ দেওয়া হলো হে মূসা।

১২. اِنِّيْۤ اَنَا رَبُّكَ আমিই তোমার প্রতিপালক فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ অতএব তোমার পাদুকাদ্বয় খুলে ফেল اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى তুমিতো এক পবিত্র ময়দানে অর্থাৎ তুওয়া উপত্যকায় রয়েছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ১৩৫টি আয়াত এবং ৮টি রুকূ' রয়েছে।

নামকরণ : যেহেতু এ সূরার প্রথম শব্দই হলো 'ত্বা-হা' তাই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে ত্বা-হা। এই সূরার আরেকটি নাম হলো আল-কালীম। (আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র.) কৃত তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন ৪/৫২৮)

সূরায়ে মারইয়ামে আল্লাহ পাক একাধিক আম্বিয়া কেরামের ঘটনাবলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন হযরত যাকারিয়া (আ.), হযরত ইয়াহইয়া (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)। আর কয়েকজন নবীর কথা বর্ণিত হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা। আর কোনো কোনো নবীর ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ
আর আলোচ্য সূরায় হযরত মূসা (আ.) -এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং সূরার শেষে হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনাও সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে।

এ সূরার ফজিলত : এ সূরা সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, ইবনে মারদুভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। দারামী এবং ইবনে খোযাইমা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আসমান, জমিন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক সূরায়ে 'ত্বা-হা' এবং সূরা 'ইয়াসীন' পাঠ করেছেন। ফেরেশতাগণ এ সূরা শ্রবণ করে বলেছিল, সেই উম্মত অত্যন্ত ভাগ্যবান যার প্রতি এই কালাম নাজিল হবে। আর সেই ভাষা অত্যন্ত মোবারক যার মাধ্যমে এই কালাম প্রকাশিত হবে। দায়লামীও হযরত আনাস (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাফসীরুল কুরআন

ط - ه এ দু'টি অক্ষরকে মুকাত্তা'আত বলা হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, طٰهٰ আল্লাহ পাকের অন্যতম নাম। এক্ষেত্রে এ শব্দটি শপথের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন 'হা-মীম'। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ 'হা- মীমের শপথ!' এ কাফেরদেরকে সাহায্য করা হবে না এবং তারা সফল হবে না।"
মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন ত্বা-হা'র অর্থ হলো উভয় পা জমিনে রাখো, তাহাজ্জুদের নামাজে উভয় পা জমিনে স্থাপন করো। ইবনে মারদুভিয়া তাঁর তাফসীরে হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন সূরা মুযযাম্মিল -এর আয়াত নাজিল হয় : يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (হে কম্বলীওয়ালা, রাত্রিকালে নামাজে দণ্ডায়মান হোন অল্প সময় ব্যতীত।)
এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সারা রাত আল্লাহ পাকের দরবারে দণ্ডায়মান থাকতেন। ফলে তাঁর কদম মোবারকে রস জমে যায়, কদম মোবারক ফুলে যায়। তখন তিনি একটি পা মাটিতে রাখতেন আরেকটি পা তুলে রাখতেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করলেন এবং বললেন, 'ত্বা-হা'। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ উভয় পা মাটিতে রাখুন।
তাফসীরকার মুজাহিদ (র.), আতা (র.) এবং যাহহাক (র.) বলেছেন, ত্বা-হা অর্থ হলো 'হে ব্যক্তি'। তাফসীরকার কাতাদাহ (র.) বলেছেন, হিব্রু ভাষায় 'ত্বা-হা' অর্থ হলো হে ব্যক্তি। কালবী (র.)ও আলোচ্য শব্দটির এ তরজমাই করেছেন। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে আলোচ্য শব্দটি দ্বারা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে।
–(তাফসীরে মাজহারী ৭/৩৫৮–৩৫৯)

ইমাম রাযী (র.) -এর কয়েকটি ব্যাখ্যা করেছেন,
(১) ط অক্ষরটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর দ্বারা জান্নাতের তুবা বৃক্ষটি উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
আর ها অক্ষরটি দ্বারা হাবিয়া বুঝানো হয়েছে। (দোজখের একটি নাম)। এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক জান্নাত এবং দোজখের শপথ করেছেন।
(২) বর্ণিত আছে যে, ইমাম জাফর সাদেক (রা.) বলতেন ط দ্বারা আহলে-বাইতের তহারাত বা পবিত্রতা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ه অক্ষর দ্বারা আহলে বাইতের হেদায়েত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, 'ত্বা' দ্বারা পবিত্রতা আর 'হা' দ্বারা হেদায়েত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ হে সেই মহান ব্যক্তি যিনি গায়বি বিষয়ে মানুষকে হেদায়েত করেন। –(তাফসীরে কাবীর ২২/৩)

١ طٰهٰ ٢ مَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى

শানে নুযূল -১ : হযরত রবী' ইবনে আনাসের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে কাছীর (র.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যখন নামাজ আদায় করতেন, তখন এক পায়ে ভর দিয়ে অপর পা তুলে দাঁড়াতেন, সে প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল -২ : যুবাইরি হাক্কান ইবনে কাইস এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন রাসূল ﷺ-এর উপর কুরআন নাজিল করেন, তখন রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণ কুরআন নিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। সে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে কুরাইশ মুশরিকগণ বলতে লাগল যে, মুহাম্মদের উপর এ কুরআন নাজিল হচ্ছে কেবল মাত্র মুহাম্মদকে অসহনীয় কষ্টে নিপতিত করার জন্যে। তাদের এহেন অন্তঃসার শূন্য মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[ইবনে কাছীর ৩/১৪৫, কুরতুবী ১১/১৫২-১৫৩, বাহরে মুহীত্ব ৬/২১১]

শানে নুযূল -৩ : মুজাহিদ বলেন, নবী করীম ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম রাতের নামাজ দীর্ঘ কিয়াম সহকারে নামাজ আদায় করার জন্য তাঁরা নিজেদের সিনায় দড়ি বেঁধে রাখতেন, সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

শানে নুযূল -৪ : কালবী বলেন, মহানবী ﷺ উপর মক্কায় যখন ওহী নাজিল করা হয়, তখন তিনি মনে প্রাণে ইবাদতে মগ্ন হয়ে পড়েন। ফলে সে ইবাদত তাঁর কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল। বলা বাহুল্য, তিনি অনেক দিন পর্যন্ত সারা রাত ব্যাপিয়া নামাজ আদায় করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ১১/১৫৩, ফাতহুল কাদীর ৩/৩৬০]

শানে নুযূল -৫ : ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এর উপর যখন সর্বপ্রথম ওহী নাজিল হয়, তখন তিনি দু'পায়ের অগ্রভাগে চাপা দিয়ে নামাজে দাঁড়াতেন। তখন যে কষ্ট হতো সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -(ফাতহুল কাদীর ৩৬০/৩, রূহুল মা'আনী ৮/১৬/১৫৮)

এই সূরার অপর নাম সূরা কলীম। কারণ এতে হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আ.)-এর ঘটনার বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসনাদের দারেমীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করারও দুই হাজার বছর পূর্বে সূরা 'ত্বা-হা' ও সূরা 'ইয়াসীন' পাঠ করে ফেরেশতাদেরকে শোনান, তখন ফেরেশতারা বলেছিলেন : ঐ উম্মত অত্যন্ত ভাগ্যবান ও বরকতময়, যাদের প্রতি এই সূরাগুলো অবতীর্ণ হবে; তারা পুণ্যবান, যারা এগুলো হেফজ করবে এবং তারা অপরিসীম সৌভাগ্যশীল, যারা এগুলো পাঠ করবে। এই বরকতময় সূরাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হত্যার উদ্দেশ্য আগমনকারী ওমর ইবনুল খাত্তাবকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল।

ইবনে ইসহাক রেওয়ায়েত করেন, ওমর ইবনে খাত্তাব একদিন খোলা তরবারি হস্তে মহানবী ﷺ-কে হত্যার উদ্দেশ্য বাড়ি থেকে বের হলেন। পথিমধ্যে নুআইম ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হলে সে জিজ্ঞেস করল : কোথায় যাচ্ছেন? ওমর ইবনে খাত্তাব বললেন : আমি ঐ পথভ্রষ্ট ব্যক্তির জীবনলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছি, যে কুরাইশদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের দীন ও মাজহাবের নিন্দা করে তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে এবং তাদের প্রতিমাদেরকে মন্দ বলেছে। নুআইম বললেন ওমর, তুমি মারাত্মক ধোঁকায় পতিত আছ। তুমি কি মনে কর যে, তুমি মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যা করবে আর তার গোত্র বনী আবদে মানাফ তোমাকে পৃথিবীর বুকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করার জন্য জীবিত ছেড়ে দেবে? তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে, তবে প্রথমে তোমার ভগিনী ও ভগ্নিপতির খবর নাও। তারা মুহাম্মদ ﷺ -এর ধর্মের অনুসারি মুসলমান হয়ে গেছে। কথাটি ওমরের মনে দাগ কাটল। সেখান থেকেই ভগ্নিপতির বাড়ির উদ্দেশ্য রওয়ানা হলেন। তাঁর গৃহে তখন সাহাবী হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) স্বামী-স্ত্রীকে সহীফায়ে লিখিত কুরআন পাকের সূরা 'ত্বা-হা' পাঠ করাচ্ছিলেন।

ওমর ইবনে খাত্তাবের আগমন টের পেয়ে হযরত খাব্বাব (রা.) গৃহের এক কক্ষে অথবা কোণে আত্মগোপন করলেন। ভগিনী তাড়াতাড়ি সহীফাটি উরুর নিচে লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু তাতে কি হয়, ওমরের কানে খাব্বাবের এবং তাদের তেলাওয়াতের আওয়াজ পড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই পড়া ও পড়ানোর আওয়াজ কিসের ছিল? ভগিনী (বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমে বললেন,) ও কিছু না। কিন্তু ওমর ইবনে খাত্তাব আসল কথা ব্যক্ত করে বললেন, আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তোমরা উভয়েই মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসারী মুসলমান হয়ে গেছ। একথা বলেই তিনি ভগিনীপতি সাঈদ ইবনে যায়েদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ দৃশ্য দেখে ভগিনী স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টিত হলেন। ওমর ইবনে খাত্তাব তাঁকেও প্রহারের পর প্রহার করে দেহ রক্তাক্ত করে দিলেন।

ব্যাপার এতদূর গড়াতে দেখে ভগিনী ও ভগিনীপতি উভয়েই একযোগে বলে উঠলেন, শুনে নাও, আমরা নিশ্চিতই মুসলমান হয়ে গেছি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এখন তুমি যা করতে পার, কর। ভগিনীর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। এ অবস্থা দেখে ওমর কিছুটা অনুতপ্ত হলেন এবং বোনকে বললেন, সহীফাটি আমাকে দেখাও, যা তোমরা পড়ছিলে; এতে মুহাম্মদ কি শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, তা আমিও দেখি। ওমর ইবনে খাত্তাব লেখাপড়া জানা ব্যক্তি ছিলেন, তাই সহীফা দেখতে চাইলেন। ভগিনী বললেন, আমরা আশঙ্কা করি যে, সহীফাটি তোমার হাতে দিলে তুমি একে নষ্ট করে দেবে অথবা এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে। ওমর ইবনে খাত্তাব তাঁর উপাস্য দেবদেবীর কসম খেয়ে বললেন, তোমরা ভয় করো না, আমি সহীফাটি পড়ে তোমাদের হাতে ফেরত দিয়ে দেব। ভগিনী ফাতেমা এই ভাবগতিক দেখে কিছুটা আশান্বিত হলেন যে, বোধ হয় ওমরও মুসলমান হয়ে যাবে। তিনি বললেন, ভাই, ব্যাপার এই যে, তুমি অপবিত্র। এই সহীফা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। যদি তুমি দেখতেই চাও, তবে গোসল করে নাও। ওমর গোসল করলে সহীফা তাঁর হাতে দেওয়া হলো। সহীফায় সূরা ত্বা-হা লিখিত ছিল। প্রথম অংশ পড়েই ওমর বললেন, এই কালাম তো খুবই উৎকৃষ্ট ও সম্মানার্হ। খাব্বাব ইবনে আরত গৃহে আত্মগোপনরত অবস্থায় এসব কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। ওমরের এ বাক্য শুনেই তিনি সামনে এসে গেলেন এবং বললেন, হে ওমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহর রহমতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের দোয়ার ফলশ্রুতিতে তোমাকে মনোনীত করেছেন। গতকাল আমি প্রিয় নবী ﷺ -কে এরূপ দোয়া করতে শুনেছি : اَللّٰهُمَّ اَيِّدِ الْاِسْلَامَ بِاَبِى الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ اَوْ بِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ
হে আল্লাহ! হয় আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (অর্থাৎ আবূ জাহল) -এর মাধ্যমে না হয় ওমর ইবনে খাত্তাবের মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তি দান করুন। উদ্দেশ্য এই যে, এতদুভয়ের মধ্যে একজন মুসলমান হোক। এতে মুসলমানদের দলে নতুন প্রাণ ও নব উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। অতঃপর খাব্বার বললেন, হে ওমর, তুমি এই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করো না। উমর বললেন, আমাকে মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে নিয়ে চল। (কুরতুবী) এর পরবর্তী ঘটনা সবারই জানা।

طٰهٰ- এই শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর অর্থ يَا رَجُلُ (হে ব্যক্তি) এবং ইবনে ওমর থেকে يَا حَبِيْبِىْ (হে আমার বন্ধু) বর্ণিত আছে। কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় যে, طٰهٰ ও يٰسٓ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্যতম নাম। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও বিশিষ্ট আলেমগণ এ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন : কুরআন পাকের অনেক সূরার শুরুতে الٓمٓ এর ন্যায় বেশ কিছু সংখ্যক খণ্ড অক্ষর উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো مُتَشَابِهَاتٌ অর্থাৎ গোপনভেদ, যার মর্ম আল্লাহ ব্যতীত অপর কেউ জানেন না। طٰهٰ শব্দটিও এরই অন্তর্ভুক্ত।

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى : لِتَشْقٰى শব্দটি شَقَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ক্লেশ, পরিশ্রম ও কষ্ট। কুরআন অবতরণের সূচনাভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সারারাত ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাজে কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পা ফুলে যায়। কাফেররা কোনো রকমে হেদায়েত লাভ করুক এবং কুরআনের দাওয়াত কবুল করুক। তিনি সারাদিন এ চিন্তায়ই কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই উভয়বিধ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্যে বলা হয়েছে : আপনাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলার জন্য আমি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। সারা রাত জাগ্রত থাকা এবং কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিতভাবে রাতের সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু দাওয়াত ও প্রচার করা। একাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত কবুল করল না, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়।

-[কুরতুবী-সংক্ষেপিত]

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى : ইবনে কাছীর (র.) বলেন : কুরআন অবতরণের সূচনাভাগে সারারাত তাহাজ্জুদ ও কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে কোনো কোনো কাফের মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করতে থাকে যে, তাদের প্রতি কুরআন তো নয় সাক্ষাৎ বিপদ নাজিল হয়েছে, রাতেও আরাম নেই দিনের বেলায়ও শান্তি নেই। আলোচ্য আয়াতে

আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য সম্পর্কে বেখবর, হতভাগা, মূর্খরা জানে না যে, কুরআন ও কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যে জ্ঞান প্রদান করেছেন তাঁর কল্যাণকারিতা কত গভীর। যারা একে বিপদ মনে করে, তারা বেখবর নির্বোধ। হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাকে দীনের বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি দান করেন।

এখানে ইবনে কাসীর অপর একটি সহীহ্ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আলেম সমাজের জন্যে খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হযরত সা'লাবা কর্তৃক ইবনে-হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا قَعَدَ عَلٰى كُرْسِيِّهٖ لِقَضَاءِ عِبَادِهٖ اِنِّىْ لَمْ اَجْعَلْ عِلْمِىْ وَحِكْمَتِىْ فِيْكُمْ اِلَّا وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَغْفِرَلَكُمْ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكُمْ وَلَا اُبَالِىْ-

'রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের আমলের ফয়সালা করার জন্যে তাঁর সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন আলেমগণকে বলবেন : আমি আমার ইলম ও হেকমত তোমাদের বুকে এ জন্যেই রেখেছিলাম যাতে তোমাদের কৃত গোনাহ্ ও ত্রুটি সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোনো পরওয়া করি না, কিন্তু এখানে সেসব আলেমগণকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কুরআনে বর্ণিত ইলমের লক্ষণ অর্থাৎ আল্লাহর ভয় বিদ্যমান আছে। আয়াতে لِمَنْ يَّخْشٰى এ শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপাত্র নয়।

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى : اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ (আরশের উপর সমাসীন হওয়া) সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল উক্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের উক্তি হচ্ছে যে, এর স্বরূপ ও অবস্থা কারো জানা নেই। এটা مُتَشَابِهَاتٌ তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম। এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের উপর সমাসীন হওয়া সত্য। এ অবস্থা আল্লাহর শান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى : আর্দ্র ও ভেজা মাটিকে ثَرٰى বলা হয়, যা মাটি খনন করার সময় নিচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই ثَرٰى পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এর নিচে কি আছে, তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মাটি খুঁড়ে এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু মাত্র ছয় মাইল গভীর পর্যন্তই এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি কাজ করতে! সক্ষম হয়েছে! এর নীচে এমন প্রস্তর সদৃশ স্তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল যন্ত্রপাতি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে, মাত্র ছয় মাইলের গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, অথচ মৃত্তিকার ব্যাস হাজারো মাইল। তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, পাতালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ।

يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى : মানুষ মনে যে কথা গোপন রাখে, কারও কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় سِرٌّ পক্ষান্তরে اَخْفٰى বলে সে কথা বোঝানো হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোনো সময় আসবে। আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকিফহাল। কোন মানুষের মনে এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি থাকবে, তিনি সবই জানেন। ভবিষ্যত সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও জানে না যে, আগামীকাল তার মনে কি কথা উদিত হবে।

وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى -পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুরআন পাকের মাহাত্ম্য এবং সেই প্রসঙ্গে রাসূলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক এই যে, রেসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী ﷺ -এর জানা থাকা দরকার যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ

অর্থাৎ আমি পয়গম্বরগণের এমন কাহিনী আপনার কাছে এ জন্যে বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি নবুয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান।

এখানে উল্লিখিত হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর সূচনা এভাবে যে, একদা তিনি মাদইয়ান পৌছে হযরত শোআয়ব (আ.)- এর গৃহে এরূপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খেদমত করবেন। তাফসীর বাহরে-মুহীতের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেন তখন হযরত শোআয়ব (আ.)-এর কাছে আরজ করলেন : এখন আমি জননী ও ভগিনী সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিসর যেতে চাই। ফেরাউনের সিপাহীরা তাঁকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্যে খোঁজ করছিল। এ আশঙ্কার কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশঙ্কা অবশিষ্ট ছিল না। হযরত শোআয়ব (আ.) তাঁকে স্ত্রী অর্থাৎ নিজের কন্যাসহ কিছু অর্থ কড়ি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে শাম অঞ্চলের শাসকের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কা ছিল, তাই তিনি পরিচিত পথ ছেড়ে অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল। স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা এবং তাঁর প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী। সকাল-বিকাল যে কোনো সময় প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত। তাই তিনি জঙ্গলের পথ হারিয়ে তূর পর্বতের পশ্চিমে ও ডান দিকে চলে গেলেন। গভীর অন্ধকার। কনকনে শীত। বরফসিক্ত মাটি। এহেন দুর্যোগ- মুহূর্তে স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে আগুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে দিয়াশলাই-এর স্থলে চমকি পাথর ব্যবহার করা হতো। এই পাথরে আঘাত করলে আগুন জ্বলে উঠত। মূসা (আ.) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আগুন জ্বলল না। এই হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি তূর পর্বতে আগুন দেখতে পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেন : তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। দেখি, সেখানে গিয়ে আগুন আনা যায় কিনা। সম্ভবত আগুনের কাছে কোনো পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি, যার কাছে থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সুনিশ্চিত। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কোনো খাদেমও সাথে ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করেও সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছু সংখ্যক লোক সফর -সঙ্গীও ছিল; কিন্তু পথ ভুলে তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।-(বাহরে মুহীত)

فَلَمَّآ اَتٰىهَا -অর্থাৎ যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন; মুসনাদে আহমদে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণনা করেন যে, হযরত মূসা (আ.) আগুনের কাছে পৌছে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের উপর দাউ দাউ করে জ্বলছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর কারণে বৃক্ষের কোনো ডাল অথবা পাতা পুড়ছে না; বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরও বেড়ে গেছে! হযরত মূসা (আ.) এই বিস্ময়কর দৃশ্য কিছুক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকলেন এবং অপেক্ষা করলেন যে, আগুনের কোনো স্ফুলিঙ্গ মাটিতে পড়লে তিনি তা তুলে নেবেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন এমন হলো না, তখন তিনি কিছু ঘাস ও খড়কুটা একত্রি করে আগুনের কাছে ধরলেন। বলাবাহুল্য এতে আগুন লেগে গেলেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এগুলো আগুনের কাছে নিতেই আগুন পেছনে সরে গেল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, আগুন তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। তিনি অস্থির হয়ে পেছনে সরে গেলেন। মোটকথা আগুন লাভ করার উদ্দেশ্য পূরণ হলো না। তিনি এই অত্যাশ্চর্য আগুনের প্রভাবে বিস্ময়াভিভূত ছিলেন, ইতোমধ্যে একটি গায়বি আওয়াজ হলো। -[রূহুল-মা'আনী]

হযরত মূসা (আ.) পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনার সম্মুখীন হন। পাহাড়টি ছিল তাঁর ডানদিকে। এই উপত্যকার নাম ছিল 'তুয়া'।

نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى اِنِّىْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ : বাহরে-মুহীত, রূহুল -মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে আছে, হযরত মূসা (আ.) এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে সমভাবে শ্রবণ করেন। তার কোনো দিক নির্দিষ্ট ছিল না। শুনেছেনও অপরূপ ভঙ্গিতে, শুধু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। এটা ছিল একটা মু'জিযার মতোই। আওয়াজের সারমর্ম ছিল এই যে, যে বস্তুকে তুমি আগুন মনে করছ, তা আগুন নয়- আল্লাহ তা'আলার দ্যুতি। এতে বলা হয়, আমিই তোমার পালনকর্তা।

হযরত মূসা (আ.) কিরূপে নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ তা'লারই আওয়াজ? এই প্রশ্নে আসল উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলারই আওয়াজ। এ ছাড়া হযরত মূসা (আ.) দেখলেন যে এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার সৌন্দর্য্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, আওয়াজও সাধারণ মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে আসেনি ; বরং চতুর্দিক থেকে এসেছে। এবং শুধু কানই নয়-হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ আওয়াজ শ্রবণে শরিক আছে, এসব অবস্থা থেকেও তিনি বুঝে নেন যে, এ আওয়াজ আল্লাহ তা'আলারই।

হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন : রূহুল -মা'আনীতে মুসনাদে আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-কে যখন 'ইয়া মূসা' শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেওয়া হয়, তখন তিনি' লাব্বায়ক' (হাজির আছি) বলে জওয়াব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি কিন্তু কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন, তা জানি না। আপনি কোথায় আছেন? উত্তরে বলা হলো : আমি তোমার উপরে, সামনে, পশ্চাতে ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন : আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, না আপনার প্রেরিত কোনো ফেরেশতার কথা শুনছি। জওয়াব হলো : আমি নিজেই তোমার সাথে কথা বলছি। রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন : এ থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) এই শব্দযুক্ত কালাম ফেরেশতাদের মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজে শুনেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাতের মধ্যে একদল আলেম এজন্যেই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরন্তন হওয়া সত্ত্বেও শ্রবণযোগ্য। এর কালাম নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা হয়, তার জওয়াব তাদের পক্ষ থেকে এই যে, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন তা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এর জন্যে স্থূলতা ও দিক শর্ত। এরূপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শোনা যায়। হযরত মূসা (আ.) কোনো নির্দিষ্ট দিক থেকে এ কালাম শোনেননি এবং শুধু কানেই শোনেননি; বরং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। বলাবাহুল্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত।

সম্ভ্রমের স্থলে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদব : فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ জুতা খোলার নির্দেশ দেওয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, হযরত মূসা (আ.) -এর পাদুকাদ্বয় ছিল মৃত জন্তুর চর্মনির্মিত। হযরত আলী, হাসান বসরী ও ইবনে জুরায়জ থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাঁদের মতে হযরত মূসা (আ.)-এর পদদ্বয় এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক- এটাই ছিল জুতা খুলে রাখার উপকারিতা। কেউ কেউ বলেন, বিনয় নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দেওয়া হয়, যেমন পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করার সময় এরূপ করতেন।

হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বশীর ইবনে খাসাসিয়াকে করবস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন : اِذْ كُنْتَ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَكَانِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ অর্থাৎ তুমি যখন এ জাতীয় সম্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম কর, তখন জুতা খুলে নাও। জুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামাজ পড়া সব ফিকহবিদদের মতে জায়েজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাক জুতা পরিধান করে নামাজ পড়া প্রমাণিতও রয়েছে : কিন্তু সাধারণ সুন্নত এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, জুতা খুলে নামাজ পড়া হতো। কারণ এটাই বিনয় ও নম্রতার নিকটবর্তী। -(কুরতুবী)

اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى : আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশকে স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেন; যেমন বায়তুল্লাহ; মসজিদে-আকসা ও মসজিদে নববী। তুয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের অন্যতম। এটা তূর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। -[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

لِتَشْقٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر مضارع معروف منصوب بلام كى বহছ مضارع বাব سَمِعَ মাসদার شَقَاوَةٌ ও شِقَاءٌ মূলবর্ণ (ش - ق - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- যেন আপনি কষ্ট ভোগ করেন।

يَخْشٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সে ভয় করে।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং اجوف واوى) অর্থ- তিনি কায়েম আছেন।

تَجْهَرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার جَهْرٌ ও جِهَارٌ মূলবর্ণ (ج - ه - ر) জিনস صحيح অর্থ- তুমি উচ্চৈঃস্বরে কথা বল।

اَخْفٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার خَفَاءٌ ও خُفْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ف - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অধিক প্রচ্ছন্ন।

اُمْكُثُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَكْثٌ ও مُكُوْثٌ মূলবর্ণ (م - ك - ث) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা থামো।

اٰنَسْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْنَاسٌ মূলবর্ণ (ا - ن - س) জিনস مهموز فاء অর্থ- আমি দেখেছি।

نُوْدِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার نِدَاءٌ ও مُنَادَاةٌ মূলবর্ণ (ن - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আওয়াজ দেওয়া হলো।

فَاخْلَعْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার خَلْعٌ মূলবর্ণ (خ - ل - ع) জিনস صحيح অর্থ- খুলে ফেল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى : এখানে مَاۤ হলো نافيه আর اَنْزَلْنَا ফে'ল ও ফায়েল عَلَيْكَ হলো اَنْزَلْنَا এর সাথে متعلق আর الْقُرْاٰنَ হলে মাফউলে বিহী। আর لِتَشْقٰى -এর লাম টি تعليل এর জন্য আর تَشْقٰى হলো ফে'ল যা لام এর পরে উহ্য ان দ্বারা منصوب হয়েছে। -(ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৫৭)

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
১৩. আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব, যা কিছু ওহী করা হচ্ছে, তা শুনে নাও।	وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ﴿١٣﴾
১৪. আমি-ই আল্লাহ, আমি ভিন্ন আর কেউ মা'বুদ নেই। সুতরাং তুমি আমারই ইবাদত কর এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামাজ পড়।	اِنَّنِيْۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ﴿١٤﴾
১৫. নিশ্চয় কিয়ামত আসবে, আমি তাকে গোপন রাখতে চাই, যেন প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের বিনিময় প্রাপ্ত হয়।	اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٥﴾
১৬. অতএব, তোমাকে যেন কিয়ামত [-এর প্রস্তুতি] হতে এমন কেউ বিরত না রাখে– যে ব্যক্তি তার প্রতি বিশ্বাস রাখে না এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, নতুবা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।	فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾
১৭. আর হে মূসা! তোমার ডান হাতে এটা কী?	وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾
১৮. তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এটা দ্বারা আমার বকরি-পালের জন্য পাতা পেড়ে দেই এবং এটা দ্বারা আমার আরো অনেক কাজ হয়ে থাকে।	قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾
১৯. আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা! তা নিক্ষেপ কর।	قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَاَنَا اخْتَرْتُكَ আর তোমাকে মনোনীত করেছি فَاسْتَمِعْ অতএব শুনে নাও لِمَا يُوْحٰى যা কিছু ওহী করা হচ্ছে তা।

১৪. اِنَّنِيْۤ اَنَا اللّٰهُ আমি-ই আল্লাহ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا আমি ভিন্ন আর কোনো মাবুদ নেই فَاعْبُدْنِيْ সুতরাং তুমি আমারই ইবাদত কর وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ এবং নামাজ পড় لِذِكْرِيْ আমাকে স্মরণ করার জন্যে।

১৫. اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ কিয়ামত দিবস আসবে اَكَادُ اُخْفِيْهَا আমি তাকে গোপন রাখতে চাই لِتُجْزٰى যেন বিনিময় প্রাপ্ত হয় كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেকে بِمَا تَسْعٰى স্বীয় কৃতকর্মের।

১৬. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا অতএব তোমাকে যেন কিয়ামত (-এর প্রস্তুতি) হতে বিরত না রাখে مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا এমন কেউ যে ব্যক্তি তার উপর বিশ্বাস রাখে না وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে فَتَرْدٰى নতুবা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৭. وَمَا تِلْكَ এটা কি بِيَمِيْنِكَ তোমার ডানে হাতে يٰمُوْسٰى হে মূসা।

১৮. قَالَ তিনি বললেন هِيَ عَصَايَ এটা আমার লাঠি اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا আমি এর উপর ভর দেই وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ এবং এটা দ্বারা আমার বকরি পালের জন্য পাতা পেড়ে দেই وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى এবং এটা দ্বারা আমার আরো অনেক কাজ হয়ে থাকে।

১৯. قَالَ আল্লাহ বললেন اَلْقِهَا তা নিক্ষেপ কর يٰمُوْسٰى হে মূসা।

فَأَلْقٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾	২০. তখন তিনি তাকে নিক্ষেপ করলেন, তৎক্ষণাৎ তা এক ধাবমান সাপে পরিণত হলো।
قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُوْلٰى ﴿٢١﴾	২১. আল্লাহ তা'আলা বললেন, তা ধরে ফেল, ভয় করো না। আমি এখনই তাকে তাঁর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনব।
وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً أُخْرٰى ﴿٢٢﴾	২২. আর তুমি তোমার [ডান] হাত স্বীয় [বাম] বগল সংলগ্ন কর, তা [শ্বেত, কুষ্ঠ ইত্যাদি] কোনো দোষ ছাড়াই অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে বের হবে, এটা দ্বিতীয় নিদর্শন হবে।
لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾	২৩. যেন আমি আমার বড় নিদর্শনসমূহের কতক নিদর্শন তোমাকে দেখিয়ে দেই।
اِذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾	২৪. [এগুলো নিয়ে] তুমি ফেরাউনের নিকট যাও, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে।
قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾	২৫. তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার হৃদয় প্রশস্ত করে দিন।
وَيَسِّرْ لِيْٓ أَمْرِيْ ﴿٢٦﴾	২৬. এবং আমার কার্য সহজ করে দিন।
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾	২৭. আর আমার জিহ্বা হতে জড়তা দূর করে দিন।
يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾	২৮. যাতে লোকে আমার কথা বুঝতে পারে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. فَأَلْقٰهَا তখন তিনি তাকে নিক্ষেপ করলেন فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى তৎক্ষণাৎ তা এক ধাবমান সাপে পরিণত হলো।

২১. قَالَ আল্লাহ বললেন خُذْهَا তা ধরে ফেল وَلَا تَخَفْ, ভয় করো না سَنُعِيْدُهَا আমি এখনই তাকে ফিরিয়ে আনব سِيْرَتَهَا الْأُوْلٰى তাঁর পূর্বাবস্থায়।

২২. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ আর তুমি তোমার (ডান) হাত স্বীয় (বাম) বগল সংলগ্ন কর تَخْرُجْ তা বের হবে بَيْضَآءَ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ কোনো দোষ ছাড়াই اٰيَةً أُخْرٰى এটা দ্বিতীয় নিদর্শন হবে।

২৩. لِنُرِيَكَ যেন আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى আমার বড় নিদর্শনসমূহের কতক নিদর্শন।

২৪. اِذْهَبْ তুমি যাও إِلٰى فِرْعَوْنَ ফেরাউনের নিকট إِنَّهٗ طَغٰى নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

২৫. قَالَ তিনি বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ আমার হৃদয় প্রশস্ত করে দিন।

২৬. وَيَسِّرْ لِيْٓ এবং সহজ করে দিন أَمْرِيْ আমার কার্য।

২৭. وَاحْلُلْ আর দূর করে দিন عُقْدَةً জড়তা مِّنْ لِّسَانِيْ আমার জিহবা হতে।

২৮. يَفْقَهُوْا যাতে লোকেরা বুঝতে পারে قَوْلِيْ আমার কথা।

অনুবাদ	আয়াত
২৯. এবং আমার জন্য একজন সহায়ক নিযুক্ত করে দেন, আমার পরিজন হতে।	وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾
৩০. অর্থাৎ, হারূনকে– যিনি আমার ভ্রাতা।	هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾
৩১. আর তাঁর দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করে দিন।	اشْدُدْ بِهٖۤ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾
৩২. এবং তাঁকে আমার কার্যে শরিক করে দিন।	وَاَشْرِكْهُ فِيْۤ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾
৩৩. যেন আমরা উভয় আপনার পবিত্রতা অধিক পরিমাণে বর্ণনা করতে পারি।	كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾
৩৪. আর যেন আপনার জিকির অধিক পরিমাণে করতে পারি।	وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾
৩৫. নিশ্চয় আপনি আমাদেরকে ভালোরূপে দেখছেন।	اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾
৩৬. আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হলো।	قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾
৩৭. আর আমি তো তোমার প্রতি আরো অনুগ্রহ করেছিলাম,	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰۤى ﴿٣٧﴾
৩৮. স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি সে বিষয়টি তোমার মাকে গায়বি নির্দেশ দ্বারা জানিয়ে দিয়েছিলাম যা গায়বি নির্দেশ দ্বারা জানাবার ছিল।	اِذْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّكَ مَا يُوْحٰۤى ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. وَاجْعَلْ لِّيْ এবং আমার জন্য নিযুক্ত করে দিন। وَزِيْرًا একজন সহায়ক مِّنْ اَهْلِيْ আমার পরিজন হতে।

৩০. هٰرُوْنَ অর্থাৎ হারূনকে। اَخِي যিনি আমার ভ্রাতা

৩১. اشْدُدْ بِهٖ আর তাঁর দ্বারা সুদৃঢ় করে দিন اَزْرِيْ আমার শক্তি

৩২. وَاَشْرِكْهُ আর তাঁকে শরিক করে দিন فِيْۤ اَمْرِيْ আমার কার্যে।

৩৩. كَيْ نُسَبِّحَكَ যেন আমরা উভয়ে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি। كَثِيْرًا অধিক পরিমাণে।

৩৪. وَّنَذْكُرَكَ আর যেন আপনার জিকির করতে পারি। كَثِيْرًا অধিক পরিমাণে।

৩৫. اِنَّكَ নিশ্চয় আপনি। كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا আমাদেরকে ভালোরূপে দেখছেন।

৩৬. قَالَ আল্লাহ বললেন قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হলো يٰمُوْسٰى হে মূসা।

৩৭. وَلَقَدْ مَنَنَّا আর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম عَلَيْكَ তোমার প্রতি مَرَّةً اُخْرٰى আরো।

৩৮. اِذْ اَوْحَيْنَاۤ স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি সেই বিষয়টি গায়বি নির্দেশ দ্বারা জানিয়ে দিয়েছিলাম اِلٰۤى اُمِّكَ তোমার মাতাকে مَا يُوْحٰى যা গায়বি নির্দেশ দ্বারা জানাবার ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুরআন শ্রবণের আদব : فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى -ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত রয়েছে, কুরআন শ্রবণ করার আদব এই যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাজে কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে, অন্য কোনো কাজে ব্যাপৃত হবে না, দৃষ্টি নিম্নগামী রাখবে এবং কালাম বোঝার প্রতি মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি এরূপ আদব সহকারে কালাম শ্রবণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা বোঝারও তৌফিক দান করেন। -[কুরতুবী]

إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ

-এই কালামে হযরত মূসা (আ.) - কে ধর্মের সমুদয় মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ, রেসালত ও পরকাল। فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى বলে রেসালতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে فَاعْبُدْنِيْ অর্থ শুধু আমার ইবাদত কর- আমার ব্যতীত কারো ইবাদত করো না। এটা তাওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর إِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ -বলে পরকালের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। فَاعْبُدْنِيْ -এই নির্দেশে নামাজের কথাও রয়েছে, কিন্তু নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাজ সমস্ত ইবাদতের সেরা ইবাদত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নামাজ ধর্মের স্তম্ভ, ঈমানের নূর এবং নামাজ বর্জন কাফেরদের আলামত।

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ : উদ্দেশ্য এই যে, নামাজের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ। নামাজ আদ্যোপান্ত জিকিরই জিকির- মুখে, অন্তকরণে এবং সর্বাঙ্গে জিকির। তাই নামাজে জিকির তথা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। কোনো কোনো হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী لِذِكْرِيْ শব্দের অর্থ এরূপও যে, কারও নিদ্রাভঙ্গ না হলে অথবা কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকার দরুন নামাজের কথা ভুলে গেলে এবং নামাজের সময় চলে গেলে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয় অথবা নামাজের কথা স্মরণ হয়, তখনই নামাজ পড়ে নিতে হবে।

أَكَادُ أُخْفِيْهَا : অর্থাৎ কিয়ামতের ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই, এমনকি পয়গম্বর ও ফেরেশতাদের কাছ থেকেও। أَكَادُ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকালের ভাবনা দিয়ে মানুষকে ঈমান ও সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি কিয়ামত আসবে-একথাও প্রকাশ করতাম না।

لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى : [যাতে প্রত্যেককে তার কর্মানুযায়ী ফল দেওয়া যায়]। এই বাক্যটি اٰتِيَةٌ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ সুস্পষ্ট যে, এখানে কিয়ামত আগমনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। রহস্য এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয়। এখানে কেউ সৎ ও অসৎকর্মের ফল লাভ করে না। কেউ কিছু ফল পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ নয়-একটি নমুনা হয় মাত্র। তাই এমন দিনক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন প্রত্যেক সৎ ও অসৎকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পুরোপুরি দেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি أَكَادُ أُخْفِيْهَا এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ এই যে, এখানে কিয়ামত ও মৃত্যুর সময়- তারিখ গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং ব্যক্তিগত কিয়ামত অর্থাৎ মৃত্যু ও বিশ্বজনীন কিয়ামত অর্থাৎ হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফেল না হোক। (রূহুল -মা'আনী)

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا : এতে হযরত মূসা (আ.) কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তুমি কাফের ও বেঈমানদের কথায় কিয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ বেছে নিয়ো না। তাহলে তা তোমার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য নবী ও পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাঁদের তরফ থেকে এরূপ অসাবধানতার সম্ভাবনা নেই। এতদসত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.) -কে এরূপ বলার আসল উদ্দেশ্য, তাঁর উম্মত ও সাধারণ মানুষকে শোনানো। এতে তারা বুঝবে যে, আল্লাহর পয়গম্বগণকেও যখন এমনভাবে তাকিদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের কতটুকু যত্নবান হতে হবে।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى -তোমার হাতে ওটা কি? -আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে এরূপ জিজ্ঞাসা করা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি কৃপা, অনুকম্পা ও মেহেরবানির সূচনা ছিল, যাতে বিস্ময়কর দৃশ্যাবলি দেখা ও আল্লাহর কালাম শোনার কারণে তাঁর মনে যে ভয় ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বোধন। এছাড়া এই প্রশ্নে আরও একটি রহস্য এই যে, পরক্ষণেই তাঁর হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা

অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমার হাতে কি আছে দেখে নাও। তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত করার মু'জিযা প্রদর্শন করা হলো। নতুবা হযরত মূসা (আ.) এর মনে এরূপ সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধ হয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি।

قَالَ هِيَ عَصَايَ : হযরত মূসা (আ.) -কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে কি? এর জওয়াবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এখানে আসল জওয়াবের অতিরিক্ত আরো তিনটি বিষয় আরজ করেছেন। (এক) এটা আমার লাঠি। (দুই) আমি একে অনেক কাজে লাগাই; প্রথমত এর উপর ভর দেই; দ্বিতীয়ত এর দ্বারা আঘাত করে আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং (তিন) এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও উদ্ধার হয়। এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত জওয়াবে ইশক ও মহব্বত এবং পরিপূর্ণ আদবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। ইশক মহব্বতের দাবি এই যে, প্রেমাস্পদ যখন অনুকম্পাবশত মনোযোগ দান করেছেন তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত, যাতে সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবি এই যে, সীমাতিরিক্ত নিঃসঙ্কোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেন وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ -অর্থাৎ আমি এর দ্বারা আরও অনেক কাজ নেই। এরপর তিনি সেসব কাজের বিস্তারিত বিবরণ দেননি। -[রূহুল-মা'আনী, মাযহারী]

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে এরূপ মাসআলা বের করা হয়েছে যে, প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয় নি, জওয়াবে তাও বর্ণনা করে দেওয়া জায়েজ।

মাস'আলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরও এই সুন্নত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার নিহিত আছে। -[কুরতুবী]

فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ : হযরত মূসা (আ.) -এর হাতের লাঠি আল্লাহর নির্দেশে নিক্ষেপ করার পর তা সাপে পরিণত হয়। এই সাপ সম্পর্কে কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে كَأَنَّهَا جَانٌّ -আরবি অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে جَانٌّ বলা হয়। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ -অজগর ও বৃহৎ মোটা সাপকে ثُعْبَانٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে حَيَّةٌ বলা হয়েছে এটা ব্যাপক শব্দ, প্রত্যেক ছোট বড় মোটা সরু সাপকে حَيَّةٌ বলা হয়। সাপটির অবয়ব ও আকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার অর্থ সম্ভবত এই যে, সাপটি শুরুতে সরু ও ছোট ছিল, এরপর মোটা ও বড় হয়ে যায় অথবা সাপ তো বড় ও অজগরই ছিল; কিন্তু বড় সাপ স্বভাবতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় না। কিন্তু মূসা (আ.)-এর এই অজগরটি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে খুব দ্রুত চলত। তাই দ্রুতগতির দিক দিয়ে একে جَانٌّ অর্থাৎ হালকা ছোট সাপ বলা হয়েছে। আয়াতে, كَأَنَّهَا শব্দটি দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিতও হতে পারে। কারণ এ শব্দটি তুলনার অর্থ দেয়। একটি বিশেষ গুণ অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এই অজগরকে جَانٌّ এর সাথে তুলনা করা হয়েছে।–(মাযহারী)

অথবা এটি যেখানে যেরূপ আকৃতি ধারণের প্রয়োজন হতো তাই ধারণ করতে সক্ষম ছিল। কখনো খুব সরু, কখনও বিশাল আকারের অজগর ইত্যাদি। ইমাম কুরতুবীর বর্ণনা অনুযায়ী চিকন সাপের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল বলে 'জান্ন' বলা হতো। লোকেরা দেখে ভীষণভাবে ভীত হতো বলে 'ছুওবানুন' বলা হতো।

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ : جَنَاحَكَ আসলে জন্তুর পাখাকে বলা হয়। এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ বগলের নীচে হাত রেখে যখন বের করবে, তখন তা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে تَخْرُجْ بَيْضَاءَ এর এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। -(মাযহারী)

اِذْهَبْ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ -স্বীয় রাসূলকে দু'টি বিরাট মু'জিযার অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করার পর আদেশ করা হয়েছে যে, এখন উদ্ধত ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্যে চলে যাও।

হযরত মূসা (আ.) যখন খোদায়ী কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুয়ত ও রেসালতের দায়িত্ব লাভ করেলেন, তখন নিজ সত্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলারই দ্বারস্থ হলেন। কারণ তাঁরই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে পাঁচটি

বিষয়ে দোয়া করলেন। প্রথম দোয়া رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার, আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যেন নবুয়তের জ্ঞান বহন করার উপযোগী হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দোয়া وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ (অর্থাৎ আমার কাজ সহজ করে দিন) এই উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুয়তের ফলশ্রুতি ছিল যে, কোনো কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীনে নয়। এটাও আল্লাহ তা'আলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে কারো জন্য কঠিনতরও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। একারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করবে :

اَللّٰهُمَّ الْطُفْ بِنَا فِىْ تَيْسِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ فَاِنَّ تَيْسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ-

অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ! প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করার ব্যাপারে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করে দেওয়া আপনার পক্ষে সহজ।)

তৃতীয় দোয়া : وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ -(অর্থাৎ আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।) এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মূসা (আ.) দুগ্ধ পান করার জমানায় তার জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফেরাউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মূসা দুধ ছেড়ে দিলে ফেরাউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্ররূপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন শিশু হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের দাড়ি ধরে তার গালে এক চপেটাঘাত করে বসেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করছিলেন। এক সময় এই ছড়ি দ্বারা তিনি ফেরাউনের মাথায় আঘাত করে বসেন। ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। স্ত্রী আছিয়া বললেনঃ রাজাধিরাজ! আপনি অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো এখনও ভালো-মন্দের পার্থক্য বোঝেনা। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফেরাউনকে পরীক্ষা করানোর জন্যে আছিয়া একটি পাত্রে জ্বলন্ত অঙ্গার ও অপর একটি পাত্রে মণিমুক্তা এনে হযরত মূসা (আ.)- এর সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অবুঝ শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে জ্বলন্ত অঙ্গারটিকে উজ্জ্বল ও সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্যে হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো হয় না। এতে ফেরাউন বুঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অজ্ঞতাবশত করেছে। কিন্তু এখানে কোনো সাধারণ শিশু ছিল না; ছিলেন আল্লাহর নবী রাসূল, যাঁর স্বভাব-প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেকেই অনন্যসাধারণ হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ.) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন, কিন্তু হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর হাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পাত্রে রেখে দিলেন এবং হযরত মূসা (আ.) তৎক্ষণাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তাঁর জিহ্বা পুড়ে গেল। এতে ফেরাউন বিশ্বাস করল যে, হযরত মূসা (আ.)- এর এই কর্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়, এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত। এ ঘটনা থেকেই হযরত মুসা (আ.)- এর জিহ্বায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কুরআনে একেই عُقْدَةً বলা হয়েছে এবং এটা দূর করার জন্যেই হযরত মূসা (আ.) দোয়া করেন।-(মাযহারী, কুরতুবী)

প্রথমোক্ত দুটি দোয়া ছিল সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য হাসিল করার জন্যে। তৃতীয় দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা নিরসনের জন্যে প্রার্থনা জানানো হয়েছে, কারণ রেসালত ও দাওয়াতের জন্যে স্পষ্টভাষীও বিশুদ্ধভাষী হওয়ারও একটি জরুরি বিষয়। পরবর্তী এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মূসা (আ.)- এর সব দোয়া কবুল করা হয়। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, জিহ্বার তোতলামিও দূরীকরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূনকে রেসালতের কাজে সহকারী করার যে দোয়া করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا অর্থাৎ হারূন আমার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী। এ থেকে জানা যায় যে, তোতলামির প্রভাব কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। এছাড়া ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর চরিত্রে যেসব দোষারোপ করেছিল; তন্মধ্যে একটি ছিল এই, وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ -অর্থাৎ সে তার বক্তব্য পরিষ্কার ব্যক্ত করতে পারে না। কোনো কোনো আলেম এর উত্তরে বলেন : হযরত মূসা (আ.) স্বয়ং তাঁর দোয়ায় জিহ্বার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকু লোকেরা তাঁর কথা বুঝতে পারে। বলা বাহুল্য, সেই পরিমাণ জড়তা দূর করে দেওয়া হয়েছিল। এরপরও তোতলামির সামান্য প্রভাব থাকলে তা দোয়া কবুল হওয়ার পরিপন্থি নয়।

চতুর্থ দোয়া وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ -অর্থাৎ আমার পরিবাবর্গ থেকেই আমার জন্যে একজন উজির করুন। পূর্বোক্ত তিনটি দোয়া ছিল নিজ সত্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া রেসালতের করণীয় কাজ আনজাম দেওয়ার জন্যে উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক রাখে। হযরত মূসা (আ.) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উজির নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উজিরের অর্থই বোঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উজির তার বাদশাহর বোঝা দায়িত্ব সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উজির বলা হয়। এ থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, কোনো সাংগঠনিক কাজ অথবা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বাগ্রে সহকর্মী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পছন্দসই সাহায্যকারী পাওয়া গেলে পরবর্তীতে সব কাজ সহজ হয়ে যায়। সহকর্মীদল ভ্রান্ত হলে যাবতীয় উপায় ও উপকরণাদি অকেজো হয়ে পড়ে। আজকাল রাষ্ট্র ও সরকারসমূহে যেসব দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর আসল কারণ রাষ্ট্রপ্রধানের সহকর্মী মন্ত্রী ও দায়িত্বশীলদের কর্তব্যবিমুখতা, দুষ্কর্ম ও অযোগ্যতা ছাড়া কিছুই নয়।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহ তা'আলা যখন কেনো ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভালো কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সৎ উজির দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোনো জরুরি কাজ ভুলে গেলে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উজির তাতে তাঁর সাহায্য করেন। –[নাসায়ী]

এই দোয়ায় হযরত মূসা (আ.) যে উজির প্রার্থনা করেছেন, তার সাথে مِنْ اَهْلِيْ কথাটিও যুক্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই উজির পরিবারের মধ্যে থেকে হওয়া উচিত। কেননা পরিবারভুক্ত ব্যক্তির অভ্যাস, জানাশোনা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও মিল -মহব্বত থাকে। ফলে কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। তবে তাঁর মধ্যে কাজের যোগ্যতা থাকা এবং অপরের চাইতে উত্তম বিবেচনায় মনোনীত হওয়া শর্ত। নিছক স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে মনোনীত না হওয়া চাই। বর্তমানে যুগে সাধারণভাবে সততা ও আন্তরিকতা অনুপস্থিত এবং প্রকৃত কাজের চিন্তা কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই কোনো শাসনকর্তার সাথে তার আত্মীয়স্বজনকে মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করাকে নিন্দনীয় মনে করা হয়। যেক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার পুরোপুরি ভরসা থাকে, সেখানে কোনো সৎকর্মপরায়ণ আত্মীয়কে কোনো উচ্চপদ দান করা দোষের কথা নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির নিষ্পত্তির জন্য অধিক উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খোলাফায়ে রাশেদীন সাধারণত তাঁরাই হয়েছেন, যাঁরা নবী-পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রাখতেন।

হযরত মূসা (আ.) তাঁর দোয়ায় প্রথমে অনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, উজির আমার পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উজির করতে চাই, তিনি আমার ভাই হারূন - যাতে রেসালতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি।

হযরত হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.) থেকে তিন অথবা চার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন হযরত মূসা (আ.) যখন এই দোয়া করেন, তখন তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর দোয়ার ফলে তাঁকেও পয়গম্বর করে দেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদপ্রাপ্ত হন। হযরত মূসা (আ.)-কে যখন মিসরে ফেরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার জন্যে প্রেরণ করা হয়, তখন হযরত হারূন (আ.) কে মিসরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তিনি তাই করেন।-(কুরতুবী)

পঞ্চম দোয়া وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ -হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-কে নিজের উজির করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। এ অধিকার তাঁর ছিল; কিন্তু বরকতের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে নবুওয়ত ও রেসালতে শরিক করতেও চাইলেন। কোনো নবী ও রাসূলের এরূপ অধিকার নেই। তাই এর জন্যে পৃথক দোয়া করেছেন যে, তাঁকে আমার রেসালতের অংশীদার করে দিন।

সৎকর্মপরায়ণ সঙ্গী জিকির ও ইবাদতেও সাহায্যকারী হয় : كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا - অর্থাৎ হযরত হারূনকে উজির ও নবুয়তে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, আমরা বেশি পরিমাণে আপনার জিকির, পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাসবীহ ও জিকির মানুষ একাও যত ইচ্ছা করতে পারে। এতে কোনো সঙ্গীর

কাজের কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু চিন্তা করলে জানা যায় যে, তাসবীহ্ ও জিকিরের উপযুক্ত পরিবেশ এবং আল্লাহভক্ত সঙ্গীদের অনেক প্রভাব রয়েছে। যার সঙ্গী সহচর আল্লাহভক্ত নয়, সে ততটুকু ইবাদত করতে পারে না, যতটুকুক আল্লাহভক্তদের পরিবেশে একজন করতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতে চায়, তাঁর উপযুক্ত পরিবেশেও তালাশ করা উচিত।

এ পর্যন্ত পাঁচটি দোয়া সমাপ্ত হলো। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى -অর্থাৎ হে মুসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হলো।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى -হযরত মূসা (আ.) -কে এ সময় বাক্যালাপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নবুয়ত ও রেসালত দান করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাঁকে সেসব নিয়ামতও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবৎ প্রতিযুগে তাঁর জন্যে ব্যয়িত হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশঙ্কার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিস্ময়কর পন্থায় তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নিয়ামত উল্লেখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ববর্তী। এগুলোকে এখানে اُخْرٰى শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এরূপ নয় যে, এই নিয়ামতগুলো পরবর্তীকালের। বরং اُخْرٰى কোনো সময় শুধু 'অন্য' অর্থ বোঝায়। এতে অগ্রপশ্চাতের কোনো অর্থ থাকে না। এখানেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। -[রূহুল-মা'আনী]

হযরত মূসা (আ.)- এর এই আদ্যোপান্ত কাহিনী হাদীসের বরাত দিয়ে সম্মুখে বর্ণিত হবে।

اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰى : অর্থাৎ যখন আমি তোমার মাতার কাছে এমন ব্যাপারে ওহী করলাম যা ওহীর মাধ্যমেই জানানো যেতে পারত। তা এই যে, ফেরাউন তার সিপাহীদেরকে ইসরাঈলী নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তাঁর মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশঙ্কা করো না। আমি তাকে হেফাজতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। বলাবাহুল্য, এসব কথা বিবেকগ্রাহ্য নয়। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা এবং তাঁর হেফাজতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা একমাত্র তাঁর পক্ষে থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

নবী-রাসূল নয় -এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি? وَحْىٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা হয় সেই জানে অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারও বিশেষ গুণ নয়-নবী, রাসূল সাধারণ সৃষ্টিজীব বরং জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে।

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ- আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা এই অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। আলোচ্য اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَبِّكَ আয়াতেও আভিধানিক অর্থে 'ওহী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে মূসা-জননীর নবী অথবা রাসূল হওয়া জরুরি না। যেমন-মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহর বাণী পৌঁছেছিল, অথচ বিশিষ্ট আভিধানিক আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রাসূল ছিলেন না। ওহী সাধারণত ইলহামের আকারে হয়, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কারো অন্তরে কোনো বিষয়বস্তু জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এ আল্লাহর পক্ষে থেকেই। ওলী-আল্লাহগণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন। বরং আবূ হাইয়্যান ও অন্য কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণত হযরত মারইয়ামের ঘটনায় স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ওহী শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সত্তার সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংস্কার এবং তাবলীগ দাওয়াতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এর বিপরীতে নবুয়তের ওহীর উদ্দেশ্যেই জনসংস্কারের জন্যে কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্যে আদিষ্ট করা। এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অপরকেও তার নবুয়ত ও ওহী মানতে বাধ্য করা; যারা না মানে তাদেরকে কাফের আখ্যা দেওয়া।

ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুয়তের ওহী তথা পারিভাষিক ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে। কিন্তু নবুয়ত ও নবুয়তের ওহী শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোনো কোনো বুযুর্গের উক্তিতে একেই "ওহী-তাশরীয়ী" ও গায়রে-তাশরীয়ী" শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। শায়েখ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবীর কোনো কোনো বাক্যের বরাত দিয়ে নবুয়তের দাবিদার কাদিয়ানী তার দাবির বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং ইবনে আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَقِمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ باب اِفْعَالٌ বাব اِقَامَةً মাসদার (ق - و - م) মূলবর্ণ জিনস اجوف واوى অর্থ- তুমি কায়েম রাখ।

لِتُجْزٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب مضارع مجهول বহছ ضَرَبَ বাব جَزَاءً মাসদার (ج - ز - ى) মূলবর্ণ জিনস ناقص يائى অর্থ- যেন বিনিময় প্রাপ্ত হয়, যেন প্রতিফল দেওয়া হয়।

لَايَصُدَّنَّكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب نهى معروف بانون ثقيلة বহছ نَصَرَ বাব صَدٌّ মাসদার মূলবর্ণ (ص - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তোমাকে যেন বিরত না রাখে।

فَتَرْدٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر مضارع معروف বহছ سَمِعَ বাব رَدًى মাসদার (ر - د - ى) মূলবর্ণ জিনস ناقص يائى অর্থ- নতুবা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

اَهُشُّ : সীগাহ واحد متكلم مضارع معروف বহছ نَصَرَ বাব هَشٌّ মাসদার (ه - ش - ش) মূলবর্ণ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আমি পাতা পেড়ে দেই।

خُذْهَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ نَصَرَ বাব اَخْذٌ মাসদার (ا - خ - ذ) মূলবর্ণ জিনস مهموز فاء অর্থ- তুমি তা ধরে ফেল।

لَا تَخَفْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر نهى حاضر معروف বহছ سَمِعَ বাব خِيْفَةً، خَوْفً ও مخافة মাসদার মূলবর্ণ (خ - و - ف) জিনস اجوف واوى অর্থ- তুমি ভয় করো না।

سَنُعِيْدُهَا : সীগাহ جمع متكلم مضارع معروف বহছ باب اِفْعَالٌ বাব اِعَادَةً মাসদার (ع - و - د) মূলবর্ণ জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি এখনই তাকে ফিরিয়ে আনব।

اُضْمُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ نَصَرَ বাব ضَمٌّ মাসদার মূলবর্ণ (ض - م - م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তুমি সংলগ্ন কর।

لِنُرِيَكَ : সীগাহ جمع متكلم مضارع معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اِرَاءَةً মাসদার (ر - أ - ى) মূলবর্ণ জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ- যেন আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই/ দেখাই।

يَسِّرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ تَفْعِيْل বাব تَيْسِيْرً মাসদার মূলবর্ণ (ى - س - ر) জিনস مثال يائى অর্থ- আপনি সহজ করে দিন।

اُحْلُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ نَصَرَ বাব حَلٌّ মাসদার (ح - ل - ل) মূলবর্ণ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ আপনি দূর করে দিন, আপনি (গিরা গ্রন্থি) খুলে দিন।

اُشْدُدْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ نَصَرَ বাব شَدٌّ মাসদার (ش - د - د) মূলবর্ণ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আপনি সুদৃঢ় করে দিন।

اُوْتِيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر ماضى مجهول বহছ اِفْعَالٌ বাব اِيْتَاءً মাসদার اِفْعَالٌ বাব মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموزفاء) অর্থ- মঞ্জুর করা হলো, তোমাকে দেওয়া হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالَ هِىَ عَصَاىَ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ : এখানে قَالَ ফে'ল ও তার উহ্য যমীর ফায়েল মিলে مقول ; আর هِىَ মুবতাদা عَصَاىَ হলো তার খবর। আর اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا বাক্যটি হলো আর পরবর্তী বাক্য হলো حالية -এর আর عَلٰى غَنَمِىْ আর بِهَا হলো اَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ হলো اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا-এর উপর আতফ হয়েছে। আর اَهُشُّ -এর সাথে متعلق তদ্রূপ عَلٰى غَنَمِىْ ও اَهُشُّ -এর সাথে متعلق হয়েছে। -(ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৬৬)

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾

৩৯. তা এই যে, মূসাকে একটি সিন্দুকের মধ্যে রাখ অতঃপর তাঁকে নদীতে ফেলে দাও, অনন্তর নদী তাঁকে তীরে নিয়ে ফেলবে [এবং] এমন এক ব্যক্তি তাঁকে ধরে নেবে, যে আমারও শত্রু এবং তাঁরও শত্রু; আর ঢেলে দিলাম তোমার উপর আমার পক্ষ হতে স্নেহের নিদর্শন, আর যেন তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ ﴿٤٠﴾

৪০. যখন তোমার ভগ্নি চলতে চলতে [ফেরাউন-গৃহে] আসল তখন বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান বলে দেব– যিনি একে লালন-পালন করতে পারবে? তৎপর আমি তোমাকে আবার তোমার মার নিকট পৌছে দিলাম, যেন তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে বিষণ্ন না থাকে; আর তুমি এক [কিবতী] ব্যক্তিকে প্রাণে মেরেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে সে চিন্তা হতে মুক্তি দিলাম এবং তোমাকে নানাবিধ পরীক্ষায় ফেললাম। তৎপর তুমি কয়েক বৎসর বাস করলে মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে, তঃপর হে মূসা! তুমি এক নির্ধারিত সময়ে এসেছ।

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾

৪১. এবং আমি তোমাকে আমার [নবুয়তের] জন্য মনোনীত করেছি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ তা এই যে, মূসাকে একটি সিন্দুকের মধ্যে রাখ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ অতঃপর তাঁকে নদীতে ফেলে দাও فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ অনন্তর নদী তাঁকে তীরে নিয়ে ফেলবে يَأْخُذْهُ এমন এক ব্যক্তি তাঁকে ধরে নেবে عَدُوٌّ لِّي যে আমারও শত্রু وَعَدُوٌّ لَّهُ এবং তাঁরও শত্রু, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ আর ঢেলে দিলাম তোমার উপর مَحَبَّةً مِّنِّي আমার পক্ষ হতে স্নেহের নিদর্শন وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, আর যেন তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

৪০. إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ যখন তোমার ভগিনী চলতে চলতে (ফেরাউন গৃহে) আসল فَتَقُولُ তখন বলল هَلْ أَدُلُّكُمْ আমি কি তোমাদেরকে সন্ধান বলে দেব عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ এমন ব্যক্তির যিনি একে লালন-পালন করতে পারবে فَرَجَعْنَاكَ তৎপর আমি তোমাকে আবার পৌছে দিলাম إِلَىٰ أُمِّكَ তোমার মাতার নিকট كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا যেন তার চক্ষু জুড়ায় وَلَا تَحْزَنَ সে বিষণ্ন না থাকে وَقَتَلْتَ نَفْسًا, আর তুমি এক (কিবতী) ব্যক্তিকে প্রাণে মেরেছিলে فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ অতঃপর আমি তোমাকে সেই চিন্তা হতে মুক্তি দিলাম وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, এবং তোমাকে নানাবিধ পরীক্ষায় ফেললাম فَلَبِثْتَ سِنِينَ তৎপর তুমি কয়েক বছর বাস করলে فِي أَهْلِ مَدْيَنَ মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ অতঃপর হে মূসা! তুমি এক নির্ধারিত সময়ে এসেছ।

৪১. وَاصْطَنَعْتُكَ, এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি لِنَفْسِي আমার (নবুয়তের) জন্যে।

৪২. তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।	اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ﴿٤٢﴾
৪৩. তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে।	اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٤٣﴾
৪৪. অতঃপর তার সাথে নম্র কথা বল, হয় সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ভয় করবে।	فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾
৪৫. তাঁরা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আশঙ্কা হয়, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে।	قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ﴿٤٥﴾
৪৬. আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, সব শুনছি ও দেখছি।	قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ﴿٤٦﴾
৪৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তার নিকট যাও এবং বল, আমরা উভয়ে তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত। অতএব, বনী ইসরাঈলদেরকে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও, এবং তাদেরকে নির্যাতন করো না; আমরা তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে [নবুয়তের] নিদর্শন এনেছি; আর নিরাপত্তা রয়েছে এরূপ ব্যক্তির জন্য, যে সৎপথে চলে।	فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪২. اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ তুমি এবং তোমার ভাই যাও بِاٰيٰتِيْ আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।

৪৩. اِذْهَبَآ তোমরা উভয়ে যাও اِلٰى فِرْعَوْنَ ফেরাউনের নিকট اِنَّهٗ طَغٰى সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

৪৪. فَقُوْلَا لَهٗ অতঃপর তার সাথে বল قَوْلًا لَّيِّنًا নম্র কথা لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে اَوْ يَخْشٰى কিংবা ভয় করবে।

৪৫. قَالَا তারা বলবেন رَبَّنَآ হে আমাদের প্রতিপালক اِنَّنَا نَخَافُ আমাদের আশঙ্কা হয় اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে اَوْ اَنْ يَّطْغٰى অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে।

৪৬. قَالَ আল্লাহ বললেন لَا تَخَافَآ তোমরা ভয় করো না اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ আমি তোমাদের সাথে আছি اَسْمَعُ وَاَرٰى সব শুনছি ও দেখছি।

৪৭. فَاْتِيٰهُ সুতরাং তোমরা উভয়ে তার নিকট যাও فَقُوْلَآ এবং বল اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ আমরা উভয়ে তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ অতএব বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও وَلَا تُعَذِّبْهُمْ এবং তাদেরকে নির্যাতন করোনা قَدْ جِئْنٰكَ আমরা তোমার নিকট এনেছি بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শন وَالسَّلٰمُ আর নিরাপত্তা রয়েছে عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى এরূপ ব্যক্তির জন্য যে সৎপথে চলে।

৪৮. আমাদের প্রতি এ ওহী এসেছে যে, আজাব ঐ ব্যক্তির উপর হবে- যে মিথ্যা আরোপ করে এবং পরাঙ্মুখ হয়।	إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾
৪৯. সে বলল, হে মূসা! তোমাদের প্রতিপালক আবার কে?	قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ﴿٤٩﴾
৫০. মূসা বললেন, আমাদের প্রতিপালক তিনিই- যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযথ আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।	قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾
৫১. ফেরাউন বলল, তবে পূর্বকালের লোকদের কী অবস্থা হয়েছে?	قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿٥١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا আমাদের প্রতি এ ওহী এসেছে যে أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ আজাব ঐ ব্যক্তির উপর হবে যে মিথ্যারোপ করে وَتَوَلَّىٰ এবং পরাঙ্মুখ হয়।

৪৯. قَالَ সে বলল فَمَنْ رَبُّكُمَا তোমাদের প্রতিপালক আবার কে يَا مُوسَىٰ হে মূসা

৫০. قَالَ হযরত মূসা বললেন رَبُّنَا আমাদের প্রতিপালক তিনি الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ যিনি প্রত্যেক বস্তুকে যথাযথ আকৃতি দান করেছেন ثُمَّ هَدَىٰ অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।

৫১. قَالَ ফেরাউন বলল فَمَا بَالُ তবে কি অবস্থা হয়েছে الْقُرُونِ الْأُولَىٰ পূর্বকালের লোকদের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মূসা জননীর নাম : তাফসীরে রূহুল-মা'আনীতে আছে যে, তাঁর প্রসিদ্ধ নাম 'ইউহানিব'। 'ইতকান' গ্রন্থে তার নাম 'লাহইরানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী, লিখিত রয়েছে। কেউ কেউ তাঁর নাম 'বারেখা' এবং কেউ কেউ 'বাযখত' বলেছেন। যারা তাবিজ ইত্যাদি করে, তাদের কেউ কেউ তাঁর নামের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন : আমরা এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভব এগুলো ভিত্তিহীন জনশ্রুতি।

فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ -এখানে يَمٌّ শব্দের অর্থ দরিয়া এবং বাহ্যত নীলনদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতে এক আদেশ হযরত মূসা (আ.) এর মাতাকে দেওয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুকে পুরে দরিয়ার ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যত চেতনাহীন বোধশক্তিহীন। একে আদেশ দেওয়ার মর্ম বোঝে আসে না। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বোঝানো হয়নি, বরং খবর দেওয়া হয়েছে যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণের মতে এখানে আদেশই বোঝানো হয়েছে এবং দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা তাদের মতে জগতের কোনো সৃষ্টবস্তু বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন নয়, বরং সবার মধ্যেই বোধশক্তি ও উপলব্ধি বিদ্যমান রয়েছে। এই বোধশক্তি ও উপলব্ধির কারণেই কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সব বস্তু আল্লাহর তাসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছে। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, মানব, জিন ও ফেরেশতা ছাড়া কোনো সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি চেতনা নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালে বিধি-বিধান আরোপিত হতে পারে। তবে এতটুকু পার্থক্য

অবশ্যই আছে মানব, জিন ও ফেরেশতা ছাড়া কোনো সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি ও চেতনা নেই যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধিবিধান আরোপিত হতে পারে। এ সম্পর্কে সাধক রুমী চমৎকার বলেছেন :

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند * با من و تو مردہ با حق زندہ اند

মাটি, বাতাস, পানি ও আগুন আল্লাহর বান্দা। আমার ও তোমার কাছে তারা মৃত কিন্তু আল্লাহর কাছে জীবিত।

يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ : অর্থাৎ এই সিন্দুক ও তন্মধ্যস্থিত শিশুকে সমুদ্রের তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুঁড়িয়ে নেবে, যে আমার ও মূসার উভয়ের শত্রু, অর্থাৎ ফেরাউন। ফেরাউন যে আল্লাহর দুশমন, তা তার কুফরের কারণে সুস্পষ্ট। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর দুশমন হওয়ার ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ তখন ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর দুশমন ছিল না, বরং তাঁর লালনে পালনে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেছিল। এতদসত্ত্বেও তাকে হযরত মূসা (আ.)-এর শত্রু বলা হয় শেষ পরিণামের দিক বিবেচনা করে। অর্থাৎ অবশেষে ফেরাউন শত্রুতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর জ্ঞানে ছিল। একথা বলাও অযৌক্তিক হবে না যে, ফেরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখন হযরত মূসা (আ.)- এর শত্রুই ছিল। সে স্ত্রী আছিয়ার মন রক্ষার্থেই শিশু মূসার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তাই পরে যখন তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই মূসাকে হত্যার আদেশ জারি করেছিল, যা আছিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে প্রতিহত হয়ে যায়।

-[রূহুল মা'আনী, মাযহারী]

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي : এখানে مَحَبَّةً শব্দটি-আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন : আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে তোমার অস্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে যে-ই তোমাকে দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হতো। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইকরামা (রা.) থেকে এরূপ তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। -[মাযহারী]

وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي : صَنَعْتَ শব্দ দ্বারা এখানে লালন-পালন বোঝানো হয়েছে। আরবে صَنَعْتُ فَرَسِي عَلَىٰ عَيْنِي বাকপদ্ধতিটি এ অর্থেই বলা হয়। অর্থাৎ আমি আমার ঘোড়ার উত্তম লালন-পালন করেছি। عَلَىٰ عَيْنِي বলে عَلَىٰ حِفْظِي বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর উত্তম লালন-পালন সরাসরি হবে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে। তাই মিসরের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্ব ফেরাউনের গৃহে এই উদ্দেশ্য এমনভাবে সাধন করা হয়েছে যে, সে জানত না নিজের হাতে নিজেরই দুশমনকে লালন-পালন করছে। -[মাযহারী]

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ : হযরত মূসা (আ.)-এর ভগিনী পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন। এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا অর্থাৎ আমি বার বার তোমাকে পরীক্ষা করেছি– (ইবনে আব্বাস) অথবা তোমাকে বারবার পরীক্ষায় ফেলেছি।-(যাহ্হাক)

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ নাসায়ীর একটি দীর্ঘ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে। তা এই :

মূসা (আ.)-এর বিস্তারিত কাহিনী : নাসায়ীর তাফসীর অধ্যায়ে 'হাদীসুল ফুতূন' নামে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে যে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ইবনে কাছীরেও তা পুরোপুরি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই রেওয়ায়েতটিকে মারফূ' বর্ণনা আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে কাছীর নিজেও তা সমর্থন করেছেন, وَصَدَّقَ ذَلِكَ عِنْدِي অর্থাৎ এ হাদীসটির মারফূ' হওয়া আমার মতে ঠিক। অতঃপর তিনি একটি প্রমাণও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এরপর একথাও লিখেছেন যে, ইবনে-জারীর এবং ইবনে আ'বী হাতেমও তাঁদের তাফসীর গ্রন্থে এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু একে মাওকূফ অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিজের বর্ণনা বলেছেন। মারফূ' হাদীসের বাক্য এতে কুত্রাপি কদাচিৎ হয়েছে। মনে হয়, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই রেওয়ায়েতটি কা'ব-আহবারের কাছ থেকে লাভ করেছেন, যেমন অনেক জায়গায় এরূপ হয়েছে। কিন্তু হাদীসের সমালোচক ইবনে কাছীর এবং হাদীসের ইমাম নাসায়ী একে মারফূ' বলে স্বীকার করেন। যারা মারফূ' বলে স্বীকার করেন না, তারাও এর বিষয়বস্তু অস্বীকার করেন না। অধিকাংশ বিষয়বস্তু স্বয়ং কুরআনের আয়াতে বিধৃত হয়েছে। তাই আদ্যোপান্ত হাদীসের অনুবাদ লেখা হচ্ছে। এতে হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্তারিত ঘটনার সাথে সাথে অনেক শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয়বস্তুও জানা যাবে।

হাদীসুল ফুতূন : ইমাম নাসায়ীর সনদে কাসেম ইবনে আবূ আইয়ূবের বর্ণনা : আমাকে সাঈদ ইবনে জুবায়ের জানিয়েছেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে কুরআনের وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا আয়াতের তাফসীর

জিজ্ঞেস করলাম যে, এখানে فُتُونًا বলে কি বুঝানো হয়েছে? ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, এই ঘটনা অতিদীর্ঘ। প্রত্যুষে আমার কাছে এসো, বলে দিব। পরদিন খুব ভোরেই আমি তাঁর কাছে হাজির হলাম, যাতে গতকালের ওয়াদা পুরা করিয়ে নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, শোন, একদিন ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গ আলোচনা প্রসঙ্গে বলাবলি করল, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীমের কাছে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে পয়গম্বর ও বাদশাহ পয়দা করবেন। এ কথা শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, হ্যাঁ, বনী ইসরাঈল অপেক্ষা করছে যে, তাদের মধ্যে কোনো নবী ও রাসূল জন্মগ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে তারা বিন্দুমাত্রও দ্বিধাগ্রস্ত নয়। পূর্বে তাদের ধারণা ছিল যে, সে নবী হলেন ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব (আ.)। তাঁর ইন্তেকালের পর তারা বলতে শুরু করেছে যে, ইউসুফ (আ.) ওয়াদাকৃত পয়গম্বর নন। (অন্য কোনো নবী ও রাসূলের মাধ্যমে এই ওয়াদা পূর্ণ হবে।) ফেরাউন এ কথা শুনে চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল যে, বনী ইসরাঈল তো এখন তার গোলাম। যদি তাদের মধ্যে কোনো নবী ও রাসূল পয়দা হয়, তবে বনী ইসরাঈলকে অবশ্যই মুক্ত করবে। তাই সে সভাসদদেরকে জিজ্ঞেস করল, এই সম্ভাব্য বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি? সভাসদরা পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, ইসরাঈল বংশে কোনো ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করতে হবে। সেমতে এ কাজে বিশেষ বাহিনী নিযুক্ত করা হলো। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছুরি থাকত। তারা বনী ইসরাঈলের ঘরে ঘরে তল্লাশী চালিয়ে ছেলে সন্তান দৃষ্টিগোচর হলেই তাকে হত্যা করে ফেলত।

বেশ কিছুকাল পর্যন্ত এই কর্মপদ্ধতি অব্যাহত থাকার পর তাদের চৈতন্যোদয় হলো। তারা দেখল যে, দেশের যাবতীয় মেহনত-মজুরি ও শ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম তো বনী-ইসরাঈলই আনজাম দেয়। এভাবে হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত থাকলে তাদের বৃদ্ধদের মৃত্যুর পর ভবিষ্যতে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে কোনো পুরুষও অবশিষ্ট থাকবে না, যে দেশের কাজকর্ম আনজাম দেবে। ফলে পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম আমাদেরকেই সম্পন্ন করতে হবে। তাই পুনঃসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, প্রথম বছর যেসব ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং দ্বিতীয় বছর যারা জন্মগ্রহণ করবে, তাদেরকে হত্যা করা হবে। ছেড়ে দেওয়া ও হত্যা করার ধারা এই নিয়মেই চলবে। এভাবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিছুসংখ্যক যুবকও থাকবে, যারা বৃদ্ধদের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তাদের সংখ্যা এতো বেশিও হবে না, যা ফেরাউনী রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। সেমতে এ আইনই রাজ্যময় জারি করে দেওয়া হলো। এ দিকে আল্লাহর কুদরত এভাবে প্রকাশ পেল যে, মূসা-জননীর গর্ভে এক সন্তান তখনই জন্মগ্রহণ করল যখন সন্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়ার বছর ছিল। এ সন্তান ছিল হযরত হারূন (আ.)। ফেরাউনী আইনের দৃষ্টিতে তাঁর কোন বিপদাশঙ্কা ছিল না। এর পরবর্তী পুত্রসন্তান হত্যার বছরে হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার গর্ভসঞ্চার হলে তিনি দুঃখে বিষাদে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কারণ এই সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই তাকে হত্যা করতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, হে ইবনে জুবায়ের! فتون অর্থাৎ পরীক্ষার এ হচ্ছে প্রথম পর্ব। মূসা (আ.) তখনও দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেননি, এমতাবস্থায় তাঁর হত্যার পরিকল্পনা প্রস্তুত ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা-জননীকে ইলহামী ইশারার মাধ্যমে এরূপ সান্ত্বনা দিলেন :

لَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

অর্থাৎ তুমি ভয় ও দুঃখ করো না। আমি তার হেফাজত করব এবং কিছুদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর আমি তাঁকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দেব। অতঃপর তাকে আমার রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করে নেব। যখন হযরত মূসা (আ.) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাতাকে আদেশ দিলেন, বাচ্চাকে একটি সিন্দুকে রেখে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। মূসা-জননী এ আদেশ পালন করলেন। তিনি যখন সিন্দুকটি দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলেন, তখন শয়তান তাঁর মনে এরূপ কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করল যে, তুমি এ কি করলে? যদি বাচ্চা তোমার কাছে থেকে নিহতও হতো, তবে তুমি নিজ হাতে তার কাফন-দাফন করে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে। এখন তো তাঁকে সামুদ্রিক জন্তুরা খেয়ে ফেলবে। মূসা-জননী এই দুঃখ ও বিষাদে মুহ্যমান ছিলেন, এমন সময় দরিয়ার ঢেউ সিন্দুকটিকে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর নিক্ষেপ করল। সেখানে ফেরাউনের বাঁদি-দাসীরা গোসল করতে যেত। তারা সিন্দুকটি দেখে তা কুড়িয়ে আনল এবং খোলার ইচ্ছা করল। তখন তাদের একজন বলল, যদি এতে টাকাকড়ি থাকে এবং আমরা খুলে ফেলি, তবে ফেরাউন-পত্নী সন্দেহ করবে যে, আমরা কিছু টাকাকড়ি সরিয়ে ফেলেছি। এরপর আমরা যাই বলি না কেন, সে বিশ্বাস করবে না। তাই সবাই একমত হলো যে, সিন্দুকটি যেমন আছে, তেমনিই ফেরাউন-পত্নীর সামনে পেশ করা হবে।

ফেরাউন-পত্নী সিন্দুক খুলেই তাতে একটি নবজাত শিশুকে দেখতে পেলেন। দেখা মাত্রই শিশুর প্রতি তাঁর মনে গভীর মায়ামমতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, যা ইতঃপূর্বে কোনো শিশুর প্রতি হয়নি। এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي উক্তিরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। অপরদিকে হযরত মূসা-জননী শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে আল্লাহ তা'আলার উপরিউক্ত ওয়াদা ভুলে গেলেন এবং কুরআনের ভাষায় তাঁর অবস্থা দাঁড়াল فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا অর্থাৎ মূসা-জননীর অন্তর যাবতীয় আনন্দ ও কল্পনা থেকে শূন্য হয়ে গেল। পুত্রের চিন্তা ছাড়া তাঁর অন্তরে আর কোনো কিছুই ছিল না। এদিকে পুত্রসন্তানের হত্যাকার্যে আদিষ্ট সিপাহীরা যখন জানতে পারল যে, ফেরাউনের গৃহে একটি ছেলে-সন্তান আগমন করেছে, তখন তারা ছুরি নিয়ে ফেরাউন পত্নীর কাছে উপস্থিত হলো এবং দাবি করল যে, ছেলেটিকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন। আমরা তাকে হত্যা করব।

এ পর্যন্ত পৌঁছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইবনে জুবায়েরকে আবার বললেন, হে ইবনে জুবায়ের! এটা হযরত মূসা (আ.)-এর পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব।

ফেরাউন-পত্নী সিপাহীদেরকে বললেন, একটু থাম। একটি মাত্র ছেলের কারণে তো বনী ইসরাঈলের শক্তি বেড়ে যাবে না। আমি ফেরাউনের কাছে যাচ্ছি। দেখি, তিনি ছেলেটির প্রাণভিক্ষা দেন কিনা! ফেরাউন তাকে ক্ষমা করলে উত্তম, নতুবা তোমাদের কাজে আমি বাধা দেব না; ছেলেটিকে তোমাদের হাতেই তুলে দেব। একথা বলে তিনি ফেরাউনের কাছে গেলেন এবং বললেন, এই শিশুটি আমার ও তোমার চোখের মণি। ফেরাউন বলল, হাঁ, তোমার চোখের মণি হওয়া তো বুঝাই যায়; কিন্তু আমি এরূপ মণির প্রয়োজন অনুভব করি না।

অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কসম! যদি ফেরাউন তখন নিজের চোখের মণি হওয়া স্বীকার করে নিত, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকেও হেদায়েত করতেন, যেমন তার পত্নী আছিয়াকে হেদায়েত করেছেন।

মোটকথা, স্ত্রীর কথায় ফেরাউন শিশুকে হত্যার কবল থেকে মুক্ত করে দিল। এখন ফেরাউন-পত্নী তাকে দুধ পান করানোর জন্য আশেপাশের মহিলাদেরকে ডাকল। সবাই এ কাজ আনজাম দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শিশুটি কারো স্তন্য পান করল না। (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ) এখন ফেরাউন-পত্নী মহাভাবনায় পড়লেন যে, যদি শিশুটি কারো দুধ গ্রহণ না করে, তবে জীবিত থাকবে কিভাবে? তিনি শিশুটিকে বাঁদিদের হাতে দিয়ে বললেন, একে বাজারে এবং জনসমাবেশে নিয়ে যাও। সম্ভবত সে কোনো মহিলার দুধ কবুল করবে।

এদিকে মূসা-জননী পাগলপারা হয়ে নিজ কন্যাকে বললেন, বাইরে গিয়ে তাঁর একটু খোঁজ নাও এবং লোকদের কাছে জিজ্ঞেস কর যে ঐ সিন্দুক ও নবজাত শিশুর কি দশা হয়েছে, সে জীবিত আছে, না সামুদ্রিক জন্তুর আহারে পরিণত হয়েছে? হযরত মূসা (আ.)-এর হেফাজত ও কয়েকদিন পর তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার যে ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা গর্ভাবস্থায় তাঁর সাথে করেছিলেন, তখন পর্যন্ত সেই ওয়াদা তাঁর স্মরণে ছিল না। হযরত মূসা ভগিনী বাইরে গিয়ে আল্লাহর কুদরতের এই লীলা দেখতে পেলেন যে, ফেরাউনের বাঁদিরা শিশুটিকে কোলে নিয়ে ধাত্রীর খোঁজে ঘোরাফেরা করছে। সে যখন জানতে পারল যে, শিশুটি কারো দুধ গ্রহণ করছে না এবং এজন্য বাঁদিরা খুব উদ্বিগ্ন, তখন তাদেরকে বলল, আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব যেখানে আশা করা যায় যে, সে তাদের দুধ গ্রহণ করবে এবং তারাও একে শুভেচ্ছা ও আদর-যত্ন সহকারে লালন-পালন করবে। একথা শুনে বাঁদিরা তাকে পাকড়াও করল। তাদের সন্দেহ হলো যে, বোধ হয় এই মহিলাই শিশুটির জননী অথবা কোনো নিকট-আত্মীয়া। ফলে সে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারছে যে, ঐ পরিবার তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী। তখন ভগিনীও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।

এখানে পৌঁছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আবার ইবনে জুবায়েরকে বললেন, এটা ছিল পরীক্ষার তৃতীয় পর্ব।

তখন মূসা-ভগিনী নতুন কথা উদ্ভাবন করে বলল, ঐ পরিবারটি শিশুর হিতাকাঙ্ক্ষী বলায় আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা রাজদরবারে পৌঁছতে পারবে এবং আর্থিক দিক দিয়ে অনেক লাভবান হবে-এই আশায় তারা শিশুটির আদর-যত্নে ও শুভেচ্ছায় কোনো ত্রুটি করবে না। এই ব্যাখ্যা শুনে বাঁদিরা তাকে ছেড়ে দিল। সে গৃহে ফিরে মাতাকে আদ্যোপান্ত ঘটনার সংবাদ দিল। মাতা তাঁকে নিয়ে বাঁদিরা যেখানে সমবেত ছিল, সেখানে পৌঁছলেন। বাঁদিদের কথায় তিনি শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। হযরত মূসা (আ.) তৎক্ষণাৎ তাঁর স্তনের সাথে একাত্ম হয়ে দুধ পান করতে লাগলেন এবং পেট ভরে দুধ পান করলেন। শিশুর জন্য উপযুক্ত ধাত্রী পাওয়া গেছে এই সংবাদ শুনে ফেরাউন-পত্নী মূসা-জননীকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি যখন দেখলেন এবং বুঝলেন যে, ফেরাউন-পত্নী তাঁর তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছে, তখন তিনি আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে গেলেন। ফেরাউন-পত্নী বললেন, তুমি এখানে থেকেই শিশুকে দুধ পান করাবে। কেননা অপরিসীম মহব্বতের কারণে তাকে আমি আমার দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পারব না। হযরত মূসা-জননী বললেন, আমি তো নিজের বাড়িঘর ছেড়ে এখানে থাকতে পারি না। কারণ আমার কোলে একটি শিশু আছে। আমি তাকে দুধ পান করাই। তাকে আমি কিভাবে ছেড়ে দিতে পারি? হাঁ, আপনি যদি সম্মত হয়ে শিশুকে আমার হাতে সমর্পণ করেন এবং আমি নিজ বাড়িতে তাঁকে দুধ পান করাতে পারি তবে অঙ্গীকার করছি যে, এই শিশুর হেফাজত ও দেখাশোনায় বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করব না। বলা বাহুল্য, তখন হযরত মূসা-জননীর মনে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাও জেগে উঠেছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে, কয়েকদিন বিচ্ছেদের পর আমি তাঁকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। তাই তিনি নিজের কথায় অটল রইলেন। অবশেষে ফেরাউন-পত্নী বাধ্য হয়ে তাঁর কথা মেনে নিলেন। মূসা-জননী সেদিনই হযরত মূসা (আ.)-কে সাথে নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে এলেন এবং আল্লাহ তা'আলা বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁর লালন-পালন করলেন।

হযরত মূসা (আ.) যখন একটু শক্ত-সমর্থ হয়ে গেলেন, তখন ফেরাউন-পত্নী তাঁর মাতাকে খবর পাঠাল যে, শিশুকে এনে আমাকে দেখিয়ে যাও। আমি তাঁকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেছি। ফেরাউন-পত্নী দরবারের লোকদেরকে আদেশ দিল যে, আমার আদরের শিশু আজ আমার গৃহে আসছে। তোমাদেরকে তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তাঁকে উপযুক্ত উপঢৌকন দিতে হবে। এ ব্যাপারে তোমরা কি করছ, আমি নিজে তা তদারকি করব। এই আদেশ জারির ফলে হযরত মূসা (আ.) যখন মাতার সাথে গৃহ থেকে বের হলেন, তখন থেকেই তাঁর উপর হাদিয়া ও উপঢৌকনের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। অবশেষে তিনি যখন ফেরাউন-পত্নীর কাছে পৌঁছলেন, তিনি তখন স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে মূল্যবান উপঢৌকন পৃথকভাবে পেশ করলেন। ফেরাউন-পত্নী তাঁকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন এবং সমস্ত উপঢৌকন মূসা-জননীকে দান করে দিলেন। অতঃপর ফেরাউন-পত্নী বললেন, এখন আমি ছেলেকে নিয়ে ফেরাউনের কাছে যাচ্ছি। সে-ও তাকে পুরস্কার ও উপঢৌকন দান করবে। সেমতে তাকে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত করা হলে সে তাঁকে আদর করে কোলে তুলে নিল। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের দাঁড়ি ধরে নিচের দিকে হেচকা টান দিলে তখন সভাসদরা সুযোগ পেয়ে ফেরাউনকে বলল, আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একজন নবী পয়দা হবে এবং আপনার দেশ ও সম্পত্তির মালিক হবে। আপনার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে আপনাকে ধরাশায়ী করবে। সেই ওয়াদা কিভাবে পূর্ণ হচ্ছে আপনি লক্ষ্য করেছেন কি?

ফেরাউন যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। তৎক্ষণাৎ সন্তান হত্যাকারী সিপাহীদেরকে ডেকে পাঠাল যাতে তাকে হত্যা করা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস এখানে পৌঁছে পুনরায় ইবনে জুবায়েরকে বললেন, এটা পরীক্ষার চতুর্থ পর্ব। মৃত্যু আবার হযরত মূসা (আ.)-এর মস্তকের উপর ছায়াপাত করল।

এই পরিস্থিতি দেখে ফেরাউন-পত্নী বলল, তুমি তো এই বাচ্চা আমাকে দিয়ে ফেলেছ। এখন এ কি হচ্ছে? ফেরাউন বলল, তুমি দেখ না, ছেলেটি কর্মের মাধ্যমে যেন দাবি করছে যে, সে আমাকে ধরাশায়ী করে দিবে, আমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। ফেরাউন-পত্নী বলল, এ ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য তুমি একটি মূলনীতি মেনে নাও। এতে বাস্তব সত্য ফুটে উঠবে এবং বুঝা যাবে যে, ছেলেটি একাজ বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত করেছে, না জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। দু'টি অঙ্গার এবং দু'টি মোতি আনা হোক এবং তার সামনে পেশ করা হোক। যদি সে মোতির দিকে হাত বাড়ায় এবং অঙ্গার থেকে আত্মরক্ষা করে, তবে বুঝতে হবে যে, তার কাজকর্ম জ্ঞান-প্রসূত ও ইচ্ছাকৃত। পক্ষান্তরে যদি সে মোতির পরিবর্তে অঙ্গারের দিকে হাত বাড়ায়, তবে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে এ কাজটি জ্ঞানের অধীনে করেনি। কেননা কোনো জ্ঞানবান ব্যক্তি আগুন হাতে নিতে পারে না। ফেরাউন এই প্রস্তাব মেনে নিল। দু'টি অঙ্গার এবং দু'টি মোতি হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে পেশ করা হলো। তিনি হাত বাড়িয়ে অঙ্গার তুলে নিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) মোতির দিকে হাত বাড়াতে চেয়েছিলেন; কিন্তু হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর হাত অঙ্গারের দিকে ফিরিয়ে দেন। ব্যাপার দেখে ফেরাউন কালবিলম্ব না করে অঙ্গার তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, যাতে তার হাত পুড়ে না যায়। এবার ফেরাউন-পত্নী সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন, ঘটনার আসল স্বরূপ দেখলে তো! এভাবে আল্লাহ তা'আলার কৃপায় হযরত মূসা (আ.) প্রাণে বেঁচে গেলেন। কারণ ভবিষ্যতে তাঁকে যে অনেক মহৎ কাজ করতে হবে। হযরত মূসা (আ.) এমনিভাবে ফেরাউনের রাজকীয় সম্মান-সম্ভ্রমে ও রাজকীয় ভরণ-পোষণে মাতার কাছে লালিত-পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন।

তাঁর রাজকীয় সম্মান-সম্ভ্রম দেখে ফেরাউন বংশীয় লোকদের মধ্যে বনী ইসরাঈলের প্রতি জুলুম, নির্যাতন, অপমান ও অবজ্ঞা করার সাহস রইল না, যা ইতঃপূর্বে তাদের পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলের উপর অহরহ চলত। একদিন হযরত মূসা (আ.) শহরের এক পার্শ্ব দিয়ে গমন করার সময় দু'ব্যক্তিকে বিবদমান দেখতে পেলেন। তাদের একজন ছিল ফেরাউন বংশীয় অপর ব্যক্তি ইসরাঈল বংশীয়। ইসরাঈল বংশীয় ব্যক্তি হযরত মূসা (আ.) -কে দেখে সাহায্যের জন্য ডাক দিল। ফেরাউন বংশীয় লোকটির ধৃষ্টতা দেখে হযরত মূসা (আ.) নিরতিশয় রাগান্বিত হলেন। কারণ রাজদরবারে হযরত মূসা (আ.)-এর অসাধারণ সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও সে তাঁর সামনে ইসরাঈলীকে বলপূর্বক ধরে রেখেছিল। সে আরো জানত যে, হযরত মূসা (আ.) ইসরাঈলীদের হেফাজত করেন। সাধারণভাবে সবাই একথা জানত যে, ইসরাঈলীদের সাথে তাঁর পক্ষপাতমূলক সম্পর্ক শুধু দুধ পান করার কারণেই। অবশ্য এটাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর মাতার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো উপায়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি ধাত্রীমায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি একজন ইসরাঈলী।

মোটকথা, হযরত মূসা (আ.) রাগান্বিত হয়ে ফেরাউন বংশীয় লোকটিকে একটি ঘুষি মারলেন। ঘুষির তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সে অকুস্থলেই প্রাণত্যাগ করল। ঘটনাক্রমে সেখানে হযরত মূসা (আ.) ও বিবদমান দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। ফেরাউন বংশীয় ব্যক্তি তো নিহতই হলো। ইসরাঈলী নিজের লোক ছিল, তাই ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না।

যখন ফেরাউন বংশীয় লোকটি হযরত মূসা (আ.)-এর হাতে মারা গেল, তখন তিনি বললেন :
هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ এ কাজটি শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। সে প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী শত্রু। অতঃপর তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি আমার হাতে ভুলক্রমে ফেরাউন বংশীয় লোকটি নিহত হয়েছে। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করলেন। কারণ তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এ ঘটনার পর হযরত মূসা (আ.) ভীতচকিত হয়ে এ ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকেন যে, ফেরাউন বংশীয় লোকদের উপর এ হত্যাকাণ্ডের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং ফেরাউনের দরবার পর্যন্ত বিষয়টি পৌঁছল কি না। জানা গেল যে ঘটনার যে প্রতিবেদন ফেরাউনের কাছে পৌঁছেছে, তা এই, জনৈক ইসরাঈলী ফেরাউন বংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তাই ইসরাঈলীদের কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেওয়া হোক এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে মোটেই অবকাশ না দেওয়া হোক। ফেরাউন উত্তরে বলল, হত্যাকারীকে শনাক্ত করে প্রমাণসহ উপস্থিত কর। কারণ বাদশাহ্ যদিও তোমাদের আপন লোক; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কাউকে বিনিময়ে হত্যা করা তার পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়। কাজেই হত্যাকারীকে তালাশ কর এবং প্রমাণাদি সংগ্রহ কর। আমি অবশ্যই তার কাছ থেকে তোমাদের প্রতিশোধ হত্যার আকারে গ্রহণ করব। একথা শুনে ফেরাউন বংশীয়রা হত্যাকারীর সন্ধানে অলিতে-গলিতে ও বাজারে চক্কর দিতে লাগল; কিন্তু হত্যাকারীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

হঠাৎ একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। পরের দিন হযরত মূসা (আ.) গৃহ থেকে বের হয়ে সেই ইসরাঈলীকে অন্য একজন ফেরাউন বংশীয় ব্যক্তির সাথে লড়াইরত দেখতে পেলেন। ইসরাঈলী আবার তাঁকে দেখামাত্রই সাহায্যের জন্য ডাক দিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) বিগত ঘটনার জন্যই অনুতপ্ত ছিলেন। এক্ষণে সেই ইসরাঈলীকেই আবার লড়াইরত দেখে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মূলত ইসরাঈলীই অপরাধী এবং কলহপ্রিয়। এতদসত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.) ফেরাউন বংশীয় ব্যক্তিকে বাধা দিতে চাইলেন এবং ইসরাঈলীকেও সতর্ক করে বললেন, তুই গতকল্যও ঝগড়া করেছিলি, আজও তাই করছিস। কাজেই তুই-ই অপরাধী। ইসরাঈলী হযরত মূসা (আ.)-কে গতকালের ন্যায় রাগান্বিত দেখে এবং একথা শুনে সন্দেহ করল যে, সে আজ আমাকেই হত্যা করবে। তখন সে কালবিলম্ব না করে বলে ফেলল, হে মূসা! তুমি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও, যেমন গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে।

এসব কথাবার্তার পর উভয়েই সেখান থেকে প্রস্থান করল। কিন্তু ফেরাউন বংশীয় লোকটি হত্যাকারী অন্বেষণকারীদেরকে খবর দিল যে, স্বয়ং ইসরাঈলী হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছে যে, গতকাল তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে। সংবাদটি

তৎক্ষণাৎ রাজদরবারে পৌঁছানো হলো। ফেরাউন একদল সিপাহী হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করল। সিপাহীদের বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মূসা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোথাও যেতে পারবে না। তাই তারা ধীরে সুস্থে শহরের মহাসড়ক ধরে তাঁর খোঁজে বের হলো।

এদিকে শহরের দূরবর্তী অংশে বসবাসকারী হযরত মূসা (আ.)-এর জনৈক অনুসারী এ সংবাদ জানতে পারল যে, ফেরাউনের সিপাহী হযরত মূসা (আ.)-এর খোঁজে বের হয়ে পড়েছে। সে একটি ছোট গলির পথে অগ্রসর হয়ে হযরত মূসা (আ.)-কে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিল।

এখানে পৌঁছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আবার ইবনে জুবায়েরকে বললেন, হে ইবনে জুবায়ের! এটা হচ্ছে পরীক্ষার পঞ্চম পর্ব। মৃত্যু মাথার উপর ছায়াপাত করেছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে এ থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সংবাদ শুনে হযরত মূসা (আ.) তৎক্ষণাৎ শহর থেকে বের হয়ে পড়লেন এবং মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি আজ পর্যন্ত রাজকীয় বিলাসিতায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কষ্ট ও পরিশ্রমের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল না। মিসর থেকে বের হয়ে পড়েছেন বটে; কিন্তু পথঘাট অজানা। একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহর উপর ভরসা ছিল যে, عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।

মাদইয়ানের নিকটে পৌঁছে হযরত মূসা (আ.) শহরের বাইরে একটি কূপের ধারে একটি জনসমাবেশ দেখতে পেলেন। তারা কূপে জন্তুদেরকে পানি পান করাচ্ছিল। তিনি আরো দেখলেন যে, দু'জন কিশোরী তাদের মেষপালকে আগলিয়ে পৃথক এক জায়গায় দণ্ডায়মান রয়েছে। হযরত মূসা (আ.) কিশোরীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা পৃথক জায়গায় দণ্ডায়মান কেন? তারা বলল, এত লোকের ভিড়ভাড় ঠেলে কূপের ধারে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আমরা অপেক্ষা করছি, যখন লোকেরা চলে যাবে, তখন যে পানিটুকু অবশিষ্ট থাকবে, তাই আমরা মেষপালকে পান করাব।

হযরত মূসা (আ.) তাদের আভিজাত্যে মুগ্ধ হয়ে নিজেই কূপ থেকে পানি তুলতে লাগলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রচুর শক্তিসামর্থ্য দান করেছিলেন। তিনি দ্রুত তাদের মেষ-পালকে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করিয়ে দিলেন। কিশোরীদ্বয় তাদের মেষপাল নিয়ে গৃহে পৌঁছল এবং হযরত মূসা (আ.) একটি বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন :

رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি সে নিয়ামতের প্রত্যাশী, যা আপনি আমার প্রতি নাজিল করবেন। উদ্দেশ্য এই যে, আহার ও বাসস্থানের কোনো ব্যবস্থা হওয়া চাই। কিশোরীদ্বয় যখন দৈনন্দিন সময়ের পূর্বেই মেষপালকে পানি পান করিয়ে গৃহে পৌঁছল, তখন তাদের পিতা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, আজ তো মনে হয় নতুন কোনো ব্যাপার হয়েছে। কিশোরীদ্বয় হযরত মূসা (আ.)-এর পানি তোলা এবং পান করানোর কাহিনী পিতাকে বলে দিল। পিতা তাদের একজনকে আদেশ দিলেন, যে ব্যক্তি এই অনুগ্রহ করেছে, তাঁকে এখানে ডেকে আন। কিশোরী তাঁকে ডেকে আনল। পিতা হযরত মূসা (আ.)-এর বৃত্তান্ত জেনে বললেন, لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ এখন যাবতীয় ভয়ভীতি মন থেকে মুছে ফেলুন। আপনি জালিমদের নাগালের বাইরে চলে এসেছেন। আমরা ফেরাউনের রাজত্বে বাস করি না। আমাদের উপর তার কোনো জোরও চলতে পারে না।

তখন কিশোরীদ্বয়ের একজন তার পিতাকে বলল, يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ অর্থাৎ আব্বাজান আপনি তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা শক্ত সুঠামদেহী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি চাকুরীর জন্য অধিক উপযুক্ত। কন্যার মুখে একথা শুনে পিতা আত্মসম্মানে কিছুটা আঘাত অনুভব করলেন যে, আমার মেয়ে কিভাবে জানতে পারল যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কিভাবে অনুমান করলে যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত? কন্যা বলল, তার শক্তি তখনই প্রত্যক্ষ করেছি, যখন সে কূপ থেকে পানি তুলে সব রাখালের পূর্বে নিজের কাজ সম্পন্ন করেছে। অন্য কেউ তার সমকক্ষ হতে পারেনি। বিশ্বস্ততার বিষয়টি এভাবে জানতে পেরেছি যে, যখন আমি তাকে ডেকে আনতে গেলাম, তখন প্রথম নজরে সে আমাকে একজন নারী দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নিচু করে ফেলল। অতঃপর যতক্ষণ আমি আপনার পয়গাম তার গোচরীভূত করিনি, ততক্ষণ সে দৃষ্টি উপরে তুলেনি। এরপর সে আমাকে বলল, আপনি আমার পিছে পিছে চলুন; কিন্তু পেছনে থেকেই গৃহের পথ বলে দেবেন। একমাত্র বিশ্বস্ত ব্যক্তিই এমন কাজ করতে পারে। পিতা কন্যার

এই বিজ্ঞজনোচিত কথায় আনন্দিত হলেন, তার কথার সত্যায়ন করলেন এবং নিজেও তার শক্তি ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন। তখন কিশোরীদের পিতা [যিনি ছিলেন আল্লাহর পয়গম্বর হযরত শুআয়ব (আ.)] হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন, আমি আমার এক কন্যাকে এই শর্তে আপনার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করতে চাই যে, আপনি আট বছর পর্যন্ত আমার এখানে চাকুরী করবেন। যদি আপনি স্বেচ্ছায় দশ বছর পূর্ণ করে দেন, তবে তা আরো উত্তম হবে; কিন্তু আমি এই শর্ত আপনার প্রতি আরোপ করতে চাই না যাতে আপনার কষ্ট বেশি না হয়। আপনি এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন কি? হযরত মূসা (আ.) এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। ফলে আট বছরের চাকুরী চুক্তি অনুযায়ী জরুরি হয়ে গেল, অবশিষ্ট দু'বছরের ওয়াদা তাঁর ইচ্ছাধীন রয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পয়গম্বর হযরত মূসা (আ.)-কে দিয়ে এই ওয়াদাও পূর্ণ করিয়ে দেন এবং তিনি চাকুরীর দশ বছরই পূর্ণ করেন।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেন, একবার জনৈক খ্রিস্টান আলেমের সাথে আমার দেখা হলে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনার জানা আছে কি, হযরত মূসা (আ) উভয় মেয়াদের মধ্য থেকে কোনটি পূর্ণ করেছিলেন? আমি বললাম, আমার জানা নেই। কারণ তখন পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই হাদীস আমার জানা ছিল না। অতঃপর আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে প্রশ্ন রাখলাম। তিনি বললেন, আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করা তো চুক্তি অনুযায়ী জরুরিই ছিল। সাথে সাথে একথাও জানা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল তাঁর রাসূল ইচ্ছাধীন ওয়াদাও পূর্ণ করুক। তাই তিনি দশ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। এরপর আমি খ্রিস্টান আলেমের সাথে দেখা করে এ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, আপনি যার কাছ থেকে এ তথ্য অবগত হয়েছেন, তিনি কি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম? আমি বললাম, হাঁ, তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী এবং সবার সেরা।

দশ বছর চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণ করার পর যখন হযরত মূসা (আ.) স্ত্রীকে সাথে নিয়ে শুআয়ব (আ.)-এর দেশ মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হলেন, তখন কনকনে শীত, গভীর অন্ধকার, অজ্ঞাত রাস্তা এবং নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ তিনি তূর পর্বতের উপর আগুন দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি সেখানে গেলেন, বিস্ময়কর দৃশ্যাবলি দেখার পর লাঠি ও সুশুভ্র হাতের মু'জিযা এবং রিসালাত ও নবুয়তের পদ লাভ করলেন। এর পূর্ণ কাহিনী ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, আমি রাজদরবারের পলাতক আসামী সাব্যস্ত হয়েছি। কিবতীকে খুন করার অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে পাল্টা হত্যার আদেশ জারি হয়েছে। এক্ষণে ফেরাউনের কাছেই রিসালাতের দাওয়াত পৌঁছানোর আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। এছাড়া জিহ্বার দিক দিয়েও আমি তোতলা। এসব চিন্তাভাবনা করে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আবেদন-নিবেদন করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা অনুযায়ী তাঁর ভাই হারূনকে রিসালাতে অংশীদার করে তাঁর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন এবং আদেশ দিলেন যে, মিসর শহরের বাইরে এসে হযরত মূসা (আ.)-কে অভ্যর্থনা জানাও। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) সেখানে পৌঁছলেন। হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। উভয় ভ্রাতা নির্দেশ অনুযায়ী ফেরাউনকে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাঁর দরবারে পৌঁছলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা দরবারে হাজির হওয়ার সুযোগ পেলেন না। তাঁরা প্রবেশদ্বারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরপর অনেক পর্দা ডিঙ্গিয়ে হাজির হওয়ার অনুমতি পেলেন। উভয়েই ফেরাউনকে বললেন, إِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ অর্থাৎ আমরা উভয়েই তোমার পালন-কর্তার পক্ষ থেকে দূত ও বার্তাবাহী। ফেরাউন জিজ্ঞেস করল, فَمَنْ رَّبُّكُمَا তোমাদের পালনকর্তা কে? হযরত মূসা ও হারূন (আ.) কুরআনে উল্লিখিত উত্তর দিলেন, رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى এরপর ফেরাউন বলল, তাহলে তোমরা কি চাও? সাথে সাথে সে নিহত কিবতীর কথা উল্লেখ করে হযরত মূসা (আ.)-কে অপরাধী সাব্যস্ত করল এবং নিজ গৃহে হযরত মূসা (আ.)-কে লালন-পালন করার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করল। হযরত মূসা (আ.) উভয় কথার যে জওয়াব দিয়েছেন, তা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে ত্রুটি স্বীকার করে অজ্ঞতার ওজর পেশ করলেন এবং গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াবে বললেন, তুমি সমগ্র বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করে রেখেছ। তাদের উপর নানা রকম অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছ। এরই ফলশ্রুতিতে ভাগ্যলিপির খেলায় আমাকে তোমার গৃহে পৌঁছানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা ছিল, পূর্ণ হয়েছে। এতে তোমার কোনো অনুগ্রহ নেই। অতঃপর তিনি ফেরাউনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহ তা'আলায় বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিতে সম্মত আছ? ফেরাউন

অস্বীকার করে বলল, তোমার কাছে রাসূল হওয়ার কোনো আলামত থাকলে দেখাও। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন। অমনি তা অজগর সাপ হয়ে মুখ খুলে ফেরাউনের দিকে ধাবিত হলো। ফেরাউন ভীত হয়ে সিংহাসনের নীচে আত্মগোপন করল এবং সাপটিকে বিরত রাখার জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। হযরত মূসা (আ.) তাকে ধরে ফেললেন। অতঃপর তিনি বগলে হাত রেখে তা বের করতেই হাত ঝলমল করতে লাগল। ফেরাউনের সামনে এটা ছিল দ্বিতীয় মু'জিযা। এরপর হাত পুনরায় বগলে রাখতেই তা পূর্বাবস্থায় ফিরে এলো।

ফেরাউন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সভাসদদের সাথে পরামর্শ করল যে, ব্যাপার তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এখন আমাদের করণীয় কি? সভাসদরা সম্মিলিতভাবে বলল, চিন্তার কোনো কারণ নেই। তারা উভয়েই জাদুকর। জাদুর সাহায্যে তারা আপনাকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে চায় এবং আপনার সর্বোত্তম ধর্ম (তাদের মতে ফেরাউনের পূজা) মিটিয়ে দিতে চায়। আপনি তাদের কোনো দাবির কাছে নতি স্বীকার করবেন না এবং চিন্তিতও হবেন না। কারণ আপনার রাজ্যে বড় বড় জাদুকর রয়েছে। তাদেরকে আহ্বান করুন। তারা তাদের জাদু দ্বারা তাদের জাদুকে নস্যাৎ করে দেবে।

ফেরাউন রাজ্যময় হুকুম জারি করে দিল যে, যারা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী তাদের সবাইকে রাজদরবারে হাজির হতে হবে। সারা দেশের জাদুকররা সমবেত হলে তারা ফেরাউনকে জিজ্ঞেস করল : যে জাদুকরের সাথে আপনি আমাদের মোকাবিলা করাতে চান, সে কি করে? ফেরাউন বলল, সে তার লাঠিকে সাপে পরিণত করে দেয়। জাদুকররা অত্যন্ত নিরুদ্বেগের স্বরে বলল, এটা কিছুই নয়। লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করার যে জাদু, তা পুরাপুরি আমাদের করায়ত্ত। আমাদের জাদুর মোকাবিলা করার শক্তি কারো নেই। কিন্তু প্রথমে মীমাংসা হওয়া দরকার যে, আমরা জয়ী হলে আপনি আমাদেরকে কি পুরস্কার দেবেন।

ফেরাউন বলল, জয়ী হলে তোমরা আমার পরিবারে সদস্য এবং বিশেষ নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এরপর তোমরা যা চাইবে, তাই পাবে।

তখন জাদুকররা মোকাবিলার সময় ও স্থান হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করল। তাদের ঈদের দিন দ্বিপ্রহরের সময় নির্ধারিত হলো। ইবনে জুবায়ের বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের يَوْمُ الزِّيْنَةِ (ঈদের দিন) ছিল আশুরা অর্থাৎ মুহররমের দশ তারিখ। এই দিনেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউন ও তার জাদুকরদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। যখন সবাই একটি বিস্তৃত মাঠে মোকাবিলা দেখার জন্য সমবেত হয়ে গেল, তখন ফেরাউনের লোকেরা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغَالِبِيْنَ অর্থাৎ এখানে আমাদের অবশ্যই থাকা উচিত, যাতে জাদুকররা অর্থাৎ হযরত মূসা ও হারুন বিজয়ী হলে আমরা তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। তাদের এই কথাবার্তা পয়গম্বরদ্বয়ের প্রতি বিদ্রূপের ছলে ছিল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাদের জাদুকরের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.) জয়লাভ করতে পারবেন না।

মোকাবিলার ময়দান জমজমাট হয়ে গেল। জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, প্রথমে আপনি কিছু নিক্ষেপ করবেন (অর্থাৎ জাদু প্রদর্শন করবেন), না আমরা নিক্ষেপ করে সূচনা করব? হযরত মূসা (আ.) বললেন, তোমরাই সূচনা কর এবং তোমাদের জাদু প্রদর্শন কর। তারা بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ (অর্থাৎ ফেরাউনের আনুকূল্যে আমরা অবশ্যই জয়ী হব) বলে কিছু সংখ্যক লাঠি ও রশি মাটিতে নিক্ষেপ করল। লাঠি ও রশিগুলো দৃশ্যত সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে হযরত মূসা (আ.) কিছুটা ভয় পেলেন। فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى হযরত মূসা (আ.) মনে মনে ভীত হলেন।

একজন মানুষ হিসেবে এই ভয় স্বভাবগতও হতে পারে। পয়গম্বরগণও এরূপ স্বভাবগত ভয় থেকে মুক্ত নন। এছাড়া ভয়ের কারণ এরূপেও হতে পারে যে, এখন ইসলামের দাওয়াতের পথে বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ওহীর মাধ্যমে তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন। হযরত মূসা (আ.) লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা অজগর সাপ হয়ে গেল। সাপটির মুখ খোলা ছিল। সাপটি জাদুকরদের নিক্ষিপ্ত লাঠি ও রশির সাপগুলোকে মুহূর্তের মধ্যেই গলাধঃকরণ করে ফেলল।

ফেরাউনের জাদুকররা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এই দৃশ্য দেখে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, হযরত মূসা (আ.)-এর অজগরটি জাদুর ফলশ্রুতি নয়; বরং আল্লাহর দান। সেমতে জাদুকররা তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করল যে, আমরা আল্লাহর

প্রতি এবং হযরত মূসা (আ.)-এর আনীত ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আমরা বিগত ধ্যান-ধারণা ও ধর্মবিশ্বাস থেকে তওবা করছি। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কোমর ভেঙ্গে দিলেন। তারা যেসব জাল বিস্তার করেছিল, সবই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ তারা সেখানে পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত হয়ে মাঠ ত্যাগ করল।

যে সময় এই মোকাবিলা হচ্ছিল, তখন ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া ছিন্নবাস পরিহিতা হয়ে আল্লাহর দরবারে হযরত মূসা (আ.)-এর সাহায্যের জন্য দোয়া করছিলেন। ফেরাউন বংশীয়রা মনে করছিল যে, তিনি ফেরাউনের চিন্তায় ছিন্নবাস পরিধান করেছেন, তার জন্য দোয়া করছেন। অথচ তাঁর সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য নিবেদিত ছিল এবং তিনি তাঁরই বিজয় প্রার্থনা করছিলেন।

এ ঘটনার পর হযরত মূসা (আ.) যখনই কোনো মু'জিযা প্রদর্শন করতেন এবং আল্লাহর প্রমাণ চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করত, তখনই ফেরাউন ওয়াদা করত, এখন আমি বনী ইসরাঈলকে আপনার কর্তৃত্বে সমর্পণ করব। কিন্তু যখন হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার ফলে আজাবের আশঙ্কা টলে যেত, তখনই সে তার ওয়াদা ভুলে যেত। সে বলত, আপনার পালনকর্তা আরো কোনো নিদর্শন দেখাতে পারেন কি? দিন এভাবেই অতিবাহিত হতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন-গোষ্ঠির উপর ঝড়ঝঞ্ঝা, পঙ্গপাল, পরিধেয় বস্ত্রে উকুন, পাত্র ও খাদ্যদ্রব্যে ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদি আজাব চাপিয়ে দিলেন। কুরআন পাকে এগুলোকে "বিস্তারিত নিদর্শনাবলি" শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। ফেরাউনের অবস্থা ছিল এই যে, যখনই কোনো আজাব আসত এবং তা দূর করতে সে অক্ষম হতো, তখনই হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ফরিয়াদ করে বলত, কোনো রকমে আজাবটি দূরীভূত করে দিন। আমি ওয়াদা করছি, বনী ইসরাইলকে মুক্ত করে দেব। অতঃপর আজাব দূরীভূত হলে সে ওয়াদা ভঙ্গ করত। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশ দিলেন, বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ কর। হযরত মূসা (আ.) সবাইকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে শহর ত্যাগ করলেন। প্রত্যুষে ফেরাউন টের পেয়ে গোটা সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করল। এদিকে হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের গমন পথে যে নদী অবস্থিত ছিল, আল্লাহ তা'আলা তাকে আদেশ দিলেন, যখন হযরত মূসা (আ.) তোকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে, তখন তোর মধ্যে বারটি রাস্তা হয়ে যাওয়া উচিত। বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র এগুলো দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে পার হয়ে যাবে। তারা পার হয়ে গেলে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের সমেত নদীর বারটি পথ আবার একাকার হয়ে মিশে যাবে।

হযরত মূসা (আ.) দরিয়ার নিকটে পৌঁছে দরিয়াকে লাঠি দ্বারা আঘাত হানার কথাটি বেমালুম ভুলে গেলেন। বনী ইসরাঈল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে লাগল : اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে যাব। কারণ পেছন দিক থেকে ফেরাউনী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন তাদের নজরে পড়ছিল। তাদের সামনে দরিয়া বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এহেন সংকট মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা হযরত মূসা (আ.)-এর মনে পড়ল যে, দরিয়াকে লাঠি দ্বারা আঘাত করলে তাতে বারটি রাস্তা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তিনি তৎক্ষণাৎ লাঠি দ্বারা আঘাত হানলেন। এ সময়টি এমনি সংকটময় ছিল যে, বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্বর্তী অংশকে ফেরাউনী সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দল প্রায় ধরেই ফেলেছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযায় দরিয়া পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে বারটি রাস্তা হয়ে গেল। মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলসহ এসব রাস্তা দিয়ে দরিয়া পার হয়ে গেলেন। পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাউনী বাহিনী এসব রাস্তা দেখে গোটা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী হাঁকিয়ে দিল। তারা সবাই যখন দরিয়ার মধ্যে ধাবমান ছিল, ঠিক তখনই আল্লাহর নির্দেশে দরিয়ার বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে গেল। দরিয়ার অপর পারে পৌঁছে হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গীরা বলল, আমাদের আশঙ্কা হয় যে ফেরাউন বোধ হয় এদের সাথে সলিল সমাধি লাভ করেনি এবং সে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। তখন হযরত মূসা (আ.) দোয়া করলেন যে, ফেরাউনের নিপাত আমাদের সামনে জাহির করা হোক। সে মতে আল্লাহর অপার শক্তি ফেরাউনের মৃতদেহকে দরিয়ার বাইরে নিক্ষেপ করল। ফলে বনী ইসরাঈলীদের সবাই তার মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল।

এরপর বনী ইসরাঈল সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পথিমধ্যে এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন করল। তারা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমার ইবাদত ও পূজায় লিপ্ত ছিল। এ দৃশ্য দেখে বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ.)-কে বলতে লাগল, يَا مُوْسَى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ - اِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ হে মূসা! আমাদের জন্যও মাবূদ তৈরি

করে দাও, যেমন তারা অনেক মা'বূদ করে নিয়েছে। হযরত মূসা (আ.) বললেন, তোমরা এসব কি মূর্খতার কথাবার্তা বলছ? এরা যে প্রতিমার ইবাদত করছে, তাদের ইবাদত নিষ্ফল হবে। হযরত মূসা (আ.) আরো বললেন, তোমরা পালনকর্তার এতসব মু'জিযা ও অনুগ্রহ দেখার পরও তোমাদের মূর্খতাসুলভ চিন্তাধারা বদলায়নি? এরপর হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। এক জায়গায় পৌঁছে তিনি বললেন, তোমরা সবাই এখানে অবস্থান কর। আমি পালনকর্তার কাছে যাচ্ছি। ত্রিশদিন পর প্রত্যাবর্তন করব। আমার অনুপস্থিতিতে হারুন (আ.) আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন। তোমরা প্রতি কাজে তাঁর আনুগত্য করবে।

হযরত মূসা (আ.) তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তূর পর্বতে গমন করলেন এবং আল্লাহর ইঙ্গিতে উপর্যুপরি ত্রিশ দিবারাত্রির রোজা রাখলেন, যাতে এরপর আল্লাহর সাথে বাক্যালাপের গৌরব অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ত্রিশ দিবারাত্র উপর্যুপরি রোজার কারণে স্বভাবত তাঁর মুখে এক প্রকার গন্ধ দেখা দেয়। ফলে তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এই গন্ধ নিয়ে আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ অনুচিত। তিনি পাহাড়ী ঘাস দ্বারা মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করলেন। এরপর আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইরশাদ হলো, মূসা! তুমি ইফতার করলে কেন? [আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল যে, হযরত মূসা (আ.) কোনো কিছু পানাহার করেন নি, শুধু ঘাস দ্বারা মুখ পরিষ্কার করেছেন, কিন্তু পয়গম্বরসুলভ বিশেষ মর্যাদার কারণে একেই ইফতার বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।] হযরত মূসা (আ.) এই সত্য উপলব্ধি করে আরজ করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি মনে করলাম যে, আপনার সাথে আলাপরত হওয়ার পূর্বে মুখের দুর্গন্ধ দূর করে দেই। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি কি জান না যে, রোজাদারের মুখের গন্ধ আমার কাছে মিশকের সুগন্ধি থেকেও অধিক প্রিয়? এখন তুমি ফিরে যাও এবং আরো দশদিন রোজা রাখ। এরপর আমার কাছে এসো। হযরত মূসা (আ.) তাই করলেন।

এদিকে হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল যখন দেখল যে, ত্রিশদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও হযরত মূসা (আ.) ফিরে এলেন না, তখন তারা চিন্তিত হলো। এদিকে হারুন (আ.) হযরত মূসা (আ.) -এর চলে যাওয়ার পর বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ দেন এবং বলেন যে, মিসরে অবস্থানকালে তোমরা ফেরাউনী সম্প্রদায়ের অনেক আসবাবপত্র ধার করেছিলে অথবা তারা তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছিল। সেগুলো তোমরা সাথে নিয়ে এসেছ। তোমাদেরও অনেক আসবাবপত্র ফেরাউনীদের কাছে ধার অথবা গচ্ছিত আছে। এখন তোমরা মনে করছ যে, তাদের আসবাবপত্র তোমাদের আসবাবপত্রের বিনিময়ে তোমরা হস্তগত করে রেখেছ। কিন্তু তাদের ধার অথবা আমানতের জিনিস তোমরা ব্যবহার করবে আমি এটা হালাল মনে করি না। কিন্তু অসুবিধা এই যে, এগুলো ফেরত দেবারও কোনো উপায় নেই। তাই একটি গর্ত খনন করে সমস্ত অলংকার ও অন্যান্য ব্যবহারিক সামগ্রী তাতে ফেলে দাও। বনী ইসরাঈল এই আদেশ পালন করল। হযরত হারুন (আ.) সব আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দিলেন। ফলে সব পুড়ে ছাই-ভস্ম হয়ে গেল। অতঃপর হযরত হারুন (আ.) বললেন, এখন এগুলো আমাদেরও নয়, তাদেরও নয়।

বনী ইসরাঈলের সাথে গাভী পূজারী সম্প্রদায়ের সামেরী নামক জনৈক ব্যক্তিও ছিল। সে বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু মিসর ত্যাগ করার সময় সে-ও হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের সাথে চলে এসেছিল। ঘটনাক্রমে সে (জিবরাঈল (আ.)-এর) একটি বিশেষ অলৌকিক প্রভাব দেখতে পেল (অর্থাৎ যেখানেই তিনি পা রাখেন, সেখানেই জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হয়ে যায়।) হযরত জিবরাঈলের পা পড়েছে, এমন এক জায়গা থেকে সে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে আসার পথে হযরত হারুন (আ.)-এর সাথে তার দেখা হলো। হযরত হারুন (আ.) মনে করলেন যে, তার হাতে বোধ হয় কোনো ফেরাউনী অলংকার রয়েছে। তাই বললেন, সবার মতো তুমিও একে গর্তে ফেলে দাও। সামেরী বলল, এটা তো সেই রাসূলের পদচিহ্নের মাটি, যিনি আপনাদেরকে দরিয়া পার করিয়েছেন। আমি একে কিছুতেই গর্তে ফেলব না; তবে এই শর্তে ফেলব যে, আপনি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দোয়া করবেন। হযরত হারুন (আ.) দোয়ার ওয়াদা করলেন। সে ঐ মাটি গর্তে ফেলে দিল। ওয়াদা অনুযায়ী হযরত হারুন (আ.) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, সামেরীর উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। দোয়া শেষ হতেই সামেরী বলল, আমার উদ্দেশ্য এই যে, গর্তে যেসব সোনা, রূপা, লোহা, পিতল ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়েছে, সেগুলো একটি গো-বৎসতে পরিণত হোক। হযরত হারুন (আ.)-এর দোয়া কবুল হয়ে গিয়েছিল। ফলে গর্তের সমস্ত অলঙ্কার, লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদি একটি গো-বৎসের আকার ধারণ করল। তাতে কোনো আত্মা ছিল না; কিন্তু গাভীর মতো শব্দ করত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! এটা কোনো জীবিত আওয়াজ ছিল না। বরং তার পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে যেত। এর ফলে আওয়াজ শোনা যেত।

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বনী ইসরাঈল কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল সামেরীকে জিজ্ঞেস করল এটি কি? সে বলল, এটাই তো তোমাদের খোদা। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) পথ ভুলে এই খোদার কাছে না গিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছেন। একদল বলল, হযরত মূসা (আ.) যে পর্যন্ত আসল সত্য বর্ণনা না করেন, সে পর্যন্ত আমরা সামেরীর কথা অবিশ্বাস করতে পারি না। যদি বাস্তবে এটাই আমাদের খোদা হয়, তবে তার বিরোধিতা করে আমরা পাপী হব না, আর যদি এটা খোদা না হয়, তবে আমরা হযরত মূসা (আ.)-এর কথাই মেনে চলব।

অন্য একদল বলল, এগুলো সব শয়তানি ধোঁকা। এই গো-বৎস আমাদের পালনকর্তা হতে পারে না। আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। অপর একদলের কাছে সামেরীর উক্তি চমৎকার বলে মনে হলো। তারা সামেরীকে সত্য বিশ্বাস করে গো-বৎসকে খোদা হিসেবে মেনে নিল।

এই মহা অনর্থ দেখে হারূন (আ.) বললেন : يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা পরীক্ষায় পতিত হয়েছ। তোমাদের পালনকর্তা দয়াময় আল্লাহ। তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা মেনে চল। বনী ইসরাঈল বলল, বলুন তো দেখি হযরত মূসা (আ.)-এর কি হলো, তিনি আমাদের কাছে ত্রিশ দিনের ওয়াদা করে গিয়েছিলেন; এখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হচ্ছে তবুও তাঁর দেখা নেই। কোনো কোনো নির্বোধ বলল, হযরত মূসা (আ.) পালনকর্তাকে হারিয়ে বোধ হয় তাঁর খোঁজে ঘোরাফেরা করছেন।

এদিকে চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর হযরত মূসা (আ.) বাক্যালাপের গৌরব অর্জন করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই অনর্থের সংবাদ দিলেন, যাতে তাঁর সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا হযরত মূসা (আ.) সেখান থেকে ক্রোধান্বিত ও পরিতপ্ত অবস্থায় ফিরে এলেন এবং ফিরে এসে যা বললেন, তা তুমি কুরআন পাকে পাঠ করেছ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ভাই হারূনের মাথার চুল ধরে টান দিলেন এবং সাথে করে আনা তাওরাতের ফলকগুলো হাত থেকে রেখে দিলেন। এরপর রাগ স্তিমিত হলে ভাইয়ের সত্যিকার ওজর জেনে তাকে ক্ষমা করলেন আর আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর সামেরীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ কাণ্ড করলে কেন? সে উত্তর দিল :

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ অর্থাৎ আমি রাসূল জিবরাঈলের পদচিহ্নের মাটি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম এবং আমি বুঝেছিলাম যে, এই মাটি যে বস্তুর মধ্যেই রাখা হবে, তাতেই জীবনের চিহ্ন সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আপনাদের কাছ থেকে বিষয়টি গোপন রেখেছিলাম।

فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي অর্থাৎ আমি এই মাটি অলঙ্কার ইত্যাদির স্তূপে রেখে দিলাম। আমার মন আমার সামনে এ কাজটি পছন্দনীয় আকারে উপস্থিত করেছিল।

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا.

অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) সামেরীকে বললেন, যাও, এখন তোমার শাস্তি এই যে, তুমি সারা জীবন একথা বলে বেড়াবে : আমাকে কেউ স্পর্শ করো না। নতুবা সে-ও আজাবে গ্রেফতার হয়ে যাবে। তোমার জন্য একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে, তার খেলাফ হবে না। তুমি যে উপাস্যের আরাধনা করেছ, তার পরিণাম দেখ, আমি একে আগুনে ভস্ম করব। অতঃপর এর ভস্ম দরিয়ায় ভাসিয়ে দেব। সে খোদা হলে তার সাথে এরূপ ব্যবহারের শক্তি আমাদের হতো না।

তখন বনী ইসরাঈল স্থির বিশ্বাসে উপনীত হলো যে, তারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছিল। ফলে যে দলটি হযরত হারূন (আ.)-এর মতাবলম্বী ছিল, তাদের প্রতি সবারই ঈর্ষা হতে লাগল (অর্থাৎ যারা মনে করত যে, গো-বৎস আমাদের খোদা হতে পারে না)। বনী ইসরাঈল এই মহাপাপ বুঝতে পেরে হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, আপনার পালনকর্তার কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের পাপমোচনের জন্য তওবার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন

হযরত মূসা (আ.) এ কাজের জন্য বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে সৎকর্মপরায়ণ সত্তরজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন। তারা সজ্ঞানে গো-বৎস পূজা থেকেও বিরত ছিল। তিনি খুব বাছাই-বাছাই করে তাদেরকে মনোনীত করলেন এই সত্তর জন মনোনীত সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন,

যাতে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের তওবা কবুল করার বিষয়ে আবেদন পেশ করতে পারেন। হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতে পৌঁছলে ভূপৃষ্ঠে প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হলো। এতে তিনি প্রতিনিধি দলের সামনে এবং স্বীয় কওম বনী ইসরাঈলের সামনে খুবই লজ্জিত হলেন। তাই আরজ করলেন :

رَبِّ لَوْشِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاِيَّاىَ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, যদি আপনি তাদেরকে ধ্বংসই করতে চাইলেন, তো এই প্রতিনিধি দল আগমনের পূর্বেই ধ্বংস করে দিতেন এবং আমাকেও তাদের সাথে ধ্বংস করে দিতেন। আপনি কি আমাদের সবাইকে এ কারণে ধ্বংস করবেন যে, আমাদের কিছু নির্বোধ লোক পাপ করেছে? প্রকৃতপক্ষে এই ভূমিকম্পের কারণ ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাই সত্ত্বেও এমন কিছু লোক কৌশলে এই প্রতিনিধি দলে শামিল হয়ে গিয়েছিল, যারা পূর্বে গো-বৎসের পূজা করেছিল এবং তাদের অন্তরে গো-বৎসের মাহাত্ম্য বিরাজমান ছিল।

হযরত মূসা (আ.)-এর এই দোয়া ও ফরিয়াদের জওয়াবে ইরশাদ হলো :

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ

অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমার অনুগ্রহ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। আমি অচিরেই আমার রহমতের পরওয়ানা তাদের জন্যে লিখে দেব, যারা আল্লাহভীতি অবলম্বন করে, জাকাত আদায় করে, আমার নিদর্শনাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা সে নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাদের তাওরাত ও ইঞ্জীল গ্রন্থে লিখিত দেখে।

একথা শুনে হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, পরওয়ারদেগার, আমি আপনার কাছে আমার সম্প্রদায়ের তওবা সম্পর্কে আরজ করেছিলাম। আপনি জওয়াবে আমার কওমসহ অন্য কওমকে রহমত দান করার কথা বলেছেন। আপনি আমার জন্য আরো পিছিয়ে আমাকেও সে নিরক্ষর পয়গম্বরের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করলেন না কেন? অতঃপর আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে বনী ইসরাঈলের তওবা কবুল হওয়ার একটি পদ্ধতি বলে দেওয়া হলো। তা এই যে, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তার পিতা, পুত্র ইত্যাদি স্বজনের মধ্যে যার সাক্ষাৎ পাবে, তাকেই তরবারি দ্বারা হত্যা করবে। যেস্থানে গো-বৎসের পূজা হয়েছে, সেখানেই এই পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালাতে হবে।

প্রতিনিধিদলের যেসব সদস্যের অবস্থা হযরত মূসা (আ.) -এর জানা ছিল না। এবং তাদেরকে নির্দোষ মনে করে প্রতিনিধিদলে শামিল করা হয়েছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মনে গো-বৎস পূজার আগ্রহ ছিল, এ সময় তারাও মনে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে নিল। তারা এই কঠোর আদেশ পালন করল, যা তাদের তওবা কবুল হওয়ার জন্য জারি করা হয়েছিল, অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনকে হত্যা। এই আদেশ বাস্তবায়িত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি সবার পাপ মার্জনা করে দিলেন। এরপর হযরত মূসা (আ.) তাওরাতের যেসব ফলক রাগান্বিত অবস্থায় রেখে দিয়েছিলেন, সেগুলো তুলে নিলেন এবং বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে পবিত্র ভূমি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে এমন এক শহরে উপনীত হলেন, যা 'জাব্বারীন' অর্থাৎ প্রবল প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। তাদের আকার-আকৃতি ও দৈহিক গড়ন ভয়াবহ ছিল। তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন, শক্তি ও শান-শওকতের লোমহর্ষক কাহিনী বনী ইসরাঈলের শ্রুতিগোচর হলো। হযরত মূসা (আ.)-এর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি এই শহরে প্রবেশ করবেন; কিন্তু এই প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের অবস্থা শুনে বনী ইসরাঈল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল : হে মূসা! এই শহরে ভয়ানক প্রতাপশালী অত্যাচারী সম্প্রদায় বাস করে। তাদের মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। যতক্ষণ তারা এ শহরে বর্তমান থাকবে, ততক্ষণ আমরা শহরে প্রবেশ করব না। হাঁ, তারা যদি শহর ত্যাগ করে কোথাও চলে যায়, তবে আমরা শহরে প্রবেশ করতে পারি।

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ : আলোচ্য রেওয়ায়েতের একজন রাবী ইয়াজিদ ইবনে হারূনকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াতের কেরাত এভাবেই করেছেন কি? ইয়াজিদ বললেন, হাঁ, তিনি আয়াতটি এভাবেই পাঠ করেছেন। আয়াতে رَجُلَانِ (দুই ব্যক্তি) বলে প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের দু'ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। তারা শহর থেকে এসে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। বনী ইসরাঈলকে আতঙ্কগ্রস্ত দেখে তারা বলল, আমরা

আমাদের সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। তোমরা তাদের দৈহিক গড়ন, বিশাল বপু ও সংখ্যাধিক্য দেখে ভয় পাচ্ছ। প্রকৃত সত্য এই যে, তাদের মধ্যে মনোবল বলতে মোটেই নেই। তারা মোকাবিলায় হীনবল। তোমরা শহরের ফটক পর্যন্ত অগ্রসর হলেই দেখবে যে, তারা অস্ত্র সংবরণ করে নিয়েছে। ফলে তোমরাই তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে।
কেউ কেউ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ আয়াতের তাফসীর এরূপ করেছেন যে, এই দুই ব্যক্তি হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের ছিল।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ.

অর্থাৎ বনী ইসরাঈল এ দুই ব্যক্তির উপদেশ শোনার পরও হযরত মূসা (আ.)-কে কর্কশ ভাষায় অশোভন ভঙ্গিতে জওয়াব দিল : হে মূসা! আমরা তো এই শহরে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই প্রবেশ করব না, যতক্ষণ এই শক্তিশালী কওম এখানে থাকবে। যদি আপনি তাদের মোকাবিলায় করতে চান, তবে আপনি এবং আপনার পালনকর্তা গিয়ে তাদের সাথে লড়াই করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম।

হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অগণিত নিয়ামত সত্ত্বেও প্রতি পদক্ষেপে তাদের অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রত্যক্ষ করে আসছিলেন; কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনও তাদের জন্য বদদোয়া করেন নি। কিন্তু এবার তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তাদের এই অনর্থক জওয়াব শুনে তিনি নিরতিশয় মনক্ষুণ্ন এবং দুঃখিত হলেন এবং তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে 'ফাসেক' (পাপাচারী) শব্দ ব্যবহার করলেন। সাজা হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেকেও তাদেরকে ফাসেক নাম দেওয়া হলো এবং পবিত্র ভূমি থেকে চল্লিশ বছরের জন্য বঞ্চিত করে দেওয়া হলো। এছাড়া তাদেরকে উন্মুক্ত প্রান্তরে এমনভাবে আবদ্ধ করে দেওয়া হলো যে, অস্থির হয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তারা কেবল চলতেই থাকত। কিন্তু আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা (আ.)ও তাদের সাথে ছিলেন। তাঁর বরকতে এই ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্তির দিনগুলোতেও আল্লাহ তা'আলার অনেক নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। তারা তীহ প্রান্তরে যেদিকেই যেত, মেঘমালা তাদের মাথার উপর ছায়া দান করত। তাদের আহারের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাজিল হতো। তাদের পোশাক অলৌকিকভাবে ময়লাযুক্ত হতো না এবং ছিন্ন হতো না। তাদেরকে একটি চৌকোণ পাথর দান করে হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, যখন তাদের পানির প্রয়োজন হয়, তখন এই পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করবে। আঘাত করার সাথে সাথে পাথর থেকে বারটি ঝরনা প্রবাহিত হয়ে যেত। পাথরের প্রত্যেক দিক থেকে তিনটি করে ঝরনা প্রবাহিত হতো। বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্রের মধ্যে ঝরনা-গুলো নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে বিবাদ সৃষ্টি না হয়। তারা যখনই এক জায়গা থেকে সফর করে অন্য জায়গায় তাঁবু ফেলত, তখন পাথরটিকেও সেখানে বিদ্যমান দেখতে পেত। -(কুরতুবী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। আমার মতে এটা সঠিক। কেননা হযরত মু'আবিয়া (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনে হাদীসে বর্ণিত এই বিষয়বস্তু অস্বীকার করলেন যে, কিবতীর হত্যাকারীর সন্ধান ঐ দ্বিতীয় কিবতী বলে দিয়েছিল, যার সাথে ইসরাঈলী ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন লড়াইরত ছিল। কারণ এই যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে দ্বিতীয় কীবতী কিছুই জানত না। এমতাবস্থায় সে এর খবর কিরূপে দিতে পারে। এ খবর তো একমাত্র ঝগড়াকারী ইসরাঈলী ব্যক্তিই জানত।

হযরত মু'আবিয়া (রা.) হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনা মেনে নিতে অস্বীকৃত হলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাগান্বিত হলেন এবং মু'আবিয়ার হাত ধরে তাকে সা'দ ইবনে মালেক যুহরীর কাছে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তাকে বললেন : হে আবু ইসহাক, তোমার স্মরণ আছে কি, যখন আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মূসা (আ.)-এর হাতে নিহত কিবতীর হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন এই গোপন ভেদ ফাঁসকারী ও হত্যাকারীর সন্ধানদাতা ইসরাঈলী ছিল, না দ্বিতীয় কিবতী? সা'দ ইবনে মালেক বললেন : দ্বিতীয় কিবতীই ঘটনা ফাঁস করেছিল। কেননা সে ইসরাঈলীর মুখে এ কথা শুনেছিল যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে। সে-ই ফেরাউনের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিয়েছিল। ইমাম নাসায়ী এই বিস্তারিত হাদীসটি 'সুনানে কুবরা' গ্রন্থে তাফসীর অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন।

এই হাদীসটি ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আবী হাতেম তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইয়াজিদ ইবনে হারূনের সনদ দ্বারাই উদ্ধৃত করে বলেছেন : হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভাষ্য নয়; বরং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-

এর নিজের কথা। তিনি একে কা'ব আহবারের ঐ সব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গ্রহণ করেছেন, যেগুলো উদ্ধৃত করা ও বর্ণনা করা বৈধ রাখা হয়েছে। তবে এতে কোথাও কোথাও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাক্যাবলিও সংযুক্ত হয়েছে। ইমাম ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আদ্যোপান্ত হাদীস ও তার উপর গবেষণা ও সত্যায়ন লিপিবদ্ধ করার পর বলেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় শায়েখ আবুল হাজ্জাজ মিযযী. ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের ন্যায় হাদীসটিকে মাওকূফ অর্থাৎ ইবনে আব্বাসের ভাষ্য বলতেন।

উল্লিখিত কাহিনী থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় : কুরআন পাক হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই কাহিনীতে হাজার হাজার শিক্ষা, রহস্য ও আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের ঈমান সুদৃঢ়। এগুলোতে কর্মোদ্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশাবলিও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য সূরায় কাহিনীটি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে : তাই এর শিক্ষা, উপদেশ ও নির্দেশাবলির কিছু অংশও প্রসঙ্গক্রমে লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ফেরাউনের বোকাসুলভ চেষ্টা-তদবির এবং প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর পরিকল্পনা : ফেরাউন যখন জানতে পারল যে, বনী-ইসরাঈলের মধ্যে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে, তখন সে ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানদের জন্মরোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আদেশ জারি করে। এরপর জাতীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে এক বছরের ছেলে-মেয়েদেরকে জীবিত রাখার এবং পরবর্তী বছরের ছেলেদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যে বছর ছেলেদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া হতো, সে বছরই হযরত মূসা (আ.)-কে জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট করার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার ছিল, কিন্তু নির্বোধ ফেরাউনের উৎপীড়নমূলক পরিকল্পনা পূর্ণরূপে নস্যাৎ করা ও তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছায় হত্যার বছরেই হযরত মূসা (আ.)- কে ভূমিষ্ট করালেন। আল্লাহ তা'আলা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটালেন, যাতে হযরত মূসা (আ.) স্বয়ং খোদাদ্রোহী জালেমের গৃহে লালিত-পালিত হন। ফেরাউন ও তার স্ত্রী পরম ঔৎসুক্যের সাথে তাঁকে নিজেদের গৃহে লালন-পালন করেন। সারা দেশের ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানরা মূসা সন্দেহে নিহত হচ্ছিল, আর হযরত মূসা (আ.) স্বয়ং ফেরাউনের গৃহে আরাম -আয়েশ ও আদর-যত্নের সাথে বয়সের সিঁড়ি অতিক্রম করছিলেন।

در بہ بند و دشمن اندر خانہ بود ☆ حیلۂ فرعون زیں افسانہ بود

[দরজা বন্ধ করে দিল, অথচ শত্রু ভিতরেই রয়ে গেল : ফেরাউনের পরিকল্পনা এই কাহিনীর প্রতিচ্ছবি।]

মূসা জননীর প্রতি অলৌকিক নিয়ামত বেং ফেরাউনী পরিকল্পনার আরও একটি প্রতিশোধ : হযরত মূসা (আ.) যদি সাধারণ শিশুদের ন্যায় কোনো ধাত্রীর দুধ কবুল করতেন, তবে তাঁর লালন-পালন শত্রু ফেরাউনের গৃহে এরপরও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে হতো। কিন্তু তাঁর মাতা তাঁর বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং হযরত মূসা (আ.)-ও কোনো কাফের মহিলার দুধ পেতেন. আল্লাহ তা'আলা একদিকে তাঁর পয়গম্বরকে কাফের মহিলার দুধ থেকেও বাঁচিয়ে নিলেন এবং অপরদিকে তাঁর মাতাকেও বিরহের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন। মুক্তিও এমনভাবে দিলেন যে, ফেরাউনের পরিবার তাঁর কাছে ঋণী হয়ে রইল এবং উপঢৌকন ও উপহারের বৃষ্টিও বর্ষিত হলো। নিজেরই প্রাণপ্রতিম সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর বিনিময়ে মূসা-জননী ফেরাউনের রাজদরবার থেকে ভাতাও পেলেন এবং ফেরাউনের গৃহে সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় থাকতে হলো না। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের জন্যে একটি সুসংবাদ : এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে শিল্পপতি তার শিল্পকাজে ছওয়াবের নিয়ত রাখে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর জননীর ন্যায়। তিনি আপন শিশুকে দুধ পান করিয়ে অপরের কাছ থেকে ভাতা পেয়েছেন। (ইবনে-কাছীর) উদ্দেশ্য এই যে, কোনো রাজমিস্ত্রী মসজিদ খানকাহ, মাদ্রাসা অথবা কোনো জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কালে যদি শুধু মজুরি ও পয়সা উপার্জনের নিয়ত করে, তবে সে তাই পাবে। কিন্তু যদি সে এরূপ নিয়তও করে যে, এই নির্মাণ কাজ সৎকাজে নিয়োজিত হবে। এর দ্বারা ধার্মিক ব্যক্তিরা উপকৃত হবে- এজন্যে একাজকে সে অন্য কাজের উপর অগ্রাধিকার দেয়, তবে সে মূসা-জননীর ন্যায় মজুরিও পাবে এবং ধর্মীয় উপকারও লাভ করবে।

আল্লাহর বিশেষ বান্দাগণ প্রেমাস্পদসুলভ মাধুর্য প্রাপ্ত হন : وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ-আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাগণকে বিশেষ এক প্রকার প্রেমাস্পদসুলভ সৌন্দর্য দান করেন। ফলে তাদেরকে দেখে আপন-পর, শত্রু, মিত্র সবাই মহব্বত করতে থাকে। পয়গম্বরগণের স্তর তো অনেক উর্ধ্বে, অনেক ওলীর মধ্যে এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

হযরত মূসা (আ.) এর হাতে ফেরাউনী কাফেরের হত্যাকে 'ভুলক্রমে হত্যা' কেন সাব্যস্ত করা হলো : মূসা (আ.) **জনৈক ইসরাঈলী মুসলমানকে ফেরাউনী কাফেরের সাথে লড়াইরত দেখে ফেরাউনীকে ঘুষি মারলেন, ফলে সে প্রাণ ত্যাগ করল।** হযরত মূসা (আ.) নিজেও এ কাজকে 'শয়তানের কাজ' বলে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাও করা হয়েছে।

কিন্তু এখানে একটি আইনগত প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ফেরাউন ব্যক্তি কাফের এবং হরবী ছিল। তার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর কোনো শান্তিচুক্তি ছিল না এবং তাকে জিম্মি কাফেরদের তালিকাভুক্ত করা যেত না, যাদের জান-মাল ও সম্মানের হেফাজত করা মুসলমানদের দায়িত্বে ওয়াজিব। সে ছিল একান্তই হরবী কাফের। ইসলামি শরিয়তের আইনে এরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করা গোনাহ নয়। এমতাবস্থায় এ হত্যাকে শয়তানের কাজ কি কারণে সাব্যস্ত করা হলো?

বিশিষ্ট তাফসীর গ্রন্থসমূহে কেউ কেউ এ প্রশ্নের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। আমি যখন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর নির্দেশে "আহ্কামুল -কুরআন" গ্রন্থের রচনায় নিয়োজিত ছিলাম, তখন এ প্রশ্ন উত্থাপন করায় তিনি উত্তরে বলেছেন: এ কথা ঠিক যে, এই ফেরাউনী কাফেরের সাথে সরাসরি ও প্রকাশ্য কোনো শান্তি-চুক্তি অথবা জিম্মি হওয়ার চুক্তি ছিল না। কিন্তু তখন হযরত মূসা (আ.)-এরও রাজত্ব ছিল না এবং সেই নিহত ব্যক্তিরও ছিল না। বরং তারা উভয়েরই ফেরাউনের রাজত্বে নাগরিক ছিল এবং একজন অপরজনের পক্ষে থেকে নিরাপদ ছিল। এটা ছিল এক প্রকার অলিখিত কার্যগত চুক্তি। ফেরাউনকে হত্যার ফলে এই কার্যত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ হয়েছে। তাই একে 'ভুলক্রমে হত্যা' সাব্যস্ত করা হয়েছে। ভুলটি যেহেতু ইচ্ছাকৃত নয়-ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছে, তাই এটা মূসা (আ.) -এর নবীসুলভ পবিত্রতার পরিপন্থি নয়।

এ কারণেই মাওলানা থানভী (র) অবিভক্ত ভারতে কোনো মুসলমানের পক্ষে কোনো হিন্দুর জান-মালের ক্ষতি করা বৈধ মনে করতেন না। কেননা মুসলমান ও হিন্দু এ উভয় সম্প্রদায় তখন ইংরেজদের রাজত্বে বাস করত।

অক্ষমদের সাহায্য ও জনসেবা ইহকাল পরকালে উপকারী : হযরত মূসা (আ.) মাদাইয়ান শহরের উপকণ্ঠে দু'জন মহিলাকে দেখল যে, তারা অক্ষমতার কারণে তাদের ছাগলকে পানি পান করাতে পারছে না। মহিলাদ্বয় সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং হযরত মূসা (আ.) একজন মুসাফির ছিলেন। কিন্তু অক্ষমদের সেবা ভদ্রতা ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার কাছেও পছন্দনীয় কাজ ছিল। তাই তিনি তাদের জন্য পরিশ্রম স্বীকার করলেন এবং তাদের ছাগলকে পানি পান করিয়ে দিলেন। এ কাজের ছওয়াবও পুরস্কার আল্লাহর কাছে বিরাট। দুনিয়াতেও তাঁর এ কাজকে প্রবাস জীবনের অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে নিজের শান অনুযায়ী জীবন গঠন করার সুযোগ তিনি এর মাধ্যমেই লাভ করেন এবং হযরত শোআইব (আ.) -এর সেবা ও তাঁর জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যৌবনে পদার্পণ করার পর তাঁর মাতাকে যে দায়িত্ব পালন করতে হতো, আল্লাহ তা'আলা প্রবাস জীবনে তা একজন পয়গম্বরের হাতে সম্পন্ন করিয়ে দিয়েছেন।

দুই পয়গম্বরের মধ্যে চাকর ও মনিবের সম্পর্ক : এর রহস্য ও অভাবনীয় উপকারিতা : হযরত মূসা (আ.) শোআইব (আ.)-এর গৃহে অতিথি হয়ে ফেরাউনী সিপাহীদের কবল থেকে নিশ্চিন্ত হলে হযরত শোআইব (আ.) স্বীয় কন্যার পরামর্শক্রমে তাঁকে চাকর রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। এতে আল্লাহর অনেক হেকমত এবং মানবজাতির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত নিহিত রয়েছে।

প্রথমত : হযরত শোআইব (আ.) আল্লাহর নবী ও রাসূল ছিলেন। একজন প্রবাসী মুসাফিরকে চাকুরীর বিনিময় ছাড়াই কিছুদিন নিজ গৃহে আশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই দুষ্কর ছিল না। কিন্তু তিনি সম্ভবত পয়গম্বরসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে একথা বুঝে নিয়েছিলেন যে, সংসাহী মূসা (আ.) এ ধরনের আতিথ্য কবুল করবেন না এবং অন্যত্র চলে গেলে বিপদগ্রস্ত হবেন। তাই সকল প্রকার লৌকিকতা পরিহার করে লেন-দেনের পথ বিছে নিলেন। এতে অপরের জন্যেও নির্দেশ রয়েছে যে, অন্যের গৃহে গিয়ে তাঁর গলগ্রহ হয়ে যাওয়া ভদ্রতার খেলাফ।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় ছিল হযরত মূসা (আ.)-কে রিসালাত ও নবুয়ত দ্বারা ভূষিত করা। এর জন্যে যদিও কোনোরূপ সাধনা ও কর্ম শর্ত নয় এবং কোনো সাধনা ও কর্ম দ্বারা তা অর্জন করা যায় না; কিন্তু আল্লাহর চিরাচরিত রীতি এই যে, তিনি পয়গম্বরগণকেও সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পথ পরিচালনা করেন। কেননা এটা মানব চরিত্রের উৎকর্ষের উপায় এবং অপরের সংশোধনের প্রধান কারণ হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ.)-এর জীবন এ পর্যন্ত রাজকীয় সম্মান ও জাঁকজমকের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে তাঁকে জনগণের পথপ্রদর্শকও সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে

হবে। হযরত শোআয়ব (আ.)-এর সাথে শ্রম ও মজুরির এই চুক্তিতে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন সম্পর্কিত অনুশীলনের গোপন ভেদও নিহিত ছিল। সাধক সিরাজী তাই বলেন :

شبان وادی ایمان گہیر سد بمراد * کہ چند سال بجاں خدمت شعیب کند

তৃতীয়ত হযরত মূসা (আ.)-এর কাছ থেকে ছাগল চরানোর কাজ নেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ পয়গম্বরকে এ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। ছাগল সাধারণত পাল থেকে আলাদা হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে। ফলে রাখালের মনে বার বার ক্রোধের উদ্রেক হয়। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সে যদি পলাতক ছাগল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তবে ছাগল হাতছাড়া হয়ে কোনো বাঘের খোরাকে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছামতো পরিচালনা করার জন্যে যদি রাখাল ছাগলকে মারপিট করে, ক্ষীণকায় জন্তু হওয়ার কারণে হাত-পা ভেঙ্গে যাওয়া বিচিত্র নয়। এ কারণে রাখালকে অত্যধিক ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। পয়গম্বরগণের সাথে সাধারণ মানব সমাজের ব্যবহারও তদ্রূপ হয়ে থাকে। এতে পয়গম্বরগণ তাদের তরফ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেও পারেন না এবং তাদেরকে কঠোরতার মাধ্যমেও পথে আনতে পারেন না। ফলে ধৈর্য ও সহনশীলতার অভ্যাসের পথই তাঁদেরকে অবলম্বন করতে হয়।

কাউকে কোনো পদ ও চাকুরী দান করার চমৎকার মাপকাঠি : এই কাহিনীতে হযরত শোআইব (আ.)-এর কন্যা পিতাকে পরামর্শ দিয়েছে যে, তাঁকে চাকর রাখা হোক। এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে সে বলেছে যে, শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই সর্বোত্তম চাকর হতে পারে। 'শক্তিশালী' বলে এখানে অর্পিত কাজের শক্তি ও যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে এবং 'বিশ্বস্ত' বলে বোঝানো হয়েছে যে, তাঁর সাবেক জীবনের অবস্থা তার সততা ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দেয়। আজকাল বিভিন্ন চাকুরী এবং ও বেসরকারী পদের জন্য প্রার্থী বাছাই ক্ষেত্রে আবেদনকারীর মধ্যে যেসব গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তা সবই উপরিউক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে; বরং প্রচলিত বাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত শর্তাবলির মধ্যে উপরিউক্ত বিষয়াদি সাধারণত পূর্ণরূপে অনুসরণ করা হয় না। কেননা সততা ও বিশ্বস্ততা আজকাল কোথাও বিবেচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয় না। শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতার ডিগ্রীকেই মাপকাঠি ধরা হয়। আজকাল সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যেসব ত্রুটি -বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হয়, তার অধিকাংশ এই সততা বিষয়ক মূলনীতি প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনেরই ফল। শিক্ষার দিক দিয়ে যোগ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততা গুণ না থাকে, তবে সে কারচুপি ও ঘুষখোরীর এমন অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সিদ্ধহস্ত হয়, যা আইনের আওতায় পড়ে না। এ দোষটিই আজ বিশ্বের অধিকাংশ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে অকেজো; বরং ক্ষতিকর রেখেছে। এ কারণেই ইসলামি ব্যবস্থায় এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার সুফল বহু শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

জাদুকর ও পয়গম্বরগণের কাজে সুস্পষ্ট পার্থক্য : ফেরাউন সমবেত জাদুকরদেরকে দেশ ও জাতির বিপদাশঙ্কা সামনে রেখে কাজ করতে বলেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে একে নিজের কাজ মনে করে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু তারা কি করেছে? কাজ শুরু করার আগেই পারিশ্রমিকের ব্যাপারে দর-কষাকষি আরম্ভ করে দিয়েছে। এর বিপরীতে আল্লাহ প্রেরিত সব পয়গম্বরগণ মানুষের সামনে এই ঘোষণা রাখেন : وَلَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। পয়গম্বরগণের প্রচার ও দাওয়াত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রভাব অত্যধিক। ইসলামি বায়তুল-মাল থেকে আলেম মুফতি ও ওয়ায়েজদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে তাঁরা শিক্ষাদান, ওয়াজ ও ইমামতির বেতন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই বেতন গ্রহণ পরবর্তী ফিকহবিদগণের মতে অপারগ অবস্থায় জায়েজ হলেও জনগণের সংস্কারের ক্ষেত্রে এর কুফল অস্বীকার করার উপায় নেই। বলাবাহুল্য, বিনিময় গ্রহণ করার ফলে তাঁদের প্রচেষ্টার উপকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

ফেরাউনী জাদুকরদের জাদুর স্বরূপ : ফেরাউনী জাদুকররা তাদের লাঠি ও রশিগুলোকে বাহ্যত সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিল। প্রশ্ন এই যে, এগুলো কি বাস্তবিকই সাপ হয়ে গিয়েছিল? এ সম্পর্কে কুরআন পাকের ভাষা يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اِنَّهَا تَسْعٰى -(জাদুর কারণে এগুলো ইতস্তত ছুটাছুটি করছে বলে মনে হচ্ছিল) থেকে জানা যায় যে, এগুলো সত্যিকার সাপ হয়ে যায়নি, বরং জাদুকররা এক প্রকার মেসমেরিজমের মাধ্যমে দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে দৃষ্টি-বিভ্রাট করে দিয়েছিল। ফলে এগুলো দর্শকদের কাছে ছুটাছুটিরত সাপ বলে মনে হচ্ছিল।

অবশ্য এ দ্বারা এটা জরুরি নয় যে, জাদুবলে বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তিত হতে পারে না। এখানে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ফেরাউনী জাদুকরদের জাদু বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন করার মতো শক্তিশালী ছিল না।

গোত্রগত বিভক্তি সামাজিক কাজ কারবারের সীমা পর্যন্ত নিন্দনীয় নয় : ইসলাম দেশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও গোত্রগত বিভেদকে জাতীয়তার ভিত্তি স্থির করার তীব্র নিন্দা করেছে এবং এসব বিভেদ মিটানোর জন্যে প্রতি কাজে প্রতি পদক্ষেপে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামি রাজনীতির ভিত্তিই হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। এতে আরবি, আজমি, ফারসি, হিন্দি ও সিন্ধি সবাই একজাতির ব্যক্তিবর্গ। বিশ্বনবী ﷺ মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করার জন্যে সর্বপ্রথম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একাত্মতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিদায় হজের ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য এই কর্মপদ্ধতি ব্যক্ত করেন যে, আঞ্চলিক, বংশগত ও ভাষাগত বিভেদের মূর্তিকে ইসলাম ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এতদসত্ত্বেও সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত এসব পার্থ্যক্যকে মূল্য দেওয়ার অনুমতি ইসলামে আছে। কেননা বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের পানাহার ও বসবাসের পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এগুলোর বিপরীত করা খুবই কষ্টকর কাজ।

হযরত মূসা (আ.) যে বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেছিলেন, তারা বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা এসব গোত্রের পার্থক্যকে সামাজিক কাজ-কারবারে বৈধ রাখেন। ফলে দরিয়ার মধ্যেও প্রত্যেক গোত্রের জন্য অলৌকিকভাবে আলাদা বারটি রাস্তা প্রকাশ করে দেন। এমনিভাবে তীহ্ প্রান্তরে পাথর থেকেও অলৌকিকভাবে আলাদা আলাদা বারটি ঝরনা প্রবাহিত করে দেন, যাতে গোত্রসমূহের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি না হয় এবং প্রত্যেক গোত্র তার নির্ধারিত পানি লাভ করতে পারে।

সমষ্টিগত শৃঙ্খলা বিধানের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা : হযরত মূসা (আ.) এক মাসের জন্য তাঁর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পৃথক হয়ে তূর পর্বতে ইবাদতে মশগুল হতে চেয়েছিলেন। তখন হযরত হারূন (আ.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে সবাইকে নির্দেশ দিলেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা তার আনুগত্য করবে। পারস্পরিক মতভেদ ও অনৈক্য রোধ করাই ছিল এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। এ থেকে জানা যায় যে, কোনো রাষ্ট্র, দল ও পরিবারের প্রধান যদি বিদেশ সফরে গমন করে, তবে প্রশাসনযন্ত্র চালু রাখার জন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যাওয়া পয়গম্বরদের সুন্নত।

মুসলমানদের দলে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে বড় ধরনের মন্দকে সাময়িকভাবে বরদাশত করা যায় : হযরত মূসা (আ.)- এর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বৎস পূজা অনর্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হযরত হারূন (আ.) সবাইকে সত্যের দাওয়াত দেন, কিন্তু হযরত মূসা (আ.) -এর ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি কোনো দলের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেননি। এতে হযরত মূসা (আ.) ক্রুদ্ধ হলে তিনি এই অজুহাতই পেশ করেন যে, আমি কঠোরতায় অবতীর্ণ হলে বনী ইসরাঈল শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত।

إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

অর্থাৎ আমি কোনো দল থেকেই কঠোরভাবে বিচ্ছিন্নতাও নিস্পৃহতার কথা ঘোষণা করিনি; কারণ তাহলে আপনি ফিরে এসে আমাকে অভিযুক্ত করে বলতেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছ এবং আমার নির্দেশ পালন করনি।

হযরত মূসা (আ.)-ও তাঁর অজুহাতকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেননি; বরং সঠিক মেনে নিয়ে তাঁর জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাময়িকভাবে কোনো মন্দ কাজের ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন করলে তা দুরস্ত হবে। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ

হযরত মূসা (আ.)- এর কাহিনীর উল্লিখিত হেদায়েতসমূহের শেষে হযরত মূসা ও হারূন (আ.)- কে একটি বিশেষ নির্দেশ সহকারে ফেরাউনকে পথ প্রদর্শননের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। নির্দেশটি এই :

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

পয়গম্বরসুলভ দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি : এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথ প্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙ্ক্ষার ভঙ্গিতে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিন্তা- ভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

ফেরাউন খোদায়ী -দাবিদার অত্যাচারী বাদশাহ ছিল এবং আপন সত্তার হেফাজতের জন্য বনী ইসরাঈলের হাজারো ছেলে-সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী ছিল। তার কাছেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ পয়গম্বরদেরকে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে সে চিন্তাভাবনার সুযোগ পায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই জানতেন যে, ফেরাউন তার অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে বিরত হবে না; কিন্তু যে নীতির মাধ্যমে মানবজাতি চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয় এবং আল্লাহভীতির দিকে ফিরে আসে, পয়গম্বরগণকে সেই নীতির অনুসারী করা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ফেরাউন হেদায়েত লাভ করুক বা না করুক; কিন্তু নীতি এমন হওয়া চাই, যা হেদায়েত ও সংস্কারের উপায় হতে পারে।

আজকাল অনেক আলেম নিজেদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে একে অপরের বিরুদ্ধে গালিগালাজ ও দোষারোপকে ইসলামের সেবা মনে করে বসেছে। তাদের এ বিষয়ে বিশদ চিন্তাভাবনা করা উচিত।

হযরত মূসা (আ.) কেন ভয় পেলেন ? إِنَّنَا نَخَافُ : হযরত মূসা ও হারূন (আ.) এখানে আল্লাহ তা'আলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় أَنْ يَّفْرُطَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরাউন সম্ভবত আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার আগেই ক্ষমতার অহমিকায় উত্তেজিত হয়ে উঠবে এবং আক্রমণ করে বসবে। দ্বিতীয় ভয় أَنْ يَّطْغٰى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবত সে আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরো বেশি অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে হযরত মূসা (আ.)-কে নবুয়ত ও রিসালাত দান করা হলে তিনি হযরত হারূন (আ.)-কে তাঁর সাথে শরিক করার আবেদন করেন। তাঁর আবেদন কবুল করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে বলে দেন : سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا
অর্থাৎ আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু সবল করব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছাতে পারবে না। এছাড়া এ আশ্বাসও দান করেন যে, তুমি যা যা প্রার্থনা করেছ, সবই তোমাকে দান করলাম।

قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى : এসব প্রার্থিত বিষয়ের মধ্যে বক্ষ উন্মোচনও ছিল। বক্ষ উন্মোচনের সারমর্ম এই যে, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে অন্তরে কোনোরূপ সংকীর্ণতা ও ভয় ভীতি সৃষ্টি হবে না।

আল্লাহ তা'আলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি? এর এক উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না– এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট। এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে পারে আবার বৈষয়িক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শোনা ও মু'জিযা দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, ফেরাউন কথা শোনার আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। তাছাড়া বক্ষ উন্মোচনের জন্য তো স্বভাবগত ভয় দূর হয়ে যাওয়াটা জরুরি নয়।

দ্বিতীয়ত, ভয়ের বস্তু দেখে স্বভাবগতভাবে ভয় করা সব পয়গম্বরদের সুন্নত। এ ভয় পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়। স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) তাঁরই লাঠি সাপে রূপান্তিত হওয়ার পর তাকে ধরতে ভয় পাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ বললেন, لَا تَخَفْ ভয় করো না। অন্যান্য সব ভয়ের ক্ষেত্রে এমনিভাবে স্বভাবগত ও মানবগত ভয় দেখা দিয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদের মাধ্যমে দূর করেছেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গেই
فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ও فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا এবং فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ
আয়াতসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই মানবগত ভয়ের কারণেই শেষ নবী ﷺ মদিনার দিকে এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদিনার দিকে হিজরত করেন। আহযাব যুদ্ধে এই ভয় থেকেই আত্মরক্ষার জন্যে পরিখা খনন করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা বারবার এসেছিল। কিন্তু সত্য এই যে, আল্লাহর ওয়াদার প্রতি তারা সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু মানবের স্বভাবগত তাকিদ অনুযায়ী যে স্বভাবগত ভয় পয়গম্বরদের মধ্যে দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থি নয়।

اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى : আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। এর পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ মানবের উপলব্ধির বাইরে।

হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াতসহ বনী-ইসরাঈলকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তি দেওয়ারও আহবান জানান : এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরগণ যেমন মানব জাতিকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব-স্ব উম্মতকে পার্থিব অর্থনৈতিক দুর্গতির কবল থেকে মুক্ত করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য। তাই কুরআন পাকে হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াতে উভয় বস্তুই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করে প্রত্যেকের অস্তিত্বের উপযোগী নির্দেশ দিয়েছেন, ফলে সে তার কাজে নিয়োজিত হয়েছে : এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, এক প্রকার বিশেষ নির্দেশ হচ্ছে পয়গম্বরদের দায়িত্ব ও পরম কর্তব্য। জ্ঞানশীল মানব ও জিনই এই নির্দেশের পাত্র ও প্রতিপক্ষ। এছাড়া অন্য এক প্রকার সৃষ্টিগত নির্দেশও আছে। এই নির্দেশ সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। আগুন, পানি, মাটি, বাতাস ও এদের সমন্বয়ে গঠিত প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ এক প্রকার চেতনা ও অনুভূতি দান করেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতি মানব ও জিনের সমান নয়। এ কারণেই এই চেতনার অধিকারীদের উপর হালাল ও হারামের বিধি-বিধান আরোপিত হয় না। এই অপূর্ণ চেতনা ও অনুভূতির পথেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোকে অমুক কাজ করতে হবে। এই সৃষ্টিগত নির্দেশ অনুসরণ করে ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, ও এতদুভয়ের সব সৃজিত বস্তু নিজ নিজ কাজেও আপন আপন কর্তব্যে নিয়োজিত রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য তাদের কাজ করছে। গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য তারকা আপন আপন কাজে এমনভাবে মশগুল আছে যে, এক মিনিট অথবা এক সেকেণ্ডও পার্থক্য হয় না। বাতাস, পানি, আগুন, মাটি তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যাপৃত আছে এবং আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তাতে কেশাগ্র পরিমাণও ব্যতিক্রম করছে না। হাঁ ব্যতিক্রমের নির্দেশ হলে কখনো আগুন পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়; যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য হয়েছিল এবং কখনো পানি আগুনের কাজ করতে থাকে, যেমন কওমে নূহের জন্য করেছিল। أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا (তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল)। জন্মের শুরুতে শিশুকে কথাবার্তা শিক্ষা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। এমতাবস্থায় তাকে কে শিক্ষা দিল যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্য হাসিল করতে হবে এবং মায়ের স্তন চেপে ধরে দুধ চুষে নেওয়ার কৌশল তাকে কে বলে দিল? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও গরমে ক্রন্দন করাই তার সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ক্রন্দন কে শিক্ষা দিল? এটাই আল্লাহর নির্দেশ, যা প্রত্যেক সৃষ্ট জীব তার সামর্থ্য ও প্রয়োজন মোতাবেক অদৃশ্য জগৎ থেকে কারো শিক্ষা ব্যতীত প্রাপ্ত হয়।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি ব্যাপক সৃষ্টিগত নির্দেশ প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের জন্য রয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্টজীব সৃষ্টিগতভাবে এই নির্দেশ অনুসরণ করে এবং এর বিপরীত করা তার সাধ্যের অতীত। দ্বিতীয় নির্দেশ বিশেষভাবে জ্ঞানশীল জিন ও মানবের জন্য রয়েছে। এই নির্দেশ সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক নয়; বরং ইচ্ছাধীন। এই ইচ্ছার কারণেই মানব ও জিন ছওয়াব অথবা আজাবের অধিকারী হয়।

أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ : আয়াতে প্রথমোক্ত প্রকার নির্দেশ বিধৃত হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার ঐ কাজের কথা বলেছেন, যা সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ একাজ নিজে অথবা অন্য কোনো মানব করেছে বলে দাবি করতে পারে না। ফেরাউন এ কথার কোনো জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আবোল -তাবোল প্রশ্ন তুলে এড়িয়ে গেল এবং হযরত মূসা (আ.)-কে এমন একটি প্রশ্ন করল, যার সত্যিকার জওয়াব জনসাধারণের শ্রুতিগোচর হলে তারা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। প্রশ্নটি এই যে, অতীত যুগে যেসব উম্মত ও জাতি প্রতিমা পূজা করত, আপনার মতে তারা কিরূপ, তাদের পরিণাম কি হয়েছে? উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর উত্তরে হযরত মূসা (আ.) অবশ্যই বলবেন যে, তারা সবাই গোমরাহ ও জাহান্নামী। তখন ফেরাউন একথা বলার সুযোগ পাবে যে, আপনি তো সারা বিশ্বকেই বেওকুফ, গোমরাহ ও জাহান্নামী মনে করেন। একথা শুনে জনসাধারণ তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। ফলে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু মূসা (আ.) এ প্রশ্নের এমন বিজ্ঞজনোচিত জবাব দিলেন, যার ফলে ফেরাউনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

إِقْذِفِيْهِ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر امر حاضر معروف বহছ বাব ضَرَبَ মাসদার قَذْفٌ মূলবর্ণ (ق ـ ذ ـ ف) জিনস صحيح অর্থ- তুমি তাকে রাখ, তুমি তাকে নিক্ষেপ করো।

اَلْقَيْتُ : সীগাহ واحد متكلم ماضي معروف বহছ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আমি ঢেলে দিলাম।

تَقَرَّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب مضارع معروف বহছ বাব سَمِعَ মাসদার قُرَّةٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তা জুড়ায়, শীতল হয়।

فَتَنّٰكَ : সীগাহ جمع متكلم ماضي معروف বহছ বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنَةٌ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صحيح অর্থ- আমি তোমাকে পরীক্ষায় ফেললাম।

اِصْطَنَعْتُكَ : সীগাহ واحد متكلم ماضي معروف বহছ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِصْطِنَاعٌ মূলবর্ণ (ص ـ ن ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- আমি তোমাকে মনোনীত করেছি।

فَقُوْلَا : সীগাহ تثنية مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা কথা বল।

اَنْ يَّفْرُطَ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ বাব نَصَرَ মাসদার فَرْطٌ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ط) জিনস صحيح অর্থ- সে বাড়াবাড়ি করবে।

جِئْنٰكَ : সীগাহ جمع متكلم ماضي معروف বহছ বাব ضَرَبَ মাসদার مَجِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ج ـ ى ـ ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموزلام ও اجوف يائى) অর্থ- আমরা তোমার নিকট এনেছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى : এখানে فَقُوْلَا-এর فاء টি আতেফা। আর قُوْلَا ফে'ল তার যমীর ফায়েল আর لَهٗ হলো قُوْلَا-এর متعلق এবং قَوْلًا হলো مفعول مطلق আর لَيِّنًا হলো সিফত [لَعَلَّهٗ এর لَعَلَّ হলো حرف مشبه بالفعل এবং ه হলো তার ইসম। আর يَتَذَكَّرُ হলো তার খবর; او হলো হরফে আতফ يَخْشٰى ফে'ল يَتَذَكَّرُ-এর উপর আতফ হয়েছে। –(ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৮৪)

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾

৫২. মূসা বললেন, তাদের সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে, আমার প্রতিপালক বিভ্রান্ত হন না এবং ভুলেও যান না।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؕ فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٣﴾

৫৩. তিনি এমন, যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানাস্বরূপ করেছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য রাস্তাসমূহ বানিয়েছেন, আর আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন; অতঃপর আমি তা দ্বারা নানা প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।

كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿٥٤﴾

৫৪. তোমরা নিজেরা [-ও] খাও এবং তোমাদের পশুপাল [-ও] চরাও; এ সব বস্তুর মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٥﴾

৫৫. ঐ মাটি হতেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং সে মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং তা হতেই পুনরায় তোমাদেরকে বের করে নেব।

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ﴿٥٦﴾

৫৬. আর তাকে আমার সকল নিদর্শনই দেখিয়েছি, কিন্তু সে মিথ্যারোপই করল এবং অস্বীকারই করল।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. قَالَ মূসা বললেন عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ তাদের সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট فِيْ كِتٰبٍ লিপিবদ্ধ রয়েছে لَا يَضِلُّ رَبِّيْ আমার প্রতিপালক বিভ্রান্ত হননা وَلَا يَنْسٰى, এবং ভুলেও যান না।

৫৩. الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ তিনি এমন যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য করেছেন مَهْدًا বিছানাস্বরূপ وَّسَلَكَ لَكُمْ এবং তোমাদের জন্য বানিয়েছেন فِيْهَا তাতে سُبُلًا রাস্তাসমূহ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً আর আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন فَاَخْرَجْنَا بِهٖ অতঃপর আমি তা দ্বারা উৎপন্ন করেছি اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى নানা প্রকার উদ্ভিদ।

৫৪. كُلُوْا তোমরা নিজেরা খাও وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ, এবং তোমাদের পশুপাল (-ও) চরাও اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ এ সব বস্তুর মধ্যে রয়েছে لَاٰيٰتٍ নিদর্শনাবলি لِّاُولِي النُّهٰى বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

৫৫. مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ ঐ মাটি হতেই আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ, এবং সে মাটিতেই আমি তোমাকে ফিরিয়ে নেব وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ, এবং তা হতেই তোমাদেরকে বের করে নেব تَارَةً اُخْرٰى পুনরায়

৫৬. وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ, আর তাকে দেখিয়েছি اٰيٰتِنَا كُلَّهَا আমার সকল নিদর্শনই فَكَذَّبَ وَاَبٰى কিন্তু সে মিথ্যারোপই করল এবং অস্বীকারই করল।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৫৭. বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছ যে, তোমার জাদুক্রিয়া দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বের করে দেবে।	قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾
৫৮. তবে আমরাও তোমার বিরুদ্ধে তদনুরূপ জাদু আনয়ন করছি। অতএব, আমাদের ও তোমার মধ্যে কোনো সমতল মাঠে মিলনের একটি সময় স্থির কর, যার ব্যতিক্রম না আমরা করব আর না তুমি।	فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَاۤ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾
৫৯. মূসা বললেন, তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেদিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হবে।	قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾
৬০. ফেরাউন ফিরে গেল, অতঃপর স্বীয় কৌশলের উপকরণ একত্র করল, অতঃপর [মাঠে] আসল।	فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦٠﴾
৬১. মূসা বললেন, ওহে হতভাগারা! আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না, অন্যথায় আল্লাহ শাস্তি দ্বারা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন, আর যে মিথ্যা রচনা করে সে ব্যর্থ হয়ে থাকে।	قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৭. قَالَ বলল اَجِئْتَنَا তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ যে لِتُخْرِجَنَا আমাদেরকে বের করে দেবে مِنْ اَرْضِنَا আমাদের দেশ হতে بِسِحْرِكَ তোমার জাদুক্রিয়া দ্বারা يٰمُوْسٰى হে মূসা

৫৮. فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ তবে আমরাও তোমার বিরুদ্ধে তদনুরূপ জাদু আনয়ন করছি। فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا অতএব আমাদের ও তোমার মধ্যে মিলনের একটি সময় স্থির কর لَا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَا اَنْتَ যার ব্যতিক্রম না আমরা করব না তুমি مَكَانًا سُوًى কোনো সমতল মাঠে।

৫৯ قَالَ মূসা বললেন مَوْعِدُكُمْ তোমাদের নির্ধারিত সময় يَوْمُ الزِّيْنَةِ উৎসবের দিন وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى এবং যেদিন জনগণকে পূর্বাহ্নে সমবেত করা হবে।

৬০. فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ ফেরাউন ফিরে গেল فَجَمَعَ كَيْدَهٗ অতঃপর স্বীয় কৌশলের উপকরণ একত্রিত করল ثُمَّ اَتٰى অতঃপর মাঠে আসল।

৬১. قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى মূসা বললেন وَيْلَكُمْ ওহে হতভাগারা لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করোনা فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ অন্যথায় আল্লাহ শাস্তি দ্বারা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى আর যে মিথ্যা রচনা করে সে ব্যর্থ হয়ে থাকে।

৬২. অনন্তর জাদুকররা নিজেদের মতে পরস্পর বিতর্ক করতে লাগল এবং গোপন আলাপ করতে লাগল।	فَتَنَازَعُوٓا اَمۡرَهُمۡ بَيۡنَهُمۡ وَاَسَرُّوا النَّجۡوٰى ﴿٦٢﴾
৬৩. তারা বলল, নিশ্চয় এরা উভয়ে জাদুকর, এদের উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় জাদুক্রিয়ায় তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বের করে দেবে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট [ধর্ম-] মতকে নস্যাৎ করে ফেলবে।	قَالُوٓا اِنۡ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيۡدٰنِ اَنۡ يُّخۡرِجٰكُمۡ مِّنۡ اَرۡضِكُمۡ بِسِحۡرِهِمَا وَيَذۡهَبَا بِطَرِيۡقَتِكُمُ الۡمُثۡلٰى ﴿٦٣﴾
৬৪. অতএব, এখন তোমরা সকলে মিলে স্বীয় তদবীরের ব্যবস্থা কর এবং সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হও, আর আজ সে ব্যক্তিই সফল যে জয়ী হবে।	فَاَجۡمِعُوۡا كَيۡدَكُمۡ ثُمَّ ائۡتُوۡا صَفًّا ۚ وَقَدۡ اَفۡلَحَ الۡيَوۡمَ مَنِ اسۡتَعۡلٰى ﴿٦٤﴾
৬৫. তারা বলল, হে মূসা! আপনিই প্রথম [আপনার লাঠি] নিক্ষেপ করবেন? নাকি, আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হব?	قَالُوۡا يٰمُوۡسٰٓى اِمَّاۤ اَنۡ تُلۡقِىَ وَاِمَّاۤ اَنۡ نَّكُوۡنَ اَوَّلَ مَنۡ اَلۡقٰى ﴿٦٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬২. فَتَنَازَعُوٓا اَمۡرَهُمۡ بَيۡنَهُمۡ অনন্তর জাদুকররা নিজেদের মতে পরস্পর বিতর্ক করতে লাগল وَاَسَرُّوا النَّجۡوٰى এবং গোপন আলাপ করতে লাগল।

৬৩. قَالُوٓا তারা বলল اِنۡ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ নিশ্চয় এরা উভয়ে জাদুকর يُرِيۡدٰنِ اَنۡ يُّخۡرِجٰكُمۡ এদের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদেরকে বের করে দেবে مِّنۡ اَرۡضِكُمۡ তোমাদের দেশ হতে بِسِحۡرِهِمَا স্বীয় জাদুক্রিয়ায় وَيَذۡهَبَا بِطَرِيۡقَتِكُمُ الۡمُثۡلٰى এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট (ধর্ম) মতকে নস্যাৎ করে ফেলবে।

৬৪. فَاَجۡمِعُوۡا كَيۡدَكُمۡ অতএব, এখন তোমরা সকলে মিলে স্বীয় তদবীরের ব্যবস্থা কর ثُمَّ ائۡتُوۡا صَفًّا এবং সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হও وَقَدۡ اَفۡلَحَ الۡيَوۡمَ আর আজ সে ব্যক্তি সফলকাম হবে مَنِ اسۡتَعۡلٰى যে জয়ী হবে।

৬৫. قَالُوۡا তারা বলল يٰمُوۡسٰٓى হে মূসা اِمَّاۤ اَنۡ تُلۡقِىَ আপনিই প্রথম নিক্ষেপ করবেন وَاِمَّاۤ اَنۡ نَّكُوۡنَ اَوَّلَ مَنۡ اَلۡقٰى না, আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হবো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالَ عِلۡمُهَا عِنۡدَ رَبِّىۡ فِىۡ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّىۡ وَلَا يَنۡسَى : ফেরাউন অতীত উম্মতদের পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে হযরত মূসা (আ.) যদি পরিষ্কার বলে দিতেন যে, তারা গোমরাহ্ ও জাহান্নামী, তবে ফেরাউন এরূপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে, সে তো শুধু আমাদেরকেই নয় সারা বিশ্বকে গোমরাহ্ ও জাহান্নামী মনে করে। একথা জনগণের শ্রুতিগোচর হলে তারাও হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে যেত। হযরত মূসা (আ.) এমন বিজ্ঞনোচিত জওয়াব দিলেন যে, পূর্ণ বক্তব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফেরাউনও বিভ্রান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়নি। একেই বলে "সাপও মরেছে এবং লাঠিও ভাঙ্গেনি।" তিনি বললেন : তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আছে; আমার পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। ভুল করার অর্থ এক কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ হয়ে যাওয়া। ভুলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى : এখানে أَزْوَاجٌ শব্দের অর্থ হরেক রকম এবং شَتّٰى শব্দটি شَتِيْتٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদের অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর লতা-গুল্ম, ফল-ফুল ও বৃক্ষের ছালে আল্লাহ তা'আলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কেউ একথা বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তাই চূড়ান্ত। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ মানুষ ও তাদের পালিত জন্তু এবং বন্য জন্তুদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গৃহনির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহারোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ : তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى অর্থাৎ এতে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানদের জন্য। نُهٰى শব্দটি نُهْيَةٌ এর বহুবচন। বিবেককে نُهْيَةٌ (নিষেধকারক) বলার কারণ হলো, এই বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকারক কাজ থেকে নিষেধ করে।

প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্যের সাথে ঐ স্থানের শামিল থাকে যেখানে সে সমাধিস্থ হবে : مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ : مِنْهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা মাটি বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করছি। এখানে সব মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ এক হযরত আদম (আ.) ছাড়া সাধারণ মানুষ মাটি দ্বারা নয়, বীর্য দ্বারা সৃজিত হয়েছে। হযরত আদম (আ.) -এর সৃষ্টিই কেবল সরাসরি মাটি দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তবে 'তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃজন করেছি।" বলার কারণ এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন হযরত আদম (আ.)। তাঁর মধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেউ বলেন, সব বীর্য মূলত মাটি থেকেই উৎপন্ন। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি। কারো কারো মতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে প্রত্যেক মানুষের সৃজনে মাটি অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তাই প্রত্যেক মানুষের সৃজনকে প্রত্যক্ষভাবে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন : কুরআনের ভাষা থেকে বাহ্যত একথাই বোঝা যায় যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষ সৃজিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যেই ঐ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহর জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। আবূ নাঈম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তাযকেরায় উল্লেখ করে বলেছেন

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عَوْنٍ لَمْ نَكْتُبْهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَاصِمِ بْنِ نَبِيْلٍ وَهُوَ اَحَدُ الثِّقَاتِ الْاَعْلَامِ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ

এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী বলেন : যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সৃজনকালে আদিষ্ট হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেওয়া হয়। কাজেই মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্য উভয় বস্তু দ্বারাই হয়। আতা এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত পেশ করেছেন: مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ -[কুরতুবী]

তাফসীরে মাযহারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির একটি অংশ রাখা হয়। মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খামিরে শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরো বলেন : আমি, আবূ বকর ও ওমর একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হব। খতীব এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি গরীব। ইবনে জাওযী একে মাওযূ'আত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু শায়েখ মুহাদ্দিস মির্যা মুহাম্মদ হারেসী বদখশী (র.) বলেন : এই হাদীসের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হযরত ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান (লিগায়রিহি-র) চাইতে কম নয়।-[মাযহারী]

مَكَانًا سُوًى : ফেরাউন হযরত মূসা (আ.) ও জাদুকরদের মোকাবিলার জন্য নিজেই প্রস্তাব করল যে, প্রতিযোগিতাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা ফেরাউন বংশীয় লোকদের ও বনী ইসরাঈলের লোকদের সমান দূরত্বে অবস্থিত- যাতে কোনো পক্ষকেই বেশি দূরে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। হযরত মূসা (আ.) এই প্রস্তাব সমর্থন করে দিন ও সময় এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেন مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতা সাজ-সজ্জার দিনে হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য ঈদ অথবা কোনো মেলা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার দিন। এটা কোন দিন ছিল– এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ফেরাউন বংশীয়দের একটি নির্দিষ্ট ঈদের দিন ছিল। সেদিন তারা সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হতো। কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল নববর্ষের দিন। কেউ বলেন, এটা শনিবার দিন ছিল, যাকে তারা সম্মান করত। আবার কারো মতে এটা আশুরা অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশম দিবস ছিল।

জ্ঞাতব্য : হযরত মূসা (আ.) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্রেণির লোকদের সমাবেশ পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর অবশ্যম্ভাবি পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। সময় রেখেছেন পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ উপরে উঠার পর হয়। এতে এক উপকারিতা এই যে, এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে। দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই উত্তম। এরূপ সময়েই একাগ্রতা ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজে সমাধা করা হয়। এমন সময়ের সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সমাবেশের বিষয়বস্তু দূরদূরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনী জাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান করলেন তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বরং দূরদূরান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ে।

জাদুর স্বরূপ, প্রকার ও শরিয়তগত বিধি-বিধান :

فَجَمَعَ كَيْدَهٗ –ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলায় কৌশল হিসাবে জাদুকর ও তাদের সাজ-সরঞ্জাম জমা করে নিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে জাদুকরদের সংখ্যা বাহাত্তর ছিল বলে বর্ণিত আছে। সংখ্যা সম্পর্কে অন্যান্য আরও বিভিন্ন উক্তি আছে। চারশ থেকে নয় লাখ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সবাই শামউন নামক জনৈক সরদারের নির্দেশ মতো কাজ করত। কথিত আছে যে, তাদের সরদার ছিল একজন অন্ধ ব্যক্তি। -[কুরতুবী]

জাদুকরদের প্রতি হযরত মূসা (আ.)-এর পয়গম্বরসুলভ ভাষণ : মু'জিযা দ্বারা জাদুর মোকাবিলা করার পূর্বে হযরত মূসা (আ.) জাদুকরদের শুভেচ্ছামূলক উপদেশের কয়েকটি বাক্য বলে আল্লাহর আজাবের ভয় প্রদর্শন করলেন। বাক্যগুলো এই :

وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى

অর্থাৎ তোমাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন। আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করো না অর্থাৎ তাঁর সাথে ফেরাউন অথবা অন্য কাউকে শরিক করো না। এরূপ করলে আল্লাহ তোমাদেরকে আজাব দ্বারা পিষ্ট করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে, পরিণামে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়।

বলাবাহুল্য, ফেরাউনের শয়তানি শক্তি ও লোক-লস্করের সহায়তায় যারা মোকাবিলা করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, এসব উপদেশমূলক বাক্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া তাদের জন্যে সুদূরপরাহত ছিল। কিন্তু পয়গম্বর ও তাদের অনুসারীগণের সাথে সত্যের একটি গোপন শক্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকে। তাদের সাদাসিধা ভাষাও পাষাণসম অন্তরে তীর ও ছুরির ন্যায় ক্রিয়া করে। হযরত মূসা (আ.)-এর এসব বাক্য শ্রবণ করে জাদুকরদের কাতার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। কারণ এ জাতীয় কথাবার্তা কোনো জাদুকরের মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই মনে হয়। তাই কেউ কেউ বলেন, এদের মোকাবিলা করা সমীচীন নয়। আবার কেউ কেউ নিজের মতেই অটল রইল। فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ এর অর্থ তাই। এরপর এই মতভেদ দূর করার জন্য তারা গোপনে পরামর্শ করতে লাগল وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى কিন্তু অবশেষে মোকাবিলার পক্ষেই সমষ্টির মত প্রকাশ পেল। তারা বলল–

اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى

অর্থাৎ তারা উভয়ে জাদুকর। তারা চায় তাদের জাদুর জোরে তোমাদেরকে অর্থাৎ ফেরাউন বংশীয়দেরকে তোমাদের দেশ মিসর থেকে বহিষ্কার করে দিতে। উদ্দেশ্য এই যে, জাদুর সাহায্যে তোমাদের দেশ অধিকার করা এবং তোমাদের সর্বোত্তম ধর্মকে মিটিয়ে দেওয়া। مُثْلٰى শব্দটি اَمْثَلُ এর স্ত্রীলিঙ্গ। এর অর্থ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যে ফেরাউনকে খোদা ও ক্ষমতাশালী মান্য কর যে- এ ধর্মই উত্তম ও সেরা ধর্ম, এরা এই ধর্মকে রহিত করে তদস্থলে নিজেদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কোনো কওমের সরদার ও প্রতিনিধিদেরকেও 'কওমের তরিকা, বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী (রা.) থেকে তরিকার এই তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা তোমাদের কওমের সরদার এবং সেরা লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিতে চায়। কাজেই তাদের মোকাবিলায় তোমরা তোমাদের পূর্ণ কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব জাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে একযোগে তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হও। فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا –সারিবদ্ধ হওয়া প্রতিপক্ষের মনে ভীতি সঞ্চার করার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। তাই জাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করল। জাদুকররা তাদের ভ্রুক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমে হযরত মূসা (আ.) কে বলল, প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, না আমরা করব? হযরত মূসা (আ.) জওয়াবে বললেন, بَلْ اَلْقُوْا অর্থাৎ প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং জাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। হযরত মূসা (আ.) এর এই জওয়াবে অনেক রহস্য লুক্কায়িত ছিল। প্রথমত মজলিসী শিষ্টাচারের কারণে এরূপ জওয়াব দিয়েছেন। জাদুকররা

যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ করার অনুমতি দানের সৎসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর ভদ্রজনোচিত জওয়াব ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকেও আরো অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার অনুমতি দেওয়া। দ্বিতীয়ত জাদুকররা তাদের স্থিরচিত্ততা ও চিন্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের চিন্তাহীনতা ও স্থিরতার পরিচয় পেশ করেছেন। তৃতীয়ত যাতে হযরত মূসা (আ.) এর সামনে তাদের জাদুর সব লীলা-খেলা এসে যায় এবং এরপরই তিনি তাঁর মু'জিযা প্রকাশ করেন। এভাবে একই সময়ে সত্যের বিজয় দিবালোকের মতো ফুটে উঠতে পারত। জাদুকররা হযরত মূসার (আ.)-এর কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যত সাপ হয়ে ইতস্তত ছুটাছুটি করতে লাগল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا يَنْسٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلا বাব سَمِعَ মাসদার نَسْىٌ ও نِسْيَانٌ মূলবর্ণ (ن - س - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি ভুলেও যান না।

شَتّٰى : শব্দটি একবচন। আবার কেউ কেউ এটিকে شَتِيْتٌ এর বহুবচন বলেছেন। অর্থ– নানা প্রকার উদ্ভিদ।

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার أَكْلٌ মূলবর্ণ (ء - ك - ل) জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা নিজেরা খাও।

اِرْعَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার رَعْىٌ মূলবর্ণ (ر - ع - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা চরাও।

جِئْتَنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَجِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ج - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব [مهموز لام এবং اجوف يائى] অর্থ-তুমি কি আমাদের নিকট এসেছ।

اَنْ يُّحْشَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার حَشْرٌ মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ- সমবেত করা হবে।

لَا تَفْتَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা মিথ্যারোপ করো না।

فَيُسْحِتَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْحَاتٌ মূলবর্ণ (س - ح - ت) জিনস صحيح অর্থ- অন্যথায় আল্লাহ তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন।

يُرِيْدَان : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَادَةٌ মূলবর্ণ (ر - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ- এদের উদ্দেশ্য। তারা উভয়ে চায়।

اَلْمُثْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার مَثَالَةٌ মূলবর্ণ (م - ث - ل) জিনস صحيح অর্থ- উৎকৃষ্ট।

اِسْتَعْلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِعْلَاءٌ মূলবর্ণ (ع - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- যে জয়ী হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا : এখানে قَالَ ফে'ল, আর لَهُمْ হলো তার সাথে متعلق আর مُوْسٰى হলো তার ফায়েল وَيْلَكُمْ হলো মাসদার আরবগণ এর ফে'লকে মৃত ঘোষণা করেছেন, এটা উহ্য ফে'ল কর্তৃক মানসূব। আর لَا تَفْتَرُوْا হলো ফে'ল আর যমীর তার ফায়েল আর عَلَى اللّٰهِ জার ও মাজরূর মিলে تَفْتَرُوْا ফে'লের সাথে متعلق আর كَذِبًا হলো মাফউলে বিহী। (ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৯২)

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৬৬. তিনি [অবজ্ঞাস্বরে] বললেন- না, তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর, অতঃপর তখনই তাদের রশি ও লাঠিগুলো তাদের জাদুক্রিয়ার ফলে মূসার ধারণায় এরূপ মনে হতে লাগল, যেন তারা [সাপের ন্যায়] দৌড়াচ্ছে।	قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾
৬৭. সুতরাং মূসার অন্তরে কিছু ভয়ের সঞ্চার হলো।	فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾
৬৮. আমি বললাম ভয় করো না, তুমিই জয়ী থাকবে।	قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾
৬৯. আর তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, তারা যা কিছু সাজিয়েছে, এটা সে সমস্তকেই গ্রাস করে ফেলবে; তারা যা সাজিয়েছে তা কেবল জাদুকরদের কৌশল; আর জাদুকররা যেখানেই যাক, কৃতকার্য হয় না।	وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾
৭০. সুতরাং জাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল- বলল, আমরা হারূন ও মূসার পরওয়ারদেগারের প্রতি ঈমান আনলাম।	فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৬. قَالَ তিনি বললেন بَلْ اَلْقُوْا না, তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ অতঃপর তখনই তাদের রশি ও লাঠিগুলো يُخَيَّلُ اِلَيْهِ মূসার ধারণায় এরূপ মনে হতে লাগল مِنْ سِحْرِهِمْ তাদের জাদুক্রিয়ার ফলে اَنَّهَا تَسْعٰى যেন তারা (সাপের ন্যায়) দৌড়াচ্ছে।

৬৭. فَاَوْجَسَ সুতরাং সঞ্চার হলো فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى মূসার অন্তরে কিছু ভয়ের।

৬৮. قُلْنَا আমি বললাম لَا تَخَفْ ভয় করো না اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى তুমিই জয়ী থাকবে।

৬৯. وَاَلْقِ আর নিক্ষেপ কর مَا فِيْ يَمِيْنِكَ তোমার ডান হাতে যা আছে তা تَلْقَفْ এটা সে সমস্তকেই গ্রাস করে ফেলবে مَا صَنَعُوْا তারা যা সাজিয়েছে اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ তারা যা সাজিয়েছে তা কেবল জাদুকরদের কৌশল وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى আর জাদুকররা যেখানেই যাক কৃতকার্য হয় না।

৭০. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا সুতরাং জাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল قَالُوْٓا বলল اٰمَنَّا আমরা ঈমান আনলাম بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى হারূন ও মূসার পরওয়ারদেগারের প্রতি।

৭১. ফেরাউন বলল, আমার অনুমতির পূর্বেই তোমরা মূসার প্রতি ঈমান এনেছ? নিঃসন্দেহে সে তোমাদের গুরু যে তোমাদেরকে জাদু বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে, সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের হাত-পা কেটে দেব বিপরীত দিক থেকে এবং তোমাদের সকলকে খেজুর-বৃক্ষের উপর শূলে চড়াব, আর অতি সত্বর তোমরা এটাও জানতে পারবে যে, আমাদের মধ্যে কার আজাব অধিকতর কঠোর এবং অধিকতর স্থায়ী।	قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾
৭২. তারা পরিষ্কার উত্তর দিল যে, আমরা কখনো তোমাকে প্রাধান্য দেব না ঐ সমস্ত নিদর্শনের মোকাবিলায় যা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, আর ঐ সত্তার মোকাবিলায় যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমার যা কিছু করার থাকে করে ফেল; তুমি এ পার্থিব জীবনে কিছু করা ব্যতীত আর কিইবা করতে পারবে।	قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۚ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾
৭৩. ব্যস, এখন তো আমরা আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি, তিনি যেন আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং যে জাদুর ব্যাপারে তুমি আমাদের উপর বল প্রয়োগ করছ তাও ক্ষমা করে দেন; আর আল্লাহ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং অধিকতর স্থায়ী।	اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿٧٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭১. قَالَ ফেরাউন বলল اٰمَنْتُمْ لَهٗ তোমরা মূসার প্রতি ঈমান এনেছ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ আমার অনুমতির পূর্বেই اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمْ নিঃসন্দেহে সে তোমাদের গুরু الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ যে তোমাদেরকে জাদু বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে فَلَاُقَطِّعَنَّ সুতরাং আমি অবশ্যই কেটে দেব اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ তোমাদের হাত-পা مِّنْ خِلَافٍ বিপরীত দিক থেকে وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ এবং অবশ্যই তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ খেজুর বৃক্ষের উপর وَلَتَعْلَمُنَّ আর অতি সত্বর তোমরা এটাও জানতে পারবে যে اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا আমাদের মধ্যে কার আজাব অধিকতর কঠোর وَّاَبْقٰى এবং অধিকতর স্থায়ী।

৭২. قَالُوْا তারা পরিষ্কার উত্তর দিল যে لَنْ نُّؤْثِرَكَ আমরা কখনো তোমাকে প্রাধান্য দেব না عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ ঐ সমস্ত নিদর্শনের মোকাবিলায় যা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি وَالَّذِيْ فَطَرَنَا আর ঐ সত্তার মোকাবিলায় যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ তোমার যা কিছু করার থাকে করে ফেল اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا তুমি এই পার্থিব জীবনে কিছু করা ব্যতীত আর কিইবা করতে পারবে।

৭৩. اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا ব্যাস এখন তো আমরা আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا তিনি যেন আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ যে জাদুর ব্যাপারে তুমি আমাদের উপর বল প্রয়োগ করেছ তাও ক্ষমা করে দেন وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى আর আল্লাহ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং অধিকতর স্থায়ী।

৭৪. যে ব্যক্তি অপরাধীরূপে নিজ প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হবে, তার জন্য দোজখ রয়েছে; সে তথায় মরবেও না আর বাঁচবেও না।	إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾
৭৫. আর যে ব্যক্তি প্রতিপালকের সমীপে মু'মিন রূপে উপস্থিত হবে, পরন্তু নেক কাজও করে থাকে, তবে এমন লোকদের জন্য অতিশয় উচ্চ মর্যাদা রয়েছে,	وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾
৭৬. অর্থাৎ অনন্তবাসের উদ্যানসমূহ- যার নিম্নদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে; আর যে ব্যক্তি পবিত্র, এটাই তার পুরস্কার।	جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৪. إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا যে ব্যক্তি অপরাধীরূপে নিজ প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হবে فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ তার জন্য দোজখ রয়েছে لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ সে তথায় মরবেও না বাঁচবে ও না।

৭৫. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا আর যে ব্যক্তি প্রতিপালকের সমীপে মুমিনরূপে উপস্থিত হবে قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ পরন্তু নেক কাজও করে থাকবে فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ তবে এমন লোকদের জন্য অতিশয় উচ্চ মর্যাদা রয়েছে।

৭৬. جَنَّاتُ عَدْنٍ অনন্তবাসের উদ্যানসমূহ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নদীসমূহ বইতে থাকবে خَالِدِينَ فِيهَا তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ আর যে ব্যক্তি পবিত্র এটাই তাঁর পুরস্কার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ : এ থেকে জানা যায় যে, ফেরাউনী জাদুকরদের জাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্দীর কারণে সাপ রূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ জাদু এমনই হয়ে থাকে।

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ : অর্থাৎ এ পরিস্থিতি দেখে হযরত মূসা (আ.) -এর মধ্যে ভয় সঞ্চার হলো। কিন্তু এ ভয়কে তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখলেন; প্রকাশ হতে দেননি। এ ভয়টি যদি প্রাণের ভয়ে হয়ে থাকে, তবে মানবতার খাতিরে এমন হওয়া নবুয়তের পরিপন্থি নয়। কিন্তু বাহ্যত: বোঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল না; বরং তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, এই বিরাট সমাবেশের সামনে যদি জাদুকররা জিতে যায় তবে নবুয়তের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারবে না। এ কারণেই এর জওয়াবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে : لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ এতে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, জাদুকররা জিততে পারবে না। তুমিই বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবে। এভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর উপরিউক্ত আশঙ্কা দূর করে দেওয়া হয়েছে।

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ : হযরত মূসা (আ-) কে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, তোমার ডান হাতে যা আছে, তা নিক্ষেপ কর। এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি বোঝানো হয়েছে, কিন্তু তা পরিষ্কার উল্লেখ না করে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের জাদুর কোনো মূল্য নেই। এজন্য পরোয়া করো না এবং তোমার হাতে যা-ই আছে, তাই নিক্ষেপ কর। এটা তাদের সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। সেমতে তাই হলো। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা একটি বিরাট অজগর সাপ হয়ে জাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল।

জাদুকররা মুসলমান হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল : হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন জাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাদুকরদের বুঝতে বাকি রইল না যে, একাজ জাদুর জোরে হতে পারে না; বরং এটা নিঃসন্দেহে মু'জিযা, যা একান্তভাবে আল্লাহর কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সেজদায় পড়ে গেল এবং ঘোষণা করল, আমরা মূসা ও হারুনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কোনো কোনো হাদীসে রয়েছে, জাদুকররা ততক্ষণ পর্যন্ত সেজদা থেকে মাথা তোলেননি, যতক্ষণ খোদায়ী কুদরত তাদেরকে জান্নাত দোজখ প্রত্যক্ষ না করিয়ে দেয়। -[রূহুল মা'আনী]

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ : আল্লাহ তা'আলা যখন এই বিরাট সমাবেশের সামনে ফেরাউনের লাঞ্ছনা ফুটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব হয়ে প্রথমে সে জাদুকরদেরকে বলতে লাগল, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিভাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? সে যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া এই জাদুকরদের কোনো কথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মু'জিযা দেখার পর কারো অনুমতির আবশ্যকতা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না। তাই সে এখন জাদুকরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বলল, এখন জানা গেল যে, তোমরা সবাই মূসার শিষ্য। এই জাদুকরই তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তাঁর কাছে নতি স্বীকার করেছ।

فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ : এখন ফেরাউন জাদুকরদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবত ফেরাউনী আইনে শাস্তির এই পন্থাই প্রচলিত ছিল অথবা এভাবে হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটি নমুনা হয়ে যায়। তাই ফেরাউন এ পন্থাই প্রস্তাব হিসেবে দিয়েছে।

وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ : অর্থাৎ হস্তপদ কাটার পর তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের শূলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় না মরা পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে।

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا : জাদুকররা ফেরাউনের কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হলো না। তারা বলল, আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোনো কথাকে সে সব নিদর্শন ও মু'জিযার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, জাদুকররা যখন সেজদায় গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ স্তর ও নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন তাই তারা বলল, এসব নিদর্শন সত্ত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি না। -[কুরতুবী]

এবং জগৎ- স্রষ্টা আসমান-জমিনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা স্বীকার করতে পারি না। فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ এখন তোমার যা খুশি, আমাদের সম্পর্কে ফয়সালা কর এবং যে সাজা দেওয়ার ইচ্ছা দাও। اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিলেও তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমার কোনো অধিকার থাকবে না। আল্লাহর অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তাঁর অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরও থাকব। কাজেই তাঁর শাস্তির চিন্তা অগ্রগণ্য।

وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ জাদুকররা এখন ফেরাউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে জাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অর্থহীন কাজের কাছে যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর কাছে এই পাপ কাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাদুকররা স্বেচ্ছায় মোকাবিলা করতে এসেছিল এবং এই মোকাবিলার জন্য দর-কষাকষিও ফেরাউন সাথে করেছিল- অর্থাৎ বিজয় হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় ফেরাউনের বিরুদ্ধে জাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিভাবে শুদ্ধ হবে? এর এক কারণ এই হতে পারে যে, জাদুকররা প্রথমে শাহী পুরস্কার ও সম্মানের লোভে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা মু'জিযার মোকাবিলা করতে পারবে না। তখন ফেরাউন তাদেরকে মোকাবিলা করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় কারণ এই বর্ণনা করা হয় যে, ফেরাউন তার রাজ্যে জাদুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই জাদু শিক্ষা করতে বাধ্য ছিল। -[রূহুল-মা'আনী]

ফেরাউন- পত্নী আছিয়ার শুভ পরিণতি : তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, সত্য ও মিথ্যার এই সংঘর্ষে সময় ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া মোকাবিলার শুভ ফলাফলের জন্যে সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাকে মূসা ও হারুন (আ.) এর বিজয়ের সংবাদ শোনানো হলো, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন : আমি হযরত মূসা ও হারুনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস

স্থাপন করলাম। নিজ-পত্নীর সংবাদ শুনে ফেরাউন আদেশ দিল : একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তাঁর মাথার উপর ছেড়ে দাও। আছিয়া নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ তা'আলা পাথর তাঁর মাথায় পড়ার আগেই তাঁর প্রাণ কবজ করে নিলেন। এরপর তাঁর মৃতদেহের উপর পাথর পতিত হলো।

ফেরাউনী জাদুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন : وَذٰلِكَ جَزَاؤُا مَنْ تَزَكّٰى إِنَّهُ مَنْ يَّأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا থেকে এসব বাক্য ও প্রকৃত সত্য যা খাঁটি ইসলামি বিশ্বাস ও পরজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো ঐ জাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে এবং তাঁরা ইসলামি বিশ্বাস কিংবা ধর্মের কোনো শিক্ষাও পায়নি। এসব হযরত মূসা (আ.)-এর সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকতার প্রভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের দ্বার মুহূর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের নিশ্চিত সম্ভাবনার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেননি এবং কঠোরতম শাস্তি ও বিপদের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি। তাঁরা যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে বেলায়েতের ঐ স্তরে উন্নিত হয়ে গেছে, যে স্তরে উন্নীত হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেষ্টা ও সাধনার পরও কঠিন হয়ে থাকে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও উবায়েদ ইবনে উমায়ের বলেন, আল্লাহর কুদরতের লীলা দেখ, তারা দিনের প্রারম্ভে কাফের জাদুকর ছিল এবং দিবাশেষে আল্লাহর ওলী ও শহীদ হয়ে গেল।-(ইবনে কাছীর)।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَلْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর।

فَأَوْجَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِيْجَاسٌ মূলবর্ণ (و - ج - س) জিনস مثال واوى অর্থ- সঞ্চার হলো, সে অনুভব করল।

تَلْقَفْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার لَقْفٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ف) জিনস صحيح অর্থ- এটা গ্রাস করে ফেলবে, সে গিলে ফেলবে।

لَأُقَطِّعَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْطِيْعٌ মূলবর্ণ (ق - ط - ع) জিনস صحيح অর্থ- আমি অবশ্যই কেটে দেব। টুকরা টুকরা করা।

لَأُصَلِّبَنَّكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْلِيْبٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ- আমি অবশ্যই তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।

جُذُوْعٌ : শব্দটি جِذْعٌ এর বহুবচন ঢাল, শাখা, কাণ্ড। جُذُوْعُ النَّخْلِ অর্থ- খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড। খেজুর শাখা।

لَنْ نُؤْثِرَكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى تاكيد بلن درفعل مستقبل معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْثَارٌ মূলবর্ণ (أ - ث - ر) জিনস مهموز فاء অর্থ-আমরা কখনো তোমাকে প্রাধান্য দেব না।

قَاضٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার قَضَاءٌ মূলবর্ণ (ق - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- মীমাংসা/ফায়সালাকারী।

تَزَكّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَزَكِّىْ মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- যে পবিত্র থাকে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰى : এখানে قُلْنَا ফে'ল ও ফায়েল মিলে قَوْل আর বাদবাকি বাক্য হলো مقول : আর لَا হরফে تَخَفْ হলো ফে'ল আর উহ্য যমীর أَنْتَ হলো তার ফায়েল আর إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰى হলো جملة مستانفة إن হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল এবং كَ হলো اسم এবং أَنْتَ হলো تاكيد অথবা ضمير فصل অথবা মুবতাদা আর الْأَعْلٰى হয়তো خبر ان অথবা أَنْتَ-এর খবর তাহলে দ্বিতীয় অবস্থায় أَنْتَ الْأَعْلٰى পূর্ণ বাক্য হলো خبر ان।

-[ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৯৭]

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۥ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ﴿٧٧﴾

৭৭. আর আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, আমার বান্দাগণকে নিয়ে রাতারাতি সরে পড়, অতঃপর তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্ক পথ করে দাও, তোমাদের মনে কারো পশ্চাদনুসরণের আশঙ্কাও থাকবে না এবং অন্য কোনো প্রকারের ভয়ও থাকবে না।

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾

৭৮. অনন্তর ফেরাউন স্বীয় সেনাদলসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল, তখন সমুদ্র যেমন মিলিত হবার ছিল তেমনি তাদেরকে নিয়ে মিলিত হয়ে গেল;

وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ﴿٧٩﴾

৭৯. আর ফেরাউন স্বীয় সম্প্রদায়কে কুপথে এনেছিল এবং তাদেরকে সুপথ দেখায়নি।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ﴿٨٠﴾

৮০. হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু হতে উদ্ধার করেছি এবং তোমাদের সাথে তূর পর্বতের ডান পার্শ্বে গমনের ওয়াদা করেছি, আর আমি তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া নাজিল করেছি।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ﴿٨١﴾

৮১. আমি তোমাদেরকে যে উৎকৃষ্ট বস্তু দিয়েছি তা খাও এবং তাতে সীমালঙ্ঘন করো না, অন্যথায় তোমাদের উপর আমার গজব নিপতিত হবে, আর যার উপর আমার গজব নিপতিত হয়, সে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৭. وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ আর আমি ওহী পাঠালাম اِلٰى مُوْسٰٓى মূসার প্রতি اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ আমার বান্দাগণকে নিয়ে রাতারাতি সরে পড় فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا অতঃপর তাদের জন্য পথ করে দাও فِى الْبَحْرِ সমুদ্রে يَبَسًا শুষ্ক لَا تَخٰفُ دَرَكًا তোমাদের মনে কারো পশ্চাদনুসরণের আশঙ্কাও থাকবে না وَلَا تَخْشٰى এবং অন্য কোনো প্রকারের ভয়ও থাকবে না।

৭৮. فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ অনন্তর ফেরাউন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল بِجُنُوْدِهٖ স্বীয় সেনাদলসহ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ তখন সমুদ্র তেমনি তাদেরকে নিয়ে মিলিত হয়ে গেল مَا غَشِيَهُمْ যেমন মিলিত হবার ছিল।

৭৯. وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ আর ফেরাউন কুপথে এনেছিল قَوْمَهٗ স্বীয় সম্প্রদায়কে وَمَا هَدٰى এবং তাদেরকে সুপথ দেখায়নি।

৮০. يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ হে বনী ইসরাঈল قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করেছি مِّنْ عَدُوِّكُمْ তোমাদের শত্রু হতে وَوٰعَدْنٰكُمْ এবং তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ তূর পর্বতের ডান পার্শ্বে গমনের وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ আর আমি তোমাদের প্রতি নাজিল করেছি الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى মান্না ও সালওয়া।

৮১. كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ আমি তোমাদেরকে যে উৎকৃষ্ট বস্তু দিয়েছি তা খাও وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ এবং তাতে সীমালঙ্ঘন করো না فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ অন্যথায় তোমাদের উপর আমার গজব নিপতিত হবে وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ আর যার উপর আমার গজব নিপতিত হয় فَقَدْ هَوٰى সে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

৮২. আর আমি তাদের জন্য পরম ক্ষমাশীল- যারা তওবা করে ও ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তৎপর সুপথে স্থায়ী থাকে।	وَاِنِّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰی ﴿٨٢﴾
৮৩. আর হে মূসা! আপনি নিজ কওমের পূর্বে তাড়াহুড়া কেন চলে আসলেন?	وَمَاۤ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یٰمُوْسٰی ﴿٨٣﴾
৮৪. তিনি বললেন, এই তো তারা আমার পশ্চাতেই আসছে, আর আমি আপনার সমীপে এজন্য তাড়াহুড়া করে চলে এসেছি, যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।	قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰۤی اَثَرِیْ وَعَجِلْتُ اِلَیْكَ رَبِّ لِتَرْضٰی ﴿٨٤﴾
৮৫. আল্লাহ্ বললেন, আপনার পর আমি আপনার কওমকে এক বিভ্রাটে ফেলেছি, সামেরী তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।	قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِیُّ ﴿٨٥﴾
৮৬. অতঃপর মূসা ক্রোধ ও ক্ষোভে অধীর হয়ে নিজ কওমের নিকট ফিরে এলেন, [এবং] বললেন, হে আমার কওম! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের সাথে এক উত্তম ওয়াদা করেননি? তোমাদের উপর কি দীর্ঘ সময় অতীত হয়ে গেছে? নাকি তোমাদের এটাই অভিপ্রায় ছিল যে, তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের গজব নিপতিত হোক আর সে জন্যই কি তোমরা আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলে তা ভঙ্গ করেছ?	فَرَجَعَ مُوْسٰۤی اِلٰی قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ یٰقَوْمِ اَلَمْ یَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ اَفَطَالَ عَلَیْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ یَّحِلَّ عَلَیْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِیْ ﴿٨٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. وَاِنِّیْ لَغَفَّارٌ আর আমি তাদের জন্য পরম ক্ষমাশীল لِّمَنْ تَابَ যারা তওবা করে وَاٰمَنَ, ও ঈমান আনে عَمِلَ صَالِحًا, এবং নেক কাজ করে ثُمَّ اهْتَدٰی তৎপর সুপথে স্থায়ী থাকে।

৮৩. وَمَاۤ اَعْجَلَكَ আর আপনি তাড়াহুড়া করে কেন চলে আসলেন عَنْ قَوْمِكَ নিজ কওমের পূর্বে یٰمُوْسٰی হে মূসা।

৮৪. قَالَ তিনি বললেন هُمْ اُولَآءِ عَلٰۤی اَثَرِیْ এই তো তারা আমার পশ্চাতেই আসছে وَعَجِلْتُ اِلَیْكَ رَبِّ, আর আমি আপনার সমীপে এজন্য তাড়াহুড়া করে বলে এসেছি لِتَرْضٰی যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।

৮৫. قَالَ আল্লাহ বললেন فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ আমি আপনার কওমকে এক বিভ্রাটে ফেলেছি مِنْۢ بَعْدِكَ আপনার পর وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِیُّ সামেরী তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।

৮৬. فَرَجَعَ مُوْسٰی অতঃপর মূসা ফিরে আসলেন اِلٰی قَوْمِهٖ নিজ কওমের নিকট غَضْبَانَ اَسِفًا ক্রোধ ও ক্ষোভে অধীর হয়ে قَالَ বললেন یٰقَوْمِ হে আমার কওম اَلَمْ یَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের সাথে করেননি وَعْدًا, حَسَنًا এক উত্তম ওয়াদা اَفَطَالَ عَلَیْكُمُ الْعَهْدُ তোমাদের উপর কি দীর্ঘ সময় অতীত হয়ে গেছে اَمْ اَرَدْتُّمْ নাকি তোমাদের এটাই অভিপ্রায় ছিল যে اَنْ یَّحِلَّ عَلَیْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের গজব নিপতিত হোক فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِیْ আর সে জন্যই কি তোমরা আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলে তা ভঙ্গ করেছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى : যখন সত্য ও মিথ্যা, মু'জিযা ও জাদুর চূড়ান্ত লড়াই ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের কোমর ভেঙে দিল এবং হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর নেতৃত্বে বনী-ইসরাঈল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল, তখন তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার আদেশ দান করা হলো। কিন্তু ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন এবং সামনে পথিমধ্যে সমুদ্র অন্তরায় হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত মূসা (আ.)-কে এই দু'টি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্য বলা হলো যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ হয়ে যাবে এবং পশ্চাদ্দিক থেকে ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবনের আশঙ্কা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ সূরাতেই 'হাদীসুল ফুতূন'-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারটি সড়ক নির্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেক সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্তূপ জমাট বরফের ন্যায় পাহাড়সম দণ্ডায়মান হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ দৃষ্টিগোচর হলো। সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে : فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ বারটি সড়কের মধ্যবর্তী পানির প্রাচীরকে আল্লাহ তা'আলা এমন করে দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীদেরকে দেখত এবং কথাবার্তা বলত। অন্যান্য গোত্রের কি অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকের থেকে এই দুশ্চিন্তা দূর করার উদ্দেশ্য এরূপ করা হয়েছিল।-(কুরতুবী)

মিসর থেকে বের হওয়ার সময় বনী-ইসরাঈলের কিছু অবস্থা : তাদের সংখ্যা ও ফেরাউনী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা : তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) রাত্রির সূচনাভাগ বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বনী-ইসরাঈল ইতঃপূর্বে শহরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ঈদ উৎসব পালন করার জন্য বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু অলংকারপত্র ধার করে নেয়। বনী-ইসরাঈলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কুরআন পাক ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারোটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও আল্লাহর কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)- এর আমলে বনী ইসরাঈল যখন মিসরে আগমন করে তখন তারা বারো ভাই ছিল। এখন বারো ভাইয়ের বারো গোত্রের এত বিপুল সংখ্যক লোক মিসর থেকে বের হলো যে, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফেরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করল। তাদের মধ্যে সত্তর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্চাদ্দিক থেকে সৈন্যদের এই সয়লাব এবং সামনে ভূমধ্যসাগর দেখে বনী-ইসরাঈল ঘাবড়ে গেল এবং মূসা (আ.)-কে বলল, اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ - অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। তখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রে লাঠি মারলেন এবং তাতে আল্লাহর কুদরতে বারোটি রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। তখন বারোটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌছে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কিভাবে তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু ফেরাউন সগর্বে সৈন্যদেরকে বলল, এগুলো সব আমার প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। একথা বলে তৎক্ষণাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাতে আসার আদেশ দিল। যখন ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সামুদ্রিক পথের মধ্যখানে এসে গেল একটি লোকও তীরে রইল না, তখন আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং সমুদ্রের সকল অংশ পরস্পর মিলিত হয়ে গেল। فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ বাক্যের সারমর্ম তাই। -[রূহুল মা'আনী]

وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ : ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সমুদ্র পার হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় বনী ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাত প্রদান করা যায় এবং বনী-ইসরাঈল স্বয়ং তার বাক্যালাপের গৌরব প্রত্যক্ষ করে।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى -এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদেরকে একটি পবিত্র শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করে। তখন সাজা হিসেবে তাদেরকে তীহ্ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই উপত্যকা থেকে বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। এই শাস্তি সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-এর বরকতে তাদের উপর বন্দীদশায়ও নানা রকম নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। 'মান্না' ও 'সালওয়া' ছিল এইসব নিয়ামতেরই অন্যতম, যা তাদের আহারের জন্যে দেওয়া হতো।

যখন হযরত মূসা (আ.) ও বনী-ইসরাঈল ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে সামনে অগ্রসর হলো, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই সম্প্রদায়ের পূজা পাঠ দেখে বনী-ইসরাঈল বলতে লাগল, তারা যেমন উপস্থিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোনো আল্লাহ বানিয়ে দাও। হযরত মূসা (আ.) তাদের বোকামিসুলভ দাবির জওয়াবে বললেন : তোমরা তো নেহায়েতই মূর্খ। এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বাতিল। إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী-ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে তূর পর্বতে চলে এসো। আমি তোমাকে তাওরাত দান করব। এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তাওরাত লাভ করার পূর্বে তোমাকে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত অবিরাম রোজা রাখতে হবে। এরপর দশ দিন আরও বৃদ্ধি করে এই মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেওয়া হলো। হযরত মূসা (আ.) বনী-ইসরাঈলসহ তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদা দৃষ্টে হযরত মূসা (আ.)- এর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সীমা রইল না। তিনি তার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অগ্রে পৌঁছে ত্রিশ দিবা-রাত্রির রোজা রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হারূন (আ.)-এর আদেশ মেনে চলবে। বনী-ইসরাঈল হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.) দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তার ধারণা ছিল যে, তারাও অনতিবিলম্বে তূর পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী ইসরাঈল তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর পশ্চাতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল।

হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ তা'আলা বললেন : وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسٰى হে মূসা! তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে দ্রুত কেন চলে এলে।

ত্বরা করা সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রশ্ন ও তার রহস্য : হযরত মূসা (আ.) তার সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করেছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তূর পর্বতের নিকট পৌঁছে গেছে। তার এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাঈল যে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেওয়াই ছিল উপরিউক্ত প্রশ্নের বাহ্যত উদ্দেশ্য।

[তাফসীরে ইবনে কাছীর] রূহুল-মা'আনীতে কাশ্শাফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে : এই প্রশ্নের কারণ ছিল হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া এবং এই ত্বরা করার জন্য হুশিয়ার করা যে, নবুয়তের পদের তাকিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা, তাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তাঁর ত্বরা করার ফলশ্রুতিতে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং ত্বরা করার কাজেরও নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের মধ্যে এই ত্রুটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। "ইনতিসাফ" গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরো বলা হয় হয়েছে যে, এতে হযরত মূসা (আ.)-কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিত। যেমন লূত (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দেশ দেন যে, মুমিনদেরকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অগ্রে রেখে তুমি সবার পশ্চাতে থাক। وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ

আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত প্রশ্নের জওয়াবে হযরত মূসা (আ.) নিজ ধারণা অনুযায়ী আরজ করলেন, আমার সম্প্রদায়ও পেছনে পেছনে প্রায় এসেই গেছে। তবে আমি একটু ত্বরা করে এসে গেছি; কারণ নির্দেশ পালনে অগ্রে অগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে সংঘটিত গো-বৎস পূজার সংবাদ দেন এবং বলে দেন যে, সামেরী পথভ্রষ্ট করার কারণে তারা ফেতনায় পতিত হয়েছে।

সামেরী কে ছিল? কেউ কেউ বলেন, সামেরী ফেরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতিবেশী এবং তার প্রতি বিশ্বাসী ছিল। হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন, তখন সে-ও সাথে রওয়ানা হয়। কারো মতে সে বনী ইসরাঈলেরই সামেরা গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেন, সে পারস্য বংশোদ্ভূত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সে গো-বৎস পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কোনোরূপে মিসর পৌঁছে সে বনী ইসরাঈলীদের ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা।-(কুরতুবী)

কুরতুবীর টীকায় বলা হয়েছে : সে ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু ছিল এবং গো-বৎস পূজা করত। সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর অবলম্বন করে অথবা প্রথম থেকেই কপট মনে ঈমান প্রকাশ করে।

জনশ্রুতি এই : সামেরীর নাম ছিল মূসা ইবনে জাফর। ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ফেরাউনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাঈলী ছেলে -সন্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল। ফেরাউনী সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্র হত্যার ভয়ে ভীতা জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে শিশুর হেফাজত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তাঁর এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত হলো ও বনী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করল। জনৈক কবি এই বিষয়বস্তুটিই একটি ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন :

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَخْلَقْ سَعِيْدًا تَحَيَّرَتْ * عُقُوْلٌ مُرَبِّيَةٌ وَخَابَ الْمُؤَمَّلُ
فَمُوْسَى الَّذِىْ رَبَّاهُ جِبْرِيْلُ كَافِرٌ * وَمُوْسَى الَّذِىْ رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُؤْمِنٌ

কোনো ব্যক্তি জন্মগতভাবে ভাগ্যবান না হলে তার লালন-পালনকারীদের বিবেকও হতভম্ব হয়ে যায় এবং তার প্রতি প্রত্যাশা পোষণকারী ব্যক্তিও নিরাশ হয়ে পড়ে। দেখ, যে মূসাকে হযরত জিবরাঈল (আ.) লালন-পালন করেছেন, সে তো কাফের হয়ে গেল এবং যে মূসাকে অভিশপ্ত ফেরাউন লালন-পালন করেছে, সে আল্লাহর রাসূল হয়ে গেল।

اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا : হযরত মূসা (আ.) ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ফিরে জাতিকে সম্বোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা স্মরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্য তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলাবাহুল্য, তাওরাত লাভ করলে বনী ইসরাঈলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যেত।

اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদার পর তেমন কোনো দীর্ঘ মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয়নি যে, তোমরা তা ভুলে যেতে পার। এমন তো নয় যে, সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছ।

اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ : অর্থাৎ, ভুলে যাওয়ার অথবা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার তো কোনো সম্ভাবনা নেই, এখন এ ছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার গজব ডেকে আনছ?

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا تَخْشٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অন্য কোনো প্রকারের ভয়ও থাকবে না, সে ভয় করবে না।

فَغَشِيَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার غِشَاوَةٌ মূলবর্ণ (غ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তখন তা তাদেরকে নিয়ে মিলিত হয়ে গেল।

نَزَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَنْزِيْلٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ- আমি নাজিল করেছি।

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَكْلٌ মূলবর্ণ (ا ـ ك ـ ل) জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা খাও।

لَا تَطْغَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার طُغْيَانٌ، طَغْوَانٌ মূলবর্ণ (ط ـ غ ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা বাড়াবাড়ি করো না।

يَحِلُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার حُلُوْلٌ মূলবর্ণ (ح ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- নিপতিত হবে, নাজিল হবে।

هَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هَوًى মূলবর্ণ (ه ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- সে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। সে ধ্বংস হয়েছে।

فَتَنَّا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنَةٌ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صحيح অর্থ- আমি এক বিভ্রাটে ফেলেছি, আমি পরীক্ষা করেছি, আমি বিপদে ফেলেছি।

اَضَلَّهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِضْلَالٌ মূলবর্ণ (ض ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ-সে তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, সে তাদেরকে গোমরাহ করে দিল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ : এখানে همزة টা استفهام-এর জন্য আর فاء হলো হরফে আতফ, طَالَ ফে'ল আর عَلَيْكُمْ টা طَالَ-এর সাথে متعلق হয়েছে الْعَهْدُ হলো ফায়েল اَمْ হরফে আতফ اَرَدْتُّمْ ফেল ও ফায়েল اَنْ يَّحِلَّ হলো مصدر بتاويل হয়ে মাফউল عَلَيْكُمْ হলো يَحِلَّ-এর সাথে متعلق আর غَضَبٌ হলো يَحِلَّ এর ফায়েল আর مِنْ رَّبِّكُمْ হলো غَضَبٌ এর সিফত فَاَخْلَفْتُمْ এর فاء আতেফা اَخْلَفْتُمْ টা اَرَدْتُّمْ এর উপর আতফ হয়েছে আর مَوْعِدِىْ হলো اَخْلَفْتُمْ-এর মাফউল।

-[ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১২]

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾

৮৭. তারা বলল, আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি, কিন্তু [কিবতী] সম্প্রদায়ের অলঙ্কারের বোঝা আমাদের উপর চেপে ছিল, অতঃপর আমরা তা [সামেরীর পরামর্শে আগুনে] নিক্ষেপ করলাম, তৎপর এরূপে সামেরী [-ও] নিক্ষেপ করল।

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۵ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

৮৮. অনন্তর সে [সামেরী] তাদের জন্য একটি বাছুর [বানিয়ে] প্রকাশ করল, যা একটি দেহ ছিল– যা হাম্বা-হাম্বা শব্দকারী, তখন তারা বলতে লাগল, তোমাদের এবং মূসার মা'বূদ তো এটাই, মূসা তো ভুলে গেছেন।

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۵ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

৮৯. তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের কোনো কথার উত্তর দেয় না এবং এটা তাদের কোনো ক্ষতি সাধনের বা উপকার পৌছানোর ক্ষমতাও রাখে না।

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ﴿٩٠﴾

৯০. আর হারূন পূর্বেও তাদেরকে বলেছিল, হে আমার কওম! তোমরা এর [অর্থাৎ এ বাছুরের] কারণে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছ, আর তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন দয়াময়। অতএব, তোমরা আমার পথে চল এবং আমার কথা মান।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৭. قَالُوْا তারা বলল مَآ اَخْلَفْنَا আমরা ভঙ্গ করিনি مَوْعِدَكَ আপনার সাথে কৃত ওয়াদা بِمَلْكِنَا স্বেচ্ছায় وَلٰكِنَّا কিন্তু حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا আমাদের উপর বোঝা চেপে ছিল مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ (কিবতী) সম্প্রদায়ের অলঙ্কারের فَقَذَفْنٰهَا অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করলাম فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ তৎপর এরূপে সামেরী (-ও) নিক্ষেপ করল।

৮৮. فَاَخْرَجَ لَهُمْ অনন্তর সে [সামেরী] তাদের জন্য প্রকাশ করল عِجْلًا একটি বাছুর جَسَدًا যা একটি দেহ ছিল لَّهٗ خُوَارٌ যা হাম্বা-হাম্বা শব্দকারী فَقَالُوْا তখন তারা বলতে লাগল هٰذَآ এটাই اِلٰهُكُمْ তোমাদের মা'বূদ وَاِلٰهُ مُوْسٰى এবং মূসার মা'বূদ فَنَسِيَ মূসা তো ভুলে গেছেন।

৮৯. اَفَلَا يَرَوْنَ তারা কি দেখে না যে اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا এটা তাদের কোনো কথার উত্তর দেয় না وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا এবং এটা তাদের কোনো ক্ষতি সাধনের ক্ষমতাও রাখে না وَّلَا نَفْعًا বা উপকার পৌছানোর।

৯০. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ আর হারূন পূর্বেও তাদেরকে বলেছিল يٰقَوْمِ হে আমার কওম اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ তোমরা এর কারণে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ আর তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন দয়াময় فَاتَّبِعُوْنِيْ অতএব তোমরা আমার পথে চল وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ এবং আমার কথা মান।

৯১. তারা বলল, মূসা আমাদের নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এ অবস্থাতেই থাকব।	قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾
৯২. তিনি বললেন, হে হারূন! তোমার কি বাধা ছিল? যখন তুমি দেখলে যে, এরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।	قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾
৯৩. তখন তুমি আমার নিকট আসলে না কেন? তবে কি তুমি আমার কথা অমান্য করেছ?	اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾
৯৪. হারূন বললেন, হে আমার মাতৃনন্দন! তুমি আমার দাড়ি ধরো না এবং মাথাও স্পর্শ করো না, আমার এ আশঙ্কা হলো, তুমি বলবে যে, তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ, আর তুমি আমার কথার মূল্য দাওনি।	قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿٩٤﴾
৯৫. মূসা বললেন, হে সামেরী! তোমার বক্তব্য কী [এমন করলে কেন]?	قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾
৯৬. সে বলল, আমি এমন বস্তু দেখেছিলাম যা অন্যরা দেখেনি, অতঃপর আমি সে দূতের [অশ্বের] পদ-চিহ্ন হতে এক মুষ্টি [মাটি] নিয়েছিলাম, পরে আমি সে মুষ্টি [মূর্তির মধ্যে] নিক্ষেপ করেছিলাম এবং আমার মনেও এটা ভালো লাগল।	قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯১. قَالُوْا তারা বলল لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ আমরা এ অবস্থাতেই থাকব حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى মূসা আমাদের নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত।

৯২. قَالَ তিনি বললেন يٰهٰرُوْنُ হে হারূন مَا مَنَعَكَ তোমার কি বাধা ছিল اِذْ رَاَيْتَهُمْ যখন তুমি দেখলে যে ضَلُّوْٓا এরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

৯৩. اَلَّا تَتَّبِعَنِ তখন তুমি আমার নিকট আসলে না কেন اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ তবে কি তুমি আমার কথা অমান্য করেছ?

৯৪. قَالَ হারূন বললেন يَبْنَؤُمَّ হে আমার মাতৃনন্দন لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ তুমি আমার দাড়ি ধরো না وَلَا بِرَاْسِيْ এবং মাথাও স্পর্শ করো না اِنِّيْ خَشِيْتُ আমার এ আশঙ্কা হলো اَنْ تَقُوْلَ তুমি বলবে যে فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ আর তুমি আমার কথার মূল্য দাওনি।

৯৫. قَالَ মূসা বললেন فَمَا خَطْبُكَ তোমার বক্তব্য কি يٰسَامِرِيُّ হে সামেরী

৯৬. قَالَ সে বলল بَصُرْتُ আমি এমন বস্তু দেখেছিলাম بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ যা অন্যরা দেখেনি فَقَبَضْتُ قَبْضَةً অতঃপর আমি এক মুষ্টি (মাটি) নিয়েছিলাম مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ সেই দূতের (অশ্বের) পদ-চিহ্ন হতে فَنَبَذْتُهَا পরে আমি সেই মুষ্টি (মূর্তির মধ্যে) নিক্ষেপ করেছিলাম وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ এবং আমার মনেও এটা ভালো লাগল।

৯৭. তিনি বললেন, দূর হয়ে যা! তোর ইহজীবনে এ শাস্তি যে, তুই এটা বলে বেড়াবি- আমাকে কেউ ছুঁইও না, এবং তোর জন্য আর একটি [শাস্তির] ওয়াদা আছে যা তোর উপর হতে অপসারিত হবার নয়, আর তোর ঐ মা'বূদকে দেখ, যার প্রতি নিবদ্ধ হয়ে বসেছিলি; আমি তাকে পুড়ে ফেলব, তৎপর এটাকে [ঐ ভস্মকে] নদীতে বিক্ষিপ্ত করে ভাসিয়ে দেব।

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. قَالَ তিনি বললেন فَاذْهَبْ দূর হয়ে যা! فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ তোর ইহজীবনে এই শাস্তি যে أَنْ تَقُولَ তুই এটা বলে বেড়াবি لَا مِسَاسَ আমাকে ছুঁইও না। وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا এবং তোর জন্য আর একটি (শাস্তির) ওয়াদা আছে لَّنْ تُخْلَفَهُ যা তোর উপর হতে অপসারিত হবার নয় وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلٰهِكَ আর তোর ঐ মা'বূদকে দেখ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا যার প্রতি নিবদ্ধ হয়ে বসেছিলি لَّنُحَرِّقَنَّهُ আমি এটাকে পুড়ে ফেলব ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا তৎপর এটাকে নদীতে বিক্ষিপ্ত করে ভাসিয়ে দেব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا : مَلْك শব্দটি মীমের যবর এবং মীমের পেশযোগে ব্যবহৃত হয়। উভয়ের অর্থ এখানে স্ব-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বৎস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হইনি; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলা বাহুল্য, তাদের এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করেনি। বরং তারা নিজেরাই চিন্তা -ভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তারা সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছে ঃ

وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ : أَوْزَارٌ শব্দটি وِزْرٌ এর বহুবচন, অর্থ বোঝা। মানুষের পাপও কেয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে وِزْرٌ এবং পাপরাশিকে أَوْزَارٌ বলা হয়। زِينَةِ শব্দের অর্থ এখানে অলংকার এবং কওম বলে ফেরাউনের কওমকে বোঝানো হয়েছে। বনী-ইসরাঈল ঈদের বাহানায় তাদের কাছ থেকে কিছু অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। এগুলোকে أَوْزَارٌ তথা পাপের বোঝা বলার কারণ এই যে, ধারের কথা বলে গৃহীত এসব অলংকার ফেরত দেওয়া কর্তব্য ছিল। যেহেতু ফেরত দেওয়া হয়নি, তাই এগুলোকে পাপ বলা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আ.) তাদেরকে এগুলো যে পাপ সে সম্পর্কে হুশিয়ার করে সেগুলোকে একটি গর্তে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে সামেরী তার কু-মতলব চরিতার্থ করার জন্যে তাদেরকে বলেছিল এসব অলংকার অপরের ধন। এগুলো রাখা তোমাদের জন্য বিপদস্বরূপ। তার এই কথা শুনে অলংকারগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়।

কাফেরদের মাল মুসলমানদের জন্যে কখন হালাল? এখানে প্রশ্ন হয় যে, যেসব কাফের মুসলিম রাষ্ট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং যেসব কাফেরের সাথে জান মালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোনো চুক্তি হয়, তাদের মাল তো মুসলমানদের জন্য হালাল নয়, কিন্তু যেসব কাফের ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মি নয় এবং যাদের সাথে কোনো চুক্তিও হয়নি ফিকহবিদদের পরিভাষায় যাদেরকে 'কাফের হরবী' বলা হয়, তাদের মাল মুসলমানদের জন্য মূলতই হালাল। এমতাবস্থায় হযরত হারূন (আ.) এই মালকে وِزْرٌ তথা পাপ কেন বললেন এবং তাদের কবজা থেকে বের করে গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ কেন দিলেন? এর একটি প্রসিদ্ধ জওয়াব বিশিষ্ট তাফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, কাফের হরবীর মাল যদিও মুসলমানদের জন্যে হালাল, কিন্তু তা গনিমতের মালের (যুদ্ধলব্ধ মালের) মতোই বিধান রাখে। ইসলামপূর্ব কালে

গনিমতের মাল সম্পর্কে এই আইন ছিল যে, তা কাফেরদের কবজা থেকে বের করে আনা জায়েজ ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা ব্যবহার করা ও ভোগ করা জায়েজ নয়। বরং গনিমতের মাল একত্রিত করে কোনো টিলা ইত্যাদির উপর রেখে দেওয়া হতো এবং আসমানি আগুন (বজ্র ইত্যাদি) এসে তা গ্রাস করে ফেলত। এটাই ছিল তাদের জেহাদ কবুল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যে গনিমতের মালকে আসমানি আগুন গ্রাস করত না, সেই মাল জিহাদ কবুল না হওয়ার লক্ষণরূপে গণ্য হতো। ফলে এরূপ মালকে অশুভ মনে করে কেউই তার কাছে যেত না। রাসূলে কারীম (রা.)- এর শরিয়তের যেসব বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে গনিমতের মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়াও অন্যতম। সহীহ মুসলিমের হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী ইসরাঈলের অধিকারভুক্ত ছিল, সেগুলোকে গনিমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও তাদের জন্যে সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল না। এ কারণেই এই মালকে اَوْزَارٌ - (পাপরাশি) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হযরত হারূন (আ.)-এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

জরুরি জ্ঞাতব্য : কিন্তু ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইমাম মুহাম্মদের প্রণীত সিয়ার ও তার টীকা সারখসী গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক সত্যাশ্রয়ী। তা এই যে, কাফের হরবীর মালও সর্বাবস্থায় গনিমতের মাল হয় না ; বরং যথারীতি জিহাদও যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারির জোরে এই মাল অর্জন করা শর্ত। একারণেই সারখসী গ্রন্থে مُغَالَبَةٌ بِالْمُحَارَبَةِ অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকারভুক্ত করাকে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাফের হরবীর যে মাল যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, তা গনিমতের মাল নয়; বরং একে مَالٌ فَئٌ অর্থাৎ অনায়াসলব্ধ মাল বলা হয়; যেমন কোনো ইসলামি রাষ্ট্র কাফেরদের উপর কর ধার্য করে দেয় এবং তারা দিতে সম্মত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যদি ও জেহাদ ও যুদ্ধ নেই ; কিন্তু সম্মতিক্রমে প্রদত্ত এই মালও অনায়াসলব্ধ মালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হালাল।

এখানে কিবতীদের কাছ থেকে নেওয়া অলংকারপাতি যুদ্ধলব্ধ মাল নয়। কারণ এখানে জিহাদ ও যুদ্ধ হয় নি এবং অনায়াসলব্ধ মালও নয় ; কারণ এগুলো তাদের কাছ থেকে ধারের কথা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তারা এগুলো বনী ইসরাঈলের মালিকানায় দিতে সম্মত ছিল না। তাই ইসলামি শরিয়তের আইনেও এই মাল তাদের জন্য হালাল ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে মনস্থ করেন, তখন আরবের কাফেরদের অনেক আমানত তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। কেননা সমগ্র আরব তাঁকে আমানতদাররূপে বিশ্বাস করত এবং তাঁকে 'আমীন' (বিশ্বস্ত) বলে সম্বোধন করত। রাসূলে কারীম ﷺ তাদের আমানত ফেরত দেওয়ার জন্য সযত্ন তৎপরতা প্রদর্শন করেন এবং সবগুলো আমানত হযরত আলী (রা.) -এর হাতে সোপর্দ করে আদেশ দেন যে, প্রত্যেকের আমানত ফেরতদানের কাজ সম্পন্ন করেই তুমি মদিনায় হিজরত করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মালকে গনীমতের মাল হিসেবে হালাল সাব্যস্ত করেন নি। এরূপ করলে তা মুসলমানদের মাল হয়ে যেত এবং ফেরত দানের প্রশ্নই উঠত না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

فَقَذَفْنَاهَا : অর্থাৎ আমরা এসব অলংকারপাতি নিক্ষেপ করে দিয়েছি। উল্লিখিত হাদীসুল ফুতূনের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হযরত হারূন (আ.)-এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েত আছে, সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণের সমাবেশ হওয়াও অবান্তর নয়।

فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ : হাদীসে ফুতূনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আ.) সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং হযরত মূসা (আ.)- এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌঁছল এবং হযরত হারূন (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল : আমিও নিক্ষেপ করব? হযরত হারূন (আ.) মনে করলেন যে, তার হাতেও কোনো অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হারূন (আ.)-কে বলল, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক- আপনি আমার জন্য এই মর্মে দোয়া করলেই আমি নিক্ষেপ করব -নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হযরত হারূন (আ.)- এর জানা ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিক্ষেপ করল, তা অলংকারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পায়ের নীচ থেকে সংগ্রহ করেছিল। কারণ একদা সে এই বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ

করেছিল যে, যে মাটিকে জিবরাইলের ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিলে যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটির দ্বারা একটি জীবিত গো-বৎস তৈরি করতে উদ্যত হলো। মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হযরত হারূন (আ.)-এর দোয়ার বরকতে হোক- অলংকারাদির গলিত স্তূপ এই মাটি নিক্ষেপের এবং হযরত হারূন (আ.)-এর দোয়া করার সাথেই সাথেই একটি জীবিত গো-বৎসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে লাগল। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সামেরীই বনী ইসরাঈলকে অলংকারাদি গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল। তাতে এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, সে অলংকারাদি গলিয়ে একটি গো-বৎসের মূর্তি তৈরি করে নিয়েছিল, কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। উপরিউক্ত মাটি নিক্ষেপের পর তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এসব রেওয়ায়েত কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় এগুলো বিশ্বাস করা যায় না। তবে এগুলোকে মিথ্যা বলারও কোনো প্রমাণ নেই।

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ : অর্থাৎ সামেরী এসব অলঙ্কার দ্বারা একটি গো-বৎস অবয়ব তৈরি করে নিল, তাতে গরুর আওয়াজ ছিল। جَسَدٌ (অবয়ব) শব্দ দৃষ্টে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এটা অবয়ব ও দেহ ছিল- তাতে প্রাণ ছিল না। তবে বিশেষ এক কারণে তা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল। অধিকাংশ তাফসীরবিদের উক্তি প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে প্রাণ ছিল।

فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِىَ : অর্থাৎ আওয়াজরত গো-বৎস দেখে সামেরী ও তার সঙ্গীরা অন্যদেরকে বলল, এই তোমাদের এবং মূসার খোদা। কিন্তু মূসা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের অসার ওজর বর্ণিত হলো। হযরত মূসা (আ.)-এর ক্রোধ দেখে তারা এই ওজর পেশ করেছিল। এরপর :

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا : বাক্যে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবে যদি একটি গো-বৎস জীবিত হয়ে গরুর মতো আওয়াজ করতে থাকে, তবে এই জ্ঞানপাপীদের একথা তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এর সাথে আল্লাহর কি সম্পর্ক? যে ক্ষেত্রে গো-বৎসটি তাদের কথার কোনো জওয়াব দিতে পারে না এবং তাদের কোনো উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, সে ক্ষেত্রে তাকে খোদা মেনে নেওয়ার নির্বুদ্ধিতার পেছনে কোনো যুক্তি আছে কি?

বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বৎস পূজার ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হযরত হারূন (আ.), হযরত মূসা আ.)-এর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন; কিন্তু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল হযরত হারূন (আ.)-এর অনুগত থেকে গো-বৎস পূজাকে ভ্রষ্টতা মনে করল। তাদের সংখ্যা বারো হাজার বর্ণিত আছে। (কুরতুবী) অবশিষ্ট দু'দল গো-বৎস পূজায় যোগ দিল। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, একদল স্বীকার করল, হযরত মূসা (আ.) ফিরে এসে নিষেধ করলে আমরা গো-বৎস পূজা ত্যাগ করব। আর অপর দলের অটল বিশ্বাস ছিল যে, মূসা (আ.)ও ফিরে এসে গো-বৎসকেই উপাস্যরূপে গ্রহণ করবেন এবং আমরা যেভাবেই হোক এ পন্থা ত্যাগ করব না। উভয়দলের বক্তব্য শ্রবণ করে হযরত হারূন (আ.) সমমনা বারো হাজার সঙ্গী নিয়ে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন; কিন্তু বসবাসের স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহ-অবস্থান অব্যাহত রইল।

হযরত মূসা (আ.) ফিরে এসে প্রথমে বনী ইসরাঈলকে যা যা বললেন, তা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। এরপর তাঁর খলীফা হযরত হারূন (আ.)-কে সম্বোধন করে তাঁর প্রতি তীব্র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তাঁর শ্মশ্রু ও মাথার কেশ ধরে টান দিলেন এবং বললেন, তুমি যখন দেখলে যে, বনী ইসরাঈল প্রকাশ্যে গোমরাহী অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তখন আমার অনুসরণ করলে না কেন এবং আমার আদেশ অমান্য করলে কেন?

مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا اَلَّا تَتَّبِعَنِ : এখানে অনুসরণের এক অর্থ হলো হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে তূর পর্বতে চলে যাওয়া। কোনো কোনো তাফসীরবিদ অনুসরণের এরূপ অর্থও করেছেন যে, তারা যখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন তুমি তাদের মোকাবিলা করলে না কেন? কেননা আমার উপস্থিতিতে এরূপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতাম। তোমারও এরূপ করা উচিত ছিল।

উভয় অর্থের দিক দিয়ে হযরত হারূন (আ.)-এর বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.)-এর অভিযোগ ছিল এই যে, এহেন পথভ্রষ্টতায় হয় তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে। হযরত হারূন (আ.)- এই কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে হযরত মূসা (আ.)-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননী-তনয় বলে সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শত্রু নই। তাই আমার ওজর শুনে নাও। অতঃপর হযরত হারূন (আ.) এরূপ ওজর বর্ণনা করলেন : আমি আশঙ্কা করলাম যে, তোমার ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বারো হাজার সঙ্গী নিয়ে তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় أَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ বলে আমাকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলে । এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। কারণ এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তাওহীদে ফিরে আসবে। কুরআন পাকের অন্যত্র হযরত হারূন (আ.)-এর ওজরের মধ্যে এ কথাও রয়েছে: إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي অর্থাৎ বনী ইসরাঈল আমাকে শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করেছে। কেননা অন্যদের মোকাবিলায় আমার সঙ্গী-সাথি ছিল নগণ্য সংখ্যক। তাই তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

ওজরের সার-সংক্ষেপ এই যে, আমি তাদের পথভ্রষ্টতার সাথি ছিলাম না। যতটুকু উপদেশ দেওয়া আমার সাধ্যে ছিল আমি তা পূর্ণ করেছি। কিন্তু তারা আমার আদেশ অমান্য করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম অথবা তাদেরকে পরিত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যেতাম, তবে মাত্র বারো হাজার বনী ইসরাঈলই আমার সাথে থাকত; অবশিষ্টরা তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতো এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ তুঙ্গে উঠত। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তোমার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করেছি। এই ওজর শুনে মূসা (আ.) হারূন (আ.)-কে ছেড়ে দিলেন এবং অনর্থের আসল উদ্ভাবক সামেরীর খবর নিলেন । কুরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-এর মতামতকে বিশুদ্ধ মেনে নেন অথবা নিছক ইজতিহাদী ভুল মনে করে ছেড়ে দেন।

পয়গম্বরদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য এবং উভয় পক্ষে যথার্থতার দিক : এ ঘটনায় হযরত মূসা (আ.)-এর মত ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ছিল যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হযরত হারূন (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের মুশরিক কওমের সাথে সহ-অবস্থান উচিত ছিল না। তাদেরকে ছেড়ে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে চলে আসা সঙ্গত ছিল। এতে তাদের কর্মের প্রতি পরিপূর্ণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়ে যেত।

অপরপক্ষে হযরত হারূন (আ.)-এর মত ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ অনুসারে এই ছিল যে, ত্যাগ করে চলে গেলে চিরকালের জন্য বনী ইসরাঈল দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে এবং বিভেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাদের সংশোধনের এই সম্ভাব্য পথ বিদ্যমান ছিল যে, হযরত মূসা (আ.) ফিরে এলে তাঁর প্রভাবে তারা পুনরায় ঈমান ও তাওহীদে ফিরে আসবে। তাই সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত কিছুদিন তাদের সাথে নম্রতা ও একত্রে বসবাস সহ্য করা দরকার। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি পালন এবং জনগণকে ঈমান ও তাওহীদে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু একজন বয়কট ও বিচ্ছিন্নতাকে এর উপায় মনে করেছেন এবং অপরজন সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শনকে এ উদ্দেশ্যের জন্য উপকারী জ্ঞান করেছেন। উভয় পক্ষ সুধী, সমঝদার ও চিন্তাশীলদের জন্য চিন্তাভাবনার পাত্র। কোনো পক্ষকে ভুল বলা সহজ নয়। মুজতাহিদ ইমামদের ইজতিহাদী মতানৈক্য সাধারণত এমনি ধরনের হয়ে থাকে। এতে কাউকে গোনাহ্গার অথবা নাফরমান বলা যায় না। হযরত মূসা (আ.)-এর চুল ধরে টান দেওয়ার বিষয়টি ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার খাতিরে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়া ছিল। বাস্তব অবস্থা জানার পূর্বে তিনি হযরত হারূন (আ.) কে প্রকাশ্য ভুলে লিপ্ত মনে করেছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে ওজর জেনে নেওয়ার পর তিনি নিজের জন্য ও তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।

بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ -(অর্থাৎ অন্যেরা যা দেখেনি, আমি তা দেখেছি) এখানে হযরত জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। তাঁকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত এই যে, যেদিন হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযায় ভূমধ্যসাগরে শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায়, বনী ইসরাঈল এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যায় এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয়

রেওয়ায়েত এই যে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর হযরত মূসা (আ.) -কে তূর পর্বতে গমনের আদেশ শোনানোর জন্যে হযরত জিবরাঈল (আ.) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। সামেরী তাঁকে দেখেছিল, অন্যেরা দেখেনি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর কারণ এই যে, সামেরী স্বয়ং জিবরাঈলের হাতে লালিত -পালিত হয়েছিল। তার জননী তাকে গর্তে নিক্ষেপ করলে হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌঁছানোর জন্য আগমন করতেন। ফলে সে জিবরাঈলের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল না।-[বয়ানুল কুরআন]

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ : রাসূল বলে এখানে আল্লাহ প্রেরিত জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় যে, জিবরাঈলের ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। তুমি এই মাটি তুলে নাও। সে পদচিহ্নের মাটি তুলে নিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে একথা বর্ণিত হয়েছে : اُلْقِىَ فِىْ رَوْعِهٖ اِنَّهٗ لَا يُلْقِيْهَا عَلٰى شَيْءٍ فَيَقُوْلُ كُنْ كَذَا اِلَّا كَانَ সামেরীর মনে আপনা -আপনি জাগল যে, পদচিহ্নের মাটি যে বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে, অমুক বস্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, সামেরী ঘোড়ার পদচিহ্নের এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যেখানেই এর পা পড়ে, সেখানেই অনতিবিলম্বে সবুজ বনানী সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকেই সে বুঝে নেয় যে, এই মাটিতে জীবনের প্রভাব রয়েছে। (কামালাইন) তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ তাফসীরকেই সাহাবী, তাবেয়ী এবং বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত বলা হয়েছে। অতঃপর এর বিরুদ্ধে আজ-কালকার বাহ্যদর্শীদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে فَجَزَاهُ اللّٰهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ। -[বয়ানুল কুরআন]

এরপর বনী ইসরাঈলের স্তূপীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরি করল, তখন নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের ভেতরে নিক্ষেপ করল। আল্লাহর কুদরতে তাতে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি হাম্বা রব করতে লাগল। হাদীসে-ফুতূনে বলা হয়েছে যে, সামেরী হযরত হারূন (আ.)-কে বলেছিল, আমি মুঠির ভেতরের বস্তু নিক্ষেপ করব; কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া করবেন। হযরত হারূন (আ.) তার কপটতা ও গো-বৎস পূজার বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিহ্নের মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন হযরত হারূন (আ.)- এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিসরে পৌঁছে সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী ইসরাঈলের সাথে সাগর পার হয়ে যায়।

فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ : হযরত মূসা (আ.) সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সবাই তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছ ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। সম্ভবত এই শাস্তিটি একটি আইনের আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্য এবং অন্যান্য বনী ইসরাঈলীর জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছিল, এটাও সম্ভবপর যে, আইনগত শাস্তির ঊর্ধ্বে স্বয়ং তার সত্তায় আল্লাহর কুদরতে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না; যেমন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত মূসা (আ.)-এর বদদোয়ায় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত।- (মা'আলিম) এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদভ্রান্তের মতো ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চিৎকার করে বলত: لَا مِسَاسَ অর্থাৎ আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।

সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক : রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বাহরে-মুহীতের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মূসা (আ.) সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন; কিন্তু তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন।-(বয়ানুল -কুরআন)

لَنُحَرِّقَنَّهُ : (অর্থাৎ আমরা একে আগুনে পুড়িয়ে দেব।) এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই গো-বৎসটি স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে আগুনে পোড়ানো হবে কিরূপে? কেননা স্বর্ণ রৌপ্য গলিত ধাতু-দগ্ধ হওয়ার নয়। উত্তর এই, প্রথমত এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, গো-বৎসেরে মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুঠে উঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংস সম্পন্ন হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বৎস হয়ে থাকলে তাকে পোড়ানোর অর্থ হবে জবাই করে পুড়িয়ে দেওয়া এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘষে ঘষে কণা করে দেওয়া (দূররের মনসূর) অথবা কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পোড়ানো।-(রূহুল-মা'আনী) অলৌকিকভাবে দগ্ধ করাও অবাস্তব নয়।- (বয়ানুল -কুরআন)

শব্দ বিশ্লেষণ :

حُمِّلْنَا : সীগাহ جمع متلكم বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْمِيْل মূলবর্ণ (ح - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– আমাদের উপর চেপে ছিল, আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

فُتِنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنَةٌ মূলবর্ণ (ف - ت - ن) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছ, তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে।

عَاكِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার عُكُوْفٌ মূলবর্ণ (ع - ك - ف) জিনস صحيح অর্থ- অবস্থানকারীগণ।

اَلَّا تَتَّبِعَنِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منصوب منفى বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّبَاعٌ মূলবর্ণ (ت - ب - ع) জিনস صحيح অর্থ- তখন তুমি আমার নিকট আসলে না কেন।

اَفَعَصَيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عِصْيَانٌ মূলবর্ণ (ع - ص - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তবে কি তুমি অমান্য করেছ, তুমি কি অবাধ্যাচরণ করেছ।

لَمْ تَرْقُبْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার رقوب মূলবর্ণ (ر - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ- তুমি মূল্য দাওনি, তুমি দৃষ্টি রাখনি।

فَقَبَضْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قَبْضَةٌ মূলবর্ণ (ق - ب - ض) জিনস صحيح অর্থ- অতঃপর আমি নিয়েছিলাম, আমি নিয়েছি।

سَوَّلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْوِيْل মূলবর্ণ (س - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- এটা ভালো লাগল, সে প্ররোচিত করল।

لَنُحَرِّقَنَّهُ : সীগাহ جمع متلكم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْرِيْقٌ মূলবর্ণ (ح - ر - ق) জিনস صحيح অর্থ- আমি অবশ্যই তাকে পুড়ে ফেলব।

لَنَنْسِفَنَّهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نَسْفًا মূলবর্ণ (ن - س - ف) জিনস صحيح অর্থ- আমি অবশ্যই তাকে বিক্ষিপ্ত করে ভাসিয়ে দেব।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوْا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا : এখানে قَالُوْا ফে'ল ফা'য়েল মিলে قول আর পরবর্তী বাক্য হলো مقول : আর مَا হলো نافية এবং اَخْلَفْنَا ফে'ল ও ফায়েল مَوْعِدَكَ মাফউলে বিহী بِمَلْكِنَا জার মাজরূর মিলে উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে অর্থাৎ حَالَ كَوْنِنَا مَالِكِيْنَ اَمْرَنَا وَلٰكِنَّنَا غَلَبْنَا عَلٰى اَمْرِنَا مِنْ جِهَةِ السَّامِرِىِّ وَكَيْدِهٖ (ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১৫–৭১৬)

إِنَّمَآ إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ؕ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾	৯৮. বস্তুত, তোমাদের উপাস্য হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, যিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়; তার জ্ঞান সকল বিষয়েই পরিব্যাপ্ত।
كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾	৯৯. এভাবেই আমি আপনার নিকট অপরাপর অতীত ঘটনাবলির সংবাদসমূহও বর্ণনা করে থাকি এবং আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে এক নসিহত নামা দিয়েছি।
مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾	১০০. যারা তা হতে মুখ ফিরাবে, বস্তুত তারা কিয়ামত দিবসে অত্যন্ত ভারি বোঝা বহন করবে।
خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾	১০১. তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে; আর এ বোঝা কিয়ামতের দিন তাদের জন্য অতি নিকৃষ্ট হবে।
يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾	১০২. যে দিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, আর আমি যেদিন অপরাধীদেরকে এমন অবস্থায় একত্র করব যে, [চক্ষু] ফ্যাকাশে নীল বর্ণের হবে।
يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾	১০৩. তারা [ভয়ে] পরস্পর চুপে চুপে বলাবলি করবে যে, তোমরা কেবল দশ দিন ছিলে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৮. إِنَّمَآ إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ বস্তুত তোমাদের উপাস্য হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা الَّذِىْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ যিনি ব্যতীত অপর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا, তার জ্ঞান সকল বিষয়েই পরিব্যাপ্ত।

৯৯. كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ এভাবেই আমি আপনার নিকট বর্ণনা করে থাকি مِنْ أَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ অপরাপর অতীত ঘটনাবলির সংবাদসমূহও وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ, আর আমি আপনাকে দিয়েছি مِنْ لَّدُنَّا আমার পক্ষ থেকে ذِكْرًا এক নসিহতনামা।

১০০. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ যারা তা হতে মুখ ফিরাবে فَإِنَّهٗ يَحْمِلُ বস্তুত তারা বহন করবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিনে وِزْرًا অত্যন্ত ভারি বোঝা।

১০১. خٰلِدِيْنَ فِيْهِ তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে وَسَآءَ لَهُمْ আর তাদের জন্য অতি নিকৃষ্ট হবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন حِمْلًا এই বোঝা।

১০২. يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ আর আমি অপরাধীদেরকে একত্রিত করব يَوْمَئِذٍ যেদিন زُرْقًا এমন অবস্থায় যে (চক্ষু) ফ্যাকাশে নীল বর্ণের হবে।

১০৩. يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ তারা পরস্পর চুপে চুপে বলাবলি করবে যে إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا তোমরা কেবল দশ দিন ছিলে।

১০৪. যে সম্বন্ধে তারা কথাবার্তা বলবে তা আমি খুব জানি, যখন তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি বলবে যে, না, তোমরা তো কেবল একদিন ছিলে।	نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾
১০৫. আর মানুষ আপনাকে পর্বত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, অতএব, আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক এগুলোকে সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেবেন।	وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿١٠٥﴾
১০৬. তৎপর জমিনকে এক সমতল মাঠে পরিণত করবেন।	فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾
১০৭. যাতে না তুমি অসমতা দেখতে পাবে, আর না উচ্চতা।	لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ﴿١٠٧﴾
১০৮. ঐদিন সকলেই আহ্বানকারীর ডাকে সাঁড়া দেবে, তাঁর সম্মুখে কোনো একগুঁয়েমি থাকবে না এবং সমস্ত শব্দ আল্লাহর সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে যাবে, অতএব, তুমি পদক্ষেপের ক্ষীণ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পাবে না।	يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾
১০৯. ঐ দিন সুপারিশ কারো উপকারে আসবে না; কিন্তু এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন এবং যার সুপারিশ করা পছন্দ করেছেন।	يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৪. نَحْنُ اَعْلَمُ তা আমি খুব জানি بِمَا يَقُوْلُوْنَ যে সম্বন্ধে তারা কথাবার্তা বলবে اِذْ يَقُوْلُ যখন বলবে اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً তাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا না, তোমরা তো কেবল একদিন ছিলে।

১০৫. وَيَسْـَٔلُوْنَكَ আর মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عَنِ الْجِبَالِ পর্বত সম্বন্ধে فَقُلْ অতএব আপনি বলে দিন يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا আমার প্রতিপালক এগুলোকে সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেবেন।

১০৬. فَيَذَرُهَا তৎপর জমিনকে পরিণত করবেন قَاعًا صَفْصَفًا এক সমতল মাঠে।

১০৭. لَّا تَرٰى فِيْهَا যাতে না তুমি দেখতে পাবে عِوَجًا অসমতা وَّلَآ اَمْتًا আর না উচ্চতা।

১০৮. يَوْمَئِذٍ ঐ দিন يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ সকলেই আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেবে لَا عِوَجَ لَهٗ তার সম্মুখে কোনো একগুঁয়েমি থাকবে না وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ এবং সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে لِلرَّحْمٰنِ আল্লাহর সম্মুখে فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا অতএব তুমি পদক্ষেপের ক্ষীণ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পাবে না।

১০৯. يَوْمَئِذٍ ঐ দিন لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ সুপারিশ কারো উপকারে আসবে না اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ কিন্তু এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا এবং যার সুপারিশ করা পছন্দ করেছেন।

১১০. তিনি তাদের অগ্র-পশ্চাতের সব কিছুই জানেন এবং তাদের জ্ঞান আল্লাহকে বেষ্টন করতে পারে না।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾
১১১. আর সকল চেহারাই সে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহর সম্মুখে অবনমিত থাকবে; আর এমন ব্যক্তি বঞ্চিত হবে যে অনাচারসহ আসবে।	وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾
১১২. আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে এবং সে ঈমানও রাখে, তবে তার কোনো [পাপ] বৃদ্ধিরও আশঙ্কা থাকবে না এবং [নেকী] হ্রাসেরও না।	وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾
১১৩. আর আমি এভাবেই তাকে আরবি কুরআনরূপে নাজিল করেছি এবং আমি তাতে বিভিন্নরূপে ভীতি প্রদর্শন করেছি, যেন তারা ভয় করে কিংবা এ কুরআন তাদের জন্য কিয়ৎ পরিমাণ বোধশক্তির উদ্ভব করে।	وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১০. يَعْلَمُ তিনি জানেন مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তাদের অগ্র পশ্চাতের সব কিছুই وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا এবং তাদের জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানকে বেষ্টন করতে পারে না।

১১১. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ আর সকল চেহারাই অবনমিত থাকবে لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ সেই চরিঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহর সম্মুখে وَقَدْ خَابَ আর এমন ব্যক্তি বঞ্চিত হবে مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا যে অনাচারসহ আসবে।

১১২. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে وَهُوَ مُؤْمِنٌ এবং সে ঈমানও রাখে فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا তবে তার কোনো (পাপ) বৃদ্ধিরও আশঙ্কা থাকবেনা এবং (নেকী) হ্রাসেরও না।

১১৩. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ আর আমি এভাবেই তাকে নাজিল করেছি قُرْآنًا عَرَبِيًّا আরবি কুরআনরূপে وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ এবং আমি তাতে বিভিন্নরূপে ভীতি প্রদর্শন করেছি لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ যেন তারা ভয় করে أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا কিংবা এই কুরআন তাদের কিয়ৎ পরিমাণ বোধশক্তির উদ্ভব করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا

শানে নুযূল : ইবনুল মুনযির ইবনে জুরাইজের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরাইশের লোকজন রাসূল ﷺ কে লক্ষ্য করে বলল যে, তুমি তো বলছ কিয়ামত দিবসে দুনিয়ার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। বলত তো দেখি কিয়ামত দিবসে তোমার প্রতিপালক এত সব বিশাল বিশাল সু-দৃঢ় পর্বতরাজিকে কি করবেন? তাদের এ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে ও তাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। (ফাতহুল কাদীর ৩৭৮/৩, রূহুল মা'আনী ২৬২/৮/১৬)

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا : বিশিষ্ট তাফসীরবিদদের সর্বসম্মত মতে এখানে ذِكْرًا বলে কুরআন বোঝানো হয়েছে।

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا : অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন সে বিরাট পাপের বোঝা বহন করবে। কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে যথা কুরআন তেলাওয়াত না করা, কুরআন পাঠ শিক্ষা করার চেষ্টা না করা, কুরআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ না করা, শুদ্ধ পড়লেও

উদাসীন হয়ে কিংবা অযত্নে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সম্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনিভাবে কুরআনের বিধানাবলি বোঝার চেষ্টা না করাও কুরআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল। বোঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিধানাবলির বিরুদ্ধাচরণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফিরোনো। মোটকথা, কুরআনের হকের প্রতি বেপরোয়া হওয়া খুব বড় গোনাহ। কিয়ামতের দিন এই গোনাহ্ ভারি বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দ কর্ম ও গোনাহকে কিয়ামতের দিন ভারি বোঝার আকারে পিঠের উপর চাপানো হবে।

يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ : হযরত ওমর (রা.) বলেন : জনৈক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করল : صُوْر (সূর) কি ? তিনি বললেন : শিং এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। অর্থ এই যে, صُوْر শিং এর মতোই কোনো বস্তু হবে। এতে ফেরেশতা ফুৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اٰتَيْنٰكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ- আমি আপনাকে দিয়েছি।

يُنْفَخُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার نَفْخٌ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ خ) জিনস صحيح অর্থ- ফুৎকার দেওয়া হবে।

لَبِثْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার لُبْثٌ মূলবর্ণ (ل ـ ب ـ ث) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ছিলে।

يَنْسِفُهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نَسْفٌ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ف) জিনস صحيح অর্থ- তিনি এগুলোকে উড়িয়ে দিবেন।

فَيَذَرُهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَذْرٌ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ- তৎপর জমিনকে পরিণত করবেন, অতঃপর একে ছেড়ে দেবেন।

قَاعًا : এর বহুবচন قِيَعٌ، قِيْعَةٌ، قِيْعَانٌ এবং اَقْوَاعٌ আসে। অর্থ– নরম। সমতল চূড়ায়, যা পাহাড় এবং টিলা থেকে দূরে অবস্থিত হয়।

اَمْتًا : ইসম। অর্থ– টিলা, উঁচু, উন্নত। কোনো বস্তু জিম্মি হওয়া। বহুবচন আসে اَمْوَاتٌ - اَمَاتٌ। তাছাড়া اَمْتًا মাসদারও আসে। বাব ضَرَبَ অর্থ– অনুমান করা, ইচ্ছা করা।

عَنَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার عُنُوٌّ মূলবর্ণ (ع ـ ن ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- অবনমিত থাকবে।

صَرَّفْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْرِيْفٌ মূলবর্ণ (ص ـ ر ـ ف) জিনস صحيح অর্থ- আমি প্রদর্শন করেছি।

يَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তারা ভয় করে, তারা বেঁচে থাকে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَكَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا : এখানে كَذٰلِكَ শব্দটি উহ্য মাসদারের نعت হয়েছে অর্থাৎ كَمَا قَصَصْنَا يَا مُحَمَّدُ هٰذِهِ الْقِصَّةَ আর نَقُصُّ হলো ফে'ল তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর نَحْنُ হলো ফায়েল। আর عَلَيْكَ টা نقص ফে'লের সাথে متعلق এবং مِنْ أَنْبَاءِ হলো উহ্য মাওসূফের صفة এবং صفة ও موصوف মিলে نقص ফে'লের মাফউলে বিহী অর্থাৎ نَقُصُّ نَبأً مِنَ انباء আর ما হলো মুযাফ ইলাইহি আর قَدْ سَبَقَ বাক্যটি তার সেলাহ। আর وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ এর واو টি আতেফা قَدْ টা تحقيق-এর জন্য এসেছে আর اٰتَيْنٰكَ ফে'ল ফা'য়েল ও মাফউলে বিহী আর مِنْ لَّدُنَّا হলো حال কেননা এটা ذِكْرًا-এর সিফত আর ذِكْرًا হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। -[ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭২৩-৭২৪]

১১৪. বস্তুত আল্লাহ তা'আলা যিনি প্রকৃত বাদশাহ, অতি উচ্চ মর্যাদাশীল, আর আপনার প্রতি কুরআনের পূর্ণ ওহী নাজিল হওয়ার পূর্বে আপনি তা [পাঠ কর]-তে তাড়াহুড়া করবেন না, আর এই প্রার্থনা করুন– হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।	فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾
১১৫. আর আমি এর পূর্বে আদমকে এক নির্দেশ দিয়েছিলাম; অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল, আর আমি তাঁর মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।	وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾
১১৬. আর ঐ সময়টিও স্মরণ করুন, যখন আমি ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম যে, আদমের সম্মুখে সেজদায় পতিত হও, তখন সকলে সেজদায় পতিত হলো– ইবলীস ব্যতীত; সে অস্বীকার করল।	وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿١١٦﴾
১১৭. অতঃপর আমি বললাম, হে আদম! নিঃসন্দেহে এই শয়তান তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু। অতএব, সে যেন তোমাদেরকে বেহেশত হতে বের করে না দেয়, ফলে তোমরা কষ্টে নিপতিত হবে।	فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾
১১৮. এখানে তোমাদের জন্য এ ব্যবস্থা রয়েছে যে, তোমরা কখনো ক্ষুধার্ত হবে না এবং উলঙ্গও থাকবে না,	اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৪. فَتَعٰلَى اللّٰهُ বস্তুত আল্লাহ অতি উচ্চ মর্যাদাশীল الْمَلِكُ الْحَقُّ যিনি প্রকৃত বাদশাহ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ আর আপনি তা (পাঠ কর) -তে তাড়াহুড়া করবেন না مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ আপনার প্রতি কুরআনের পূর্ণ ওহী নাজিল হওয়ার পূর্বে وَقُلْ আর এই প্রার্থনা করুন رَّبِّ হে আমার প্রতিপালক زِدْنِيْ عِلْمًا আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।

১১৫. وَلَقَدْ عَهِدْنَآ আর আমি এক নির্দেশ দিয়েছিলাম اِلٰٓى اٰدَمَ আদমকে مِنْ قَبْلُ এর পূর্বে فَنَسِيَ অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا আর আমি তাঁর মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।

১১৬. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ আর ঐ সময়টিও স্মরণ করুন! যখন আমি ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম যে اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ আদমের সম্মুখে সেজদায় পতিত হও فَسَجَدُوْٓا তখন সকলে সেজদায় পতিত হলো اِلَّآ اِبْلِيْسَ ইবলীস ব্যতীত اَبٰى সে অস্বীকার করল।

১১৭. فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ অতঃপর আমি বললাম, হে আদম اِنَّ هٰذَا নিঃসন্দেহে এই শয়তান عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا অতএব সে যেন তোমাদেরকে বের করে না দেয় مِنَ الْجَنَّةِ জান্নাত থেকে فَتَشْقٰى ফলে তোমরা কষ্টে নিপতিত হবে।

১১৮. اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا এবং এখানে তোমাদের জন্য এ ব্যবস্থা রয়েছে যে, তোমরা কখনো ক্ষুধার্ত হবে না وَلَا تَعْرٰى এবং উলঙ্গও থাকবেনা।

১১৯. এবং এখানে তৃষ্ণার্তও হবে না এবং রৌদ্র-তপ্তও হবে না।	وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾
১২০. অতঃপর শয়তান তাঁকে প্ররোচনা দিল, বলল, "হে আদম। আমি কি তোমাকে চিরস্থায়ী থাকার বৃক্ষ দেখিয়ে দেব, আর এমন রাজত্ব যাতে কখনো দুর্বলতা আসবে না?"	فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾
১২১. অতঃপর তাঁরা উভয়ে সে বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করলেন, ফলে উভয়ের গুপ্তাঙ্গ উভয়ের সমক্ষে খুলে গেল এবং তাঁরা নিজেদের উপর উদ্যানের পাতা জুড়ে দিলেন, আর আদম কর্তৃক নিজ প্রতিপালকের আদেশ লঙ্ঘন হলো, সুতরাং তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন,	فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۫ وَعَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾
১২২. অনন্তর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মকবুল করে নিলেন, অতঃপর তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং সৎপথের উপর কায়েম রাখলেন।	ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾
১২৩. আল্লাহ বললেন, তোমরা উভয়ে বেহেশত হতে নেমে যাও এমন অবস্থায় যে, তোমরা [পরস্পর] একে অন্যের শত্রু হবে, অতঃপর যদি আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট কোনো হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে আমার সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুঃখ-কষ্ট পাবে না।	قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًاۢ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৯. وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا এবং এখানে তৃষ্ণার্তও হবে না وَلَا تَضْحٰى, রৌদ্র তপ্তও হবে না।

১২০. فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ অতঃপর শয়তান তাকে প্ররোচনা দিল قَالَ বলল يٰۤاٰدَمُ হে আদম هَلْ اَدُلُّكَ আমি কি তোমাকে দেখিয়ে দেব عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ চিরস্থায়ী থাকার বৃক্ষ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى আর এমন রাজত্ব যাতে কখনো দুর্বলতা আসবেনা।

১২১. فَاَكَلَا مِنْهَا অতঃপর তারা উভয়ে সে বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করলেন فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا ফলে উভয়ের গুপ্তাঙ্গ উভয়ের সমক্ষে খুলে গেল وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا, এবং তারা নিজেদের উপর জুড়ে দিলেন مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ উদ্যানের পাতা وَعَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ, আর আদম কর্তৃক নিজ প্রতিপালকের আদেশ লঙ্ঘন হলো فَغَوٰى সুতরাং বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

১২২. ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ অনন্তর তার প্রতিপালক তাকে মকবুল করে নিলেন فَتَابَ عَلَيْهِ অতঃপর তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন وَهَدٰى, এবং সৎপথের উপর কায়েম রাখলেন।

২২৩. قَالَ আল্লাহ বললেন اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا তোমরা উভয়ে বেহেশত হতে নেমে যাও بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ এমন অবস্থায় যে, তোমরা একে অন্যের শত্রু হবে فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ অতঃপর যদি তোমাদের নিকট পৌঁছে مِّنِّيْ هُدًى আমার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়েত فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ তবে যে আমার সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে فَلَا يَضِلُّ সে পথভ্রষ্টও হবে না وَلَا يَشْقٰى, এবং দুঃখ-কষ্ট পাবে না।

১২৪. আর যে ব্যক্তি আমার ঐ নসিহত হতে মুখ ফিরাবে, তবে তার জন্য হবে সংকীর্ণতার জীবন এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাব।	وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٤﴾
১২৫. সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অন্ধরূপে কেন উঠালেন? অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম।"	قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾
১২৬. আল্লাহ বলবেন, এরূপেই তোমার নিকট আমার নির্দেশসমূহ পৌছেছিল, কিন্তু তুমি তার প্রতি কোনো খেয়াল করনি এবং সেরূপে আজ তোমার প্রতিও কোনো লক্ষ্য করা হবে না।	قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২৪. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ আর যে ব্যক্তি আমার ঐ নসিহত হতে মুখ ফিরাবে فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا তবে তার জন্য হবে সংকীর্ণতার জীবন وَّنَحْشُرُهٗ এবং আমি তাকে উঠাব يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে اَعْمٰى অন্ধ অবস্থায়।

১২৫. قَالَ সে বললে رَبِّ হে আমর প্রতিপালক لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى আপনি আমাকে অন্ধরূপে কেন উঠালেন وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম।

১২৬. قَالَ আল্লাহ বললেন كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا এরূপেই তোমার নিকট আমার নির্দেশসমূহ পৌছেছিল فَنَسِيْتَهَا কিন্তু তুমি তার প্রতি কোনো খেয়াল করনি وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى এবং সেরূপে আজ তোমার প্রতিও কোনো লক্ষ্য করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

শানে নুযুল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন ওহী নিয়ে আসতেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী পৌছানো শেষ করার আগেই রাসূল ﷺ পঠিত বিষয় ভুলে যাবার ভয়ে তাড়াহুড়া করে পড়তে আরম্ভ করতেন। রাসূল ﷺ কে তাড়াহুড়া না করার আদেশ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ২২৩/১১]

ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত হাসানের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চপেটাঘাত দেয়। সুতরাং সে মহিলা বিচার নিয়ে রাসূল ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সে বিষয়ে নালিশ করে কেসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার আবেদন জানালো। রাসূল ﷺ তাদের পারস্পরিক বিষয়টির মধ্যে কেসাস নির্ধারণ করে দিলেন। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে দিলেন। ফলে রাসূল ﷺ সে হুকুম কার্যকর করা থেকে বিরত থাকেন। অবশেষে اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ নাজিল হয়।

[ফাতহুল কাদীর ৩৯০/৩, রূহুল মা'আনী পৃ. ২৬৮, খণ্ড ১৬, পারা ৮]

আল্লামা মাওয়ার্দী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে জলদি ওহী আশার কামনা থেকে নিষেধ করেছেন। কারণ মক্কাবাসী ও নাজরানের নেতৃবর্গরা রাসূল ﷺ কে বলল যে, হে মুহাম্মদ! আমাদের অমুক বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করে দাও একথা বলে তিন দিনের সময়সীমা বেধেঁ দিল। কিন্তু ওহী আসতে বিলম্ব হলে একথাটি ইহুদিদের মাঝে প্রচার হয়ে গেল। তারা ধারণা করতে ছিল যে, রাসূল ﷺ হয়তো পরাজিত হয়ে গেলেন। এতে করে রাসূল ﷺ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়েন। সে জন্য রাসূল ﷺ নিজেও ওহী জলদী আসার কামনা করছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী পৃ. ২৬৮, খণ্ড ১৬, পারা ৮]

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمٰى

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত আসওয়াদ ইবনে আবুল আসওয়াদ আল-মাখজূমী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সংকীর্ণ-জীবন যাপন দ্বারা কাফেরদের বরযখী জীবনকে বুঝানো হয়েছে। হাসান, কাতাদাহ ও কালবী বলেন, পরজগতে জাহান্নামের সংকীর্ণ জীবন ধারাকে বুঝানো হয়েছে। সেখানে আহার হবে যাক্কূম ফল। পানীয় হবে ফুটন্ত গরম ও তৈলের গাদের ন্যায় রক্ত পূঁজ মিশ্রিত গরম পানীয়, যেখানে মৃত্যু এবং নতুন জীবন বলতে আর কিছুই থাকবে না। জাহান্নামীদের জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।–[বাহরে মুহীত্ব ২৬৫-৬৪]

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهُ সহীহ্ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহীর প্রারম্ভিককালে যখন জিবরাঈল কোনো আয়াত নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুনাতেন, তখন তিনি তাঁর সাথে সাথে আয়াতটি পাঠ করারও চেষ্টা করতেন, যাতে আয়াতটি স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এতে তাঁর দ্বিগুণ কষ্ট হতো– আয়াতকে জিবরাঈলের কাছ থেকে শোনা ও বোঝার কষ্ট এবং সাথে সাথে মনে রাখার জন্য মুখে পাঠ করার কষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা কিয়ামার لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ব্যাপারটি সহজ করে দিয়েছেন যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্থ করা আপনার দায়িত্ব নয়– এটা আমার দায়িত্ব। আমি নিজেই আপনাকে মুখস্থ করিয়ে দেব। তাই জিবরাঈলের সাথে সাথে পাঠ করার এবং জিহ্বা নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু নিবিষ্ট মনে শুনে যাবেন। তবে এরূপ দোয়া করে যাবেন رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا – হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। কোরআনের যে অংশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা স্মরণ রাখা, যে অংশ অবতীর্ণ হয়নি, তা প্রার্থনা করা এবং কোরআন বোঝার তওফীকও এই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বাপর সম্পর্ক : এখান থেকে হযরত আদম (আ.)-এর কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে। এই কাহিনী ইতঃপূর্বে সূরা বাকারা ও আ'রাফে এবং কিছু সূরা হিজর ও কাহফে বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে সূরা সাদ'-এ বর্ণিত হবে। সব ক্ষেত্রেই কাহিনীর অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলিসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই কাহিনীর সম্পর্ক তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সবচাইতে উজ্জ্বল ও অমলিন উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে : ذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ এতে রাসূল ﷺ -কে বলা হয়েছে, আপনার নবুয়তের প্রমাণ ও আপনার উম্মতকে হুঁশিয়ার করার জন্যে আমি পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অবস্থা ও ঘটনাবলি আপনার কাছে বর্ণনা করি। তন্মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্তারিত ঘটনা এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও কোনো কোনো দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হযরত আদম (আ.)-এর কাহিনী। এখান থেকে এই কাহিনী শুরু করা হয়েছে। এতে উম্মতে মুহাম্মদীকে হুঁশিয়ার করা। উদ্দেশ্য যে, শয়তান মানব জাতির আদি শত্রু। সে সর্বপ্রথম তোমাদের আদি পিতা- মাতার সাথে শত্রুতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্য জান্নাত থেকে মর্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারি হয় এবং জান্নাতের পোশাক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভুলের ক্ষমা পেয়ে তিনি রেসালত ও নবুয়তের উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত হন। তাই শয়তানি কুমন্ত্রণার থেকে মানব মাত্রেরই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে শয়তানি প্ররোচনা ও অপকৌশল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا : এখানে عَهِدْنَا শব্দটি اَمَرْنَا অথবা وَصَّيْنَا শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। -(বাহরে মুহীত) উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পূর্বে হযরত আদম (আ.)-কে তাকিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফলফুল অথবা কোনো একটি অংশ আহার করো না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও নিয়ামত তোমাদের জন্য অবারিত। সেগুলো ব্যবহার কর। আরো বলেছিলাম যে, ইবলিস তোমাদের শত্রু। তাঁর কুমন্ত্রণা মেনে নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু আদম (আ.) এসব কথা ভুলে গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, نِسْيَانٌ ও عَزْمٌ লক্ষণীয় نِسْيَانٌ শব্দের অর্থ ভুলে যাওয়া, অনুধাবন হওয়া এবং عَزْمٌ-এর শাব্দিক অর্থ কোনো কাজের জন্য সংকল্পকে দৃঢ় করা। এ শব্দদ্বয় দ্বারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম

করার পূর্বে একথা জেনে নেওয়া জরুরি যে, হযরত আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রভাবশালী পয়গম্বরগণের অন্যতম ছিলেন এবং সব পয়গম্বর গোনাহ্ থেকে পবিত্র থাকেন।

প্রথম শব্দে বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) ভুলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ভুলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে পাপই গণ্য করা হয়নি। একটি সহীহ হাদীসে বলা : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ অর্থাৎ আমার উম্মতের ভুলবশত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাক বলে, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দেন না; কিন্তু এটাও জানা কথা যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতে এমন সব উপকরণও রেখেছেন, যেগুলো পূর্ণ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করলে মানুষ ভুল থেকে বাঁচতে পারে। পয়গম্বরগণ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল। তাদেরকে এ জন্যও ধরপাকড় করা যেতে পারে যে, তাঁরা এসব উপকরণকে কেন কাজে লাগালেন না? অনেক সময় একজন মন্ত্রীর জন্য এমন কাজেও ধরপাকড়ের যোগ্য মনে করা হয়, যা সাধারণ কর্মচারীদের জন্য পুরস্কারযোগ্য হয়ে থাকে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.) এ কথাটিই এভাবে বলেছেন, حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অনেক সৎকর্মকে নৈকট্যশীলদের জন্য গোনাহ্ গণ্য করা হয়।

হযরত আদম (আ.)-এর এই ঘটনা প্রথমত নবুয়ত ও রিসালাতের পূর্বেকার। এই অবস্থায় পয়গম্বরগণের কাছ থেকে গোনাহ্ প্রকাশ পাওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের কতক আলেমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থি নয়। দ্বিতীয়ত প্রকৃতপক্ষে এটা ভুল, যা গোনাহ্ নয়। কিন্তু হযরত আদম (আ.)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তাঁর জন্য গোনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করার জন্য এই ভুলকে عِصْيَانٌ (অবাধ্যতা) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয়ত عَزْم শব্দ ব্যবহার করে আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত আদম (আ.)-এর মধ্যে عَزْم তথা সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোনো কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। হযরত আদম (আ.) আল্লাহর নির্দেশ পালন করার পুরাপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ন হয় এবং ভুল তাঁকে বিচ্যুত করে দেয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে আদম সৃষ্টির পর সব ফেরেশতাকে আদমের উদ্দেশ্যে সেজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ইবলিসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা তখন পর্যন্ত ইবলিস জান্নাতের ফেরেশতাদের সাথে একত্রে বাস করত। ফেরেশতারা সবাই সেজদা করল, কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বলল, আমি অগ্নিনির্মিত আর সে মৃত্তিকা নির্মিত। অগ্নি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিভাবে তাকে সেজদা করব? এ কারণে ইবলিস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলো। পক্ষান্তরে আদম ও হাওয়ার জন্য জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও অফুরন্ত নিয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। সবকিছু ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হলো যে, একে (অর্থাৎ এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে) আহার করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সূরা বাক্বারা ও সূরা আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আদমকে বললেন : দেখ, সেজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলিস তোমাদের (অর্থাৎ আদম-হাওয়ার) শত্রু। যেন অপকৌশল ও ধোঁকার মাধ্যমে তোমাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। এরূপ করলে এর পরিণতিতে তোমরা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে।

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى : অর্থাৎ শয়তান যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। ফলে তোমরা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবে। تَشْقٰى শব্দটি شَقَاوَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিবিধ- প্রথমটি পারলৌকিক কষ্ট অপরটি হলো ইহলৌকিক কষ্ট। অর্থাৎ দৈহিক কষ্ট ও বিপদ। এখানে দ্বিতীয় অর্থই হতে পারে। কেননা প্রথম অর্থে কোনো পয়গম্বরতো দূরের কথা, কোনো সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানের জন্যে এই শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। তাই ফাররা (র.)-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন : هُوَ اَنْ يَّاكُلَ مِنْ كَدِّ يَدَيْهِ অর্থাৎ এখানে شَقَاوَتْ এর অর্থ হাতে খেটে আহার্য উপার্জন করা।- (কুরতুবী) এখানে স্থানের ইঙ্গিতও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। কেননা পরবর্তী আয়াতে জান্নাতের এমন চারটি নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তম্ভবিশেষ এবং জীবনধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত জান্নাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে এসব নিয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

সম্ভবত এই ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের উল্লেখ না করে শুধু এমন সব নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের কুমন্ত্রনা মেনে নিয়ে তোমরা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়ো না এবং এসব নিয়ামত যেন যেন হাতছাড়া হয়ে না যায়। এরূপ হলে পৃথিবীতে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। তাফসীরবিদদের সর্বসম্মত বর্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে فَتَشْقَىٰ শব্দের মর্ম। ইমাম কুরতুবী এখানে আরো উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আদম (আ.) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) জান্নাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার জন্য দিলেন এবং বললেন : যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো কর্তন করুন এবং পিষে রুটি তৈরি করুন। হযরত জিবরাঈল (আ.) এসব কাজের পদ্ধতিও হযরত আদম (আ.)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে হযরত আদম (আ.) রুটি তৈরি করে খেতে বসলেন। কিন্তু হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে গেল। হযরত আদম (আ.) অনেক পরিশ্রমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, হে আদম! আপনার এবং আপনার সন্তান-সন্ততির রিজিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে।

স্ত্রীর জরুরি ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব : আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর সাথে হাওয়াকেও সম্বোধন করে বলেছেন : عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ - অর্থাৎ শয়তান তোমারও শত্রু এবং তোমার স্ত্রীরও শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়। কিন্তু আয়াতের শেষে فَتَشْقَىٰ একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এতে স্ত্রীকে শরিক করা হয়নি। নতুবা স্থানের চাহিদা অনুযায়ী فَتَشْقَيَا বলা হতো। কুরতুবী এ থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, স্ত্রীর জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা স্বামীর দায়িত্ব। এসব সামগ্রী উপার্জন করতে গিয়ে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয় তা এককভাবে স্বামী করতে হবে। এ কারণেই فَتَشْقَىٰ একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে অবতরণের পর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপার্জন করতে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে, তা হযরত আদম (আ.)-কেই করতে হবে। কেননা হাওয়ার ভরণ পোষণ ও সামগ্রী সংগ্রহ করা তাঁর দায়িত্ব।

মাত্র চারটি বস্তু জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে : আল্লামা কুরতুবী বলেন : এ আয়াতটি আমাদেরকে আরো শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর জিম্মায় ওয়াজিব, তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ - আহার, পানীয়, বস্ত্র, বাসস্থান। স্বামী এর বেশি কেছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ-অপরিহার্য নয়। এ থেকেই আরো জানা গেল যে, স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কারো ভরণ পোষণ শরিয়ত কোনো ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে তাতেও উপরিউক্ত চারটি বস্তুই তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে, যেমন-পিতা মাতা অভাবগ্রস্থ ও অপারগ হলে তাঁদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফিকহের গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত রয়েছে।

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ : জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় এই চারটি মৌলিক বস্তু জান্নাতে চাওয়া ও পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায়। জান্নাতে ক্ষুধা লাগে না-এতে সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্বাদও পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিপাসার্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বাদ অনুভব করতে পারে না। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্টভোগ করতে হবে না; বরং ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং পিপাসা হলে পানীয় পাওয়া যাবে, এতে বিলম্ব হবে না। এছাড়া জান্নাতী ব্যক্তির মন যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা পাবে।

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَٰنُ থেকে وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ এই আয়াতে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ.)- ও হাওয়া (আ.)-কে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল-ফুল আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে, ইবলিস তোমাদের উভয়ের দুশমন। তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, যেন সে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করে দিতে না পারে, তখন এতটুকু নির্দেশের পর ও এই মহান পয়গম্বর শয়তানের ধোঁকা বুঝতে পারলেন না কেন ? এটা তো প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও গোনাহ। আল্লাহর নবী ও রাসূল হয়ে তিনি এই গোনাহ্ কিভাবে করলেন ? অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পয়গম্বরগণ প্রত্যেক ছোট-বড় গোনাহ থেকেই পবিত্র থাকেন। সেসব প্রশ্নের জওয়াব সূরা বাক্বারার তাফসীরে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে প্রথমে عَصَىٰ ও পরে غَوَىٰ বলা হয়েছে। এর কারণও সূরা বাক্বারায় উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শরিয়তের আইনে হযরত আদম (আ.)-এর এই কর্ম গোনাহ ছিল না, কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহর নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই তার সামান্য ভ্রান্তিকে গুরুতর ভাষায় অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করে সতর্ক করা হয়েছে। غَوَىٰ শব্দটি

দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং (দুই)–পথভ্রষ্ট অথবা গাফেল হওয়া। কুশায়রী, কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরবিদ এস্থলে প্রথম অর্থই অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, হযরত আদম (আ.) জান্নাতে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছিলেন, তা বাকি রইল না এবং তার জীবন তিক্ত হয়ে গেল।

পয়গম্বরগণের সম্পর্কে একটি জরুরি নির্দেশ : তাদের সম্মানের হেফাজত : কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী 'আহকামুল কুরআন, গ্রন্থে عَصٰى ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। উক্তিটি তাঁর ভাষায় এই :

لَايَجُوْزُ لاَحَدِنَا الْيَوْمَ اَنْ يَخْبِرَ بِذٰلِكَ عَنْ اٰدَمَ اِلاَّ اِذَا ذَكَرْنَاهُ فِىْ اَثْنَاءِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى عَنْهُ اَوْ قَوْلِ نَبِيِّهٖ فَاَمَّا اَنْ يَّبْتَدِئَ ذٰلِكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهٖ فَلَيْسَ بِجَائِزٍ لَنَا فِىْ اٰبَائِنَا الاَدنِين اِلَيْنَا الْمُمَاثِلِيْنَ لَنَا فَكَيْفَ فِىْ اَبِيْنَا الْاَقْدَمِ الْاَعْظَمِ الْاَكْرَمِ النَّبِىِّ الْمُقَدَّمِ الَّذِىْ عَذَرَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى وَتَابَ عَلَيْهِ وَغَفَرَلَهٗ–

"আজ আমাদের কারো জন্য হযরত আদম (আ.)-কে অবাধ্য বলা জায়েজ নয়, তবে কুরআনের কোনো আয়াতে অথবা হাদীসে এরূপ বলা হলে তা বর্ণনা করা জায়েজ। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যে এরূপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সবদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চাইতে অগ্রগণ্য, সম্মানিত ও মহান, আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত পয়গম্বর, আল্লাহ যাঁর তওবা কবুল করেছেন, এবং ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তাঁর জন্য কোনো অবস্থাতেই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা জায়েজ নয়।"

একারণেই কুশায়রী আবূ নসর বলেন কুরআনে ব্যবহৃত এই শব্দের কারণে হযরত আদম (আ.)-কে গোনাহগার, পথভ্রষ্ট বলা জায়েজ নয়। কুরআন পাকের যেখানেই কোনো নবী অথবা রাসূল সম্পর্কে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের বিপরীত বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে, না হয় নবুয়ত-পূর্ববর্তী বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে, তাই কুরআনি আয়াত ও হাদীসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা করা জায়েজ কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে এমন ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি নেই। –(কুরতুবী)

اِهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا : অর্থাৎ জান্নাত থেকে নেমে যাও উভয়েই। এই সম্বোধন হযরত আদম (আ.) ও ইবলিস, উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ -এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে পৌঁছেও শয়তানের শত্রুতা অব্যাহত থাকবে। যদি বলা হয় যে, শয়তানকে তো এর পূর্বেই জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল কাজেই এই সম্বোধনে তাকে শরিক করা অবান্তর; তাহলে এটা হতে পারে যে, এখানে হযরত আদম (আ.) ও হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে; এমতাবস্থায় পারস্পরিক শত্রুতার অর্থ হবে তাদের সন্তান-সন্ততির পারস্পরিক শত্রুতা। বলাবাহুল্য, সন্তানদের পারস্পরিক শত্রুতা পিতা-মাতার জীবনকেও দুর্বিসহ করে তোলে।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ : এখানে জিকির-এর অর্থ কুরআনও হতে পারে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোবারক সত্তাও হতে পারে, যেমন- অন্য আয়াতে ذِكْرًا رَّسُوْلًا বলা হয়েছে। উভয় অর্থের সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কুরআন অথবা রাসূলের প্রতি বিমুখ হয় অর্থাৎ কুরআনের তেলাওয়াত -এর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার পরিণাম এই :

فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى : অর্থাৎ তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং কিয়ামতে তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করা হবে। প্রথমোক্ত শাস্তিটি সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে এবং শেষোক্ত আজাব কিয়ামতে হবে।

কাফের ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার স্বরূপ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, দুনিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফের ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়তো মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণগণও, এর সম্মুখীন হন; বরং পয়গম্বরগণ এই পার্থিব জীবনে সর্বাধিক কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য সব হাদীস গ্রন্থে সা'দ প্রমুখের রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : পয়গম্বরগণের প্রতি দুনিয়ার বালা-মসিবত সবচাইতে বেশি কঠিন হয়। তাদের পর যে ব্যক্তি যে স্তরের সৎকর্মপরায়ণ ও ওলী হয়, সেই অনুযায়ী সে এসব কষ্ট ভোগ করে। এর বিপরীতে সাধারণ কাফের ও পাপাচারীদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশে মত্ত দেখা যায়। অতএব জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কুরআনের এ উক্তি পরকালের জন্য হতে পারে, দুনিয়া অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়।

এর পরিষ্কার ও নির্মল জওয়াব এই যে, এখানে দুনিয়ার আজাব বলে কবরের আজাব বোঝানো হয়েছে। কবরে তাদের জীবন দুর্বিসহ করে দেওয়া হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। মুসনাদে বাযাযারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং مَعِيْشَةً ضَنْكًا -এর তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগৎ বোঝানো হয়েছে। -(মাযহারী)

হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। - (মাযহারী) এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে তাদের কাছে সুখ-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়; কিন্তু সুখ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। কারণ এটা অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

زِدْنِيْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ باب ضَرَبَ মাসদার زِيَادَةٌ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ- আপনি আমাকে বৃদ্ধি করে দিন।

لَمْ نَجِدْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وُجُوْدٌ মূলবর্ণ (و ـ ج ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ- আমি পাইনি।

لَا تَعْرٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منفى বাব سَمِعَ মাসদার عُرًى মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তুমি উলঙ্গও থাকবে না।

لَاتَظْمَؤُا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منفى بلا বাব سَمِعَ মাসদার ظَمَأٌ ও ظَمَاءٌ মূলবর্ণ (ظ ـ م ـ أ) জিনস مهموز لام অর্থ- তুমি তৃষ্ণার্তও হবে না।

لَا تَضْحٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منفى بلا বাব سَمِعَ মাসদার ضُحًى মূলবর্ণ (ض ـ ح ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তুমি রৌদ্র তপ্তও হবে না।

وَسْوَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার وَسْوَسَةٌ মূলবর্ণ (و ـ س ـ و ـ س) জিনস مضاعف رباعى অর্থ- সে কুমন্ত্রণা দিল, সে প্ররোচনা দিল।

سَوْاٰتُهُمَا : سَوْاٰتٌ ইসম। মুযাফ, هُمَا যমীর মুযাফ ইলাইহি। অর্থ– তাদের উভয়ের লজ্জাস্থান। এর একবচন سواة।

يَخْصِفَانِ : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خُصُوْفٌ মূলবর্ণ (خ ـ ص ـ ف) জিনস صحيح অর্থ- তারা উভয়ে জুড়ে দিলেন, তারা উভয়ে আবৃত করেন।

فَغَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার غَىٌّ ও غَوَايَةٌ মূলবর্ণ (غ ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- সুতরাং তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

يَأْتِيَنَّكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف بانون ثقيلة বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ-সে তোমাদের নিকট পৌঁছে।

مَعِيْشَةً : ইসম। একবচন। বহুবচন مَعَائِشُ অর্থ– জীবন, জীবিকা, জীবনোপকরণ।

فَنَسِيْتَهَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার نِسْيَانٌ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- কিন্তু তুমি তার প্রতি কোনো খেয়াল করনি, এরূপর তুমি তা ভুলে গেছ।

تُنْسٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার نِسْيَانٌ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমার প্রতিও কোনো লক্ষ্য করা হবে না, তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ : এখানে فَقُلْنَا -এর فاء আতেফা قُلْنَا হলো ফে'ল ও ফায়েল يٰاٰدَمُ হলো نداء আর اِنَّ هٰذَا الخ হলো مقول এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, আর هٰذَا হলো তার ইসম এবং عَدُوٌّ হলো তার খবর আর لَكَ হলো عَدُوٌّ -এর সিফত আর لِزَوْجِكَ হলো لَكَ এর উপর আতফ। [ই'রাবুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৩৩]

১২৭. আর তদ্রূপ ঐ ব্যক্তিকেও আমি শাস্তি দেব যে সীমাতিক্রম করে এবং নিজ প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে না; আর বাস্তবিকই পরকালের আজাব অধিক কঠোর এবং অতি দীর্ঘস্থায়ী।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿۱۲۷﴾

১২৮. এতেও কি তারা সৎপথের সন্ধান পায়নি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসস্থানসমূহ দিয়ে এরাও যাতায়াত করে থাকে; এতে তো বুদ্ধিমানদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শনাবলি রয়েছে।

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿۱۲۸﴾

১২৯. আর যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্বেই একটি কথা অবধারিত হয়ে না থাকত এবং একটি সময় নির্ধারিত না থাকত তবে আজাব অনিবার্যই হতো।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿۱۲۹﴾

১৩০. অতএব, আপনি তাদের [কুফর মিশ্রিত] বাক্যাবলির প্রতি ধৈর্যধারণ করুন এবং নিজ প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন, সূর্যোদয়ের পূর্বে [যথা ফজরের নামাজে] এবং তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে [যথা জোহর ও আছরের নামাজে], আর রাতের কতক অংশে [-ও] তাসবীহ পড়ুন এবং দিবাভাগের উভয় প্রান্তে, যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿۱۳۰﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২৭. وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ আর তদ্রূপ ঐ ব্যক্তিকে আমি শাস্তি দেব مَنْ اَسْرَفَ যে সীমাতিক্রম করে وَلَمْ يُؤْمِنْ এবং ঈমান আনে না بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ নিজ প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের প্রতি وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ আর বাস্তবিকই পরকালের আজাব اَشَدُّ অধিক কঠোর وَاَبْقٰى এবং অতি দীর্ঘস্থায়ী।

১২৮. اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ এতেও কি তারা সৎপথের সন্ধান পায়নি যে كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ যাদের বাসস্থানসমূহ দিয়ে এরাও যাতায়াত করে থাকে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এতে যথেষ্ট নিদর্শনাবলি রয়েছে لِّاُولِى النُّهٰى বুদ্ধিমানদের জন্য।

১২৯. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ আর যদি পূর্বেই একটি কথা অবধারিত হয়ে না থাকত مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে لَكَانَ لِزَامًا তবে আজাব অনিবার্যই হতো وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى এবং একটি সময় নির্ধারিত না থাকত।

১৩০. فَاصْبِرْ অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ তাদের বাক্যাবলির প্রতি وَسَبِّحْ এবং তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন بِحَمْدِ رَبِّكَ নিজ প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ সূর্যোদয়ের পূর্বে وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا এবং তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ আর রাত্রির কতক অংশে فَسَبِّحْ তাসবীহ পড়ুন وَاَطْرَافَ النَّهَارِ এবং দিবাভাগের উভয় প্রান্তে لَعَلَّكَ تَرْضٰى যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।

১৩১. আর আপনি কখনো দৃষ্টিপাত করবেন না ঐ সকল বস্তুর প্রতি যা দ্বারা আমি কাফেরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে উপভোগী করে রেখেছি, এটা শুধু পার্থিব জীবনের চাকচিক্য, তাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে; আর আপনার প্রতিপালকের দান বহুগুণে শ্রেয় এবং অধিক স্থায়ী।	وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۵ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾
১৩২. আর আপনার সংশ্লিষ্টদেরকে নামাজের আদেশ করতে থাকুন। এবং নিজেও তাতে দৃঢ়পদ থাকুন; আমি আপনার নিকট রিজিক চাই না; রিজিক তো আপনাকে আমিই দেব; আর উৎকৃষ্ট পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।	وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾
১৩৩. আর তারা বলে, ইনি আমাদের নিকট তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনো নিদর্শন কেন আনেন না? তাদের নিকট কি পৌছেনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিষয়গুলোর বিবরণ [অর্থাৎ কুরআন]?	وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾
১৩৪. আর যদি আমি কুরআনের আবির্ভাবের পূর্বেই কোনো আজাব দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম, তবে এরা এরূপ বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন পাঠাননি? তা হলে তো আমরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবার পূর্বেই আপনার আদেশ মেনে চলতাম।	وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩১. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ আর আপনি কখনো দৃষ্টিপাত করবেন না إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ঐ সকল বস্তুর প্রতি যা দ্বারা আমি উপভোগী করে রেখেছি أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ কাফেরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়েকে زَهْرَةَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا এটা শুধু পার্থিব জীবনের চাকচিক্য لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ তাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে وَرِزْقُ رَبِّكَ আর আপনার প্রতিপালকের দান خَيْرٌ বহুগুণে শ্রেয় وَأَبْقَىٰ এবং অধিক স্থায়ী।

১৩২. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ আর আপনার সংশ্লিষ্টদের নামাজের আদেশ করতে থাকুন وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا এবং নিজেও এর উপর দৃঢ়পদ থাকুন لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا আমি আপনার নিকট রিজিক চাই না نَّحْنُ نَرْزُقُكَ রিজিক তো আপনাকে আমিই দেব وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ আর উৎকৃষ্ট পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

১৩৩. وَقَالُوا আর তারা বলে لَوْلَا يَأْتِينَا ইনি আমাদের নিকট কেন আনেন না بِآيَةٍ কোনো নিদর্শন مِّن رَّبِّهِ তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে أَوَلَمْ تَأْتِهِم তাদের নিকট কি পৌছেনি بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিষয়গুলোর বিবরণ (অর্থাৎ কুরআন)।

১৩৪. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم আর যদি আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম بِعَذَابٍ কোনো আজাব দ্বারা مِّن قَبْلِهِ কুরআনের আবির্ভাবের পূর্বেই لَقَالُوا তবে এরা এরূপ বলত رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا আপনি আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন পাঠান নি فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ তাহলে তো আমরা আপনার আদেশ মেনে চলতাম مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার পূর্বেই।

১৩৫. আপনি বলে দিন, সবাই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা করতে থাক। অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে যে, কারা সরল পথে রয়েছে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে।

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩৫. قُلْ আপনি বলে দিন كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ সবাই প্রতীক্ষা করছে فَتَرَبَّصُوا সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা করতে থাক فَسَتَعْلَمُونَ অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে مَنْ أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ কারা সরল পথে রয়েছে وَمَنِ اهْتَدٰى এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى [١٣١]

শানে নুযূল : হযরত আবূ রাফে (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূল ﷺ এর নিকট কোনো একজন লোক মেহমান হয়। সুতরাং রাসূল ﷺ ইহুদি এক লোকের নিকট একজন আমাকে পাঠালেন যে, তুমি গিয়ে তাকে আমার পক্ষ থেকে বলবে যে, আমার নিকট মেহমান এসেছে তাকে আপ্যায়ন করার মতো কোনো কিছু আমার নিকট নেই। সুতরাং আমার নিকট যেন এমন পরিমাণ আটা বিক্রি করে, তা না হয় রজব চাঁদের সময় সীমার জন্য কর্জ হলেও দান করে। ইহুদি একথা শুনে বলল, কোনো বস্তু বন্ধক রাখা ব্যতিরেকে তা আমি দেব না। অতঃপর আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে সে সংবাদ করলাম। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ ! আমি আসমানে বিশ্বাসী জমিনেও বিশ্বাসী। আমাকে কর্জ দান কিংবা বাকি বিক্রি করুক আমি তো তা অবশ্যই দিয়ে দেব। আমার লৌহ বর্মটি তার নিকট রেখে তা নিয়ে আস। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। এবং জাগতিক ভোগ সম্ভারের প্রতি আকৃষ্ট না হবার প্রতিও তাতে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

–(কুরতুবী ২৩২/১১তাবারী ৪৭৯/৮, ফাতহুল কাদীর ৩৯৫/৩)

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ : يَهْدِ ক্রিয়াপদের فَاعِلْ এর ضَمِيْر- هُدًى শব্দের দিকে ফিরে, যা এর মধ্যেই আছে দ্বারা কুরআন অথবা রাসূল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআন অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মক্কাবাসীদেরকে এই হেদায়েত দেননি এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত করেননি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল নাফরমানির কারণে আল্লাহর আজাবে গ্রেফতার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, যাদের বাসভূমিতে এখন তোমরা চলাফেরা কর। এখন فَاعِلْ এর ضَمِيْر আল্লাহর দিকে ফেরারও সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দেননি।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ : মক্কাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাঁচানোর জন্য নানা রকম বাহানা খুঁজতে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। কুরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দু'টি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। এক. আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না; বরং সবর করবেন। দুই. আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যান। فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ -বাক্যে একথা বলা হয়েছে।

শত্রুদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহর স্মরণে মশগুল হওয়া : এ জগতে ছোট -বড়, ভালো-মন্দ কোনো মানুষ শত্রুমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোনো না কোনো শত্রু রয়েছে। যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোনো না কোনো ক্ষতি করেই ছাড়ে, যদিও তা মৌখিক গালি -গালাজই হয়। সম্মুখে গালি-গালাজ করার হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শত্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কুরআন পাক দু'টি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। (এক) সবর অর্থাৎ, স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া। (দুই) আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদতে মশগুল হওয়া। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ

গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্য একটি আলাদা আজাবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহর ইচছা ব্যতীত কেউ কারো কোনো রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহর সব কাজ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এতে অবশ্যই কোনো না কোনো রহস্য আছে, তখন শত্রুর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়। একারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : لَعَلَّكَ تَرْضٰى - অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন করলে আপনি সন্তুষ্টির জীবনযাপন করতে পারবেন। وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ -অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার আল্লাহর নাম নেওয়ার অথবা ইবাদত করার তাওফীক হয়, এ কাজের জন্য গর্ব ও অহংকার করার পরিবের্ত আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদত তাঁরই তাওফীক দানের ফলশ্রুতি।

এই سَبِّحْ بِحَمْدِ -শব্দটি সাধারণ জিকির ও হামদের অর্থেও হতে পারে এবং বিশেষভাবে নামাজের অর্থেও হতে পারে। তাফসীরবিদ সাধারণত শেষোক্ত অর্থই নিয়েছেন। এর যেসব নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও তাঁরা নামাজের সময় সাব্যস্ত করেছেন। উদাহরণত "সূর্যোদয়ের পূর্বে" বলে ফজরের নামাজ, "সূর্যাস্তের পূর্বে" বলে যোহর ও আসরের নামাজ এবং وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ -বলে রাত্রিকালীন সব নামাজ -মাগরিব, এশা ও তাহাজ্জুদসহ বোঝানো হয়েছে। অতঃপর وَاَطْرَافَ النَّهَارِ বলে এর আরো তাকিদ করা হয়েছে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়; বরং মুমিনের জন্যে আশঙ্কার বস্তু : وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে পথ প্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য বিবিধ নিয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না। কেননা এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা যে নিয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মুমিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

দুনিয়াতে কাফের ও পাপাচারীদের বিলাসবৈভব, ধনাঢ্যতা ও জাঁকজমক সর্বকালেই প্রত্যেকের সামনে এই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এরা যখন আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় ও লাঞ্ছিত, তখন এদের হাতে এসব নিয়ামত কেন? পক্ষান্তরে নিবেদিতপ্রাণ ঈমানদারদের দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা কেন? হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর মতো মহানুভব মনীষীর মনকেও এ প্রশ্ন দোলা দিয়েছিল। একবার রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর বিশেষ কক্ষে একান্তবাসে ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি একটি মোটা খেজুর পাতার তৈরি মাদুরে শায়িত আছেন এবং খেজুর পাতার দাগ তাঁর পবিত্র দেহে ফুটে উঠেছে। এই অসহায় দৃশ্য দেখে হযরত ওমর (রা.) কান্না রোধ করতে পারলেন না। তিনি অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, পারস্য ও রোম সম্রাটগণ এবং তাদের অমাত্যরা কেমন কেমন নিয়ামত ও সুখ ভোগ করছে। আপনি সমগ্র সৃষ্ট জীবের মধ্যে আল্লাহর মনোনীত ও প্রিয় রাসূল হয়েও আপনার এই দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, এ কেমন কথা!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– হে খাত্তাব-তনয়, তুমি এখন পর্যন্তও সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে পতিত রয়েছ? এদের ভোগ-বিলাস ও কাম্য বস্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতেই তাদেরকে দান করেছেন। পরজগতে তাদের কোনো অংশ নেই। সেখানে শুধুমাত্র আজাবই আজাব। মু'মিনদের ব্যাপার এর বিপরীত। বলা বাহুল্য, এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ পার্থিব সৌন্দর্য ও আরাম-আয়েশের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন এবং সংসারের সাথে সম্পর্কহীন জীবন পছন্দ করতেন। অথচ উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আরাম-আয়েশের সামগ্রী যোগাড় করার পূর্ণ ক্ষমতাই তাঁর ছিল। কোন সময় পরিশ্রম ও চেষ্টাচরিত্র ছাড়া ধন-সম্পদ তাঁর হাতে এসে গেলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তা ফকির-মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন এবং নিজে আগামীকল্যের জন্যও কিছু রাখতেন না। ইবনে আবী হাতেম আবূ সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন– اِنَّ اَخْوَفَ مَآ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يَفْتَحُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ের সর্বাধিক ভয় ও আশঙ্কা করি, তা হচ্ছে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য, যার দরজা তোমাদের সামনে খুলে দেওয়া হবে।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তোমাদের বিজয় অভিযান বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এবং ধনদৌলত ও বিলাস-ব্যসনের প্রাচুর্য হবে। এই পরিস্থিতি তেমন আনন্দের কথা নয়; বরং ভয় ও আশঙ্কার বিষয়। এতে লিপ্ত হয়ে তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর বিধানাবলি থেকে গাফেল হয়ে যেতে পার।

পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদেরকে নামাজের আদেশ ও তার রহস্য : وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ আপনি পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। বাহ্যত এখানে আলাদা দু'টি নির্দেশ রয়েছে। (এক) পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ এবং (দুই) নিজেও নামাজ অব্যাহত রাখা। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিজের নামাজ পুরোপুরি অব্যাহত রাখার জন্য আপনার পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও স্বজনদের নিয়মিত নামাজি হওয়া আবশ্যক। কেননা পরিবেশ ভিন্নরূপ হলে মানুষ স্বভাবত নিজেও অলসতার শিকার হয়ে যায়।

স্ত্রী, সন্তান -সন্ততি ও সম্পর্কশীল সবাই أَهْل শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এদের দ্বারাই মানুষের পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যহ ফজরের নামাজের সময় হযরত আলী ও ফাতেমা (রা.)-এর গৃহে গমন করে اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ (নামাজ পড়, নামাজ পড়) বলতেন-(কুরতুবী)

ধনকুবের ও রাজরাজাদের ধনৈশ্বর্য ও জাঁকজমকের উপর যখনই হযরত ওরওয়া ইবনে জোবায়রের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে নামাজ পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শোনাতেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.) যখন রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শোনাতেন।-(কুরতুবী)

যে ব্যক্তি নামাজ ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ তার রিজিকের ব্যাপার সহজ করে দেন : لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا- অর্থাৎ আমি আপনার কাছে এই দাবি করি না যে, আপনি নিজের ও পরিবারবর্গের রিজিক নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন। কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্বে রেখেছি। কেননা রিজিক উপার্জন করা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে বেশির থেকে বেশি মাটিকে নরম ও চাষোপযোগী করতে পারে এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে, কিন্তু বীজের ভেতর থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন করা এবং তাকে ফল -ফুলে সুশোভিত করার মধ্যে মানুষের কোনো হাত নেই। এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ। বৃক্ষ গজানোর পরও মানুষের সকল প্রচেষ্টা তার হেফাজত ও আল্লাহ কর্তৃক সৃজিত ফল-ফুল দ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা এই পরিশ্রমের বোঝাও তার জন্যে সহজ ও হালকা করে দেন।

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلَاْ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدَّ فَقْرَكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ- (اِبْنُ كَثِيْرٍ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে আদম সন্তান, তুমি একাগ্রচিত্তে আমার ইবাদত কর, আমি ধনৈশ্বর্য দ্বারা তোমার বক্ষ পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব। যদি তুমি এরূপ না করো, তবে তোমার বক্ষ চিন্তা ও কর্মব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব না (অর্থাৎ ধন-দৌলত যতই বৃদ্ধি পাবে, লোভ- লালসাও ততই বেড়ে যাবে। ফলে সর্বদা অভাবগ্রস্তই থাকবে।)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি—

مَنْ جَعَلَ هُمُوْمَهُ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِىْ اَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِىْ اَىِّ اَوْدِيَتِهِ هَلَكَ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (اِبْنُ كَثِيْرٍ)

যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে এক চিন্তা অর্থাৎ পরকালের চিন্তায় পরিণত করে আল্লাহ তা'আলা তার সংসারের চিন্তাসমূহের জন্য নিজেই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংসার চিন্তার বহুমুখী কাজে নিজেকে আবদ্ধ করে নেয়, সে এসব চিন্তার যে কোনো জটিলতায় ধ্বংস হয়ে যাক— সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা একটুকুও পরওয়া করেন না। -[ইবনে কাছীর]

بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى : অর্থাৎ তাওরাত, ইঞ্জিল ও ইবরাহীমি সহীফা ইত্যাদি খোদায়ী গ্রন্থ সর্বকালেই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ-এর নবুয়ত ও রেসালতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্যে পর্যাপ্ত প্রমাণ নয় কি?

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى অর্থাৎ আজ তো আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে মুখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার তরিকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু এই দাবি কোনো কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরিকা তাই হতে পারে, যা আল্লাহর কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহর কাছে কোনটি বিশুদ্ধ, তার সন্ধান কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে। তখন সবাই জানতে পারবে যে, কে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং কে বিশুদ্ধ ও সরল পথে ছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَجْزِيْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءً মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আমি শাস্তি দেব; আমি বদলা দেব।

مُسَمًّى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْمِيَةً মূলবর্ণ (س - م - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- নির্ধারিত।

سَبِّحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ- তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন, পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

لَا تَمُدَّنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل نهى بانون ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার مَدٌّ মূলবর্ণ (م - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তুমি প্রসারিত কর না।

لِنَفْتِنَهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف منصوب بلام كى বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنَةً মূলবর্ণ (ف - ت - ن) জিনস صحيح অর্থ- তাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, যেন আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি।

وَأْمُرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَمْرٌ মূলবর্ণ (أ - م - ر) জিনস مهموز فاء অর্থ- আপনি আদেশ করতে থাকুন।

اَنْ نَذِلَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف منصوب بان বাব ضَرَبَ মাসদার ذِلٌّ মূলবর্ণ (ذ - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আমরা অপমানিত হবার, আমরা অপমানিত হব।

نَخْزٰى : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف منصوب بان বাব ضَرَبَ মাসদার خِزْىٌ মূলবর্ণ (خ - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আমরা লাঞ্ছিত হবার।

مُتَرَبِّصٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَرَبُّصٌ মূলবর্ণ (ر - ب - ص) জিনস صحيح অর্থ- প্রতীক্ষা করছে, অপেক্ষাকারী।

اِهْتَدٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِهْتِدَاءً মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সে অবলম্বন করেছে সে সরল পথে রয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا : এখানে واو টি হলো استئنافية বা আতেফা আর أُمُرْ ফে'ল ও তার উহ্য যমীর اَنْتَ ফা'য়েল এবং اَهْلَكَ হলো মাফউলে বিহী بِالصَّلٰوةِ হলো وَأْمُرْ -এর সাথে متعلق আর وَاصْطَبِرْ হলো ফে'ল এবং তার উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল আর عَلَيْهَا টা اِصْطَبِرْ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর لَا نَسْئَلُكَ হলো جملة استئنافية আর نَسْئَلُكَ হলো ফে'ল এবং তার যমীর نَحْنُ হলো ফায়েল আর كَ হলো মাফউলে বিহী আর رِزْقًا দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। -(ই'রাবুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৪৪-৭৪৫)

পারা : ১৭

سُوْرَةُ الْاَنْبِيَآءِ مَكِّيَّةٌ

সূরা আম্বিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত–১১২, রুকূ'–৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. মানুষের জন্য তাদের হিসাবের সময় নিকটবর্তী হয়ে আসছে, অথচ তারা অসতর্কতায় বিমুখ হয়ে রয়েছে ।	اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ﴿١﴾
২. তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে নতুন উপদেশ আসে, তারা তাকে এভাবে শুনে, যেন বিদ্রূপ করছে ।	مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٢﴾
৩. তাদের অন্তর আকৃষ্ট হয় না; আর তারা অর্থাৎ জালিমরা সংগোপনে পরামর্শ করেছে যে, এই ব্যক্তি তোমাদেরই মতো শুধু একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা জাদুর কথা শ্রবণের উদ্দেশ্যে যাবে? অথচ তোমরা দেখছ ।	لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۭ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٣﴾
৪. পয়গম্বর বললেন, আমার প্রতিপালক আসমান ও জমিনের প্রত্যেক কথাই অবগত আছেন এবং তিনি অতিশয় শ্রবণকারী, অতিশয় জ্ঞানী ।	قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۡ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِقْتَرَبَ নিকটবর্তী হয়ে এসেছে لِلنَّاسِ মানুষের জন্য حِسَابُهُمْ তাদের হিসাবের সময় وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ অথচ তারা অসতর্কতায় বিমুখ হয়ে রয়েছে ।

২. مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ যে উপদেশ তাদের নিকট আসে مِّنْ رَّبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে مُّحْدَثٍ নতুন اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ তারা তাকে এভাবে শুনে وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ যেন বিদ্রূপ করছে ।

৩. لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ তাদের অন্তর আকৃষ্ট হয় না وَاَسَرُّوا النَّجْوَى আর তারা সংগোপনে পরামর্শ করেছে الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অর্থাৎ জালিমরা هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ এ ব্যক্তি তোমাদেরই মতো শুধু একজন মানুষ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ তবুও কি তোমরা জাদুর কথা শ্রবণের উদ্দেশ্যে যাবে وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ অথচ তোমরা দেখছ ।

৪. قٰلَ পয়গম্বর বললেন رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ আমার প্রতিপালক প্রত্যেক কথাই অবগত আছেন فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এবং তিনি অতিশয় শ্রবণকারী, অতিশয় জ্ঞানী ।

بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۢ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٥﴾	৫. বরং তারা এরূপ(-ও) বলেছে যে, এটা [কুরআন] অলীক কল্পনা, বরং তিনি এটা রচনা করে নিয়েছেন, বরং তিনি তো একজন কবি, তবে তাঁর উচিত আমাদের সম্মুখে এমন কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা যেরূপ পূর্ববর্তীগণকে নিদর্শনসহ রাসূল করা হয়েছিল।
مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾	৬. এদের পূর্বে যে জনপদকেই আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ঈমান আনেনি, তবে কি তারা ঈমান আনবে?
وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧﴾	৭. আর আমি আপনার পূর্বে শুধু মানুষকেই পয়গম্বর করেছি যাদের প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করতাম, অতএব, (হে অবিশ্বাসীগণ!) যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে কিতাবীদের নিকট জিজ্ঞাসা কর।
وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ﴿٨﴾	৮. আর আমি ঐ সমস্ত রাসূলের এমন দেহ সৃষ্টি করিনি যে, তাঁরা খাদ্য গ্রহণ করতেন না এবং তারা চিরস্থায়ীও হননি।
ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٩﴾	৯. অতঃপর আমি তাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলাম তা সত্যে পরিণত করেছিলাম। অর্থাৎ তাদেরকে আর যাকে যাকে আমি ইচ্ছা করেছি নাজাত দিয়েছি এবং সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ধ্বংস করেছি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. بَلْ قَالُوْٓا বরং তারা এরূপ (-ও) বলেছে اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ এটা (কুরআন) অলীক কল্পনা بَلِ افْتَرٰىهُ বরং তিনি এটা রচনা করে নিয়েছেন بَلْ هُوَ شَاعِرٌ বরং তিনি তো একজন কবি فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ তবে তাঁর উচিত আমাদের সম্মুখে এমন কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ যেরূপ পূর্ববর্তীগণকে নিদর্শনসহ রাসূল করা হয়েছিল।

৬. مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ এদের পূর্বে তারা ঈমান আনেনি مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا যে জনপদকেই আমি ধ্বংস করে দিয়েছি اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ তবে কি তারা ঈমান আনবে?

৭. وَمَآ اَرْسَلْنَا আর আমি পয়গম্বর করেছি قَبْلَكَ আপনার পূর্বে اِلَّا رِجَالًا শুধু মানুষকেই نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ যাদের প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করতাম فَسْـَٔلُوْٓا অতএব জিজ্ঞাসা করো اَهْلَ الذِّكْرِ কিতাবীদের নিকট اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ যদি তোমাদের জানা না থাকে।

৮. وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا আর আমি ঐ সমস্ত রাসূলের এমন দেহ সৃষ্টি করিনি যে لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ তারা খাদ্য গ্রহণ করতেন না وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ এবং তারা চিরস্থায়ীও হননি।

৯. ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ অতঃপর আমি তাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলাম তা সত্যে পরিণত করেছিলাম فَاَنْجَيْنٰهُمْ অর্থাৎ তাদেরকে নাজাত দিয়েছি وَمَنْ نَّشَآءُ আর যাকে যাকে আমি ইচ্ছা করেছি وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ এবং সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ধ্বংস করেছি।

১০. আমি তোমাদের প্রতি এরূপ কিতাব নাজিল করেছি যাতে তোমাদের জন্য (যথেষ্ট) উপদেশ বিদ্যমান রয়েছে; তবুও কি তোমরা বুঝ না?	لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠﴾
১১. আর আমি ধ্বংস করেছি এমন বহু জনপদকে– যার অধিবাসীরা জালিম ছিল এবং তাদের পর অপর জাতিকে সৃষ্টি করেছি।	وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. لَقَدْ اَنْزَلْنَآ আমি নাজিল করেছি اِلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি كِتٰبًا এমন কিতাব فِيْهِ ذِكْرُكُمْ যাতে তোমাদের জন্য (যথেষ্ট) উপদেশ বিদ্যমান রয়েছে اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবুও কি তোমরা বুঝ না।

১১. وَكَمْ قَصَمْنَا আর আমি ধবংস করেছি مِنْ قَرْيَةٍ এমন বহু জনপদ কে كَانَتْ ظَالِمَةً যার আধিবাসীরা জালিম ছিল وَّاَنْشَاْنَا এবং সৃষ্টি করেছি بَعْدَهَا তাদের পর قَوْمًا اٰخَرِيْنَ অপর জাতিকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আম্বিয়া প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ১১২ এবং রুকূ' ৭। এ সূরায় সতেরোজন আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ রয়েছে। এতে বিবরণ রয়েছে তাদের তাবলীগের যে, কিভাবে তাঁরা মানুষকে তাওহীদের জন্যে আহ্বান করেছেন। আর কিভাবে কাফেররা তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম কিভাবে তাদের নির্যাতন-উৎপীড়নে সবর করেছেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সফলকাম করেছেন এবং তাদের শত্রুদের পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়। এ সূরায় তাওহীদ ও রিসালাতের অনেক অকাট্য দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, এর পাশাপাশি কিয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুত এসবই হলো দীন ইসলামের মৌলিক উপাদান, যার উপর বিশ্বাস করা কল্যাণকামী প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য। এ সূরার সমস্ত আয়াত মক্কা মুয়াজ্জামায় নাজিল হয়েছে। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই।
ইবনে মারদুভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সূরাতুল আম্বিয়া মক্কা মুয়াজ্জামায় নাজিল হয়েছে।
ইমাম বুখারী, (র.) এবং ইবনে মারদুভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরা আম্বিয়া মক্কা মুয়াজ্জামায় নাজিল হয়েছে।

–[তাফসীরে আদদুররুল মানসূর ৪/৩৪৪. মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী ৪/৬০৭]

এ সূরার ফজিলত : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার হিসাব সহজ করে দেবেন।

এ সূরার আমল : যার নিদ্রা হয় না, যে বিনিদ্র রজনী কাটায়, কোনো রোগ চিন্তা বা ভয়ের কারণে এ অবস্থা হয়, হরিণের চামড়ার উপর সূরাতুল আম্বিয়া লিপিবদ্ধ করে যদি তার কোমরে বেঁধে দেওয়া হয়, তবে সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হবে।

স্বপ্নের তাবীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে সূরা আম্বিয়া পাঠ করছে, তবে সে অনেক অর্থ-সম্পদ লাভ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে নেক আমলের তাওফীক দান করবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : যারা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ হয় এবং আখেরাতের ব্যাপারে গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এরপর কাফেরদেরকে প্রদত্ত ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার তাকিদ করা হায়েছে। কেননা দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ বা ঐশ্বর্য আখেরাতের স্মরণ থেকে গাফলতের কারণ হয়। এ কারণেই এ সূরার শুরুতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে করে যারা গাফলতের মধ্যে নিপতিত রয়েছে তারা গাফলত পরিহার করে আখেরাতের চিন্তা করে, চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের হেদায়েতের উপর আমল করে জীবন-সাধনাকে সার্থক করে।

مَا اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ (٦)

শানে নুযূল : ইবনে জারীর হযরত কাতাদাহ (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কার কাফের সম্প্রদায় হযরত নবী করীম ﷺ-এর নিকট দাবি জানালো যে, আপনি যা কিছু বলেছেন, তা যদি সত্যই হয়ে থাকে, আর আমাদের ঈমান গ্রহণ করা আপনার কাছে আনন্দদায়ক হয়ে থাকে, তাহলে সাফা পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। এ মুহূর্তেই হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন যে, আপনার গোত্রবাসী যা চেয়েছে আপনি যদি চান তা হলে তাই হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, তারপরও যদি তারা ঈমান গ্রহণ না করে, তাহলে তাদেরকে আর অবকাশ দেওয়া হবে না। আপনি যদি তাদেরকে অবকাশ দিতে চান, তাহলে তাদেরকে অবকাশ দেব। রাসূল ﷺ বললেন, আমি আমার গোত্রবাসীর অবকাশ কামনা করছি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(ফাতহুল কাদীর ৩৯৯/৩)

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ (١١)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক উদ্ধৃত একটি হাদীস আল্লামা কালবীর বরাত দিয়ে ইবনে মারদুভিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হিময়ার গোত্রে আল্লাহ তা'আলা হযরত শুআইব (আ.) কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করেন। নবী তাদেরকে আল্লাহর পথে ডাকলেন। তারা তাতে ঈমান গ্রহণ করেনি বরং নবীর উপর আক্রমণ করে নবীকে হত্যা করে ফেলল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অপরাধের শাস্তি স্বরূপ বুখতেনসর নামক এক জালেম বাদশাহকে তাদের কর্তৃত্ব দান করেন। সে তাদের উপর চড়াও হয়ে তাদের সবাইকে হত্যা করে। তাদের কেউই বেঁচে থাকেনি। তদ্রূপ ইসলাম থেকে বিমুখতা অবলম্বনকারী এবং নবীর বিরুদ্ধবাদীদের পরিণতিও হবে খুব ভয়াবহ। এর প্রমাণ স্বরূপ সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(ফাতহুল কাদীর ৪০৩/৩, রূহুল মা'আনী ১৫/১৭/৯)

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ : অর্থাৎ মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়ার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কেননা এই উম্মতই হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত; যদি ব্যাপক হিসেব ধরা হয়, তবে কবরের হিসেবও এতে শামিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পরমুহূর্তেই এই হিসেব দিতে হয়। এজন্যই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার কিয়ামত বলা হয়েছে।

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ : যে ব্যক্তি মরে যায়, তার কিয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ মানুষ যত দীর্ঘায়ুই হোক, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে যখন বয়সের শেষ সীমা অজানা, তখন প্রতিমুহূর্তে ও প্রতিপদে মানুষ মৃত্যু-আশঙ্কার সম্মুখীন।

আয়াতের উদ্দেশ্য মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সব গাফেলকে সতর্ক করা; তারা যেন পার্থিব কামনা- বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসেবের দিনকে ভুলে না বসে। কেননা একে ভুলে যাওয়াই যাবতীয় অনর্থ ও গোনাহের ভিত্তি।

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ : যারা পরকাল ও কবরের আজাব থেকে গাফেল এবং তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কুরআনের কোনো নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর আল্লাহ ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে এর এ অর্থও হতে পারে যে, কুরআনের আয়াত শ্রবণ করার সময় তারা পূর্ববৎ খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে, কুরআনের প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং এরূপ অর্থও হতে পারে যে, স্বয়ং কুরআনের আয়াতের সাথেই তারা রঙ্গ-তামাশা করতে থাকে।

اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ : অর্থাৎ তারা পরস্পরে আস্তে আস্তে কানাকানি করে বলে : এই লোকটি যে নিজেকে নবী ও রাসূল বলে দাবি করে, সে তো আমাদের মতোই মানুষ-ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তার কথা মেনে নেব। তাদের সামনে আল্লাহর যে কালাম পাঠ করা হতো, তার মিষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোনো কাফেরও অস্বীকার করতে পারত না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা একে জাদু আখ্যায়িত করে লোকদেরকে বলত যে, তোমরা জান যে এটা জাদু, এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এই কথাবার্তা গোপনে বলার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মুসলমানরা শুনে ফেললে তাদের এই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ধোঁকাবাজি জনসমক্ষে ফাঁস করে দেবে।

بَلْ قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ : যেসব স্বপ্নে মানসিক অথবা শয়তানি কল্পনা শামিল থাকে, সেগুলোকে اَحْلَامٌ বলা হয়। এ কারণেই এর অনুবাদ "অলীক কল্পনা" করা হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা প্রথমে কুরআনকে জাদু বলেছে, এরপর আরো অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু করেছে যে, এটা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ও অপবাদ যে, এটা তাঁর কালাম। অবশেষে বলতে শুরু করেছে যে, আসল কথা হচ্ছে লোকটি একজন কবি। তার কালামে কবিসুলভ কল্পনা আছে।

فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ : অর্থাৎ সে বাস্তবিকই নবী ও রাসূল হলে আমাদের ফরমায়েশী বিশেষ মু'জিযাসমূহ প্রদর্শন করুক। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন : পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে দেখা গেছে যে, তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষিত মু'জিযাসমূহ

প্রদর্শন করার পরও তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। প্রার্থিত মু'জিযা দেখার পরও যে জাতি ঈমানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদেরকে আজাব দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়াই আল্লাহর আইন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে আজাবের কবল থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। তাই কাফেরদেরকে প্রার্থিত মু'জিযা প্রদর্শন করা সমুচিত নয়। অতঃপর أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ বাক্যে এদিকেই ইশারা রয়েছে যে, তারা কি প্রার্থিত মু'জিযা দেখলে বিশ্বাস স্থাপন করবে? অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে এরূপ আশা করা বৃথা। তাই প্রার্থিত মু'জিযা প্রদর্শন করা হয় না।

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ এখানে اَهْلَ الذِّكْرِ (যাদের স্মরণ আছে) বলে তাওরাত ও ইঞ্জিলের যেসব আলেম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ মানুষ ছিলেন না ফেরেশতা ছিলেন, একথা যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে তাওরাত ও ইঞ্জিলের আলেমদের কাছ থেকে জেনে নাও। কেননা তারা সবাই জানে যে, পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বর মানুষই ছিলেন। তাই এখানে اَهْلَ الذِّكْرِ দ্বারা সাধারণ কিতাবধারী ইহুদি খ্রিস্টান অর্থ নিলেও কোনো অসুবিধা নেই। কারণ তারা সবাই এ ব্যাপারের সাক্ষ্যদাতা।

মাসআলা : তাফসীরে কুরতুবীতে আছে এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরিয়তের বিধি-বিধান জানে না– এরূপ মূর্খ ব্যক্তিদের উপর আলেমদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তারা আলেমদের কাছে জিজ্ঞেসা করে তদনুযায়ী আমল করবে।

কুরআন আরবদের জন্যে সম্মান ও গৌরবের বস্তু : كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ কিতাব অর্থ কুরআন এবং জিকির অর্থ এখানে সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ভাষা আরবিতে অবতীর্ণ কুরআন তোমাদের জন্যে একটি বড় সম্মান ও চিরস্থায়ী সুখ্যাতির বস্তু। একে যথার্থ মূল্য দেওয়া তোমাদের উচিত। বিশ্ববাসী একথা প্রত্যক্ষ করেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আরবদেরকে কুরআনের বরকতে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও বিজয়ী করেছেন। জগদ্ব্যাপী তাদের সম্মান ও সুখ্যাতির ডঙ্কা বেজেছে। একথাও সবার জানা যে, এটা আরবদের কুরআনের বরকতে সম্ভব হয়েছে। কুরআন না হলে আজ সম্ভবত আরব জাতির নাম উচ্চারণকারীও কেউ থাকত না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِقْتَرَبَ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِرَابٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– নিকটবর্তী হয়ে আসছে, সে নিকটবর্তী হয়েছে।

يَلْعَبُوْنَ : সীগাহ বহছ جمع مذكر غائب مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার لِعَابٌ মূলবর্ণ (ل - ع - ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা বিদ্রূপ করছে, তারা খেলা করছে।

اَسَرُّوا : সীগাহ বহছ جمع مذكر غائب ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْرَارٌ মূলবর্ণ (س - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা সংগোপনে পরামর্শ করেছে।

اَفَتَاْتُوْنَ : সীগাহ বহছ جمع مذكر حاضر مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– তবুও কি তোমরা যাবে।

اِفْتَرٰىهُ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি এটা রচনা করে নিয়েছেন।

فَلْيَاْتِنَا : সীগাহ বহছ واحد مذكر امر غائب معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– তবে তার উচিৎ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা।

نُوْحِىْ : সীগাহ বহছ جمع متكلم مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْحَاءٌ মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– আমি ওহী প্রেরণ করতাম।

قَصَمْنَا : সীগাহ বহছ جمع متكلم ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قَصْمٌ মূলবর্ণ (ق - ص - م) জিনস صحيح অর্থ– আমি ধ্বংস করেছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ এখানে : اِقْتَرَبَ ফে'ল اِقْتَرَبَ তার لِلنَّاسِ -এর সাথে متعلق আর حِسَابُهُمْ হলো اِقْتَرَبَ-এর ফায়েল, আর وَهُمْ-এর واو টি হলো حالية আর هُمْ আর মুবতাদা এবং فِىْ غَفْلَةٍ হলো প্রথম خبر আর مُعْرِضُوْنَ হলো দ্বিতীয় খবর। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬]

অনুবাদ	আয়াত
১২. অনন্তর যখন ঐ জালিমরা আজাব আসতে দেখল, তখন তারা ঐ জনপদ হতে পলায়ন করতে লাগল।	فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. (আল্লাহ তা'আলা বলেন,) পলায়ন করো না, আর তোমরা তোমাদের সুখ-সম্পদ ও তোমাদের বাসস্থানের দিকে ফিরে চল, হয়তো তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।	لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. তারা (আজাব আসার সময়) বলতে লাগল, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! সত্যই আমরা জালিম ছিলাম।	قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤﴾
১৫. তাদের এরূপ আর্তনাদ চলতে রইল, যে পর্যন্ত না আমি তাদেরকে এরূপ (ধ্বংস) করে দিলাম, যেমন কর্তিত শস্য এবং নির্বাপিত অগ্নি।	فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ﴿١٥﴾
১৬. আর আসমান ও জমিন এবং তন্মধ্যে যা কিছু আছে তা আমি অযথা সৃষ্টি করিনি।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. যদি খেল তামাশাই আমার উদ্দেশ্য হতো, তবে বিশেষ করে আমার নিকটস্থ বস্তুকেই ক্রীড়ার উপকরণ করে নিতাম, যদি আমাকে তা করতে হতো।	لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. فَلَمَّآ اَحَسُّوْا অনন্তর যখন ঐ জালিমরা দেখল بَاْسَنَآ আজাব আসতে اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ তখন তারা ঐ জনপদ হতে পালায়ন করতে লাগল।

১৩. لَا تَرْكُضُوْا পালায়ন করো না وَارْجِعُوْٓا আর ফিরে চল اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ তোমাদের সুখ- সম্পদের দিকে وَمَسٰكِنِكُمْ ও তোমাদের বাসস্থানের দিকে لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ হয়তো তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

১৪. قَالُوْا তারা বলতে লাগল يٰوَيْلَنَآ হায় আমাদের দুর্ভাগ্য اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ সত্যই আমরা জালিম ছিলাম।

১৫. فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ তাদের এরূপ আর্তনাদ চলতে রইল حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ যে পর্যন্ত না আমি তাদেরকে এরূপ (ধ্বংস) করে দিলাম حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ যেমন– কর্তিত শস্য ও এবং নির্বাপিত অগ্নি।

১৬. وَمَا خَلَقْنَا আর আমি সৃষ্টি করিনি السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ আসমান ও জমিন وَمَا بَيْنَهُمَا এবং তন্মধ্যে যা কিছু আছে তা لٰعِبِيْنَ অযথা।

১৭. لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا যদি খেলতামাশাই আমার উদ্দেশ্য হতো لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ তবে বিশেষ করে আমার নিকটস্থ বস্তুকেই ক্রীড়ার উপকরণ করে নিতাম اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ যদি আমাকে তা করতে হতো।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

১৮. বরং আমি সত্যকে অসত্যের উপর নিক্ষেপ করি, ফলে তা (সত্য) অসত্যকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়। অতএব অসত্য তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়ে যায়, আর তোমাদের দারুণ সর্বনাশ হবে সে কথার কারণে যা তোমরা বলছ।

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

১৯. আর যারা আসমানসমূহে ও জমিনে রয়েছে সবই তাঁর; আর যারা আল্লাহর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তও হয় না।

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

২০. (বরং) তারা দিন ও রাত (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ করে, (কদাচ) বিরত হয় না।

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾

২১. তারা কি (আল্লাহ ভিন্ন) পৃথিবীর বস্তুসমূহ হতে অন্য এমন কোনো মা'বূদ সাব্যস্ত করে রেখেছে, যারা কাউকে জীবন দান করতে সক্ষম (তবে তা কেমন করে উপাস্য হতে পারে)?

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

২২. যদি আসমান ও জমিনে এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়টিই বিশৃঙ্খল হয়ে যেত।(২) সুতরাং আল্লাহ যিনি আরশের মালিক, ঐ সকল বিষয় হতে পবিত্র– যা তারা বলে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. بَلْ نَقْذِفُ বরং আমি নিক্ষেপ করি بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ সত্যকে অসত্যের উপর فَيَدْمَغُهُ ফলে তা (সত্য) অসত্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ অতএব অসত্য তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়ে যায় وَلَكُمُ الْوَيْلُ আর তোমাদের দারুণ সর্বনাশ হবে مِمَّا تَصِفُونَ সে কথার কারণে যা তোমরা বলছ।

১৯. وَلَهُ আর সবই তার مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে রয়েছে وَمَنْ عِنْدَهُ আর যারা আল্লাহর সান্নিধ্যে রয়েছে لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ তারা ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ এবং ক্লান্তও হয় না।

২০. يُسَبِّحُونَ তারা তাসবীহ পাঠ করে اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ দিন ও রাত لَا يَفْتُرُونَ (কদাচ) বিরত হয় না।

২১. أَمِ اتَّخَذُوا তারা কি সাব্যস্ত করে রেখেছে آلِهَةً অন্য এমন কোনো মা'বূদ مِنَ الْأَرْضِ পৃথিবীর বস্তুসমূহ হতে هُمْ يُنْشِرُونَ যারা কাউকে জীবন দান করতে সক্ষম।

২২. لَوْ كَانَ فِيهِمَا যদি আসমান ও জমিনে থাকত آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য لَفَسَدَتَا তবে উভয়টিই বিশৃঙ্খল হয়ে যেত فَسُبْحَانَ اللَّهِ সুতরাং আল্লাহ পবিত্র رَبِّ الْعَرْشِ যিনি আরশের মালিক عَمَّا يَصِفُونَ ঐ সকল বিষয় হতে যা তারা বলে থাকে।

২৩. তিনি যা করেন তাতে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না, পক্ষান্তরে অন্যদের নিকট প্রশ্ন তলব করা হবে।	لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. তারা কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য মা'বূদ সাব্যস্ত করে রেখেছে? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ আনয়ন কর, এ তো আমার সাথের লোকদের কিতাব (কুরআন) এবং আমার পূর্ববর্তীদেরও কিতাব (তথাপিও স্বীকার করে না); বরং তাদের অধিকাংশই এমন লোক যারা সত্যকে জানে না, সুতরাং তারা বিমুখ হয়ে থাকে।	اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. لَا يُسْـَٔلُ কেউ প্রশ্ন করতে পারেনা عَمَّا يَفْعَلُ তিনি যা করেন তাতে وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ পক্ষান্তরে অন্যদের নিকট প্রশ্ন তলব করা হবে।

২৪. اَمِ اتَّخَذُوْا তারা কি সাব্যস্ত করে রেখেছে مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً আল্লাহকে ছেড়ে অন্য মা'বূদ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ বলুন তোমরা তোমাদের প্রামাণ আনয়ন কর هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ এই তো আমার সাথের লোকদের কিতাব وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ এবং আমার পূর্ববর্তীদেরও কিতাব بَلْ اَكْثَرُهُمْ বরং তাদের অধিকাংশই এমন লোক لَا يَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ যারা সত্যকে জানে না فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ সুতরাং তারা বিমুখ হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো কোনো তাফসীরবিদদের মতে وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ الخ থেকে নিয়ে আলোচ্য আয়াতসমূহে ইয়ামেনের হাযূরা ও কালাবা জনপদসমূহকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। তার নাম এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মূসা ইবনে মিশা এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী শো'আইব বলা হয়েছে। শো'আইব নাম হলে তিনি মাদইয়ানবাসী শো'আইব (আ.) নন, অন্য কেউ। তারা আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করে এবং তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি স্বরূপ জনৈক কাফের বাদশাহ্ বুখতে নসরের হাতে ধ্বংস করে দেন। বুখতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, যেমন ফিলিস্তীনে বনী-ইসরাঈল বিপথগামী হলে তাদের উপরও বুখতে নসরকে আধিপত্য দান করে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, কুরআন কোনো বিশেষ জনপদকে নির্দিষ্ট করেনি। তাই আয়াতকে ব্যাপক অর্থেই রাখা দরকার। এর মধ্যে ইয়ামেনের উপরিউক্ত জনপদও শামিল থাকবে।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ : অর্থাৎ আমি আকাশ পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছুকে ক্রীড়া ও খেলার জন্য সৃষ্টি করিনি। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কতক জনপদকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, পৃথিবী ও আকাশ এবং এতদুভয়ের সবকিছুর সৃষ্টি যেমন বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ও উপকারিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি জনপদসমূহকে ধ্বংস করাও সাক্ষাৎ রহস্যের অধীনে ছিল। এই বিষয়বস্তুটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পৃথিবী, আকাশ ও সমগ্র সৃষ্টবস্তু সৃজনে আমার পূর্ণ শক্তি, অফুরন্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, তাওহীদ ও রিসালাতে অবিশ্বাসীরা, কি সেগুলো দেখে না ও বোঝে না অথবা তারা কি মনে করে যে, আমি এসব বস্তু অনর্থক ও ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেছি?

لَعِبِيْنَ শব্দটি لَعْب ধাতু থেকে উদ্ভূত। যে কোনো লক্ষ্যহীন কাজকে لَعْب বলা হয়। (রাগীব) যে কাজের পেছনে কোনো শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে لَهْو বলা হয়। ইসলামবিরোধীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও কুরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে এবং তাওহীদ অস্বীকার করে। প্রকৃতির এসব উজ্জ্বল নিদর্শন সত্ত্বেও তারা তাওহীদ স্বীকার করে না। সুতরাং তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে যেন দাবি করে যে, এসব বস্তু অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের জবাবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা এবং অনর্থক নয়। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যাবে সৃষ্ট জগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্টকর্মে হাজারো রহস্য লুক্কায়িত আছে। এগুলো সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তাওহীদের নীরব সাক্ষী।

কবি বলেন : ہر گیاہے کہ از زمیں روید ۞ وحدہ لا شریک لہ گوید

অর্থাৎ, মাটি থেকে উৎপন্ন প্রত্যেকটি ঘাস 'ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু' বলে থাকে।

لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ : অর্থাৎ আমি যদি ক্রীড়াচ্ছলে কোনো কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং এ কাজ আমাকে করতে হতো, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল? এ কাজ তো আমার নিকটস্থ বস্তু দ্বারাই হতে পারত।

আরবি ভাষায় لَوْ শব্দটি অবান্তর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেও لَوْ শব্দ দ্বারা বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা উর্ধ্বজগৎ ও অধঃজগতের সমস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্টবস্তুকে রঙ তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি এতটুকুও বোঝে না যে, খেলা ও রঙ তামাশার জন্যে এত বিরাট কাজ করা হয় না। একাজ যে করে, সে এভাবে করে না। আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রঙ তামাশা ও ক্রীড়ার যে কোনো কাজ কোনো ভালো বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভপর নয়-আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য তো অনেক উর্ধ্বে।

لَهْو শব্দের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুযায়ীই উপরিউক্ত তাফসীর করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : لَهْو শব্দটি কোনো সময় স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দাবি খণ্ডন করা। তারা হযরত ঈসা ও ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হতো, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই তো গ্রহণ করতে পারতাম। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ : قَذْف শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা। يَدْمَغُهٗ শব্দের অর্থ মস্তকে আঘাত করা। زَاهِق এর অর্থ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্টি জগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে, মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে।

وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ : অর্থাৎ আমার যেসব বান্দা আমার সান্নিধ্যে (অর্থাৎ ফেরেশতা) রয়েছে, তারা সদাসর্বদা বিরতিহীনভাবে আমার ইবাদতে মশগুল থাকে। তোমরা আমার ইবাদত না করলে আমার খোদায়ীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখা দিবে না। মানুষ স্বভাবত অপরকেও নিজের অবস্থার নিরিখে বিচার করে। তাই মানুষের স্থায়ী ইবাদতের পথে দুটি বিষয় অন্তরায় হতে পারে। (এক) কারো ইবাদত করাকে নিজের পদমর্যাদার পরিপন্থি মনে করা। তাই ইবাদতের কাছেই না যাওয়া। (দুই) ইবাদত করার ইচ্ছা থাকা; কিন্তু মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই স্থায়ী ও বিরামহীনভাবে ইবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের ইবাদতে এ দুটি অন্তরায় নেই। তারা ইবাদতে অহংকারও করে না যে, ইবাদতকে পদমর্যাদার খেলাফ মনে করবে এবং ইবাদতে কোনো সময় ক্লান্তও হয় না। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ অর্থাৎ ফেরেশতারা রাত দিন তাসবীহ্ পাঠ করে এবং কোনো সময় অলসতা করেন না।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারিস বলেন : আমি কা'বে আহ্বারকে প্রশ্ন করলাম : তাসবীহ্ পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোনো কাজ নেই? যদি থাকে, তবে অন্য কাজের সাথে সদাসর্বদা তাসবীহ্ পাঠ করা কিভাবে সম্ভবপর হয়? কা'ব বলেন : প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার কোনো কাজ ও বৃত্তি তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি? সত্য এই যে, ফেরেশতাদের তাসবীহ্ পাঠ করা এমন, যেমন-আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও পলক ফেলা । এ দু'টি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোনো কাজে অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না । -(কুরতুবী, বাহ্রে মুহীত)

أَمِ اتَّخَذُوٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ : এতে মুশরিকদের অর্বাচীনতা কয়েকভাবে প্রকাশ করা হায়েছে। (এক) তারা কেমন নির্বাধ যে, উপাস্য করতে গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃষ্টজীবকেই উপাস্য করেছে। এটা তো উর্ধ্ব জগতের ও আকাশের সৃষ্টজীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্টও হয়। (দুই) যাদেরকে উপাস্য করেছে, তারা কি তাদেরকে কোনো সময় কাউকে জীবিত করতে ও প্রাণদান করতে দেখেছে। সৃষ্টজীবের জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়ত্ত থাকা একান্ত জরুরি।

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ : এটা তাওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিগত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে উল্লিখিত রয়েছে। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই খোদা থাকলে উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলি পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সেই নির্দেশই দেবে, একজন যা পছন্দ করবে, অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন দুই খোদার নির্দেশাবলি পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপে হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক খোদা চাইবে যে, এখন দিন হোক, অপর খোদা চাইবে এখন রাত্রি হোক। একজন চাইবে বৃষ্টি হোক, অন্যজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় উভয়ের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ কিরূপে প্রযোজ্য হবে। যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও আল্লাহ থাকতে পারবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় আল্লাহ পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? এর বিভিন্ন উত্তর কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনে নেওয়া যায় যে, যদি উভয়ই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরি হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। বলাবাহুল্য, স্বয়ং সম্পূর্ণ না হয়ে খোদা হওয়া যায় না। সম্ভবত পরবর্তী لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ আয়াতেও এদিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোনো আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় যোগ্য, সে আল্লাহ হতে পারে না। আল্লাহ তিনিই হবেন, যিনি কারো অধীন নন, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারো নেই। পরামর্শের অধীন দুই আল্লাহ থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা আল্লাহর পদমর্যাদার নিশ্চিত পরিপন্থি।

هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ : এর এক অর্থ হলো এই যে, ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ বলে কুরআন এবং ذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ বলে তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবূর ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের কুরআন এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনো কিতাবে কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে? তাওরাত ও ইঞ্জিলের পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ কর। বাহরে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কুরআন আমার সঙ্গীদের জন্যও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যও। উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীদের জন্য তা দাওয়াত ও বিধানাবলি ব্যাখ্যার দিক দিয়ে উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্য এই দিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের অবস্থা, কাজকারবার ও কিস্সা কাহিনী জীবিত আছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَحَسُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْسَاسٌ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– জালিমরা দেখল। অনুভব করল।

يَرْكُضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَكْضٌ মূলবর্ণ (ر ـ ك ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– তারা পলায়ন করতে লাগল।

اُتْرِفْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتْرَافٌ মূলবর্ণ (ت ـ ر ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের সুখ সম্পদ, তোমাদেরকে সুখ দান করা হয়েছে।

تُسْئَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার سُوَالٌ মূলবর্ণ (س ـ أ ـ ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

فَمَا زَالَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার زَيْلٌ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– চলতে রইল, অব্যাহত থাকল।

خَامِدِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার خُمُوْدٌ মূলবর্ণ (خ ـ م ـ د) জিনস صحيحঅর্থ– নির্বাপিত অগ্নি।

اَنْ نَّتَّخِذَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমরা গ্রহণ করতাম।

فَيَدْمَغُهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার دَمْغٌ মূলবর্ণ (د ـ م ـ غ) জিনস صحيح অর্থ– ফলে তা (সত্য) অসত্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।

زَاهِقٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার زَهْقٌ মূলবর্ণ (ز ـ ه ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– অসত্য তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِحْسَارٌ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ ر) জিনস صحيح অর্থ তারা ক্লান্তও হয় না।

يَصِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَصْفٌ ও صِفَةٌ মূলবর্ণ (و ـ ص ـ ف) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা বলে থাকে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ : এখানে لا يُسْئَلُ হলো ফে'লে মাজহুল লুক্কায়িত উহ্য যমীর هُوَ হলো নায়েবে ফায়েল, আর عَمَّا হলো يُسْئَلُ-এর সাথে متعلق আর وَهُمْ-এর واو টি আতেফা অথবা حالية আর هُمْ হলো মুবতাদা আর يُسْئَلُوْنَ পুরা বাক্য হলো খবর। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯]

২৫. আর আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তার প্রতি আমি এই ওহীই নাজিল করেছি যে, আমি ভিন্ন আর কোনো মা'বূদ নেই। অতএব, তোমরা আমারই ইবাদত করতে থাক।	وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾
২৬. আর এই মুশরিকরা বলে যে, আল্লাহ (ফেরেশতাগণকে) সন্তান (রূপে) গ্রহণ করেছেন, (তওবা তওবা) তিনি পবিত্র মহান; বরং (তারা) সম্মানিত বান্দা।	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. তারা আল্লাহর আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তাঁরই আদেশানুযায়ী কাজ করে থাকে।	لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা'আলা সব অবগত আছেন; আর তারা ঐ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারো জন্য সুপারিশ করতে পারে না– যার জন্য আল্লাহ তা'আলার মর্জি হয়, আর তারা আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. আর তাদের মধ্যকার যেই ব্যক্তি এরূপ বলে যে, আল্লাহ ব্যতীত আমিও একজন উপাস্য, তবে আমি তাকে দোজখের শাস্তি প্রদান করব; আমি এমনিভাবে জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।	وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ ع ٢

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ আর আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ তার প্রতি আমি এই ওহীই নাজিল করেছি যে اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا আমি ভিন্ন আর কোনো মা'বূদ নেই فَاعْبُدُوْنِ অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করতে থাক।

২৬. وَقَالُوا আর এই মুশরিকরা বলে যে اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন سُبْحٰنَهٗ তিনি পবিত্র মহান بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ বরং (তাঁরা) সম্মানিত বান্দা।

২৭. لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ তারা আল্লাহর আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ এবং তারা তারই আদেশানুযায়ী কাজ করে থাকে

২৮. يَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা সব অবগত আছেন مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى আর তারা ঐ ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো জন্য সুপারিশ করতে পারে না যার জন্য আল্লাহ তা'আলার মর্জি وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ আর তারা আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

২৯. وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ আর তাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি এরূপ বলে اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ আল্লাহ ব্যতীত আমিও একজন উপাস্য فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ তবে আমি তাকে দোজখের শাস্তি প্রদান করব كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ আমি এমনিভাবে জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

৩০. কাফেররা কি জানে না যে, আসমান ও জমিন (প্রথমে) বন্ধ ছিল (বৃষ্টি বর্ষাত না, উদ্ভিদ গজাত না), অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিয়েছি, এবং আমি (বৃষ্টির) পানি দ্বারা প্রত্যেক প্রাণবাণ বস্তুকে সৃষ্টি করেছি; তবুও কি তারা ঈমান আনে না?	أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾
৩১. আর জমিনের উপর এই জন্য পর্বতসমূহ সৃষ্টি করেছি, যেন জমিন তাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে, আর আমি এতে প্রশস্ত রাস্তাসমূহ সৃষ্টি করেছি, যেন তারা গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারে।	وَجَعَلْنَا فِى الْأَرْضِ رَوٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾
৩২. আর আমি আসমানকে এমন একটি ছাদরূপে সৃষ্টি করেছি যা সুরক্ষিত, আর তারা এর নিদর্শনসমূহ হতে বিমুখ হয়ে থাকছে।	وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আর তিনি এমন (ক্ষমতাবান) যিনি রাত্র ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন; (আর সূর্য ও চন্দ্রের) প্রত্যেকটি নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতার কাটছে (বিচরণ করছে)।	وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আর আমি আপনার পূর্বে কোনো মানুষের জন্য চিরস্থায়ী হয়ে থাকা সাব্যস্ত করিনি; অতঃপর যদি আপনার মৃত্যু ঘটে, তবে এরা কি অনন্তকাল বেঁচে থাকবে?	وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِي۟ن مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُونَ ﴿٣٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا কাফেররা কি জানে না যে أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ আসমান ও জমিন كَانَتَا رَتْقًا বন্ধ ছিল فَفَتَقْنٰهُمَا অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিয়েছি وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ এবং আমি পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছি كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ প্রত্যেক প্রাণবান বস্তুকে أَفَلَا يُؤْمِنُونَ তবুও কি তারা ঈমান আনে না।

৩১. وَجَعَلْنَا আর সৃষ্টি করেছি فِى الْأَرْضِ জমিনের উপর رَوٰسِىَ পর্বতসমূহ أَن تَمِيدَ بِهِمْ এই জন্য যেন জমিন তাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে وَجَعَلْنَا فِيهَا আর আমি এতে সৃষ্টি করেছি فِجَاجًا سُبُلًا প্রশস্ত রাস্তাসমূহ لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ যেন তারা গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারে।

৩২. وَجَعَلْنَا, আর আমি সৃষ্টি করেছি السَّمَآءَ আসমানকে سَقْفًا এমন একটি ছাদরূপে مَّحْفُوظًا যা সুরক্ষিত وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا আর এরা তার নিদর্শনসমূহ হতে مُعْرِضُونَ বিমুখ হয়ে থাকছে।

৩৩. وَهُوَ الَّذِى তিনি এমন যিনি خَلَقَ সৃষ্টি করেছেন الَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্র ও দিবস وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে كُلٌّ فِى فَلَكٍ প্রত্যেকটি নিজ নিজ কক্ষপথে يَسْبَحُونَ সাঁতার কাটছে।

৩৪. وَمَا جَعَلْنَا, আর আমি সাব্যস্ত করিনি لِبَشَرٍ কোনো মানুষের জন্য مِّن قَبْلِكَ আপনার পূর্বেও الْخُلْدَ চিরস্থায়ী হয়ে থাকা أَفَإِي۟ن مِّتَّ অতঃপর যদি আপনার মৃত্যু ঘটে فَهُمُ الْخٰلِدُونَ তবে কি এরা অনন্তকাল বেঁচে থাকবে।

৩৫. প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর আমি তোমাদেরকে ভালো-মন্দ অবস্থা দ্বারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করে থাকি; এবং তোমরা সকলে আমার সমীপেই ফিরে আসবে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ؕ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৫. كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً আর আমি তোমাদেরকে ভালো-মন্দ অবস্থা দ্বারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করে থাকি وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ এবং তোমরা সকলে আমার সমীপেই ফিরে আসবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ (٢٦)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত বনূ খুযাআদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বনূ খুযাআ বাসীদের আকীদা বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতা যারা, তারা হলো আল্লাহর কন্যা সন্তান (নাউযুবিল্লাহ)। ফেরেশতারা তাদের সুপারিশ করবেন এ প্রত্যাশা নিয়ে তারা ফেরেশতাদের উপাসনা করত। আল্লাহ তা'আলা নিজ সত্তার শিরক থেকে সম্পূর্ণ পূতপবিত্রতা বর্ণনা করে তাদের ভ্রান্ত আকীদার অলীক ও বাতুলতা বর্ণনা করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৪৭/১১, বাহরে মুহীত্ব ২৮৫/৬]

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَاِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ (٣٤)

শানে নুযূল :

ক. আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে। কারো মতে, কোনো কোনো মুসলমানের ধারণা ছিল যে, নবী করীম ﷺ কখানো ইন্তেকাল করবেন না। তিনি হলেন চিরঞ্জীব। তাদের এ ধারণা প্রত্যাখান করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

খ. আবার কারোও মতে, মক্কার কাফের সম্প্রদায় রাসূল ﷺ-এর প্রতি অভিযোগ আরোপ করে বলত যে, তিনি একজন মানুষ, আহার করেন আবার মৃত্যুবরণও করবেন। সুতরাং তাঁর রিসালাত স্থায়ী হবে কিভাবে!

গ. আল্লামা যমখশরী (র.) বলেন যে, তারা পরস্পরকে বলত যে, মুহাম্মদ ﷺ তো শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করবেন। তখন তোমরা নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। কারণ রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালে তাঁর ধর্ম প্রচার থেমে যাবে। তাদের এধারণার ভ্রান্তা প্রকাশ করত আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল –[কুরতুবী ২৫২/১১, বাহরে মুহীত্ব ২৮৮/৬, রূহুল মা'আনী ৪৪/৯/১৭]

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ : অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহর সামনে এমন ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেড়ে কোনো কথাও বলে না এবং তাঁর আদেশের খেলাফ কখনো কোনো কাজও করে না। কথায় আগে না বাড়ার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো কথা না বলা হয়, তাঁরা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না। এ থেকে আরো জানা গেল যে, মজলিসে বসে প্রথমেই কথা বলা উচিত নয়; বরং যে ব্যক্তি মজলিসের প্রধান, তার কথার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। প্রথমেই অন্যের কথা বলা শিষ্টাচারের পরিপন্থি।

اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : এখানে رؤيت (দেখা) অর্থ জানা, চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা এরপর যে বিষয়বস্তু আসছে, তার সম্পর্ক কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে।

اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا : رَتْق শব্দের অর্থ বন্ধ হওয়া এবং فَتْق এর অর্থ খুলে দেওয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি فَتْق ও رَتْق কোনো কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতের তরজমা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি। এখানে 'বন্ধ হওয়া' ও 'খুলে দেওয়ার' অর্থ কি– এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ও সাধারণ তাফসীরবিদগণে যে উক্তি গ্রহণ করেছেন, হলো অর্থাৎ বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেওয়ার অর্থ এতদুভয়কে খুলে দেওয়া।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দিকে ইশারা করে বললেন, এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে যেয়ো। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে পৌঁছে বলল যে, আয়াতে উল্লিখিত رَتْقًا ও فَفَتَقْنَا বলে কি বোঝানো হয়েছে? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, পূর্বে আকাশ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বর্ষণ করত না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ, তরুলতা ইত্যাদি অঙ্কুরিত হতো না। আল্লাহ তা'আলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এ তাফসীর জেনে নিয়ে হযরত ইবনে ওমরের কাছে গেল। হযরত ইবনে ওমর (রা.) এ তাফসীর শুনে বললেন, এখন আমি পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হলাম যে, বাস্তবিকই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে কুরআনের ব্যুৎপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পছন্দ করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কুরআনের বিশেষ রুচিজ্ঞান দান করেছেন। তিনি رَتْق ও فَتْق-এর নির্ভুল তাফসীর করেছেন।

রূহুল মা'আনীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ রেওয়ায়েতটি ইবনে মুনজির, আবূ নু'আয়ম ও একদল হাদীসবিদদের বরাত দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুস্তাদরাক প্রণেতা হাকেমও আছেন। হাকেম এই রেওয়ায়েতকে সহীহ্ বলেছেন। ইবনে আতিয়্যা আওফী এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন : এই তফসীরটি চমৎকার, সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সঙ্গতিশীল। এতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও প্রমাণ রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত এবং পূর্ণ শক্তির প্রকাশও রয়েছে, যা তত্ত্বজ্ঞান ও তাওহীদের ভিত্তি। পরবর্তী আয়াতে যে وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ বলা হয়েছে, এর সাথে উপরিউক্ত তাফসীরের দিক দিয়েই মিল আছে। বাহরে মুহীতেও এই তাফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। কুরতুবী একে ইকরামার উক্তিও সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, অপর একটি আয়াত থেকেও এই তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ তাবারীও এই তাফসীর গ্রহণ করেছেন।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ : অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাওয়ালা নয়; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত আছে। এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম।

ইবনে কাছীর ইমাম আহমদের সনদ দ্বারা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলাম' "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তুর সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।" জবাবে তিনি বললেন : "প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে।"

এরপর আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন : "আমাকে এমন কাজ বলে দিন, যা করে আমি জান্নাতে পৌঁছতে পারি। তিনি বললেন,

أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ وَصِلِ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ أُدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

অর্থাৎ ব্যাপকহারে সালাম কর (যদিও প্রতিপক্ষ অপরিচিত হয়), আহার করাও (হাদীসে একেও ব্যাপক রাখা হয়েছে। কাফের ফাসেক প্রত্যেককে আহার করালেও ছওয়াব পাওয়া যাবে।) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। রাত্রে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে, তখন তুমি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়। এরূপ করলে তুমি নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ : আরবি ভাষায় অস্থির নড়াচড়াকে مَيْدٌ বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির ভাবে নড়াচড়া না করে। পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হতো। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কি, এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তাফসীরে কাবীর প্রভৃতি গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ দেখে নিতে পারেন। তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে সূরা নামলের তাফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)ও এ সম্পর্কে জরুরি আলোচনা করেছেন।

كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ : প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকে فَلَكٌ বলা হয়। এ কারণেই সুতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে فَلْكَةُ الْمِغْزَلِ বলা হয়। (রূহুল মা'আনী) এবং এ কারণেই আকাশকেও فَلَكٌ বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বোঝানো হয়েছে। কুরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা হয়নি যে, এই কক্ষপথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শূন্যে। মহাশূন্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কক্ষপথগুলো আকাশ থেকে অনেক নীচে মহাশূন্যে অবস্থিত।

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরো জানা যায় যে, সূর্যও একটি কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার করলেও বর্তমানে তারাও এর প্রবক্তা হয়ে গেছেন। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে কাফের ও মুশরিকদের বিভিন্ন দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের দাবিসমূহের মধ্যে ছিল হযরত ঈসা (আ.) অথবা ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহ্‌র অংশীদার অথবা ফেরেশতা ও হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর সন্তান বলা। এই খণ্ডনের কোনো জবাব তাদের কাছে ছিল না। সাধারণত দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলশ্রুতিতেই মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দ্রুত মৃত্যু-কামনা করত; যেমন কোনো কোনো আয়াতে আছে نَتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ (আমরা তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই অনর্থক কামনার দু'টি জবাব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রাসূল যদি শীঘ্রই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে? তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তাঁর ওফাত হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও রাসূল নয়, রাসূল হলে মৃত্যু হতো না; তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব নবীর নবুয়ত স্বীকার কর, তাঁরা কি মৃত্যুবরণ করেননি?

তাঁদের মৃত্যুর কারণে যখন তাঁদের নবুয়ত ও রিসালাতে কোনো ত্রুটি দেখা দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা কিরূপে করা যায়? পক্ষান্তরে যদি তাঁর শীঘ্র মৃত্যু দ্বারা তোমরা তোমাদের ক্রোধ ঠাণ্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখো, তোমরাও এই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকেও মরতে হবে। কাজেই কারো মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে? اگر بمرد عدو جائے شادمانی نیست * کہ زندگانی ما نیز جاودانی نیست

(শত্রু মারা গেলে খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আমাদের জীবনও অমর নয়।)

মৃত্যু কি? এরপর বলা হয়েছে كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক نَفْس বলে পৃথিবীস্থ জীব বোঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে কি-না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মানুষসহ মর্ত্যের সব জীব এবং ফেরেশতাসহ সব স্বর্গীয় জীব এক মুহূর্তের জন্য হলেও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন, ফেরেশতা এবং জান্নাতের হুর ও গেলমান মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত। –(রূহুল-মা'আনী) আলেমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়্যেম আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশতটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। –[রূহুল-মা'আনী]

ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ শব্দে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর বিশেষ কষ্ট অনুভব করবে। কেননা স্বাদ আস্বাদন করার বাকপদ্ধতিটি এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলাবাহুল্য, দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক, তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার সময় কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং মহান প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের কথা ভেবে কোনো কোনো আল্লাহ্ ওয়ালা মৃত্যুতে যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। এই আনন্দ দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদজনিত স্বাভাবিক কষ্টের পরিপন্থি নয়। কারণ কোনো বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্য ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। এই অর্থের দিক দিয়েই কোনো কোনো আল্লাহ ওয়ালা সংসারের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদকেও প্রিয় প্রতিপন্ন করেছেন। বলা হয়েছে از محبت تلخہا شیریں شود –[ভালোবাসার কারণে তিক্তও মিষ্ট হয়ে যায়।]

মাওলানা রূমী (র.) বলেন–

غم چہ استادہ تو بردر ما * اندر آ یار ما برادر ما
رنج راحت شد چو مطلب شد بزرگ * گرد گلہ توتیائے چشم گرگ

দুনিয়ার প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষা :

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً : অর্থাৎ আমি মন্দ ও ভালো উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। মন্দ বলে প্রত্যেক স্বভাববিরুদ্ধ বিষয় যেমন অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং ভালো বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এ নশ্বর ভুবনে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার জন্য সামনে আসে। স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়ে সবর করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয় শোকর করে তার হক আদায় করতে হবে। পরীক্ষা এই যে, কে এতে দৃঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, তা দেখা। বুযুর্গগণ বলেন : বিপদাপদে সবর করার তুলনায় বিলাস-ব্যসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকা অধিক কঠিন। তাই হযরত ওমর (রা.) বলেন : بُلِينَا بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا وَبُلِينَا بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ অর্থাৎ আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবর করলাম, কিন্তু যখন সুখ ও আরাম-আয়েশে লিপ্ত হলাম, তখন সবর করতে পারলাম না। অর্থাৎ এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُكْرَمُونَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِكْرَامٌ মূলবর্ণ (ك - ر - م) জিনস صحيح অর্থ– সম্মানিত।

اِرْتَضٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِضَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ض - و) জিনস ناقص يائى অর্থ– মর্জি হয়, সে সন্তুষ্ট হয়।

مُشْفِقُونَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِشْفَاقٌ মূলবর্ণ (ش - ف - ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা সন্ত্রস্ত থাকে।

نَجْزِيْهِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তবে আমি তাকে শাস্তি প্রদান করব।

اَوَلَمْ يَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– সে কি জানে না।

اَنْ تَمِيْدَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَيْدٌ ও مَيَدَانٌ মূলবর্ণ (م - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ– যেন জমিন হেলে না পড়ে।

يَسْبَحُونَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার سَبْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– তারা সাঁতার কাটছে।

نَبْلُوكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার بَلَاءٌ মূলবর্ণ (ب - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি।

تُرْجَعُونَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার رُجُوعٌ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সকলে ফিরে আসবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ : এখানে وَجَعَلْنَا এর واو হরফে আতফ আর جَعَلْنَا ফে'ল ও ফায়েল, আর فِيْهَا হলো جعلنا বা مفعول ثانى -এর সাথে متعلق আর فِجَاجًا হলো حال কেননা এটা سُبُلًا - এর সিফত যা তার উপর مقدم হয়েছে। আর سُبُلًا হলো مفعول به আর لَعَلَّهُمْ -এর لَعَلَّ হরফে মুশববাহ বিল ফে'ল আর هُمْ হলো لَعَلَّ এর اسم আর يَهْتَدُونَ বাক্য হলো خبر لعل । –[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭]

৩৬. আর এই কাফেররা যখনই আপনাকে দেখতে পায়, তখনই আপনাকে লক্ষ্য করে হাসি-ঠাট্টা করতে থাকে; (এবং বলাবলি করে যে,) ইনিই কি তিনি যিনি তোমাদের দেবতাদের সমালোচনা করে থাকেন, অথচ এরাই আল্লাহর স্মরণ করার ব্যাপারে অস্বীকার করে থাকে।	وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾
৩৭. মানুষ ত্বরা (প্রকৃতি) দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে; শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাব, সুতরাং তোমরা [আমার নিকট] ত্বরা করো না।	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর এরা বলে যে, এই প্রতিশ্রুতি কখন আসবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তবে অপেক্ষা কিসের?)।	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾
৩৯. যদি এই কাফেররা সেই সময়টি সম্বন্ধে অবগত হতো, যখন তারা অগ্নিকে তাদের সম্মুখ দিক হতেও ঠেকাতে পারবে না আর পিছন হতেও না, আর কেউ তাদের সহায়তাও করবে না।	لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٣٩﴾
৪০. বরং সেই অগ্নি অকস্মাৎ এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে, তখন তাদেরকে হতবুদ্ধি করে ফেলবে, অতঃপর তাকে এড়াতেও সক্ষম হবে না, আর না তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে।	بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا আর এই কাফেররা যখনই আপনাকে দেখতে পায় إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا তখনই তারা আপনাকে লক্ষ্য করে হাসি ঠাট্টা করতে থাকে أَهَٰذَا الَّذِي ইনিই কি তিনি يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ যিনি তোমাদের দেবতাদের সমালোচনা করে থাকেন وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ অথচ এরাই আল্লাহর স্মরণ করার ব্যাপারে অস্বীকার করে থাকে।

৩৭. خُلِقَ الْإِنْسَانُ মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে مِنْ عَجَلٍ ত্বরা (প্রকৃতি) দ্বারা سَأُرِيكُمْ শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব آيَاتِي আমার নিদর্শনসমূহ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ সুতরাং তোমরা [আমার নিকট] ত্বরা করো না।

৩৮. وَيَقُولُونَ আর এরা বলে যে مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ এই প্রতিশ্রুতি কখন আসবে إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩৯. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا যদি এই কাফেররা সেই সময়টি সম্বন্ধে অবগত হতো حِينَ لَا يَكُفُّونَ যখন তারা ঠেকাতে পারবে না عَنْ وُجُوهِهِمْ তাদের সম্মুখ দিক হতেও النَّارَ অগ্নিকে وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ আর পিছন হতেও না وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ আর কেউ তাদের সহায়তাও করবে না।

৪০. بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً বরং সে অগ্নি অকস্মাৎ এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে فَتَبْهَتُهُمْ তখন তাদেরকে হতবুদ্ধি করে ফেলবে فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا অতঃপর তাকে এড়াতেও সক্ষম হবে না وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ আর না তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. আর আপনার পূর্বে যে সমস্ত নবী অতীত হয়েছেন, তাদের সাথেও বিদ্রূপ করা হয়েছিল, ফলে যারা তাদের সাথে বিদ্রূপ করেছিল, তাদের উপর ঐ শাস্তি নিপতিত হয়েছিল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত।

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. বলে দিন, সে কে যে তোমাদের কে রক্ষা করে রাত্রিকালে ও দিবাভাগে আল্লাহ (-এর শাস্তি) হতে? বরং তারা (এখনও) নিজ প্রতিপালকের জিকির হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তাদের নিকট কি আমি ভিন্ন এমন আরো উপাস্য আছে যারা (আমার আজাব হতে) তাদেরকে রক্ষা করে? তারা নিজেরাই নিজেদের হেফাজতের ক্ষমতা রাখে না, আর না আমার বিরুদ্ধে কেউ তাদের সঙ্গ দিতে পারে।

بَلْ مَتَّعْنَا هٰۤؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. বস্তুত আমিই তাদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে প্রচুর (পার্থিব) সম্পদ দিয়েছি, এমন কি (এই অবস্থায়) তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেল, তারা কি এটা দেখছে না যে, আমি (তাদের) জমিনকে তার চতুর্দিক হতে সঙ্কীর্ণ করে আনছি; তবুও কি এরা (আশা করে যে) জয়ী হবে?

قُلْ اِنَّمَاۤ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. আপনি বলে দিন, আমি তো শুধু ওহীর সাহায্যে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি, আর এই বধিরদেরকে যখন ভয় প্রদর্শন করা হয়, তখন এরা শুনেই না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ আর আপনার পূর্বে যে সমস্ত নবী অতীত হয়েছেন তাদের সাথেও বিদ্রূপ করা হয়েছিল فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ ফলে তাদের সাথে যারা বিদ্রূপ করেছিল তাদের উপর নিপতিত হয়েছিল مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ঐ শাস্তি যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত।

৪২. قُلْ বলে দিন مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ সে কে যে তোমাদেরকে রক্ষা করে بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ রাত্রিকালে ও দিবাভাগে مِنَ الرَّحْمٰنِ আল্লাহ (-এর শাস্তি) হতে بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ বরং তারা (এখনও) নিজ প্রতিপালকের জিকির হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

৪৩. اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ তাদের নিকট কি এমন আরও উপাস্য আছে تَمْنَعُهُمْ যারা তাদেরকে রক্ষা করে مِّنْ دُوْنِنَا আমি ভিন্ন لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ তারা নিজেরাই ক্ষমতা রাখেনা نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ নিজেদের হেফাজতের وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ আর না আমার বিরুদ্ধে কেউ তার সঙ্গ দিতে পারে।

৪৪. بَلْ مَتَّعْنَا বরং আমি প্রচুর (পার্থিব) সম্পদ দিয়েছি هٰۤؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ তাদেরকে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ এমনকি তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেল اَفَلَا يَرَوْنَ তারা কি এটা দেখছে না যে اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ আমি জমিনকে আনছি نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا তার চতুর্দিক হতে সঙ্কীর্ণ করে اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ তবুও কি এরা (আশা করে যে) জয়ী হবে?

৪৫. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَاۤ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ আমি তো শুধু ওহীর সাহায্যে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি, وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ আর এই বধিরদেরকে যখন ভয় প্রদর্শন করা হয় তখন এরা শুনেই না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ إِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كَافِرُوْنَ (٣٦)

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ একদা আবূ সুফিয়ান ও আবূ জাহলের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন তারা দুজনে গল্প-গুজবে লিপ্ত ছিল। এরই মধ্যে আবূ জাহল রাসূল ﷺ-কে দেখে হেঁসে দিয়ে আবূ সুফিয়ানকে বলল যে, এ ব্যক্তিই তো আব্দে মানাফের নবী। তাতে আবূ সুফিয়ান ক্রোধান্বিত হয়ে বলল যে, বনু আব্দে মানাফ হতে নবী হলে তোমাদের এত অপছন্দের কারণ কেন? রাসূল ﷺ তা শোনতে পেয়ে আবূ জাহলের দিকে ফিরে আসেন। এতে করে আবূ জাহলের মনের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়। রাসূল ﷺ আবূ জাহলকে লক্ষ্য করে বললেন যে, তোমার চাচা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার উপর যে ধ্বংস এসেছে সে ধ্বংস তোমার উপর যতক্ষণ পর্যন্ত না আপতিত হবে তুমি তা থেকে বিরত হবে না। আবূ সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে আরো বললেন যে, তুমি যা বলছ তা মূলত ক্রোধবশত। পক্ষান্তরে এ ক্রোধের কারণেই অন্তর বিগলিত হচ্ছে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী পৃ. ৪৮ খণ্ড ৯ পারা ১৭, বাহরে মুহীত্ব ২৮৯/৬, ফাতহুল কাদীর ৪০৯]।

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ (٣٧)

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে, আলোচ্য আয়াত নযর ইবনে হারেছ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। নযর ইবনে হারেছ নিজের ধ্বংস কামনা করে বলেছিল যে, হে আল্লাহ! নবী দাবিদার মুহাম্মাদের কথা যদি সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমার উপর পাথর বর্ষণ কর। তার দ্রুত ধ্বংস কামনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ৪০৮/৩ রূহুল মা'আনী পৃ. ৪৯ খণ্ড ৯ পারা ১৭ জালালাইন ২৭২]

ত্বরা প্রবণতা নিন্দনীয় : خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ : عَجَلٌ শব্দের অর্থ ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোনো কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কুরআন পাকের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلًا -অর্থাৎ মানুষ অত্যন্ত ত্বরাপ্রবণ। হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে তূর পর্বতে পৌছে যান, তখন সেখানেও এই ত্বরাপ্রবণতার কারণে তাঁর প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়। পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণদের সম্পর্কে "ভালো কাজে অগ্রগামী থাকাকে" প্রশংসনীয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এটা ত্বরা-প্রবণতা নয়। কারণ, এটা সময়ের পূর্বে কোনো কাজ করা নয়; বরং এ হচ্ছে সময়ে অধিক সৎ ও পুণ্যকাজ করার চেষ্টা। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জায় যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্বরা-প্রবণতা। স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করে। উদাহরণত কারও স্বভাবে ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলে, লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে।

سَأُرِيْكُمْ اٰيٰتِىْ : এখানে اٰيٰتٌ (নিদর্শনাবলি) বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী, মু'জিযা ও অবস্থা বোঝানো হয়েছে; -(কুরতুবী) যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নিদর্শনাবলি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল; অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে করা হতো।

শব্দ বিশ্লেষণ :

سَأُرِيْكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব।

لَا يَكُفُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার كَفٌّ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা ঠেকাতে পারবে না।

فَتَبْهَتُهُمْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার بَهْتٌ মূলবর্ণ (ب - ه - ت) জিনস صحيح অর্থ– তখন তাদেরকে হতবুদ্ধি করে ফেলবে।

اُسْتُهْزِئَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مَاضِى مَجْهُول বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِهْزَاءٌ মূলবর্ণ (ه - ز - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– বিদ্রূপ করা হয়েছে।

فَحَاقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার حيق ও حوق মূলবর্ণ (ح - ى - ق) জিনস اجوف يائى অর্থ– নিপতিত হয়েছিল।

سَخِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার سَخْرٌ মূলবর্ণ (س - خ - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা বিদ্রূপ করেছিল।

يَكْلَؤُكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার كَلَاءَةٌ ও كَلَاءٌ، كَلأٌ মূলবর্ণ (ك - ل - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– সে তোমাদেরকে রক্ষা করে।

يُصْحَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার صُحْبَةٌ মূলবর্ণ (ص - ح - ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদের সঙ্গ দিতে পারে।

طَالَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার طَوْلٌ মূলবর্ণ (ن - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– অতিবাহিত হয়ে গেল।

اُنْذِرُكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ : এখানে واو টি استئنافية আর جملة مستأنفة কে আনা হয়েছে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেওয়ার জন্য। আর لَقَدْ-এর লাম হলো উহ্য قَسَم এর জবাব আর قَدْ হলো حرف تحقيق আর اُسْتُهْزِئَ হলো فعل مجهول আর بِرُسُلٍ হলো نائب فاعل-এর স্থলাভিষিক্ত আর مِنْ قَبْلِكَ হলো رسل- এর نعت বা সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৫/৩৭]

৪৬. আর যদি আপনার প্রতিপালকের আজাব হতে সামান্য ঝাপটাও তাদেরকে স্পর্শ করে, তবে তারা এরূপ বলে উঠবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! বাস্তবিকই আমরা জালিম ছিলাম।	وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা কায়েম করব (এবং আমল ওজন করব) এবং কারো প্রতি আদৌ জুলুম করা হবে না; আর যদি আমল তিল পরিমাণও হয়, তবে তাও উপস্থিত করব; আর আমি হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট।	وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর আমি তো মূসা ও হারূনকে দান করেছিলাম মীমাংসা, আলো এবং ধর্মভীরুদের জন্য নসিহতের একটি বস্তু (অর্থাৎ তাওরাত)।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. যারা নিজেদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং কিয়ামত দিবস হতেও ভয় করতে থাকে।	الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. আর এটা (কুরআন) এক বহু হিতকর নসিহত যা আমি নাজিল করেছি, তবে কি তোমরা তা অমান্য করে চলবে?	وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. আর আমি এরও পূর্বে ইবরাহীমকে তাঁর (মর্যাদানুযায়ী) সৎপথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি তাঁকে ভালোভাবে জানতাম।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

রুকু ৪

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ আর যদি তাদেরকে স্পর্শ করে نَفْحَةٌ সামান্য ঝাপটাও مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের আজাব হতে لَيَقُوْلُنَّ তবে তবে এরূপ বলে উঠবে يٰوَيْلَنَآ হায় আমাদের দুর্ভোগ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ বাস্তবিকই আমরা জালিম ছিলাম।

৪৭. وَنَضَعُ আর আমি কয়েম করব الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ ইনসাফের পাল্লা لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا এবং কারো প্রতি আদৌ জুলুম করা হবে না وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ আর যদি আমল তিল পরিমাণও হয় اَتَيْنَا بِهَا তবে তাও উপস্থিত করব وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ আর আমি হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট।

৪৮. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ আর আমি মূসা ও হারূনকে দান করেছিলাম الْفُرْقَانَ মীমাংসা وَضِيَآءً আলো وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ এবং ধর্মভীরুদের জন্য নসিহতের একটি বস্তু।

৪৯. الَّذِيْنَ যারা يَخْشَوْنَ ভয় করে رَبَّهُمْ নিজেদের প্রতিপালককে بِالْغَيْبِ না দেখে وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ এবং কিয়ামত দিবস হতেও ভয় করতে থাকে।

৫০. وَهٰذَا আর এটা ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ এক বহু হিতকর নসিহত اَنْزَلْنٰهُ যা আমি নাজিল করেছি اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ তবে কি তোমরা তা অমান্য করে চলবে।

৫১. وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ আর আমি দান করেছিলাম اِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীমকে رُشْدَهٗ তাঁর (মর্যাদানুযায়ী) সৎপথের জ্ঞান مِنْ قَبْلُ এর পূর্বে وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ এবং আমি তাঁকে ভালোভাবে জানতাম।

৫২. যখন তিনি তাঁর পিতা এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, এ মূর্তিগুলো কি, যাদের প্রতি তোমরা অনুরক্ত রয়েছ?	اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. তারা বলতে লাগল, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এদের উপাসনা করতে দেখেছি।	قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. ইবরাহীম বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা স্পষ্ট ভ্রমে রয়েছ।	قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. তারা বলল, তুমি কি আমাদের সম্মুখে সত্য এনেছ, নাকি কৌতুক করছ?	قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. ইবরাহীম বললেন, না, (এগুলো কখনো উপাস্য হতে পারে না) বরং তোমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের প্রতিপালক, যিনি সেই সমুদয়কে সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।	قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের এই মূর্তিসমূহের দুর্গতি ঘটাব, যখন তোমরা চলে যাবে।	وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. اِذْ قَالَ যখন তিনি বললেন لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ তাঁর পিতা ও স্বীয় সম্প্রদায়কে مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ এই মূর্তিগুলো কি الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ যাদের প্রতি তোমরা অনুরক্ত রয়েছ?

৫৩. قَالُوْا তারা বলতে লাগল وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে দেখেছি لَهَا عٰبِدِيْنَ এদের উপাসনা করতে।

৫৪. قَالَ ইবরাহীম বললেন لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ নিঃসন্দেহে তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা রয়েছে فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ স্পষ্ট ভ্রমে।

৫৫. قَالُوْٓا তারা বলল اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ তুমি কি আমাদের সম্মুখে সত্য এনেছ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ নাকি কৌতুক করছ।

৫৬. قَالَ ইবরাহীম বললেন بَلْ رَّبُّكُمْ না বরং তোমাদের প্রতিপালক তিনি رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের প্রতিপালক الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ যিনি সেই সমুদয়কে সৃষ্টি করেছেন وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ এবং এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।

৫৭. وَتَاللّٰهِ আল্লাহর শপথ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ আমি তোমাদের এই মূর্তিসমূহের দুর্গতি ঘটাব بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ যখন তোমরা চলে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কিয়ামতে আমলের ওজন ও দাঁড়িপাল্লা :

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ : مَوَازِيْنَ শব্দটি مِيْزَانٌ-এর বহুবচন। অর্থ- ওজনের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাল্লা। আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার জন্য অনেকগুলো

দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা দাঁড়িপাল্লা হবে। কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওজন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে। কিন্তু উম্মতের অনুসরণীয় আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দাঁড়িপাল্লাই অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে। কেননা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত কত যে সৃষ্টজীব হবে, তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাদের সবার আমল এই দাঁড়িপাল্লায়ই ওজন করা হবে। قِسْط শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়বিচার। অর্থাৎ এই দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ওজন করবে-সামান্যও কম-বেশি হবে না। মুস্তাদরাকে হযরত সালমান (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্য এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে।–[মাযহারী]

হাফেজ আবুল কাসেম লালকায়ীর হাদীস গ্রন্থে হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : দাঁড়িপাল্লায় একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যেক মানুষকে সেখানে উপস্থিত করা হবে। যদি সৎ কাজের পাল্লা ভারি হয়, তবে ফেরেশতা ঘোষণা করবেন, অমুক ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে! সে আর কোনোদিন ব্যর্থ হবে না। হাশরের মাঠে উপস্থিত সবাই এই ঘোষণা শুনবে। পক্ষান্তরে অসৎ কাজের পাল্লা ভারি হলে ফেরেশতা ঘোষণা করবে : অমুক ব্যক্তি ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়েছে। সে আর কোনোদিন কামিয়াব হবে না। উপরিউক্ত হাফেজ হযরত হুজায়ফা (রা.) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, দাঁড়িপাল্লায় নিয়োজিত এই ফেরেশতা আর কেউ নয়– হযরত জিবরাঈল (আ.)।

হাকিম, বায়হাকী ও আজেরী হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিয়ামতের দিনও কি আপনি আপনার পরিবারবর্গকে স্মরণ রাখবেন? তিনি বললেন : কিয়ামতের তিন জায়গায় কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। **এক.** যখন আমল ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লার সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন শুভ-অশুভ ফলাফল না জানা পর্যন্ত কারো কথা কারো স্মরণে আসবে না। **দুই.** যখন আমলনামাসমূহ উত্তোলন করা হবে, তখন আমলনামা ডান হাতে আসে না বাম হাতে আসে এ কথা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কারো কথাই কারো মনে থাকবে না। ডান হাতে আমলনামা এলে মুক্তির লক্ষণ এবং বাম হাতে এলে আজাবের লক্ষণ হবে। **তিন.** পুলসিরাতে উঠার পর তা সম্পূর্ণ অতিক্রম না করা পর্যন্ত কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। –[মাযহারী]

وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا : অর্থাৎ হিসাবের দিন এবং আমল ওজন করার সময় মানুষের সমস্ত ছোট-বড়, ভালো-মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাবও ওজনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমল কীভাবে ওজন করা হবে? : হাদীসে বেতাকাহর ইঙ্গিত অনুযায়ী ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা ওজন করা হতে পারে। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভবপর যে, আমলগুলোকেই স্বতন্ত্র পদার্থের আকৃতি দান করে সেগুলোকে ওজন করা হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত সাধারণত এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং আলমগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই। কুরআনের وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا প্রভৃতি আয়াত এবং অনেক হাদীস এরই সমর্থন করে।

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ : তিরমিযী হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বসে বলল : ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার দুটি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবারে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ আমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালি-গালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাদের নাফরমানি, কারচুপি এবং ঔদ্ধত্য ওজন করা হবে। এরপর তোমার গালি-গালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তুমি যে শাস্তি দাও তা যদি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে অবশিষ্টটুকু তোমার অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে। আর যদি অপরাধের তুলনায় শাস্তি বেশি হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। লোকটি একথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করনি - وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ লোকটি আরজ করল : এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। –(কুরতুবী)

اَلْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ : এই তিনটি গুণই তাওরাতের। فُرْقَانٌ অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, ضِيَاء অর্থাৎ মানুষের জন্য উপদেশ ও হেদায়েতের মাধ্যম। কেউ কেউ বলেন, فُرْقَانٌ বলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বত্র হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে ছিল; অর্থাৎ ফেরাউনের মতো শত্রুর গৃহে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, মোকাবিলার সময় আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনকে লাঞ্ছিত করেছেন, এরপর ফেরাউনী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের

সময় সমুদ্রে রাস্তা সৃষ্টি হয়ে তিনি রক্ষা পান এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সলিল-সমাধি লাভ করে। এমনিভাবে পরবর্তীতে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার এই সাহায্য প্রত্যক্ষ করা হয়েছে ذِكْر ও ضِيَاء উভয়টিই তাওরাতের বিশেষণ। কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা اَلْفُرْقَانُ-এর পরে وَاوْ দ্বারা পৃথক করা থেকে একথার প্রতি ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, فُرْقَانُ তাওরাত নয়-অন্য কোনো বিষয়।

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ আয়াতের ভাষা বাহ্যত একথাই বোঝায় যে, এ কথাটি হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের কাছে اِنِّىْ سَقِيْمٌ (আমি অসুস্থ) -এর ওজর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধানে রত হলো যে, কাজটি কে করল? যদি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপরিউক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমেই তারা বুঝে নিত যে, ইবরাহীমই একাজ করেছেন। এর জবাব হিসেবে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মোকাবিলায় তাঁর কোনো শক্তি ছিল না। একথা ভেবেই সম্ভবত তাঁর কথার দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে নি এবং ভুলেও যায়। -(বয়ানুল-কোরআন) এটাও সম্ভবপর যে, যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথাবার্তা তারা জানত না। তাফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ (র.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) উপরিউক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেননি; বরং মনে মনে বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দুই একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবরাহ করে। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَسَّتْهُمْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَسٌّ মূলবর্ণ (م - س - س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদেরকে স্পর্শ করে।

اٰتَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– আমি উপস্থিত করব।

لِلْمُتَّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– ধর্মভীরুদের জন্য।

يَخْشَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ভয় করে।

اَلتَّمَاثِيْلُ : ইসম। বহুবচন; একবচনে تمثال অর্থ– প্রতিচ্ছবিগুলো, মূর্তিগুলো, ছবিগুলো। উল্লেখ্য যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর শরিয়তে প্রতিচ্ছবি ও প্রতিমূর্তি তৈরি করা হারাম ছিল না।

أَجِئْتَنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَجِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ج - ى - أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ– তুমি কি আমাদের সম্মুখে এনেছ।

فَطَرَهُنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার فَطْرٌ মূলবর্ণ (ف - ط - ر) জিনস صحيح অর্থ– তিনি সে সমুদয়কে সৃষ্টি করেছেন।

لَاَكِيْدَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব ضَرَبَ মাসদার كَيْدٌ মূলবর্ণ (ك - ي - د) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমি অবশ্যই দুর্গতি ঘটাব।

اَنْ تُوَلُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْلِيَةٌ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস মুরাক্কাব لفيف مفروق অর্থ– তোমরা চলে যাবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ : এখানে قالوا ফে'ল ও ফায়েল মিলে قول আর وَجَدْنَا الخ আর مقول বাক্য হলো। وَجَدْنَا আর ফে'ল ও ফায়েল আর اٰبَاءَنَا হলো وَجَدْنَا-এর প্রথম মাফউল আর لَهَا এটা عَابِدِيْنَ-এর সাথে متعلق আর عَابِدِيْنَ হলো وَجَدْنَا এর দ্বিতীয় মাফউল। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৪]

৫৮. অতঃপর তিনি সেই মূর্তিগুলোকে (কুঠার দ্বারা) খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেললেন কেবল তাদের প্রধান মূর্তিটি ব্যতীত, যাতে তারা ইবরাহীমের নিকট ফিরে আসে।	فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. তারা বলাবলি করতে লাগল, আমাদের দেবতাগণের সাথে এমন কাজ কে করল? নিঃসন্দেহে সে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. কেউ কেউ বলল, আমরা ইবরাহীম নামক জনৈক যুবককে আমাদের দেবতাদের সম্বন্ধে (মন্দ) আলোচনা করতে শুনেছি।	قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾
৬১. তারা বলল, আচ্ছা, তবে তাকে সকলের সমক্ষে উপস্থিত কর, যেন তারা সাক্ষী হয়ে যায়।	قَالُوْا فَأْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. তারা বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমাদের দেবতাদের সাথে এ কাজ করেছ?	قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾
৬৩. তিনি বললেন, (তোমরা এরূপ কেন মনে কর যে, এ কাজ আমার) না, বরং এই যে ওদের প্রধান সে করেছে, সুতরাং তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর, যদি তাদের কথা বলার ক্ষমতা থাকে।	قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا অতঃপর তিনি সেই মূর্তি গুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেললেন اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ কেবল তাদের প্রধান মূর্তিটি ব্যতীত لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ যাতে তারা ইবরাহীমের নিকট ফিরে আসে।

৫৯. قَالُوْا তারা বলাবলি করতে লাগল مَنْ فَعَلَ هٰذَا এমন কাজ কে করল بِاٰلِهَتِنَآ আমাদের দেবতাদের সাথে اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ নিঃসন্দেহে সে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৬০. قَالُوْا কেউ কেউ বলল سَمِعْنَا আমরা শুনেছি فَتًى জনৈক যুবককে يَّذْكُرُهُمْ আমাদের দেবতাদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ইবরাহীম নামক।

৬১. قَالُوْا তারা বলল فَأْتُوْا بِهٖ তবে তাকে উপস্থিত কর عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ সকলের সমক্ষে لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ যেন তারা সাক্ষী হয়ে যায়।

৬২. قَالُوْٓا তারা বলল ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا তুমি কি এ কাজ করেছ بِاٰلِهَتِنَا আমাদের দেবতাদের সাথে يٰٓاِبْرٰهِيْمُ হে ইবরাহীম।

৬৩. قَالَ তিনি বললেন بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا না, বরং এই যে তাদের প্রধান, সে করেছে فَسْـَٔلُوْهُمْ সুতরাং তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ যদি তাদের কথা বলার ক্ষমতা থাকে।

فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. এতে তারা মনে মনে চিন্তা করল, তৎপর (একে অন্যকে) বলল, প্রকৃতপক্ষে তোমরাই অন্যায় পথে রয়েছ।

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. অনন্তর তারা (লজ্জায়) মাথা অবনত করল, (এবং বলল, হে ইবরাহীম!) তুমি তো অবগত আছ যে, এই মূর্তিগুলো কথা বলে না।

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ۗ ﴿٦٦﴾

৬৬. ইবরাহীম (আ.) বললেন, তবে কি তোমরা (আল্লাহকে ছেড়ে) এমন বস্তুর উপাসনা করছ, যা না তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে, আর না তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে?

اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. ধিক! তোমাদের প্রতি আর তাদের প্রতি– আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে তোমরা উপাসনা করছ; তবুও কি তোমরা বুঝ না?

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারা বলতে লাগল, একে আগুনে জ্বালিয়ে দাও এবং তোমাদের দেবতাগণের প্রতিশোধ নাও, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾

৬৯. (অতঃপর তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করল) আমি আদেশ করলাম, হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের প্রতি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৪. فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ এতে তারা মনে মনে চিন্তা করল فَقَالُوْٓا তৎপর বলল اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ প্রকৃতপক্ষে তোমরাই অন্যায় পথে রয়েছ।

৬৫. ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ অনন্তর তারা (লজ্জায়) মাথা অবনত করল لَقَدْ عَلِمْتَ তুমি তো অবগত আছ যে مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ এই মূর্তিগুলো কথা বলে না।

৬৬. قَالَ ইবরাহীম বললেন اَفَتَعْبُدُوْنَ তবে কি তোমরা উপাসনা করছ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا এমন বস্তুর যা না তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে وَلَا يَضُرُّكُمْ আর না তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে।

৬৭. اُفٍّ لَّكُمْ ধিক! তোমাদের প্রতি وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ আর তাদের প্রতি যাদেরকে তোমরা উপাসনা করছ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবুও কি তোমরা বুঝ না।

৬৮. قَالُوْا তারা বলতে লাগল حَرِّقُوْهُ একে আগুনে জ্বালিয়ে দাও وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ এবং তোমাদের দেবতাগণের প্রতিশোধ নাও اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ যদি তোমরা কিছু করতে চাও।

৬৯. قُلْنَا আমি আদেশ করলাম يٰنَارُ হে অগ্নি كُوْنِيْ তুমি হয়ে যাও بَرْدًا শীতল وَّسَلٰمًا ও নিরাপদ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীমের প্রতি।

৭০. আর তারা তাঁর অনিষ্ট করতে ইচ্ছা করেছিল। সুতরাং আমি তাদেরকে অকৃতকার্য করে দিলাম।	وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. আর ইবরাহীম ও লূতকে সেই (শাম) দেশের দিকে প্রেরণ করে রক্ষা করলাম– যাতে আমি দুনিয়াবাসীদের জন্য বরকত রেখেছিলাম।	وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾
৭২. আর (হিজরতের পর) আমি ইবরাহীমকে দান করলাম (পুত্র) ইসহাক; আর পৌত্র ইয়াকুব; এবং আমি তাদেরকে সৎকর্মশীল করেছিলাম।	وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭০. وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا এবং তারা তাঁর অনিষ্ট করতে ইচ্ছা করেছিল فَجَعَلْنٰهُمُ সুতরাং আমি তাদেরকে করে দিলাম الْاَخْسَرِيْنَ অকৃতকার্য।

৭১. وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا আর ইবরাহীম ও লূতকে রক্ষা করলাম اِلَى الْاَرْضِ সেই দেশের দিকে প্রেরণ করে الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا যাতে আমি বরকত রেখেছিলাম لِلْعٰلَمِيْنَ দুনিয়াবাসীদের জন্য।

৭২. وَوَهَبْنَا لَهٗٓ আর আমি ইবরাহীমকে দান করলাম اِسْحٰقَ (পুত্র) ইসহাক وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً আর পৌত্র ইয়াকুব وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ এবং আমি তাদেরকে সৎকর্মশীল করেছিলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا : جُذَاذًا শব্দটি جَذٌّ -এর বহুবচন। এর অর্থ খণ্ড। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) মূর্তিগুলোকে ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন।

اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ : অর্থাৎ শুধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙার কবল থেকে রেহাই দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মূর্তিদের চাইতে বড় ছিল, না হয় আকার-আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় বলে মান্য করত।

لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ : اِلَيْهِ শব্দের সর্বনাম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে দুই রকম সম্ভাবনা আছে। এক, এই দুই সর্বনাম দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। তাই আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞেস করুক যে, তুমি একাজ কেন করলে? এরপর আমি তাদেরকে তাদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞাত করব। এর অন্য এক অর্থ এমনও হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মূর্তিদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পূজার যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। দুই, কালবী বলেন, সর্বনাম দ্বারা كَبِيْر (প্রধান মূর্তি)-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তিকে খণ্ড-বিখণ্ড এবং বড় মূর্তিকে আস্ত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবত এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হলো? সে যখন কোনো উত্তর দেবে না তখন তার অক্ষমতাও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি মিথ্যা নয় -রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা :

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ হযরত ইবরাহীম (আ.) -কে সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রেফতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্যে প্রশ্ন করল, তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ

কি? তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) জওয়াব দিলেন : না, এদের প্রধানই একাজ করেছে। যদি তারা কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো হযরত ইবরাহীম (আ.) করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যত বাস্তববিরোধী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহর দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) এহেন মিথ্যাচারের অনেক উর্ধ্বে। এ প্রশ্নের উত্তর দানের জন্যে তাফসীরবিদগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে বয়ানুল-কুরআনে যে সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ উক্তি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল; অর্থাৎ তোমরা একথা ধরে নাও না কেন যে, একাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে। ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না; যেমন- কুরআনে আছে إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ অর্থাৎ রহমান আল্লাহর কোনো সন্তান থাকলে আমি সর্বপ্রথম তাঁর ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্মম ও দ্ব্যর্থহীন জবাব বাহ্‌রে-মুহীত, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে إِسْنَاد مَجَازِىْ তথা রূপক ভঙ্গিতে হযরত ইবরাহীম (আ.) যে কাজ স্বহস্তে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা এ মূর্তিটিই হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে একাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবত এ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত, যদি কোনো বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করিনি; বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ।

হযরত ইবরাহীম (আ.) কার্যতও মূর্তি ভাঙাকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছিলেন। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই ধারণা করে যে, সে-ই একাজ করেছে। এরপর কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য, এটা রূপক ভঙ্গি। আরবি ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ (অর্থাৎ বসন্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে।) এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। একে মিথ্যা অভিহিত করা যায় না। এমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যত ও উক্তিগতভাবে সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দ্বীনী উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হায়েছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল এই যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবত পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরিক করার কারণে বড় মূর্তিটি ক্রুদ্ধ হয়ে একাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তাওহীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরিকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা এই প্রস্তরদের শরিকানা নিজের সাথে কিভাবে মেনে নিবেন?

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল যে, যাদেরকে আমরা আল্লাহ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই তদ্রূপ হতো, কেউই তাদেরকে ভেঙে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে বাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হয়েছে : فَاسْئَلُوْهُمْ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ মোটকথা, কোনরূপ দ্ব্যর্থতার আশ্রয় না নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপরিউক্ত উক্তিকে বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে, হযরত ইবহারীম (আ.) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির দিকে কাজটির সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। এরূপ করা হলে তাতে কোনোরূপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে না। শুধু এক প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন হয়েছে।

হাদীসে ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ : এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহ্ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكْذِبْ غَيْرَ ثَلَاثٍ - অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) তিন জায়গা ব্যতীত কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেননি। -(বোখারী, মুসলিম) অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে দুটি মিথ্যা খাস আল্লাহ্‌র জন্য বলা হয়েছে। একটি بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ -আয়াতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে ওজর পেশ করে إِنِّىْ سَقِيْمٌ (আমি অসুস্থ) বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রীর

হেফাজতের জন্য বলা হয়েছে। ঘটনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী হযরত সারাহ্সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল জালেম ও ব্যভিচারী। কোনো ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোনো কন্যা পিতার সাথে কিংবা ভগিনী স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করত না। হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর স্ত্রীসহ এই জনপদে পৌছার খবর কেউ এই জালেম ব্যভিচারীর কাছে পৌছে দিলে সে হযরত সারাহ্কে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল, এই মহিলার সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? হযরত ইবরাহীম (আ.) জালিমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বলে দিলেন, সে আমার ভগিনী। (এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা।) কিন্তু এতদসত্ত্বেও সারাহ্কে গ্রেফতার করা হলো। হযরত ইবরাহীম (আ.) সারাহ্কেও বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তুমি আবার এর বিরপীত বলো না। কারণ ইসলামি সম্পর্কে তুমি আমার ভগিনী। এখন এই দেশে আমরা দুজনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বে সম্পর্কশীল। হযরত ইবরাহীম (আ.) জালিমের মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্র কাছে সবিনয় প্রার্থনার জন্য নামাজ পড়তে শুরু করলেন। হযরত সারাহ্ জালিমের সামনে উপনীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। তখন সারাহ্কে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ববৎ সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহ্র দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইল, কিন্তু আল্লাহ্র হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এমনিভাবে তিনবার এরূপ ঘটনার পর সে সারাহ্কে ফেরত পাঠিয়ে দিল। (এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ)। এই হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জবাব হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না ; বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় "তাওরিয়া"। এর অর্থ দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বুঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফিকহবিদগণের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েজ ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লিখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেই সারাহকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলো। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামি সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী। বলাবাহুল্য এটাই "তাওরিয়া"। এই তাওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের "তাকায়্যুহ" থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাকায়্যুহর মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তাওরিয়াতে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে, যেমন-ইসলামি সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী হওয়া। উল্লিখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না; বরং তাওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ -এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মূর্তি ভাঙার কাজটিকে রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। إِنِّي سَقِيمٌ বাক্যটি তদ্রূপ। কেননা سَقِيمٌ (অসুস্থ) শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই "আমি অসুস্থ" বলেছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বুঝেছিল। এই হাদীসেই "তিনটির মধ্যে দুটি মিথ্যা আল্লাহ্র জন্য ছিল" এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোনো গোনাহের কাজ ছিল না। নতুবা গোনাহের কাজ আল্লাহ্র জন্য করার কোনো অর্থই হতে পারে না: গোনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; বরং এমন বাক্য হয়, যার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে - একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা : মির্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহ্র দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরি হয়ে পড়ে। কাজেই খলীলুল্লাহ্কে মিথ্যাবাদী বলার চাইতে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া সহজতর। কেননা

হাদীসটি কুরআনের পরিপন্থি। এরপর তারা এ থেকে একটি সমগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে. যে হাদীস কুরআনের পরিপন্থি হবে, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই নীতিটি স্বস্থানে সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং মুসলিম উম্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কুরআনের পরিপন্থি বলা যায়! বরং স্বল্পবুদ্ধিতা ও বক্রবুদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কুরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে এ কথা বলে গা খালাস করা হয় যে, হাদীসটি কুরআন-বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, 'তিনটি মিথ্যা' বলে যে তাওরিয়া বোঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন প্রশ্ন হলো, তাওরিয়া বোঝাতে গিয়ে كَذِبَاتٌ (মিথ্যা) শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো? এর কারণ তাই, যা ইতঃপূর্বে সূরা ত্বা-হায় হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে হযরত আদম (আ.)-এর ভুলকে عَصٰى ও غَوٰى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল, তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আজীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা হয় না। কুরআন পাকে এ ধরনের বিষয়ে পয়গম্বরদের সম্পর্কে আল্লাহ ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য পয়গম্বরদের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর কোনো ত্রুটির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশের জন্য দণ্ডায়মান হবেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) হাদীসে বর্ণিত ঐ তাওরিয়ার ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যকে নিজের দোষ ও ত্রুটি সাব্যস্ত করে ওজর পেশ করবেন। এই ত্রুটির দিকে ইশারা করার জন্য হাদীসে এগুলোকে كَذِبَاتٌ তথা 'মিথ্যা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ও এরূপ করার অধিকার ছিল এবং তাঁর হাদীস বর্ণনা করার সীমা পর্যন্ত আমাদেরও এরূপ বলার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) মিথ্যা বলেছেন বললে তা জায়েজ হবে না। সূরা ত্বা-হায় হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহ্‌রে মুহীতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআন অথবা হাদীসে কোনো পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কুরআন তেলাওয়াতে, কুরআন শিক্ষা অথবা হাদীস রিওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোনো পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েজ ও ধৃষ্টতা বৈ নয়।

উল্লিখিত হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আমল খাঁটি করার সূক্ষ্মতা : হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে উল্লিখিত তিনটি মিথ্যার মধ্যে থেকে দু'টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর জন্য ছিল; কিন্তু হযরত সারাহ্ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ বলা হয় নি। অথচ স্ত্রীর আবরু রক্ষা করাও সাক্ষাৎ দীনের কাজ। এ সম্পর্কে তাফসীরে-কুরতুবীতে কাজী আবূ বকর (র.) ইবনে আরাবী থেকে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন, তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ না বলার বিষয়টি সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। যদিও এটা দীনেরই কাজ ছিল, কিন্তু এতে স্ত্রীর সতীত্ব ও হেরেমের হেফাজত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে فِى اللّٰهِ (আল্লাহর মধ্যে) এবং لِلّٰهِ (আল্লাহর জন্য) এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ (খাটি ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্যই) স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অথবা অন্য কারও হলে নিঃসন্দেহে একেও উপরিউক্ত তালিকায় গণ্য করা হতো। কিন্তু পয়গম্বরগণের মাহাত্ম্য সবার উপরে। তাঁদের জন্য এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থি মনে করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য নমরূদের অগ্নিকুণ্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হওয়া স্বরূপ : যারা মু'জিযা ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলি অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনব অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে গুণ কোনো বস্তুর সত্তার জন্য অপরিহার্য হয়, তা কোনো সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না-দর্শনশাস্ত্রের এই নীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি। সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে কোনো বস্তুর সত্তার জন্য কোনো গুণ

অপরিহার্য নয়। বরং আল্লাহর চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্য উত্তাপ ও প্রজ্বলিত করা জরুরি, পানির জন্য ঠাণ্ডা করা ও নির্বাপণ করা জরুরি। কিন্তু এই জরুরি অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ-যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও এর যুক্তিসম্মত হওয়ার কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারেননি; এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যস্ত, তখন আল্লাহ তা'আলা যদি কোনো বিশেষ রহস্যের কারণে কোনো অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তনে কোনো যুক্তিগত অসম্ভাব্যতা নেই। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার কাজ আর পানি প্রজ্বলন কাজ করতে শুরু করেন; অথচ অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি পানিই থাকে; তবে কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্য তা আল্লাহর নির্দেশে স্বীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে থাকে। পয়গম্বরগণের নবুয়ত প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব মু'জিযা প্রকাশ করেন, সেগুলোর সারমর্ম তাই। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা নমরূদের অগ্নিকুণ্ডকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন, তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি بَرْدًا (শীতল) শব্দের সাথে وَسَلٰمًا (নিরাপদ) শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। হযরত নূহ (আ.)-এর সলিল সমাধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে : أُغْرِقُوْا فَأُدْخِلُوْا نَارًا -অর্থাৎ তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে।

حَرِّقُوْهُ : অর্থাৎ সমগ্র সম্প্রদায় ও নমরূদ সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হোক। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অগ্নিশিখা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। তখন তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের নিকট যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অগ্নির অসহ্য তাঁপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য কারো ছিল না। শয়তান হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে 'মিন্‌জানিকে' (এক প্রকার নিক্ষেপণ যন্ত্র) রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সময় হযরত ইবরাহীম (আ.) মিন্‌জানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত সৃষ্টজীব চীৎকার করে উঠল : ইয়া রব! আপনার দোস্তের এ কি বিপদ! আল্লাহ তাদের সবাইকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হলো, প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে। –[মাযহারী]

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষে সম্ভবত অগ্নি অগ্নিই ছিল না; বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যত অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দহন করছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যেসব রশি দ্বারা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দেহে সামান্য আঁচও লাগেনি।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এই অগ্নিকুণ্ডে সাতদিন ছিলেন। তিনি বলতেন, এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারা জীবন তা ভোগ করিনি। –[মাযহারী]

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ : অর্থাৎ ইবরাহীম ও লূতকে আমি নমরূদের অধিকারভুক্ত দেশ (অর্থাৎ ইরাক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাসস্থল। অভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গম্বরগণের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদ-নদীর প্রাচুর্য, ফল-মূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً : অর্থাৎ আমি তাঁকে (দোয়া ও অনুরোধ আনুযায়ী) পুত্র ইসহাক ও অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকূবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে نَافِلَةً বলা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَأْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ ضَرَبَ বাব اِتْيَانٌ মাসদার (أ ـ ت ـ ى) মূলবর্ণ জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– আচ্ছা তবে তাকে উপস্থিত কর।

يَنْطِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ ضَرَبَ বাব نُطْقٌ মাসদার (ن ـ ط ـ ق) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– কথা বলার ক্ষমতা (থাকে), তারা কথা বলে।

نُكِسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب ماضى مجهول বহছ نَصَرَ বাব نَكْسٌ মাসদার (ن ـ ك ـ س) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– তারা অবনত করল।

حَرِّقُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ تَفْعِيْل বাব تَحْرِيْقٌ মাসদার মূলবর্ণ (ح ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা একে আগুনে জ্বালিয়ে দাও।

كُوْنِىْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر امر حاضر معروف বহছ نَصَرَ বাব كَوْنٌ মাসদার (ك ـ و ـ ن) মূলবর্ণ জিনস اجوف واوى অর্থ– তুমি হয়ে যাও।

اَرَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب ماضى معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اِرَادَةٌ মাসদার (ر ـ و ـ د) মূলবর্ণ জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা ইচ্ছা করছিল।

اَلْاَخْسَرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم تفضيل বহছ سَمِعَ বাব خُسْرَانٌ মাসদার (خ ـ س ـ ر) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– অকৃতকার্য।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يٰنَارُ كُوْنِىْ الخ এখানে : قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ মিলে قول আর قُلْنَا হলো ফে'ল ও ফায়েল মিলে مقول ; এখানে يٰنَارُ এর يا হলো হরফে নেদা আর نار হলো منادى যা نكره مقصودة হয়ে مبنى على الضم হয়ে নসবের স্থলে পতিত হয়েছে, আর كُوْنِىْ হলো فعل ناقص আর তার যমীর হলো اسم ناقص আর بَرْدًا হলো خبر ناقص আর سَلٰمًا আতফ হয়েছে بَرْدًا-এর উপর। আর عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ এটা سَلٰمًا এর সিফত হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫২]

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর আমি তাদের সকলকে ইমাম করেছিলাম, তাঁরা আমার আদেশক্রমে হেদায়েত করেছিলেন, আর আমি তাদের প্রতি নেক কাজ করতে ও নামাজের পাবন্দি করতে এবং জাকাত আদায় করতে হুকুম পাঠালাম এবং তাঁরা আমার ইবাদত করতেন।

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. আর আমি লূতকে হেকমত ও ইলম দান করেছিলাম এবং তাঁকে সেই জনপদ হতে মুক্তি দিয়েছিলাম– যার অধিবাসীরা অশ্লীল জঘন্য কাজ করত; নিঃসন্দেহে তারা ছিল অসৎ, দুষ্কার্যকারী।

وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ ع ٥

৭৫. আর আমি লূতকে আমার রহমতে দাখিল করলাম, নিশ্চয় তিনি (উচ্চ মর্যাদাবান) নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾

৭৬. আর নূহের (কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন এর (ইবরাহীমের যুগের) পূর্বে দোয়া করেছিলেন, তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে অতিশয় কঠিন পেরেশানি হতে মুক্তি দিয়েছিলাম।

وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. আর আমি সেই লোকদের হতে তাঁর তাঁকে সাহায্য করে ছিলাম যারা আমার নির্দেশসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, নিঃসন্দেহে তারা অতি মন্দ লোক ছিল, সুতরাং আমি তাদের সকলকে নিমজ্জিত করে দিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৩. وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً আর আমি তাদের সকলকে ইমাম করেছিলাম يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا তারা আমার আদেশক্রমে হেদায়েত করেছিলেন وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ আর আমি তাদের প্রতি হুকুম পাঠলাম فِعْلَ الْخَيْرٰتِ নেক কাজ করতে وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ ও নামাজের পাবন্দি করতে وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ এবং জাকাত আদায় করতে وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ এবং তাঁরা আমার ইবাদত করতেন।

৭৪. وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ আর আমি লূতকে দান করেছিলাম حُكْمًا وَّعِلْمًا হেকমত ও ইলম وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ এবং তাঁকে সেই জনপদ হতে মুক্তি দিয়েছিলাম الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ যার অধিবাসীরা জঘন্য কাজ করত اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ নিঃসন্দেহে তারা ছিল অসৎ সম্প্রদায় فٰسِقِيْنَ দুষ্কার্যকারী।

৭৫. وَاَدْخَلْنٰهُ আর আমি লূতকে দাখিল করলাম فِيْ رَحْمَتِنَا আমার রহমতে اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ নিশ্চয় তিনি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।

৭৬. وَنُوْحًا আর নূহের (কাহিনী) আলোচনা করুন اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ যখন এর পূর্বে দোয়া করেছিলেন فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ এবং তাঁকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে মুক্তি দিয়েছিলাম مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ অতিশয় কঠিন পেরেশানি হতে।

৭৭. وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ আর আমি সেই লোকদের হতে তাঁকে সাহায্য করেছিলাম الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا যারা আমার নির্দেশসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ নিঃসন্দেহে তারা অতি মন্দ লোক ছিল فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ সুতরাং আমি তাদের সকলকে নিমজ্জিত করে দিলাম।

৭৮. আর দাউদ ও সুলায়মানের আলোচনা করুন, যখন তারা কোনো কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে বিচার করছিলেন, যখন তাতে কতিপয় লোকের মেষপাল রাত্রিকালে ঢুকেছিল, আর আমি সেই মীমাংসা- যা তাদের সম্বন্ধে হচ্ছিল- দেখছিলাম।	وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. অতঃপর আমি ঐ মীমাংসার জ্ঞান সুলায়মানকে দান করলাম এবং আমি উভয়কেই হেকমত ও জ্ঞান দান করেছিলাম, আর আমি পর্বতসমূহকে ও পক্ষীসমূহকেও দাউদের আদেশানুগত করেছিলাম তারা (তাঁর সঙ্গে) তাসবীহ্ পাঠ করত আর আমিই এ সমস্তের কর্তা ছিলাম।	فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۫ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. আর আমি তোমাদের জন্য তাঁকে বর্ম নির্মাণের কৌশল শিখিয়েছিলাম, যেন তা তোমাদের একজনকে অপরজনের আঘাত হতে রক্ষা করে, সুতরাং তোমরা কি শোকর করবে?	وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. আর আমি প্রবল বায়ুকে সুলায়মানের বশীভূত করেছিলাম, উহা তার আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হতো যাতে আমি বরকত দিয়ে রেখেছি। আর আমি প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞাত আছি।	وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৮. وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ আর দাউদ ও সুলায়মানের আলোচনা করুন اِذْ يَحْكُمٰنِ যখন তারা বিচার করছিলেন فِي الْحَرْثِ কোনো কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ যখন তাতে রাত্রিকালে ঢুকেছিল غَنَمُ الْقَوْمِ কতিপয় লোকের মেষপাল وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ আর আমি সেই মীমাংসা যা তাদের সম্বন্ধে হচ্ছিল-দেখছিলাম।

৭৯. فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ অতঃপর আমি ঐ মীমাংসার জ্ঞান সুলায়মান কে দান করলাম وَكُلًّا اٰتَيْنَا এবং আমি উভয়কেই দান করেছিলাম حُكْمًا وَّعِلْمًا হেকমত ও জ্ঞান وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ আর আমি দাউদের আদেশানুগত করেছিলাম যে, الْجِبَالَ পর্বতসমূহকে يُسَبِّحْنَ তারা তাসবীহ পাঠ করত وَالطَّيْرَ এবং পক্ষীসমূহকেও وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ আর আমিই এসমস্তের কর্তা ছিলাম।

৮০. وَعَلَّمْنٰهُ আর আমি তাকে শিখিয়েছিলাম صَنْعَةَ لَبُوْسٍ বর্ম নির্মাণের কৌশল لَّكُمْ তোমাদের জন্য لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَاْسِكُمْ যেন তা তোমাদের একজনকে অপরজনের আঘাত হতে রক্ষা করে فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ সুতরাং তোমরা কি শোকর করবে?

৮১. وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً আর আমি প্রবল বায়ুকে সুলায়মানের আদেশানুগত করেছিলাম تَجْرِيْ তা প্রবাহিত হতো بِاَمْرِهٖ তার আদেশে اِلَى الْاَرْضِ সেই দেশের দিকে الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا যাতে আমি বরকত দিয়ে রেখেছি, وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ আর আমি প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞাত আছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে জনপদ থেকে হযরত লূত (আ.)-কে উদ্ধার করার কথা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল ছাদুম। এর অধীনে আরো সাতটি জনপদ ছিল। এগুলোকে হযরত জিবরাঈল (আ.) উলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু হযরত লূত (আ.) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদের বসবাসের জন্য একটি জনপদ অক্ষত রেখে দেওয়া হয়েছিল। –[কুরতুবী]

تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ : خَبَائِث শব্দটি خَبِيْثَةٌ -এর বহুবচন। অনেক নোংরা ও অশ্লীল অভ্যাসকে خَبَائِث বলা হয়। "লাওয়াতাত" ছিল তাদের সর্বপ্রধান নোংরা অভ্যাস, যা থেকে বন্য জন্তুরাও বেঁচে থাকে। অর্থাৎ পুরুষের সাথে পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটি মাত্র অভ্যাসকে خَبَائِث বলা হয়ে থাকলে তাও অবান্তর নয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : এ ছাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত আছে। এমনিভাবে রূহুল মা'আনীতে রয়েছে, তন্মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট কাজ ছিল পুংমৈথুন। এ ছাড়া আরো অনেক অনর্থক ও মন্দ কাজে তারা অভ্যস্ত ছিল; যথা মদ্যপান, গান-বাজনা, শ্মশ্রু মুণ্ডন, গোঁফ লম্বা করা, কবুতরবাজি, ঢিলা নিক্ষেপ, শিস বাজানো, রেশমি বস্ত্র পরিধান। এদিক দিয়ে সমষ্টিকে خَبَائِث বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ : مِنْ قَبْلُ এর অর্থ হযরত ইবরাহীম ও লূত (আ.)-এর পূর্বে হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে হযরত নূহ (আ.)-এর যে আহ্বানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা নূহে আছে। তা এই যে, তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন : رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا -অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার পৃথিবীর বুকে কোনো কাফের অধিবাসীকে থাকতে দিও না। অন্যত্র আছে, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় যখন কোনোরূপেই তাঁর উপদেশ মানল না, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, اِنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ অর্থাৎ আমি অপারগ ও অক্ষম হয়ে গেছি, আপনিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ : كَرْبِ عَظِيْم (মহাসংকট) বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তার বন্যার পূর্বে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরিবার-বর্গের প্রতি চালানো হতো।

نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ : অভিধানে نَفْشٌ শব্দের অর্থ রাত্রিকালে শস্যক্ষেত্রে জন্তু ঢুকে পড়ে ক্ষতিসাধন করা।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ : فَفَهَّمْنٰهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত মকদ্দমা ও তার ফয়সালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিলেন। মকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালাও শরিয়তের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয় পক্ষের রেয়াত ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহর কাছে তা পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদাহ্ ও যুহরী (র.) থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, দুই লোক হযরত দাউদ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। (সম্ভবত : বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই হযরত দাউদ (আ.) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। (কেননা ফিকহের পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কেয়াম' অর্থাৎ যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেওয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেওয়া হয়েছে। বাদী ও বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তাঁর পুত্র) সুলায়মান (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিয়ে দেয়। হযরত

সুলয়মান (আ.) বললেন : আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হতো এবং উভয়পক্ষের জন্য উপকারী হতো। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একথা জানালেন। হযরত দাউদ (আ.) বললেন : এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্যে উপকারী রায়টা কি? হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন আপনি ছাগপাল শষ্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শষ্যক্ষেত্র ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌছে যাবে, তখন শস্যক্ষেত্র ক্ষেত্রের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন। হযরত দাউদ (আ.) এই রায় পছন্দ করে বললেন : বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয়পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

রায় দানের পর কোনো বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্তন করা যায় কি? : এখানে প্রশ্ন হয়, হযরত দাউদ (আ.) যখন এক রায় দিয়েছিলেন, তখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিল? যদি হযরত দাউদ (আ.) নিজেই তাঁর রায় শুনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তাবে কোনো বিচারকের এরূপ করার অধিকার আছে কি না? কুরতুবী এখানে এ ধরনের বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনার সারমর্ম এই যে, যদি কোনো বিচারক শরিয়তের প্রমাণাদি ও সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোনো রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে, তবে সেই রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যান ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেওয়া শুধু জায়েজই নয়; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোনো বিচারকের রায় শরিয়তসম্মত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় ভঙ্গ করা জায়েজ নয়। কেননা এই রীতি প্রবর্তিত হলে মহা অনর্থ দেখা দেবে। ইসলামি আইন খেলার বস্তুতে পরিণত হবে এবং রোজই হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায় দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায় দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন যে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েজ, বরং উত্তম। হযরত ওমর ফারুক (রা.) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর নামে বিচার ও রায় দানের মূলনীতি সম্বলিত একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রায় দেওয়ার পর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকুতনী সনদসহ বর্ণনা করেছেন। -[কুরতুবী সংক্ষেপিত] শামসুল আয়িম্মা সারাখসী মাবসূতেও এই চিঠি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.) উভয়ের রায় স্ব-স্ব স্থানে বিশুদ্ধ। এর স্বরূপ এই যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর রায় ছিল বিধি মোতাবেক এবং হযরত সুলায়মান (আ.) যা বলেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে মকদ্দমার রায় ছিল না; বরং উভয় পক্ষের মধ্যে আপস করার একটি পন্থা। কুরআনে وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (অর্থাৎ আপস করা উত্তম) বলা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় পন্থাই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়েছে। -[মাযহারী]

হযরত ওমর ফারুক (রা.) বিচারকদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যখন দুই পক্ষ মকদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন প্রথমে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপস রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে শরিয়তের রায় জারি করতে হবে। তিনি এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : বিচারকসুলভ আইনগত ফয়সালা যে ব্যক্তির বিপক্ষে যায়, সে সাময়িকভাবে দমে গেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শত্রুতার বীজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা দুই মুসলমানের মধ্যে না থাকা উচিত। পক্ষান্তরে আপস-রক্ষার ফলে অন্তরগত ঘৃণা-বিদ্বেষও দূর হয়ে যায়। -[মুঈনুল হুক্কাম]

মুজাহিদের এই উক্তি অনুযায়ী হযরত দাউদ (আ.)-এর ব্যাপারটিতে রায় ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা হয়নি; বরং উভয় পক্ষকে রায় শোনানোর পর তাদের উপস্থিতিতেই আপস রক্ষার একটি পন্থা উদ্ভাবিত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ তাতে সম্মত হয়ে গেছে।

দুই মুজতাহিদ যদি দুইটি পরস্পর বিরোধী রায় দান করেন, তবে প্রত্যেকটি শুদ্ধ হবে, না কোনো একটিকে ভ্রান্ত বলা হবে : এ স্থলে কুরতুবী বিস্তারিতভাবে এবং অন্যান্য তাফসীরবিদ বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ সর্বদা সত্য রায়ই দান করে এবং দুইটি পরস্পরবিরোধী ইজতিহাদ হলে উভয়টিকে সত্য মনে করা হবে, না একটিকে ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হবে? এ ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য

আয়াত থেকে উভয় দলই প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। যারা বলে, পরস্পরবিরোধী হলেও উভয় ইজতিহাদ সত্য, তাদের প্রমাণ আয়াতের শেষ বাক্য। এতে বলা হয়েছে : وَكُلًّا اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا এতে হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলায়মান (আ.) উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করার কথা বলা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি কোনোরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়নি এবং একথাও বলা হয়নি যে, তিনি ভুল করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর রায় সত্য ছিল এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রায়ও। তবে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রায়কে উভয় পক্ষের জন্যে অধিক উপযোগী হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বলে, ইজতিহাদী মতভেদের স্থলে এক পক্ষ সত্য ও অপর পক্ষ ভ্রান্ত হয়, তাদের প্রমাণ আয়াতের প্রথম বাক্য; অর্থাৎ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ -এতে বিশেষ করে হযরত সুলায়মান (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাকে সত্য রায় বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর রায় সঠিক ছিল না। তবে তিনি ইজতিহাদের কারণে এ ব্যাপারে ক্ষমার্হ ছিলেন এবং তাকে এ কারণে ধরপাকড় করা হয়নি। উসূলে ফিকহের কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে। এখানে শুধু এতটুকু বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট যে, হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো ধর্মীয় নির্দেশ বর্ণনা করে, তার ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হলে সে দুই ছওয়াব পাবে একটি ইজতিহাদ করার এবং অপরটি বিশুদ্ধ নির্দেশ পর্যন্ত পৌঁছার। পক্ষান্তরে যদি ইজতিহাদ নির্ভুল না হয় এবং সে ভুল করে বসে, তবে সে ইজতিহাদের শ্রম স্বীকার করার কারণে এক ছওয়াব পাবে। নির্ভুল নির্দেশ পর্যন্ত পৌঁছার দ্বিতীয় ছওয়াব সে পাবে না (অধিকাংশ প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে)। এই হাদীস থেকে আলেমগণের উপরিউক্ত মতভেদের স্বরূপও স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শাব্দিক মতবিরোধের মতোই। কেননা উভয় পক্ষ সত্যপন্থি হওয়ার সারমর্ম এই যে, ভুলকারী মুজতাহিদ ও তার অনুসারীদের জন্যও ইজতিহাদটি সত্য ও বিশুদ্ধ। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করলে তারা মুক্তি পাবে, যদিও ইজতিহাদটি সত্তার দিক দিয়ে ভুলও হয়। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী যারা আমল করবে, তাদের গোনাহ্ নেই। যারা বলেছেন যে, দুই ইজতিহাদের মধ্যে একটিই সত্য এবং অপরটি ভ্রান্ত, তাদের এ উক্তির সারমর্মও এর বেশি নয় যে, আল্লাহ তা'আলার আসল উদ্দেশ্য পর্যন্ত না পৌঁছার কারণে ভুলকারী মুজতাহিদ কম ছওয়াব পাবে। ভুলকারী মুজতাহিদকে ভর্ৎসনা করা হবে অথবা তার অনুসারীরা গোনাহ্গার হবে– এরূপ উদ্দেশ্য এই মতাবলম্বীদেরও নেই। তাফসীরে কুরতুবীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কারো জন্তু অন্যের জান অথবা মালের ক্ষতি সাধন করলে কি ফয়সালা হওয়া উচিত : হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালা থেকে জানা যায় যে, জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে, যদি ঘটনা রাত্রিকালে হয়। কিন্তু এটা জরুরি নয় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর শরিয়তের ফয়সালা আমাদের শরিয়তেও বহাল থাকবে। এ কারণেই এ বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব এই যে, যদি রাত্রিকালে কারো জন্তু অপরের ক্ষেতে চড়াও হয়ে ক্ষতি সাধন করে, তবে জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দিনের বেলায় এরূপ হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তাঁর প্রমাণ হযরত দাউদের ফয়সালাও হতে পারে। কিন্তু তিনি ইসলামি মূলনীতি অনুযায়ী একটি হাদীস থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মুয়াত্তা ইমাম মালেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত বারা ইবনে আযেবের উষ্ট্রী এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে পড়ে বাগানের ক্ষতিসাধন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা দিলেন যে, রাত্রিবেলায় বাগান ও ক্ষেতের হেফাজত করা মালিকদের দায়িত্ব। হেফাজত সত্ত্বেও যদি রাত্রিবেলায় কারো জন্তু ক্ষতিসাধন করে, তবে জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে। হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ও কূফার ফিকহবিদগণ বলেন যে, যে সময় জন্তুর সাথে রাখাল অথবা হেফাজতকারী থাকে এবং তার গাফলতির কারণে জন্তু কারো ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে, তখন জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ব্যাপারটি রাত্রে হোক কিংবা দিনে। পক্ষান্তরে যদি জন্তুর সাথে মালিক অথবা হেফাজতকারী না থাকে, জন্তু স্ব প্রণোদিত হয়ে কারো ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে, তবে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না, ব্যাপারটি দিনে হোক কিংবা রাত্রে। ইমাম আজমের প্রমাণ সে হাদীস যা বোখারী, মুসলিম ও অন্য হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ অর্থাৎ জন্তু কারো ক্ষতি করলে তা ধরপাকড়যোগ্য নয়। অর্থাৎ জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না (অন্যান্য প্রমাণদৃষ্টে এর জন্য মালিক অথবা রাখাল জন্তুর সঙ্গে না থাকা শর্ত)। এই হাদীসে দিবারাত্রির পার্থক্য ছাড়াই এই আইন বিধৃত হয়েছে যে, যদি জন্তুর মালিক

ইচ্ছাকৃতভাবে কারো ক্ষেতে জন্তু ছেড়ে না দেয়, জন্তু নিজেই চলে যায়, তবে মালিককে ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে না। হযরত বারা ইবনে আযেবের ঘটনা যে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হানাফী ফিকহবিদগণ তার সনদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীসের মোকাবিলায় তা প্রমাণ হতে পারে না।

পর্বত ও পক্ষীকুলের তাসবীহ : وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক গুণাবলির মধ্যে সুমধুর কণ্ঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন যাবূর পাঠ করতেন, তখন বিহঙ্গকুল শূন্যে থেমে যেত এবং তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তাসবীহের আওয়াজ শোনা যেত। সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তাসবীহ পাঠে শরিক হওয়া ছিল আল্লাহর কুদরতের অধীন একটি মু'জিযা। মু'জিযার জন্য পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যে জীবন ও চেতনা থাকা জরুরি নয়। বরং প্রত্যেক অচেতন বস্তুর মধ্যেও মু'জিযা হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান আছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াতে রত ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তেলাওয়াত শোনার জন্য থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন।

এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে হযরত দাউদ (আ.)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরই দান করেছেন। হযরত আবূ মূসা (রা.) যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর তেলাওয়াত শুনেছেন তখন আরজ করলেন : আপনি শুনেছেন একথা আমার জানা থাকলে আমি আরো সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম। –[ইবনে কাছীর]

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালকার ক্বারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া চাই। তাঁরা শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্য শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে তেলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই গায়েব হয়ে যায়।

বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল : وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ অস্ত্র জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে যেগুলো পরিধান করে অথবা গলায় লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়, অভিধানের দিক দিয়ে তাকেই لِبَاس বলা হয়। এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধ হেফাজতের জন্য ব্যবহার হয়। অন্য এক আয়াতে আছে وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ অর্থাৎ আমি দাউদের জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম। এই নরম করার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। **এক.** তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা আপনা-আপনি নরম হয়ে যেত, তিনি মোমের ন্যায় তাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটা সরু করতে পারতেন। **দুই.** আগুনে লাগিয়ে নরম করার কৌশল তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছিল, যা আজকাল লৌহ কারখানাসমূহে অনুসৃত হয়।

যে শিল্প দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পয়গম্বরগণের কাজ : আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প হযরত দাউদ (আ.)-কে শেখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেওয়া হয়েছে যে, لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ অর্থাৎ যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ তরবারির বিপদ থেকে হেফাজত করে। এই প্রয়োজন থেকে দীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেওয়াকে আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া ছওয়াবের কাজ; তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গম্বরগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে; যেমন হযরত দাউদ (আ.) থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মূসা-জননীর মতো। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফেরাউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে যে জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, সে জনসেবার ছওয়াব তো পাবেই; তদুপরি শিল্পকর্মের পার্থিব উপকারও সে লাভ করবে। সূরা ত্বা-হা'য় হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে এই হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা : হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আসরের নামাজ ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি এর মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে দেন। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য তিনি একাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ঘোড়ার চাইতে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً : এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ -এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেমন হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর আওয়াজের সাথে তাসবীহ্ পাঠ করত, তেমনি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুতে ভর করে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে যেতেন। এখানে প্রণিধান যোগ্য যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর বশীভূতকরণের মধ্যে مع (সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে ل (জন্য) বর্ণ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে সুলায়মানের জন্য বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীভূতকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। হযরত দাউদ (আ.) যখন তেলাওয়াত করতেন, তখন পর্বত ও পক্ষীকুল স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাসবীহ্ পাঠ শুরু করত, তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করত না। পক্ষান্তরে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যখন ইচ্ছা যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে তার বিশাল সিংহাসন এবং লোক লস্করসহ সেখানে পৌঁছে দিত; যেখানে নামাতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত। –[রূহুল-মা'আনী, বায়যাভী]

তাফসীরে ইবনে কাছীরে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.) কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পরিষদবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হতো, সেখানে পৌঁছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একমাসের দূরত্ব এবং দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একমাসের দূরত্ব অতিক্রম করত; অর্থাৎ একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে আবী হাতেম হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ আসন স্থাপন করা হতো। এগুলোতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে ঈমানদার মানুষ এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্য পক্ষীকুলকে আদেশ করা হতো, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ আনুযায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হতো, সেখানে পৌঁছে দিত। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে হযরত সুলায়মান (আ.) মাথা নত করে আল্লাহর জিকির ও শোকরে মশগুল থাকতেন। ডানে, বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন। –[ইবনে কাছীর]

عَاصِفَةً : এর শাব্দিক অর্থ প্রবল বায়ু। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ رُخَاءً বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ মৃদু বাতাস, যাতে ধুলা উড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ -সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যত এদুটি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর যে, এই বায়ু সত্তাগতভাবে প্রখর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে একমাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহর কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হতো না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোনো পাখিরও কোনোরূপ ক্ষতি হতো না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَهْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা হেদায়েত করছিলেন।

اَدْخَلْنَاهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْخَالٌ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– আমি লূতকে দাখিল করলাম।

نَادٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُنَادَاةٌ মূলবর্ণ (ن - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি দোয়া করেছিলেন।

فَاسْتَجَبْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِجَابَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তখন আমি দোয়া কবুল করেছিলাম।

فَاَغْرَقْنَا هُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِغْرَاقٌ মূলবর্ণ (غ - ر - ق) জিনস صحيح অর্থ– সুতরাং আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম।

نَفَشَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَفْشٌ মূলবর্ণ (ن - ف - ش) জিনস صحيح অর্থ– রাত্রিকালে ঢুকেছিল।

فَفَهَّمْنٰهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَفْهِيْمٌ মূলবর্ণ (ف - ه - م) জিনস صحيح অর্থ– অতঃপর আমি ঐ মীমাংসার জ্ঞান দান করলাম।

يُسَبِّحْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– তারা তাসবীহ পাঠ করত।

عَاصِفَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার عَصْفٌ মূলবর্ণ (ع - ص - ف) জিনস صحيح অর্থ– বশীভূত করেছিলাম।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ এখানে وَسَخَّرْنَا ফে'ল ও ফায়েল আর مع হলো ظرف مكان যা سَخَّرْنَا এর সাথে متعلق হয়েছে دَاوُدَ মুযাফ ইলাইহি الْجِبَالَ মাফউলে বিহী আর يُسَبِّحْنَ পূর্ণ বাক্য হলো الْجِبَالَ থেকে حال আবার এটা جملة مستأنفة ও হতে পারে الطَّيْرَ হলো الْجِبَالَ এর উপর আতফ অথবা مفعول معه আর وَكُنَّا-এর واو আতেফা كُنَّا ফে'ল নাকেস তার যমীর اسم ناقص আর فٰعِلِيْنَ হলো خبر ناقص। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৮]

অনুবাদ	আয়াত
৮২. আর কোনো কোনো জিন এমনও ছিল, যারা সুলায়মানের জন্য (সমুদ্রে) ডুব দিত এবং এতদ্ব্যতীত তারা অন্যান্য কাজও করত; এবং আমি তাদের রক্ষাকারী ছিলাম।	وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. আর আইয়ূবের (কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন তিনি আপন প্রতিপালককে ডেকে বললেন, আমি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছি, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।	وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং তাঁর যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম এবং আমি তাঁকে তাঁর পরিজনবর্গ দান করলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমান সংখ্যক আরো (দান করলাম) আমার বিশেষ অনুগ্রহে এবং ইবাদতকারীদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকার উদ্দেশ্যে।	فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. আর ইসমাঈল ও ইদরীস এবং যুলকিফলের (কাহিনী) আলোচনা করুন, (তাঁরা) সকলে দৃঢ়পদ লোকদের অন্তর্গত ছিলেন।	وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. এবং তাঁদেরকে আমি আমার রহমতের মধ্যে দাখিল করেছিলাম; নিঃসন্দেহে তাঁরা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।	وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ আর কোনো কোনো জিন এমনও ছিল مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ যারা সুলায়মানের জন্য (সমুদ্রে) ডুব দিত وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ এবং এতদ্ব্যতীয় তারা অন্যান্য কাজও করত وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ এবং আমি তাদের রক্ষাকারী ছিলাম।

৮৩. وَاَيُّوْبَ আর আইয়ূবের (কাহিনী) আলোচনা করুন اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ যখন তিনি আপন প্রতিপালককে ডেকে বললেন اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ আমি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছি وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ আর আপনি সকল দয়ালু অপেক্ষা অধিক দয়ালু।

৮৪. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম فَكَشَفْنَا এবং দূর করে দিলাম مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ তাঁর যে কষ্ট ছিল তা وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ এবং আমি তাঁকে তাঁর পরিজনবর্গ দান করলাম وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ এবং তাদের সাথে তাদের সমান সংখ্যক আরো رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا আমার বিশেষ অনুগ্রহে وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ এবং ইবাদতকারীদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকার উদ্দেশ্যে।

৮৫. وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ আর ইসমাঈল ও ইদরীস এবং যুল কিফলের (কাহিনী) আলোচনা করুন كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ (তারা) সকলে দৃঢ়পদ লোকদের অন্তর্গত ছিলেন।

৮৬. وَاَدْخَلْنٰهُمْ আমি তাদেরকে দাখিল করেছিলাম فِىْ رَحْمَتِنَا আমার রহমতের মধ্যে اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ নিঃসন্দেহে তাঁরা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. আর মৎসওয়ালার (কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন তিনি (তাঁর সম্প্রদায় হতে) ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন, আর তিনি ধারণা করেছিলেন যে, আমি তাঁকে পাকড়াও করব না, অবশেষে তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডাকলেন যে, আপনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। আপনি পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমি তো সীমালজ্ঘনকারী (অপরাধী)।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. অতএব, আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করলাম, আর আমি এভাবেই মুমিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।

وَزَكَرِيَّاۤ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. আর যাকারিয়ার (কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন তিনি নিজ প্রতিপালককে ডেকে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রাখবেন না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. অতঃপর আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং আমি তাঁকে দান করলাম (পুত্র) ইয়াহইয়া এবং তাঁর খাতিরে তাঁর (বন্ধ্যা) স্ত্রীকে সন্তান ধারণের উপযুক্তা করে দিলাম, এরা (এ সূরায় বর্ণিত লোক) সকলে প্রতিযোগিতা করতেন আর নেক কাজে আমাকে ডাকতেন আশা ও ভয়সহকারে এবং আমার সম্মুখে অবনমিত থাকতেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৭. وَذَا النُّوْنِ আর মৎসওয়ালার (কাহিনী) আলোচনা করুন اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন فَظَنَّ আর তিনি ধারণা করেছিলেন যে اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ আমি তাকে পাকড়াও করব না فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ অবশেষে তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডাকলেন যে اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ আপনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই سُبْحٰنَكَ আপনি পবিত্র اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ নিঃসন্দেহে আমি সীমালজ্ঘনকারী।

৮৮. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ অতএব আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করলাম وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ আর আমি এভাবে মুমিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।

৮৯. وَزَكَرِيَّاۤ আর যাকারিয়ার (কাহিনী) আলোচনা করুন اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ যখন তিনি নিজ প্রতিপালককে ডেকে বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا আমাকে একা রাখবেন না وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী।

৯০. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ অতঃপর আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى এবং আমি তাঁকে দান করলাম (পুত্র) ইয়াহইয়া وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ এবং তাঁর খাতিরে তাঁর (বন্ধ্যা) স্ত্রীকে সন্তান ধারণের উপযুক্তা করে দিলাম اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ এরা সকলে প্রতিযোগিতা করতেন فِى الْخَيْرٰتِ নেক কাজে وَيَدْعُوْنَنَا আর আমাকে ডাকতেন رَغَبًا وَّرَهَبًا আশা ও ভয়সহকারে وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ এবং আমার সম্মুখে অবনমিত থাকতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুলায়মান (আ.)-এর জিন ও শয়তানকে বশীভূতকরণ : وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ অর্থাৎ আমি সুলায়মান (আ.)-এর জন্য শয়তানদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্য সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত; যেমন-অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ অর্থাৎ তারা সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরি করত। হযরত সুলায়মান (আ.) তাদেরকে অধিক পরিশ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক ছিলাম।
شَيٰطِيْنَ -শয়তান হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট সূক্ষ্ম দেহ। মানুষের ন্যায় তারাও শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই জাতিকে বোঝাবার জন্য আসলে جِنٌّ অথবা جِنَّاتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয়-কাফের, তাদেরকেই শয়তান বলা হয়। বাহ্যত বোঝা যায় যে, মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সব জিন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বশীভূত ছিল, কিন্তু মুমিনরা বশীভূতকরণ ছাড়াই হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিদর্শনাবলি ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে শুধু شَيٰطِيْنَ তথা কাফের জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও জবরদস্তি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আজ্ঞাধীন থাকত। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নতুবা কাফের জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা বরাবরই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার হেফাজতে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারত না।

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব : হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন; যথা পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য দেখাও যায় না এমন সূক্ষ্ম বস্তুকে বশীভূত করেছেন; যেমন– বায়ু, জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। –[তফসীরে কাবীর]

হযরত আইয়ুব (আ.)-এর কাহিনী : আইয়ূব (আ.)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়ায়েতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কুরআন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোনো দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সবই উধাও হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য কোনো কারণে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন; বরং তাদের তুলনায় আরো অধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশির ভাগ ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন : আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ূব (আ.)-কে প্রথম দিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালান-কোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গম্বরসুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে এসবই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুষ্ঠের ন্যায় এক দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে। জিহ্বা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোনো অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি ভাগারে অর্থাৎ আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। শুধু তাঁর স্ত্রী তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়া বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ (আ.)। –[ইবনে-কাছীর] সহায়-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত-মজুরি করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন এবং তাঁর সেবাযত্ন করতেন। হযরত আইয়ূব (আ.)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ অর্থাৎ পয়গম্বরগণ সবচাইতে বেশি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে : প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশি মজবুত; তার বিপদ এবং

পরীক্ষাও তত অধিক হয় (যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহর কাছে উচ্চ হয়) ; আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ূব (আ.)-কে পয়গম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন (যেমন হযরত দাউদ (আ.)-কে শোকরের এমনি স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছিল)। বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে হযরত আইয়ূব (আ.) উপমেয় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে মায়সারাহ্ বলেন, আল্লাহ যখন হযরত আইয়ূব (আ.)-কে অর্থকড়ি, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নিয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতে আরো বেশি আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহর কাছে আরজ করেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ; এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোনো অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

উল্লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, এই কাহিনী সম্পর্কে হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ (র.) থেকে অনেক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে রেওয়ায়েতগুলো সুবিদিত নয়। তাই আমি সেগুলো উল্লেখ করলাম না।

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থি ছিল না : হযরত আইয়ূব (আ.) পার্থিব ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোনো সময় হা-হুতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোনো বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেননি। সতী সাধ্বী স্ত্রী লাইয়া একবার-আরজও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জবাব দিলেন, আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায়! (অথচ আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ-কষ্ট পেশ করা বে-সবরির অন্তর্ভুক্ত নয়) অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলাবাহুল্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল-বেসবরি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে তাঁর সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন, إِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا –(আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি) যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহে বিভিন্নরূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হলো।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আইয়ূব (আ.)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হলো : পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরনা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তা দ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইয়ূব (আ.) তদ্রূপই করলেন। ঝরনার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষত-জর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্যে রক্ত-মাংস ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক পরিধান করে আবর্জনার স্তূপ থেকে একটু সরে গিয়ে একপাশে বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। একপাশে উপবিষ্ট হযরত আইয়ূব (আ.)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন : আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও ব্যাঘ্র কি তাঁকে খেয়ে ফেলেছে? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে হযরত আইয়ূব (আ.) বললেন, আমিই আইয়ূব। কিন্তু স্ত্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন, আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন? হযরত আইয়ূব (আ.) আবার বললেন : লক্ষ্য করে দেখ, আমিই আইয়ূব। আল্লাহ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। শুধু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন। –(ইবনে কাছীর)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত আইয়ূব (আ.)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে নতুন সন্তানও এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কুরআন وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। শা'বী বলেন, এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম। –[কুরতুবী]

যুলকিফল নবী ছিলেন, না ওলী? তার বিস্ময়কর কাহিনী : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিনজন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ও ইদরীস (আ.) যে নবী ও রাসূল ছিলেন, তা কুরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কুরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয়জন হচ্ছেন যুলকিফল। ইবনে-কাছীর (র.) বলেন, তাঁর নাম দুজন পয়গম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহর নবী ছিলেন। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েতে থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গম্বরগণের কাতারভুক্ত ছিলেন না; বরং একজন সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তাফসীরবিদ ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াসা। (যিনি পয়গম্বর ছিলেন বলে কুরআনে উল্লেখ আছে) বার্ধক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সব সাহাবীকে একত্রিত করে বললেন : আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে, তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই, সদা সর্বদা রোজা রাখা, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোনো সময় রাগম্বিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করত। সে বলল, আমি এই কাজের জন্যে উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা' জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সদা সর্বদা রোজা রাখ, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোনো সময় গোস্সা কর না? লোকটি বলল, নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা' সম্ভবত তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মতো তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডয়মান হলো। তখন হযরত ইয়াসা' তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুলকিফল এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখে শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বলল, যাও কোনোরূপে এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্দরুন তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাঙ্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল, সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলিস বলল, তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুলকিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোজা রাখতেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হলো এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর হলো, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌঁছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই জুলুম করেছে, সেই জুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুলকিফল বললেন : আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুলকিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মকদ্দমার ফয়সালা করার জন্য আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্য গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে? উত্তর হলো, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল, হুজুর! আমার শত্রুপক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন, তখন আবার অস্বীকার করে বসে। তিনি আবার বলে দিলেন যে, এখন যাও। আমি যখন মজলিসে বসি, তখন এসো। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হলো না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ঢুলতে লাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া নাড়া না দেয়। বৃদ্ধ এদিনও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল সবাই নিষেধ করলে সে জানালা পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুলকিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ভেতর ঢুকলে কিভাবে? তখন যুলকিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন, তা হলে তুমি আল্লাহর দুশমন ইবলিস। সে স্বীকার করে বলল, আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হননি। এখন আমি আপনাকে কোনোরূপে রাগম্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা' নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুলকিফলের খেতাব দান করা হয়। যুলকিফল শব্দের অর্থ অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফল তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। –[ইবনে কাছীর]

মুসনাদে আহমদে আরো একটি রেওয়ায়েত আছে; কিন্তু তাতে যুলকিফলের পরিবর্তে আলকিফল নাম বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাছীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর বলেছেন, কিফল নামক এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে আয়াতে বর্ণিত যুলকিফল নয়। রেওয়ায়েতটি এই :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে একটি হাদীস একবার দুইবার নয়, সাতবারেরও বেশি শুনেছি। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির নাম ছিল কিফল। সে কোনো গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকত না। একবার জনৈকা মহিলা তার কাছে আগমন করলে সে ষাট দীনারের বিনিময়ে তাঁকে ব্যভিচারে সম্মত করে নিল। সে যখন কু-কর্ম করতে উদ্যত হলো, তখন মহিলাটি কাঁপতে লাগল ও কান্না জুড়ে দিল। সে বলল, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমার উপর কোনো জোর জবরদস্তি করছি? মহিলা বলল, না, জবরদস্তি কর নি; কিন্তু আমি এই পাপকর্ম বিগত জীবনে কোনোদিন করিনি। এখন অভাব-অনটন আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে। তাই সম্মত হয়েছিলাম। একথা শুনে কিফল তদবস্থায়ই মহিলার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল এবং বলল, যাও, এই দীনারও তোমারই। এখন থেকে কিফল আর কোনোদিন পাপ কাজ করবে না। ঘটনাক্রমে সেদিন রাত্রেই কিফল মারা গেল। সকালে তার দরজায় অদৃশ্য থেকে কে যেন এই বাক্য লিখে দিল : غَفَرَ اللّٰهُ لِلْكِفْلِ অর্থাৎ আল্লাহ কিফলকে ক্ষমা করেছেন।

ইবনে কাছীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন যে এই রেওয়ায়েতটি সিহাহ সিত্তায় নেই। এই সনদ অপরিচিত। যদি একে প্রামাণ্যও ধরে নেওয়া হয়, তবে এতে কিফলের কথা বলা হয়েছে যুলকিফলের নয়। মনে হয় সে অন্য কোনো ব্যক্তি وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুলকিফল হযরত ইয়াসা' নবীর খলীফা সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবত বিশেষ ও পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গম্বরগণের কাতারে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা' নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের পদও দান করেছিলেন।

وَذَا النُّوْنِ : হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ.)-এর কাহিনী কুরআন পাকের সূরা ইউনুস, সূরা আম্বিয়া, সূরা সাফফাত ও সূরা নূনে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'যুননূন' এবং কোথাও 'সাহেবুল-হুত' উল্লেখ করা হয়েছে। নূন ও হুত উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুন-নূন ও সাহেবুল-হুতের অর্থ মাছওয়ালা। হযরত ইউনুস (আ.)-কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল! এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে যুন-নূনও বলা হয় এবং সাহেবুল-হুত শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর কাহিনী : তাফসীরে ইবনে কাছীরে আছে, হযরত ইউনুস (আ.)-কে মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। হযরত ইউনুস (আ.) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আজাব এসেই যাবে। (কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আজাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল) অনতিবিলম্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চাদেরকে মায়েদের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আজাব হটিয়ে দেন। এদিকে হযরত ইউনুস (আ.) ভাবছিলেন যে, আজাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আজাব আসেনি এবং তাঁর সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোনো কেনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। (মাযহারী) এর ফলে হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রাণনাশেরও আশঙ্কা দেখা দিল। সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে তিনি ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে একটি নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারি করা হলে ঘটনাচক্রে এখানে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নাম বের হলো। (আরোহীরা বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই) তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হলো। পুনরায় লটারি করা হলো। এবারও হযরত ইউনুস (আ.)-এর নামই বের হলো।

আরোহীরা তখনও দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লটারি করা হলো। কিন্তু নাম হযরত ইউনুস (আ.)-এরই বের হলো। এই লটারির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ অর্থাৎ লটারির ব্যবস্থা করা হলে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নামই তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আ.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ তা'আলা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানিচিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে যায় (হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্তি) এবং হযরত ইউনুস (আ.)-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আ.)-এর অস্থি-মাংসের যেন কোনো ক্ষতি না হয়; সে তার খাদ্য নয়, বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্য তাঁর কয়েদখানা। (ইবনে কাছীর) কুরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যক্রম আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি অসন্তোষের কারণ হন এবং তাঁকে সমুদ্রে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আজাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। বাহ্যত এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না; বরং আল্লাহর ওহীর কারণে ছিল। পয়গম্বরগণের সনাতন রীতি অনুযায়ী নিজের জনগোষ্ঠীকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যত আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এরূপ কোনো ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহর অসন্তোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন সম্প্রদায়ের খাঁটি তওবা ও কান্নাকাটি কবুল করে তাদের উপর থেকে আজাব অপসৃত করেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের উদ্দেশে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে; বরং প্রাণ-নাশেরও আশঙ্কা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তজ্জন্যে আল্লাহ তা'আলা ধরপাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যদিও গোনাহ্ ছিল না, কিন্তু উত্তম পন্থার খেলাফ অবশ্যই ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করেননি। পয়গম্বর ও আল্লাহর নৈকট্যশীলদের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের অভিরুচি-জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ত্রুটি হলে তজ্জন্যে ধৃত করা হয়। এ কারণেই হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহর রোষে পতিত হন।

তাফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যত তাঁর পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আজাব হটে যাওয়ার পরই হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রতি রোষের এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করাও আজাব দানের উদ্দেশ্যে নয়, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল; যেমন পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদান গণ্য হয়ে থাকে; যাতে ভবিষ্যতে সে সর্তক হয়। –(কুরতুবী)

ذَهَبَ مُغَاضِبًا : অর্থাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যত এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা رَبّ শব্দটিকে مُغَاضِبًا -এর مَفْعُوْل বলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যও مُغَاضِبًا لِرَبِّهٖ : অর্থাৎ পলানকর্তার খাতিরে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। কাফের ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র খাতিরে রাগান্বিত হওয়া সাক্ষাত ঈমানের আলামত। –[কুরতুবী, বাহরে-মুহীত]

فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ : অভিধানের দিক দিয়ে نَقْدِرَ শব্দের তিন রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যদি قُدْرَتٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে, তিনি ধারণা করলেন যে, আমি তাকে কাবু করতে পারব না। বলাবাহুল্য, এরূপ ধারণা কোনো পয়গম্বর তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে পারে না। কারণ এরূপ মনে করা প্রকাশ্য কুফর। কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়, এটা قَدَرٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এর অর্থ 'সংকীর্ণ করা' যেমন এক আয়াতে রয়েছে اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। হযরত আতা, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বসরী প্রমুখ তাফসীরবিদগণ এ অর্থই নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইউনুস (আ.) মনে করলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনোরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। তৃতীয়, এটা তাফসীরের অর্থে قَدْرٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিচারে রায় দেওয়া। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, হযরত ইউনুস (আ.) মনে করলেন, এ ব্যাপারে আমার কোনো ত্রুটি ধরা হবে না। কাতাদাহ্, মুজাহিদ, ফাররা প্রমুখ তাফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা, প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্য, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্য মকবুল : وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ –অর্থাৎ আমি যেভাবে হযরত ইউনুস (আ.)-কে দুশ্চিন্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মুমিনকেও করে থাকি; যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাসূল ﷺ বলেন, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ মাছের পেটে পাঠকৃত হযরত ইউনুস (আ.)-এর এই দোয়াটি যদি কোনো মুসলমান কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করবেন। –[মাযহারী]

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا الخ : হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের একান্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দোয়া করেছেন, কিন্তু সাথে সাথে وانت خير الورثين ও বলেছিলেন। অর্থাৎ পুত্র পাই বা না পাই; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিশ। এটা পয়গম্বরসুলভ শিষ্টা প্রদর্শন বৈ নয়। কারণ পয়গম্বরগণের আসল মনোযোগ আল্লাহ তা'আলার দিকেই থাকা উচিত। অন্যের প্রতি মনোযোগ হলেও আসল বিষয় থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে নয়।

وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا : তারা আগ্রহ ও ভয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলাকে ডাকে। এর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা ইবাদত ও দোয়ার সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে। আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল ও ছওয়াবের আশাও রাখে এবং স্বীয় গোনাহ্ ও ত্রুটির জন্য ভয়ও করে। -[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَغُوْصُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার غَوْصٌ মূলবর্ণ (غ - و - ص) জিনস اجوف واوى অর্থ– যারা ডুব দিত।

مَسَّنِىَ : সীগাহ واحد مذكرغائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার مَسِيْسٌ ও مَس মূলবর্ণ (م - س - س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমি নিপতিত হয়েছি।

مُغَاضِبًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُغَاضَبَةُ মূলবর্ণ (غ - ض - ب) জিনস صحيح অর্থ– ক্রুদ্ধ হয়ে, ক্রুদ্ধাবস্থায়।

فَنَادٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُنَادَاةٌ মূলবর্ণ (ن - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অবশেষে তিনি ডাকলেন।

نُنْجِىْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اِنْجَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি নাজাত দিয়ে থাকি।

لَا تَذَرْنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার وذر মূলবর্ণ (و - ذ - ر) জিনস مثال واوى অর্থ– আমাকে একা রাখবেন না, আমাকে ছেড়ে দেবেন না।

اَلْوَارِثِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব حَسِبَ মাসদার وِرَاثٌ মূলবর্ণ (و - ر - ث) জিনস مثال واوى অর্থ– উত্তরাধিকারীগণ।

كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُسَارَعَةٌ মূলবর্ণ (س - ر - ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রতিযোগিতা করতেন।

يَدْعُوْنَنَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– এরা সকলে আমাকে ডাকতেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ : এখানে فَاسْتَجَبْنَا -এর فاء টি আতেফা اِسْتَجَبْنَا ফে'ল ও ফায়েল, আর হলো لَهٗ -এর اِسْتَجَبْنَا متعلق আর এর মাফউল উহ্য نداءه শব্দটি আর وَاَصْلَحْنَا ফে'ল ও ফায়েল, আর হলো لَهٗ -এর اَصْلَحْنَا সাথে متعلق আর زَوْجَهٗ হলো مفعول به আর اِصْلَاح দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বন্ধ্যাত্বের পরেও তাকে সন্তান জন্ম দেওয়ার যোগ্য করে তোলা। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭১]

৯১. আর সেই বিবি (মারইয়ামের কাহিনী)-এর আলোচনা করুন, যিনি নিজের সতীত্বের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন, অতঃপর আমি তাঁর মধ্যে আমার রূহ ফুঁকেছিলাম, আর আমি তাঁকে এবং তাঁর পুত্রকে জগদ্বাসীদের জন্য (আমার কুদরতের) নিদর্শন করেছিলাম।	وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾
৯২. (হে লোক সকল!) এটাই তোমাদের জাতি– যা একই জাতি, আর আমিই হচ্ছি তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং আমারই ইবাদত কর।	اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾
৯৩. আর তারা নিজেদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করে নিল, সকলেই আমার সমীপে ফিরে আসবে।	وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٣﴾
৯৪. অনন্তর যে ব্যক্তি নেক কাজ করতে থাকবে এবং সে ঈমানদারও হবে, তবে তার পরিশ্রম ব্যর্থ হবে না, আর আমি তা লিখে নিয়েছি।	فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. আর আমি যে সকল জনপদ ধ্বংস করেছি, তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, তারা আবার ফিরে আসবে।	وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾
৯৬. অবশেষে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হবে আর তারা প্রত্যেক উচ্চস্থান হতে বের হতে থাকবে।	حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯১. وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا আর সেই বিবি (মারইয়ামের কাহিনী) এর আলোচনা করুন, যিনি নিজের সতীত্বের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا অতঃপর আমি তাঁর মধ্যে আমার রূহ ফুঁকেছিলাম وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً আর আমি তাকে এবং তাঁর পুত্রকে নিদর্শন করেছিলাম لِّلْعٰلَمِيْنَ জগদ্বাসীর জন্য।

৯২. اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ এটাই তোমাদের জাতি اُمَّةً وَّاحِدَةً যা একই জাতি وَّاَنَا رَبُّكُمْ আর আমিই হচ্ছি তোমাদের প্রতিপালক فَاعْبُدُوْنِ সুতরাং আমারই ইবাদত কর।

৯৩. وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ আর তারা নিজেদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করে নিল كُلٌّ اِلَيْنَا সকলেই আমার সমীপে رٰجِعُوْنَ ফিরে আসবে।

৯৪. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ অনন্তর যে ব্যক্তি নেক কাজ করতে থাকবে وَهُوَ مُؤْمِنٌ এবং সে ঈমানদারও হবে فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ তবে তার পরিশ্রম ব্যর্থ হবে না وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ আর আমি তা লিখে নিচ্ছি।

৯৫. وَحَرٰمٌ আর সম্ভব নয় عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ আমি যে সকল জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পক্ষে اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ তারা আবার ফিরে আসবে।

৯৬. حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ অবশেষে যখন মুক্ত করে দেওয়া হবে يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ ইয়াজুজ ও মাজুজদেরকে وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ আর তারা প্রত্যেক উচ্চস্থানে হতে বের হতে থাকবে।

অনুবাদ	আয়াত
৯৭. আর সত্য ওয়াদা নিকটে এসে পৌঁছবে, তখন হঠাৎ এরূপ অবস্থা হবে যে, অবিশ্বাসীদের চক্ষুগুলো বিস্ফারিত হয়ে থাকবে; (এবং বলবে), হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা এ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম, বরং আমরাই সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।	وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾
৯৮. নিঃসন্দেহে তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসনা করছ তারা সকলে দোজখের ইন্ধন হবে; তোমরা সকলে তাতে প্রবেশ করবে।	إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۖ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾
৯৯. যদি এরা প্রকৃতই মা'বূদ হতো, তবে তারা তাতে (দোজখে) প্রবেশ করত না? এবং তারা সকলে তাতে অনন্তকাল থাকবে।	لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾
১০০. সেখানে তাদের আর্তনাদ হবে এবং তথায় তারা কোনো কথা শুনতেও পাবে না।	لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾
১০১. যাদের জন্য আমার পক্ষ হতে মঙ্গল নির্ধারিত হয়ে আছে, তাদেরকে তা (দোজখ) হতে দূরে রাখা হবে।	إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾
১০২. তারা এর ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না, এবং তারা নিজেদের বাঞ্ছিত বস্তুসমূহের মধ্যে অনন্তকাল থাকবে।	لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. وَاقْتَرَبَ আর নিকটে এসে পৌঁছবে الْوَعْدُ الْحَقُّ সত্য ওয়াদা فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ তখন হঠাৎ এরূপ অবস্থা হবে যে, বিস্ফারিত হয়ে থাকবে أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا অবিশ্বাসীদের চক্ষুগুলো يَا وَيْلَنَا (এবং বলবে) হায় আমাদের দুর্ভাগ্য قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا আমরা এ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ বরং আমরাই সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।

৯৮. إِنَّكُمْ নিঃসন্দেহে তোমরা وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসনা করছ তারা সকলে حَصَبُ جَهَنَّمَ দোজখের ইন্ধন হবে أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ তোমরা সকলে তাতে প্রবেশ করবে।

৯৯. لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً যদি এরা প্রকৃতই মা'বূদ হতো مَا وَرَدُوهَا তবে তারা তাতে প্রবেশ করত না وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ তারা সকলে তাতে অনন্তকাল থাকবে।

১০০. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ সেখানে তাদের আর্তনাদ হবে وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ এবং তথায় তারা কোনো কথা শুনতেও পাবে না।

১০১. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ যাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে مِّنَّا الْحُسْنَىٰ আমার পক্ষ থেকে মঙ্গল أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ তাদেরকে তা (দোজখ) হতে দূরে রাখা হবে।

১০২. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا তারা এর ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না وَهُمْ এবং তারা فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ নিজেদের বাঞ্ছিত বস্তুসমূহের মধ্যে خَالِدُونَ অনন্তকাল থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)

শানে নুযূল : ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ নিঃসন্দেহে তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সকলেই তাতে প্রবেশ করবে।

আয়াত যখন নাজিল হলো, তখন মুশরিকরা বলতে লাগল যে, আল্লাহকে ছাড়া ফেরেশতা, ঈসা ও ওযায়ের (আ.) প্রমুখ পবিত্র সত্তার ও তো উপাসনা করা হচ্ছে? সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। −[ফাতহুল কাদীর ৪৩১/৩, তাবারী ৯১/৯, কুরতুবী ৩০০/১১, বাহরে মুহীত্ব ৩১৬/৬ রূহুল মা'আনী ৯৫/৯/১৭, ইবনে কাছীর ২০৪/৩]

وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ : এখানে 'হারাম' শব্দটি 'শরিয়তগত অসম্ভব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসীরবিদদের মতে لا অতিরিক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোনো কোনো তাফসীরবিদ حرام শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরি অর্থে ধরে لا কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদেকে আমি আজাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্য দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরি। −(কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কিয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ : এখানে حتى শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে,পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ্ মুসলিমে হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কায়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করছিলাম। ইতঃমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন ; যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন। আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য فُتِحَتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোনো বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ তা'আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেওয়া হবে। কুরআন পাক থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম হবে। সূরা কাহ্ফে ইয়াজূজ-মাজূজ, যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

حَدَبٍ শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি-বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট ছোট টিলা। সূরা কাহ্ফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের জায়গা পৃথিবীর উত্তরদিকস্থ পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তরদিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উতলিয়ে পড়তে দেখা যাবে।

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ : অর্থাৎ তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফেরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ ইবাদত তো হযরত ঈসা (আ.) হযরত ওযায়ের (আ.) ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? তাফসীরে কুরতুবীর এক

রেওয়ায়েতে এই প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কুরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। জানি না, সন্দেহের জবাব তাদের জানা আছে বলেই জিজ্ঞাসা করে না, না তারা সন্দেহের ও জবাবের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না। লোকেরা আরজ করল, আপনি কোন আয়াতের কথা বলেছেন? তিনি বললেন, আয়াতটি হলো এই–
إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফেরদের বিতৃষ্ণার অবধি থাকে না। তারা বলতে থাকে, এতে আমাদের উপাস্যদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা (কিতাবী আলেম) ইবনে যাবআরীর কাছে পৌঁছে এ বিষয়ে নালিশ করল। তিনি বললেন, আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সমুচিত জবাব দিতাম। আগন্তুকরা জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জবাব দিতেন? তিনি বললেন আমি বলতাম যে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর এবং ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-এর ইবাদত করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ) আপনি কি বলেন? (নাউযুবিল্লাহ) তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? কাফেররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হলো যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ এ একথার জবাব দিতে পারবেন না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল করেন : إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সুফল অবধারিত হয়ে গেছে, তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে।
এই ইবনে যাবআরী সম্পর্কেই কুরআন পাকের এই আয়াত নাজিল হয়েছিল : وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ অর্থাৎ যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَحْصَنَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْصَانٌ মূলবর্ণ (ح - ص - ن) জিনস صحيح অর্থ– তিনি রক্ষা করেছিলেন।

وَتَقَطَّعُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَقَطُّعٌ মূলবর্ণ (ق - ط - ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা বিভেদ সৃষ্টি করে নিল।

يَنْسِلُونَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نَسْلٌ মূলবর্ণ (ن - س - ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা বের হতে থাকবে।

اِقْتَرَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِرَابٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– সে নিকটে এসে পৌঁছবে।

شَاخِصَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার شُخُوْصٌ মূলবর্ণ (ش - خ - ص) জিনস صحيح অর্থ– বিস্ফারিত হয়ে থাকবে।

مُبْعَدُونَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبْعَادٌ মূলবর্ণ (ب - ع - د) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে দূরে রাখা হবে।

اِشْتَهَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِشْتِهَاءٌ মূলবর্ণ (ش - ه - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– বাঞ্ছিত, সে পেতে চায়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ : এখানে وَحَرَامٌ-এর واو টি অতেফা বা استئنافية আর حَرَامٌ হলো خبر مقدم আর عَلَىٰ قَرْيَةٍ মুতাআল্লিক হলো حَرَامٌ-এর সাথে, আর أَهْلَكْنَاهَا বাক্যটি হলো قَرْيَةٍ-এর সিফত, আর أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ হলো مبتدا موخر এখানে أَنَّهُمْ-এর ان হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল هُمْ হলো اسم ان আর لَا يَرْجِعُونَ হলো خبر ان। –[ইরাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৪]

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

১০৩. (হাশরের মাঠের) মহা বিভীষিকা তাদেরকে বিচলিত করবে না এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবেন, (বলবেন), এটাই তোমাদের সেই দিন– যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿۱۰۴﴾

১০৪. সেই দিনটিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি আসমানসমূহকে এমনভাবে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে লিখিত কাগজসমূহ গুটিয়ে নেওয়া হয়; আমি প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় যেভাবে আরম্ভ করেছিলাম, সেভাবেই তাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রুতি পালন করা আমার কর্তব্য, আমি অবশ্য (পূর্ণ) করব।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৫. আর আমি (আসমানি) কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি, লাওহে মাহফূযে (লিখা)-এর পরে- এ জমিনের (বেহেশতের) মালিক আমার নেক বান্দাগণ হবে।

اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿۱۰۶﴾ ؕ

১০৬. নিঃসন্দেহে এটা (কুরআন)-এর মধ্যে ইবাদতকারী লোকদের জন্য যথেষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

১০৭. আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৮. আপনি বলে দিন, আমার নিকট তো শুধু এই ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ সুতরাং এখনো কি তোমরা তা মানবে?

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৩. لَا يَحْزُنُهُمُ তাদেরকে বিচলিত করবে না الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ মহা বিভিষিকা وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবেন هٰذَا يَوْمُكُمُ (বলবেন) এটাই তোমাদের সেই দিন الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

১০৪. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ সেই দিনটিও স্মরণযোগ্য যেদিন আমি আসমানসমূহকে এমনভাবে গুটিয়ে ফেলব كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ যেভাবে লিখিত কাগজ গুটিয়ে ফেলা হয় كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ আমি প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় যেভাবে আরম্ভ করেছিলাম نُّعِيْدُهٗ সেভাবেই তাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব وَعْدًا عَلَيْنَا এটা আমার অবশ্য পালনীয় ওয়াদা اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ আমি অবশ্য (পূর্ণ) করব।

১০৫. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ আর আমি (আসমানি) কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ লওহে মাহফূজে লেখার পরে اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا এই জমিনের (বেহেশতের) মালিক হবে عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ আমার নেক বান্দাগণ।

১০৬. اِنَّ فِيْ هٰذَا নিঃসন্দেহে এটার মধ্যে রয়েছে لَبَلٰغًا যথেষ্ট বিষয়বস্তু لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ইবাদতকারী লোকদের জন্য।

১০৭. وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ আর আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই।

১০৮. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ আমার নিকট তো শুধু এই ওহী আসে যে اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ সুতরাং এখনো কি তোমরা তা মানবে?

১০৯. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলে দিন, আমি তো তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি (কাজেই তোমাদের ওজর করার কোনো সুযোগ নেই); আর আমি এটা জানি না যে, তোমাদের সাথে যে (শাস্তির) ওয়াদা করা হয়েছে তা নিকটে, নাকি দূরে।	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾
১১০. আল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে কথিত কথাও জানেন এবং যা তোমরা অন্তরে রাখ তাও জানেন।	إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾
১১১. আর আমি জানি না, হয়তো তা তোমাদের জন্য পরীক্ষা এবং এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত উপভোগের অবকাশ মাত্র।	وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾
১১২. রাসূল বললেন, হে আমার প্রতিপালক! ন্যায়বিচার করে দিন, আর আমাদের প্রতিপালক অতিশয় অনুগ্রহশীল– যাঁর সমীপে সেই সমস্ত কথার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা যাচ্ছে যা তোমরা বলছ।	قُلْ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৯. فَإِنْ تَوَلَّوْا অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় فَقُلْ তবে আপনি বলে দিন آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি وَإِنْ أَدْرِي আর আমি এটা জানি না যে أَقَرِيبٌ তা নিকটে أَمْ بَعِيدٌ নাকি দূরে مَا تُوعَدُونَ তোমাদের সাথে যে (শাস্তির) ওয়াদা করা হয়েছে।

১১০. إِنَّهُ يَعْلَمُ আল্লাহ জানেন الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ উচ্চৈঃস্বরে কথিত কথা وَيَعْلَمُ এবং জানেন مَا تَكْتُمُونَ তাও যা তোমরা অন্তরে রাখ।

১১১. وَإِنْ أَدْرِي আর আমি জানিনা لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ হয়তো তা তোমাদের জন্য পরীক্ষা وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ এবং এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত উপভোগের অবকাশ মাত্র।

১১২. قَالَ রাসূল বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক احْكُمْ بِالْحَقِّ ন্যায় বিচার করে দিন وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ আর আমাদের প্রতিপালক অতিশয় অনুগ্রহশীল الْمُسْتَعَانُ যাঁর সমীপে সে সমস্ত কথার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা যাচ্ছে عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ যা তোমরা বলছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, فَزَعٌ أَكْبَرُ (মহাত্রাস) বলে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্য উত্থিত হবে। কারো কারো মতে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন, শিঙ্গায় তিনবার ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকার হবে ত্রাসের ফুৎকার। এতে সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। আয়াতে একেই فَزَعٌ أَكْبَرُ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ফুৎকার হবে বজ্রের ফুৎকার। এতে সব মানুষ মারা যাবে এবং সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুৎকার হবে পুনরুত্থানের ফুৎকার। এতে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে মুসনাদে আবূ ইয়া'লা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে হযরত আবূ হুরায়রার একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। –[মাযহারী]

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) سِجِلّ শব্দের অর্থ করেছেন সহীফা। আলী ইবনে তালহা, আউফী, মুজাহিদ, কাতাদাহ্ প্রমুখও এই অর্থ বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাছীর, ইবনে জারীর প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। كُتُب শব্দের অর্থ এখানে مَكْتُوْب অর্থাৎ লিখিত। আয়াতের অর্থ এই যে, কোনো সহীফাকে তার লিখিত বিষয়বস্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশ-মণ্ডলীকে সেইভাবে গুটানো হবে। (ইবনে কাছীর, রূহুল-মা'আনী) سِجِلّ সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা কোনো ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। হাদীসবিদগণের কাছে এই রেওয়ায়েত গ্রাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ তা'আলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে। –[ইবনে কাছীর]

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ : এখানে زَبُوْر শব্দটি زُبُرْ-এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যাবূর। এখানে زَبُوْرٌ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে আছে, আয়াতে ذِكْر বলে তাওরাত এবং زَبُوْرٌ বলে তাওরাতের পর অবতীর্ণ আল্লাহর গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে, যথা ইঞ্জিল, যাবূর ও কুরআন। -(ইবনে জারীর) যাহ্হাক থেকে এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ বলেন, ذِكْرٌ বলে লওহে মাহ্ফুজ এবং زَبُوْرٌ বলে পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর সকল গ্রন্থই বোঝানো হয়েছে। যুজাজ এ অর্থই পছন্দ করেছেন। –[রূহুল-মা'আনী]

اَلْاَرْضُ : অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদের মতে এখানে اَرْض (পৃথিবী) বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, সুদ্দী, আবুল আলিয়া থেকেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম রাযী (র.) বলেন, কুরআনের অন্য আয়াতও এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاۤءُ অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর মালিক হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো মুমিন-কাফের সবাই হয়ে যায়। এ ছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কিয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর অপর এক রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে اَرْض এর অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী - অর্থাৎ দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জান্নাতের পৃথিবীও। জান্নাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সৎকর্মপরায়ণগণ হবে, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। তবে এক সময় তারা এককভাবে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছে اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং শুভ পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্যই। অপর এক আয়াতে আছে وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ মুমিন ও সৎকর্মীদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা করবেন। আরো এক আয়াতে আছে اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ -নিশ্চয় আমি আমার পয়গম্বগণকে এবং মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতের দিন সাহায্য করব। ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণরা একবার পৃথিবীর বৃহদাংশ অধিকারভুক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। ইমাম মাহদী (আ.)-এর জমানায় আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। –[রূহুল মা'আনী, ইবনে কাছীর]

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ : এখানে عَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمْ এর বহুবচন। মানব, জিন, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার জন্যই রহমতস্বরূপ ছিলেন, কেননা আল্লাহর জিকির ও ইবাদত

হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টজগতের সত্যিকার রূহ। এ কারণেই যখন পৃথিবী থেকে এই রূহ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কিয়ামত এসে যাবে। যখন জানা গেল যে, আল্লাহর জিকির ও ইবাদত সব বস্তুর রূহ, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বস্তুর জন্য রহমতস্বরূপ, তা আপনা-আপনি ফুটে উঠল। কেননা দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর জিকির ও ইবাদত তাঁরই প্রচেষ্টায়ও শিক্ষার বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত। –[ইবনে আসাকির] হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বাচনিক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, اَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ بِرَفْعِ قَوْمٍ وَخَفْضِ اٰخَرِيْنَ অর্থাৎ আমি আল্লাহর প্রেরিত রহমত, যাতে (আল্লাহর আদেশ পালনকারী) এক সম্প্রদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন করি এবং (আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী) অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে দেই। –[ইবনে-কাছীর]

এ থেকে জানা গেল যে, কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কাফেরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মোকাবিলায় জেহাদ করাও সাক্ষাৎ রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَايَحْزُنُهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفي فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার حُزْنٌ মূলবর্ণ (ح-ز-ن) জিনস صحيح অর্থ– তা তাদেরকে বিচলিত করবে না।

نَطْوِىْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার طَيٌّ মূলবর্ণ (ط-و-ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– আমি গুটিয়ে ফেলব।

نُعِيْدُهٗ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعَادَةٌ মূলবর্ণ (ع-و-د) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি একে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব।

يَرِثُهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব حَسِبَ মাসদার وِرْثٌ মূলবর্ণ (و-ر-ث) জিনস مثال واوى অর্থ– এর পর সে এর মালিক হবে।

يُوْحٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْحَاءٌ মূলবর্ণ (و-ح-ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– ওহী আসে।

اِنْ تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف মাসদার تَوَلِّىْ মূলবর্ণ (و-ل-ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

اٰذَنْتُكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব افعال মাসদার اِيْذَانٌ মূলবর্ণ (ا-ذ-ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমি তো তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি।

اَلْمُسْتَعَانُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِعَانَةٌ মূলবর্ণ– (ع-و-ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– যার সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করা যাচ্ছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَاءٍ : এখানে শুরুর فاء টি হলো استئنافية আর اِنْ হলো شرطية আর تَوَلَّوْا হলো ফে'ল ও ফায়েল, আর فَقُلْ এর فاء টি হলো جواب شرط এর সংযোগ স্থাপনকারী, আর قُلْ ফে'ল ও ফায়েল, اٰذَنْتُكُمْ হলো ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল বিহী পুরো বাক্যটি جزم এর স্থলে জবাবে শর্ত عَلٰى سَوَاءٍ টা উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে ت (যা ফায়েল) থেকে حال অথবা كُمْ (যা মাফউল) থেকে حال হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৩]

سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ

সূরা হাজ্জ

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৭৮, রুকু'– ১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. হে লোকসকল! নিজেদের প্রতিপালককে ভয় কর, নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কম্পন বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে।	يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴿۱﴾
২. যেদিন তোমরা তা (ঐ কম্পন) দেখবে, সেদিন (এমন অবস্থা হবে যে,) সমস্ত স্তন্যদায়িনী তাদের স্তন্যপায়ীকে ভুলে যাবে এবং সকল গর্ভবর্তী নারীরা (সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে) তাদের গর্ভকে নিক্ষেপ করবে, আর তুমি মানুষকে নেশাগ্রস্ত সদৃশ্য দেখতে পাবে অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়, বস্তুত আল্লাহর আজাব বড় কঠোর।	يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ﴿۲﴾
৩. আর কতিপয় লোক এরূপ আছে যারা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে না জেনে না বুঝে তর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ﴿۳﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে লোক সকল! اتَّقُوْا رَبَّكُمْ নিজের প্রতিপালককে ভয় কর اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কম্পন شَيْءٌ عَظِيْمٌ বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে।

২. يَوْمَ تَرَوْنَهَا যেদিন তোমরা তা (ঐ কম্পন) দেখবে تَذْهَلُ সে দিন ভুলে যাবে كُلُّ مُرْضِعَةٍ সমস্ত স্তন্যদায়িনী عَمَّآ اَرْضَعَتْ তাদের স্তন্যপায়ীকে وَتَضَعُ এবং নিক্ষেপ করবে كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ সকল গর্ভবতী নারীরা حَمْلَهَا তাদের গর্ভকে وَتَرَى النَّاسَ আর তুমি মানুষকে দেখতে পাবে سُكٰرٰى নেশাগ্রস্ত وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয় وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ বস্তুত আল্লাহর আজাব বড় কঠোর।

৩. وَمِنَ النَّاسِ আর কতিপয় লোক এমন আছে مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ যারা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে তর্ক করে بِغَيْرِ عِلْمٍ না জেনে না বুঝে وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ এবং প্রত্যেক অবাধ্য বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে।

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٤﴾

৪. যার সম্বন্ধে একথা লিখিত হয়ে গেছে যে, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক রাখবে, তবে তার কাজই হলো এই যে, সে তাকে বিপথগামী করে দেবে এবং তাকে দোজখের আজাবের পথ দেখিয়ে দেবে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

৫. (আল্লাহ বলেন) হে মানুষগণ! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহে থাক, তবে (চিন্তা কর যে,) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, অতঃপর বীর্য হতে, অতঃপর জমাট রক্ত হতে, তৎপর মাংসপিণ্ড হতে, যা পূর্ণাকৃতিও হয়ে থাকে এবং অপূর্ণাকৃতিও হয়ে থাকে, যেন আমি তোমাদের সম্মুখে (নিজ কুদরত) প্রকাশ করে দেই, আর আমি যাকে (যে বীর্যকে) ইচ্ছা এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত গর্ভাধারে স্থির রেখে দেই, অতঃপর আমি তোমাদেরকে শিশুর আকারে (মাতৃ গর্ভ হতে) বের করি, অতঃপর যেন তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও, আর তোমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে, যারা (যৌবনের পূর্বেই) মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, আর কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে এমনও আছে যাদেরকে অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়ে থাকে, যার ফলে তারা কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে পুনঃ (ঐ বিষয়) ভুলে যায়; আর হে শ্রোতা! তুমি জমিনকে দেখছ যে, তা শুষ্ক, অতঃপর যখন আমি এর উপর পানি বর্ষণ করি, তখন তা সরস হয় আর স্ফীত হয়ে উঠে এবং নানা রকমের নয়নাভিরাম উদ্ভিদসমূহ উৎপন্ন করতে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. كُتِبَ عَلَيْهِ যার সম্বন্ধে লিখিত হয়ে গেছে أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ এ কথা যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক রাখবে فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ তবে তার কাজই হলো এই যে, সে তাকে বিপথগামী করে দেবে وَيَهْدِيهِ এবং তাকে দেখিয়ে দেবে إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ দোজখের আজাবের পথ।

৫. يَا أَيُّهَا النَّاسُ হে মানুষগণ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ যদি তোমরা সন্দেহে থাক مِنَ الْبَعْثِ পুনরুত্থান সম্বন্ধে فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ তবে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি مِنْ تُرَابٍ মাটি হতে ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ অতঃপর বীর্য হতে ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ অতঃপর জমাট রক্ত হতে ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ তৎপর মাংসপিণ্ড হতে مُخَلَّقَةٍ যা পূর্ণাকৃতি হয়ে থাকে وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ এবং অপূর্ণাকৃতিও হয়ে থাকে لِنُبَيِّنَ لَكُمْ যেন আমি তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দেই وَنُقِرُّ আর আমি স্থির রাখি فِي الْأَرْحَامِ গর্ভাধারে مَا نَشَاءُ যাকে ইচ্ছা إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا অতঃপর আমি তোমাদেরকে শিশু আকারে বের করি ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ অতঃপর তোমরা যেন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ আর তোমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যারা (যৌবনের পূর্বেই) মৃত্যু প্রাপ্ত হয় وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ আর কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে এমনও আছে যাদেরকে পৌঁছানো হয়ে থাকে إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا যার ফলে তারা কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে পুনঃ (ঐ বিষয়) ভুলে যায় وَتَرَى الْأَرْضَ আর হে শ্রোতা তুমি জমিনকে দেখছ هَامِدَةً তা শুষ্ক فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ অতঃপর যখন আমি তার উপর পানি বর্ষণ করি اهْتَزَّتْ তখন তা সরস হয় وَرَبَتْ আর স্ফীত হয়ে উঠে وَأَنْبَتَتْ, এবং উৎপন্ন করতে থাকে مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ নানা রকমের সুদর্শন উদ্ভিদসমূহ।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٦

৬. এসব এ কারণে হয়েছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এবং তিনিই প্রাণহীনকে প্রাণ দান করে থাকেন এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. ذٰلِكَ এসব এ কারণে হয়েছে بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ আল্লাহ হচ্ছেন অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى এবং তিনিই প্রাণহীনকে প্রাণ দান করে থাকেন وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে হাজ্জ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : তত্ত্বজ্ঞানীগণ সূরা হাজ্জ মক্কী নাকি মাদানি সূরার অন্তর্ভুক্ত– সে প্রশ্নে একাধিক মত পোষণ করেছেন। ইবনে মারদুভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সূরা হাজ্জ মদিনা মুনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত আছে। ইবনুল মুনযির (র.) হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সূরা হাজ্জ মদিনা শরীফে নাজিল হয়েছে, তবে এ সূরার ৪ আয়াত মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, এ সূরা মদিনা শরীফে নাজিল হয়েছে। তবে এর ১০ টি আয়াত মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, এ সূরায় মক্কা শরীফ এবং মদিনা শরীফে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ একত্র হয়েছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ সূরাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর, এর আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে রাত্রে এবং দিনে, ভ্রমণকালে এবং গৃহে অবস্থানকালে, মক্কা শরীফে এবং মদিনা শরীফে, শান্তিপূর্ণ অবস্থায় এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায়।

এ ছাড়া এর কিছু আয়াত রহিতকারী, কিছু আয়াত রহিত এবং কিছু মুহকাম তথা সুস্পষ্ট ও কিছু মুতাশাবিহ তথা অস্পষ্ট। সূরাটিতে অবতরণের সব প্রকারই সন্নিবেশিত হয়েছে।

সূরা হাজ্জের ফজিলত : আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনে মারদূভিয়া ও বায়হাকী (র.) প্রমুখ হযরত আকাবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরা হাজ্জকে কি দু'ই সেজদার কারণে বিশেষ ফজিলত প্রদান করা হয়নি? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– হ্যাঁ, যে এই দু'টি সেজদা না করবে, সে যেন এ সূরা পাঠ না করে। হযরত খালেদ ইবনে মেদান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দু'টি সেজদার কারণে পবিত্র কুরআনে সূরা হাজ্জের বিশেষ ফজিলত রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-সূরা হাজ্জ পাঠ করার সময় দু'টি সেজদা দিতেন এবং তিনি বলেছেন, এ সূরায় দু'টি সেজদার আয়াত থাকার কারণে সমগ্র কুরআনে এর বিশেষ ফজিলত রয়েছে। আরো অনেক সাহাবায়ে কেরাম সূরা হাজ্জ সম্পর্কে এ মত পোষণ করতেন। পরবর্তীকালের মনীষীদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) প্রমুখ এ মতই পোষণ করতেন। অবশ্য কোনো কোনো মনীষী বলেছেন, সূরা হাজ্জে একটি সেজদার আয়াতই রয়েছে, যেমন হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) প্রমুখ। আর এ মর্মে ইবনে আবি শায়বা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী ৯ম খণ্ড, পারা ১৭ পৃ. ১০৯-১১০]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা আম্বিয়ার শেষের দিকে তাওহীদ, রিসালাত এবং আখেরাতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই এই সূরার প্রারম্ভেই কিয়ামতের মহা বিপদের উল্লেখ করে তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা কিয়ামতের কঠিন দিনে তাকওয়া পরহেজগারীই হবে মহা উপকারী সম্বল। তাই ইরশাদ হয়েছে– يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ অর্থাৎ হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর অর্থাৎ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করতে থাকো। অথবা এর অর্থ হলো তোমরা আল্লাহ পাকের আজাবকে ভয় করতে থাকো। আর আল্লাহর আজাবকে ভয় করার পন্থা হলো তাঁর নির্দেশিত কর্তব্য পালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ, যার পরে আর কোনো বাণী আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাজিল হবে না। আর এই মহান বাণী অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বনবী ﷺ -এর প্রতি, আর সমগ্র বিশ্ব-মানবের সাধনাই হলো এর মূল লক্ষ্য এবং সমগ্র

মানবজাতিকেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে। তাই يَاَيُّهَا النَّاسُ [হে মানবজাতি!] বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সমগ্র মানবজাতিকে তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় বরযখী জীবন ও পরজগতের জীবনকে বিশ্বাস করত না। পরজগতের শাস্তি বিলম্বিত হবার কারণে সেগুলোকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। আলোচ্য সূরাতে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিষদ ও সবিস্তার আলোচনা করে কাফের সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

আলোচ্য সূরা রাসূল ﷺ -এর সফররত অবস্থায় নাজিল হয়েছিল। তখন রাসূল ﷺ সাহাবীগণকে ডেকে জমায়েত করে বললেন, আজকের দিনটি কোন দিন বলত দেখি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, এটি সেই দিন, যে দিন আল্লাহ হযরত আদম (আ.) কে বলবেন যে, হে আদম! উঠ! প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন করে জাহান্নামে প্রেরণ কর। আর একজনকে বেহেশতে পাঠাও। একথাটি মুসলমানদের অন্তরে অত্যন্ত ভীতির সঞ্চার করলো। সুতরাং নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা নিকটে এসে সু-সংবাদ গ্রহণ কর। বলা বাহুল্য ইয়াজূজ ও মাজূজ হবে এক হাজার আর তোমাদের হবে একজন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ (٣)

শানে নুযূল : ক. আল্লামা ওয়াহেদী বলেন, তাফসীর কারকদের মতে আলোচ্য আয়াত নযর ইবনে হারেছ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে অত্যন্ত ঝগড়াটে কাফের ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা পুনরুত্থানে সক্ষম -একথা সে আদৌ বিশ্বাস করত না। হাশর-নাশর কোনো কিছুর প্রতি তার বিশ্বাস ছিল না। তার সে দুরাচারী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।
খ. কারোও মতে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ও উতবা ইবনে রবী'আ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[ফাতহুল কাদীর ৪৩৬/৩, কুরতুবী ৯/১২]

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ সফর অবস্থায় এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলে কারীম ﷺ উচ্চৈঃস্বরে এর তেলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কেরাম তাঁর আওয়াজ শুনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন এই আয়াতে উল্লিখিত কিয়ামতের ভূকম্পন কোন দিন হবে তোমরা জান কি? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন করে বলবেন, যারা জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে উঠাও। হযরত আদম (আ.) জিজ্ঞেস করবেন, কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বললেন, এই সময়েই ত্রাস ও ভীতির আধিক্যে বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম একথা শুনে ভীত-বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের মধ্যে কে মুক্তি পেতে পারে? তিনি বললেন, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজূজ-মাজূজের মধ্যে থেকে এবং একজন তোমাদের মধ্যে থেকে হবে। এই বিষয়বস্তু সহীহ্ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, সেদিন তোমরা এমন দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা যে দলে ভিড়বে, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। একটি ইয়াজূজ-মাজূজের সম্প্রদায় ও অপরটি ইবলীস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ এবং আদম সন্তানদের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে মারা গেছে, তাদের সম্প্রদায়। (তাই নয়শত নিরানব্বই এর মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা তাদেরই হবে।) তাফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

কিয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে : কিয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুত্থিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, না এর আগেই হবে– এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতরূপে গণ্য হবে। কুরআন পাকের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে। যথা–

১. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ২. وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ৩. اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ইত্যাদি।
কেউ কেউ হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন সম্পর্কিত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন যে, ভূকম্পন হাশর-নাশর ও পুনরুত্থানের পর হবে। প্রকৃত সত্য এই যে, উভয় উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়াত ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নাশরের পরে হওয়াও উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

কিয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী মহিলারা তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কিয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে এরূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোনো খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নাশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কিয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে। –[কুরতুবী]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ : এই আয়াত কট্টর বিতর্ককারী নযর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা এবং কুরআনকে বিগত লোকদের গল্পকাহিনী বলত। কিয়ামতে পুনরুত্থানও সে অস্বীকার করত।–[মাযহারী]

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হুকুম এ ধরনের বদভ্যাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যাপক।

মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা : فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ : এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ বোখারীর এক হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেওয়া হয় : ১. তার বয়স কত হবে, ২. সে কি পরিমাণ রিজিক পাবে, ৩. সে কি কি কাজ করবে এবং ৪. পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা। –[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, তখন মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করে يَارَبِّ مُخَلَّقَةٌ اَوْغَيْرُ مُخَلَّقَةٍ অর্থাৎ এই মাংসপিণ্ড দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কি না? যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ তবে গর্ভাশয় সেই মাংসপিণ্ডকে পাত করে হয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জবাবে مُخَلَّقَةٌ বলা হয়, তবে ফেরেশতা জিজ্ঞেস করে, ছেলে না কন্যা, হতভাগা না ভাগ্যবান, বয়স কত, কি কর্ম করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে? এসব প্রশ্নের জবাব তখনই ফেরেশতাকে বলে দেওয়া হয়।–(ইবনে কাছীর) غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ও مُخَلَّقَةٍ শব্দদ্বয়ের এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। –[কুরতুবী]

مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ : উল্লিখিত হাদীস থেকে এই শব্দদ্বয়ের তাফসীর এই জানা গেল, যে বীর্য দ্বারা মানবসৃষ্টি অবধারিত হয়, তা مُخَلَّقَةٌ এবং যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ; কোনো কোনো তাফসীরকারক غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ ও مُخَلَّقَةٌ -এর এরূপ তাফসীর করেন যে, যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুষম হয়, সে مخلقة অর্থাৎ পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন, বর্ণ ইত্যাদি অসম, সে غَيْرِ مُخَلَّقَةٌ

ثم نخرجكم طفلا : অর্থাৎ অতঃপর মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদেরকে দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ইন্দ্রিয় জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তিদান করা হয় এবং পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌঁছে যায়। ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ -এর অর্থ তাই। اَشُدَّ শব্দটি شِدَّةٌ -এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায়ক্রমে উন্নতির ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা লাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্যক্ষ করা হয়।

اَرْذَلِ الْعُمُرِ : সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ত্রুটি দেখা যায়। রাসূলে কারীম ﷺ এমন বয়স থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। হযরত সা'দের বাচনিক নাসায়ীতে বর্ণিত আছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত দোয়া অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন এবং হযরত সা'দ (রা.)ও এই দোয়া তাঁর সন্তানদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

মানব সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর তার বয়সের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা : মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে আবূ ইয়া'লায় বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের সৎকর্ম পিতা-মাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কোনো সন্তান অসৎকর্ম করলে তা তার নিজের আমলনামায়ও লিখা হয় না এবং পিতা-মাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন তার হেফাজত ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্য সঙ্গী দুজন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ ও ধবলকুষ্ঠ এই রোগত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব হালকা করে দেন। ষাট

বছর বয়সে পৌছলে সে আল্লাহর দিকে রুজুর তৌফিক প্রাপ্ত হয়। সত্তর বছর বয়সে পৌছলে আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা তাকে মহব্বত করতে থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার সৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসৎকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নব্বই বছর বয়সে আল্লাহ তা'আলা অগ্র-পশ্চাতের সব গোনাহ্ মাফ করে দেন এবং তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফায়াত করার অধিকার দান করেন ও শাফায়াত কবুল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায়। "আমীনুল্লাহ্ ও আমিরুল্লাহ ফিল আরয" অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর বন্দী। কেননা এই বয়সে সাধারণত মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কোনো কিছুতে ঔৎসুক্য বাকি থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন যাপন করে। অতঃপর মানুষ যখন 'আরযালে ওমর' তথা নিষ্কর্মা বয়সে পৌছে যায়, তখন সুস্থ ও শক্তিবান অবস্থায় যেসব সৎকর্ম করত, তা অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লিখা হয় এবং কোনো গোনাহ্ হয়ে গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না।

হাফেজ ইবনে কাছীর এই রেওয়ায়েতটি মুসনাদে আবূ ইয়া'লা থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ جِدًّا وَفِيْهِ نَكَارَةٌ شَدِيْدَةٌ অর্থাৎ হাদীসটি অবিদিত এবং এতে ঘোর আপত্তির কারণ নিহিত আছে। এরপর তিনি বলেন– وَمَعَ هٰذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ اَحْمَدُ فِيْ سَنَدِهٖ مَوْقُوْفًا وَمَرْفُوْعًا অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হাদীসটিকে 'মাওকূফ ও মরফূ' উভয় প্রকারে তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনে কাছীর মুসনাদে আহমদ থেকে উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় তাই, যা মুসনাদে আবূ ইয়া'লা (রা.) থেকে উপরে বর্ণিত হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় করো।

تَذْهَلُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার ذُهُوْلٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ه ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– সে ভুলে যাবে।

اَرْضَعَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرْضَاعٌ মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তাদের স্তন্যপায়ীকে।

لِنُبَيِّنَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع منصوب بلام বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ب ـ ى ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– যেন আমি প্রকাশ করে দেই।

لِتَبْلُغُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع منصوب বাব نَصَرَ মাসদার بُلُوْغٌ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ غ) জিনস صحيح অর্থ– যেন তোমরা উপনীত হও।

يُتَوَفّٰى : সীগহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَوَفِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।

يُرَدُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার رَدٌّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পৌছানো হয়ে থাকে।

اِهْتَزَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِهْتِزَازٌ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ ز) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তা সরস হয়।

رَبَتْ : সীগহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার رِبَاء ও رِبُو মূলবর্ণ (ر ـ ب ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তা স্ফীত হয়ে উঠে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ : এখানে يَا হরফে নেদা اَيُّهَا মুনাদা, যা نكره مقصودة হয়ে مبنى على الضم হয়েছে আর هاء হলো تنبيه -এর জন্য আর اَلنَّاسُ হলো اى থেকে بدل আর اِتَّقُوْا হলো ফে'ল ফায়েল رَبَّكُمْ মাফউল اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ হলো اسم ان আর شَيْءٌ হলো خبر ان আর عَظِيْمٌ হলো شَيْءٌ এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৪]

অনুবাদ	আয়াত
৭. আর নিশ্চয় কিয়ামত আসবেই, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই, এবং আল্লাহ কবরবাসীদেরকে পুনরায় উত্থিত করবেন।	وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۙ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝٧
৮. আর কোনো কোনো মানুষ এমনও আছে, যারা আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে বিতর্ক করে থাকে কোনো রূপ জ্ঞান ব্যতীত এবং কোনো প্রমাণ ব্যতীত এবং কোনো উজ্জ্বল গ্রন্থ (-এর প্রমাণ) ব্যতীত।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ۝٨
৯. তারা অহংকারবশত ঘাড় বাঁকিয়ে বিতর্ক করে থাকে, যেন (অপরাপরকে) আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করে, এমন লোকদের জন্য পৃথিবীতে লাঞ্ছনা রয়েছে, আর আমি তাদেরকে কিয়ামত-দিবসে জ্বলন্ত আগুনের আজাব আস্বাদন করাব।	ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝٩
১০. (এবং তাদেরকে বলা হবে) এটা তোমার হস্ত-কৃত কর্মের প্রতিফল আর (এটাও প্রমাণিত যে,) আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।	ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۝١٠ ع
১১. আর কোনো কোনো মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে কিনারায় দাঁড়িয়ে, অতঃপর তার যদি কোনো (পার্থিব) স্বার্থ লাভ হয়, তবে সে তদ্দরুন আশ্বস্ত হয়, আর যদি কোনো পরীক্ষাগত বিপদ তার উপর এসে পড়ে, তবে সে উর্ধ্বমুখে ফিরে চলে যায়, (যাতে) সে ইহকাল ও পরকাল উভয়টাই হারিয়ে বসে, এটাই হচ্ছে (তার) স্পষ্ট ক্ষতি।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝١١

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ আর নিশ্চয় কিয়ামত আসবেই لَا رَيْبَ فِيهَا তাতে কোনোই সন্দেহ নেই وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ এবং আল্লাহ পুনরায় উত্থিত করবেন مَنْ فِي الْقُبُورِ কবরবাসীদেরকে।

৮. وَمِنَ النَّاسِ আর কোনো কোনো মানুষ এমনও আছে مَنْ يُجَادِلُ যারা বিতর্ক করে থাকে فِي اللَّهِ আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে بِغَيْرِ عِلْمٍ কোনোরূপ জ্ঞান ব্যতীত وَلَا هُدًى এবং কোনো প্রমাণ ব্যতীত وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ এবং কোনো উজ্জ্বল গ্রন্থ ব্যতীত

৯. ثَانِيَ عِطْفِهِ তারা অহংকারবশত ঘাড় বাঁকিয়ে বিতর্ক করে থাকে لِيُضِلَّ যেন বিভ্রান্ত করে عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ আল্লাহর পথ হতে لَهُ فِي الدُّنْيَا এমন লোকদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে خِزْيٌ লাঞ্ছনা وَنُذِيقُهُ আর আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামত দিবসে عَذَابَ الْحَرِيقِ জ্বলন্ত আগুনের আজাব।

১০. ذَٰلِكَ (তাদেরকে বলা হবে) এটা بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ তোমার হস্ত-কৃত কর্মের প্রতিফল وَأَنَّ اللَّهَ আর আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ بِظَلَّامٍ জুলুম করেন না لِلْعَبِيدِ বান্দাদের প্রতি।

১১. وَمِنَ النَّاسِ আর কোনো কোনো মানুষ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ আল্লাহর ইবাদত করে عَلَىٰ حَرْفٍ কিনারায় দাঁড়িয়ে فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ অতঃপর তার যদি কোনো (পার্থিব) স্বার্থ লাভ হয় اطْمَأَنَّ بِهِ তবে সে তদ্দরুন আশ্বস্ত হয় وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ আর যদি কোনো পরীক্ষাগত বিপদ তার উপর এসে পড়ে انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ তবে সে উর্ধ্বমুখে ফিরে চলে যায় خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ (যাতে) সে ইহকাল ও পরকাল উভয়টাই হারিয়ে বসে ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ এটাই হচ্ছে (তার) স্পষ্ট ক্ষতি

বঙ্গানুবাদ	আরবি
১২. সে আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে এমন বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, যা না পারে তার কোনো ক্ষতি করতে আর না পারে তার কোনো উপকার করতে, এটা (-ও) হচ্ছে চরম পথভ্রষ্টতা।	يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٢﴾
১৩. সে এমন সব বস্তুর উপাসনা করছে– যার ক্ষতি তার উপকারের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী; মন্দ এমন কার্যনির্বাহক এবং কতই না মন্দ এমন সহচরও।	يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾
১৪. নিশ্চয় আল্লাহ এমন লোকদেরকে– যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে– (বেহেশতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তাই করে থাকেন।	اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٤﴾
১৫. যে ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, আল্লাহ (তাঁর) রাসূলকে কোনো সাহায্য করবেন না দুনিয়া ও আখেরাতে, সে যেন আসমান পর্যন্ত একটি রশি টানিয়ে নেয়। (এবং তা আসমানের সঙ্গে বেঁধে দেয়) তৎপর (এর সাহায্যে আসমানে উঠে) সেই ওহীকে রোধ করে, অতঃপর সে চিন্তা করে দেখুক যে, তার এই চেষ্টা তার অপছন্দনীয় বস্তুকে রোধ করতে পারে কিনা?	مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ সে আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে এমন বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েছে مَا لَا يَضُرُّهٗ যা না পারে তার কোনো ক্ষতি করতে وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ, আর না পারে তার কোনো উপকার করতে ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ এটা হচ্ছে চরম পথভ্রষ্টতা।

১৩. يَدْعُوْا সে এমন বস্তুর উপাসনা করছে لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ যার ক্ষতি তার উপকারের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী لَبِئْسَ الْمَوْلٰى কতইনা মন্দ এমন কার্যনির্বাহক وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ, এবং কতইনা মন্দ এমন সহচরও।

১৪. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ নিশ্চয় আল্লাহ এমন লোকদেরকে দাখিল করবেন الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ, এবং নেক আমল করেছে جَنّٰتٍ এমন উদ্যানে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন।

১৫. مَنْ كَانَ يَظُنُّ যে ব্যক্তি এ ধারণা করে যে اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ আল্লাহ (তাঁর) রাসূলকে কোনো সাহায্য করবেন না فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ দুনিয়া ও আখেরাতে فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ সে যেন আসমান পর্যন্ত একটি রশি টানিয়ে নেয় ثُمَّ لْيَقْطَعْ তৎপর সেই ওহীকে রোধ করে فَلْيَنْظُرْ অতঃপর সে চিন্তা করে দেখুক যে هَلْ يُذْهِبَنَّ রোধ করতে পারে কিনা كَيْدُهٗ তাঁর এই চেষ্টা مَا يَغِيْظُ তার অপছন্দনীয় বস্তুকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتَابٍ مُّنِيْرٍ [٨]

শানে নুযূল : যে সকল মানুষেরা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে শিরকের আকীদা পোষণ করত– যথা ফেরেশতাকুল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান (নাউযুবিল্লাহ), হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) –তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। সুতরাং মুহাম্মদ ইবনে কা'বের মতানুসারে আলোচ্য আয়াত আখনাস ইবনে শুরাইক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। জমহুর মুফাসসিরগণের মতানুসারে পূর্বের আয়াতের ন্যায় আলোচ্য আয়াতও নরাধম নযর ইবনে হারেছ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তার সম্পর্কে একাধিক আয়াত নাজিল হবার কারণ হলো, তার দুরাচারী ও খোদাদ্রোহিতার প্রতি গভীর নিন্দা ও তিরস্কার ব্যক্ত করা। –[বাহরে মুহীত্ব ৩২৯/৬, ফাতহুল কাদীর ৪৩৯/৩, কুরতুবী ১৮/১২ রূহুল মা'আনী ১২২/১৭/৯]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اِطْمَاَنَّ بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ اِنْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ [١١]

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুভিয়া সঠিক সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কতেক বেদুঈন এমন ছিল যারা রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের এলাকায় চলে যেত। অতঃপর তারা যদি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি লাভ করত, তাহলে তারা বলত, আমাদের এ ধর্ম অত্যন্ত কল্যাণময়। সুতরাং তারা তাকে আকড়ে ধরত। আর যদি দুর্ভিক্ষ পেয়ে যেত এবং সন্তান-সন্ততি মারা যেত তাহলে তারা বলত, এ ধর্মে আমাদের জন্য কোনো প্রকারের কল্যাণ নিহিত নেই। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

ইবনে মারদূভিয়া হযরত আবূ সাঈদ (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর তার চোখের দৃষ্টি শক্তি লোপ পায়, মাল নষ্ট হয়ে যায় এবং সন্তান-সন্ততি মারা যায়। তখন সে ইসলাম কে অলক্ষুণে বলে মন্তব্য কর। সুতরাং সে রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল যে, আমাকে ইসলাম হতে অব্যাহতি দান করুন। রাসূল ﷺ বললেন, ইসলামকে অব্যহতি দেওয়া যায় না। তখন সে বলল যে, এ ধর্মের মধ্যে আমার জন্যে কোনো ধরনের কল্যাণ নিহিত নেই। আমার দৃষ্টি শক্তি লোপ পেল। আমার সম্পদ ধ্বংস হলো এবং আমার সন্তান-সন্ততি মারা গেল । রাসূল ﷺ তখন বললেন যে, হে ইহুদি! ইসলাম মানুষকে উন্নত করে তুলে, আগুন যেভাবে লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্য থেকে ঝঙ্কার দূর করে পরিচ্ছন্ন করে। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

–[ফাতহুল কাদীর ৪৪২/৩, বাহরে মুহীত্ব ২৩২৯/৬, কুরতুবী ১৯/১২ রূহুল মা'আনী ১২৪/১৭/৯, ইবনে কাছীর ২১৫/৩]

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَاۤءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ [١٥]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা ইসলামের প্রতি অননামনা হয়ে বলছিল যে, আমাদের ভয় হচ্ছে যে, মুহাম্মদ ﷺ-কে সাহায্য করা হবে না। তাহলে তো আমাদের মধ্যে এবং ইহুদিদের মধ্যে যে মৈত্রী চুক্তি রয়েছে তা ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে ওরা আমাদের প্রতি কোনো প্রকারের সহযোগিতার হাত বাড়াবেনা। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[তাবারী ১২০/৭]

ثَانِيَ عِطْفِهٖ : عِطْف শব্দের অর্থ পার্শ্ব ও কিনারা। সুতরাং ثَانِيَ عِطْفِهٖ -এর অর্থ হবে পার্শ্ব পরিবর্তনকারী। তবে এখানে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বোঝানো হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ : বুখারী ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করে মদিনায় বসবাস করতে শুরু করেন, তখন এমন লোকও এসে ইসলাম গ্রহণ করত, যাদের অন্তরে ইসলাম পাকাপোক্ত ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সন্তান ও ধন-দৌলতে উন্নতি দেখা গেলে তারা বলত এই ধর্ম ভালো। এই শ্রেণির লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা ঈমানের এক কিনারায় দণ্ডায়মান আছে। ঈমানের পর যদি তারা পার্থিব সুখ ও ধন-সম্পদ লাভ করে, তবে ইসলামের উপর অটল হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষা স্বরূপ কোনো বিপদাপদ ও পেরেশানিতে পতিত হয়, তবে ধর্ম ত্যাগ করে বসে

مَنْ كَانَ يَظُنُّ : সারকথা এই যে, ইসলামের পথ রুদ্ধকারী শত্রু চায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর ধর্মকে সাহায্য না করুন। এমন শত্রুদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, এটা তখনই সম্ভবপর, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের পদ বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে এবং তাঁর প্রতি ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা যাঁকে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং ওহী দ্বারা ভূষিত করেছেন, ইহকাল ও পরকালে তাঁকে সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে। যুক্তির দিক দিয়েও এই ওয়াদার খেলাফ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল ও তাঁর ধর্মের উন্নতির পথ রুদ্ধ করতে চায়, তার সাধ্য থাকলে এমন কৌশল অবলম্বন করা উচিত, যাতে নবুয়তের পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়বস্তুটি অসম্ভবকে সম্ভব বলে ধরে নেওয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ওহী বন্ধ করতে চাইলে সে কোনোরূপে আকাশে পৌছুক এবং সেখান থেকে ওহীর আগমন বন্ধ করে দিক। বলাবাহুল্য, কারো পক্ষে আকাশে যাওয়া ও আল্লাহ্ তা'আলাকে ওহী বন্ধ করতে বলা মোটেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং তার কৌশল যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে আক্রোশের ফল কি? এই তাফসীর হুবহু দুররে-মনসূর গ্রন্থে হযরত ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই সর্বোত্তম ও সাবলীল তাফসীর। -[বয়ানুল কুরআন সহজকৃত]।

কুরতুবী এই তাফসীরকেই আবূ জা'ফর নাহ্হাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেন : এটা সবচাইতে সুন্দর তাফসীর। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আয়াতের এমন তাফসীর করেছেন যে, এখন سَمَاء বলে নিজ গৃহের ছাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই; যদি কোনো মূর্খ শত্রু কামনা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করে, তবে যে জেনে রাখে যে, তার বাসনা কখনো পূর্ণ হবে না। এই বোকাসুলভ আক্রোশের প্রতিকার এছাড়া কিছুই নেই যে, সে তার ছাদে রশি ঝুলিয়ে ফাঁসি নিয়ে মরে যাক। -[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُنِيْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنَارَةٌ মূলবর্ণ (ن - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ- উজ্জ্বল।

ثَانِىَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার ثَنْىٌ মূলবর্ণ (ث - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- বাঁকিয়ে।

نُذِيْقُهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِذَاقَةٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব।

اِطْمَئَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعِيْلَالٌ মাসদার اِطْمِئْنَانٌ মূলবর্ণ (ط - م - ن) জিনস صحيح অর্থ- সে আশ্বস্ত হয়।

تَجْرِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جَرْىٌ ও جَرَيَانٌ মূলবর্ণ (ج - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তা প্রবাহিত হবে।

فَلْيَمْدُدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَدٌّ মূলবর্ণ (م - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- সে যেন টানিয়ে নেয়।

يَغِيْظُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার غَيْظٌ মূলবর্ণ (غ - ى - ظ) জিনস اجوف يائى অর্থ- তার অপছন্দনীয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَهُ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَنُذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ : এখানে لَهُ হলো خبر مقدم আর فِى الدُّنْيَا হলো حال কেননা এটা خِزْىٌ এর সিফত হয়েছে। প্রসিদ্ধ কায়দার ভিত্তিতে খবরটি মুকাদ্দাম হয়েছে। আর خِزْىٌ হলো مبتدأ مؤخر আর وَنُذِيْقُهُ-এর واو টি আতেফা, আর نُذِيْقُهُ হলো ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী, আর يَوْمَ الْقِيٰمَةِ টা ظرف হয়ে نُذِيْقُ এর সাথে متعلق হয়েছে, আর عَذَابَ الْحَرِيْقِ হলো مفعول ثانى আর لَهُ فِى الدُّنْيَا পূর্ণ বাক্যটি حالية হয়েছে। -[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০৬]

১৬. আর এভাবেই আমি এটাকে (কুরআনকে) সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিরূপে নাজিল করেছি। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করে থাকেন।	وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾
১৭. যারা ঈমান এনেছে এবং ইহুদি হয়েছে, আর সাবেঈন, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক এবং মুশরিকগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মীমাংসা করে দেবেন কিয়ামতের দিন এদের সকলের মধ্যে, (অর্থাৎ মুসলমানকে বেহেশতে এবং কাফেরকে দোজখে দাখিল করবেন।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾
১৮. [হে শ্রোতা!] তুমি কি এটা জান না? আল্লাহ তা'আলার সমীপে সকলেই (স্ব-স্ব অবস্থানুযায়ী) মস্তকাবনত করছে, যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু এবং মানুষের মধ্যকার বহু লোকও; আর অনেক লোক এমনও আছে, (অনুগত না হওয়ার দরুন) যাদের জন্য আজাব সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে; আর আল্লাহ তা'আলা যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মান প্রদানকারী কেউই নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন (তা) করে থাকেন।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿١٨﴾ السجدة

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ আর এভাবেই আমি এটাকে (কুরআনকে) নাজিল করেছি اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিরূপে وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ আর আল্লাহ হেদায়েত করে থাকেন مَنْ يُّرِيْدُ যাকে ইচ্ছা।

১৭. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَالَّذِيْنَ هَادُوْا এবং ইহুদি হয়েছে وَالصّٰبِـِٕيْنَ আর সাবেঈন وَالنَّصٰرٰى খ্রিস্টান وَالْمَجُوْسَ ও অগ্নিপূজক وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا এবং মুশরিকগণ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মীমাংসা করে দেবেন এদের সকলের মধ্যে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন।

১৮. اَلَمْ تَرَ তুমি কি এটা জান না اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ আল্লাহ তা'আলার সমীপে সকলেই মস্তকাবনত করছে مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে আছে وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ এবং সূর্য, চন্দ্র وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ নক্ষত্র পুঞ্জ পর্বতমালা وَالشَّجَرُ বৃক্ষরাজি وَالدَّوَآبُّ সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ এবং মানুষের মধ্যকার বহু লোকও وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ আর অনেক লোক এমনও আছে যাদের জন্য আজাব সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা যাকে লাঞ্ছিত করেন فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ তাকে সম্মান প্রদানকারী কেউ নেই اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন (তা) করে থাকেন।

১৯. এরা হচ্ছে দু'টি বিবদমান পক্ষ, (মু'মিন ও কাফের) যারা নিজ প্রতিপালকের সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ করেছে, সুতরাং যারা কাফের হয়েছে তাদের (পরিধানের) জন্য আগুনের কাপড় কাটা হবে; তাদের মাথার উপরে তীব্র উত্তপ্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে।	هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾
২০. এতে তাদের উদরস্থ সবকিছু (নাড়ি-ভুঁড়ি) এবং (তাদের) চর্মসমূহ গলে যাবে;	يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾
২১. এবং তাদের জন্য লোহার গুর্জ রয়েছে।	وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾
২২. যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে পুনরায় তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং বলা হবে, দহনের আজাব আস্বাদন করতে থাক।	كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾
২৩. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বেহেশতের এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন– যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে; তথায় তাদেরকে সোনার বালা ও মুক্তা পরানো হবে: এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের।	اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ؕ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. هٰذٰنِ خَصْمٰنِ এরা হচ্ছে দু'টি বিবাদমান পক্ষ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ যারা নিজ প্রতিপালকের সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ করেছে فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا সুতরাং যারা কাফের হয়েছে قُطِّعَتْ لَهُمْ তাদের জন্য কাটা হবে ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ আগুনের কাপড় يُصَبُّ ঢেলে দেওয়া হবে مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ তাদের মাথার উপরে الْحَمِيْمُ তীব্র উত্তপ্ত পানি।

২০. يُصْهَرُ بِهٖ তাতে গলে যাবে مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ তাদের উদরস্থ সবকিছু (নাড়ি-ভুঁড়ি) وَالْجُلُوْدُ, এবং (তাদের) চর্মসমূহ।

২১. وَلَهُمْ এবং তাদের জন্য রয়েছে مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ লোহার গুর্জ।

২২. كُلَّمَا اَرَادُوْا যখনই তারা চাইবে اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا তা হতে বের হতে مِنْ غَمٍّ যন্ত্রণাকাতর হয়ে اُعِيْدُوْا فِيْهَا তখনই তাদেরকে পুনরায় তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে وَذُوْقُوْا, এবং বলা হবে আস্বাদন করতে থাক عَذَابَ الْحَرِيْقِ দহনের আজাব।

২৩. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দাখিল করবেন الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে جَنّٰتٍ বেহেশতের এমন উদ্যানসমূহে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে يُحَلَّوْنَ فِيْهَا তথায় তাদেরকে পরানো হবে مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ সোনার বালা وَلُؤْلُؤًا ও মুক্তা وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا, এবং তথায় তাদের পোশাক হবে حَرِيْرٌ রেশমের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ [١٩]

শানে নুযূল– ১ : কাইস ইবনে উবাদা হযরত আবূ যর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আমি তাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলে যে, আলোচ্য আয়াত কুরাইশের ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিন জন মুমিন আর তিন জন হলো মুশরিক। মুমিন তিনজন হলেন হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, আলী ইবনে আবূ তালেব ও উবায়দা ইবনে হারেছ (রা.)। আর মুশরিক তিনজন হলো নরাধম উতবা ইবনে রবী'আ, শায়বা ইবনে রবী'আ ও ওয়ালীদ ইবনে উতবা। তারা বদর যুদ্ধে পরস্পরের মোকাবিলায় যুদ্ধ করেছিল। তন্মধ্যে কাফের তিনজনই নিহত হয়ে জাহান্নামের পথে পাড়ি জমালো এবং মুমিনগণের মধ্যে হযরত আলী ও হামযা (রা.) অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসেন এবং হযরত উবায়দা ইবনে হারেছ (রা.) আহত অবস্থায় ফিরে এসে রাসূল ﷺ-এর পদ মোবারকের পাশে গিয়ে শাহাদতের অমিয় শুধা পান করেন। সেই দু'পক্ষের মোকাবিলা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[তাবারী ১২৩/৯, রূহুল মা'আনী ১৩৪/১৭/৯, কুরতুবী ২৫/১২, ইবনে কাছীর ২১৮/৩ ফাতহুল কাদীর ৪৪৫/৩, বাহরে মুহীত্ব ৩৩৪/৬]

শানে নুযূল – ২ : ইবনে জারীর, ইবনে মারদূভিয়া দুজন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুমিন ও ইহুদিদের মধ্যে এক বির্তকের সূত্রপাত হয়। ইহুদিরা দাবি করল যে, আমরা তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটতম। কারণ আমরা হলাম তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবের অধিকারী এবং আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্ববর্তী নবী। মুমিনগণ বললেন, আমরা তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার অধিক নৈকট্যশীল। কারণ আমরা নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছি, আরো ঈমান এনেছি তোমাদের নবীর প্রতি এবং আল্লাহ যে সমস্ত কিতাব নাজিল করেছেন, সে গুলোর প্রতিও। তোমরা তো আমাদের নবী এবং কিতাবকেও ভালোভাবে চেনো ও জানো। কিন্তু ঈর্ষা বশত তোমরা তা অমান্য করছ। তাদের পারস্পরিক এ বির্তক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৩৩/১৭/৯, কুরতুবী ২৬/১২, বাহরে মুহীত্ব ৩৪৪/৬]

প্রথম আয়াতে বিশ্বের মুসলমান, কাফের, অতঃপর কাফেরদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার ফয়সালা করে দেবেন। তিনি প্রত্যেকের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। ফয়সালা কি হবে, কুরআনে তা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের জন্য চিরন্তন ও অক্ষয় সুখশান্তি আছে এবং কাফেরদের জন্য চিরস্থায়ী আজাব। দ্বিতীয় আয়াতে জীবিত আত্মাধারী অথবা জড় পদার্থ ও উদ্ভিদ ইত্যাদি সব সৃষ্ট বস্তু যে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল, তা 'সেজদার' শিরোনামে ব্যক্ত করে মানব জাতির দুইটি শ্রেণি বর্ণনা করা হয়েছে। এক, আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, সেজদায় সবার সাথে শরিক। দুই, আবাধ্য বিদ্রোহী, সেজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। আয়াতে আজ্ঞানুবর্তী হওয়াকে সেজদা করা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক প্রকার সেজদা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সেজদা তার অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষের সেজদা হচ্ছে মাটিতে মস্তক রাখা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সেজদা হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা যথাযথ পালন করা।

সমগ্র সৃষ্টবস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ : সমগ্র সৃষ্টজগত স্রষ্টার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। সৃষ্টজগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার : ১. সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফের, জীবিত, মৃত, জড়পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা বহির্ভূত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ তা'আলার অজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। বিশ্ব-চরাচরের কোনো কণা অথবা পাহাড় আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। ২. সৃষ্টজগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য। অর্থাৎ স্ব-ইচ্ছায় আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি মেনে চলা। এতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য আছে। যারা আনুগত্যশীল ফরমাবরদার তারা মুমিন এবং যারা আনুগত্য বর্জন করে ও অস্বীকার করে তারা কাফের। আয়াতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, এখানে সেজদা ও আনুগত্য বলে শুধু সৃষ্টিগত আনুগত্য নয়; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনাই নেই! এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে? এর উত্তর এই যে, কুরআন পাকের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক, চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোনো সৃষ্টবস্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কম-বেশি এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণস্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে

আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সৃষ্টবস্তুর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণি ও প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেক ও চেতনা দেওয়া হয়েছে। মানব জাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। জন্তু-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা সাধারণত অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়, কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুক্কায়িত যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও বিবেক ও চেতনার অধিকারী। কুরআন পাক আকাশ ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে বলে যে, قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনকে আদেশ করলেন, তোমাদেরকে আমার আজ্ঞাবহ হতেই হবে। অতএব হয় স্বেচ্ছায় আনুগত্য অবলম্বন কর, না হয় বাধ্যতামূলকভাবেই অনুগত থাকতে হবে। উত্তরে আসমান ও জমিন আরজ করল, আমরা স্বেচ্ছায় ও খুশিতে আনুগত্য কবুল করলাম। অন্যত্র পর্বতের প্রস্তর সম্পর্কে কুরআন পাক বলে, وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ কতক প্রস্তর আল্লাহর ভয়ে উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে। এমনিভাবে অনেক হাদীসে পর্বতসমূহের পারস্পরিক কথাবার্তা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিবেক ও চেতনার সাক্ষ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই আলোচ্য আয়াতে যে আনুগত্যকে সেজদা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। আয়াতের অর্থ এই যে, মানবজাতি ছাড়াও (জিনসহ) সব সৃষ্টবস্তু স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সেজদা করে অর্থাৎ আজ্ঞা পালন করে। শুধু মানব ও জিনই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে-(এক) মুমিন, অনুগত ও সেজদাকারী এবং (দুই) কাফের, অবাধ্য ও সেজদার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। সেজদার তৌফিক না দিয়ে আল্লাহ তা'আলা শেষোক্ত দলকে হেয় করেছেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا : আয়াতে উল্লিখিত দুই পক্ষ হচ্ছে সাধারণ মুমিনগণ এবং তাদের বিপরীত সব কাফের দল; ইসলামের যুগের হোক কিংবা পূর্ববর্তী যুগসমূহের। তবে এই আয়াত সে দুই পক্ষ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বদরের রণক্ষেত্রে একে অপরের বিপক্ষে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে থেকে হযরত আলী, হামযা, ওবায়দা (রা.) ও কাফেরদের পক্ষ থেকে ওতবা ইবনে রবী'আ, তদীয় পুত্র ওলীদ ও তদীয় ভ্রাতা শায়বা এতে শরিক ছিল। তন্মধ্যে কাফের পক্ষের তিন জনই নিহত এবং মুসলমানদের মধ্যে থেকে হযরত আলী ও হামযা অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। ওবায়দা গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পায়ের কাছে প্রাণত্যাগ করেন। আয়াত যে এই সম্মুখ যোদ্ধাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রামাণিত আছে। কিন্তু বাহ্যত এই হুকুম তাঁদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সমগ্র উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- যে কোনো জমানার উম্মত হোক না কেন।

জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানোর রহস্য : এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে কংকন পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার। পুরুষদের জন্য একে দূষণীয় মনে করা হয়। উত্তর এই যে, মাথায় মুকুট এবং হাতে কংকন পরিধান করা পুরানাকালের রাজা-বাদশাহ্দের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গ্রেফতার করার জন্যে সুরাকা ইবনে মালেক অশ্বপৃষ্ঠ সওয়ার হয়ে পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল। আল্লাহ্র হুকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পুঁতে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ায় ঘোড়াটি উদ্ধার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সম্রাট কিস্রার কংকন যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর খেলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং সম্রাটের কংকন অন্যান্য মালের সাথে আগমন করে, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা দাবি করে বসেন এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা সাধারণ পুরুষের মধ্যে যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই, এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কংকন পরিধান করাকেও রাজকীয় ভূষণ মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানো হবে। কংকন সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে, কিন্তু সূরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেন, জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কংকন পরানো হবে- স্বর্ণ নির্মত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। -[কুরতুবী]

রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম : আলোচ্য আয়াতে আছে জান্নাতীদের পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে। রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলাবাহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোনো অবস্থাতেই তুল্য নয়।

ইমাম নাসায়ী, বাযযার ও বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীদের রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে; জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরি হবে। -[মাযহারী]

ইমাম নাসায়ী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ فِيْهَا فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبَاسُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَرَابُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاٰنِيَةُ اَهْلِ الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করবে, সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানাহার করবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এই বস্তুত্রয় জান্নাতীদের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। –[কুরতুবী]

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে; যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করে তওবা করে না, সে পরকালে জান্নাতের মদ থেকে বঞ্চিত হবে। –[কুরতুবী]

অন্য এক হাদীসে আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَاِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُوَ.

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে অন্যান্য জান্নাতী রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে; কিন্তু সে পরিধান করতে পারবে না। –[কুরতুবী]

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, যখন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, তখন কোনো বস্ত্র থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দুঃখ ও পরিতাপ থাকবে। অথচ জান্নাত দুঃখ ও পরিতাপের স্থান নয়। সেখানে কারো মনে বিষাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না হয়, তবে এই বঞ্চিত করায় তো উপকারিতা নেই। কুরতুবী এর চমৎকার জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন জান্নাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্নরূপ হবে। কেউ উপরের স্তরে এবং কেউ নিম্নস্তরে থাকবে। স্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভবও করবে। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোনো কিছুর পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَشْرَكُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِشْرَاكٌ মূলবর্ণ (ش - ر - ك) জিনস صحيح অর্থ– মুশরিকগণ।

اَلَمْ تَرَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منفى بلم বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– তুমি কি জান না?

يُهِن : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهَانَةٌ মূলবর্ণ (ه - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি লাঞ্ছিত করেন।

يُصَبُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার صَبٌّ মূলবর্ণ (ص - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ঢেলে দেওয়া হবে।

مَقَامِعُ : مِقْمَعَةٌ-এর বহুবচন। কাছে اسم اله অর্থ– গুর্জ, হাতুড়ি, মুগুর।

اُعِيْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعَادَةٌ মূলবর্ণ (ع - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

يُحَلَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ح - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাদেরকে পরানো হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল হলো اللّٰهَ اسم ان আর يُدْخِلُ الخ বাক্যটি خبر ان আর الَّذِيْنَ হলো مفعول به আর وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ বাক্যটি اٰمَنُوْا -এর উপর আতফ হয়েছে আর جَنّٰتٍ হলো দ্বিতীয় مفعول به অথবা এটা منصوب بنزع الخافض হয়েছে আর تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ বাক্যটি جَنّٰتٍ -এর সিফত হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১০ ও ১২০]

وَهُدُوٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٤﴾

২৪. আর (এ পুরস্কার এই কারণে যে) তারা কালেমায়ে তাইয়েবার হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছিল, এবং তারা পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথপ্রাপ্ত হয়েছিল ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ۭ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٥﴾

২৫. নিঃসন্দেহে যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহর রাস্তা হতে এবং মসজিদে হারাম হতে (-ও) বাধা প্রদান করে যা (ব্যক্তিগত সম্পত্তি না করে) আমি সকল মানুষের জন্য (এরূপে) নির্ধারিত করে দিয়েছি যে, এতে সকলেই সমান, সেখানে (স্থায়ীভাবে) অবস্থানকারীই হোক আর বহিরাগতই হোক; আর যে ব্যক্তি সেখানে ইচ্ছাপূর্বক সীমালঙ্ঘন করে ধর্ম বিরোধী কাজ করবে, তবে আমি তাকে যন্ত্রণাময় আজাব আস্বাদন করাব ।

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿٢٦﴾

২৬. আর যখন আমি ইবরাহীমকে কা'বা গৃহের স্থান জানিয়ে দিলাম যে, (তা ইবাদতের জন্য তৈরি কর এবং) আমার সাথে কাউকে শরিক করো না, আর আমার এই গৃহটিকে পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের জন্য এবং (নামাজে) দণ্ডায়মান লোকদের জন্য এবং রুকূ' ও সেজদাকারীদের জন্য ।

وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿٢٧﴾

২৭. আর লোকদের মধ্যে হজের ঘোষণা করে দাও, লোকেরা তোমার নিকট চলে আসবে পদব্রজে এবং দুর্বল উটসমূহে (আরোহণ করে), এগুলো সুদূর পথ অতিক্রম করে পৌঁছবে ।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. وَهُدُوٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ আর তারা কালেমায়ে তাইয়েবার হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছিল وَهُدُوٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ এবং তারা পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথ প্রাপ্ত হয়েছিল ।

২৫. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিঃসন্দেহে যারা কাফের হয়েছে وَيَصُدُّوْنَ এবং বাধা প্রদান করে عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রাস্তা হতে وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এবং মসজিদে হারাম হতে الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ যা আমি সকল মানুষের জন্য (এরূপে) নির্ধারিত করে দিয়েছি যে سَوَآءَ তাতে সকলেই সমান الْعَاكِفُ فِيْهِ সেখানে (স্থায়ীভাবে) অবস্থানকারীই হোক وَالْبَادِ আর বহিরাগতই হোক وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ আর যে ব্যক্তি সেখানে ইচ্ছাপূর্বক সীমালঙ্ঘন করে ধর্ম বিরোধী কাজ করবে نُّذِقْهُ তবে আমি তাকে আস্বাদন করাব مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ যন্ত্রণাময় আজাব ।

২৬. وَاِذْ بَوَّاْنَا আর যখন আমি জানিয়ে দিলাম لِاِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীমকে مَكَانَ الْبَيْتِ কা'বা গৃহের স্থান اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا আমার সাথে কাউকে শরিক করোনা وَطَهِّرْ بَيْتِيَ আর আমার এ গৃহটিকে পবিত্র রেখো لِلطَّآئِفِيْنَ তওয়াফকারীদের জন্য وَالْقَآئِمِيْنَ এবং (নামাজে) দণ্ডায়মান লোকদের জন্য وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ এবং রুকূ' ও সেজদাকারীদের জন্য ।

২৭. وَاَذِّنْ আর ঘোষণা করে দাও فِي النَّاسِ লোকদের মধ্যে بِالْحَجِّ হজের يَاْتُوْكَ লোকেরা তোমার নিকট চলে আসবে رِجَالًا পদব্রজে وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ এবং দুর্বল উটসমূহে (আরোহণ করে) يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ যে গুলো সুদূর পথ অতিক্রম করে পৌঁছবে ।

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٨﴾	২৮. যেন তারা নিজেদের উপকারের জন্য উপস্থিত হয়, আর যেন (কুরবানির) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে (জবাই করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে ঐ সমস্ত নির্দিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুসমূহের উপর যা আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন। অতঃপর ঐগুলো হতে তোমরাও খাও, আর বিপন্ন অভাবগ্রস্তগণকেও খাওয়াও।
ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٢٩﴾	২৯. অতঃপর যেন তারা নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং নিজ ওয়াজিব কাজসমূহ পূর্ণ করে, আর (ঐ নির্দিষ্ট দিনগুলোর মধ্যেই) সেই নিরাপদ (কা'বা) গৃহের তওয়াফ করে।
ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿٣٠﴾	৩০. এই কথা তো সমাপ্ত হলো, আর যদি কেউ আল্লাহর সম্মানিত নির্দেশাবলির মর্যাদা রক্ষা করে, তবে তা তার প্রতিপালক দরবারে তার জন্য অতি উত্তম, আর তোমাদের জন্য এই নির্দিষ্ট পশুগুলোকে হালাল করা হয়েছে, ঐগুলো ব্যতীত যা তোমাদের প্রতি (নিষিদ্ধ বলে) পঠিত হয়েছে, অতএব, তোমরা অপবিত্রতা তথা মূর্তিসমূহ হতে সরে থাক এবং মিথ্যা কথা হতে দূরে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. لِّيَشْهَدُوْا যেন তারা উপস্থিত হয় مَنَافِعَ لَهُمْ নিজেদের উপকারের জন্য وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ আর যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ নির্দিষ্ট দিনগুলোতে عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ঐ সমস্ত নির্দিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু সমূহের উপর যা আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন فَكُلُوْا مِنْهَا অতঃপর ঐগুলো হতে তোমরাও খাও وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ আর বিপন্ন অভাবগ্রস্তগণকেও খাওয়াও।

২৯. ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ অতঃপর যেন তারা নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ এবং নিজ ওয়াজিব কাজসমূহ পূর্ণ করে وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ সেই নিরাপদ (কা'বা) গৃহের তওয়াফ করে।

৩০. ذٰلِكَ এই কথা তো সমাপ্ত হলো وَمَنْ يُّعَظِّمْ আর যদি কেউ রক্ষা করে حُرُمٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর সম্মানিত নির্দেশাবলির মর্যাদা فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ তবে তা তার জন্য অতি উত্তম عِنْدَ رَبِّهٖ তার প্রতিপালকের দরবারে وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ আর তোমাদের জন্য এই নির্দিষ্ট পশুগুলোকে হারাম করা হয়েছে اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ ঐগুলো ব্যতীত যা তোমাদের প্রতি (নিষিদ্ধ বলে) পঠিত হয়েছে فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ অতএব, তোমরা অপবিত্রতা হতে সরে থাক مِنَ الْاَوْثَانِ তথা মূর্তিসমূহ হতে وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ এবং মিথ্যা কথা হতে দূরে থাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ [٢٥]

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম ও সাঈদ ইবনে জুবায়ের হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশটি আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, রাসূল ﷺ একজন মুহাজির ও একজন আনসার দু'জন সাহাবীর সাথে তাকে কোথাও পাঠালেন। কথোপকথন হতে লাগল। এক পর্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) ক্রোধান্বিত হয়ে আনসারী সাহাবীকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে সে মক্কাভিমুখে পালিয়ে যায়। তার এহেন হিংসাত্মক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশটি আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন।

–[ইবনে কাছীর ২১১/৩ ফাতহুল কাদীর ৪৪৯/৩ সাভী ৯৭/৩]

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ [٢٧]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আলোচ্য আয়াত সে সকল মানুষ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা সওয়ারী না নিয়েই হজ্জ আদায় করার জন্য আসত। এর ফলে অন্যান্য সাথিদের কষ্ট হতো। তাই আল্লাহ তা'আলা এই আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন যে, তারা যেন নিজেদের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ও সওয়ারী নিজের সাথে নিয়ে আসে। –[তাবারী ১৩৬/৯]

وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে কালেমায়ে তাইয়েবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বোঝানো হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেন, এখানে কুরআন পাক উদ্দেশ্য –[কুরতুবী] তবে বিশুদ্ধ কথা হলো, এসবগুলোই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : এখানে سَبِيْلِ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র পথ) বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই; অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়।

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ : এটা তাদের দ্বিতীয় গোনাহ্। তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। 'মসজিদে হারাম' ঐ মসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহর চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হেরেম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোনো কোনো সময় মসজিদে হারাম বলে মক্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয়; যেমন– আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শুধু মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি; বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। কুরআন পাক এ ঘটনায় মসজিদে হারাম শব্দটি সাধারণ হেরেমের অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছে : وَيَصُدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

তাফসীরে দূররে মনসূরে এস্থানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছে যে, আয়াতে মসজিদে হারাম বলে হেরেম শরীফ বোঝানো হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিন ও কাফের দুই পক্ষের বিতর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই বিতর্কেরই একটি বিশেষ প্রকার আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, কোনো কোনো কাফের এমনও আছে, যারা নিজেরা গোমরাহীতে অটল এবং অন্যদেরকও আল্লাহর পথে চলতে বাধা দান করে। এ ধরনের লোকেরাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে ওমরার ইহরাম বেঁধে মসজিদে-হারামে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অথচ মসজিদে হারাম ও হেরেম শরীফের ইবাদত, ওমরা ও হজ্জ সম্পর্কিত অংশ তাদের মালিকানায় ছিল না। ফলে কোনোরকম বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকার তাদের ছিল না। বরং এসব জায়গা সব মানুষের জন্য সমান ছিল। এখানে হেরেমের অধিবাসী, বহিরাগত মুসাফির, শহরবাসী এবং বিদেশী সবার সমান অধিকার ছিল। এরপর তাদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে (অর্থাৎ গোটা হেরেম শরীফে) কোনো ধর্মদ্রোহী কাজ করবে; যেমন মানুষকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া অথবা অন্য কোনো ধর্মবিরোধী কাজ করা, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানো হবে; বিশেষ করে যখন ধর্মবিরোধী কাজের সাথে জুলুম অর্থাৎ শিরকও মিলিত থাকে। মক্কার মুশরিকদের অবস্থা তদ্রূপই ছিল। তারা মুসলমানদেরকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। তাদের এ কাজও ধর্ম বিরোধী ও অবৈধ ছিল, এর সাথে তারা কুফর ও শিরকেও লিপ্ত ছিল। যদিও ধর্ম বিরোধী কাজ বিশেষত শিরক ও কুফর সর্বত্র ও সর্বকালে হারাম, চূড়ান্ত অপরাধ ও শাস্তির কারণ; কিন্তু যারা এরূপ কাজ হেরেমের অভ্যন্তরে করে, তাদের অপরাধ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই এখানে বিশেষভাবে হেরেমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

মক্কার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য : মসজিদে হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়; যেমন– সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুজদালেফার গোটা ময়দান– এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে সাধারণ ওয়াকফ। কোনো ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনো হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফিকহ্‌বিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকাররমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোনো কোনো ফিকহ্‌বিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলমান যে কোনো স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিক সংখ্যক ফিকহ্‌বিদগণের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা হতে পারে। এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া জায়েজ। হযরত ওমর ফারূক (রা.) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্য জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) থেকে এ ব্যাপারে উপরিউক্ত উভয় প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতোয়া হলো শেষোক্ত উক্তি অনুযায়ী। –[রূহুল-মা'আনী] ফিকহের গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হেরেমের যে যে অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াকফ। এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হারাম। আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয়।

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ : অভিধানে اِلْحَادٌ -এর অর্থ সরল পথ থেকে সরে যাওয়া। এখানে 'এলহাদের' অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদাহর মতে কুফর ও শিরক। কিন্তু অন্য তাফসীরকারকগণ একে সাধারণ অর্থে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক গোনাহ্ ও আল্লাহর নাফরমানি এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, চাকরকে গালি দেওয়া এবং মন্দ বলাও। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত আতা (র.) বলেন, 'হেরেমে এলহাদ' বলে এহ্‌রাম ব্যতীত হেরেমে প্রবেশ করা এবং হেরেমে নিষিদ্ধ এমন কোনো কাজ করাকে বোঝানো হয়েছে। যেমন– হেরেমে শিকার করা কিংবা হেরেমে কোনো বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরিয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বত্রই গোনাহ্ এবং আজাবের কারণ। তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার কারণ এই যে, মক্কার হেরেমে সৎকাজের ছওয়াব যেমন বেশি হয়, তেমনি পাপ কাজের আজাবও বহুলাংশে বেড়ে যায়।
–[মুজাহিদের উক্তি]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এই আয়াতের এক তাফসীর এরূপও বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা না হয়, কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই গোনাহ্ লিখা হয়। কুরতুবী এই তাফসীরই হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হজ্জ করতে গেলে দু'টি তাঁবু স্থাপন করতেন– একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে। যদি পরিবারবর্গ অথবা চাকর-নওকরদের মধ্যে কাউকে কোনো কারণে শাসন করার প্রয়োজন হতো, তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাঁবুতে যেয়ে একাজ করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, আমাদেরকে ইহা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সময় كَلَّا وَاللّٰهِ অথবা بَلٰى وَاللّٰهِ ইত্যাদি যেসব বাক্য উচ্চারণ করে, এগুলোও হেরেমের অভ্যন্তরে 'এলহাদ' করার শামিল। –[মাযহারী]

এর আগের আয়াতে মসজিদে হারাম ও হেরেম শরীফে প্রবেশের পথে বাধাদানকারীদের প্রতি কঠোর শাস্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর সাথে সম্পর্ক রেখে এখন বায়তুল্লাহর বিশেষ ফজিলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাদের দুষ্কর্ম আরো অধিক ফুটে উঠে।

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সূচনা : وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ অভিধানে بَوَّاَ শব্দের অর্থ কাউকে ঠিকানা ও বসবাসের গৃহ দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই – একথা উল্লেখযোগ্য ও স্মর্তব্য যে, আমি ইবরাহীম (আ.) -কে বায়তুল্লাহর অবস্থান স্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। مَكَانَ الْبَيْتِ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। হযরত আদম (আ.) ও তৎপরবর্তী পয়গম্বরগণ বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করতেন। হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এই জায়গার কাছেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেওয়া হয় : اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا অর্থাৎ আমার ইবাদতে কাউকে শরিক করো না

বলাবাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আ.) শিরক করবেন, এমন কল্পনাও করা যায় না। তাঁর মূর্তি সংহার, মুশরিকদের মোকাবিলা এবং এই ব্যাপারে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার ঘটনাবলি পূর্বেই ঘটেছিল। তাই এখানে সাধারণ মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্যে, যাতে তারা শিরক না করে। দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেওয়া হয় وَطَهِّرْ بَيْتِيَ আমার গৃহকে পবিত্র রাখ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু বায়তুল্লাহ্ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের নাম নয়; বরং যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রথম বায়তুল্লাহ নির্মাণের আদেশ করা হচ্ছে, তাকেই বায়তুল্লাহ বলা হয়। এই ভূখণ্ড সব সময় বিদ্যমান ছিল। একে পবিত্র করার আদেশ দানের কারণ এই যে, সে সময়ও জুরহাম ও আমালিকা গোত্র এখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা এসব মূর্তির পূজা করত। –(কুরতুবী) এটাও সম্ভবপর যে, এই আদেশটি পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। পবিত্র করার অর্থ কুফর ও শিরক থেকেও পবিত্র রাখা। বাহ্যিক ময়লা আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেই একাজ করাতেন! এতদসত্ত্বেও যখন তাঁকে একাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ এই : وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহর হজ তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। –(বগভী) ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইবরাহীম (আ.)-এর হজ ফরজ হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহর কাছে আরজ করলেন এখানে তো জনমানবহীন বন্য প্রান্তর। ঘোষণা শোনার মতো কেউ নেই; যেখানে জনবসতি আছে সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌঁছবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন : তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। বিশ্বে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। হযরত ইবরাহীম (আ.) মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ তা'আলা তা উচ্চ করে দেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তিনি আবূ কুবায়স পাহাড়ে আরোহণ করে ঘোষণা করেন। দুই কানে অঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বললেন, লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তা নিজের গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হজ ফরজ করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।' এই রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই আওয়াজ আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়; বরং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের সবার কান পর্যন্ত এ আওয়াজ পৌঁছে দেওয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হজ লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জবাবে لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ বলেছে অর্থাৎ হাজির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইবরাহীমি আওয়াজের জবাবই হচ্ছে হজে 'লাব্বাইক' বলার আসল ভিত্তি। –[কুরতুবী, মাযহারী]

অতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘোষণাকে সব মানবমণ্ডলী পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে– يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহ্‌র দিকে চলে আসবে; কেউ পদব্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর-দূরান্ত দেশ থেকে আগমন করবে। ফলে তাদের সওয়ারীর জন্তুগুলো কৃশকায় হয়ে যাবে। এই ঘোষণার দিন থেকে আজ পর্যন্ত হাজারো বছর অতীত হয়ে গেছে, বায়তুল্লাহ্‌র পানে আগমনকারীদের অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। পরবর্তী পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের উম্মতও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর পর যে সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে। তাতেও আরবের বাসিন্দারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও হজের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে বর্ণিত ছিল।

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ : অর্থাৎ দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে তাদের এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্ত। এখানে مَنَافِعَ শব্দটি نَكِرَةْ ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ধর্মীয় উপকার তো অসংখ্য আছেই; পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়। কমপক্ষে এতটুকু বিষয় স্বয়ং বিস্ময়কর যে, হজের সফরে বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয় হয়, যা কেউ কেউ সারা জীবন পরিশ্রম করে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে এবং এখানে একই সময়ে ব্যয় করে ফেলে, কিন্তু সারা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এরূপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোনো ব্যক্তি হজ অথবা ওমরায় ব্যয় করার কারণে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্থ হয়ে গেছে; এ ছাড়া অন্যান্য কাজে যেমন, বিয়ে-শাদীতে, গৃহনির্মাণে টাকা ব্যয় করে নিঃস্ব ও ফকির হওয়া হাজারো মানুষ যত্রতত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ তা'আলা হজ ও ওমরার সফরে এই বৈশিষ্ট্যও নিহিত রেখেছেন যে, এতে কোনো ব্যক্তি পার্থিব দারিদ্র্য ও উপবাসের সম্মুখীন হয় না। বরং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে,

হজ-ওমরায় ব্যয় করলে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততা দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে। হজের ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক; তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কল্যাণটি কোনো অংশে কম নয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ করে এবং তাতে অশ্লীল ও গোনাহের কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে; অর্থাৎ জন্মের অবস্থায় শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে, সে-ও তদ্রূপই হয়ে যায়। –[বুখারী, মুসলিম, মাযহারী]

বায়তুল্লাহর কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হলো যে, তারা তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। দ্বিতীয় উপকার এরূপ বর্ণিত হয়েছে– وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ অর্থাৎ যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেসব জন্তুর উপর, যেগুলো আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরি কথা এই যে, কুরবানির গোশত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত, বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর জিকির, যা এই দিনগুলোতে কুরবানি করার সময় জন্তুদের উপর করা হয়। এটাই ইবাদতের প্রাণ। কুরবানির গোশত তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, এটা বাড়তি নিয়ামত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সেই দিনগুলো বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কুরবানি করা জায়েজ; অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ। مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ : এর অর্থ ব্যাপক; ওয়াজিব হোক কিংবা মোস্তাহাব সব রকম কুরবানি এর অন্তর্ভুক্ত।

فَكُلُوْا مِنْهَا –এখানে كُلُوْا শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয়; বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা; যেমন– কুরআনের وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا আয়াতে শিকারের আদেশ অনুমতি দানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাসআলা : হজের মওসুমে মক্কা মুয়াজ্জমায় বিভিন্ন প্রকার জন্তু জবাই করা হয়। এক প্রকার জন্তু তো এমন, যাদেরকে কোনো অপরাধের শাস্তি হিসেবে করা কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে থাকে; যেমন কেউ হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে শিকার করলে এর প্রতিদানে তার উপর কোনো জন্তুর কুরবানি ওয়াজিব হয়। শিকারকৃত কোনো জন্তুর পরিবর্তে কোন ধরনের জন্তু কুরবানি করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এমনিভাবে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলির কোনো একটি কেউ করে ফেললে তার উপরও জন্তু কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ফিকহবিদগণের পরিভাষায় এরূপ কুরবানিকে 'দমে-জিনায়াত' (ত্রুটিজনিত কুরবানি) বলা হয়। কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে গরু অথবা উট কুরবানি করা জরুরি হয়, কোনো কোনো কাজের জন্য ছাগল-ভেড়াই যথেষ্ট হয় এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজের জন্য কুরবানি ওয়াজিব হয় না, শুধু সদকা দিলেই চলে। এসব বিবরণ পেশ করার স্থান এটা নয়। ত্রুটি ও অপরাধের শাস্তি হিসেবে যে কুরবানি ওয়াজিব হয়, তার গোশত খাওয়া অপরাধী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়; বরং এটা শুধু ফকির-মিসকীনদের হক। অন্য কোনো ধনী ব্যক্তির জন্যও তা খাওয়া জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে সব ফিকহবিদ একমত। কুরবানির অবশিষ্ট প্রকার ওয়াজিব হোক কিংবা নফল সেগুলোর মাংস কুরবানি আদায়কারী নিজে, তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ধনী হলেও খেতে পারে। হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে "তামাত্তু ও কেরানের" কুরবানিও ওয়াজিব কুরবানির অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতে অবশিষ্ট প্রকার কুরবানিই বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সাধারণ কুরবানি এবং হজের কুরবানিসমূহের গোশত কুরবানি আদায়কারী নিজে ও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মুসলমান খেতে পারে। কিন্তু কমপক্ষে গোশতের তিন ভাগের এক ভাগ ফকির-মিসকিনকে দান করা মোস্তাহাব। এই মোস্তাহাবের আদেশই আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে– وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ - এখানে الْبَآئِسَ শব্দের অর্থ দুঃস্থ এবং فَقِيْرٌ -এর অর্থ অভাবগ্রস্ত। উদ্দেশ্য এই যে, কুরবানির গোশত তাদেরকেও আহার করানো ও দেওয়া মোস্তাহাব ও কাম্য।

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ : এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, যা মানুষের দেহে জমা হয়। ইহরাম অবস্থায় চুল মুণ্ডানো, কাটা, উপড়ানো, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নীচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজের কুরবানি সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ, ইহরাম খুলে ফেল, মাথা মুণ্ডাও এবং নখ কাট। নাভীর নীচের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে কুরবানি ও পরে ইহরাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ীই করা উচিত। কুরবানির পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ এরূপ করলে তাকে ত্রুটিজনিত কুরবানি করতে হবে।

হজের ক্রিয়াকর্মের ক্রমের গুরুত্ব : হজের ক্রিয়াকর্মের যে ক্রম কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, ফিকহ্‌বিদগণ তা বিন্যস্ত করেছেন। এই ক্রম অনুযায়ী হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত; ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে ওয়াজিব। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে ত্রুটিজনিত কুরবানি ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ীর মতে সুন্নত। কাজেই বিরুদ্ধাচরণ করলে ছওয়াব হ্রাস পায়, কুরবানি ওয়াজিব হয় না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে আছে, مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ أَخَّرَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কোনটিকে অগ্রে অথবা পশ্চাতে নিয়ে যায়, তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। ইমাম ত্বাহাভীও এই রেওয়ায়েতটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন এবং সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ্, নাখয়ী ও হাসান বসরীর মাজহাবও তাই। তাফসীরে মাযহারীতে এই মাসআলার পূর্ণ বিবরণ ও বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া হজের অন্যান্য মাসআলাও বর্ণিত হয়েছে।

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ : نُذُورٌ শব্দটি نَذْرٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ মানত। এর স্বরূপ এই যে, শরিয়তের আইনে যে কাজ কোনো ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে, আমি একাজ করব অথবা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার জন্য একাজ করা জরুরি তবে একেই নযর বা মানত বলা হয়। একে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও মূলত তা ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কাজটি গোনাহ্ ও নাজায়েজ না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোনো গোনাহ্‌র কাজের মানত করে, সেই গোনাহের কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করা জরুরি হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখ ফিকহ্‌বিদদের মতে কাজটি উদ্দিষ্ট ইবাদত জাতীয় হওয়াও শর্ত; যেমন– নামাজ, রোজা, সদকা, কুরবানি ইত্যাদি। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি নফল নামাজ, রোজা, সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। আলোচ্য আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মাসআলা : স্মর্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয় না, যে পর্যন্ত মানতের শব্দ উচ্চারণ না করে। তাফসীরে-মাযহারীতে এস্থলে নযর ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্ন ও জবাব : এই আয়াতে পূর্বেও হজের ক্রিয়াকর্ম, তথা কুরবানি ও ইহরাম খোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরেও তওয়াফে-জেয়ারত এর কথা বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে মানত পূর্ণ করার আলোচনা করা হয়েছে; অথচ মানত পূর্ণ করা একটি স্বতন্ত্র বিধান। হজ ছাড়াও, হেরেম এবং হেরেমের বাইরে যে কোনো দেশে মানত পূর্ণ করা যায়। অতএব আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্বন্ধ কি?

উত্তম এই যে, মানত পূর্ণ করা যদিও একটি স্বতন্ত্র নির্দেশ এবং হজের দিন, হজের ক্রিয়াকর্ম ও হেরেমের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু হজের ক্রিয়া-কর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ যখন হজের জন্য রওয়ানা হয়, তখন এই সফরে অধিক পরিমাণে সৎ কাজ ও ইবাদত করার স্পৃহা তার মনে জাগ্রত হয়। ফলে সে অনেক কিছুর মানতও করে, বিশেষত জন্তু কুরবানির মানত তো ব্যাপকভাবেই প্রচলিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এখানে মানতের অর্থ কুরবানির মানতই করেছেন। হজের বিধানের সাথে মানতের আরো একটি সম্বন্ধ এই যে, মানত ও কসমের কারণে যেমন মানুষের উপর শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়– এমন অনেক বিষয় ওয়াজিব হয়ে যায় এবং মূলত হারাম ও নাজায়েজ নয়– এমন অনেক বিষয় হারাম ও নাজায়েজ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ইহ্‌রামের সব বিধান প্রায়শ এ ধরনেরই। সেলাই করা কাপড় ও সুগন্ধি ব্যবহার, চুল মুণ্ডানো, নখ কাটা ইত্যাদি মৌলিকভাবে কোনো নাজায়েজ কাজ নয়; কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধার কারণে এ সবগুলোই হারাম হয়ে যায়। এমনিভাবে হজের ক্রিয়াকর্ম, যা সারা জীবনে একবারেই ফরজ হয়; কিন্তু হজ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার কারণে সব ক্রিয়াকর্ম তার উপর ফরজ হয়ে যায়। এ কারণেই হযরত ইকরিমা (রা.) এ স্থলে মানতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এখানে হজের ওয়াজিব কর্মসমূহ বোঝানো হয়েছে, যেগুলো হজের কারণে তার উপর জরুরি হয়ে যায়।

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ : এখানে তওয়াফ বলে তওয়াফে জেয়ারত বোঝানো হয়েছে, যা জিলহজের দশ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ ও কুরবানির পর করা হয়। এই তওয়াফ হজের দ্বিতীয় রোকন ও ফরজ। প্রথম রোকন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। এটা আরো পূর্বে আদায় করা হয়। তওয়াফে জেয়ারতের পর ইহ্‌রামের সব বিধান পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ ইহরাম খুলে যায়। –[রূহুল মা'আনী]

بَيْت عَتِيْق : عَتِيْق শব্দের অর্থ মুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাঁর গৃহের নাম بَيْت عَتِيْق রেখেছেন; কারণ আল্লাহ একে কাফের ও অত্যাচারীদের আধিপত্য ও অধিকার থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। (রূহুল মা'আনী) কোনো কাফেরের সাধ্য নেই যে, একে অধিকারভুক্ত করে। আসহাবে ফীল তথা হস্তী বাহিনীর ঘটনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে তাওয়াফের বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অনুধাবনযোগ্য।

حُرُمٰتِ اللّٰهِ : বলে আল্লাহ্ নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ শরিয়তের বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। এগুলোর সম্মান তথা এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা ইহকাল পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়।

اُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ : اَنْعَام বলে উট, গরু ছাগল, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইহ্রাম অবস্থায়ও হালাল। اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ বাক্যে যেসব জন্তু ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মৃত জন্তু, যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি কিংবা যে জন্তুর উপর অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। এগুলো সর্বাবস্থায় হারাম; ইহ্রাম অবস্থায় হোক কিংবা ইহ্রামের বাইরে।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ : رِجْسٌ শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, ময়লা اَوْثَانٌ শব্দটি وَثَنٌ- এর বহুবচন; অর্থ মূর্তি। মূর্তিদেরকে অপবিত্রতা বলা হয়েছে। কারণ এরা মানুষের অন্তরকে শিরকের অপবিত্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়।

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ : قَوْل زُوْر- এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের পরিপন্থি, তাই বাতিল ও মিথ্যাভুক্ত। শিরক ও কুফরের বিশ্বাস হোক কিংবা পারস্পরিক লেন-দেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যা বলা হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বৃহত্তম কবীরা গোনাহ্ সমূহ হলো এগুলো : আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোক্ত শব্দ قَوْلُ الزُّوْرِ কে বার বার উচ্চারণ করেন। –[বুখারী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

هُدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছিল।

بَوَّأْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْوِئَةٌ মূলবর্ণ (ب . و . أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف واوى) অর্থ– আমি জানিয়ে দিলাম।

اَذِّنْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَأْذِيْنٌ মূলবর্ণ (ا . ذ . ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তুমি ঘোষণা করে দাও।

فَكُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَكْلٌ মূলবর্ণ (أ . ك . ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– অতঃপর তোমরাও খাও।

اَطْعِمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطْعَامٌ মূলবর্ণ (ط . ع . م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা খাওয়াও।

لِيَقْضُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قَضَاءٌ মূলবর্ণ (ق . ض . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যেন তারা দূর করে।

لِيُوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْفَاءٌ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– যেন তারা পূর্ণ করে।

لِيَطَّوَّفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَطَوُّفٌ মূলবর্ণ (ط . و . ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– যেন তারা তওয়াফ করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ : এখানে ثم হরফে আতফ لام এর- لِيَقْضُوْا - لِيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ টা وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ আর مفعول به হলো تَفَثَهُمْ ফে'ল ও ফায়েল يَقْضُوْا আর لام امر হলো এর উপর আতফ হয়েছে এবং لِيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ বাক্যও لِيَقْضُوْا- এর উপর আতফ হয়েছে, আর بِالْبَيْتِ শব্দটি لِيَطَّوَّفُوْا -এর সাথে متعلق হয়েছে আর الْعَتِيْقِ হলো الْبَيْت এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৬]

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿۳۱﴾

৩১. এভাবে যে, আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাক, তাঁর সাথে শরিক সাব্যস্ত করো না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করল, সে যেন আকাশ হতে অধঃপতিত হলো, অতঃপর (পড়বার পথে) পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বায়ু তাকে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিয়ে আছাড় মারল।

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿۳۲﴾

৩২. এই কথা তো হলো (মুশরিকদের), আর যে ব্যক্তি আল্লাহর (ধর্মের) নিদর্শনসমূহকে সম্মান করল, তবে তা আল্লাহকে অন্তরে ভয় করার দরুনই হয়ে থাকে।

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿۳۳﴾

৩৩. এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের জন্য তা হতে নানাবিধ উপকার লাভ করা জায়েজ, অতঃপর তার জবাই সিদ্ধ হওয়ার স্থান হলো কা'বা গৃহের সন্নিকট।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. আর আমি প্রত্যেক উম্মতের উপর কুরবানি এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত করেছি, যেন তারা ঐ নির্দিষ্ট পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে- যা তিনি তাদেরকে দিয়েছিলেন, সুতরাং তোমাদের মা'বূদ এক আল্লাহ। অতএব, তোমরা সম্পূর্ণরূপে তারই অনুগত হয়ে থাক; আর এই সকল বিনয়ীদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. حُنَفَآءَ لِلّٰهِ এভাবে যে, আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাক غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ তাঁর সাথে শরিক সাব্যস্ত করো না وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করল فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ সে যেন আকাশ হতে অধঃপতিত হলো فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ অথবা বায়ু তাকে আছাড় মারল فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ কোনা দূরবর্তী স্থানে নিয়ে।

৩২. ذٰلِكَ এ কথা তো হলো (মুশরিকদের) وَمَنْ يُّعَظِّمْ আর যে ব্যক্তি সম্মান করল شَعَآئِرَ اللّٰهِ আল্লাহর (ধর্মের) নিদর্শনসমূহকে فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ তাবে তা আল্লাহকে অন্তরে ভয় করার দরুনই হয়ে থাকে।

৩৩. لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ তোমাদের জন্য তা হতে নানাবিধ উপকার লাভ করা জায়েজ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ثُمَّ مَحِلُّهَا অতঃপর তার জবাই সিদ্ধ হওয়ার স্থান হলো اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ কা'বা গৃহের সন্নিকট।

৩৪. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا আর আমি প্রত্যেক উম্মতের উপর কুরবানি এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত করেছিলাম لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ যেন তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে عَلٰى উপর مَا رَزَقَهُمْ যা তিনি তাদেরকে দিয়েছিলেন مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ঐ নির্দিষ্ট পশুগুলোর فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ সুতরাং তোমাদের মা'বূদ এক আল্লাহ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا অতএব, তোমরা সম্পূর্ণরূপে তারই অনুগত হয়ে থাক وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ আর ঐ সকল বিনয়ীদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. যারা এমন যে, যখন আল্লাহর (আহকাম) উল্লেখ করা হয়, তখন তাদের অন্তর ভীতিপূর্ণ হয়ে যায় এবং যারা নিজেদের উপর আপতিত বিপদসমূহে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা নামাজের পাবন্দি করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর কুরবানির উট ও গরুকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন করে দিয়েছি, ঐ পশুগুলোতে তোমাদের (আরো) কল্যাণ রয়েছে, সুতরাং তোমরা এগুলোকে দাঁড় করানো অবস্থায় এদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর, অতঃপর যখন সে পশুগুলো কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তা হতে তোমরাও খাও এবং অযাচঞাকারী ও যাচঞাকারীকেও খেতে দাও; আমি এভাবেই ঐ পশুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যেন তোমরা শোকর কর।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. আল্লাহ তা'আলার সমীপে না এদের গোশত পৌছে, আর না এদের রক্ত বরং তাঁর নিকট (কেবল) তোমাদের তাকওয়া(-ই) পৌছে থাকে; এই প্রকারে আল্লাহ তা'আলা ঐ পশুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যেন তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর, যেহেতু তিনি তোমাদেরকে (কুরবানি করার) তৌফিক দান করেছেন এবং নিষ্ঠাবানদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৫. الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ যারা এমন যে, যখন আল্লাহর (আহকাম) উল্লেখ করা হয় وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ তখন তাদের অন্তর ভীতিপূর্ণ হয়ে যায় وَالصّٰبِرِيْنَ এবং যারা ধৈর্য ধারণ করে عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ নিজেদের উপর আপতিত বিপদসমূহে وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ এবং যারা নামাজের পাবন্দি করে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে

৩৬. وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ আর কুরবানির উট ও গরুকে আমি তোমাদের জন্য করে দিয়েছি مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ আল্লাহর নির্দশন لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ঐ পশুগুলোতে তোমাদের (আরো) কল্যাণ রয়েছে فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا সুতরাং তোমরা এদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর صَوَآفَّ এগুলোকে দাঁড় করানো অবস্থায় فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا অতঃপর যখন সে পশুগুলো পড়ে যায় فَكُلُوْا مِنْهَا তখন তা হতে তোমরাও খাও وَاَطْعِمُوا এবং খেতে দাও الْقَانِعَ অযাচঞাকারীকে وَالْمُعْتَرَّ ও যাচঞাকারীকেও كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ আমি এভাবেই ঐ পশুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ যেন তোমরা শোকর কর।

৩৭. لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا আল্লাহ তা'আলার সমীপে না তাদের গোশত পৌছে وَلَا دِمَآؤُهَا আর না তাদের রক্ত وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ বরং তাঁর নিকট (কেবল) তোমাদের তাকওয়া (-ই) পৌছে থাকে كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ এই প্রকারে আল্লাহ তা'আলা ঐ পশুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ যেন তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ যেহেতু তিনি তোমাদের তৌফিক দান করেছেন وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ এবং নিষ্ঠাবানদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ. (٣٧)

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম ইবনে জুরাইজের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, জাহিলিয়া যুগের লোকেরা কুরবানির জন্তুর গোশত এবং রক্ত কা'বা গৃহে ছিটিয়ে দিত। সুতরাং রাসূল ﷺ-এর নিকট সাহাবায়ে কেরাম বললেন যে, কা'বা গৃহে গোশত ও রক্ত ছিটিয়ে দেওয়ার অধিকার তো আমাদের সবচেয়ে বেশি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[ইবনে কাছীর ২৩০/৩, রূহুল মা'আনী ১৫৮/১৭/৯, কুরতুবী ৬৩/১২, বাহরে মুহীত্ব ৩৪৩/৬ ফাতহুল কাদীর ৪৫৯/৩]

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ : شَعَائِرُ শব্দটি شَعِيْرَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। যে যে বিষয়কে কোনো বিশেষ মাযহাব অথবা দলের আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে তার شَعَائِرُ বলা হয়। লোক সমাজে যে যে বিধানকে মুসলমান হওয়ার আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে 'শা'আয়েরে ইসলাম' বলা হয়। হজের অধিকাংশ বিধান তদ্রূপই।

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ : অর্থাৎ আল্লাহর আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক আল্লাহভীতির লক্ষণ। যার অন্তরে তাকওয়া ও খোদাভীতি থাকে, সে-ই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরে খোদাভীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজকর্মে পরিলক্ষিত হয়।

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى : অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তু থেকে দুধ, সওয়ারী, মাল পরিবহন ইত্যাদি সর্বপ্রকার উপকার লাভ করা তেমাদের জন্য তখন পর্যন্ত হালাল, যে পর্যন্ত এগুলোকে হেরেম শরীফে জবাই করার জন্য উৎসর্গ না কর। হজ্জ অথবা ওমরাকারী ব্যক্তি জবাই করার জন্য যে জন্তু সাথে নিয়ে যায় তাকে হাদী বলা হয়। যখন কোনো জন্তুকে হেরেমের হাদী হওয়ার জন্য উৎসর্গ করা হয়, তখন তা থেকে কোনো উপকার লাভ করা বিশেষ কোনো অপরাগতা ছাড়া জায়েজ নয়।

যদি কেউ উটকে হাদী করে সাথে নেয়, তার সাথে সওয়ারীর অন্য কোনো জন্তু না থাকে এবং পায়ে হাঁটা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এরূপ অপারগতার কারণে সে হাদীর উটে সওয়ার হতে পারে।

ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ : এখানে بَيْتِ عَتِيْقٍ (সম্মানিত গৃহ) বলে সম্পূর্ণ হেরেম বোঝানো হয়েছে। হেরেম বায়তুল্লাহ্‌রই বিশেষ আঙ্গিনা; যেমন–পূর্ববর্তী আয়াতে 'মসজিদে হারাম' বলে হেরেম বোঝানো হয়েছে। مَحِلٌّ অর্থাৎ মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার স্থান। এখানে জবাই করার স্থান বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, হাদীর জন্তু জবাই করার স্থান বায়তুল্লাহ্‌র সন্নিকট; অর্থাৎ সম্পূর্ণ হেরেমে। এতে বোঝা গেল যে, হেরেমের ভিতরে হাদী জবাই করা জরুরি, হেরেমের বাইরে জায়েজ নয়। হেরেম মিনার কুরবানগাহ্‌ও হতে পারে: মক্কা মোকাররমার অন্য কোনো স্থানও হতে পারে। –[রূহুল মা'আনী]

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا : আরবি ভাষায় نُسُكٌ ও مَنْسَكٌ কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) জন্তু কুরবানি করা, (দুই) হজের ক্রিয়াকর্ম এবং (তিন) ইবাদত। কুরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তিন অর্থই হতে পারে। এ কারণেই তাফসীরকারক মুজাহিদ প্রমুখ এখানে مَنْسَكٌ-এর অর্থ কুরবানি নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এই উম্মতকে কুরবানির যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা কোনো নতুন আদেশ নয়, পূববর্তী উম্মতদেরকেও কুরবানির আদেশ দেওয়া হয়েছিল'। কাতাদাহ্ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। তাঁর মতে আয়াতের অর্থ এই যে, হজের ক্রিয়াকর্ম যেমন এই উম্মতের উপর আরোপ করা হয়েছে। তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও হজ ফরজ করা হয়েছিল। ইবনে আরাফা তৃতীয় অর্থ ধরে আয়াতের অর্থ করেছেন যে, আমি আল্লাহর ইবাদত পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরজ করেছিলাম। ইবাদতের পদ্ধতিতে কিছু কিছু পার্থক্য সব উম্মতেই ছিল, কিন্তু মূল ইবাদত সবার মধ্যে অভিন্ন ছিল।

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ আরবি ভাষায় خَبْتٌ শব্দের অর্থ নিম্নভূমি। এ কারণে এমন ব্যক্তিকে خَبِيْتٌ বলা হয়, যে নিজেকে হেয় মনে করে। এ জন্যই কাতাদাহ্ ও মুজাহিদ مُخْبِتِيْنَ-এর অর্থ করেছেন বিনয়ী। হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, এমন লোকদেরকে مُخْبِتِيْنَ বলা হয়, যারা অন্যের উপর জুলুম করে না। কেউ তাদের উপর জুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান বলেন, যারা সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও অভাব-অনটনে আল্লাহ্‌র ফয়সালা ও তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকে, তারাই مُخْبِتِيْنَ

وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ : وَجَلٌ-এর আসল অর্থ ঐ ভয়ভীতি, যা কারও মাহাত্ম্যের কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ তা'আলার জিকির ও নাম শুনে তাদের অন্তরে এক বিশেষ ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মের আলামতরূপে গণ্য হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও ইবাদতকে شَعَائِرٌ বলা হয়। কুরবানি ও এমন বিধানাবলির অন্যতম। কাজেই এ ধরনের বিধানসমূহ পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ : صَوَآفَّ শব্দের অর্থ সারিবদ্ধভাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, জন্তু তিন পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান থাকবে এবং এক পা বাঁধা থাকবে। উটের জন্য এই নিয়ম। দণ্ডায়মান অবস্থায় উট কুরবানি করা সুন্নত ও উত্তম। অবশিষ্ট সব জন্তুকে শোয়া অবস্থায় জবাই করা সুন্নত।

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا : এখানে وَجَبَتْ -এর অর্থ -سَقَطَتْ যেমন বাক্যপদ্ধতিতে বলা হয় وَجَبَتِ الشَّمْسُ অর্থাৎ সূর্য ঢলে পড়েছে। এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়া বোঝানো হয়েছে।

اَلْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ : যাদেরকে কুরবানির গোশত দেওয়া উচিত, তাদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতে بَائِسَ فَقِيْرَ বলা হয়েছে। এর অর্থ দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত। এই আয়াতে তদস্থলে قَانِعٌ ও مُعْتَرٌ শব্দদ্বয়ের দ্বারা তার তাফসীর করা হয়েছে। ঐ قَانِعٌ অভাবগ্রস্ত ফকিরকে বলা হয়, যে কারো কাছে যাচনা করে না, দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে مُعْتَرٌ ঐ ফকিরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে; মুখে সওয়াল করুক বা না করুক। –[মাযহারী]

ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য : لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا বাক্যে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, কুরবানি একটি মহান ইবাদত; কিন্তু আল্লাহর কাছে এর গোশত ও রক্ত পৌঁছে না এবং কুরবানির উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্যান্য সব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নামাজে উঠা-বসা করা এবং রোজায় ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মহব্বত বর্জিত ইবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র। কিন্তু ইবাদতের শরিয়তসম্মত কাঠামোও এ কারণে জরুরি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্য এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَتَخْطَفُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ ও سَمِعَ মাসদার خَطْفٌ মূলবর্ণ (خ . ط . ف) জিনস صحيح অর্থ– অতঃপর তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

تَهْوِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هَوِىٌّ মূলবর্ণ (ه . و . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে আছাড় মারল।

اَلْمُخْبِتِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْبَاتٌ মূলবর্ণ (خ . ب . ت) জিনস صحيح অর্থ– এই সকল বিনয়ীদেরকে।

وَجِلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার وَجَلٌ মূলবর্ণ (و . ج . ل) জিনস مثال واوى অর্থ– ভীতিপূর্ণ হয়ে যায়।

وَجَبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَجْبَةٌ মূলবর্ণ (و . ج . ب) জিনস مثال واوى অর্থ– তা পড়ে যায়।

اَلْقَانِعُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার قَنَاعَةٌ মূলবর্ণ (ق . ن . ع) জিনস صحيح অর্থ– অযাচনাকারী

اَلْمُعْتَرُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِعْتِرَارٌ মূলবর্ণ (ع . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যাচঞাকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ এখানে فَإِلٰهُكُمْ এর فاء টি فصيحة আর اِلٰهُكُمْ মুবতাদা আর اِلٰهٌ তার খবর وَّاحِدٌ সিফাত فَلَهٗ -এর فاء আতেফা আর لَهٗ শব্দটি اَسْلِمُوْا এর সাথে متعلق مقدم আর اَسْلِمُوْا **ফে'ল** ও ফায়েল আর وَبَشِّرْ -এর واو টি আতেফা بَشِّرْ ফে'লে আমর যমীর اَنْتَ উহ্য ফায়েল আর اَلْمُخْبِتِيْنَ **হলো** مفعول به। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫]

৩৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণ হতে (কাফেরদের প্রভাব) দূর করে দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রতারক কাফেরকে ভালোবাসেন না।	إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. যাদের সাথে (কাফেররা) যুদ্ধ করে, তাদেরকে (যুদ্ধ করার) অনুমতি প্রদান করা হলো, কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য (বিজয়ী) করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।	أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾
৪০. যারা নিজ গৃহ হতে বিনা কারণে (অন্যায়ভাবে) বিতাড়িত হয়েছে শুধু এই জন্য যে, তারা এরূপ বলে- আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ; আর যদি আল্লাহ তা'আলা মানুষের একের শক্তিকে অপরের দ্বারা খর্ব না করতেন, তবে খ্রিস্টানদের আশ্রম ও গির্জা এবং ইহুদিদের উপাসনালয় আর সেই মসজিদসমূহ যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে থাকে- সমস্তই ধ্বংস হয়ে যেত; এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন- যে আল্লাহর (ধর্মের) সাহায্য করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা শক্তিমান, পরাক্রান্ত।	الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা দূর করে দিবেন عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا মুমিনগণ হতে (কাফেরদের প্রভাব) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন না كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ কোনো প্রতারক কাফেরকে।

৩৯. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ যাদের সাথে (কাফেররা) যুদ্ধ করে, তাদেরকে (যুদ্ধ করার) অনুমতি প্রদান করা হলো بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য (বিজয়ী) করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

৪০. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم যারা নিজ গৃহ হতে বিতাড়িত হয়েছে بِغَيْرِ حَقٍّ বিনা কারণে إِلَّا أَن يَقُولُوا শুধু এ জন্য যে, তারা এরূপ বলে رَبُّنَا اللَّهُ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ وَلَوْلَا আর যদি না دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ আল্লাহ তা'আলা মানুষের একের শক্তিকে অপরের দ্বারা খর্ব করতেন لَّهُدِّمَتْ তবে সমস্তই ধ্বংস হয়ে যেত صَوَامِعُ وَبِيَعٌ খ্রিস্টানদের আশ্রম ও গির্জা وَصَلَوَاتٌ এবং ইহুদিদের উপাসনালয় وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا আর সেই মসজিদসমূহ যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়া হয়ে থাকে وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ সাহায্য করবেন مَن يَنصُرُهُ তাকে যে আল্লাহর (ধর্মের) সাহায্য করবে إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শক্তিমান, পরাক্রান্ত।

৪১. যারা এমন যে, যদি আমি পৃথিবীতে তাদেরকে রাজত্ব প্রদান করি, তবে তারা নামাজের পাবন্দি করবে এবং জাকাত প্রদান করবে, আর (অপরকে) নেক কাজ করতে বলবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে; আর সমস্ত কাজের পরিণাম তো আল্লাহ তা'আলারই ক্ষমতাধীন।	اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٤١﴾
৪২. আর এরা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (তবে দুঃখিত হবেন না, কেননা) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং আ'দ ও ছামূদ সম্প্রদায় (নিজ নিজ নবীগণকে) অবিশ্বাস করেছিল।	وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾
৪৩. এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় ও লূতের সম্প্রদায়ও।	وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর মাদইয়ানের অধিবাসীরাও এবং মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, সুতরাং আমি সেই কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম, অতঃপর আমি তাদেরকে (আজাব দ্বারা) পাকড়াও করলাম, সুতরাং (দেখ) আমার আজাব কেমন হয়েছিল।	وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾
৪৫. মোটকথা, এমন কত জনপদ রয়েছে– যেগুলোকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি– এমতাবস্থায় যে, তারা অবাধ্যাচরণ করত, ফলে ঐগুলো স্বীয় ছাদসমূহের উপর পড়ে রয়েছে, এবং বহু অকর্মণ্য কূপ ও বহু মজবুত অট্টালিকাও।	فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. اَلَّذِيْنَ যারা এমন যে اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ যদি আমি পৃথিবীতে তাদেরকে রাজত্ব প্রদান করি اَقَامُوا الصَّلٰوةَ তবে তারা নামাজের পাবন্দি করবে وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করবে وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ এবং নেক কাজ করতে বলবে وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ আর সমস্ত কাজের পরিণাম তো আল্লাহ তা'আলারই ক্ষমতাধীন।

৪২. وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ আর এরা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ তাদের পূর্বে অবিশ্বাস করেছিল قَوْمُ نُوْحٍ নূহের সম্প্রদায় وَعَادٌ وَّثَمُوْدُ এবং আ'দ ও ছামূদ সম্প্রদায়।

৪৩. وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় وَقَوْمُ لُوْطٍ ও লূতের সম্প্রদায়ও।

৪৪. وَاَصْحٰبُ مَدْيَنَ আর মাদইয়ানের অধিবাসীরা ও وَكُذِّبَ مُوْسٰى এবং মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ সুতরাং আমি সেই কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ সুতরাং আমার আজাব কেমন হয়েছিল।

৪৫. فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ মোটকথা, এমন কত জনপদ রয়েছে اَهْلَكْنٰهَا যেগুলো কে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি وَهِيَ ظَالِمَةٌ এমতাবস্থায় যে, তারা অবাধ্যাচরণ করত فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ফলে ঐগুলো স্বীয় ছাদসমূহের উপর পড়ে রয়েছে وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ এবং বহু অকর্মণ্য কূপও وَقَصْرٍ مَّشِيْدٍ বহু মজবুত অট্টালিকাও।

৪৬. তবে কি এ সমস্ত লোক দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তো তাদের অন্তর এমন হতো যে, তা দ্বারা তারা বুঝত অথবা তাদের কর্ণ এমন হতো যে, তা দ্বারা তারা শুনত। কথা হলো এই যে, (অবোধদের) চক্ষু অন্ধ হয়ে যায় না, বরং অন্ধ হয়ে যায় সেই অন্তরসমূহ- যা তাদের বক্ষের মধ্যে আছে (কাফেরদের অন্তরও তদ্রূপ)।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ তবে কি এসমস্ত লোক দেশ বিদেশ ভ্রমণ করেনি فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ তাহলে তো তাদের অন্তর এমন হতো যে يَعْقِلُونَ بِهَا তা দ্বারা তারা বুঝত أَوْ آذَانٌ অথবা তাদের কর্ণ এমন হতো যে يَسْمَعُونَ بِهَا যা দ্বারা তারা শুনত فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ কথা হলো এই যে, চক্ষু অন্ধ হয়ে যায় না وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ বরং অন্ধ হয়ে যায় সেই অন্তরসমূহ الَّتِي فِي الصُّدُورِ যা তাদের বক্ষের মধ্যে আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ [٣٨]

শানে নুযূল : হিজরত করার পূর্বে মুশরিকদের পক্ষ থেকে মুমিনগণকে মক্কা শরীফে সীমাহীন ও অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। ফলে অনেকেই আবিসিনিয়ার পথে হিজরত করে চলে গেলেন। কোনো কোনো মুমিন যথাসাধ্য মক্কাতে থেকেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করবেন বলে মনে করেন। তাদের সাথে কৌশল অবলম্বন করে ধোকা দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন মুমিনদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে নিষেধ করে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিজ দায়িত্বে নেওয়ার কথা ঘোষণা দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ৬৫/১২]

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩)

শানে নুযূল : নাসায়ী ও তিরমিযী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন মক্কা ত্যাগ করে মদিনার পথে হিজরত করলেন, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, মক্কাবাসীরা তাদের নবীকে বহিষ্কার করে দিল! তারা তো অতি শীঘ্রই ধ্বংস হবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ৬৬/১২, তাবারী ১৬১/৯, ফাতহুল কাদীর ৩, ইবনে কাছীর ২৩২/৩]

সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি প্রদান করে সর্বপ্রথম আলোচ্য আয়াতই নাজিল করা হয়েছে। এ আয়াত নাজিল হওয়ার দ্বারা কাফের ও বিজাতীয়দের পক্ষ হতে মুসলমানদের উপর আপতিত সকল প্রকারের নির্যাতন সহ্য করার নির্দেশমূলক সকল আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যায়। -[প্রাগুক্ত]

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ [٤١]

শানে নুযূল : ইবনে আরাবী হাতেম আইয়ূবের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং হিশাম মুহাম্মদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) বলেন, আমাদেরকে অন্যায়ভাবে আমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আমাদের অপরাধ এতটুকুই ছিল যে, আমরা বলেছিলাম- আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক। অতঃপর আমাদেরকে রাজত্ব দেওয়া হয়েছে জমিনের উপর। ফলে আমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করেছি, জাকাত আদায় করেছি, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেছি। সুতরাং আলোচ্য আয়াত আমাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। -[ইবনে কাছীর ২৩৩/৩]

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ [٤٦]

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম ও কাতাদাহ ইবনে জুবাইর -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) অর্থাৎ ইবনে উম্মে মাকতূম সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, সূরায়ে বনী ইসরাঈলে وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ আয়াতাংশ যখন নাজিল হয়, তখন হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো দুনিয়াতে অন্ধ, তাই বলে পর জগতেও কি অন্ধ থেকে যাব? হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করা হয়েছে।

–[কুরতুবী ৭৩/১২, রূহুল মা'আনী ১৬৮/১৭/৯]

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে হেরেম শরীফ ও মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে এবং ওমরা আদায় করতে বাধা দিয়েছিল; অথচ তাঁরা ওমরার ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে এই ওয়াদা দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সত্বরই মুশরিকদের শক্তি ভেঙ্গে দেবেন। ষষ্ঠ হিজরিতে এই ঘটনা ঘটেছিল। এরপর থেকে উপর্যুপরি কাফের মুশরিকদের শক্তি দুর্বল ও তারা মনোবলহীন হতে থাকে। অবশেষে অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজিত হয়ে যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রথম আদেশ : মক্কায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোনো দিন যেত না, যে দিন কোনো– না– কোনো মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁরা কাফেরদের জুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূল ﷺ জবাবে বলতেন সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর ব্যাপী এ পরিস্থিতিই অব্যাহত ছিল। –[কুরতুবী]

যখন রাসূলে কারীম ﷺ মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে আদিষ্ট হন এবং হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হয়– أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ لَيَهْلِكُنَّ অর্থাৎ এরা তাদের পয়গম্বরকে বহিষ্কার করেছে। এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদিনায় পৌঁছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী]

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাইয়্যান, হাকেম প্রমুখের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটাই প্রথম আয়াত, যা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছি। ইতঃপূর্বে সত্তরেরও অধিক আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

জেহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য : وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ –এতে জেহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং এটা যে নতুন নির্দেশ নয়– তা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গম্বরদেরকেও কাফেরদের মোকাবিলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন না করা হলে কোনো মাযহাব ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপসনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেত।

لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوٰتٌ وَمَسَٰجِدُ : বিগত জমানায় যত ধর্মের ভিত্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শিরকে পরিণত হয়েছে, সেসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা স্ব-স্ব জমনায় তাদের উপাসনালয় গুলোর সম্মান ও সংরক্ষণ ফরজ ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোনো সময়ই নবুয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; যেমন– অগ্নিপূজারী মজুসী অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা তাদের ইবাদতখানা কোনো সময়ই সম্মানার্হ ছিল না।

صَوَامِعُ শব্দটি صَوْمَعَةٌ -এর বহুবচন। এটা খ্রিস্টানদের সংসার ত্যাগী দরবেশদের বিশেষ ইবাদতখানা وَبِيَعٌ শব্দটি بِيْعَةٌ -এর বহুবচন। খ্রিস্টানদের সাধারণ গির্জাকে بِيْعَةٌ বলা হয়। وَصَلَوٰتٌ শব্দটি صَلٰوةٌ -এর বহুবচন। ইহুদিদের ইবাদতখানাকে وَصَلَوٰتٌ এবং মুসলমানদের ইবাদতখানাকে مَسَاجِدُ বলা হয়।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও জেহাদের আদেশ অবতীর্ণ না হলে কোনো সময়েই কোনো ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। হযরত মূসা (আ.)-এর আমলে صَلَوَاتٌ হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলে بِيَعٌ ও صَوَامِعُ এবং শেষনবী ﷺ-এর জমানায় মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। –[কুরতুবী]

খোলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও তার প্রকাশ : اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ এই আয়াতে তাদেরই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের বর্ণনা اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ আয়াতে ছিল। অর্থাৎ যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে তারা তাদের ক্ষমতাকে নামাজ কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই আয়াতে মদিনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত উসমান গনী (রা.) বলেন– ثَنَاءٌ قَبْلَ بَلَاءٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এই ইরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসা-কীর্তন করার শামিল। এরপর আল্লাহ তা'আলার এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। চারজন খোলাফায়ে রাশেদীন এবং মুহাজিরগণ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা তাদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন। তাঁরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, জাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎকাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন। এ কারণেই আলেমগণ বলেন, এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খেলাফায়ে রাশেদীন সবাই এই সুসংবাদের যোগ্যপাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য, বিশুদ্ধ এবং আল্লাহর ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল।

–[রূহুল-মা'আনী]

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূলের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিন্তু বলাবাহুল্য কুরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোনো বিশেষ ঘটনার মাধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই তাফসীরবিদ যাহ্হাক বলেন, এই আয়াতে তাদের জন্যই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের এমন সব কর্ম আনজাম দেওয়া উচিত, যেগুলো খোলাফায়ে রাশেদীন তাদের জমানায় আনজাম দিয়েছিলেন।

–[কুরতুবী]

শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ ধর্মীয় কাম্য :

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ : এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশভ্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে। فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ বাক্যে ইঙ্গিত আছে যে, অতীতকাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে। ইবনে আবী হাতেম কিতাবুততাফাক্কুরে হযরত মালেক ইবনে দীনার (র.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশ দেন যে, লোহার জুতা ও লোহার লাঠি তৈরি কর এবং আল্লাহর পৃথিবীতে এত ঘোরাফেরা কর যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি ভেঙ্গে যায়। (রূহুল-মা'আনী) এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُقٰتَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُقَاتَلَةٌ মূলবর্ণ (ق - ت - ل) জিনস صحيح অর্থ– যাদের সাথে (কাফেররা) যুদ্ধ করে, যাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়।

لَهُدِّمَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَهْدِيْمٌ মূলবর্ণ (ه - د - م) জিনস صحيح অর্থ– সমস্তই ধ্বংস হয়ে যেত।

صَوَامِعُ : صَوْمَعَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– খ্রিস্টান সংসার বিরাগিদের উপাসনালয়, গীর্জা।

بِيَعٌ : শব্দটি بِيْعَةٌ এর বহুবচন। অর্থ– ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ইবাদতখানা এবং তাদের গীর্জাঘর।

صَلَوَاتٌ : صَلَاةٌ -এর বহুবহন। অর্থ– রহমতসমূহ, নামাজসমূহ, দোয়াসমূহ, ইহুদিদের ইবাদতখানা।

لَيَنْصُرَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَصْرٌ মূলবর্ণ (ن - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– নিঃসন্দেহে (আল্লাহ) সাহায্য করবেন।

نَهَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَهْىٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা নিষেধ করবে।

فَأَمْلَيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْلَاءٌ মূলবর্ণ (م - ل - أ) জিনস مهموز لام অর্থ– সুতরাং আমি অবকাশ দিয়েছিলাম।

خَاوِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার خَوِىٌّ ও خَوَاءٌ মূলবর্ণ (خ - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তা পড়ে রয়েছে।

لَمْ يَسِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَيْرٌ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা ভ্রমণ করে নি।

لَا تَعْمٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার عَمًى মূলবর্ণ (ع - م - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অন্ধ হয়ে যায় না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ : এখানে اُذِنَ ফে'লে মাজহুল, আর لِلَّذِيْنَ টা اُذِنَ -এর সাথে متعلق আর يُقَاتَلُوْنَ বাক্য টি সেলাহ, يُقَاتَلُوْنَ ফে'ল ও ফায়েল, بِاَنَّهُمْ টা اُذِنَ এর সাথে متعلق আর ظُلِمُوْا বাক্যটি اَنَّهُمْ এর খবর। আর وَاِنَّ اللّٰهَ -এর واو টি استئنافية আর اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اللّٰهَ তার اسم আর لَقَدِيْرٌ টা عَلٰى نَصْرِهِمْ -এর সাথে মুতা'আল্লিক। আর قَدِيْرٌ হলো خبر ان।

–[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮-১৩৯]

৪৭. আর এরা আপনার নিকট দ্রুত আজাবের চাহিদা করছে, অথচ আল্লাহ তা'আলা কখনো নিজের ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না, আর আপনার প্রতিপালকের দরবারের (কিয়ামতের) একদিন তোমাদের হিসেবের এক হাজার বছরের সমতুল্য।	وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ۭ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর এমন অনেক জনপদ (–বাসী) ছিল, যাদেরকে আমি অবকাশ দিয়েছিলাম, এমতাবস্থা যে, তারা অবাধ্যাচরণ করত, অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম, আর (সকলকে) আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে।	وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾
৪৯. আপনি বলে দিন, হে লোকসকল! আমি তো তোমাদের জন্য শুধু একজন প্রকাশ্য ভয়প্রদর্শক।	قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾
৫০. অতএব, যারা (ভয় প্রদর্শনবাণী শ্রবণ করে) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করতে থাকে, তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।	فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾
৫১. আর যারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে (ব্যর্থ করার) চেষ্টা করতে থাকে (নবী বা মু'মিনদেরকে) হারিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, (মূলত) এরূপ লোকেরাই হচ্ছে দোজখী।	وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ আর এরা আপনার নিকট দ্রুত আজাবের চাহিদা করছে وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ অথচ আল্লাহ তা'আলা কখনো নিজের ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ আর আপনার প্রতিপালকের দরবারে একদিন كَاَلْفِ سَنَةٍ এক হাজার বছরের সমতুল্য مِّمَّا تَعُدُّوْنَ তোমাদের হিসাবের।

৪৮. وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ আর এমন অনেক জনপদ (বাসী) ছিল اَمْلَيْتُ لَهَا যাদেরকে আমি অবকাশ দিয়েছিলাম وَهِيَ ظَالِمَةٌ এমতাবস্থায় যে, তারা অবাধ্যাচরণ করত ثُمَّ اَخَذْتُهَا অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ আর (সকলকে) আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে।

৪৯. قُلْ আপনি বলে দিন يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে লোকসকল اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ আমি তো তোমাদের জন্য শুধু نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ একজন প্রকাশ্য ভয়প্রদর্শক।

৫০. فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অতঃপর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করতে থাকে لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ও সম্মানজনক জীবিকা।

৫১. وَالَّذِيْنَ سَعَوْا আর যারা চেষ্টা করতে থাকে فِيْٓ اٰيٰتِنَا আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে مُعٰجِزِيْنَ হারিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে اُولٰٓئِكَ এরূপ লোকেরাই হচ্ছে اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ দোজখী।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

৫২. আর (হে মুহাম্মদ!) আমি আপনার পূর্বে কোনো রাসূল ও কোনো নবী এমন পাঠাইনি, যার সাথে এ ঘটনা ঘটেনি যে, যখনই তিনি কিছু পাঠ করতেন, (শয়তান তখনই) তাঁর পঠিত বিষয়ে (কাফেরদের অন্তরে) সন্দেহের উদ্ভব করত, অনন্তর আল্লাহ তা'আলা শয়তান কর্তৃক উদ্ভাবিত সন্দেহসমূহকে নস্যাৎ করে দেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজ আয়াতসমূহকে অধিক মজবুত করে দেন; আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, অতিশয় প্রজ্ঞাময়।

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

৫৩. যেন তিনি শয়তানের উদ্ভাবিত সন্দেহকে এমন লোকদের জন্য পরীক্ষার উপকরণ করে দেন–যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যাদের অন্তর কঠিন, আর বাস্তবিক এই জালিমরা চরম বিরোধিতার মধ্যে রয়েছে।

وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. আর যাদেরকে বুঝ-শক্তি দেওয়া হয়েছে, যেন তারা এ বিষয়ে অধিকতর বিশ্বাসী হয় যে, এই আয়াতসমূহ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে চিরসত্য, ফলে তারা ঈমানে অধিক দৃঢ় হয়ে যাবে, অতঃপর তার প্রতি তাদের অন্তর আরো আকৃষ্ট হয়ে পড়বে; আর প্রকৃতপক্ষে এই ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. وَمَآ أَرْسَلْنَا আর আমি এমন পাঠাইনি مِن قَبْلِكَ আপনার পূর্বে مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ কোনো রাসূল ও কোনো নবী إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ যার সাথে এ ঘটনা ঘটেনি যে, যখনই তিনি কিছু পাঠ করতেন أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ শয়তান তাঁর পঠিত বিষয়ে (কাফেরদের অন্তরে) সন্দেহের উদ্ভব করত فَيَنسَخُ ٱللَّهُ অনন্তর আল্লাহ তা'আলা নস্যাৎ করে দেন مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ শয়তান কর্তৃক উদ্ভাবিত সন্দেহসমূহকে ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজ আয়াতসমূহকে অধিক মজবুত করে দেন وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী অতিশয় প্রজ্ঞাময়।

৫৩. لِّيَجْعَلَ যেন তিনি করে দেন مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ শয়তানের উদ্ভাবিত সন্দেহকে فِتْنَةً পরীক্ষার উপকরণ لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ এমন লোকদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, এবং যাদের অন্তর কঠিন وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ আর বাস্তবিক এই জালিমরা চরম বিরোধিতার মধ্যে রয়েছে।

৫৪. وَلِيَعْلَمَ আর যেন অধিকতর বিশ্বাসী হয় ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ তারা যাদেরকে বুঝ শক্তি দেওয়া হয়েছে أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ এ বিষয়ে যে এ আয়াতসমূহ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিরসত্য فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ ফলে তারা ঈমানে অধিক দৃঢ় হয়ে যাবে فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ অতঃপর তার প্রতি তাদের অন্তর আরো আকৃষ্ট হয়ে পড়বে وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই প্রদর্শন করে থাকেন ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ঈমানদারদেরকে إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ সঠিক পথ।

৫৫. এবং কাফেররা সর্বদা তৎসম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যেই থাকবে (যে সন্দেহ শয়তান তাদের মনে জাগিয়েছে) যে পর্যন্ত না তাদের নিকট হঠাৎ একদিন কিয়ামত এসে পড়ে অথবা তাদের উপর কোনো অশুভ দিনের (অর্থাৎ হাশরের) আজাব এসে পৌছে।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾
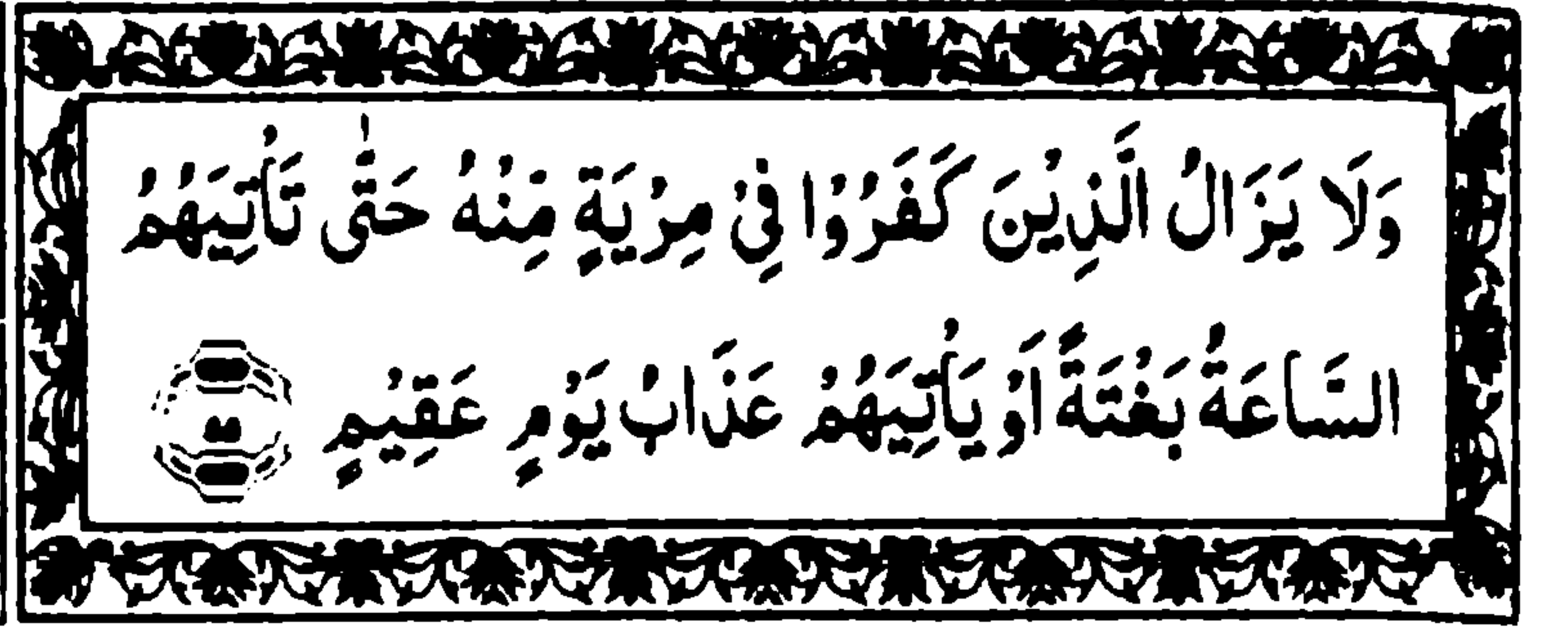
শাব্দিক অনুবাদ :

৫৫. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا আর কাফেররা সর্বদা থাকবে فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ তৎসম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যেই حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ যে পর্যন্ত না তাদের নিকট কিয়ামত এসে পড়ে بَغْتَةً হঠাৎ একদিন أَوْ يَأْتِيَهُمْ অথবা তাদের উপর এসে পৌছে عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ কোনো অশুভ দিনের আজাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ [٤٧]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত নযর ইবনে হারেছ মতান্তরে আবূ জাহল ইবনে হিশাম সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে মান্য না করার অপরাধের শাস্তি দ্রুত কামনা করছিল। সুতরাং শাস্তি বিলম্ব হলেও তা থেকে রেহাই পাবে না– সে কথা জানিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৭৩/১২]

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [٥٢]

শানে নুযূল : একবার মক্কায় কোনো এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত স্পষ্টতার সাথে সূরায়ে নাজম তেলাওয়াত করছিলেন। যে মজলিসে মুসলমান ও অমুসলমান উভয় পক্ষই উপস্থিত ছিল। অতঃপর যখন রাসূল ﷺ সূরায়ে আন-নাজম -এর أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, তখন শয়তান রাসূল ﷺ-এর স্বরকে নকল করে تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى কালিমাগুলো সম্প্রচার করে দিল। নিকটবর্তী কাফেররা ধারণা করে নিল যে, তাদের কর্ণকুহরে রাসূল ﷺ-এর স্বরই ভেসে উঠেছে। ফলে সূরা শেষে মুসলমানদের সাথে কাফেররাও সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং কাফেররা শয়তানে তৈরি আওয়াজকে প্রচার করতে লাগল। তাদের এহেন ভিত্তিহীন প্রচারে রাসূল ﷺ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে প্রশান্তি দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৭৮/১২]

পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়া তাৎপর্য : وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। এই দিন বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলি ও ভয়ঙ্কর অবস্থার কারণে এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে। অনেক তাফসীরকারক এখানে এই অর্থই নিয়েছেন।

বাস্তবক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হতে পারে। কোনো কোনো হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন নিঃস্ব মুহাজিরদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি; আরো বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে। আল্লাহর একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃস্বরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। –[মাযহারী]

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : সূরা মা'আরেজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াতটি হলো এই– كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ এতেও উপরিউক্ত উভয় প্রকার তাফসীর হতে পারে। প্রত্যেকের সংকট ভিন্ন ভিন্ন ও কম-বেশি হবে, তাই দিনটি কারো কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারো কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়। অর্থাৎ এক আয়াতে এক হাজার এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে।

مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ : এ থেকে জানা যায় যে, রাসূল ও নবী এক নয় পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তি এই যে, নবী তাঁকে বলা হয়, যাঁকে জনগণের সংস্কারের

উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়তের পদ দান করা হয় এবং তাঁর কাছে ওহী আগমন করে, তাঁকে কোনো স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হোক বা কোনো পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরিয়ত প্রচারে আদিষ্ট করা হোক। যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হয়, তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত মূসা, ঈসা (আ.) ও শেষ নবী মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ। এবং যিনি পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরিয়ত প্রচারে আদিষ্ট, তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত হারুন (আ.)। তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর কিতাব তওরাত ও তাঁরই শরিয়ত প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। 'রাসূল' তাঁকে বলা হয়, যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হয়। এ থেকে আরো জানা গেল যে, যিনি রাসূল হবেন তিনি নবীও হবেন। এটা জরুরি। কিন্তু যিনি নবী হবেন তাঁর রাসূল হওয়া জরুরি নয়। এই ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেত্রে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আগমন করেন, তাঁকে রাসূল বলা এর পরিপন্থি নয়। সূরা মারইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْٓ اُمْنِيَّتِهٖ : আয়াতে تَمَنّٰى শব্দের অর্থ قَرَأَ (আবৃত্তি করে) এবং اُمْنِيَّة শব্দের অর্থ قِرَاءَة অর্থাৎ, আবৃত্তি করা। আরবি অভিধানে এ অর্থও প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আবূ হাইয়ান বাহরে মুহীত গ্রন্থে এবং আরো অনেক তাফসীরকারক এ তাফসীরই গ্রহণ করেছেন। হাদীস গ্রন্থাদিতে এস্থলে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা "গারানিক" নামে খ্যাত। অধিক সংখ্যক হাদীসবিদগণের মতে ঘটনাটি ভিত্তিহীন। কেউ কেউ একে বানোয়াট ও ধর্মদ্রোহীদের আবিষ্কার বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর যারা একে ধর্তব্যও বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য নির্দেশাবলি সম্পর্কে যেসব সন্দেহ দেখা দেয়, তাঁরা সেসব সন্দেহের জবাবও দিয়েছেন। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, এই আয়াতের তাফসীর এই ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এ আয়াতের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা। ঘটনাটিকে অহেতুক আয়াতের তাফসীরের অংশ সাব্যস্ত করে সন্দেহ ও সংশয়ের দ্বার উন্মোচন অতঃপর জবাবদানে ব্যাপৃত হওয়া মোটেই লাভজনক কাজ নয়। তাই এ পথ পরিহার করা হলো।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اِسْتِعْجَالٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ل) জিনস صحيح অর্থ– এরা আপনার নিকট দ্রুত চাহিদা করছে।

تَعُدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَدٌّ মূলবর্ণ (ع - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমাদের হিসাবের।

مُعٰجِزِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُعَاجَزَةٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ز) জিনস صحيح অর্থ– হারিয়ে দেবার উদ্দেশ্য।

تَمَنّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَمَنِّىْ মূলবর্ণ (م - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি কিছু পাঠ করতেন।

اَلْقَى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে সন্দেহের উদ্ভব করত।

فَيَنْسَخُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَسْخٌ মূলবর্ণ (ن - س - خ) জিনস صحيح অর্থ– তিনি নস্যাৎ করে দেন।

اَلْقَاسِيَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার قَسْوٌ ও قَسْوَةٌ মূলবর্ণ (ق - س - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– কঠিন।

فَيُؤْمِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মূলবর্ণ (أ - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা ঈমানে অধিক দৃঢ় হয়ে যাবে

لَهَادٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

এখানে فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ এর فَيَنْسَخُ এর فاء হলো استئنافية আর يَنْسَخُ একটি ফে'ল, الله ফায়েল, مَا হলো مفعول به আর يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ..., ثُمَّ আতফ, يُحْكِمُ ফে'ল ও اللّٰهُ ফায়েল, اٰيٰتِ হলো مفعول به আর وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ হলো جملة إعتراضية যা মুবতাদা ও খবরের সমন্বয়ে গঠিত। –ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

৫৬. সেদিন আধিপত্য আল্লাহ তা'আলারই হবে। তিনি তাদের সকলের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। অতএব, যারা ঈমান এনে থাকবে এবং নেক কাজ করে থাকবে, তারা শান্তির উদ্যানে অবস্থান করবে।	اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٦﴾
৫৭. আর যারা কুফরি করে থাকবে এবং আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে থাকবে, তবে তাদের জন্য লাঞ্ছনাময় আজাব রয়েছে।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٧﴾
৫৮. আর যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বদেশ ত্যাগ করেছে, তৎপর তারা (জেহাদে) নিহত হয়েছে কিংবা মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উত্তম রিজিক দান করবেন এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত রিজিকদাতা অপেক্ষা উত্তম।	وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. আল্লাহ তাদেরকে এমন স্থানে নিয়ে দাখিল করবেন, যা তারা পছন্দ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বড় ধৈর্যশীল।	لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾
৬০. এই (বিষয়) তো গেল, আর যে ব্যক্তি এই পরিমাণ নির্যাতন করে, যে পরিমাণ নির্যাতন তাকে করা হয়েছিল, তৎপর আবার তার প্রতি অত্যাচার করা হয়, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে (সেই মুমিনকে) সাহায্য করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, অতিশয় মার্জনাকারী।	ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৬. اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ সেদিন আধিপত্য আল্লাহ তা'আলারই হবে يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ তিনি তাদের সকলের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অতএব যারা ঈমান এনে থাকবে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করে থাকবে فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ তারা শান্তির উদ্যানে অবস্থান করবে।

৫৭. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কুফরি করে থাকবে وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا এবং আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে থাকবে فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ তবে তাদের জন্য লাঞ্ছনাময় আজাব রয়েছে।

৫৮. وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا আর যারা স্বদেশ ত্যাগ করেছেন فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রাস্তায় ثُمَّ قُتِلُوْٓا তৎপর তারা (জেহাদে) নিহত হয়েছে। اَوْ مَاتُوْا কিংবা মারা গেছে لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই দান করবেন رِزْقًا حَسَنًا উত্তম রিজিক وَاِنَّ اللّٰهَ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ সমস্ত রিজিকদাতা অপেক্ষা উত্তম।

৫৯. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا আল্লাহ তাদেরকে এমন স্থানে নিয়ে দাখিল করবেন يَّرْضَوْنَهٗ যা তারা পছন্দ করবে وَاِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয়ই আল্লাহ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ মহাজ্ঞানী, বড় ধৈর্যশীল।

৬০. ذٰلِكَ এই (বিষয়) তো গেল وَمَنْ عَاقَبَ আর যে ব্যক্তি নির্যাতন করে بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ এ পরিমাণ যে পরিমাণ নির্যাতন তাকে করা হয়েছিল ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ তৎপর আবার তার প্রতি অত্যাচার করা হয় لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, অতিশয় মার্জনাকারী।

৬১. এটা এ জন্য যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর আল্লাহ তা'আলা খুব শ্রবণকারী, খুব দর্শনকারী।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾
৬২. (আর) এটা এই কারণেও যে, আল্লাহ তা'আলাই চিরসত্য, আর তারা আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে যে সমস্ত বস্তুর উপাসনা করছে, সেগুলো একেবারেই মিথ্যা এবং আল্লাহ তা'আলাই মহিমান্বিত, অতি বড়।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾
৬৩. তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান (অর্থাৎ মেঘ) হতে পানি বর্ষণ করেছেন, যা দ্বারা জমিন সবুজ হয়ে গেছে; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সম্যক সূক্ষ্মদর্শী– সব কিছুর খবর রাখেন।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۡ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾
৬৪. যা কিছু আসমানসমূহের মধ্যে আছে এবং যা কিছু জমিনের মধ্যে রয়েছে সব তাঁরই; আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী, সর্বপ্রকার প্রশংসার উপযোগী।	لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬১. ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ এটা এ জন্য যে, আল্লাহ يُوْلِجُ প্রবেশ করান الَّيْلَ فِى النَّهَارِ রাতকে দিনের মধ্যে وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ আর আল্লাহ তা'আলা খুব শ্রবণকারী, بَصِيْرٌ খুব দর্শনকারী।

৬২. ذٰلِكَ এটা একারণে যে بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ আল্লাহ তা'আলাই চিরসত্য وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ আর তারা আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে যে সমস্ত বস্তুর উপাসনা করছে هُوَ الْبَاطِلُ সেগুলো একেবারেই বাতিল وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ এবং আল্লাহ তা'আলাই মহিমান্বিত الْكَبِيْرُ অতি বড়।

৬৩. اَلَمْ تَرَ তুমি কি দেখনা اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ আল্লাহ তা'আলা বর্ষণ করেছেন مِنَ السَّمَآءِ مَآءً আসমান হতে পানি فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً যা দ্বারা জমিন সবুজ হয়ে গেছে اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সম্যক সূক্ষ্মদর্শী-সব কিছুর খবর রাখেন।

৬৪. لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহের মধ্যে আছে এবং যা কিছু জমিনের মধ্যে রয়েছে সব তাঁরই وَاِنَّ اللّٰهَ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা لَهُوَ الْغَنِىُّ অমুখাপেক্ষী الْحَمِيْدُ সর্বপ্রকার প্রশংসার উপযোগী।

৬৫. তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই কাজে নিয়োজিত রেখেছেন– পৃথিবীর সকল বস্তুকে এবং নৌকাকে (-ও) যা সমুদ্রে তাঁর আদেশে চলাচল করে এবং তিনিই আসমানসমূহকে জমিনের উপর পড়ে যাওয়া হতে প্রতিরোধ করে রেখেছেন। হাঁ যদি তাঁরই আদেশ হয়ে যায়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি অতিশয় স্নেহশীল, দয়াবান।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٥﴾
৬৬. আর তিনিই সেই প্রতিপালক– যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, আবার তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন; নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।	وَهُوَ الَّذِىْۤ اَحْيَاكُمْ ۫ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿٦٦﴾
৬৭. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য জবাই করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি, ফলে তারা সে মতে জবাই করত। সুতরাং তাদের উচিত, তারা যেন এই ব্যাপারে আপনার সাথে ঝগড়া না করে। অতএব, আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করতে থাকুন; নিশ্চয় আপনি সঠিক পথে রয়েছেন।	لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ؕ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٦٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৫. اَلَمْ تَرَ তুমি কি দেখনা যে اَنَّ اللّٰهَ আল্লাহ তা'আলা سَخَّرَ لَكُمْ তোমাদেরই কাজে নিয়োজিত রেখেছেন مَّا فِى الْاَرْضِ পৃথিবীর সকল বস্তুকে وَالْفُلْكَ এবং নৌকাকে تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ যা সমুদ্রে চলাচল করে بِاَمْرِهٖ তাঁর আদেশে وَيُمْسِكُ এবং তিনিই আসমানসমূহকে প্রতিরোধ করে রেখেছেন السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ জমিনের উপর পড়ে যাওয়া হতে اِلَّا بِاِذْنِهٖ হাঁ যদি তাঁরই আদেশ হয়ে যায়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা بِالنَّاسِ মানুষের প্রতি لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ অতিশয় স্নেহশীল, দয়াবান।

৬৬. وَهُوَ الَّذِىْۤ اَحْيَاكُمْ আর তিনিই সেই প্রতিপালক যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ আবার তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করবেন ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৬৭. لِكُلِّ اُمَّةٍ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য جَعَلْنَا আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি مَنْسَكًا জবাই করার পদ্ধতি هُمْ نَاسِكُوْهُ ফলে তাঁরা সে মতে জবাই করত فَلَا يُنَازِعُنَّكَ সুতরাং তাদের উচিত তারা যেন আপনার সাথে ঝগড়া না করে فِى الْاَمْرِ এ ব্যাপারে وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করতে থাকুন اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ নিশ্চয় আপনি সঠিক পথে রয়েছেন।

৬৮. আর যদি এরা (এতদসত্ত্বেও) আপনার সাথে ঝগড়া করতে থাকে, তবে আপনি এই বলে দিন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।	وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. আল্লাহ তা'আলা বিচার-দিবসে তোমাদের মধ্যে সে সকল বিষয়ে (কার্যকরী) মীমাংসা করে দেবেন–যে সকল বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে।	اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. [হে শ্রোতা!] তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই অবগত আছেন– যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে; নিশ্চয় এটা আমলনামায় (লিপিবদ্ধ) রয়েছে; নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর পক্ষে (খুব) সহজ।	اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧٠﴾
৭১. আর এই (মুশরিক) লোকেরা আল্লাহ ভিন্ন এমন বস্তুসমূহের পূজা করছে যেগুলো সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রমাণ প্রেরণ করেননি। আর না এদের নিকট কোনো (যৌক্তিক) প্রমাণ আছে; আর না এই জালিমদের কোনো সাহায্যকারীও হবে।	وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٧١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৮. وَاِنْ جٰدَلُوْكَ আর যদি এরা আপনার সাথে ঝগড়া করতে থাকে فَقُلِ তবে আপনি এই বলে দিন যে اللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা খুব অবগত আছেন بِمَا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে।

৬৯. اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন يَوْمَ الْقِيٰمَةِ বিচার দিবসে فِيْمَا كُنْتُمْ সে সকল বিষয়ে যে সকল বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ।

৭০. اَلَمْ تَعْلَمْ হে শ্রোতা! তুমি কি জান না যে اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই অবগত আছেন مَا فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ নিশ্চয় এটা আমলনামায় (লিপিবদ্ধ) রয়েছে اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর পক্ষে (খুব) সহজ।

৭১. وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর এই (মুশরিক) লোকেরা আল্লাহ ভিন্ন এমন বস্তুর সমূহের পূজা করছে مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا যেগুলো সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রমাণ প্রেরণ করেননি وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ আর না এদের নিকট কোনো (যৌক্তিক) প্রমাণ আছে وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ আর না এই জালিমদের কোনো সাহায্যকারীও হবে।

৭২. আর যখন এদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ- যা সুস্পষ্ট- তেলাওয়াত করা হয়, তখন কাফেরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের চিহ্ন দেখতে পাও, যেন এরা অনতিবিলম্বে সেই লোকদের উপর আক্রমণ করে বসবে- যারা তাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছে; আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তা অপেক্ষা অধিকতর অপ্রীতিকর বস্তু বলে দেব? তা হচ্ছে দোজখ; কাফেরদেরকে আল্লাহ এর ওয়াদা দিয়েছেন; এবং তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۷۲﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭২. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ আর যখন এদের সম্মুখে তেলাওয়াত করা হয় اٰيٰتُنَا আমার আয়াতসমূহ بَيِّنٰتٍ যা সুস্পষ্ট تَعْرِفُ তখন দেখতে পাও فِىْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا কাফেরদের মুখমণ্ডলে الْمُنْكَرَ অসন্তোষের চিহ্ন يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ যেন এরা অনতিবিলম্বে আক্রমণ করে বসবে بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ সেই লোকদের উপর যারা তাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করছে اٰيٰتِنَا আমার আয়াতসমূহ قُلْ আপনি বলুন اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ আমি কি তোমাদেরকে তা অপেক্ষা অধিকতর অপ্রীতিকর বস্তু বলে দেব اَلنَّارُ তা হচ্ছে দোজখ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেরদেরকে আল্লাহ এর ওয়াদা দিয়েছেন وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ এবং তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ [৫৮]

শানে নুযূল : মদিনায় হযরত ওসমান ইবনে মাজউন ও হযরত আবূ সালমা ইবনে আবুল আসাদ (রা.) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন কেউ কেউ বললেন যে, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন তারা গৃহে যারা মৃত্যু বরণ করেন, তাদের থেকে অতি মর্যাদাবান। তাঁদের এ বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেন যে, হিজরতকারীরা তারা গৃহে মৃত্যু বরণ করুক কিংবা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করুক তারা সকলেই সমান।

-[কুরতুবী ৮২/১২ রূহুল মা'আনী ১৮৮/১৭/৯]

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ [৬০]

শানে নুযূল : মুকাতিল ইবনে হাইয়ান ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ কোথাও একটি ক্ষুদ্র দল প্রেরণ করেন। রাস্তায় তারা মুশরিকদের এক বাহিনীর মুখামুখিতে পড়ে যান। সে সময় মুহাররাম মাসের আখেরী দু'টি রাত অবশিষ্ট ছিল। তৎকালে মুহাররম মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ অবৈধ ছিল। সুতরাং কাফেররা পরস্পরে বলে যে, মুসলমানরা তো এ মাসে যুদ্ধ করাকে বৈধ মনে করে না বিধায় তাদের মোকাবিলা করার প্রয়োজন।

মুসলমানরা কাফেরদেরকে যুদ্ধ করবেনা বলে প্রতিশ্রুতিও দান করে। কিন্তু তারা যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছুই মানতে অস্বীকার করল। সুতরাং কাফেররা চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ ভাবেই মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেল। পরিণতিতে আল্লাহ মুসলমানদেরকে সাহায্য করে বিজয় দিলেন। সেই সাহায্যপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র দল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন : -[ইবনে কাছীর ২৩৯/৩, রূহুল মা'আনী ১৯০/১৭/৯, কুরতুবী ৮৪/১২ তাবারী ১৮৩/৯, ফাতহুল কাদীর ৪৬৭/৩]

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ [٦٧]

শানে নুযূল : কাফেরদের মধ্য থেকে বুদাইল ইবনে ওরাকা এবং মুসলমানদের থেকে হযরত বাশার ইবনে সুফিয়ান খাবায়ী প্রমুখের মধ্যে জবাইকৃত জন্তু সম্পর্কে তর্ক হয়। কাফেরদের পক্ষ থেকে মুমিনদের প্রতি অভিযোগ হলো যে, তোমরা নিজেদের হাতে যে জন্তুকে হত্যা কর সে জন্তুটি আহার কর; কিন্তু আল্লাহ যে জন্তুটি হত্যা করেন, সে জন্তুটি তো তোমরা আহার করছনা। মুমিন ও কাফেরদের মধ্যে এ বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। আলোচ্য আয়াত জিহাদের বিধান নাজিল হবার পূর্বে নাজিল হয়েছিল।

–[বাহরে মুহীত্ব ৩৫৭/৬, কুরতুবী ৮৭/১২, রূহুল মা'আনী ১৯৬/১৭/৯]

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ [٦٨] اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [٦٩]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন– মে'রাজের রজনীতে রাসূল ﷺ যখন সপ্ত আসমানে গিয়ে ছিলেন, এবং সেখানে তিনি আল্লাহ তা'আলার অতুলনীয় নিদর্শনাবলি স্বচক্ষে অবলোকন করলেন, তখন তাঁর মনে এ আশঙ্কার উদয় হলো যে, ফিরে গিয়ে যখন সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে এ বিষয়গুলো বর্ণনা করে শুনাব, তখন তো কাফেররা আমাকে মিথ্যুক বলে তিরস্কার করবে । সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। জিহাদের বিধান নাজিল হবার দ্বারা অবশ্য নীরবে কাফেরদের নির্যাতন সহ্য করার নির্দেশাবলি রহিত হয়ে যায়।

–[কুরতুবী ৮৭/১২]

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের সবকিছুকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। অধীন করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এরূপ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এই অর্থের দিক দিয়ে এখানে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের পাহাড়, নদী, হিংস্রজন্তু, পশুপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বস্তু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলে না। কিন্তু কোনো কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেওয়ারই নামান্তর। এ কারণেই تَسْخِيْر -এর তরজমা "কাজে নিয়োজিত করা" দ্বারা করা হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আজ্ঞাধীন করে দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ তা'আলার ছিল। কিন্তু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্য ক্ষতিদায়ক হতো। কারণ মানুষের স্বভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। একজন নদীকে একদিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্যজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হতো না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন, কিন্তু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌছে দিয়েছেন।

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا : এই বিষয়বস্তুই প্রায় এমনি শব্দ সহযোগে আলোচ্য সূরার ৩৪ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে مَنْسَكٌ শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে مَنْسَكٌ ও نُسُكٌ কুরবানির অর্থে হজের বিধানাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল। এজন্য সেখানে وَاوْ সহকারে وَلِكُلِّ أُمَّةٍ বলা হয়েছিল। এখানে مَنْسَكٌ -এর অন্য অর্থ (অর্থাৎ জবাই করার বিধানাবলি অথবা শরিয়তের বিধানাবলির জ্ঞান) বোঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান। তাই এখানে واو সহকারে বলা হয়নি।

এই আয়াতের একটি তাফসীরের সারমর্ম তো এই যে, কোনো কোনো কাফের মুসলমানদের সাথে তাদের জবাই করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্ক-বিতর্ক করত। তারা বলত, তোমাদের ধর্মের এই বিধান আশ্চর্যজনক যে, যে জন্তুকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে জন্তুকে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মৃত্যুদান করেন অর্থাৎ সাধারণ মৃতজন্তু তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জবাবে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (রূহুল মা'আনী) অতএব এখানে مَنْسَكٌ -এর অর্থ হবে জবাই করার নিয়ম। জবাবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উম্মত ও শরিয়তের জন্যে জবাইয়ের বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রাসূলে কারীম ﷺ-এর শরিয়ত একটি স্বতন্ত্র শরিয়ত। এই শরিয়তের বিধি-বিধানের মোকাবিলা কোনো পূর্ববর্তী শরিয়তের বিধি-বিধান দ্বারা করাও জায়েজ নয়; অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও বাতিল চিন্তাধারা দ্বারা এর মোকাবিলা করছ। এটা কিরূপে জায়েজ হতে পারে? মৃতজন্তু হালাল নয়, এটা এই উম্মত ও

শরিয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয়: পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথার উপর নির্ভর করে পয়গম্বরের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বুদ্ধিতা। (রূহুল মা'আনী) সাধারণ তাফসীরকারকদের মতে مَنْسَكٌ শব্দের অর্থ এখানে শরিয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, যা কোনো বিশেষ ভালো অথবা মন্দ কাজের জন্য নির্ধারিত থাকে। এ কারণেই হজের বিধি-বিধানকে مَنَاسِكُ الْحَجِّ বলা হয়। কেননা এগুলোতে বিশেষ বিশেষ স্থান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্ধারিত আছে। (ইবনে-কাছীর) কামূসে نُسُكٌ শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে ইবাদত। কুরআনে وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। مَنَاسِكُ বলে ইবাদতের বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই দ্বিতীয় তাফসীরও বর্ণিত আছে। ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তাফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, مَنْسَكٌ বলে শরিয়তের সাধারণ বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিক ও ইসলামবিদ্বেষীরা মুহাম্মদি শরিয়তের বিধানাবলি সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা কি শোনেনি যে, কোনো পূর্ববর্তী শরিয়ত ও কিতাব দ্বারা নতুন শরিয়ত ও কিতাবের মোকাবিলা করা বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতকে তার সময়ে বিশেষ শরিয়ত ও কিতাব দিয়েছেন। অন্য কোনো উম্মত ও শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরিয়তের অনুসরণ সে উম্মতের জন্য বৈধ ছিল; কিন্তু যখন অন্য শরিয়ত আগমন করে, তখন তাদেরকে এই নতুন শরিয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন শরিয়তের কোনো বিধান পূর্ববর্তী শরিয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে 'মনসূখ' তথা রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে 'নাসেখ' তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি নতুন শরিয়তের বাহক, তাঁর সাথে কাউকে তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেওয়া যায় না। আয়াতের সর্বশেষ বাক্য فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ -এর সারমর্মও তাই। অর্থাৎ বর্তমানকালে যখন শেষনবী ﷺ একটি স্বতন্ত্র শরিয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তাঁর শরিয়তের সব বিধিবিধান নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার অধিকার কারো নেই।

এ থেকে আরো জানা গেল যে, প্রথম তাফসীর ও এই দ্বিতীয় তাফসীরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। কারণ আয়াতে জবাই সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরিয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। ভাষার ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে-অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই উভয় তাফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন প্রত্যেক উম্মতকে আলাদা আলাদা শরিয়ত দিয়েছেন, যার মধ্যে বিভিন্নমুখী খুঁটিনাটি বিধানও থাকে, তখন কোনো পূর্ববর্তী শরিয়তের অনুসারীর এমন অধিকার নেই যে, নতুন শরিয়ত সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করবে; বরং নতুন শরিয়তের অনুসরণ তার উপর ওয়াজিব। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ আপনি তাদের আপত্তি বা তর্ক বিতর্কে প্রভাবান্বিত হবেন না; বরং যথারীতি সত্যের প্রতি দাওয়াতের কর্তব্য পালনে মশগুল থাকুন; কারণ আপনি সত্য ও সরল পথে রয়েছেন। আপনার বিরোধীরাই পথভ্রষ্ট।

একটি সন্দেহের কারণ : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আরো একটি বিষয় জানা গেল যে, মুহাম্মদি শরিয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরিয়ত মনসূখ হয়ে গেছে। এখন যদি খ্রিস্টান, ইহুদি ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে, এই আয়াতে স্বয়ং কুরআন বলছে যে, প্রত্যেক শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর শরিয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা, স্বয়ং কুরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ শরিয়ত দেওয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদি শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। একথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী শরিয়তের কোনো বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এই বিষয়বস্তু আরো ফুটে উঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনিই এর প্রতিদান দিবেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُهِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ باب إِفْعَالٌ মাসদার إِهَانَةٌ মূলবর্ণ (ه ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– লাঞ্ছনাময়।

مَاتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب ماضى معروف বহছ باب نَصَرَ মাসদার مَوْتٌ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা মারা গেছে।

يَرْضَوْنَهُ : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ باب سَمِعَ মাসদার رِضًى মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– যা তারা পছন্দ করবে।

عُوْقِبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى مجهول বহছ باب مُفَاعَلَةٌ মাসদার عِقَابٌ ও مُعَاقَبَةٌ মূলবর্ণ (ع ـ ق ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল।

لَيَنْصُرَنَّهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب مستقبل معروف بانون تاكيد ثقيلة درفعل لام تاكيد বহছ باب نَصَرَ মাসদার اَلنَّصْرُ মূলবর্ণ (ن ـ ص ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অবশ্যই তিনি তাকে সাহায্য করবেন।

يَدْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ باب نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– এরা উপাসনা করছে।

اَنْ تَقَعَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب مضارع منصوب বহছ باب فَتَحَ মাসদার وُقُوْعٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ع) জিনস مثال واوى অর্থ– পড়ে যাওয়া হতে।

نَاسِكُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ باب نَصَرَ মাসদার نُسُكٌ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– তারা সে মতে জবাই করত।

تُتْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب مضارع مجهول বহছ باب نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তেলাওয়াত করা হয়।

يَسْطُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ باب نَصَرَ মাসদার سَطْوَةٌ মূলবর্ণ (س ـ ط ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা আক্রমণ করে বসবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاِنْ جَادَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ : এখানে واو টি আতেফা আর ان হলো شرط আর جَادَلُوْكَ এর হলো ফে'ল ও ফায়েল আর كَ হলো مفعول به আর فَقُلْ-এর فاء হলো رابطة আর قُلْ হলো ফে'ল ও ফায়েল জাদালুও মিলে جواب شرط আর فَقُلْ এর পূর্ণ বাক্যটি হলো مقول আর اَللّٰهُ মুবতাদা اَعْلَمُ খবর আর পূর্ণ বাক্যটি হলো قول আর بِمَا متعلق এটা হলো اَعْلَمُ-এর সাথে আর مَا ইসমে মাওসূল আর تَعْمَلُوْنَ হলো সেলাহ।

–[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৭০-১৭১]

৭৩. হে লোকসকল! এক আশ্চর্য কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। নিঃসন্দেহে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা করছ, তারা একটি মক্ষিকাও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলেও এই উদ্দেশ্যে একত্র হয়; আর যদি মক্ষিকা তাদের হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তখন তারা এর থেকে সেই বস্তুকে ছাড়িয়ে নিতেও সক্ষম হয় না; এমন উপাসকও অক্ষম এবং এমন উপাস্যও অক্ষম।	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ﴿۷۳﴾
৭৪. আল্লাহ তা'আলাকে যেমন সম্মান করা উচিত ছিল, তেমন সম্মান তারা করেনি; আল্লাহ তা'আলা মহা শক্তিমান, পরাক্রান্ত।	مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۷۴﴾
৭৫. (রাসূল নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে) আল্লাহ তা'আলা (যাকে ইচ্ছা) নির্বাচিত করে নেন ফেরেশতাগণের মধ্য হতে নির্দেশবাহকরূপে এবং (অনুরূপ) মানবকুল হতেও; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা খুব শ্রবণকারী, অতি দর্শনকারী।	اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۷۵﴾
৭৬. তিনি তাদের (ফেরেশতা ও মানুষের) ভবিষ্যত ও অতীতের অবস্থাসমূহ (খুব) জানেন; এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۷۶﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৩. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ লোকসকল ضُرِبَ مَثَلٌ এক আশ্চর্য কথা বলা হচ্ছে فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ নিঃসন্দেহে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের উপাসনা করছ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا তারা একটি মক্ষিকাও সৃষ্টি করতে পারবে না وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ যদিও তারা সকলে এই উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا আর যদি মক্ষিকা তাদের হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ তখন তারা তা হতে সেই বস্তুকে ছাড়িয়ে নিতেও সক্ষম হয় না ضَعُفَ الطَّالِبُ এমন উপাসকও অক্ষম وَالْمَطْلُوْبُ এবং এমন উপাস্যও অক্ষম।

৭৪. مَا قَدَرُوا اللّٰهَ আল্লাহ তা'আলাকে তেমন সম্মান তারা করেনি حَقَّ قَدْرِهٖ যেমন সম্মান করা উচিত ছিল اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ আল্লাহ তা'আলা মহা শক্তিমান, পরাক্রান্ত।

৭৫. اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ আল্লাহ তা'আলা নির্বাচিত করে নেন مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাগণের মধ্য হতে رُسُلًا নির্দেশবাহক রূপে وَّمِنَ النَّاسِ এবং অনুরূপ মানবকুল হতেও اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা খুব শ্রবণকারী, অতি দর্শনকারী।

৭৬. يَعْلَمُ তিনি জানেন مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তাদের ভবিষ্যত ও অতীতের অবস্থাসমূহ وَاِلَى اللّٰهِ এবং আল্লাহরই নিকট تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

৭৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকূ করতে থাক, সেজদা করতে থাক, নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক এবং নেক কাজ করতে থাক, আশা করা যায়, তোমরা সফলতা লাভ করবে।	يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমন করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন এবং তোমাদের উপর ধর্ম সম্বন্ধে কোনো প্রকার সৃষ্টি সংকীর্ণতা করেননি। তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের ধর্মের উপর কায়েম থাক। তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নাম রেখেছেন– মুসলমান, (কুরআন নাজিলের) আগেও এবং এর (কুরআনের) মধ্যেও, যেন তোমাদের (সাক্ষ্য প্রদানের) পক্ষে রাসূল সাক্ষী হন এবং তোমরা (এক বড় মুকদ্দমায়) লোকগণের বিরুদ্ধে সাক্ষী হও, সুতরাং তোমরা (নিয়মিতভাবে) নামাজ কায়েম রাখ এবং জাকাত প্রদান করতে থাক, আর আল্লাহ তা'আলাকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক; তিনি তোমাদের কার্যনির্বাহক; অতএব, তিনি কতইনা উত্তম কার্যনির্বাহক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী।	وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ۬ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚۖ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٧٨﴾

ع ١٧

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৭. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ اِرْكَعُوْا তোমরা রুকূ করতে থাক وَاسْجُدُوْا সেজদা করতে থাক وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক وَافْعَلُوا الْخَيْرَ এবং নেক কাজ করতে থাক لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।

৭৮. وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ আর তোমরা আল্লাহর কাজে খুব যত্নবান হও حَقَّ جِهَادِهٖ যেমন যত্নবান হওয়া আবশ্যক هُوَ اجْتَبٰىكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ আর তোমাদের উপর সৃষ্টি করেন নি فِى الدِّيْنِ ধর্ম সম্বন্ধে مِنْ حَرَجٍ কোনো প্রকার সংকীর্ণতা مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের ধর্মের উপর কায়েম থাক هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান مِنْ قَبْلُ (কুরআন নাজিলের) আগেও وَفِيْ هٰذَا এবং এর (কুরআনের) মধ্যেও لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ যেন রাসূল হন شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ তোমাদের পক্ষে সাক্ষী وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ এবং তোমরা লোকগণের বিরুদ্ধে সাক্ষী হও فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ সুতরাং তোমরা (নিয়মিতভাবে) নামাজ কায়েম রাখ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করতে থাক وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ আর আল্লাহ তা'আলাকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক هُوَ مَوْلٰىكُمْ তিনি তোমাদের কার্যনির্বাহক فَنِعْمَ الْمَوْلٰى অতএব তিনি কতইনা উত্তম কার্যনির্বাহক وَنِعْمَ النَّصِيْرُ এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ [৭৪]

শানে নুযূল-১ : রাসূল ﷺ একদা কোথাও বসা ছিলেন। তাঁর আশে-পাশে বসা ছিলেন সাহাবায়ে কেরামগণও। আর ছিল ইহুদি পণ্ডিত মালেক ইবনে সায়েফ। তখন রাসূল ﷺ মালেক ইবনে সায়েফকে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, বলতো দেখি হিবরুস সামীনের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত আছেন তা তুমি তাওরাতের মধ্যে দেখতে পেয়েছ কী? সে বলল, হাঁ। এবার রাসূল ﷺ বললেন, সে হিবরুস সামীন হলে তুমি! তখন উপস্থিত লোকজন হেঁসে উঠল। মালেক ইবনে সায়েফ সে মুহূর্তে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহ তো কোনো মানুষের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন যে, ওরা তো আল্লাহর পরিচয়ই পায়নি।

শানে নুযূল-২ : মতান্তরে আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে নিম্নরূপ। ইহুদিরা বলছিল যে, আল্লাহ সপ্ত আকাশকে রবিবার দিন নির্মাণ করেছেন, সোমবার দিন জমিনকে, মঙ্গলবার দিন পর্বতরাজী, বৃক্ষরাজী, লতাপাতা, বুধবার দিন চন্দ্র-সূর্য বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করে আরশে আরোহণ করেন"। অতঃপর এক পায়ের উপর অপর পা তুলে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ তখন ক্রোধান্বিত হন। আল্লাহ তা'আলা সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[সাভী ১১০/৩]

একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা : ضُرِبَ مَثَلٌ এই শব্দটি সাধারণত কোনো বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে শিরক ও মূর্তিপূজার বোকামির একটি সুস্পষ্ট উপমা দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে কর, তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা তোমরা রোজই তাদের সামনে মিষ্টান্ন, ফল-মূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ বলে তাদের মূর্খতা ও বোকামি ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ, যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাসক আরও বেশি শক্তিহীন হবে। مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ অর্থাৎ এই নির্বোধ নিমকহারামরা আল্লাহর মর্যাদা বোঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরিক সাব্যস্ত করেছে।

সূরা হাজ্জের সেজদায়ে তেলাওয়াত : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ সূরা হাজ্জে ইতঃপূর্বে একটি আয়াত উল্লিখিত হয়েছে, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব। আর এখানে উল্লিখিত আয়াতে তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালেকও সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে এই আয়াতে তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব নয়। কেননা এতে সেজদার সাথে রুকূ ইত্যাদিও উল্লিখিত হয়েছে। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে নামাজের সেজদা বোঝানো হয়েছে, যেমন وَاسْجُدِي وَارْكَعِي আয়াতে সবাই একমত যে, এতে নামাজের সেজদা উদ্দেশ্য। এই আয়াত তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজিব হয় না। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখের মতে, এই আয়াতেও তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব। তাঁদের প্রমাণ সেই হাদীস, যাতে বলা হয়েছে সূরায়ে হজ্জ অন্যান্য সূরার উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যে, এতে দু'টি তেলাওয়াতে সেজদা আছে। ইমাম আজম (র.)-এর মতে, এই হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ ও হাদীসের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য।

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ : مُجَاهَدَةٌ ও جِهَادٌ শব্দের অর্থ কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার করা। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জেহাদ বলা হয়। حَقَّ جِهَادِهٖ -এর অর্থ আল্লাহর ওয়াস্তে জেহাদ করা, তাতে জাগতিক নাম-যশ ও গনিমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, حَقَّ جِهَادِهٖ -এর অর্থ জেহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা। কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে এখানে জেহাদের অর্থ সাধারণ ইবাদত ও আল্লাহর বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তা পালন করা।

যাহ্হাক ও মোকাতিল বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, اِعْمَلُوْا حَقَّ عَمَلِهٖ وَاعْبُدُوْهُ حَقَّ عِبَادَتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য কাজ কর, যেমন করা উচিত এবং আল্লাহর ইবাদত কর, যেমন করা উচিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) বলেন, এস্থলে জেহাদ বলে নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ করা বোঝানো হয়েছে এবং এটাই حَقَّ جِهَادِهٖ অর্থাৎ যথাযোগ্য জেহাদ। ইমাম বগভী প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে কেরামের একটি দল কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ قَالَ مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ لِهَوَاهُ অর্থাৎ তোমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এসেছ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ এখনও অব্যাহত আছে। এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করে বলেছেন যে, এর সনদে ত্রুটি আছে।

জ্ঞাতব্য : তাফসীরে মাযহারীতে এই দ্বিতীয় তাফসীর অবলম্বন করে আয়াত থেকে একটি তত্ত্ব উদঘাটন করা হয়েছে। তা এই যে, সাহাবায়ে কেরাম যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে রত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ তখনও চালু ছিল, কিন্তু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল, কিন্তু স্বভাবতই এই জেহাদ শায়খে-কামেলের সংসর্গ লাভের উপর নির্ভরশীল। তাই জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদি আল্লাহ্র মনোনীত উম্মত : هُوَ اجْتَبٰكُمْ –হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বনী-ইসরাঈলের মধ্যে থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্যে থেকে কুরাইশকে, অতঃপর কুরাইশের মধ্যে থেকে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশেমের মধ্যে থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। –[মুসলিম, মাযহারী]

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। 'ধর্মে সংকীর্ণতা নেই' এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ননা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোনো গোনাহ্ নেই, যা তওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার মতো কোনো উপায় থাকবে না। পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গোনাহ্ও ছিল, যা তওবা করলেও মাফ হতো না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সংকীর্ণতার অর্থ কঠিন ও দুষ্কর বিধি-বিধান, যা বনী ইসরাঈলের উপর আরোপিত হয়েছিল। কুরআন পাকে একে اَغْلَالٌ ও اَصَرٌ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই উম্মতকে এমন কোনো বিধান দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ বলেন, সংকীর্ণতার অর্থ এমন সংকীর্ণতা, যা মানুষের পক্ষে অসহনীয়। এই ধর্মে এমন কোনো অসহনীয় বিধান নেই। অল্পবিস্তর পরিশ্রম ও কষ্ট তো দুনিয়ার প্রত্যেক কাজেই হয়। শিক্ষালাভ, চাকুরি, ব্যবসা ও শিল্পে কতই না পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়; কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় না যে, কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন। ভ্রান্ত ও বিরুদ্ধ পরিবেশ অথবা দেশগ্রামে প্রচলন না থাকার কারণে কোনো কাজে যে কঠিনতা দেখা দেয়, তাকে কাজের সংকীর্ণতা ও কঠোরতা বলা যাবে না। পরিবেশে তার সঙ্গী কেউ নেই, এ কারণে কর্মীর কাছে কাজটি কঠিন মনে হয়। যে দেশে রুটি খাওয়া ও রুটি তৈরি করার অভ্যাস নেই, সেই দেশে রুটি লাভ করা সত্যিই কঠিন হয়ে যায়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ কথা বলা যায় না যে, রুটি তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ।

হযরত কাযী সানাউল্লাহ (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেন : ধর্মে সংকীর্ণতা নেই, একথার তাৎপর্য এমন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে সকল উম্মতের মধ্যে থেকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উম্মতের জন্য ধর্মের পথে কঠিনতর কষ্টও সহজ বরং আনন্দদায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে। বিশেষত অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারী কাজও হালকা-পাতলা মনে হতে থাকে। হাদীসে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلٰوةِ অর্থাৎ নামাজে আমার চক্ষু শীতল হয়। –[আহমদ, নাসায়ী, হাকেম]

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ : অর্থাৎ এটা তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মিল্লাত। এখানে প্রকৃতপক্ষে কুরাইশী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। এরপর কুরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফজিলতে শামিল হয়; যেমন– হাদীসে আছে : اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ অর্থাৎ সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কুরাইশদের অনুগামী। মুসলমান মুসলমান কুরাইশীদের অনুগামী এবং কাফের কাফের কুরাইশীদের অনুগামী। –[মাযহারী]

কেউ কেউ বলেন, আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম ﷺ হচ্ছেন উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা; যেমন তাঁর বিবিগণ 'উম্মাহাতুল-মুমিনীন' অর্থাৎ মুমিনদের মাতা। নবী করীম ﷺ যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর; একথা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত।

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا : অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) কুরআনের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মদি এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন; যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই দোয়া কুরআনে বর্ণিত আছে– رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ কুরআনে মুমিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম। যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) নন, কিন্তু কুরআনের পূর্বে তাঁর এই নামকরণ কুরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে করে দেওয়া হয়েছে।

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ : অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান এই উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম তখন উম্মতে-মুহাম্মদি তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গম্বর যখন এই দাবি করবেন, তখন তাঁদের উম্মতরা অস্বীকার করে বসবে। তখন উম্মতে মুহাম্মদি সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়গম্বরগণ নিশ্চিতরূপেই তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি পৌঁছে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উম্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা হবে যে, আমাদের জমানায় উম্মতে-মুহাম্মদীর অস্তিত্বই ছিল না, সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষী হতে পারে? উম্মতে মুহাম্মদির তরফ থেকে জেরার জবাবে বলা হবে, আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু আমরা আমাদের রাসূল ﷺ-এর মুখে একথা শুনেছি, যাঁর সত্যবাদিতায় কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বস্তু বুখারী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে।

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ : উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহর বিধানাবলি পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া। বিধানাবলির মধ্যে এস্থলে শুধু নামাজ ও জাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলির মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলির মধ্যে জাকাত সর্বাধিক গুরুত্ববহ; যদিও শরিয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য।

وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ অর্থাৎ সবকাজে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা কর এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেন, এই বাক্যের অর্থ এই যে, কুরআন ও সুন্নাহকে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়ে থাক; যেমন এক হাদীসে আছে : تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দু'টিকে অবলম্বন করে থাকবে; পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব ও অপরটি আমার সুন্নত। –[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَاسْتَمِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِمَاعٌ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর।

يَسْلُبْهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم বাব نَصَرَ মাসদার سَلْبٌ মূলবর্ণ (س - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদের হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

ضَعُفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার ضَعْفٌ মূলবর্ণ (ض - ع - ف) জিনস صحيح অর্থ– অক্ষম।

يَصْطَفِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِصْطِفَاءٌ মূলবর্ণ (ص - ف - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি নির্বাচন করে নেন।

جَاهِدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُجَاهَدَةٌ মূলবর্ণ (ج - ه - د) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জিহাদ কর।

اِجْتَبٰكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِجْتِبَاءٌ মূলবর্ণ (ج - ب - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি তোমাদেরকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন।

اِعْتَصِمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِعْتِصَامٌ মূলবর্ণ (ع - ص - م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ : এটি جملة مستانفة হয়েছে। اَللّٰهُ মুবতাদা يَصْطَفِىْ পূর্ণ বাক্য হলো খবর, আর مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ হলো حال কেননা এটা মূলত رُسُلًا -এর সিফাত ছিল যা তার উপর مقدم হয়েছে। আবার এটা يَصْطَفِىْ এর সাথে متعلق ও বলা যেতে পারে তখন رُسُلًا হবে مفعول به আর وَمِنَ النَّاسِ বাক্য টি مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ এর উপর আতফ করা হয়েছে আর (প্রথম ফে'ল টি এটাকে বুঝানোর কারণে।) এর পূর্বের ফে'ল কে উহ্য রাখা হয়েছে। (সুতরাং বাক্যটি ছিল এমন) অর্থাৎ وَيَصْطَفِىْ مِنَ النَّاسِ رُسُلًا আর اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ পূর্ণ বাক্যটি পূর্বের জন্য تعليلية হবে! অর্থাৎ سَمِيْعٌ لِمَا يَقُوْلُوْنَهُ بَصِيْرٌ بِمَنْ يَّتَّخِذُهُ এখানে اِنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل আর اَللّٰهَ হলো তার اسم এবং سَمِيْعٌ হলো তার প্রথম খবর আর بَصِيْرٌ হলো দ্বিতীয় খবর। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮২-১৮৩]

পারা : ১৮

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ

সূরা মু'মিনূন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১১৮, রুকূ'– ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. নিশ্চয় ঐ মুসলমানগণ (পারলৌকিক) সফলতা লাভ করেছে,	قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ ﴿١﴾
২. যারা নিজেদের নামাজের মধ্যে বিনয়ী,	الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ ﴿٢﴾
৩. আর যারা অনর্থক কথা (ও কাজ) হতে দূরে থাকে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ ﴿٣﴾
৪. আর যারা (আমল, আখলাকে) নিজকে পরিশুদ্ধ করে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ ﴿٤﴾
৫. আর যারা (অবৈধ কাম-প্রবৃত্তি হতে) নিজ লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ ﴿٥﴾
৬. কিন্তু নিজ স্ত্রীগণ কিংবা (শরিয়তসম্মত) নিজ বাঁদিগণ হতে (হেফাজত করে না), কেননা (এতে) তাদের প্রতি কোনো দোষারোপ হয় না,	اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قَدْ اَفْلَحَ নিশ্চয় সফলতা লাভ করেছে اَلْمُؤْمِنُوْنَ ঐ মুসলমানগণ।

২. اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ যারা নিজেদের নামাজের মধ্যে خٰشِعُوْنَ বিনয়ী।

৩. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ আর যারা অনর্থক কথা (ও কাজ) হতে مُعْرِضُوْنَ দূরে থাকে।

৪. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা (আমল আখলাকে) لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে।

৫. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ আর যারা নিজ লজ্জাস্থানকে حٰفِظُوْنَ হেফাজত করে।

৬. اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ কিন্তু নিজ স্ত্রীগণ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ কিংবা নিজ বাঁদিগণ হতে فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ কেননা তাদের প্রতি কোনো দোষারোপ হয় না।

অনুবাদ	আয়াত
৭. হাঁ, যারা এতদ্ব্যতীত (অন্যত্র কাম চরিতার্থ করতে) প্রয়াসী, এমন লোক (শরিয়তের) সীমালঙ্ঘনকারী,	فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧
৮. আর যারা নিজ (দায়িত্বে গৃহীত) আমানতসমূহ ও অঙ্গীকার রক্ষা করে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٨
৯. আর যারা নিজেদের নামাজসমূহের পাবন্দি করে।	وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩
১০. এমন লোকেরাই উত্তরাধিকারী,	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠
১১. যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে; (এবং) তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে।	الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١١
১২. আর আমি মানুষকে মাটির সারাংশ (খাদ্যসার) হতে সৃষ্টি করেছি,	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝١٢
১৩. তৎপর আমি তাকে বীর্য রূপে একটি সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করেছি।	ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝١٣
১৪. অতঃপর আমি উক্ত বীর্য শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করলাম, অনন্তর আমি উক্ত জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করলাম, অতঃপর উক্ত মাংসপিণ্ডকে হাড়ে রূপান্তরিত করলাম, পরে উক্ত হাড়গুলোতে গোশত জড়ালাম, অতঃপর আমি (আত্মা প্রদানপূর্বক) একে গড়ে তুললাম অন্য এক সৃষ্টিরূপে; সুতরাং কতইনা মহামহিমান্বিত সেই আল্লাহ– যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা।	ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝١٤

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ হাঁ যারা এতদ্ব্যতীত প্রয়াসী فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ এমন লোক (শরিয়তের) সীমালঙ্ঘনকারী;

৮. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ নিজ (দায়িত্বে গৃহীত) আমানতসমূহ ও অঙ্গীকার رٰعُوْنَ রক্ষা করে;

৯. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ নিজেদের নামাজসমূহের يُحَافِظُوْنَ পাবন্দি করে।

১০. اُولٰٓئِكَ هُمُ এমন লোকেরাই الْوٰرِثُوْنَ উত্তরাধিকারী।

১১. الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ যারা উত্তরাধিকারী হবে الْفِرْدَوْسَ জান্নাতুল ফিরদাউসের هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে।

১২. وَلَقَدْ خَلَقْنَا আর আমি সৃষ্টি করেছি الْاِنْسَانَ মানুষকে مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ মাটির সারাংশ হতে।

১৩. ثُمَّ جَعَلْنٰهُ তৎপর আমি তাকে স্থাপন করেছি نُطْفَةً বীর্য রূপে فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ একটি সুরক্ষিত স্থানে।

১৪. ثُمَّ خَلَقْنَا অতঃপর আমি পরিণত করলাম النُّطْفَةَ উক্ত বীর্য শুক্রবিন্দুকে عَلَقَةً জমাট রক্তে فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ অনন্তর আমি উক্ত জমাট রক্তকে পরিণত করলাম مُضْغَةً মাংসপিণ্ডে فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ অতঃপর উক্ত মাংস-পিণ্ডকে রূপান্তরিত করলাম عِظٰمًا হাড়ে فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا পরে উক্ত হাড়গুলোতে গোশত জড়ালাম ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ অতঃপর আমি তাকে গড়ে তুললাম خَلْقًا اٰخَرَ অন্য এক সৃষ্টিরূপে فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ সুতরাং কতইনা মহা-মহিমান্বিত সেই আল্লাহ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা।

১৫. আবার এর পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে।	ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ﴿۱۵﴾
১৬. তৎপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করা হবে।	ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿۱۶﴾
১৭. আর আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের উপর সাত আসমান এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অসতর্ক ছিলাম না।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿۱۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ আবার এর পর তোমরা لَمَيِّتُوْنَ অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে।

১৬. ثُمَّ اِنَّكُمْ তৎপর তোমাদেরকে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন تُبْعَثُوْنَ পুনরায় জীবিত করা হবে।

১৭. وَلَقَدْ خَلَقْنَا আর আমি সৃষ্টি করেছি فَوْقَكُمْ তোমাদের উপর سَبْعَ طَرَآئِقَ সাত আসমান وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অসতর্ক ছিলাম না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণ : যেহেতু এ সূরার প্রারম্ভে মুমিনগণের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আল মুমিনূন। মু'মিনগণের যে বৈশিষ্ট্য এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, মূলত এ সবই হলো ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ইবনে মারদূভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন সূরা মু'মিনূন মক্কায় নাজিল হয়েছে।

সূরা মু'মিনূনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব :

নাসায়ী, তিরমিযী, ও মুসনাদে আহমদে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে তিনি বলেন যখন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রতি ওহী নাজিল হতো, তখন নিকটবর্তী লোকদের কানে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ শ্রুত হতো। একবার এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শ্রবণের জন্য থেমে গেলাম। কিছুক্ষণ পর যখন ওহী নাজিল হয়ে গেল, তখন প্রিয়নবী ﷺ কেবলামুখী হয়ে বসে দু'হাত তুলে এ দোয়া করলেন।

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضِ عَنَّا وَاَرْضِنَا.

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমদেরকে অধিক পরিমাণে দাও, আমাদেরকে কম দিও না, আমাদেরকে সম্মানিত করো, অপমানিত করো না, আমাদেরকে (নিয়ামত) দান কর, বঞ্চিত করো না, অন্যদের উপর আমাদের কে অগ্রাধিকার দাও, আমাদের উপর অন্যদের কে অগ্রাধিকার দিও না, আমাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট থাক, আর আমাদেরকে খুশি করে দাও!"

এরপর তিনি ইরশাদ করেছেন "আমার উপর দশটি আয়াত নাজিল হয়েছে, যে এই দশটি আয়াতে বর্ণিত গুণাবলি অর্জন করল সে জান্নাতী হয়ে গেল।" এরপর তিনি এই সূরার প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করেন।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী : ১৮/১]

ইমাম বুখারী (র.) আদাবুল মুফরাদে এবং ইমাম নাসায়ী, ইবনুল মুনজের, হাকেম, ইবনে মারদুভিয়া, বায়হাকী (র.) প্রমুখ ইয়াজিদ ইবনে বাবনুসের বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট আরজ করলাম, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর মহান পূতঃপবিত্র চরিত্র মাধুর্যের বর্ণনা দিন! তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র মাধুর্য হলো কুরআনে কারীম। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি সূরা মুমিনূন পাঠ কর? এরপর তিনি এ সূরার প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন, এ ছিল প্রিয়নবী ﷺ -এর চরিত্র মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য।

ইবনে জারীর তাবারী (র.) লিখেছেন, ইমাম কাতাদা (র.) হযরত কা'ব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন. "আল্লাহ তা'আলা শুধু তিনটি বস্তু স্বীয় হস্ত মোবারকে সৃষ্টি করেছেন। যথা– ১. আদম (আ.)-কে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন।

২. তাওরাত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। ৩. জান্নাতে আদন। এরপর জান্নাতকে বলেছেন, তুমি কথা বল, জান্নাত তখন এই সূরার প্রথম আয়াতসমূহ পাঠ করেছে।" আল্লামা সুয়ূতী (র.) হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে এ বর্ণনার আংশিক উল্লেখ করেছেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে নেক আমল করার নির্দেশ ছিল। ইরশাদ হয়েছে– وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ; এর শুভ পরিণতি স্বরূপ সাফল্য লাভের সুসংবাদ ছিল। ইরশাদ হয়েছে– لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ অর্থাৎ হয়তো তোমরা সাফল্য মণ্ডিত হবে। আর এ আয়াতের শুরুতেই সেই ভাগ্যবান লোকদের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, যারা জীবন সংগ্রামে সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে– قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) : ৪/৬০]

: قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (١) الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ (٢)

শানে নুযূল : হাকেম (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ নামাজ পড়া অবস্থায় কখনো আসমানের দিকে দেখতেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী ﷺ আর নামাজ পড়া অবস্থায় আসমানের দিকে তাকাননি।

ইবনে মারদুভিয়ার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে এদিক সেদিক তাকাতেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখতেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এরপর থেকে তারা সিজদার স্থানে নজর করতেন।

ইবনে আবি হাতেম ইবনে সীরীনের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজ পড়া অবস্থায় আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখতেন, তখন আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করলেন। –[তাফসীর মাযহারী : ৮/৬১]

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ [١٤]

শানে নুযূল–১ : ইবনে আবী শায়বা, আব্দ ইবনে হুমায়েদ ও ইবনুল মুনযির সালেহ আবুল খলীলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, রাসূল ﷺ-এর উপর– وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ .... ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ পর্যন্ত যখন নাজিল হয়, তখন হযরত ওমর (রা.) বলে উঠলেন فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ এ মুহূর্তে রাসূল ﷺ বললেন, হে ওমর! যার কুদরতি হস্তে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ, তুমি যা বলেছ তা দ্বারাই আলোচ্য আয়াত শেষ করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.)-এর শান সম্পর্কীয় বিষয়ে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–২ : তায়ালসী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদূভিয়া ও ইবনে আসাকির হযরত আনাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, আমি চারটি স্থানে আমার প্রতিপালকের আনুকুল্য ও উপযোগী বলেছি। ১. আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মাকামে ইবরাহীমে যদি আমরা নামাজ আদায় করতাম? তখন আল্লাহ তা'আলা وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى আয়াতাংশ নাজিল করেন ২. আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীদের উপর পর্দাকরণকে যদি আবশ্যকীয় করে দিতেন! কারণ আপনার নিকট ভালো-মন্দ সব ধরনের লোকই গমন করে। তখন আল্লাহ তা'আলা وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا الخ আয়াত নাজিল করেন। ৩. নবী পত্নীগণকে আমি বলেছিলাম لَتَنْتَهِنَّ তখন আল্লাহ عَسٰى رَبُّهٗ الخ আয়াত নাজিল করেন। ৪. وَلَقَدْ خَلَقْنَا .... خَلْقًا اٰخَرَ পর্যন্ত যখন নাজিল হয়, তখন আমি বলেছিলাম فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ তখনও উক্ত বাক্য দ্বারাই আয়াতের ইতি টানা হয়। –[ফাতহুল কাদীর ৪৭৯/৩]

সাফল্য কি এবং কোথায় ও কিরূপে পাওয়া যায় : قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - فَلَاحٌ (সাফল্য) শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আজান ও ইকামতে দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক মুসলমানকে সাফল্যের দিকে আহ্বান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া। –(কামূস) এ শব্দটি যেমনি সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। কোনো মানুষ এর চাইতে বেশি কোনোকিছু কামনাই করতে পারে না। বলাবাহুল্য, একটি মনোবাঞ্ছাও অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কষ্টও অবশিষ্ট না থাকা-এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জগতের কোনো মহত্তম ব্যক্তিরও আয়ত্তাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ্ হোক কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও পয়গম্বর হোক, জগতে অবাঞ্ছিত কোনো

কিছুর সম্মুখীন না হওয়া এবং অন্তরে বাসনা জাগ্রত হওয়া মাত্রই অবিলম্বে তা পূর্ণ হওয়া কারো জন্য সম্ভবপর নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নিয়ামতের অবসান ও ধ্বংসের খটকা এবং যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। কেননা দুনিয়া কষ্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোনো বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। এ অমূল্য সম্পদ অন্য জগতে পাওয়া যায়, যার নাম জান্নাত। সে দেশেই মানুষের প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে। وَلَهُمْ مَا يَدَّعُوْنَ অর্থাৎ তারা যা চাইবে, তাই পাবে। সেখানে কোনো সামান্যতম ব্যথা ও কষ্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকেই একথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ الَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন, যার প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন।" এই আয়াতে আরো ইঙ্গিত আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন হবে। তাই জান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আমাদের দুঃখ দূর হলো। কুরআন পাক সূরা আ'লায় সাফল্য লাভ করার ব্যবস্থাপত্র দিতে গিয়ে বলেছে– قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ যে নিজেকে পাপকর্ম থেকে পবিত্র রেখেছে সে সাফল্য লাভ করেছে। এর সাথে সাথে আরো ইঙ্গিত করেছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভের জায়গা আসলে পরকাল। যে সাফল্য কামনা করেছে, তার কাজ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা নয়। বলা হয়েছে : بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাক; অথচ পরকাল উত্তমও; কারণ তাতেই প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা অর্জিত ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হতে পারে এবং পরকাল চিরস্থায়ীও।

মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে-দুনিয়া এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করা-এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা সেসব মুমিনকে সফল্য দান করার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত মু'মিনগণ পরকালে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য পাবে– এ কথা বোধগম্য, কিন্তু দুনিয়াতে সাফল্য বাহ্যত কাফের ও পাপাচারীদেরই হাতের মুঠোয়। প্রতি যুগের পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের পর সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সাধারণত কষ্ট ভোগ করে গেছেন। এর কারণ কি? এ প্রশ্নের জওয়াব স্পষ্ট। দুনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের ওয়াদা করা হয়নি যে, কোনোরূপ কষ্টের সম্মুখীনই হবে না; বরং এখানে কিছু না কিছু কষ্ট প্রত্যেক পরহেজগার, সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকেও ভোগ করতে হয় এবং প্রত্যেক কাফের ও পাপাচারীদেরকেও ভোগ করতে হয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও অবস্থা তাই, অর্থাৎ মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লক্ষ্য অর্জিত হয়ই। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে কাকে সাফল্য অর্জনকারী বলা হবে? অতএব পরিণামের উপরই এটা নির্ভরশীল।

দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, যেসব সজ্জন উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত, দুনিয়াতে তারা সাময়িকভাবে কষ্টের সম্মুখীন হলেও পরিণামে তাদের কষ্ট দ্রুত দূর হয়ে যায় এবং মনোবাঞ্ছা অর্জিত হয়। বিশ্ববাসী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয় এবং তারা মরেও অমর হয়ে যায়। ন্যায়ের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থা যতই পর্যালোচনা করা হবে, প্রতি যুগে ও প্রতি ভূখণ্ডে ততই এর পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণ : সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদি ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা করে এখানে যে সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই :

প্রথম. নামাজে 'খুশূ' তথা বিনয়-নম্র হওয়া। 'খুশূ'র আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ অনর্থক নড়াচড়া না করা। –(বয়ানুল-কুরআন)। বিশেষত এমন নড়াচড়া, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে নিষিদ্ধ করেছেন। ফিকাহবিদগণ এ ধরনের নড়াচড়াকে 'নামাজের মাকরূহসমূহ' শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে খুশুর এই সংজ্ঞা হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য মনীষী থেকে খুশূর সংজ্ঞা সম্পর্কে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলত অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ বিবরণ। উদাহরণত হযরত

মুজাহিদ (র.) বলেন, দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার নাম খুশূ। হযরত আলী (রা.) বলেন, ডানে বামে ভ্রূক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা খুশূ। হযরত আতা (র.) বলেন, দেহের কোনো অংশ নিয়ে খেলা না করা 'খুশূ'। হাদীসে হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নামাজের সময় আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না নামাজী অন্য কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করে। যখন সে অন্য কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। –(আহমদ, নাসায়ী, আবূ দাউদ–মাযহারী)। নবী করীম ﷺ হযরত আনাস (রা.) কে নির্দেশ দেন, সেজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং ডানে-বামে ভ্রূক্ষেপ করো না। [বায়হাকী-মাযহারী]
হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নামাজে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন– لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هٰذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهٗ অর্থাৎ এ ব্যক্তির অন্তরে খুশূ থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা থাকত। –[মাযহারী]
নামাজে খুশূর প্রয়োজনীয়তার স্তর : ইমাম গাযযালী, কুরতুবী এবং অন্য আরো কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাজে খুশূ ফরজ। সম্পূর্ণ নামাজ খুশূ ব্যতীত সম্পন্ন হলে নামাজই হবে না। অন্যেরা বলেছেন, খুশূ নিঃসন্দেহে নামাজের প্রাণ। খুশূ ব্যতীত নামাজ নিষ্প্রাণ; কিন্তু একে নামাজের রোকন মনে করে এ কথা বলা যায় না যে, খুশূ না হলে নামাজই হয় না এবং পুনর্বার পড়া ফরজ।
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে বলেন, নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুশূ অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরজ নয়; কিন্তু নামাজ কবুল হওয়া এর উপর নির্ভরশীল এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরজ। তাবরানী 'মু'জামে-কাবীরে' হযরত আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সর্বপ্রথম যে বিষয় উম্মত থেকে অন্তর্হিত হবে, তা হচ্ছে খুশূ। শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে কোনো খুশূবিশিষ্ট ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হবে না। –[বয়ানুল-কুরআন]
পূর্ণ মুমিনের দ্বিতীয় গুণ : অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা। وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ - لَغْو এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা কাজ, যাতে কোনো ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চস্তরের গোনাহ্, যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই; বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিম্নস্তর। একে বর্জন করা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসনীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَا لَا يَعْنِيْهِ অর্থাৎ 'মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্য মণ্ডিত হতে পারে।' এ কারণেই আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।
তৃতীয় গুণ জাকাত : এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ-সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে জাকাত বলা হয়। কুরআন পাকে এ শব্দটি সাধারণত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় জাকাত ফরজ হয়নি- মদিনায় হিজরতের পর ফরজ হয়েছে। ইবনে কাছীর প্রমুখ তাফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জবাব এই যে, জাকাত মক্কাতেই ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুযযাম্মিল মক্কায় অবতীর্ণ, এ বিষয়ে সবাই একমত। এই সূরাতেও فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ -এর সাথে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সরকারি পর্যায়ে জাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং 'নিসাব' ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদিনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। যাঁরা জাকাতকে মদিনায় অবতীর্ণ বিধানাবলির মধ্যে গণ্য করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য তাই। যারা বলেন যে, মদিনায় পৌঁছার পরই জাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা এস্থলে জাকাত শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা নিয়েছেন। আয়াতে এ অর্থের প্রতি আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণত কুরআন পাকে যেখানে ফরজ জাকাতের উল্লেখ করা হয়, সেখানে اِيْتَاءُ - وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ ও وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ইত্যাদি শিরোনামে বর্ণনা করা হয়। এখানে শিরোনাম পরিবর্তন করে لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ বলাই ইঙ্গিত করে যে, এখানে পরিভাষিক অর্থ বুঝানো হয়নি। এ ছাড়া فَاعِلُوْنَ শব্দটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে فِعْل (কাজ) -এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক জাকাত فِعْل নয়; বরং অর্থ-কড়ির একটা অংশ। فَاعِلُوْنَ শব্দ দ্বারা এই অংশ বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। মোটকথা, আয়াতে পারিভাষিক অর্থ নেওয়া হলে জাকাত যে মুমিনের জন্য অপরিহার্য ফরজ তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে জাকাতের অর্থ আত্মশুদ্ধি নেওয়া হলে তাও ফরজই। কেননা শিরক, রিয়া, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফস্‌কে পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গোনাহ্। নফস্‌কে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরজ।
চতুর্থ গুণ যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে সংযত রাখা : وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ –অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও শরিয়তসম্মত দাসীদের ছাড়া সব পর নারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণির সাথে শরিয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারো সাথে কোনো অবৈধ পন্থায় কামবাসনা

পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ অর্থাৎ যারা শরিয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে-জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য হবে না।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রী অথবা শরিয়তসম্মত দাসীর সাথে শরিয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোনো পথ হালাল নয়; যেমন– জেনা, তেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করার মাঝেও জেনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েজ-নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথবা কোনো পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা-এগুলো সব নিষিদ্ধ ও হারাম। অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদের মতে اِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ অর্থাৎ হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত।

–[বয়ানুল কুরআন, কুরতুবী, বাহ্‌রে-মুহীত]

পঞ্চম গুণ আমানত প্রত্যর্পণ করা : وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ –আমানত শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোনো ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও একে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হুকুকুল্লাহ্ তথা আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হোক কিংবা হুকূকুল-ইবাদ তথা বান্দার হক সম্পর্কিত হোক। আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরিয়ত আরোপিত সকল ফরজ ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা। বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত; অর্থাৎ কেউ কারো কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হেফাজত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোনো গোপন কথা কারো কাছে বললে তাও তার আমানত। শরিয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারো গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতের খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্য পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরি ও চাকুরীর জন্য নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে, আমানতের হেফাজত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। উপরিউক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ গুণ অঙ্গীকার পূর্ণ করা : অঙ্গীকার বলতে প্রথমত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বুঝায়, যা কোনো ব্যাপারে উভয়পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এমন চুক্তি পূর্ণ করা ফরজ এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়; অর্থাৎ একতরফাভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোনো কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা। এমন ওয়াদা পূর্ণ করাও শরিয়তের আইনে জরুরি ও ওয়াজিব। হাদীসে আছে اَلْعِدَةُ دَيْنٌ অর্থাৎ ওয়াদা এক প্রকার ঋণ। ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে এর খেলাফ করা গোনাহ্। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে। কিন্তু একতরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্যে আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত এর খেলাফ করা গোনাহ্।

সপ্তম গুণ নামাজে যত্নবান হওয়া : وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ –নামাজে যত্নবান হওয়ার অর্থ নামাজের পাবন্দি করা এবং প্রত্যেক নামাজ মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা। (রূহুল মা'আনী) এখানে صَلَوٰتٌ শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মোস্তাহাব ওয়াক্তে পাবন্দি সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে নামাজে বিনয়-নম্র হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে صَلٰوةٌ শব্দটি একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নামাজ ফরজ হোক অথবা ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা নফল হোক-নামাজ মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নম্র হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লিখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহর হক ও বান্দার হক এবং এতদসংশ্লিষ্ট সব বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে কামেল মুমিন এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের হকদার।

এখানে এ বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এই সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নামাজ দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামাজ দ্বারা। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাজকে নামাজের মতো পাবন্দি ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা-আপনি নামাজির মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ –উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এ আয়াতে জান্নাতুল-ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাতে প্রবেশও সুনিশ্চিত। قَدْ أَفْلَحَ বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলি পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এ বাক্যে আরো ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাঁর বিধি-বিধান পালনে বাহ্যিক কাজকর্ম ও অন্তরকে পবিত্র রাখা এবং সব বান্দার হক আদায় করাকে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের পন্থা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ও মানবজাতি সৃজনে তাঁর বিশেষ অভিব্যক্তিসমূহ বর্ণিত হয়েছে, যাতে পরিষ্কার ফুটে ওঠে যে, জ্ঞান ও চেতনাশীল মানুষ এছাড়া অন্য কোনো পথ অবলম্বন করতেই পারে না।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ - سُلَالَةٍ অর্থ সারাংশ এবং طِينٍ অর্থ আর্দ্র মাটি। অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত আদম (আ.) থেকে এবং তাঁর সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً বলে একথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই মাটির সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিষ্ঠসংখ্যক তাফসীরবিদগণ আয়াতের এ তাফসীরই লিখেছেন। একথা বলাও সম্ভবপর যে, سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ বলে মানুষের শুক্রই বুঝানো হয়েছে। কেননা শুক্র খাদ্য থেকে উৎপন্ন এবং খাদ্য মাটি থেকে সৃষ্টি হয়।

মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর : আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ অর্থাৎ, মৃত্তিকার সারাংশ, দ্বিতীয় বীর্য, তৃতীয় জমাট রক্ত, চতুর্থ মাংসপিণ্ড, পঞ্চম অস্থি-পিঞ্জর, ষষ্ঠ অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ রূহ সঞ্চারকরণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি অভিনব তত্ত্ব : তাফসীরে কুরতুবীতে এস্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ আয়াতের ভিত্তিতেই 'শবে-কদর' নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি অভিনব তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, হযরত ওমর ফারূক (রা.) একবার সমবেত সাহাবীগণকে প্রশ্ন করলেন, রমজানের কোন তারিখে শবে কদর? সবাই উত্তরে 'আল্লাহ তা'আলাই জানেন' বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমীরুল-মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষের সৃষ্টিও সপ্ত স্তরে সম্পন্ন করেছেন এবং সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য করেছেন তাই আমার তো মনে হয় যে, শবে-কদরও রমজানের সাতাশতম রাত্রিতে হবে। খালীফা সেই অভিনব প্রমাণ শুনে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে বললেন, এই বালকের মাথার চুলও এখন পর্যন্ত পুরোপুরি গজায়নি; অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবী শায়বার মুসনাদে এই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মানব-সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে তাই বুঝিয়েছেন, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের সাতটি বস্তু সূরা আবাসার আয়াতে উল্লিখিত আছে : فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا এ আয়াতে আটটি বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটি মানুষের খাদ্য এবং সর্বশেষ اَبّ জন্তুদের খাদ্য।

কুরআন পাকের ভাষালঙ্কার লক্ষণীয় যে, মানব সৃষ্টির সাতটি স্তরকে একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করেনি : বরং কোথাও এক স্তর থেকে অন্যস্তরে বিবর্তনকে ثُمَّ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা কিছু বিলম্বে হওয়া বোঝায় এবং কোথাও فَا অব্যয় দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা অবিলম্বে হওয়া বোঝায়। এতে সেই ক্রমের প্রতি ইঙ্গিত আছে, যা দুই বিবর্তনের মাঝখানে স্বভাবত হয়ে থাকে। কোনো কোনো বিবর্তন মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয়। সেমতে কুরআন পাক প্রাথমিক তিন স্তরকে ثُمَّ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে– প্রথম মাটির সারাংশ এরপর একে বীর্যে পরিণত করা। এখানে ثُمَّ ব্যবহার করে جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً বলেছে। কেননা, মাটি থেকে খাদ্য সৃষ্টি হওয়া, এরপর তা দেহের অংশ হওয়া, অতঃপর তা বীর্যের আকার ধারণ করা মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই সময়সাপেক্ষ। এমনিভাবে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বীর্যের জমাট রক্তে পরিণত

হওয়াও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। একেও ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর জমাট রক্তের মাংসপিণ্ড হওয়া, মাংসপিণ্ডের অস্থি হওয়া এবং অস্থির উপর মাংসের প্রলেপ হওয়া— এই তিনটি স্তর অল্প সময়ে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। তাই এগুলোতে فَ অব্যয় দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। রূহ সঞ্চার ও জীবন সৃষ্টির সর্বশেষ ثُمَّ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, একটি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থে রূহ্ ও জীবন সৃষ্টি করা মানব বুদ্ধির দীর্ঘ সময় চায়।

মোটকথা, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বিবর্তনের যে যে ক্ষেত্রে মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ কাজ ছিল সেখানে ثُمَّ শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যেখানে সাধারণ মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ছিল না, সেখানে فَ অব্যয় প্রয়োগ করে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে সেই হাদীস দ্বারা আর সন্দেহ হতে পারে না, যাতে বলা হয়েছে যে, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌছাতে চল্লিশ দিন করে ব্যয় হয়। কারণ, এটা মানুষের ধারণাতীত আল্লাহর কুদরতের কাজ।

মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ রূহ্ ও জীবন সৃষ্টি করা : কুরআন পাক এ বিষয়টি এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বলেছে ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ অর্থাৎ আমি অতঃপর তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি। এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তর উপাদন ও বস্তুজগতের বিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই শেষ ও সপ্তম স্তর অন্য জগৎ অর্থাৎ রূহ জগৎ তথা রূহ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর ছিল। তাই একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রকৃত রূহ্ ও জৈব রূহ : এখানে خَلْقًا اٰخَرَ -এর তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, শা'বী, ইকরামা, যাহ্হাক, আবুল আলিয়া প্রমুখ তাফসীরবিদ 'রূহ্ সঞ্চার' দ্বারা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে আছে, সম্ভবত এই রূহ্ বলে জৈব রূহ্ বুঝানো হয়েছে। কারণ এটাও বস্তুবাচক ও সূক্ষ্ম দেহ বিশেষ, যা জৈব দেহের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ বলেন। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে ثُمَّ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'আলমে আরওয়াহ্' তথা রূহ্ জগত থেকে প্রকৃত রূহকে এনে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত রূহকে মানব সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে আল্লাহ তা'আলা এসব রূহকে সমবেত করে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলেছিলেন। উত্তরে সবাই সমস্বরে بَلٰى বলে আল্লাহ্র প্রতিপালকত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। হাঁ, মানবদেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির পরে স্থাপিত হয়। এখানে 'রূহ্ সঞ্চার' দ্বারা যদি জৈব রূহের সাথে প্রকৃত রূহের সম্পর্ক স্থাপন বুঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর। মানবজীবন প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহ্ও তখন তার কাজ ত্যাগ করে।

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ - خَلْق ও تَخْلِيْق -এর আসল অর্থ নতুনভাবে কোনো সাবেক নমুনা ছাড়া কোনো কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক দিয়ে خَالِق (স্রষ্টা) একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। অন্য কোনো ফেরেশতা অথবা মানব কোনো সামান্যতম বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে خَلْق ও تَخْلِيْق শব্দ কারিগরীর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কারিগরীর স্বরূপ এর বেশি কিছু নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্ব ভূমণ্ডলে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরি করা। একাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোনো মানুষকেও কোনো বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলে দেওয়া হয়। স্বয়ং কুরআন বলেছে— وَتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলেছে— اِنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ এসব ক্ষেত্রে خَلْق শব্দ রূপকভঙ্গিতে কারিগরির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে এখানে خَالِقِيْن শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষ কারিগরির দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোনো বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা সব সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ, কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর।

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ পূর্ববর্তী ১২-১৪ তিন আয়াতে মানব সৃষ্টি প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন ১৫ ও ১৬ আয়তে তার শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা সবাই এ জগতে আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। অতঃপর বলা হয়েছে— ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ অর্থাৎ মৃত্যুর পর আবার কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে। যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌছে দেওয়া হয়। এ হচ্ছে

মানুষের শেষ পরিণতি। অতঃপর সূচনা ও পরিণতি অর্থাৎ এতদুভয়ের অন্তবর্তীকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজির অল্প-বিস্তার বর্ণনা আছে, যা পরবর্তী আকাশ সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে। وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ - طَرَائِقَ শব্দটি طَرِيْقَةٌ-এর বহুবচন। একে স্তরের অর্থেও নেওয়া যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। طَرِيْقَة- এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ সবগুলো আকাশ বিধানাবলি নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ।

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ –এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেইনি এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না; বরং তাদের প্রতিপালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্য খাদ্য ও ফল-ফুল দ্বারা সুখের সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছি। এ বিষয়গুলো পরবর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَفْلَحَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِفْلَاحٌ মূলবর্ণ (ف ـ ل ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– সফলতা লাভ করেছে।

خَاشِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার خُشُوْعٌ মূলবর্ণ (خ ـ ش ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– বিনয়ী।

مُعْرِضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِعْرَاضٌ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– তারা দূরে থাকে।

مَلُوْمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার مَلَامَةٌ ও لَوْمٌ মূলবর্ণ (ل ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তাদের প্রতি দোষারোপ হয়।

اِبْتَغٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِغَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– প্রয়াসী।

اَلْعٰدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার عُدْوَانٌ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সীমালঙ্ঘনকারী।

رَاعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার رِعَايَةٌ ও رَعْىٌ মূলবর্ণ (ر ـ ع ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা রক্ষা করে।

يَرِثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব حَسِبَ মাসদার وَرْثٌ মূলবর্ণ (و ـ ر ـ ث) জিনস مثال واوى অর্থ– যারা উত্তরাধিকারী হবে।

فَكَسَوْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার كَسْوٌ মূলবর্ণ (ك ـ س ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– অতঃপর আমি রূপান্তরিত করলাম।

تُبْعَثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার بَعْثٌ মূলবর্ণ (ب ـ ع ـ ث) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ : এখানে قَدْ হরফে তাহকীক, اَفْلَحَ ফে'ল, الْمُؤْمِنُوْنَ ফায়েল, الَّذِيْنَ হলো الْمُؤْمِنُوْنَ-এর সিফাত هُمْ মুবতাদা فِىْ صَلَاتِهِمْ হলো خَاشِعُوْنَ-এর সাথে متعلق আর خَاشِعُوْنَ হলো খবর। আর খবর خَاشِعُوْنَ পূর্ণ বাক্যটি الَّذِيْنَ-এর সেলাহ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/১৮৬]

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. আর আমি আসমান হতে পরিমাণ মতো পানি বর্ষণ করেছি, তৎপর আমি এটাকে (দীর্ঘকাল পর্যন্ত) জমিনে স্থির রেখেছি, এবং আমি এর বিলোপ সাধন করতে (-ও) সক্ষম।

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. তৎপর আমি এটা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। সে বাগানে তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণ ফলসমূহ রয়েছে এবং তা হতে তোমরা খেয়ে থাক।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. আর (ঐ পানি হতে) এক (প্রকার) বৃক্ষও– যা সাইনা পর্বতে (প্রচুর) উৎপন্ন হয়ে থাকে– যাতে উৎপন্ন হয় তৈল এবং ভক্ষণকারীদের জন্য তরকারি।

وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. আর চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে; আমি তোমাদেরকে এদের উদরস্থ বস্তু (দুগ্ধ) পান করাই এবং এতে তোমাদের আরো অনেক উপকার রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কোনো কোনোগুলো তোমরা আহার করে থাক।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. আর এদের উপর এবং নৌকার উপর আরোহণ (-ও) করে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَاَنْزَلْنَا আর আমি বর্ষণ করেছি مِنَ السَّمَآءِ আসমান হতে مَآءً পানি بِقَدَرٍ পরিমাণ মতো فَاَسْكَنّٰهُ তৎপর আমি এটাকে স্থির রেখেছি فِي الْاَرْضِ জমিনে وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ এবং আমি এর বিলোপ সাধন করতে لَقٰدِرُوْنَ সক্ষম।

১৯. فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ তৎপর আমি এটা দ্বারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি جَنّٰتٍ বাগান مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ খেজুর ও আঙ্গুরের لَكُمْ فِيْهَا সে বাগানে তোমাদের জন্য রয়েছে فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ প্রচুর পরিমাণ ফলসমূহ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ এবং তা হতে তোমরা খেয়ে থাক।

২০. وَشَجَرَةً এক (প্রকার) বৃক্ষও تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ যা সাইনা পর্বতে (প্রচুর) উৎপন্ন হয়ে থাকে تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ যাতে উৎপন্ন হয় তৈল وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ এবং ভক্ষণকারীদের জন্য তরকারি।

২১. وَاِنَّ لَكُمْ আর তোমাদের জন্য রয়েছে فِي الْاَنْعَامِ চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে لَعِبْرَةً শিক্ষণীয় বিষয় نُسْقِيْكُمْ আমি তোমাদেরকে পান করাই مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا তাদের উদরস্থ বস্তু (দুগ্ধ) وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ এবং এতে তোমাদের আরো অনেক উপকার রয়েছে وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ এবং তাদের মধ্যে কোনো কোনোগুলো তোমরা আহার করে থাক।

২২. وَعَلَيْهَا আর এদের উপর وَعَلَى الْفُلْكِ এবং নৌকার উপর تُحْمَلُوْنَ আরোহণ (-ও) করে থাকে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৩. আর নূহকে পয়গম্বর করে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করলাম, অনন্তর তিনি বললেন, হে আমার কওম! আল্লাহরই ইবাদত করতে থাক, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য আর কোনো মা'বূদ নেই; এরপরও কি তোমরা ভয় করছ না?

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿۲۴﴾

২৪. অতঃপর তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ– যারা কাফের ছিল বলল– এ ব্যক্তি তোমাদের মতো একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সে তোমাদের চেয়ে উন্নত হয়ে থাকতে চায়; আর যদি (রাসূল পাঠানোই) আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো, তবে ফেরেশতাদেরকে পাঠাতেন, আর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকেও এমন কথা শুনিনি।

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿۲۵﴾

২৫. সে তো শুধু এমন একজন মানুষ যার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। অতএব তোমরা তার বিষয়ে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আরো অপেক্ষা কর।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿۲۶﴾

২৬. নূহ প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন। কেননা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا আর নূহকে পয়গম্বর করে প্রেরণ করলাম اِلٰى قَوْمِهٖ তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে فَقَالَ অনন্তর তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার কওম اعْبُدُوا اللّٰهَ আল্লাহরই ইবাদত করতে থাক مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য আর কোনো মা'বূদ নেই اَفَلَا تَتَّقُوْنَ এরপরও কি তোমরা ভয় করছ না?

২৪. فَقَالَ الْمَلَؤُا অতঃপর প্রধানগণ বলল الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কাফের ছিল مِنْ قَوْمِهٖ তাঁর সম্প্রদায়ের مَا هٰذَآ এ ব্যক্তি আর কিছুই নয় اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ তোমাদের মতো একজন মানুষ ব্যতীত يُرِيْدُ সে চায় اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ তোমাদের চেয়ে উন্নত হয়ে থাকতে وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً তবে ফেরেশতাদেরকে পাঠাতেন مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا আর আমরা এমন কথা শুনিনি فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকেও।

২৫. اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ সে তো শুধু এমন একজন মানুষ بِهٖ جِنَّةٌ যার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে فَتَرَبَّصُوْا অতএব তোমরা আরো অপেক্ষা কর بِهٖ তার বিষয়ে حَتّٰى حِيْنٍ এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।

২৬. قَالَ নূহ প্রার্থনা করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! انْصُرْنِيْ আমাকে সাহায্য করুন بِمَا كَذَّبُوْنِ কেননা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।

২৭. অনন্তর আমি তাঁকে আদেশ করলাম, তুমি নৌকা তৈরি কর আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার আদেশ মোতাবেক। অতঃপর যখন আমার (শাস্তির) আদেশ এসে পৌছবে এবং জমিন হতে পানি উথলিয়ে উঠতে থাকবে, তখন প্রত্যেক প্রকার (প্রাণী) হতে দুটি করে– অর্থাৎ এক জোড়া করে তাতে তুলে নাও এবং স্বীয় পরিবারবর্গকেও (উঠিয়ে নাও), কেবল তাদের মধ্য হতে সেই ব্যক্তি ছাড়া যার সম্বন্ধে (ডুবে মরার) সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে রয়েছে। আর আমার নিকট জালিমদের (তথা কাফেরদের রক্ষা) সম্বন্ধে কিছু বলো না। নিশ্চয় তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে।

فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ অনন্তর আমি তাকে আদেশ করলাম اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ তুমি নৌকা তৈরি কর بِاَعْيُنِنَا আমার তত্ত্বাবধানে وَوَحْيِنَا ও আমার আদেশ মোতাবেক فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে পৌছবে وَفَارَ التَّنُّوْرُ এবং জমিন হতে পানি উথলিয়ে উঠতে থাকবে فَاسْلُكْ فِيْهَا তখন তাতে তুলে নাও مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ প্রত্যেক প্রকার (প্রাণী) হতে দুটি করে অর্থাৎ এক জোড়া করে وَاَهْلَكَ এবং স্বীয় পরিবারবর্গকেও اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ কেবল তাদের মধ্যে হতে সেই ব্যক্তি ছাড়া যার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে রয়েছে وَلَا تُخَاطِبْنِيْ আর আমার নিকট কিছু বলো না فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا জালিমদের (তথা কাফেরদের রক্ষা) সম্বন্ধে اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ নিশ্চয় তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ

মানুষকে পানি সরবরাহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে بِقَدَرٍ কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্যে অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আজাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশি বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্য বিপদ ও আজাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়। যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কোনো কারণে প্লাবন-তুফান চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিন্ন।

এরপর অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের পানি যদি দৈনন্দিন বর্ষিত হয়, তাতেও মানুষ বিপদে পতিত হবে। প্রাত্যহিক বৃষ্টি তার কাজকারবার ও স্বভাবের পরিপন্থি। যদি সম্বৎসর অথবা ছয় মাস অথবা তিন মাসের প্রয়োজনের পানি এক দফায় বর্ষণ করা হয় এবং মানুষকে নিজ নিজ বরাদ্দের পানি ছয় মাসের জন্য সঞ্চিত করে রাখার আদেশ দেওয়া হয়, তবে অধিকাংশ মানুষও এই পরিমাণ পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে না। যদি

কোনোরূপে বড় চৌবাচ্চা ও গর্তে পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করেও নেয়, তবে কয়েকদিন পর পানি পচে যাবে; যা পান করা এবং ব্যবহার করাও কঠিন হবে। তাই আল্লাহর কুদরত এর এই ব্যবস্থা করেছে যে, পানি যে সময় বর্ষিত হয়, তখন সাময়িকভাবে বৃক্ষ ও মৃত্তিকা সিক্ত হয়ে যায়, অতঃপর ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন পুকুর, চৌবাচ্চা ও প্রাকৃতিক গর্তে এই পানি জমা থাকে। প্রয়োজনের সময় মানুষ ও জীবজন্তু তা ব্যবহার করে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই পানিতে বেশি দিন চলে না। তাই প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরকে প্রত্যহ তাজা পানি পৌঁছানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পানির একটা বিরাট অংশকে বরফে পরিণত করে পাহাড়ের শৃঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোনো ধুলাবালু এমন কি মানুষ ও জীবজন্তু পৌঁছতে পারে না। সেখানে পচে যাওয়া, নাপাক হওয়া এবং অব্যবহারযোগ্য হওয়ারও কোনো আশঙ্কা নেই। এরপর এই বরফের পানি চুয়ে চুয়ে পাহাড়ের শিরা-উপশিরা বয়ে মাটির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই প্রাকৃতির ধারা মাটির কোণে কোণে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে কিছু পানি নদীনালা ও নহরের আকারে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে পারে এবং কোটি কোটি মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে সিক্ত করে। অবশিষ্ট বরফগলা পানি মাটির গভীর স্তরে নেমে গিয়ে ফলগুধারার আকারে প্রবাহিত হতে থাকে। কূপ খনন করে এই পানি সর্বত্রই উত্তোলন করা যায়। কুরআন পাকের এই আয়াতে এই গোটা ব্যবস্থাকে একটি মাত্র বাক্য وَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ এ ব্যক্ত করা হয়েছে। পরিশেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাটির স্তর থেকে যে পানি কূপের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়, তাও অনেক বেশি গভীরে নয়; বরং অল্প গভীরে রেখেই সহজলভ্য করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা পানির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এ পানি মাটির এমন গভীরতর অংশে পৌঁছে যাওয়াটাও সম্ভবপর ছিল, যা মানুষের নাগালের বাইরে। আয়াতের শেষে وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ বাক্যে এই বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আরবের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন। বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ –বাক্যে অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এসব বাগানে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোনো কোনো ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর। وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ বাক্যের মতলব তাই। এরপর বিশেষ করে যয়তুন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা এর উপকারিতা অপরিসীম। যয়তুনের বৃক্ষ তূর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاۤءَ সায়না ও সিনিন সেই স্থানের নাম, যেখানে তূর পর্বত অবস্থিত। যয়তুনের তৈল মালিশ ও বাতি জ্বালানোর কাজেও আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ যয়তুন বৃক্ষের জন্যে বিশেষত তূর পর্বতের উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই বৃক্ষ সর্বপ্রথম তূর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন : তুফানে-নূহের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল যয়তুন। –[মাযহারী]

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এমন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা তিনি জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা স্মরণ করে তাওহীদ ও ইবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছে– وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً অর্থাৎ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে– نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا অর্থাৎ এসব জন্তুর পেটে আমি তোমাদের জন্য পাক-সাফ দুধ তৈরি করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এরপর বলা হয়েছে শুধু দুধই নয়, এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্যে অনেক (অগণিত) উপকারিতা রয়েছে। وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ চিন্তা করলে দেখা যায়, জন্তুদের দেহের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি লোম মানুষের কাজে আসে এবং তার দ্বারা মানুষের জীবনধারণের অসংখ্য প্রকার সরঞ্জাম তৈরি হয়। জন্তুদের পশম, অস্থি, অন্ত্র এবং সমস্ত অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করে, তা গণনা করাও কঠিন। এসব উপকার ছাড়া আরও একটি বড় উপকার এই যে, হালাল জন্তুদের মাংসও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ পরিশেষে জন্তু-জানোয়ারদের আরও একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে আরোহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর। এই শেষ উপকারের মধ্যে

জন্তুদের সাথে নদীতে চলাচলকারী নৌকাও শরিক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং মালপত্র একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার কথাও আলোচনা করে বলা হয়েছে : وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ চাকার মাধ্যমে চলে এমন সব যানবাহনও নৌকার হুকুম রাখে।

وَفَارَ التَّنُّوْرُ - تَنُّوْرٌ চুল্লীকে বলা হয়, যা রুটি পাকানোর জন্য তৈরি করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কেউ কেউ এর দ্বারা বিশেষ চুল্লীর অর্থই নিয়েছেন, যা কূফার মসজিদে এবং কারো কারো মতে সিরিয়ার কোনো এক জায়গায় ছিল। এই চুল্লী উথলিত হওয়াকেই হযরত নূহ্ (আ.)-এর জন্য মহাপ্লাবনের আলামত বলে ঠিক করা হয়েছিল। –[মাযহারী] হযরত নূহ (আ.) তাঁর মহাপ্লাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিস্তারিত বিবরণসহ বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَاَسْكَنّٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْكَانٌ মূলবর্ণ (س - ك - ن) জিনস صحيح অর্থ– অতঃপর আমি এটাকে স্থির রেখেছি।

لَقَادِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার قُدْرَةٌ মূলবর্ণ (ق - د - ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি সক্ষম।

لِلْاٰكِلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَكْلٌ মূলবর্ণ (ا - ك - ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– ভক্ষণকারীদের জন্য।

نُسْقِيْكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْقَاءٌ মূলবর্ণ (س - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি তোমাদেরকে পান করাই।

تُحْمَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার حَمْلٌ মূলবর্ণ (ح - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা আরোহণ (ও) করে থাক।

اَفَلَا تَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস অর্থ– এরপরও কি তোমরা ভয় করছ না।

يَتَفَضَّلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَفَضُّلٌ মূলবর্ণ (ف - ض - ل) জিনস صحيح অর্থ– উন্নত হয়ে থাকতে।

فَتَرَبَّصُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَرَبُّصٌ মূলবর্ণ (ر - ب - ص) জিনস صحيح অর্থ– অতএব তোমরা আরো অপেক্ষা কর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ এখানে واو টি استئنافية আর বাক্যটি হলো مستأنفة আর لَقَدْ এর لام টি উহ্য قسم এর জবাবের জন্য এসেছে قد হলো হরফে তাহকীক আর اَرْسَلْنَا হলো ফে'ল ও ফায়েল نُوْحًا হলো مفعول به আর اِلٰى قَوْمِهٖ হলো اَرْسَلْنَا-এর সাথে متعلق। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/১৯৪]

২৮. অতঃপর যখন তুমি এবং তোমার (মুসলমান) সাথিগণ নৌকায় বসবে তখন এরূপ বল, আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা– যিনি আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায় হতে মুক্তি দিয়েছেন।	فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. আর এরূপ বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অবতারণ করুন বরকতময় অবতারণে এবং আপনি সকল অবতারণকারীর মধ্যে উত্তম।	وَقُلْ رَّبِّ أَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. এ ঘটনাতে (আমার কুদরতের) বহু নির্দশন রয়েছে এবং আমি (এটা দ্বারা বান্দাদেরকে) পরীক্ষা করে থাকি।	إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. অতঃপর তাদের (অর্থাৎ নূহের কওমের) পর আমি অন্য এক সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করলাম।	ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. অনন্তর আমি তাদের প্রতি তাদেরই মধ্য হতে এক পয়গম্বর পাঠালাম, (তিনি বললেন), তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোনো মা'বূদ নেই; তবুও কি তোমরা ভয় করো না?	فَأَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ অতঃপর যখন তুমি বসবে وَمَنْ مَّعَكَ এবং তোমার (মুসলমান) সাথিগণ عَلَى الْفُلْكِ নৌকায় فَقُلِ তখন এরূপ বল الْحَمْدُ لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা الَّذِيْ نَجّٰنَا যিনি আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ কাফের সম্প্রদায় হতে।

২৯. وَقُلْ আর এরূপ বল رَّبِّ হে আমার প্রতিপালক أَنْزِلْنِيْ আমাকে অবতারণ করুন مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا বরকতময় অবতারণে وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ এবং আপনি সকল অবতারণকারীর মধ্যে উত্তম।

৩০. إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ এ ঘটনাতে রয়েছে لَاٰيٰتٍ বহু নিদর্শন وَّإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ এবং আমি (এটা দ্বারা বান্দাদেরকে) পরীক্ষা করে থাকি।

৩১. ثُمَّ أَنْشَأْنَا অতঃপর আমি সৃষ্টি করলাম مِنْ بَعْدِهِمْ তাদের পর قَرْنًا اٰخَرِيْنَ অন্য এক সম্প্রদায়কে।

৩২. فَأَرْسَلْنَا فِيْهِمْ অনন্তর আমি তাদের প্রতি পাঠালাম رَسُوْلًا مِّنْهُمْ তাদেরই মধ্যে হতে এক পয়গম্বর أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোনো মা'বূদ নেই أَفَلَا تَتَّقُوْنَ তবুও কি তোমরা ভয় করো না?

৩৩. তাঁর কওমের সেই সরদারগণ বলল- যারা অবিশ্বাসী ছিল এবং পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল এবং আমি যাদেরকে পার্থিব জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছিলাম- এতো তোমাদের মতো একজন মানুষ, (কেননা) সে তাই খায় যা তোমরা খেয়ে থাক এবং তাই পান করে, যা তোমরা পান করে থাক।	وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আর যদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষের কথা অনুসারে চলতে থাক, তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾
৩৫. এ লোকটি কি তোমাদেরকে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যখন তোমাদের মৃত্যু ঘটবে এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হবে, তখন তোমাদেরকে (পুনরায় জীবিত করে) বের করা হবে।	أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা বহু দূরে, বহু দূরে।	هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾
৩৭. জীবন তো কেবল আমাদের এই পার্থিব জীবনই, যাতে আমাদের কেউ মরে এবং কেউ জন্মগ্রহণ করে। আর আমদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।	إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ তার কওমের সেই সরদারগণ বলল الَّذِينَ كَفَرُوا যারা অবিশ্বাসী ছিল وَكَذَّبُوا এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ পরকালের সাক্ষাৎকে وَأَتْرَفْنَاهُمْ এবং আমি যাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছিলাম فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ এতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ يَأْكُلُ সে তাই খায় مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ যা তোমরা খেয়ে থাক وَيَشْرَبُ এবং তাই পান করে مِمَّا تَشْرَبُونَ যা তোমরা পান করে থাক।

৩৪. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ আর যদি তোমরা চলতে থাক بَشَرًا مِثْلَكُمْ তোমাদের মতো একজন মানুষের কথা অনুসারে إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩৫. أَيَعِدُكُمْ এ লোকটি কি তোমাদেরকে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেয় যে أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ যখন তোমাদের মৃত্যু ঘটবে وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হবে أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ তখন তোমাদেরকে বের করা হবে।

৩৬. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ বহু দূরে বহু দূরে لِمَا تُوعَدُونَ তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা।

৩৭. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا জীবন তো কেবল আমাদের এই পার্থিব জীবনই نَمُوتُ وَنَحْيَا যাতে আমাদের কেউ মরে এবং কেউ জন্ম গ্রহণ করে وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ আর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।

৩৮. এ ব্যক্তি এমন লোক, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। আর আমরা তো তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করব না।	إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾
৩৯. পয়গম্বর প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন। কেননা তারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে।	قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾
৪০. আল্লাহ বললেন, এরা অতি শীঘ্রই অনুতপ্ত হবে।	قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾
৪১. অনন্তর সত্য সত্যই এক বিকট ধ্বনি (আজাব) তাদেরকে এসে ধরল, অনন্তর আমি তাদেরকে খড়-কুটা (-র ন্যায় দলিত, মথিত) করে দিলাম, সুতরাং দূর হোক কাফেররা (রহমত হতে)।	فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾
৪২. অতঃপর আমি তাদের (অর্থাৎ, 'আদ বা ছামূদের) পরে অন্য সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করলাম।	ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ এ বক্তি এমন লোক افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ আর আমরা তো তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করব না।

৩৯. قَالَ পয়গম্বর প্রার্থনা করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক انصُرْنِي আমাকে সাহায্য করুন بِمَا كَذَّبُونِ কেননা তারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছ।

৪০. قَالَ আল্লাহ বললেন عَمَّا قَلِيلٍ অতি শীঘ্রই لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ এরা অনুতপ্ত হবে।

৪১. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ অনন্তর এক বিকট ধ্বনি (আজাব) তাদেরকে এসে ধরল بِالْحَقِّ সত্য সত্যই فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً অনন্তর আমি তাদেরকে খড়কুটা করে দিলাম فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ সুতরাং দূর হোক কাফেররা।

৪২. ثُمَّ أَنشَأْنَا অতঃপর আমি সৃষ্টি করলাম مِن بَعْدِهِمْ তাদের পরে قُرُونًا آخَرِينَ অন্য সম্প্রদায়কে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হেদায়েতের আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছিল। আর ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ আয়াত থেকে নিয়ে আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্যান্য পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের অবস্থা সংক্ষেপে এবং নাম নির্দিষ্ট না করে বর্ণনা করা হয়েছে। তাফসীরকারকগণ বলেন, লক্ষণাদি দৃষ্টে মনে হয়, এসব আয়াতে 'আদ অথবা ছামূদ অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। 'আদ সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত হূদ (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং ছামূদ সম্প্রদায়ের পয়গম্বর ছিলেন হযরত সালেহ্ (আ.)। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এসব সম্প্রদায় এক صَيْحَةٌ অর্থাৎ ভয়ংকর শব্দ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যান্য আয়াতে ছামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত

আছে যে, তারা মহা চিৎকার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ থেকে কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, আলোচ্য আয়াতসমূহে قَرْنًا اٰخَرِيْنَ বলে ছামূদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, صَيْحَة শব্দের অর্থ আজাব হলে 'আদ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে। اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোনো পুনরুজ্জীবন নেই। কিয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফেরদের কথা তাই। যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো খোলাখুলি কাফেরই। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও কথা এবং কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুটে উঠে। তারা পরকাল ও কিয়ামতের হিসাবের প্রতি কোনো সময় লক্ষ্যও করে না। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। আমীন!

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِسْتَوَيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস ... অর্থ- তুমি বসবে।

لَمُبْتَلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِلَاءٌ মূলবর্ণ (ب - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- পরীক্ষা করে থাকি।

اَتْرَفْنٰهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتْرَافٌ মূলবর্ণ (ت - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ- আমি যাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছিলাম।

مِتُّمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَوْتٌ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমাদের মৃত্যু ঘটবে।

مُخْرَجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْرَاجٌ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ- তোমাদেরকে বের করা হবে।

تُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْدٌ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ- তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

لَيُصْبِحُنَّ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مستقبل معروف درفعل لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصْبَاحٌ মূলবর্ণ (ص - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ- এরা শীঘ্রই হবে।

نٰدِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার نَدَمٌ মূলবর্ণ (ن - د - م) জিনস صحيح অর্থ- অনুতপ্ত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ : এখানে و টি আতেফা قُلْ ফে'ল ও ফায়েল আর رَبِّ হলো منادى যা উহ্য يائى متكلم এর দিকে মুযাফ হয়েছে। আর حرف ندا ও উহ্য রয়েছে। اَنْزِلْنِيْ ফে'ল ও ফায়েল আর نون টি হলো نون وقاية আর ى হলো مفعول به আর مُنْزَلًا হলো اسم مكان বা মাসদার হয়ে দ্বিতীয় مفعول به অথবা مفعول مطلق আর مُبَارَكً হলো সিফাত وَاَنْتَ -এর و টি حالية আর اَنْتَ হলো মুবতাদা আর خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ হলো খবর। -[ই'রাবুল কুরআন : ৫/১৯৭]

অনুবাদ	আয়াত
৪৩. কোনো সম্প্রদায়ই নিজেদের (ধ্বংসের ঐ) নির্দিষ্টকাল হতে আগেও যেতে পারে না এবং পশ্চাতেও থাকতে পারে না ।	مَا تَسۡبِقُ مِنۡ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَاۡخِرُوۡنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. অতঃপর আমি আমার পয়গম্বরগণকে পর পর পাঠিয়েছি; যখনই কোনো সম্প্রদায়ের নিকট তাদের রাসূল আসত, তখনই তারা তাঁকে অবিশ্বাস করত, সুতরাং আমি (-ও ধ্বংস ক্রিয়ায়) একের পর অন্যের সূত্র বেঁধে দিয়েছি আর আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করেছি, সুতরাং সে সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর গজব– যারা ঈমান আনে না ।	ثُمَّ اَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا تَتۡرٰى ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوۡلُهَا كَذَّبُوۡهُ فَاَتۡبَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ بَعۡضًا وَّجَعَلۡنٰهُمۡ اَحَادِيۡثَ ۚ فَبُعۡدًا لِّقَوۡمٍ لَّا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. অতঃপর মূসা এবং তাঁর ভ্রাতা হারূনকে আমার নির্দেশাবলি ও সুস্পষ্ট নির্দশনসমূহসহ প্রেরণ করলাম ।	ثُمَّ اَرۡسَلۡنَا مُوۡسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوۡنَ ۙ۬ بِاٰيٰتِنَا وَسُلۡطٰنٍ مُّبِيۡنٍ ﴿٤٥﴾
৪৬. ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গের নিকট, অনন্তর তারা অহংকার করল এবং তারা ছিলও অহংকারী জাতি ।	اِلٰى فِرۡعَوۡنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسۡتَكۡبَرُوۡا وَكَانُوۡا قَوۡمًا عَالِيۡنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. ফলে তারা বলাবলি করতে লাগল, আমরা কি এমন দুজনের প্রতি ঈমান আনব যারা আমাদেরই মতোই মানুষ? অথচ তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের দাসত্ব করে ।	فَقَالُوۡۤا اَنُؤۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثۡلِنَا وَقَوۡمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوۡنَ ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. مَا تَسۡبِقُ কোনো সম্প্রদায়ই নিজেদের নির্দিষ্টকাল হতে مِنۡ اُمَّةٍ اَجَلَهَا আগেও যেতে পারে না وَمَا يَسۡتَاۡخِرُوۡنَ এবং পশ্চাতেও থাকতে পারে না ।

৪৪. ثُمَّ اَرۡسَلۡنَا অতঃপর আমি পাঠিয়েছি رُسُلَنَا আমার পয়গম্বরগণকে تَتۡرٰى পর পর كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوۡلُهَا যখনই কোনো সম্প্রদায়ের নিকট তাদের রাসূল আসত كَذَّبُوۡهُ তখনই তারা তাকে অবিশ্বাস করত فَاَتۡبَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ بَعۡضًا সুতরাং আমি একের পর অন্যের সূত্র বেঁধে দিয়েছি وَّجَعَلۡنٰهُمۡ اَحَادِيۡثَ আর আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করেছি সে সম্প্রদায়ের فَبُعۡدًا لِّقَوۡمٍ لَّا يُؤۡمِنُوۡنَ সুতরাং সে সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর গজব যারা ঈমান আনত না ।

৪৫. ثُمَّ اَرۡسَلۡنَا অতঃপর প্রেরণ করলাম مُوۡسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوۡنَ মূসা এবং তার ভ্রাতা হারূনকে بِاٰيٰتِنَا وَسُلۡطٰنٍ مُّبِيۡنٍ আমার নির্দেশাবলি ও সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহসহ ।

৪৬. اِلٰى فِرۡعَوۡنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গের নিকট فَاسۡتَكۡبَرُوۡا অনন্তর তারা অহংকার করল وَكَانُوۡا قَوۡمًا عَالِيۡنَ এবং তারা ছিলও অহংকারী জাতি ।

৪৭. فَقَالُوۡۤا ফলে তার বলাবলি করতে লাগল اَنُؤۡمِنُ আমরা কি ঈমান আনব لِبَشَرَيۡنِ مِثۡلِنَا এমন দু'জনের প্রতি যারা আমাদের মতোই মানুষ وَقَوۡمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوۡنَ অথচ তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের দাসত্ব করে ।

فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. মোটকথা, তারা সে দু'জন (নবী) -কে অবিশ্বাস করল, সুতরাং তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করলাম, যেন তারা হেদায়েত লাভ করে।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗۤ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ﴿٥٠﴾

৫০. আর আমি মারইয়ামের পুত্র (ঈসা)-কে এবং তাঁর মাতাকে বড় নিদর্শন বানালাম এবং আমি তাদেরকে এমন উচ্চ ভূমিতে নিয়ে আশ্রয় দিলাম, যা বাসযোগ্য ও সুজলা ছিল।

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٥١﴾

৫১. হে রাসূলগণ! তোমরা উৎকৃষ্ট বস্তু (অর্থাৎ আমার নিয়ামত) -সমূহ খাও এবং নেক কাজ কর; আমি তোমাদের সকলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে খুব অবগত আছি।

وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿٥٢﴾

৫২. এবং এটা হচ্ছে তোমাদের জাতি (যাদের সাথে তোমাদের থাকা কর্তব্য), তা একই জাতি, আর আমি তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় কর।

فَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. অনন্তর এরা নিজেদের ধর্মে নিজ নিজ পন্থা পৃথক করে বিভেদ সৃষ্টি করে নিল; প্রত্যেক দলের নিকট যে ধর্ম আছে তারা তাতেই সন্তুষ্ট রয়েছে।

فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. সুতরাং তাদেরকে থাকতে দিন তাদের অজ্ঞতার মধ্যে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. فَكَذَّبُوْهُمَا মোটকথা তারা সে দুজন (নবী) কে অবিশ্বাস করল فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ সুতরাং তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো

৪৯. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ আর আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করলাম لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ যেন তারা হেদায়েত লাভ করে।

৫০. وَجَعَلْنَا আর আমি বানালাম ابْنَ مَرْيَمَ মারইয়ামের পুত্র (ঈসা আ.)-কে وَاُمَّهٗ এবং তার মাতাকে اٰيَةً বড় নিদর্শন وَاٰوَيْنٰهُمَا এবং আমি তাদেরকে আশ্রয় দিলাম اِلٰى رَبْوَةٍ এমন উচ্চ ভূমিতে নিয়ে ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ যা বাসযোগ্য ও সুজলা ছিল

৫১. يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ হে রাসূলগণ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ তোমরা উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ খাও وَاعْمَلُوْا صَالِحًا এবং নেক কাজ কর اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ আমি তোমাদের সকলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে খুব অবগত আছি।

৫২. وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ এবং এটা হচ্ছে তোমাদের জাতি اُمَّةً وَّاحِدَةً তা একই জাতি وَاَنَا رَبُّكُمْ আর আমি তোমাদের প্রতিপালক فَاتَّقُوْنِ সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় কর।

৫৩. فَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا অনন্তর এরা নিজেদের ধর্মে নিজ নিজ পন্থা পৃথক করে বিভেদ সৃষ্টি করে নিল كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ প্রত্যেক দলের নিকট যে ধর্ম আছে তাতেই فَرِحُوْنَ তারা সন্তুষ্ট রয়েছে।

৫৪. فَذَرْهُمْ সুতরাং তাদেরকে থাকতে দিন فِيْ غَمْرَتِهِمْ তাদের অজ্ঞতার মধ্যে حَتّٰى حِيْنٍ এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।

৫৫. তারা কি এই ধারণা করছে যে, আমি তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে আসছি।	أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. তাতে শুধু দ্রুত তাদের কল্যাণই সাধন করে চলেছি; বরং তারা বুঝছে না।	نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ۭ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা স্বীয় প্রতিপালকের ভয়ে ভীত থাকে।	اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. এবং যারা আপন প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান রাখে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৫. أَيَحْسَبُوْنَ তারা কি এই ধারণা করছে যে أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ আমি তাদেরকে দিয়ে আসছি مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি।

৫৬. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ তাতে শুধু দ্রুত তাদের কল্যাণই সাধন করে চলেছি بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ বরং তারা বুঝছে না।

৫৭. اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ স্বীয় প্রতিপালকের ভয়ে مُّشْفِقُوْنَ ভীত থাকে।

৫৮. وَالَّذِيْنَ هُمْ এবং যারা بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ আপন প্রতিপালক নিদর্শনসমূহের প্রতি يُؤْمِنُوْنَ ঈমান রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا - طيبات -এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম বস্তু। ইসলামি শরিয়তে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই طيبات দ্বারা কেবল সে সকল হালাল বস্তু সমূহই উদ্দেশ্য যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র ও উত্তম। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণকে তাঁদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর, দুই সৎকর্ম কর। আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন। অতএব তাঁদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্য এই আদেশ আরো পালনীয়। বস্তুত আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা।

আলেমগণ বলেন, এই দু'টি আদেশকে একসাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সৎকর্মের তাওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎকর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি-ধুসরিত থাকে। এরপর আল্লাহর সামনে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে ইয়া রব, ইয়া রব-বলে ডাকে, কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরি হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে? –[কুরতুবী]

এ থেকে বোঝা গেল যে, ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য হয় না।

وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً - اُمَّةٌ শব্দটি সম্প্রদায় ও কোনো বিশেষ পয়গম্বরের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোনো সময় তরিকা ও দীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ আয়াতে দীন ও তরিকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বোঝানো হয়েছে।

فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا - زُبُرٌ শব্দটি زَبُوْرٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সব পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দিন ও তরিকা

অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরিকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছে। زبر শব্দটি কোনো সময় زبرة এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এসব মতবিরোধের ফলে দীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়া মূর্খতা, যা কোনো মুজতাহিদের মতেই জায়েজ নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَا تَسْبِقُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَبْقٌ মূলবর্ণ (س - ب - ق) জিনস صحيح অর্থ– আগেও যেতে পারে না।

مَا يَسْتَأْخِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِئْخَارٌ মূলবর্ণ (أ - خ - ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– পশ্চাতেও থাকতে পারে না।

عَالِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার عُلُوٌّ মূলবর্ণ (ع - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– অহংকারী।

اَلْمُهْلَكِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهْلَاكٌ মূলবর্ণ (ه - ل - ك) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো।

يَهْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِهْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা হেদায়েত লাভ করে।

اٰوَيْنٰهُمَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْوَاءٌ মূলবর্ণ (أ - و - ى) জিনস মুরাক্কাব (لفيف مقرون ও مهموز فاء) অর্থ– আমি তাদেরকে আশ্রয় দিলাম।

رَبْوَةٌ : ইসম। একবচন। বহুবচন ربى . ربى। উঁচু স্থান, টিলা। মাসদার رُبُوًّا ও رِبًا বাব نَصَرَ অর্থ– অতিরিক্ত হওয়া।

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَكْلٌ মূলবর্ণ (ا - ك - ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা খাও।

فَتَقَطَّعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَقَطُّعٌ মূলবর্ণ (ق - ط - ع) জিনস صحيح অর্থ– অনন্তর এরা বিভেদ সৃষ্টি করে নিল।

فَذَرْهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার وَذْرٌ মূলবর্ণ (و - ذ - ر) জিনস مثال واوى অর্থ– সুতরাং তাদেরকে থাকতে দিন।

نُمِدُّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْدَادٌ মূলবর্ণ (م - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমি দিয়ে আসছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاعْمَلُوْا صٰلِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ এখানে واو টি আতেফা আর اِعْمَلُوْا ক্রিয়াটি তার পূর্ববর্তী كُلُوْا এর উপর আতফ হয়েছে। اِعْمَلُوْا ফে'ল ও ফায়েল صَالِحًا হলো مفعول به অথবা مفعول مطلق আর اِنِّىْ الخ আর বাক্যটি امر -এর কারণ বর্ণনা করছে। আর اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ى হলো তার اسم আর بِمَا টা متعلق হয়েছে عَلِيْمٌ -এর সাথে আর تَعْمَلُوْنَ বাক্যটি صلة হয়েছে আর عَلِيْمٌ হলো اِنَّ -এর খবর। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২০৮]

বাংলা অনুবাদ	আরবি আয়াত
৫৯. আর যারা আপন প্রতিপালকের সাথে কোনো শরিক সাব্যস্ত করে না,	وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. এবং যারা (আল্লাহর রাস্তায়) দান করে– যা কিছু দান করার এবং তাদের অন্তরসমূহ ভীত থাকে একথার জন্য যে, তাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে।	وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. এরাই দ্রুত নিজ কল্যাণসমূহ সাধন করছে এবং তারা তার প্রতি ছুটে চলছে।	اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. আর আমি কাউকেও তার সাধ্যের অতীত কাজ করতে বলি না। আর আমার নিকট একটি দফতর রয়েছে– যা (অবস্থা) ঠিক ঠিক বলে দেবে এবং মানুষের প্রতি মোটেও অবিচার করা হবে না।	وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. বরং এ কাফেরদের অন্তরগুলো ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে আর এটা ছাড়া তাদের আরো কার্যকলাপ রয়েছে যা তারা করে থাকে।	بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِىْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. এমনকি, যখন আমি তাদের মধ্যকার ধনী লোকদেরকে আজাবে গ্রেফতার করব, তৎক্ষণাৎ তারা চিৎকার করে উঠবে।	حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. (বলা হবে) এখন আর্তনাদ করো না। আমার পক্ষ থেকে তোমরা কোনোই সাহায্য পাবে না।	لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ ۗ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৯. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা بِرَبِّهِمْ আপন প্রতিপালকের সাথে لَا يُشْرِكُوْنَ কোনো শরিক সাব্যস্ত করে না।

৬০. وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ এবং যারা দান করে مَآ اٰتَوْا যা কিছু দান করার وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ এবং তাদের অন্তরসমূহ ভীত থাকে اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ এ কথার জন্য যে, তাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে।

৬১. اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ এরাই দ্রুত নিজ কল্যাণসমূহ সাধন করছে وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ এবং তারা তার প্রতি ছুটে চলছে।

৬২. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আর আমি কাউকেও তার সাধ্যের অতীত কাজ করতে বলি না وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ আর আমার নিকট একটি দফতর রয়েছে يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ যা ঠিক ঠিক বলে দেবে وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ এবং মানুষের প্রতি মোটেও অবিচার করা হবে না।

৬৩. بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِىْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا বরং এই কাফেরদের অন্তরগুলো ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ আর এটা ছাড়া তাদের আরো কার্যকলাপ রয়েছে هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ যা তারা করে থাকে।

৬৪. حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذْنَا এমনকি যখন আমি গ্রেফতার করব مُتْرَفِيْهِمْ তাদের মধ্যকার ধনী লোকদেরকে بِالْعَذَابِ আজাবে اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ তৎক্ষণাৎ তারা চিৎকার করে উঠবে।

৬৫. لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ এখন আর্তনাদ করো না اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ আমার পক্ষ থেকে তোমারা কোনোই সাহায্য পাবে না।

অনুবাদ	আয়াত
৬৬. আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে আবৃত্তি করে শুনানো হতো, তখন তোমরা পশ্চাৎ দিকে ধাবিত হতে।	قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. অহংকার করতে করতে, কুরআনকে খোশ-গল্পের উপকরণে পরিণত করতে করতে, (এবং এর প্রতি) অযথা উক্তি করতে করতে।	مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. এরা কি (আল্লাহর) এই কালামে চিন্তা করে না অথবা তাদের নিকট কি এমন বস্তু এসেছে- যা তাদের পিতৃপুরুষদের নিকট আসেনি।	اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. অথবা এরা কি স্বীয় রাসূল সম্বন্ধে অবগত ছিল না এ কারণে তারা তাঁর অস্বীকার করছে।	اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. অথবা তারা কি আপনার সম্পর্কে উন্মাদ বলে উক্তি করে; বরং এ রাসূল তাদের নিকট সত্যবাণীসহ এসেছেন, আর তাদের অধিকাংশই সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. আর যদি সত্য ধর্ম তাদের কল্পনার অনুগামী হতো, তবে আসমান ও জমিন এবং যা কিছু তাতে আছে, সবই বিনষ্ট হয়ে যেত; বরং আমি তাদের নিকট তাদের নসিহতের বাণী পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা স্বীয় (কল্যাণ সিদ্ধির) নসিহত হতেও মুখ ফিরিয়ে নেয়।	وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৬. قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে আবৃত্তি করে শুনানো হতো فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ তখন তোমরা পশ্চাৎ দিকে ধাবিত হতে।

৬৭. مُسْتَكْبِرِيْنَ অহংকার করতে করতে। بِهٖ سٰمِرًا কুরআনকে খোশ-গল্পের উপকরণে পরিণত করতে করতে تَهْجُرُوْنَ অযথা উক্তি করতে করতে।

৬৮. اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ এরা কি এই কালামে চিন্তা করে না اَمْ جَآءَهُمْ অথবা তাদের নিকট কি এসেছে مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ এমন বস্তু যা তাদের পিতৃপুরুষদের নিকট আসেনি।

৬৯. اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ অথবা এরা কি স্বীয় রাসূল সম্বন্ধে অবগত ছিল না فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ এ কারণে তাঁরা তার অস্বীকার করছে।

৭০. اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ অথবা তারা কি আপনার সম্পর্কে উম্মাদ বলে উক্তি করে بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ বরং এই রাসূল তাদের নিকট সত্যবাণীসহ এসেছেন وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ আর তাদের অধিকাংশই সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

৭১. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ আর যদি সত্য ধর্ম অনুগামী হতো اَهْوَآءَهُمْ তাদের কল্পনার لَفَسَدَتِ তবে সবই বিনষ্ট হয়ে যেত السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ আসামান ও জমিন وَمَنْ فِيْهِنَّ এবং যা কিছু তাতে আছে بَلْ اَتَيْنٰهُمْ বরং আমি তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম بِذِكْرِهِمْ তাদের নসিহতের বাণী فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ কিন্তু তারা স্বীয় নসিহত হতেও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৭২. অথবা আপনি কি তাদের নিকট কিছু অর্থ কামনা করছেন? তবে তো আপনার প্রতিপালকের অর্থই সর্বোত্তম এবং তিনি সমস্ত দাতাদের মধ্যে উত্তম।	اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. আর আপনি তো তাদেরকে সরল পথের দিকে ডাকছেন।	وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٣﴾
৭৪. অথচ (তাদের মধ্যে) যারা পরলোকে অবিশ্বাসী, তারা পথ হতে সরে যাচ্ছে।	وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ﴿٧٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭২. اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا অথবা আপনি কি তাদের নিকট কিছু অর্থ কামনা করছেন فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ তবে তো আপনার প্রতিপালকের অর্থই সর্বোত্তম وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ এবং তিনি সমস্ত দাতাদের মধ্যে উত্তম।

৭৩. وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ আর আপনি তো তাদেরকে ডাকছেন اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সরল পথের দিকে।

৭৪. وَاِنَّ الَّذِيْنَ অথচ যারা لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ পরলোকে অবিশ্বাসী عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ তারা পথ হতে সরে যাচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ - يُؤْتُوْنَ শব্দটি اِيْتَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দেওয়া ও খরচ করা। তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তাফসীর করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে এর এক কেরাত ও يَاْتُوْنَ مَا اَتَوْا বর্ণিত আছে অর্থাৎ যা আমল করার তা আমল কর। এতে দান-খয়রাত, নামাজ, রোজা ও সব সৎকর্ম শামিল হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ কেরাত অনুযায়ী যদিও এখানে দান-খয়রাতেরই আলোচনা হবে, কিন্তু উদ্দেশ্য হবে সাধারণ সৎকর্ম। যেমন এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করলাম যে, এ কাজ করে লোক ভীত-কম্পিত হবে? তারা কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে সিদ্দীক তনয়া, এরূপ নয়; বরং এরা তারা, যারা রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং দান-খয়রাত করে। এতদসত্ত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবত, আমাদের এ কাজ আল্লাহর কাছে (আমাদের কোনো ত্রুটির কারণে) কবুল হবে না। এ ধরনের লোকই সৎকাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মাযহারী) হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আমি এমন লোক দেখেছি, যারা সৎকাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না। -[কুরতুবী]

اُولٰٓئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ – দ্রুত সৎকাজ করার অর্থ এই যে, সাধারণ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা ধর্মীয় উপকারের কাজে তেমনি সচেষ্ট হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের কাজে অন্যদের চাইতে অগ্রগামী থাকে।

غَمْرَةٌ -এর অর্থ এমন গভীর পানি, যাতে মানুষ ডুবে যায় এবং যা প্রবেশকারীকে নিজের মধ্যে গোপন করে নেয়। এ কারণেই غَمْرَةٌ শব্দ আবরণ ও আবৃতকারী বস্তু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে তাদের মুশরিকসুলভ মূর্খতাকে غَمْرَةٌ বলা হয়েছে, যাতে তাদের অন্তর নিমজ্জিত ও আবৃত ছিল এবং কোনোদিক থেকেই আলোর কিরণ পৌঁছাত না।

وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য তো এক শিরক ও কুফরের আবরণই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা এতেই ক্ষান্ত ছিল না অন্যান্য কুকর্মও অনবরত করে যেত।

مُتْرَفِيْهِمْ শব্দটি تَرَف থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ঐশ্বর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া। এখানে কওমকে আজাবে গ্রেফতার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু ঐশ্বর্যশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারাই দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আল্লাহর আজাব যখন আসে, তখন সর্বপ্রথম তারাই অসহায় হয়ে পড়ে। এ আয়াতে তাদেরকে যে আজাবে গ্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে, সে ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এতে সেই আজাব বুঝানো হয়েছে যা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারদের উপর পতিত হয়েছিল। কারো কারো মতে এই আজাব দ্বারা দুর্ভিক্ষের আজাব বোঝানো হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বদদোয়ার কারণে মক্কাবাসীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে, তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রাসূলে কারীম ﷺ কাফেরদের জন্য খুবই কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতন সীমা ছড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দোয়া করেন– اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ (বুখারী, মসলিম, কুরতুবী)

مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سَامِرًا تَهْجُرُوْنَ –অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে بِهٖ শব্দের সর্বনাম হেরেমের দিকে ফেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। হেরেমের সাথে কোরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ এই যে, মক্কার কোরাইশদের আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শুনে মুখ ঘুরিয়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হেরেমের সাথে সম্পর্ক ও তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্ভ ছিল। سَامِرًا শব্দটি سَمَرٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ চাঁদনী রাত। চাঁদনী রাতে বসে গল্প-গুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই سَمَر শব্দটি গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। سَامِرٌ বলা হয় গল্প-গুজবকারীকে। শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার এক কারণ ছিল হেরেমের সাথে সম্পর্ক, তত্ত্বাবধানজনিত অহংকার ও গর্ব। দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্প-গুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি তাদের কোনো ঔৎসুক্য নেই। تَهْجُرُوْنَ শব্দটি هُجْر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও গালি-গালাজ। আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করার এটা তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও গালিগালাজে অভ্যস্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য তারা বলত।

এশার পর গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করা : রাত্রিকালে কিস্‌সা-কাহিনী বলার প্রথা আরব-আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই প্রথা মিটানোর উদ্দেশ্যে এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার পর অনর্থক কিস্‌সা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, এশার নামাজের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামাজ সারাদিনের গোনাহ্সমূহের কাফফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি এশার পর অনর্থক কিস্‌সা-কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমত : এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয়; এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরো বহু রকমের গোনাহ্ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই হযরত ওমর (রা.) এশার পর কাউকে গল্প-গুজবে মত্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন, শীঘ্র নিদ্রা যাও; সম্ভবত শেষরাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফীক হয়ে যাবে। –[কুরতুবী]

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ থেকে اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ পর্যন্ত পাঁচটি এমন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুশরিকদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোনো না কোনো স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত, তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্য ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলোর সবই বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল শত্রুতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। পরবর্তী আয়াতে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে : بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ অর্থাৎ রিসালাত অস্বীকার করার কোনো যুক্তিসঙ্গত ও স্বভাবজাত কারণ তো বর্তমান নেই; এতদসত্ত্বেও তাদের অস্বীকারের কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ করে– শুনতে চায় না। এর কারণ কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং মূর্খদের অনুসরণ। ঈমান ও নবুয়ত স্বীকার করে নেওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে এটিও একটি।

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ –অর্থাৎ তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নবুয়তের দাবি নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন দেশের লোক। তাঁর বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এ নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই; কাজেই তাঁকে নবী ও রাসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়। বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভ্রান্ত কোরাইশ বংশে এ শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র জমানা তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর কোনো কর্ম, কোনো অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুয়ত দাবি করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফের সম্প্রদায় তাঁকে 'সাদিক' ও 'আমীন'- সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করত। তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনোদিন কোনো সন্দেহই করেনি। কাজেই তাদের এ অজুহাতও অচল যে, তারা তাঁকে চেনে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَا اٰتَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনসে মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– যা কিছু দান করার।

يُسَارِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُسَارَعَة মূলবর্ণ (س - ر - ع) জিনস صحيح অর্থ– এরা দ্রুত সাধন করছে।

لَا نُكَلِّفُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْلِيْفٌ মূলবর্ণ (ك - ل - ف) জিনস صحيح অর্থ– আমি কাজ করতে বলি না।

يَنْطِقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نُطْقٌ মূলবর্ণ (ن - ط - ق) জিনস صحيح অর্থ– যা বলে দেবে।

مُتْرَفِيْهِمْ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتْرَافٌ মূলবর্ণ (ت - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– তাদের মধ্যকার ধনী লোকদের।

يَجْئَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার جُؤَارٌ ও جَأْرٌ মূলবর্ণ (ج - أ - ر) জিনস مهموز عين অর্থ– তারা চিৎকার করে উঠবে।

تُتْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আবৃত্তি করে শুনানো হতো।

مُسْتَكْبِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِكْبَارٌ মূলবর্ণ (ك - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– অহংকার করতে করতে।

لَنٰكِبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার نَكْبٌ মূলবর্ণ (ن - ك - ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা সরে যাচ্ছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ : এখানে قَدْ হলো হরফে তাহকীক كَانَتْ এর হলো فعل এবং اٰيٰتِىْ তার ইসম, আর تُتْلٰى الخ পূর্ণ বাক্য হলো كَانَ এর خبر আর عَلَيْكُمْ মুতা'আল্লিক হয়েছে تُتْلٰى-এর সাথে فكنتم-এর فاء হলো আতেফা আর كُنْتُمْ হলো فعل ناقص এবং তার ইসিম, আর عَلٰى اَعْقَابِكُمْ হলো تَنْكِصُوْنَ-এর ফায়েল থেকে حال আর تَنْكِصُوْنَ বাক্যটি كُنْتُمْ এর খবর।

–[ই'রাবুল কুরআন ৫/২১২]

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর যদি আমি তাদের উপর মেহেরবানি করি এবং তাদের যে বিপদ আছে তা দূর করে দেই, তবুও তারা নিজেদের গোমরাহীতে বিভ্রান্ত হয়ে হঠকারিতা করতে থাকবে (এবং বিপদকালের সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভুলে যাবে)।

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. আর আমি তাদেরকে আজাবে আক্রান্ত করেছিলাম, তবুও তারা স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে বিনত হয়নি এবং মিনতিও করেনি।

حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. এমন কি, যখন আমি তাদের উপর ভীষণ আজাবের দ্বার খুলে দেব, সে সময় তারা হতাশ হয়ে পড়বে।

وَهُوَ الَّذِىْۤ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর তিনি (আল্লাহ) এমন, যিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তর সৃষ্টি করেছেন; (কিন্তু) তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

وَهُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে সম্প্রসারিত করেছেন এবং তোমরা তাঁরই সমীপে উপনীত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৫. وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ আর যদি আমি তাদের উপর মেহেরবানি করি وَكَشَفْنَا এবং দূর করে দেই مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ তাদের যে বিপদ আছে তা لَّلَجُّوْا তবুও তারা হঠকারিতা করতে থাকবে فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ নিজেদের গোমরাহীতে বিভ্রান্ত হয়ে।

৭৬. وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ আর আমি তাদেরকে আজাবে আক্রান্ত করেছিলাম فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ তবুও তারা স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে বিনত হয়নি وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ এবং মিনতিও করেনি।

৭৭. حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ এমন কি যখন আমি তাদের উপর খুলে দেব بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ ভীষণ আজাবের দ্বার اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ সে সময় তারা হতাশ হয়ে পড়বে।

৭৮. وَهُوَ الَّذِىْ আর তিনি (আল্লাহ) এমন اَنْشَاَ لَكُمُ যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন السَّمْعَ কর্ণ وَالْاَبْصَارَ ও চক্ষু وَالْاَفْـِٕدَةَ এবং অন্তর قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (কিন্তু) তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

৭৯. وَهُوَ الَّذِىْ আর তিনি এমন ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে সম্প্রসারিত করেছেন وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ এবং তোমরা তাঁরই সমীপে উপনীত হবে।

৮০. আর তিনি এমন, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং রাত্র ও দিবসের হ্রাস-বৃদ্ধি তাঁরই ক্ষমতাধীন; তবুও কি তোমরা বুঝ না?	وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. বরং এরাও অনুরূপ কথাই বলছে যেরূপ পূর্বকালের (কাফের) লোকেরা বলে থাকত।	بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨١﴾
৮২. (অর্থাৎ) তারা বলে যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখন কি পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করা হবে?	قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. আমাদেরকে এবং ইতঃপূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এটা কিছুই নয়, নিছক কল্পকাহিনী– যা পূর্বপুরুষগণ হতে কথিত হয়ে আসছে।	لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاۗؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে, এ জমিন এবং যা তার উপর অবস্থান করছে এগুলো কার? যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে।	قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. তারা অবশ্য (এটাই) বলবে যে, আল্লাহ তা'আলার; (তখন) আপনি বলুন, তবে কেন ভেবে দেখ না?	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۭ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮০. وَهُوَ الَّذِيْ আর তিনি এমন يُحْيٖ وَيُمِيْتُ যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ এবং রাত্র ও দিবসের হ্রাস বৃদ্ধি তাঁরই ক্ষমতাধীন اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবু ও কি তোমরা বুঝ না।

৮১. بَلْ قَالُوْا বরং এরাও অনুরূপ কথাই বলছে مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ যেরূপ পূর্বকালের (কাফের) লোকেরা বলে থাকত।

৮২. قَالُوْا তারা বলে যে ءَاِذَا مِتْنَا যখন আমরা মরে যাব وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ তখন কি পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করা হবে।

৮৩. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে وَاٰبَاؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ এবং ইতঃপূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও اِنْ هٰذَآ এটা কিছুই নয় اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ নিছক কল্পকাহিনী– যা পূর্বপুরুষগণ হতে কথিত হয়ে আসছে।

৮৪. قُلْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ এ জমিন এবং যা তার উপর অবস্থান করছে এগুলো কার اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে।

৮৫. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ তারা অবশ্য বলবে যে, আল্লাহ তা'আলার قُلْ আপনি বলুন اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ তবে কেন ভেবে দেখ না।

৮৬. আপনি (এটাও) জিজ্ঞাসা করুন যে, (বলত) এ সপ্ত আসমানের মালিক কে এবং মহান আরশের অধিপতি কে?	قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾
৮৭. তারা অবশ্য (এটাও) বলবে যে, (এগুলোও) আল্লাহর; আপনি (তখন) বলুন, তবে কেন ভয় করো না।	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۗ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. আপনি (এটাও) জিজ্ঞাসা করুন যে, তিনি কে – যাঁর হাতে সমস্ত বস্তুর আধিপত্য। যিনি আশ্রয় দেন এবং যার বিরুদ্ধে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না, যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে?	قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. তারা অবশ্য (এটাই) বলবে– (এ গুণাবলিও) আল্লাহরই; আপনি বলুন, তবে তোমরা কিরূপে মোহগ্রস্ত হচ্ছ?	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۗ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৬. قُلْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ এ সপ্ত আসমানের মালিক কে وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ এবং মহান আরশের অধিপতি কে?

৮৭. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ তারা অবশ্য বলবে যে, আল্লাহর قُلْ আপনি বলুন اَفَلَا تَتَّقُوْنَ তবে কেন ভয় করো না।

৮৮. قُلْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ তিনি কে যার হাতে সমস্ত বস্তুর আধিপত্য وَّهُوَ يُجِيْرُ এবং যিনি আশ্রয় দেন وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ এবং যাঁর বিরুদ্ধে কেউ কাউকেও আশ্রয় দিতে পারে না اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে।

৮৯. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ তারা অবশ্য বলবে আল্লাহরই قُلْ আপনি বলুন فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ তবে তোমরা কিরূপে মোহগ্রস্থ হচ্ছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ [৭৫]

শানে নুযূল -১ : রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশের জন্য বদদোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি মুযারীদের উপর তোমার শাস্তি দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাদের উপর দুর্ভিক্ষ কতক বছরের জন্য চাপিয়ে দাও। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে যেরূপ ভাবে তুমি সাহায্য করেছিলে। সুতরাং তাদের উপর সাত বৎসরের দুর্ভিক্ষ নেমে আসল। দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতায় তারা রক্তসহ লোম পর্যন্ত আহার করল। অতঃপর আবূ সুফিয়ান রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ ও আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি। আপনাকে আল্লাহ্ বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এমন ধারণা আপনি করেন কী? তারপরও পিতৃ পুরুষদের তরবারি দ্বারা হত্যা করলেন এবং ছোটদেরকে ধ্বংস করলেন দুর্ভিক্ষ দ্বারা। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[জালালাইন টীকা ২৯১/২]

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ [٧٦]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর ও আবূ নাঈম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, ইবনে আছাল আল হানাফী যখন রাসূল ﷺ-এর নিকট বন্দী হয়ে আসলেন, তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ইবনে আছাল ইয়ামামা -এর সাথে মিলে যায়। তৎকালেই মক্কা ও ইয়ামামার মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফলে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতায় কুরাইশরা রক্তসহ লোম পর্যন্ত আহার করে। সুতরাং আবূ সুফিয়ান রাসূল ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল যে, আপনি আপনার সম্পর্কে এমন ধারণা কী করেন নি যে, আপনি জগদ্বাসীর জন্য করুণা স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? রাসূল ﷺ বললেন, হাঁ। আবূ সুফিয়ান বলল, আপনি তো পিতৃপুরুষকে তরবারি দ্বারা হত্যা করলেন আর ছোটদেরকেও ধ্বংস করলেন দুর্ভিক্ষ দ্বারা। সেই দুর্ভিক্ষ কবলিত খোদায়ী শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ৪৯৫/৩, রূহুল মা'আনী ৫৫/১৮/৯, ইবনে কাছীর ২৫৯/৩]

শানে নুযূল –২ : ঘটনাটি তাফসীরে কুরতুবী প্রণেতা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এরূপ ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ছুমামা ইবনে আছাল যখন বন্দী হয়ে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি মক্কা ও মদিনার মধ্যে যোগাযোগ বিঘ্নতার সৃষ্টি করে দিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ্র কসম ইয়ামামা হতে তোমাদের নগরীতে একটি গমের দানাও আসবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আনুমোদন করবেন। এদিকে কুরাইশকে আল্লাহ্ দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার দ্বারা আক্রান্ত করলেন। যার দরুণ তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং রক্তসহ লোম পর্যন্ত ভক্ষণ করেছে। তখন আবূ সুফিয়ান আল্লাহ ও আত্মীয়তার মধ্যস্থতার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে দোয়া প্রার্থনা করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[কুরতুবী : ১২৯/১২]

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আজাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহর কাছে অথবা রাসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আজাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই ওরা আবার নাফরমানিতে মশগুল হয়ে যাবে। এ আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আজাবে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ-এর দোয়ার বরকতে আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহর কাছে নত হয়নি এবং কুফর ও শিরককেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ায় তা দূর হওয়া : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব সওয়ার হওয়ার জন্য দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মদিনায় উপস্থিত হয় এবং বলে, আমি আপনাকে আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি? আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন, নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবূ সুফিয়ান বলল, আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করছেন। আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন, যাতে এ আজাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ আজাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ আয়াত নাজিল হয়।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আজাবে পতিত হওয়া এবং অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল, কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল। –[মাযহারী]

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে আজাব, মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারো সাধ্য নেই যে, তার মোকাবিলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আজাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আজাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আজাব দেবেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَلَجُّوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ ও سَمِعَ মাসদার لِجَاجٌ ও لَجْجٌ মূলবর্ণ (ل - ج - ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তবুও তারা হঠকারিতা করতে থাকবে।

مَا اسْتَكَانُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِكَانَةٌ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বিনত হয়নি।

مَا يَتَضَرَّعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَضَرُّعٌ মূলবর্ণ (ض - ر - ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা মিনতিও করে নি।

مُبْلِسُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبْلَاسٌ মূলবর্ণ (ب - ل - س) জিনস صحيح অর্থ– তারা হতাশ হয়ে পড়বে।

أَنْشَأَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْشَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ش - أ) জিনস مهموز لام অর্থ– তিনি সৃষ্টি করেছেন।

تُحْشَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার حَشْرٌ মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা উপনীত হবে।

لَا يُجَارُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِجَارَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ : এখানে اِنْ হলো نافية আর هٰذَا হলো মুবতাদা আর اِلَّا হলো اداة حصر আর اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ হলো هٰذَا মুবতাদার খবর। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২২১]

বাংলা অনুবাদ	আরবি আয়াত
৯০. বরং আমি তাদের নিকট সত্য কথা পৌঁছিয়েছি, আর নিঃসন্দেহে এরা মিথ্যাবাদী।	بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾
৯১. আল্লাহ তা'আলা কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, আর তাঁর সাথে অন্য কোনো মা'বূদও নেই। যদি থাকত, তবে প্রত্যেক মা'বূদ নিজের সৃষ্টিকে পৃথক করে নিয়ে চলে যেত এবং একে অন্যের উপর চড়াও হতো; অথচ আল্লাহ সে কথা হতে পবিত্র– যা তারা তাঁর সম্বন্ধে বলে থাকে।	مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾
৯২. তিনি সমস্ত গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাতা, মোটকথা, তিনি তাদের শিরক হতে বহু ঊর্ধ্বে।	عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক! তাদেরকে যে (আজাবের) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা যদি আমাকে দেখান।	قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾
৯৪. তবে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে উক্ত অনাচারীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।	رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. আর আমি তাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তা আপনাকেও দেখাতে সক্ষম।	وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾
৯৬. আপনি উত্তম (ও নম্র) ব্যবহার দ্বারা তাদের দুর্ব্যবহারকে প্রতিহত করতে থাকুন; আমি খুব অবগত আছি সে সম্পর্কে যা কিছু এরা (আপনার সম্বন্ধে) বলে থাকে।	اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯০. بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ বরং আমি তাদের নিকট সত্য কথা পৌঁছিয়েছি وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ আর নিঃসন্দেহে এরা মিথ্যাবাদী।

৯১. مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ আল্লাহ তা'আলা কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ আর তাঁর সাথে অন্য কোনো মা'বূদও নেই اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ যদি থাকত, তবে প্রত্যেক মা'বূদ নিজের সৃষ্টিকে পৃথক করে নিয়ে চলে যেত وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ এবং একে অন্যের উপর চড়াও হতো سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ অথচ আল্লাহ সে কথা হতে পবিত্র যা তারা বলে থাকে।

৯২. عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ তিনি সমস্ত গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাতা فَتَعٰلٰى মোটকথা তিনি বহু ঊর্ধ্বে عَمَّا يُشْرِكُوْنَ তাদের শিরক হতে।

৯৩. قُلْ আপনি বলুন رَّبِّ হে আমার প্রতিপালক! اِمَّا تُرِيَنِّيْ তা যদি আমাকে দেখান مَا يُوْعَدُوْنَ তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে

৯৪. رَبِّ তবে হে আমার প্রতিপালক فَلَا تَجْعَلْنِيْ আমাকে অন্তর্ভুক্ত করবেন না فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ উক্ত অনাচারীদের

৯৫. وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ আর আমি তা আপনাকেও দেখাতে مَا نَعِدُهُمْ তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি لَقٰدِرُوْنَ সক্ষম।

৯৬. اِدْفَعْ আপনি প্রতিহত করতে থাকুন بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ উত্তম ব্যবহার দ্বারা السَّيِّئَةَ তাদের দুর্ব্যবহারকে نَحْنُ اَعْلَمُ আমি খুব অবগত আছি بِمَا يَصِفُوْنَ সে সম্পর্কে যা কিছু এরা (আপনার সম্বন্ধে) বলে থাকে।

৯৭. আর আপনি (এভাবে) বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি শয়তানের প্ররোচনা হতে।	وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾
৯৮. এবং হে আমার প্রতিপালক! আমার নিকট তাদের আগমন হতে আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।	وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾
৯৯. এমন কি, যখন তাদের মধ্য হতে কারো মৃত্যু আসন্ন হয়, তখন সে বলতে থাকে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দিন,	حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾
১০০. তা হলে আমি যে স্থান ছেড়ে এসেছি তথায় (গিয়ে) নেক কাজ করব, কখনো না; এটা একটা বাজে কথা মাত্র– যা সে বলছে; আর তাদের সম্মুখে এক অন্তরাল রয়েছে; কিয়ামতের দিন পর্যন্ত।	لَعَلِّیْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾
১০১. অতঃপর যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন তাদের মধ্যকার পারস্পরিক আত্মীয়তা থাকবে না এবং কেউ কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না।	فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَاۤ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾
১০২. অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, এমন সব লোক সফলকাম হবে।	فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. وَقُلْ আর আপনি বলুন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اَعُوْذُ بِكَ আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ শয়তানের প্ররোচনা হতে।

৯৮. وَاَعُوْذُ بِكَ আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি رَبِّ হে আমার প্রকিপালক اَنْ يَّحْضُرُوْنِ আমার নিকট তাদের আগমন হতে।

৯৯. حَتّٰى এমন কি اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ যখন তাদের মধ্য হতে কারো মৃত্যু আসন্ন হয় قَالَ তখন সে বলতে থাকে رَبِّ হে আমার প্রতিপালক ارْجِعُوْنِ আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দিন।

১০০. لَعَلِّیْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا তা হলে আমি তথায় (গিয়ে) নেক কাজ করব فِيْمَا تَرَكْتُ যে স্থান ছেড়ে এসেছি كَلَّا কখনো না اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا এটা একটা বাজে কথা মাত্র যা সে বলছে وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ আর তাদের সম্মুখে এক অন্তরাল রয়েছে اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত।

১০১. فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ অতঃপর যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে فَلَاۤ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ সেদিন তাদের মধ্যকার পারস্পরিক আত্মীয়তা থাকবে না وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ এবং কেউ কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না।

১০২. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এমন সব লোক সফলকাম হবে।

১০৩. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা সে সকল লোক হবে যারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরা করছে এবং অনন্তকাল দোজখে থাকবে।	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾
১০৪. অগ্নি তাদের মুখমণ্ড ঝলসিয়ে দেবে এবং এতে তাদের মুখাকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে।	تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৩. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ তারা সে সকল লোক হবে যারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরা করছে فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ এবং অনন্তকাল দোজখে থাকবে।

১০৪. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল ঝলসিয়ে দেবে وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ এবং এতে তাদের মুখাকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ - رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ -এই দুই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কুরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফেরদের উপর আজাবের ভয় প্রদর্শন উল্লিখিত হয়েছে। কিয়ামতের দিন এই আজাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই, দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এই আজাব দুনিয়াতে হয়, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলের পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তাঁর জমানায় তাঁর চোখের সামনে তাদের উপর কোনো আজাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে যখন কোনো সম্প্রদায়ের উপর কোনো আজাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আজাবের প্রতিক্রিয়া শুধু জালেমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সৎলোকও এর কারণে পার্থিব কষ্টে পতিত হয়। তবে পরকালে তারা কোনো আজাব ভোগ করবে না, বরং এই পার্থিব কষ্টের কারণে তারা ছওয়াবও পাবে। কুরআন পাক বলে : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً অর্থাৎ এমন আজাবকে ভয় কর, যা এসে গেলে শুধু জালেমদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং অন্যরাও এর কবলে পতিত হবে।

তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, হে আল্লাহ! যদি তাদের উপর আপনার আজাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে, তবে আমাকে এই জালেমদের সাথে রাখবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষ্পাপ ছিলেন বিধায় আল্লাহ্‌র আজাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে ছওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন। –[কুরতুবী]।

وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ –অর্থাৎ আমি আপনার সামনেই তাদের উপর আজাব দেখিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের উপর ব্যাপক আজাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ অর্থাৎ আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না। কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আজাব আসা এর পরিপন্থি নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আজাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আজাব এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারির আজাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল।

اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ -অর্থাৎ আপনি মন্দকে উত্তম দ্বারা, জুলুমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দ্বারা প্রতিহত করুন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের পারস্পরিক কাজ কারবারে সর্বদাই

প্রচলিত আছে। জুলুম ও নির্যাতনের জবাবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তাদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জেহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক জেহাদের অবস্থায়ও এই সচ্চরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেমন- কোনো নারীকে হত্যা না করা, শিশুকে হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত, যারা মুসলমানদের মোকাবিলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার নাক, কান ইত্যাদি 'মুছলা' না করা ইত্যাদি। তাই পরবর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শয়তান ও তার প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর পক্ষ থেকে শয়তানের প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার-বিরোধী কোনো কাজ প্রকাশ না পায়। দোয়াটি এই :

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

هَمْزٌ – শব্দের অর্থ প্রতারণা করা, চাপ দেওয়া। পশ্চাদ্দিক আওয়াজ দেওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটা একটা সুদূরপ্রসারী অর্থবহ দোয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে এই দোয়া পড়ার আদেশ করেছেন, যাতে ক্রোধ ও গোস্সার অবস্থায় মানুষ যখন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ছাড়া শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও এ দোয়াটি পরীক্ষিত। হযরত খালেদ (রা.)-এর রাত্রিকালে নিদ্রা আসত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিম্ন বর্ণিত দোয়াটি পাঠ করে শোয়ার আদেশ দিলেন। তিনি পড়া শুরু করলে অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পান। দোয়াটি এই : اَعُوْذُ

بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ.

اَنْ يَّحْضُرُوْنِ -সহীহ্ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন শয়তান সব কাজে সর্বাবস্থায় তোমাদের কাছে আসে এবং সব কাজে অন্তরকে পাপকর্মে প্ররোচিত করতে থাকে। -[কুরতুবী]

এই প্ররোচনা থেকেই আশ্রয় প্রার্থনার জন্য দোয়াটি শেখানো হয়েছে।

رَبِّ ارْجِعُوْنِ –অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন কাফের ব্যক্তি পরকালের আজাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এমন বাসনা প্রকাশ করে- আফসোস, আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সৎকর্ম করে এই আজাব থেকে রেহাই পেতাম। ইবনে জারীর ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামনে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও? সে বলে, আমি দুঃখ-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব? আমাকে এখন আল্লাহর কাছে নিয়ে যাও। কাফেরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে- رَبِّ ارْجِعُوْنِ অর্থাৎ আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. - بَرْزَخٌ -এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয়, তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যুর পর কিয়ামত ও হাশর পর্যন্ত সময় কালকে বরযখ বলা হয়। কারণ এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমা প্রাচীর। আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা এখন আজাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোনো ফায়দা নেই। কারণ সে বরযখে পৌঁছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কিয়ামত ও হাশর-নাশরের পূর্বে পুনর্জীবনও পায় না, এটাই আইন।

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَاۤ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ -কিয়ামতের দিন দু'বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের ফলে জমিন-আসমান ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উত্থিত হবে। কুরআন পাকের ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ আয়াতে একথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকার- এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জুবায়রের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন এবং আতার রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও একথা বর্ণিত আছে

যে, এখানে দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ভাষ্য এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমণ্ডলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষনা করবে, সে অমুকের পুত্র অমুক। যদি কারো কোনো প্রাপ্য তার জিম্মায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার জিম্মায় নিজের কোনো প্রাপ্য আছে দেখলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের জিম্মায় নিজের কোনো প্রাপ্য দেখলে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারো জিম্মায় কারো প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যত ও সচেষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ -বলা হয়েছে। অর্থাৎ তখন পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন কোনো উপকারে আসবে না। কেউ কারো প্রতি রহম করবে না।

প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ অর্থাৎ সেদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই,পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে দূরে পালায়ন করবে।

হাশরে মুমিন ও কাফেরের অবস্থার পার্থক্য : কিন্তু এ আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে মুমিনগণের নয়। কারণ উপরে কাফেরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন বলে যে, أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহ তা'আলা (ঈমানদার হওয়ার শর্তে) তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপসার্ত হবে, তখন যেসব মুসলমান সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তারা জান্নাতের পানি নিয়ে বের হবে। মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে। তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে তালাশ করছি। এ পানি তাদের জন্যই। –[মাযহারী]

এমনিভাবে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (কেউ কারো উপকার করতে পারবে না) আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলেমগণ বলেন, নবী করীম ﷺ-এর বংশের মধ্যে সমগ্র মুসলমান উম্মতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ তিনি উম্মতের পিতা এবং তাঁর পুণ্যময়ী বিবিগণ উম্মতের মাতা। মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে আসবে না, কিন্তু এটা কাফেরদের অবস্থা। মুমিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে।

وَلَا يَتَسَاءَلُونَ –অর্থাৎ পরস্পর কেউ কারো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ অর্থাৎ হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হাশরে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করবে না। এরপর কোনো অবস্থানস্থলে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক হ্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। –[মাযহারী]

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সেই হবে সফলকাম। পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকবে। এ আয়াতে শুধু কামেল মুমিন ও কাফেরদের ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে, এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। কামেল মুমিনদের পাল্লা ভারী হবে এবং তারা সফলকাম হবে। কাফেরদের পাল্লা হাল্কা হবে। ফলে, তাদেরকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে।

কুরআন পাকের অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ স্থলে কামিল মুমিনদের পাল্লা ভারী হওয়ার অর্থ এই যে, অপর পাল্লায় অর্থাৎ গুনাহর পাল্লায় কোনো ওজনই হবে না, তা শূন্য দৃষ্টিগোচর হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের পাল্লা হাল্কা হওয়ার অর্থ এই যে, নেকির পাল্লায় কোনো ওজনই থাকবে না, শূন্যের মতোই হাল্কা হবে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– فَلَا

نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম ওজনই করব না। অবস্থা তো কাফির মু'মিনদের এই ক্ষেত্রে হবে। পক্ষান্তরে যাদের দ্বারা কোনো গুনাহ্ সংঘটিতই হয়নি কিংবা তওবা ইত্যাদির কারণে মার্জনা করা হয়েছে, তাদের গুনাহ্র পাল্লায় কিছুই থাকবে না। অপরদিকে কাফেরদের নেক আমল ও ঈমানের শর্ত বর্তমান না থাকায় পাল্লার ওজন হাল্কা হবে। গুনাহ্গার মুসলমানদের নেকীর পাল্লায়ও আমল থাকবে এবং গুনাহ্র পাল্লায়ও আমল থাকবে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে স্পষ্টত কিছু বলা হয়নি; বরং কুরআন পাক সাধারণত তাদের শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কে নীরবই বলা যায়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কুরআন অবতরণের সময় যেসব মুমিন সাহাবী ছিলেন, তাঁরা সবাই কবিরা গুনাহ্ থেকে পবিত্রই ছিলেন। কারো দ্বারা কোনো গুনাহ্ হয়ে গেলেও তিনি তওবা করেছেন। ফলে মাফ হয়ে গেছে।

কুরআন পাকের خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا আয়াতে এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে, যাদের নেক ও বদ আমল মিশ্র। তাদের সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিয়ামতের দিন যার নেকী গুনাহ্র চাইতে বেশি হবে- এক নেকী পরিমাণ বেশি হলেও সে জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে যার গুনাহ্ নেকীর চাইতে বেশি হবে- এক গুনাহ্ বেশি হলেও সে দোজখে যাবে; কিন্তু এই মু'মিন গুনাহ্গারের দোজখে প্রবেশ পবিত্র করার উদ্দেশ্যে হবে; যেমন লোহা স্বর্ণ ইত্যাদি আগুনে ফেলে ময়লা ও মরিচা দূর করা হয়। দোজখের অগ্নি দ্বারা যখন তার গুনাহ্র মরিচা দূরীকরণ হয়ে যাবে, তখন সে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেন, কিয়ামতের পাল্লা এমন নির্ভুল ওজন করবে যে, তাতে এক সরিষা পরিমাণও এদিকে-সেদিক হলে পাল্লা হয়তো ঝুঁকে পড়বে অথবা উপরে উঠে যাবে। যার নেকী ও গোনাহ্ পাল্লায় সমান সমান হবে, সে আ'রাফে প্রবেশ করবে এবং দোজখ ও জান্নাতের মাঝখানে দ্বিতীয় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। অবশেষে সে-ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। -[মাযহারী]

ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এই উক্তিতে কাফেরদের উল্লেখ নেই, শুধু মু'মিন গুনাহ্গারদের কথা আছে।

আসল ওজনের ব্যবস্থা : কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং মু'মিন ও কাফের ব্যক্তিকে পাল্লায় রেখে ওজন করা হবে। কাফেরের কোনো ওজনই হবে না, সে যত মোটা ও স্থূলদেহই হোক না কেন। -(বুখারী, মুসলিম)

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের আমলনামা ওজন করা হবে। তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান ও হাকিম এই বিষয়বস্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন। আরো কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার ওজনহীন ও দেহহীন আমলসমূহকে হাশরের ময়দানে সাকার অবস্থায় পাল্লায় রাখা হবে এবং ওজন করা হবে। তাবারানী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাষ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যায়। শেষোক্ত উক্তির সমর্থনে আব্দুর রাজ্জাক 'ফযলুল ইলম' গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম নাখয়ী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলসমূহ ওজনের জন্য পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা হাল্কা হবে। এরপর মেঘের ন্যায় এক বস্তু এনে তার নেকীর পাল্লায় রেখে দেওয়া হবে। ফলে, পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তখন সে ব্যক্তিকে বলা হবে, তুমি জান এটা কি? (যার দ্বারা পাল্লা ভারী হয়ে গেছে)। সে বলবে, আমি জানি না। তখন বলা হবে : এটা তোমার ইল্ম, যা তুমি অপরকে শিক্ষা দিতে। যাহাবী ইমরান ইবনে হোসাইন (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন শহীদদের রক্ত এবং আলেমদের কলমের কালি (যদ্বারা তারা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি লিখতেন), পরস্পরে ওজন করা হবে। আলেমদের কালির ওজন শহীদদের রক্তের চাইতেও বেশি হবে। -[মাযহারী]

আমল ওজনের অবস্থা সম্পর্কিত তিন প্রকার রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, স্বয়ং মানুষকে তার সাথে রেখে ওজন করার মধ্যে কোনো অবান্তরতা নেই। তাই তিন প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই।

وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ : অভিধানে এমন ব্যক্তিকে كَالِحٌ বলা হয়, যার ওষ্ঠদ্বয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না। এক ওষ্ঠ উপরে উত্থিত এবং অপর ওষ্ঠ নীচে ঝুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎস আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয়ও তদ্রূপ হবে এবং দাঁত খোলা ও বেরিয়ে থাকা অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَتَيْنٰهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– আমি তাদের নিকট পৌঁছিয়েছি।

لَعَلَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার عُلُوٌّ মূলবর্ণ (ع ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে চড়াও হতো।

يَصِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَصْفٌ মূলবর্ণ (و ـ ص ـ ف) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা বলে থাকে।

تُرِيَنِّى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ معروف بانون ثقيلة مضارع বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– আপনি আমাকে দেখান।

اَعُوْذُ بِكَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার مُعَاذٌ ও عِيَاذٌ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।

يُبْعَثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার بَعْثٌ মূলবর্ণ (ب ـ ع ـ ث) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

ثَقُلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার ثِقَلٌ মূলবর্ণ (ث ـ ق ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– ভারী হবে।

خَفَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خَفٌّ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– হালকা হবে।

تَلْفَحُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার لَفْحٌ মূলবর্ণ (ل ـ ف ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তা ঝলসিয়ে দেবে।

كٰلِحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার كُلُوْحٌ ، كَلَاحٌ মূলবর্ণ (ك ـ ل ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তাদের মুখাকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ : এখানে واو টি استئنافية আর বাক্যটি হলো مستأنفة আবার এটাকে পূর্বের উপর আতফও করা যেতে পারে। আর رَبِّ হলো منادى যা উহ্য ياء متكلم-এর দিকে مضاف হয়েছে اَعُوْذُ হলো ফে'ল ও ফায়েল হলো উহ্য انا আর بِكَ মুতাআল্লিক হলো اَعُوْذُ-এর সাথে এবং مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ বাক্যাংশও মুতাআল্লিক হয়েছে اَعُوْذُ-এর সাথে। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২২৭-২২৮]

১০৫. (বলা হবে) কেন, তোমাদেরকে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হতো না? অথচ তোমরা তাকে মিথ্যা জানতে।	أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদেরকে বেষ্টন করে নিয়েছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছিলাম।	قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾
১০৭. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিন! এরপরও যদি পুনঃ এমন করি, তবে নিশ্চয় আমরা সীমালঙ্ঘনকারী।	رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾
১০৮. আল্লাহ বলবেন, তোমরা এখানেই তিরস্কৃত হয়ে পড়ে থাক এবং আমার সঙ্গে কথা বলো না।	قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾
১০৯. আমার বান্দাদের মধ্যে এক দল ছিল, যারা বলত হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আর আপনিই সর্বাপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী।	إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾
১১০. তখন তোমরা তাদেরকে উপহাসের বস্তু করে রেখেছিলে। এমন কি, এই কৌতুক তোমাদেরকে আমার স্মরণও ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে।	فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৫. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ কেন তোমাদেরকে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হতো না فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ অথচ তোমরা তাকে মিথ্যা জানতে।

১০৬. قَالُوا তারা বলবে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদেরকে বেষ্টন করে নিয়েছিল وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ এবং আমরা পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছিলাম।

১০৭. رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক أَخْرِجْنَا مِنْهَا আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিন فَإِنْ عُدْنَا এরপরও যদি পুনঃ এমন করি فَإِنَّا ظَالِمُونَ তবে নিশ্চয় আমরা সীমালঙ্ঘনকারী।

১০৮. قَالَ আল্লাহ বলবেন اخْسَئُوا فِيهَا তোমরা এখানেই তিরস্কৃত হয়ে পড়ে থাক وَلَا تُكَلِّمُونِ এবং আমার সঙ্গে কথা বলো না।

১০৯. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي আমার বান্দাদের মধ্যে এক দল ছিল يَقُولُونَ যারা বলত رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক آمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি فَاغْفِرْ لَنَا অতএব আমাদেরকে ক্ষমা করুন وَارْحَمْنَا এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ আর আপনিই সর্বাপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী।

১১০. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا তখন তোমরা তাদেরকে উপহাসের বস্তু করে রেখেছিলে حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي এমন কি এই কৌতুক তোমাদেরকে আমার স্মরণও ভুলিয়ে দিয়েছিল وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ এবং তোমরা তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে

আরবি	বাংলা
إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾	১১১. আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের পুরস্কার এই দিলাম যে, তারাই সফলকাম হয়েছে।
قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾	১১২. আল্লাহ বলবেন, তোমরা বৎসরের গণনা-হিসাবে কি পরিমাণ সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলে?
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾	১১৩. তারা বলবে, হয়তো একদিন কিংবা একদিনেরও কম ছিলাম, সুতরাং গণনাকারীগণকে জিজ্ঞাসা করুন।
قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾	১১৪. আল্লাহ বলবেন, তোমরা সামান্য সময়ই ছিলে, কি ভালো হতো যদি তোমরা বুঝতে।
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾	১১৫. তবে কি তোমরা এ ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? আর (এটাও ধারণা করছিলে যে) তোমাদেরকে আমার নিকটে আনা হবে না।
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾	১১৬. অতএব, আল্লাহ তা'আলা অতি উচ্চ মর্যাদাবান, যিনি প্রকৃত বাদশাহ, তিনি ভিন্ন ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১১. إِنِّي جَزَيْتُهُمْ আমি তাদেরকে পুরস্কার এই দিলাম যে الْيَوْمَ আজ بِمَا صَبَرُوا তাদের ধৈর্যের أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ তারাই সফলকাম হয়েছে।

১১২. قَالَ আল্লাহ বলবেন كَمْ لَبِثْتُمْ তোমরা কি পরিমাণ সময় অবস্থান করেছিলে فِي الْأَرْضِ পৃথিবীতে عَدَدَ سِنِينَ বৎসরের গণনা হিসেবে।

১১৩. قَالُوا তারা বলবে لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ হয়তো একদিন কিংবা এক দিনেরও কম ছিলাম فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ সুতরাং গণনাকারীগণ কে জিজ্ঞাসা করুন।

১১৪. قَالَ আল্লাহ বলবেন إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا তোমরা সামান্য সময়ই ছিলে لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ কি ভালো হতো যদি তোমরা বুঝতে।

১১৫. أَفَحَسِبْتُمْ তবে কি তোমরা এ ধারণা করেছিলে যে أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ আর তোমাদেরকে আমার নিকটে আনা হবে না।

১১৬. فَتَعَالَى اللَّهُ অতএব আল্লাহ তা'আলা অতি উচ্চ মর্যাদাবান الْمَلِكُ الْحَقُّ যিনি প্রকৃত বাদশাহ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ তিনি মহান আরশের অধিপতি।

১১৭. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যেরও ইবাদত করে যার পক্ষে তার নিকট কোনোই প্রমাণ নেই, সুতরাং তার প্রতিপালকের সমীপে তার হিসাব-নিকাশ হবে; নিঃসন্দেহে কাফেররা সফলকাম হবে না।	وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾
১১৮. আর আপনি (এ কথা) বলুন যে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে মার্জনা করুন এবং অনুগ্রহ করুন, আর আপনি সকল অনুগ্রহকারী অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী।	وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৭. وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ইবাদত করে اِلٰهًا اٰخَرَ অন্য কোনো উপাস্যেরও لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ যার পক্ষে তার নিকট কোনোই প্রমাণ নেই فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ সুতারাং তার প্রতিপালকের সমীপে তার হিসাব নিকাশ হবে اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ নিঃসন্দেহে কাফেররা সফলকাম হবে না।

১১৮. وَقُلْ আর আপনি বলুন যে رَّبِّ হে আমার প্রতিপালক اغْفِرْ আমাকে মার্জনা করুন وَارْحَمْ এবং অনুগ্রহ করুন وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ আর আপনি সকল অনুগ্রহকারী অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا تُكَلِّمُوْنِ –হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এটা হবে জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা। এরপরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে তারা কারো সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন, কুরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটির জবাব দেওয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির জবাবে وَلَا تُكَلِّمُوْنِ বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর তারা কিছুই বলতে পারেবে না। –[মাযহারী]

সূরা মু'মিনূনের সর্বশেষ আয়াতসমূহ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا থেকে নিয়ে শেষ সূরা পর্যন্ত বিশেষ ফজিলত পূর্ণ। বগভী ও ছা'লাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি জনৈক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কানে এই আয়াতসমূহ পাঠ করলে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্যলাভ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি তার কানে কি পাঠ করেছ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, আমি এই আয়াতগুলো পাঠ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কোনো বিশ্বাসী ব্যক্তি এই আয়াতগুলো পাহাড়ের উপর পাঠ করে দেয়, তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যেতে পারে।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ -এখানে اِغْفِرْ ও اِرْحَمْ উভয়ের مَفْعُوْل তথা কর্মপদ উল্লেখ করা হয়নি অর্থাৎ কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি! এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মাগফেরাতের দোয়া ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কেননা ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ মানবজীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস। উভয়টিই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। –(মাযহারী) রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষ্পাপ ও রহমতপ্রাপ্তই ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে মাগফেরাত ও

রহমতের দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে : প্রকৃতপক্ষে এটা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, তোমাদেরও এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান হওয়া উচিত। –[কুরতুবী]

সূরা মু'মিনূনের সূচনা قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ আয়াত দ্বারা হয়েছিল এবং সমাপ্তি اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ দ্বারা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, ফালাহ্ অর্থাৎ পরিপূর্ণ সফলতা মুমিনগণেরই প্রাপ্য এবং কাফেররা এ থেকে বঞ্চিত।

শাব্দিক অনুবাদ :

غَلَبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার غَلَبَةٌ মূলবর্ণ (غ - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ– তা বেষ্টন করে নিয়েছিল।

ضَآلِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার ضَلَالٌ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পথভ্রষ্ট।

اِخْسَئُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার خَسْأٌ মূলবর্ণ (خ - س - أ) জিনস مهموز لام অর্থ– তোমরা তিরস্কৃত হয়ে পড়ে থাক।

اَنْسَوْكُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْسَاءٌ মূলবর্ণ (ن - س - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।

جَزَيْتُهُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি তাদেরকে পুরস্কার দিলাম।

اَلْفَآئِزُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার فَوْزٌ মূলবর্ণ (ف - و - ز) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা সফলকাম হয়েছে।

اَفَحَسِبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ ও حَسِبَ মাসদার حِسْبَانٌ মূলবর্ণ (ح - س - ب) জিনস صحيح অর্থ– তবে কি তোমরা ধারণা করেছিলে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ : এখানে قَالُوْا হলো ফে'ল ও ফায়েল আর رَبَّنَا হলো منادى مضاف আর غَلَبَتْ হলো ফে'ল আর عَلَيْنَا টা غَلَبَتْ -এর সাথে متعلق হয়েছে আর شِقْوَتُنَا টা غَلَبَتْ এর ফায়েল হয়েছে। وكنا -এর واو টি হলো আতেফা আর كُنَّا হলো كَانَ এবং তার ইসম এবং قَوْمًا হলো كَانَ -এর খবর আর ضَآلِّيْنَ হলো قَوْمًا এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২৩৩]

سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা নূর

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত–৬৪, রুকূ'–৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. এটা একটি সূরা– যা আমিই নাজিল করেছি এবং এটা (-র বিষয়বস্তুগুলো) -কেও আমি নির্ধারিত করেছি এবং আমি এর মধ্যে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যেন তোমরা বুঝতে পার।	سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١﴾
২. ব্যভিচারিণী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে একশত দোররা লাগাবে, এবং আল্লাহ তা'আলার বিধান পালনে তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে কণামাত্র দয়া আসা উচিত নয়, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখ এবং উভয়ের শাস্তি প্রদান কালে মুসলমানদের একদল লোক উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।	اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. سُوْرَةٌ এটা একটি সূরা اَنْزَلْنٰهَا যা আমিই নাজিল করেছি وَفَرَضْنٰهَا এবং এটা (র-বিষয় বস্তুগুলো) কেও আমি নির্ধারিত করেছি وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا এবং আমি এর মধ্যে অবতীর্ণ করেছি اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ যেন তোমরা বুঝতে পার।

২. اَلزَّانِيَةُ ব্যভিচারিণী নারী وَالزَّانِيْ এবং ব্যভিচারী পুরুষ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا তাদের প্রত্যেক কে লাগাবে مِائَةَ جَلْدَةٍ একশত দোররা وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ এবং তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে কণামাত্র দয়া আসা উচিত নয় فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার বিধান পালনে اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ যদি তোমরা ঈমান রাখ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি وَلْيَشْهَدْ এবং উপস্থিত থাকা প্রয়োজন عَذَابَهُمَا উভয়ের শাস্তি প্রদানকালে طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের একদল লোক।

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ز وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾

৩. ব্যভিচারী পুরুষ, ব্যভিচারিণী নারী এবং মুশরিক নারী ভিন্ন কাউকে বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণী নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ ভিন্ন অন্য কেউ বিবাহ করে না, মুসলমানদের উপর এরূপ বিবাহকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤﴾

৪. আর যারা কোনো সতী রমণীকে (জেনার) অপবাদ দেয়, তৎপর প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে এরূপ লোকদেরকে আশি দোররা লাগাবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না, আর তারাই হচ্ছে ফাসেক।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥﴾

৫. কিন্তু যারা তা (অর্থাৎ তুহমত) -এর পর তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্য ক্ষমাকারী, অনুগ্রহশীল।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩. اَلزَّانِىْ ব্যভিচারী পুরুষ لَا يَنْكِحُ বিবাহ করে না اِلَّا زَانِيَةً ব্যভিচারিণী নারী ভিন্ন اَوْ مُشْرِكَةً অথবা মুশরিক নারী وَّالزَّانِيَةُ এবং ব্যভিচারিণী নারীকে لَا يَنْكِحُهَآ বিবাহ করে না اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ ভিন্ন অন্য কেউ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ এরূপ বিবাহকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের উপর।

৪. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ আর যারা কোনো সতী রমণীকে (জেনার) অপবাদ দেয় ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ তৎপর প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً তবে এরূপ লোকদেরকে আশি দোররা লাগাবে وَّلَا تَقْبَلُوْا এবং গ্রহণ করো না لَهُمْ شَهَادَةً তাদের সাক্ষ্য اَبَدًا কখনো وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ আর তারাই হচ্ছে ফাসেক।

৫. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا কিন্তু যারা তওবা করে مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ তা (অর্থাৎ তুহমত) -এর পর وَاَصْلَحُوْا এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্য ক্ষমাকারী رَّحِيْمٌ অনুগ্রহশীল।

৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীগণের প্রতি (জেনার) অপবাদ প্রদান করে এবং তাদের নিকট নিজেদের (দাবি) ব্যতীত অন্য কোনো সাক্ষী না থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য এটাই যে, চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, নিশ্চয় সে সত্যবাদী।	وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٦
৭. এবং পঞ্চমবার বলবে, তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।	وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٧

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ আর যারা নিজেদের স্ত্রীগণের প্রতি (জেনার) অপবাদ প্রদান করে وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ এবং তাদের নিকট অন্য কোনো সাক্ষী না থাকে اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ নিজেদের (দাবি) ব্যতীত فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ তবে তাদের সাক্ষ্য এটাই যে اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ নিশ্চয় সে সত্যবাদী।

৭. وَالْخَامِسَةُ এবং পঞ্চমবার বলবে اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নূরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : এ সূরায় আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ, শাসন-শৃঙ্খলা এবং তাওহীদের বিবরণ স্থান পেয়েছে। চরিত্রের পবিত্রতা অর্জন এবং নৈতিক মান উন্নয়নের উপর এ সূরায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এ সূরা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) কূফাবাসীর নামে একটি ফরমান জারি করেছিলেন। যা নিম্নরূপ– عَلِّمُوْا نِسَآءَكُمْ سُوْرَةَ النُّوْرِ অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দাও, যাতে করে তারা অবহিত হয় যে, চরিত্রের পবিত্রতাই হলো নূর এবং চরিত্রের অপবিত্রতা হলো অন্ধকার।

হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, স্ত্রী লোকদেরকে উঁচু ইমারতে অবস্থান করাবে না, তাদেরকে লেখনী শিক্ষা দেবে না, তাদেরকে সূরা নূর শেখাবে এবং তাদেরকে চরকায় সুতো কাটা শিক্ষা দেবে।

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) ৫/৯৩]

সায়ীদ ইবনে মনসূর, ইবনুল মুনজির, বায়হাকী মুজাহিদ (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পুরুষদেরকে সূরা মায়েদা শেখাও; আর তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নূর শেখাও।

হারেসা ইবনে মেজরাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নিসা, আহযাব এবং সূরা নূর শেখাও। –[রুহুল মা'আনী খ. ১৮, পৃ. ৭৪]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা মু'মিনূন -এর প্রারম্ভে মুমিনগণের গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মুমিনগণের নৈতিক মান উন্নীত থাকে। তারা চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী হয়। কখনো তারা অন্যায়, অসৎ ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয় না, ব্যভিচারের ন্যায় ঘৃণ্য, নিন্দনীয় অসামাজিক কাজ থেকে তারা অনেক দূরে থাকে। আর এমনি গুণাবলির অধিকারী হওয়ার কারণেই তারা হয় জান্নাতুল ফেরদৌসের উত্তরাধিকারী। আর এ সূরার প্রারম্ভে সেসব লোকদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে যারা চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় দেয়, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে মানবতার অবমাননা করে এবং যারা এ পর্যায়ে সীমালঙ্ঘন করে।

যারা এমনি অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তর থেকে নূর দূরীভূত হয়ে যায়। আর যারা অনাচার, ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা করে, তাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, ঐ নূরই কাল কিয়ামতের কঠিন দিনে পুলসিরাত পার হওয়ার ব্যাপারে সাহায্যক হবে। এজন্য হাদীস শরীফে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, পুলসিরাতে পৌঁছার পর মুনাফিকদের নূর বিদায় নেবে, তারা আর পুলসিরাতের পথ দেখবে না। এজন্য মুমিনগণ ভীত সন্ত্রস্ত হবে যেন মুনাফিকদের ন্যায় মুমিনদের নূরও দূরীভূত না হয়। এ কারণেই মুমিনগণ আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের নূরকে পরিপূর্ণ করার জন্য মুনাজাত করে বলে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়– رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর এই নূর কোথায় পাওয়া যায়? এ কথার জবাবও রয়েছে আলোচ্য সূরায়, অর্থাৎ মসজিদসমূহে, আল্লাহ তা'আলার জিকিরের মাধ্যমে তথা তাঁর বন্দেগির মাধ্যমে।

পক্ষান্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয় অন্যায়-অনাচার ও ব্যভিচার এবং জুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে। আর এ নূর হলো হেদায়েতের নূর। এ নূরের প্রাণকেন্দ্র হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন, তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। আর আল্লাহ পাকই আসমান জমিনের নূর।

অতএব, মুমিনগণের নেক আমল হলো নূরানী এবং তার দ্বারা মুমিনের কলব থেকে নূর বিচ্ছুরিত হয় এবং অন্য মানুষের অন্তরও আলোকিত হয়। অন্যদিকে যারা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের থেকে গোমারাহীর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। যারা এ জীবনে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথে চলে, তারাই কাল কিয়ামতের দিন অতি সহজে পুলসিরাত পার হবে। পক্ষান্তরে যারা এ জীবনে অন্যায়-অনাচারে, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে। তারা কাল কিয়ামতের কঠিন দিনে পুলসিরাত পার হতে পারবে না। যদি তওবা করে ক্ষমা লাভ করতে না পারে তবে তাদের জীবন হবে ব্যর্থতায় পর্যবাসিত। এজন্য আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ অর্থাৎ আর যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয় এবং আল্লাহ পাককে ভয় করে, পরহেজগারী অবলম্বন করে, তারাই হবে –[জীবন-সাধনায়] সফলকাম।

আলোচ্য সূরার মূল বক্তব্য : সর্বপ্রথম এ সূরার গুরুত্ব অনুধাবনের ও উপদেশ গ্রহণের তাকিদ করা হয়েছে। এরপর ব্যভিচারের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মুমিন জননী হযরত আয়েশা (রা.)-এর নামে যেসব মুনাফিকরা অপবাদ দিয়েছিল, তাদের শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে। অবশেষে তাওহীদের বিবরণ ও আখেরাতের স্মরণের তাগিদ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

এ সূরার প্রথম আয়াত ভূমিকাস্বরূপ, যা দ্বারা এর বিধানাবলির বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বিধানাবলির মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা সূরার মূল উদ্দেশ্য। সতীত্ব ও তজ্জন্যে দৃষ্টির হেফাজত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারো গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলি পরে বর্ণিত হবে। ব্যভিচার করণটা হলো সতর্কতার এমন সব বাধা ডিঙ্গিয়ে সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমানায় উপনীত হওয়ার এবং আল্লাহর বিধানাবলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর। এ কারণেই ইসলামে মানবিক অপরাধসমূহের যেসব শাস্তি কুরআনে নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি সবচেয়ে কঠোর ও অধিক। ব্যভিচার স্বয়ং একটি বৃহৎ অপরাধ; তদুপরি সে নিজের সাথে আরো শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধ্বংসের আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনাবলি সংঘটিত হয় অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোনো নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই সূরার প্রথমে এই চরম অপরাধ ও নির্লজ্জতা মূলোৎপাটনের জন্য এর শরিয়তানুগ শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ব্যভিচার একটি চরম অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি, তাই শরিয়তে এর শাস্তি সর্ববৃহৎ রাখা হয়েছে : কুরআন পাক ও মুতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের শাস্তি ও তার পন্থা স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোনো বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের উপর তা ন্যস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'হুদূদ' বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধের শাস্তি এভাবে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে, সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে

পারে। এ ধরনের শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'তা'যীরাত' [দণ্ড] বলা হয়। হুদূদ চারটি। যথা– চুরি, কোনো সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান করা এবং ব্যভিচার করা। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই স্ব স্থলে গুরুতর, জগতের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনটি বোধ হয় অন্য কোনো অপরাধে নেই। যেমন–

১. কোনো ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস করার নামান্তর। সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও নিজের সর্বস্ব কুরবানি করা ততটুকু কঠিন নয়, যতটুকু কঠিন তার অন্দর মহলের উপর হাত রাখা। এ কারণেই দুনিয়াতে রোজই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় যে, যাদের অন্দর মহলের উপর হাত রাখা হয়, তারা জীবন পণ করে ব্যভিচারীর প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই প্রতিশোধস্পৃহা বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়।

২. যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারো বংশই সংরক্ষিত থাকে না। জননী, ভগিনী, কন্যা প্রমুখের সাথে বিবাহ হারাম; যখন এসব সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায়, তখন আপন কন্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার সম্ভাবনা আছে, যা ব্যভিচারের চেয়েও কঠোরতর অপরাধ।

৩. চিন্তা করলে দেখা যায় যে, জগতের যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চেয়ে কম কারণ অর্থসম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে না দেয়, সেই আইনই বিশ্ব শান্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। এটা ব্যভিচারের যাবতীয় অনিষ্ট ও অপকারিতা সন্নিবেশিত করা ও বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান নয়। মানব সমাজের জন্যে এর ধ্বংসকারিতা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তিকে অন্যান্য অপরাধের শাস্তির চেয়ে কঠোরতর করেছে। আলোচ্য আয়াতে এই শাস্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে– اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ এতে ব্যভিচারিণী নারীকে অগ্রে এবং ব্যভিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্তি উভয়ের একই। বিধানাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুরুষদেরকে সম্বোধন করে আদেশ দান করা হয়, নারীরাও এতে প্রসঙ্গত অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনই মনে করা হয় না। সমগ্র কুরআনে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا পুংলিঙ্গ পদবাচ্য ব্যবহার করে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নারীদের উল্লেখ করণ ছাড়াই তারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্ভবত এর রহস্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে সঙ্গোপনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের আলোচনার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। তবে এই পদ্ধতি দৃষ্টে কেউ এরূপ সন্দেহ করতে পারত যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট, নারীরা এগুলো থেকে মুক্ত। তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহে স্বতন্ত্রভাবে নারীদের উল্লেখও করে দেওয়া হয়। যেমন– اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ। যে ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের উল্লেখ উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে স্বভাবিক ক্রম এরূপ হয় যে, অগ্রে পুরুষ ও পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে। চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا বলা হয়েছে। এতে চোর পুরুষকে চোর নারীর অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমত নারীর উল্লেখ প্রসঙ্গত রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং সম্পষ্টত উল্লেখকেই উপযুক্ত মনে করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত নারীকে পুরুষের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে; এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। নারী অবলা এবং তাকে স্বভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টত উল্লেখ করা না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সম্ভবত নারী এই শাস্তির আওতাধীন নয়। নারীকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ব্যভিচার একটি নির্লজ্জ কাজ। নারী দ্বারা এটা সংঘটিত হওয়া চরম নির্ভীকতা ও ঔদাসীন্যের ফলেই সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার স্বভাবে মজ্জাগতভাবে লজ্জা ও সতীত্ব সংরক্ষেণের শক্তিশালী প্রেরণা গচ্ছিত রেখেছেন এবং তার হেফাজতের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। কাজেই তার পক্ষ থেকে এ কাজ ঘটা পুরুষের তুলনায় অধিকতর অন্যায়। চোরের অবস্থা তার বিপরীত। পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা উপার্জনের শক্তি দিয়েছেন। তাকে গায়ে খেটে নিজের প্রয়োজনাদি মিটানোর সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এগুলো বাদ দিয়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা পুরুষের জন্য খুবই লজ্জা ও দোষের কথা। নারীর অবস্থা তদ্রূপ নয়। তাই সে চুরি করলে পুরুষের তুলনায় তা লঘু ও স্বল্পতরের অপরাধ হবে।

فَاجْلِدُوْا : جَلْدٌ শব্দের অর্থ চাবুক মারা। শব্দটি جِلْدٌ [চামড়া] থেকে উদ্ভূত। কারণ চাবুক সাধারণত চামড়া দ্বারা তৈরি করা হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন– جَلْدٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই কশাঘাতের

প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌঁছা চাই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ কশাঘাতের শাস্তিকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন যে, চাবুক যেন এত শক্ত না হয় যে, তাতে মাংস পর্যন্ত উপড়ে যায় এবং এমন নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোনো কষ্টই অনুভূত না হয়। এস্থলে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই হাদীসটি সনদ ও ভাষ্যসহ উল্লেখ করেছেন।

একশ কশাঘাতের উল্লিখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা : স্মর্তব্য যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লঘু থেকে গুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে। যেমন– মদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিধান স্বয়ং কুরআনে বর্ণিত আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতদ্বয় এই–

وَاللَّاتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً - وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا.

অর্থাৎ "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন পুরুষকে সাক্ষী আন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করে দেন এবং তোমাদের মধ্যে যে পুরুষ এই অপকর্ম করে তাকে শাস্তি দাও। অতঃপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুলকারী দয়ালু।" এই আয়াতদ্বয়ের পূর্ণ তাফসীর সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তির প্রাথমিক যুগে জনসম্মুখে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য এখানে আয়াতদ্বয়ের পুনরুল্লেখ করা হলো। আয়াতদ্বয়ে প্রথমত ব্যভিচারে প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্য গৃহে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়ের জন্য কষ্ট প্রদান করা উল্লিখিত হয়েছে। এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধান সর্বশেষ বিধান নয়; বরং ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে। আয়াতের اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً অংশের মর্ম তা-ই।

উল্লিখিত শাস্তিতে নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ রাখাকে তখনকার মতো যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং উভয়কে শাস্তি প্রদানের শাস্তিও যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এই শাস্তি ও কষ্ট প্রদানের কোনো বিশেষ আকার, পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা হয়নি; বরং কুরআনের ভাষা থেকে জানা যায় যে, ব্যভিচারের প্রথমিক শাস্তি শুধু 'তা'যীর' তথা দণ্ডবিধির আওতাধীন ছিল। যার পরিমাণ শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি; বরং বিচারক ও শাসনকর্তার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই আয়াতে 'কষ্ট প্রদানের' অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এসব অপরাধীর জন্য অন্য ধরনের শাস্তি প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মন্তব্য করলেন, সূরা নিসায় اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً বলে যে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করবেন, সূরা নূরের এই আয়াত সেই পথ ব্যক্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একশ কশাঘাত করার শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছে। এতদসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একশ কশাঘাতের শাস্তিকে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে বললেন– يَعْنِىْ الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ অর্থাৎ সেই পথ ও ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ এই যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও নারী করলে একশ কশাঘাত করা হবে।

বলাবাহুল্য, সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনোরূপ বিবরণ ছাড়াই ব্যভিচারের শাস্তি একশ কশাঘাত বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা– একথা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কোনো হাদীসের প্রমাণ থেকে জেনে থাকবেন। সেই হাদীসটি সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, সুনানে নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ ওবাদা ইবনে সামেতের রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন কর, আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য সূরা নিসায় প্রতিশ্রুত পথ সূরা নূরে বলে দিয়েছেন। তা এই যে, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা। –[ইবনে কাছীর]

সূরা নূরে উল্লিখিত অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি একশ কশাঘাতের সাথে এই হাদীসে একটি বাড়তি সাজা উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, পুরুষকে এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। দেশান্তরিত করার এই শাস্তি পুরুষের জন্য একশ কশাঘাতের ন্যায় অপরিহার্য, নাকি বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল যে, তিনি প্রয়োজনবোধ করলে এক বছরের জন্য দেশান্তরিতও করে দেবেন? এই ব্যাপারে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযম (র.)-এর মতে শেষোক্ত মতই নির্ভুল। অর্থাৎ বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত এই হাদীসে 'বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা, এর আগে একশ' কশাঘাতের শাস্তিও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের কার্যপ্রণালী থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, উভয় প্রকার শাস্তি একত্র হবে না। বিবাহিতকে শুধু প্রস্তরাঘাতে হত্যাই করা হবে। এই হাদীসে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا আয়াতের তাফসীর করেছেন। সূরা নূরের আয়াতে একশ কশাঘাত সংক্রান্ত বিধৃত তাফসীরে কতিপয় অতিরিক্ত বিষয়ও সংযুক্ত হয়েছে। ১. একশ কশাঘাতের শাস্তি অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া। ২. এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা এবং ৩. বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধান। বলাবাহুল্য, সূরা নূরের আয়াতের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বিষয়ের বাড়তি সংযোজন করেছেন, এগুলোও আল্লাহর ওহী ও আল্লাহর আদেশ বলেই ছিল। কারণ কুরআনে বলা হয়েছে– إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ; পয়গম্বর ও তাঁর কাছ থেকে যারা সরাসরি শোনে, তাদের পক্ষে পঠিত ওহী অর্থাৎ কুরআন ও অপঠিত ওহী অর্থাৎ হাদীস উভয়ই সমান। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের বিপুল সমাবেশের সামনে এই বিধান কার্যে পরিণত করেছেন। মা'য়েয ও গামেদিয়ার উপর তিনি প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান জারি করেছেন, যা সব হাদীসগ্রন্থে সহীহ সনদসহ বর্ণিত আছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালেদ জোহানীর রেওয়ায়েতে আছে জনৈকা বিবাহিতা মহিলার সাথে তার অবিবাহিত চাকর ব্যভিচার করে। ব্যভিচারীর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঘটনা প্রমাণিত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী করব। অতঃপর তিনি আদেশ দিলেন যে, ব্যভিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশ কশাঘাত কর। তিনি বিবাহিত মহিলাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার জন্য হযরত উনায়েসকে আদেশ দিলেন। উনায়েস নিজে মহিলার জবানবন্দি নিলে সেও স্বীকারোক্তি করল। তখন তার উপর প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান প্রয়োগ করা হলো। –[ইবনে কাছীর]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ একজনকে একশ কশাঘাত এবং অপরজনকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি দিয়েছেন। তিনি উভয় শাস্তিকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা বলেছেন। অথচ সূরা নূরের আয়াতে শুধু একশ কশাঘাতের শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে; প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি উল্লিখিত নেই। কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওহীর মাধ্যমে এ আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা পুরোপুরি বলে দিয়েছিলেন। কাজেই এ তাফসীর আল্লাহর কিতাবেরই অনুরূপ; যদিও তার কিছু অংশ আল্লাহর কিতাবে উল্লিখিত ও পঠিত নেই। বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর ভাষণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়তে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিমের ভাষ্য নিম্নরূপ–

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ أيَةَ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشٰى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِهِ فَرِيْضَةً أَنْزَلَهَا اللّٰهُ وَأَنَّ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنَا إِذَا حَصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الْاِعْتِرَافُ.

অর্থাৎ হযরত ওমর ফারুক (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাজিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয় অবতীর্ণ হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশঙ্কা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ যেন একথা বলতে শুরু না করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ তা'আলার কিতাবে পাই নাই। ফলে সে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারনে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন।

মনে রেখ! প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ তা'আলার কিতাবে রয়েছে– একথা সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি তা প্রযোজ্য; যদি ব্যভিচারের শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। –[মুসলিম খ. ২, পৃ. ৬৫]

এই রেওয়ায়েত সহীহ বুখারীতে আরো বিস্তারিত বর্ণিত আছে : [বুখারী. ২, পৃ. ১০০৯] নাসায়ীতে এই রেওয়ায়েতের ভাষ্য নিম্নরূপ–

اِنَّا لَانَجِدُ مِنَ الرَّجْمِ بُدًّا فَانَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ اَلَا وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا اَنْ يَقُوْلَ قَائِلُوْنَ اِنَّ عُمَرَ زَادَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا لَيْسَ فِيْهِ لَكَتَبْتُ فِىْ نَاحِيَةِ الْمُصْحَفِ وَشَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.

অর্থাৎ 'শরিয়তের দিক দিয়ে আমরা ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে বাধ্য। কেননা এটা আল্লাহর অন্যতম হদ। মনে রেখ, রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন এবং আমরা তাঁর পরেও রজম করেছি। যদি এরূপ আশঙ্কা না থাকত যে, লোকে বলবে, ওমর আল্লাহর কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন, তবে আমি কুরআনের এক প্রান্তে এটা লিখে দিতাম। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং অমুক অমুক সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরা রজম করেছি।" –[ইবনে কাছীর]

হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর এই ভাষণ থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, সূরা নূরের আয়াত ছাড়া রজম সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত আছে কিন্তু হযরত ওমর (রা.) সেই আয়াতের ভাষ্য প্রকাশ করেননি। তিনি একথাও বলেননি যে, সেই স্বতন্ত্র আয়াতটি কুরআনে কেন নেই এবং তা পঠিত হয় না কেন? তিনি শুধু বলেছেন, আমি আল্লাহর কিতাবে সংযোজন করেছি এই মর্মে দোষারোপের আশঙ্কা না থাকলে আমি আয়াতটি কুরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম। –[নাসায়ী]

এ রেওয়ায়েতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সেটা যদি বাস্তবিকই কুরআনের আয়াত হয় এবং পাঠ করা ওয়াজিব হয় তবে হযরত ওমর (রা.) মানুষের নিন্দাবাদের ভয়ে একে কিরূপে ছেড়ে দিলেন, অথচ ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এখানে আরো প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত ওমর (রা.) একথা বলেননি যে, আমি এ আয়াতকে কুরআনের দাখিল করে দিতাম; বরং বলেছেন, আমি একে কুরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম।

এসব বিষয় ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত ওমর (রা.) সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতের যে তাফসীর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছিলেন, যাতে তিনি একশ কশাঘাত করার বিধান অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং বিবাহিতের জন্য রজমের বিধান দিয়েছিলেন, সেই তাফসীরকে এবং তদনুযায়ী রাসূল ﷺ -এর কার্যপ্রণালিকে তিনি আল্লাহর কিতাব ও কিতাবের আয়াত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর মর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তাফসীর ও বিবরণ কিতাবের হুকুম রাখে, স্বতন্ত্র আয়াত নয়। নতুবা এই পরিত্যক্ত আয়াতকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে কোনো শক্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারত না। প্রান্তে লিখে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশও এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সেটা স্বতন্ত্র কোনো আয়াত নয়; বরং সূরা নূরের আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এ স্থলে স্বতন্ত্র আয়াত বলা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েত সনদ ও প্রমাণের দিক দিয়ে এরূপ নয় যে, এগুলোর ভিত্তিতে কুরআনে একে সংযুক্ত করা যায়। ফিকহবিদগণ একে 'তেলাওয়াত মনসূখ, বিধান মনসূখ নয়' -এর দৃষ্টান্তে পেশ করেছেন। এটা নিছক দৃষ্টান্তই মাত্র। এতে প্রকৃতপক্ষে এর কুরআনী আয়াত হওয়া প্রমাণিত হয় না। সারকথা এই যে, সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষের একশ কশাঘাতের শাস্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাখ্যা ও তাফসীরের ভিত্তিতে অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিতদের শাস্তি রজম। এই বিবরণ আয়াতে উল্লিখিত না থাকলেও যে পবিত্র সত্তার প্রতি আয়াত নাজিল হয়েছিল, তাঁর পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত আছে, শুধু মৌখিক শিক্ষাই নয়; বরং সাহাবায়ে কেরামের সামনে একাধিকবার বাস্তবায়নও প্রমাণিত রয়েছে। এ প্রমাণ আমাদের নিকট পর্যন্ত 'তাওয়াতুর' তথা সন্দেহাতীত বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে পৌঁছেছে। তাই বিবাহিত পুরুষ ও নারীর এই বিধান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাবের বিধান। একথাও বলা যায় যে, রজমের শাস্তি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত। হযরত আলী (রা.) থেকে একথাই বর্ণিত আছে। উভয় বক্তব্যের সারমর্মই একরূপ।

জরুরি জ্ঞাতব্য : এ স্থলে বিবাহিত ও অবিবাহিত শব্দগুলো শুধু সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। আসলে 'মুহসিন' ও 'গায়রে মুহসিন' অথবা 'সাইয়েব' ও 'বিকর' শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। শরিয়তের পরিভাষায় মুহসিন এমন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই অর্থ বুঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে অনুবাদে শুধু বিবাহিত বলা হয়।

ব্যভিচারের শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিন স্তর : উপরিউক্ত রেওয়ায়েত ও কুরআনী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে; প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি লঘু রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে। এই বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের বিধান সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ' করে চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় স্তরের বিধান রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লিখিত আয়াত নাজিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ' বেত্রাঘাত করতে হবে; কিন্তু বিবাহিতদের শাস্তি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

ইসলামি আইনের কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্যে শর্তাবলিও কড়া রাখা হয়েছে : উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর। এতদসঙ্গে ইসলামি আইনে এ অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলিও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে, যাতে সামান্যও ত্রুটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শাস্তি হদ মাফ হয়ে অপরাধ অনুযায়ী শুধু দণ্ডমূলক শাস্তি অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুই জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুই জন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ব্যভিচারের হদ জারি করার জন্য চার জন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য জরুরি; যেমন সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্যে দ্বিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরি কোনো শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিস্তার নেই। ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের উপর 'হদ্দে কযফ' জারি করা হবে; অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোনো ব্যক্তি এই সাক্ষ্যদানে অগ্রসর হবে না। যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ না থাকে, কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা দুই জন পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাদের অপরাধের অনুপাতে দণ্ডমূলক শাস্তি বেত্রাঘাত ইত্যাদি জারি করতে পারেন।

পুরুষ কোনো পুরুষের সাথে অথবা জন্তুর সাথে অপকর্ম করলে তা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এবং এর শাস্তিও ব্যভিচারের শাস্তি কিনা, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা নিসার তাফসীরে করা হয়েছে। তা এই যে, অভিধানে ও পরিভাষায় যদিও একে ব্যভিচার বলা হয় না, তাই হদ প্রযোজ্য নয়; কিন্তু এর শাস্তিও কঠোরতায় ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে কম নয়। সাহাবায়ে কেরাম এরূপ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার শাস্তি দিয়েছেন।

اَلزَّانِیْ لَا یَنْکِحُ اِلَّا زَانِیَۃً اَوْ مُشْرِکَۃً ۫ وَّالزَّانِیَۃُ لَا یَنْکِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِکٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ [৩]

শানে নুযূল -১ : আলোচ্য আয়াত সুফ্ফা বাসীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহ হচ্ছে যে, সুফ্ফা বাসীরা সকলেই ছিলেন মক্কা হতে মদিনায় হিজরতকারী মুহাজিরগণ। মদিনায় তাদের কোনো ঘর বাড়ি ছিল না। ছিল না কোনো নিকট আত্মীয় আপনজন; সুতরাং তাঁরা মসজিদের বারান্দায় অবস্থান করেন। তারা ছিলেন ৪০০ শত পুরুষ। দিনভর তারা রিজিকের সন্ধান করে রাতে সুফ্ফায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। এহেন পরিস্থিতে মদিনায় প্রকাশ্যভাবে ইহুদি পতিতারা ছিল। যারা খাদ্য ও পরিধেয় উৎপাদন কারিণী ছিল। তখন সুফ্ফাবাসীরা তাদেরকে বিবাহ করে তাদের ঘর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করার মতো জল্পনা কল্পনা করছিলেন। তাহলে তাদের খাদ্য ও পানীয় তারাই বহন করবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে এহেন অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রেখে সুফ্ফা বাসীদের এ ধরনের জল্পনা কল্পনা করা থেকেও পবিত্র রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। বলাবাহুল্য সুফ্ফাবাসীদের পক্ষে এমন জল্পনা কল্পনা করাও শোভনীয় নয়। এর সূত্র ধরে এ অভিমতটি সঠিক নয় বললেও মতামত রয়েছে। পক্ষান্তরে তা সঠিক হলেও দোষের কোনো কারণ নেই, কারণ সেখানে সুফ্ফাবাসীদের নিকট ইহুদি পতিতাদের পক্ষ থেকে একটি চক্রান্ত ছিল। তারা মুসলমানদেরকে ভরণ পোষণের প্রলোভন দিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সুফ্ফাবাসী আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন; আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে তাঁদের কর্ম পন্থাকে নির্ধারণ করে দিলেন।

শানে নুযূল - ২ : অপর এক বর্ণনা মতে মদিনায় উম্মুল মাহযুল নাম্নী এক দেহ ব্যবসায়িনী মহিলা ছিল, একজন মুসলমানকে সে নিজে ভরণ পোষণ করার শর্তে তাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব প্রদান করে। মুসলমান তাকে কোনো সম্মতি প্রদান না করেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে অনুমতি চান। রাসূল ﷺ জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল : ৩. আবূ দাউদ তিরমিযী, হাকেম, বায়হাকী ও ইবনে মুনযির আমর ইবনে শুআইব-তাঁর পিতা-দাদার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মারছাদ ইবনে আবী মারছাদ নামে একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি মক্কা থেকে কয়েদীদেরকে

গোপনে বহন করে এনে মদিনায় পৌঁছিয়ে দিতেন। তৎকালে মক্কায় দেহ ব্যবসায়ী উন্নাক নাম্মী এক মহিলা ছিল, সে ছিল অত্যন্ত রূপসী ও সুন্দরী। সে মহিলাটি মারছাদ বিন আবী মারছাদের জাহেলী যুগের প্রেমিকা ছিল। তাঁর সাথে মক্কা থেকে অপর এক কয়েদীকে উঠিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। তিনি বলেন যে, আমি প্রতিশ্রুতি পালনের উদ্দেশ্যে চাঁদনী রাতে মক্কার কোনো এক বিল্ডিং এর ছাদের নিচে গিয়ে পৌঁছলাম, সে মুহূর্তে উন্নাক নাম্মী মহিলাটি ছায়া দেখে সামনে এগিয়ে এসে আমাকে চিনে ফেলে। সুতরাং সে বলে উঠল তুমি কি মারছাদ? আমি বললাম হাঁ! সে বলল ধন্যবাদ তোমার আগমন শুভ হোক! আস আজ আমার নিকট রাত যাপন করবে। আমি জবাবে বললাম, হে উন্নাক! আল্লাহ জেনা-ব্যভিচার হারাম করে দিয়েছেন। সে মহিলাটি চিৎকার করে বলল! হে তাবু বাসীরা! তোমাদের বন্দিকে যে উঠিয়ে নেয়, সে এসেছে। তখন আট জন মানুষ আমার পিছু তাড়া করে। আমি সমানে গিয়ে কোনো এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তারা আমার পিছু তাড়া করে আমার মাথার উপর দাড়িয়ে পেশাব করেছে, সে পেশাব আমার মাথায় পড়ল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি দেখা থেকে তাদের দৃষ্টি শক্তি লোপ করে দিলেন। ফলে তারা আমাকে দেখতে না পেয়ে ফিরে চলে গেল। আমিও তাদের পিছনে ফিরে গিয়ে যার সাথে আমার প্রতিশ্রুতি ছিল, তাকে নিয়ে মদিনায় পৌঁছলাম। অতঃপর রাসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! উন্নাককে বিবাহ করতে পারি কি? রাসূল ﷺ কোনো প্রকারের উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এমন পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, হে মারছাদ! الزانى لاينكح সুতরাং তুমি তাকে বিবাহ করবেনা। –[রূহুল মা'আনী ৮৫/১৮-৯; কুরতুবী ১৫১/১২; দুররে মানছুর ১৯-২০/৫; ফাতহুল কাদীর ৬/৪; ইবনে কাছীর ২৮১/৩; তাবারী ২৬১/৯]

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ. [٤]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত অপবাদ রটনাকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সাঈদ ইবনে জুবায়ের বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) সম্পর্কে যে অপবাদ রটনা করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। আবার কারো মতে আলোচ্য আয়াত কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে নাজিল হয়নি বরং সকল অপবাদ রটনা করার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী ১৫৪/০২]

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ. (٦)

শানে নুযূল : বুখারী, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হেলাল ইবনে উমাইয়া রাসূল ﷺ -এর নিকট তার স্ত্রী শরীক ইবনে সামহা -এর সাথে জেনা করেছে বলে দোষারোপ করে। রাসূল ﷺ বললেন, প্রমাণ পেশ কর, নতুবা হদ্দ আসবে তোমার পিঠে। যদি কোনো ব্যক্তি নিজ চোখে তার স্ত্রীর উপর অন্য কোনো পুরুষকে দেখতে পায়, তারপরও কি তাকে প্রমাণ খুজতে হবে? তখনও রাসূল ﷺ বলতে লাগলেন প্রমাণ পেশ কর নতুবা হদ্দ তোমার উপর আসবে। অতঃপর হেলাল বললেন, যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, সে আল্লাহর কসম আমি সত্য বলেছি নিশ্চিত। আল্লাহ অবশ্যই এমন কিছু অবতীর্ণ করবেন যার বদৌলতে আমি হদ্দ হতে রেহাই পাব । সে মুহূর্তেই হযরত জিবরাঈল আমীন আলোচ্য আয়াত إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ পর্যন্ত নিয়ে অবতরণ করেন।

–[ফাতহুল কাদীর ১০/৪, কুরতুবী ১৬৪/১২, দুররে মানছুর ২২/৫]

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ –ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বিধায় শাস্তি প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেওয়ার কিংবা হ্রাস করার সম্ভাবনা আছে। তাই সাথে সাথে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকরকরণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া, অনুকম্পা ও ক্ষমা সর্বত্র প্রশংসনীয়; কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র মানবজাতির প্রতি নির্দয় হওয়া। তাই এটা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ –অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার সময় মুসলমানদের একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামে সব শাস্তি বিশেষত হুদূদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে একদল লোককে উপস্থিত থাকার আদেশ দান ব্যভিচারের শাস্তির বৈশিষ্ট্য।

ইসলামে প্রথম পর্যায়ে অপরাধ গোপন রাখার বিধান আছে, কিন্তু সাক্ষ-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেলে অপরাধীদের পূর্ণ লাঞ্ছনা ও সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা :

অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ-কারবার দমনের জন্যে ইসলামি শরিয়ত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। মেয়েদের জন্য পর্দা অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অলংকারের শব্দ ও নারীকণ্ঠের গানের শব্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এটা নির্লজ্জ কাজে উৎসাহ যোগায়। সাথে সাথে যার মধ্যে এসব ব্যাপারে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাকে একান্তে বোঝাবার আদেশ আছে; কিন্তু লাঞ্ছিত করার অনুমতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি শরিয়ত আরোপিত সাবধানতাসমূহ ডিঙ্গিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তার অপরাধ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তদবস্থায় তার অপরাধ গোপন রাখা অন্যদের সাহস বাড়ানোর কারণ হতে পারে। তাই এ পর্যন্ত অপরাধ গোপন রাখার জন্য শরিয়ত যতটুকু যত্নবান ছিল, এখন অপরাধীর জনসমক্ষে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্যও ততটুকুই যত্নবান। এ কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি শুধু প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুসলমানদের একটি দলকে তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশ গ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান : পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত প্রথম বিধান ছিল ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত। এই দ্বিতীয় বিধান ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সাথে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহেরও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ। আয়াতের সূচনাভাগে শরিয়তের কোনো বিধান নয়; বরং একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যভিচার একটি অপকর্ম এবং এর অনিষ্ট সুদূরপ্রসারী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ব্যভিচার একটি চারিত্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে যায়। ভালোমন্দের পার্থক্য লোপ পায় এবং দুশ্চরিত্রতাই বদ্ধমূল হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোক ব্যভিচার ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশ্যেই কোনো নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপারগ অবস্থায় বিবাহ করতে সম্মত হয়; কিন্তু সে মনে-প্রাণে বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে সৎ ও পবিত্র জীবনযাপন করা এবং সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়া। এর জন্য স্ত্রীর আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও অন্যান্য অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিত্রভ্রষ্ট লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ বিপদ মনে করে। যেহেতু বিবাহ এ ধরনের লোকের উদ্দেশ্যই থাকে না, তাই তাদের আগ্রহ শুধু মুসলমান নারীদের প্রতিই নয়; বরং মুশরিকা নারীদের প্রতিও থাকে। মুশরিকা নারী যদি তার ধর্মের খাতিরে কিংবা কোনো সামাজিক প্রথার কারণে বিবাহের শর্ত আরোপ করে, তবে বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। এ বিবাহ হালাল ও শুদ্ধ কি না অথবা শরিয়ত মতে বাতিল হবে কি না, সেদিকে তারা বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করে না। কাজেই এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোকদের বেলায় একথা সত্য যে, তারা যে নারীকে পছন্দ করবে, সে মুসলমান হলে ব্যভিচারিণী হবে– পূর্বে থেকে ব্যভিচারে অভ্যস্ত হোক কিংবা তাদের সাথে ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণী কথিত হোক। অথবা তারা কোনো মুশরিকা নারীকে পছন্দ করবে, যাকে বিবাহ করাই ব্যভিচারের নামান্তর। এ হচ্ছে আয়াতের প্রথম বাক্যের অর্থ। অর্থাৎ
اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً

এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোনো প্রকৃত মুমিন-মুসলমানের আগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ মুমিন-মুসলমানের আসল লক্ষ্য হলো বিবাহ এবং বিবাহের শরিয়তসম্মত উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জন। এরূপ নারী দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জন আশা করা যায় না; বিশেষত যখন একথাও জানা থাকে যে, এই নারী বিবাহের পরও ব্যভিচারের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করবে না। হাঁ, এরূপ নারীকে কোনো ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা-বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। যদি এই ব্যভিচারিণী নারী কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে তার সাথে মিলনের জন্য বিবাহের শর্ত আরোপ করে; তবে অনিচ্ছা সহকারে বিবাহেও সম্মত হয়ে যায়। অথবা এরূপ নারীকে বিবাহ করতে কোনো মুশরিক সম্মত হবে। যেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের নামান্তর, তাই এতে দু'টি বিষয়ের সমাবেশ হবে। অর্থাৎ সে মুশরিকও এবং ব্যভিচারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ; অর্থাৎ
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ

উল্লিখিত তাফসীর থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে এমন পুরুষ ও নারীকে বোঝানো হয়েছে, যারা তওবা করে না এবং বদভ্যাসে অটল থাকে। যদি তাদের মধ্যে কোনো পুরুষ ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্ততি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করে কিংবা কোনো ব্যভিচারিণী নারী কোনো সৎ পুরুষকে বিবাহ করে, তবে

আয়াত দ্বারা এরূপ বিবাহের অশুদ্ধতা বোঝা যায় না। শরিয়ত মতে এরূপ বিবাহ শুদ্ধ হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী (র.) প্রমুখ বিশিষ্ট ফিকহবিদগণের মাজহাব তাই। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ বিবাহ ঘটানোর ঘটনাবলি প্রমাণিত আছে। তাফসীরে ইবনে কাছীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এমন ফতোয়াই বর্ণিত আছে। وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতের এই শেষ বাক্যে কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে ذٰلِكَ বলে জেনা তথা ব্যভিচারের দিকে ইশারা করা হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই যে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম, তাই মুমিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। এই তাফসীরে অর্থের দিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ذٰلِكَ শব্দ দ্বারা ব্যভিচার বোঝানো আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিহীন। তাই অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, ذٰلِكَ দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিকা নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ও একমত। এ ছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যভিচারিণী নারীর সাথে সৎ পুরুষের বিবাহ অবৈধ বলেও এ বাক্য থেকে জানা যায়। এই অবৈধতা বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সৎ পুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যভিচারে বাধা না দেয়; বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে। কেননা এমতাবস্থায় এটা হবে দায়ুসী (ভেড়ুয়াপনা) যা শরিয়তে হারাম। এমনিভাবে কোনো সম্ভ্রান্ত সতী নারী যদি কোনো ব্যভিচারে অভ্যস্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে, তবে তা হারাম ও কবীরা গোনাহ্। কিন্তু এতে তাদের পারস্পরিক বিবাহ অশুদ্ধ কিংবা বাতিল হওয়া জরুরি নয়। শরিয়তের পরিভাষায় হারাম শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) কাজটি গোনাহ্। যে তা করে, সে পরকালে শাস্তিযোগ্য এবং ইহকালেও বাতিল বলে গণ্য। কোনো পার্থিব বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য নয়; যেমন কোনো মুশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা। এরূপ বিবাহ কবীরা গোনাহ্ এবং শরিয়তে অস্তিত্বহীন। ব্যভিচার ও এর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। (দুই) কাজটি হারাম। অর্থাৎ, শাস্তিযোগ্য গোনাহ্, কিন্তু দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফল প্রকাশ পায় ও শুদ্ধ হয়; যেমন কোনো নারীকে ধোঁকা দিয়ে অথবা অপহরণ করে এনে শরিয়তানুযায়ী দু'জন সাক্ষীর সামনে তার সম্মতিক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অবৈধ ও গোনাহ্ হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং সন্তানরা পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে এবং কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে বিবাহ করেও ব্যভিচার থেকে তওবা না করে, তবে তাদের এই বিবাহ হারাম, কিন্তু পার্থিব বিধানে বাতিল ও অস্তিত্বহীন নয়। বিবাহের শরিয়তারোপিতা ফলাফল– যেমন ভরণ-পোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার স্বত্ব ইত্যাদি সব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। এভাবে وَحُرِّمَ শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে বিশুদ্ধ ও সঠিক। কোনো কোনো তাফসীরকার আয়াতটিকে মানসূখ তথা রহিত বলেন, কিন্তু বর্ণিত তাফসীর অনুযায়ী আয়াতটিকে মানসূখ বলার প্রয়োজন নেই।

ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান– মিথ্যা অপবাদ একটি অপরাধ এবং তার হদ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও কলুষিত করে। তাই শরিয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চাইতে বেশি কঠোর রেখেছে। এক্ষণে কেউ যাতে কোনো পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবি। শরিয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য জরুরি। এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারো প্রতি প্রকাশ্য ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরিয়ত এই অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোনো ব্যক্তি কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে আরো তিন জন পুরুষও অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা যদি অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চার জনের চাইতে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শাস্তির ঝুঁকি নেওয়া কোনো অবস্থাতেই পছন্দ করবে না।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : এখানে কেউ বলতে পারে যে, ব্যভিচারের সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে এত কড়া শর্ত আরোপ করার ফলে অপরাধীরা নাগালের বাইরে চলে যাবে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস করবে না এবং কোনো সময় শরিয়তসম্মত প্রমাণ উপস্থিত হবে না। ফলে এ ধরনের অপরাধী কখনো শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু বাস্তবে এ ধারণা ভ্রান্ত। কেননা, এসব শর্ত হচ্ছে ব্যভিচারের হদ অর্থাৎ একশ বেত্রাঘাত অথবা রজমের শাস্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুইজন

পারবে মাহরাম পুরুষ ও নারীকে একত্রে আপত্তিকর অবস্থায় অথবা নির্লজ্জ কথাবার্তা বলা অবস্থায় দেখে এ-ধরনের সাক্ষ্যদানের উপর কোনো শর্ত আরোপিত নেই। এ ধরনের যেসব বিষয় ব্যভিচারের ভূমিকা, সেগুলোও শরিয়তের আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে এ ক্ষেত্রে হদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না; বরং বিচারক অথবা শাসনকর্তার বিবেচনা অনুযায়ী বেত্রাঘাতের শাস্তি দেওয়া হবে। কাজেই যে ব্যক্তি দুইজন পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখবে, অন্য সাক্ষী না থাকলে সে প্রকাশ্য ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেবে না; কিন্তু অবাধ মেলামেশার সাক্ষ্য দিতে পারবে এবং বিচারক অপরাধ প্রমাণিত হলে তাদেরকে দণ্ডমূলক শাস্তি দিতে পারবে।

মুহসিনাত কারা : مُحْصَنَاتٌ শব্দটি اِحْصَانٌ থেকে উদ্ভূত। শরিয়তের পরিভাষায় اِحْصَانٌ দুই প্রকার। একটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অপরটি অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। اِحْصَانٌ এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং শরিয়তসম্মত পন্থায় কোনো নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরূপ ব্যক্তির প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য اِحْصَانٌ এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে, সৎ হতে হবে অর্থাৎ পূর্বে কখনো তাঁর বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি। আলোচ্য আয়াতে মুহসিনাতের অর্থ তাই। -[জাস্‌সাস]

মাসআলা : কুরআনের আয়াতে সাধারণ রীতি অনুযায়ী কিংবা শানে নুযূলের ঘটনার কারণে অপবাদের শাস্তি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিকে আছে অপবাদ আরোপকারী পুরুষ ও অপরদিকে যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, সেই সতীসাধ্বী নারী। কিন্তু শরিয়তের বিধান কারণের অভিন্নতাবশত ব্যাপক; কোনো নারী অন্য নারীর প্রতি অথবা কোনো পুরুষের প্রতি কিংবা কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে এবং প্রমাণ উপস্থিত না করলে সবাই এই শাস্তির যোগ্য বলে গণ্য হবে। -[জাস্‌সাস, হিদায়া]

ব্যভিচারের অপবাদ প্রসঙ্গে উল্লিখিত এ শাস্তি শুধু এই অপবাদের জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কোনো অপরাধের অপবাদ আরোপ করা হলে এই শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তবে বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী প্রত্যেক অপরাধের অপবাদের জন্য দণ্ডমূলক শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কুরআনের ভাষায় যদিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, এই হদ ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে; কিন্তু চারজন পুরুষের সাক্ষ্যের কথা বলা এই সীমাবদ্ধতার প্রমাণ। কেননা, চারজন সাক্ষীর শর্ত শুধু ব্যভিচার প্রমাণের জন্যই নির্দিষ্ট। -[জাস্‌সাস, হিদায়া]

অপবাদের হদ্দে বান্দার হক অর্থাৎ যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়, তার হকও শামিল রয়েছে। তাই এই হদ্দ তখনই কার্যকর করা হবে, যখন প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যার প্রতি আরোপ করা হয়, সে হদ্দ কার্যকর করার দাবিও করে। নতুবা হদ্দ জারি করা হবে না-(হিদায়া), ব্যভিচারের হদ্দ এরূপ নয়। এটা খাঁটি আল্লাহর হক। কাজেই কেউ দাবি করুক বা না করুক, হদ্দ কার্যকর হবে।

وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا -অর্থাৎ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবির কারণে হদ্দ কার্যকর হয়, তার একটি শাস্তি তো তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হয়ে গেছে; তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হয়েছে; দ্বিতীয় শাস্তি চিরকাল জারি থাকবে। তা এই যে, কোনো মকদ্দমায় তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা পূর্ণ না করে। এরূপ তওবা করলেও হানাফী আলেমগণের মতে তার সাক্ষ্য কবুল করা হয় না। হাঁ, তবে গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়, যেমন বলা হয়েছে- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ যাদের উপর অপবাদের হদ্দ কার্যকর করা হয়েছে, তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের অবস্থা শোধরায়, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি দ্বারাও ক্ষমা করিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়ালু।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا -বাক্যের এই ব্যতিক্রম ইমাম আবূ হানীফার ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ববর্তী আয়াতের শুধু শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে; অর্থাৎ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ অতএব এই ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য এই যে, যার উপর অপবাদের হদ্দ জারি করা হয়, সে ফাসেক। কিন্তু যদি সে খাঁটি মনে তওবা করে এবং উল্লিখিতভাবে নিজের অবস্থা শোধরায়, তবে সে ফাসেক থাকবে না এবং তার পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এর ফলশ্রুতি এই যে, আয়াতের শুরুতে দুনিয়ার যে দু'টি শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া- এ শাস্তিদ্বয় তওবা সত্ত্বেও স্বস্থানে বহাল থাকবে। কেননা প্রথম বড় শাস্তিটি তো কার্যকর হয়েই গেছে। দ্বিতীয় শাস্তিটিও হদ্দেরই

অংশবিশেষ। এ বিষয়ে সবাই একমত যে তওবা দ্বারা হদ্দ মাফ হয় না; যদিও পরকালীন আজাব মাফ হয়ে যায়। এতএব দ্বিতীয় শাস্তি সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া তওবা দ্বারা মাফ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে উল্লিখিত ব্যতিক্রম পূর্ববর্তী আয়াতের সব বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অর্থ হবে এই যে, তওবা করার ফলে যেমন সে ফাসেক থাকবে না, তেমনি তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে না। জাস্‌সাস ও মাযহারীতে উভয়পক্ষের প্রমাণাদি ও জবাব বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লে'আন : مُلَاعَنَةٌ ও لِعَانٌ শব্দের অর্থ একে অপরের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের বদদোয়া করা। শরিয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েকটি শপথ দেওয়াকে লে'আন বলা হয়। যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়, অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবি করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চারজন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লে'আন করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কুরআনে উল্লিখিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।

স্বামী যদি এসব কথা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরিউক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচবার কসম খেয়ে নেয়, তবে, স্ত্রীর কাছ থেকে কুরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচবার কসম নেওয়া হবে। যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে তবে যে পর্যন্ত সে স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরিউক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লে'আন পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপার আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী পরকালের শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লে'আন হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া। সে তালাক না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না।

ইসলামি শরিয়তে লে'আনের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরি যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উল্টো তার উপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ্দ জারি করা হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চারজন সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর হয়, তখন ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ মেরে থাকবে, যাতে অপবাদের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে, কিন্তু স্বামীর পক্ষে ব্যাপারটি খুবই নাজুক। সে যখন স্বচক্ষে দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ খোলে, তবে অপবাদ আরোপের শাস্তি ভোগ করবে; আর যদি মুখ না খোলে, তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং জীবন-ধারণও দুর্বিষহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ আইনের আওতাবহির্ভূত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে আরো জানা গেল যে, লে'আন শুধু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারেই হতে পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ। হাদীসের কিতাবাদিতে এ স্থলে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কোন ঘটনাটি লে'আন সংক্রান্ত আয়াতের শানে-নুযূল -এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ দু'বার ধরে উভয় ঘটনাকে শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। বুখারীর টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এবং মুসলিমের টীকাকার ইমাম নববি (র.) উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একই অবতরণের মধ্যে উভয় ঘটনাকে শানে নুযূল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য অধিক স্পষ্ট, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হেলাল ইবনে উমাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জবানিতে বর্ণিত আছে। এ ঘটনার প্রাথমিক অংশ হযরত ইবনে আব্বাসেরই জবানিতে মুসনাদে আহমদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন কুরআনে অপবাদের হদ্দ সম্পর্কিত وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ এতে কোনো নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্য জরুরি করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করবে, তন্মধ্যে একজন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। এ আয়াত শুনে আনসারদের সরদার হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাজিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরূপ কথা শোনে বিস্মিত হলেন? তিনি আনসারগণকে সম্বোধন করে বললেন : তোমরা কি শুনলে, তোমাদের সরদার কি কথা বলছেন? আনসারগণ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাঁকে তিরস্কার করবেন না। তাঁর একথা বলার কারণ তাঁর তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। অতঃপর হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) নিজেই আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমার পুরোপুরি বিশ্বাস রয়েছে যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আশ্চর্যবোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্যে বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসাই এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই; না আমার জন্যে এটা জরুরি যে, আমি চারজন লোক এনে অবস্থা দেখাই এবং সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না? এস্থলে হযরত সা'দের ভাষা বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে, সবগুলোর সারমর্ম একই। –[কুরতুবী]

অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর এই কথাবার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। হেলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শোনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনাসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সরদার সা'দ যে কথা বলেছিলেন, এক্ষেত্রে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন শরিয়তের আইন অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে; কিন্তু হেলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন : আল্লাহর কসম, আমার বিশ্বাস যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বুখারীর রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলালের ব্যাপারে শুনে কুরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয় দাবির স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তি স্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হেলাল উত্তরে আরজ করলেন : যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তা'আলা অবশ্য এমন কোনো বিধান নাজিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এই কথাবার্তা চলছিল, এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ.) লে'আনের আইন সম্বলিত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন; অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ... আবূ ইয়া'লা এই রেওয়ায়েতটিই হযরত আনাস (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আরো বলা হয়েছে যে, লে'আনের আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার সমস্যার সমাধান নাজিল করেছেন। হেলাল আরজ করলেন : আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই আশাই পোষণ করেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেওয়া হলো। সে বলল, আমার স্বামী হেলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ তা'আলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহর আজাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে? হেলাল আরজ করলেন : আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লে'আন করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হেলালকে বলা হলো যে, তুমি কুরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য দাও; অর্থাৎ আমি আল্লাহকে হাজির ও নাজির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হেলাল আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কুরআনি ভাষা এরূপ : "যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।" এই সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলালকে বললেন : দেখ হেলাল, আল্লাহকে ভয় কর। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায়

অনেক হাল্কা। আল্লাহ্‌র আজাব মানুষের দেওয়া শাস্তির চাইতে অনেক অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হেলাল আরজ করলেন : আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে পরকালের আজাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হেলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেওয়া হলো। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একটু থাম। আল্লাহকে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহ্‌র আজাব মানুষের আজাব অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। একথা শুনে সে কসম খেতে ইতস্তত : করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে পঞ্চম সাক্ষ্যও একথা বলে দিয়ে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহর গজব হবে। এভাবে লে'আনের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরো ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে– পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না।-[মাযহারী]

দ্বিতীয় ঘটনাও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। ঘটনার বিবরণ ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ করেছেন : অপবাদের শাস্তি সম্বলিত আয়াত নাজিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আসেম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীকে কোনো পুরুষের সাথে লিপ্ত দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা করার কারণে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মুসলমানগণ তাকে ফাসেক বলবে। এমতাবস্থায় আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনব? সাক্ষীর খোঁজে বের হলে সাক্ষী আসা পর্যন্ত তারা কার্যসিদ্ধি করে পলায়ন করবে। এটা হুবহু প্রথম ঘটনায় সা'দ ইবনে মুয়াযের উত্থাপিত প্রশ্ন।

এক শুক্রবার এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ওয়ায়মেরের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর চাচাত বোন খাওলার সাথে হয়েছিল। ওয়ায়মে একদিন তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহমার সাথে লিপ্ত দেখতে পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ছিল। ওয়ায়মের আসেমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আসেম 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি' পাঠ করলেন এবং পরবর্তী দিন জুমার নামাজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, বিগত জুমায় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম পরিতাপের বিষয় এই যে, আমি নিজেই এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। কেননা আমার পরিবারের মধ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটে গেছে। ইমাম বগভী উভয়কে উপস্থিত করা এবং তাদের মধ্যে লে'আন করানোর ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। -(মাযহারী) বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইবনে সা'দ সায়েদীর রেওয়ায়েতে এর সার-সংক্ষেপ এভাবে বর্ণিত আছে যে, ওয়ায়মের আজলানী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে দেখে, তবে সেকি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? নতুবা তার কি করা উচিত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাজিল করেছেন। যাও স্ত্রীকে নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী সাহল বলেন : তাদেরকে এনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের মধ্যে লে'আন করালেন। যখন উভয়পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লে'আন সমাপ্ত হলো, তখন ওয়ায়মের বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি, তবে এর অর্থ এই হয় যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিলাম। -[মাযহারী]

উপরিউক্ত ঘটনাদ্বয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লে'আনের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার ও ইমাম বগভী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হেলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লে'আনের আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়ায়মের এমনি ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে জানতে চাওয়া হলো তখন তিনি বললেন : তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ এবং ওয়ামেরের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে قَدْ نَزَّلَ اللّٰهُ فِيْكَ এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাজিল করেছেন।-[মাযহারী]

মাসআলা : বিচারকের সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লে'আন হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর জন্যে চিরতরে হারাম হয়ে যায়, যেমন দুগ্ধ পান করানোর ফলেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে অবৈধ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا লে'আনের সাথে সাথেই স্ত্রী স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যায়, কিন্তু ইদ্দতের পর স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে চাইলে ইমাম আযম (র.)-এর মতে তা তখনই জায়েজ হবে, যখন স্বামী তাকে তালাক দেয় কিংবা মুখে বলে দেয় যে, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। স্বামী এরূপ না করলে বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ জারি করবেন এবং তাও তালাকের অনুরূপ হবে। এরপর তিন হায়েজ অতিবাহিত হলে স্ত্রী অন্য কোনো পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে। –[মাযহারী]

মাসআলা : লে'আনের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না; তাকে তার মাতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলাল ইবনে উমাইয়া ও ওয়ায়মের আজলানী উভয়ের ঘটনায়ই এই ফয়সালা দিয়েছিলেন।

লে'আনের পর যে মিথ্যাবাদী, তার পরকালীন আজাব আরো বেড়ে যাবে, কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। এমনিভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যভিচারিণী ও সন্তানকে জারয সন্তান বলাও কারো জন্য জায়েজ হবে না। হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালায় একথাও বলেছিলেন। وَقَضٰى بِاَنْ لَا تَرْمِىْ وَلَا وَلَدَهَا

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَنْزَلْنٰهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْزَالٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ– যা আমিই নাজিল করেছি।

فَرَضْنٰهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার فَرْضٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ– এটাকেও আমি নির্ধারিত করেছি।

اَلزَّانِيَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার زَنْىٌ মূলবর্ণ (ز - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ব্যভিচারিণী নারী।

زَانٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার زَنْىٌ মূলবর্ণ (ز - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ব্যভিচারী পুরুষ।

حُرِّمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْرِيْم মূলবর্ণ (ح - ر - م) জিনস صحيح অর্থ– হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

اَلْمُحْصَنٰتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْصَانٌ মূলবর্ণ (ح - ص - ن) জিনস صحيح অর্থ– কোনো সতী রমণী।

تَابُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার تَوْبٌ মূলবর্ণ (ت - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা তওবা করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ এখানে واو টি আতেফা لَا تَاْخُذْ হলো ফে'ল كُمْ হলো মাফউল, আর رَاْفَةٌ হলো ফায়েল, আর بِهِمَا হলো لَا تَاْخُذْ -এর সাথে মুতাআল্লিক আবার فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ বাক্যটিও لَا تَاْخُذْ -এর সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২৩৯]

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٨﴾

৮. আর সে স্ত্রীলোকটি হতে (জেনার) শাস্তি এভাবে রহিত হতে পারে যে, সেও চারবার শপথ করে বলবে, নিশ্চয় এ পুরুষটি [স্বামী] মিথ্যাবাদী।

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٩﴾

৯. এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, আমার উপর আল্লাহ তা'আলার গজব হোক যদি এ ব্যক্তি সত্যবাদী হয়।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

১০. আর (হে পুরুষ ও স্ত্রীগণ!) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো, আর একথা না হতো যে, আল্লাহ বড় তওবা কবুলকারী, হেকমতওয়ালা, তবে তোমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে।

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١﴾

১১. নিশ্চয়, যারা এ অপবাদ রচনা করেছে, তারা তোমাদেরই মধ্যকার ক্ষুদ্র এক দল; তোমরা তাকে নিজেদের পক্ষে মন্দ বলে মনে করো না; বরং তা তোমাদের জন্য উত্তমই উত্তম; তাদের প্রত্যেকেরই সে পরিমাণ গুনাহ হয়েছে যে পরিমাণ কাজ করেছে, আর তাদের মধ্যকার যে এ অপবাদ প্রদানে সর্বাপেক্ষা বড় দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তার কঠোর শাস্তি হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ আর সে স্ত্রী লোকটি হতে (জেনার) শাস্তি এভাবে রহিত হতে পারে যে اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ সেও চারবার শপথ করে বলবে اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ নিশ্চয় এ পুরুষটি মিথ্যাবাদী।

৯. وَالْخَامِسَةَ এবং পঞ্চমবার বলবে যে اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ আমার উপর আল্লাহ তা'আলার গজব হোক اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি এ ব্যক্তি সত্যবাদী হয়।

১০. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ আর একথা না হতো যে, আল্লাহ বড় তওবা কবুলকারী, হেকমতওয়ালা তবে তোমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে।

১১. اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ নিশ্চয় যারা এ অপবাদ রচনা করেছে عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ তারা তোমাদেরই মধ্যকার ক্ষুদ্র একদল لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ তোমরা তাকে নিজেদের পক্ষে মন্দ বলে মনে করো না بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ বরং তা তোমাদের জন্য উত্তমই উত্তম لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ তাদের প্রত্যেকের সে পরিমাণ হয়েছে مَا اكْتَسَبَ যে পরিমাণ কাজ করেছে مِنَ الْاِثْمِ গুনাহ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ আর তাদের মধ্যকার যে এ অপবাদ প্রদানে সর্বাপেক্ষা বড় দায়িত্ব গ্রহণ করেছে لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ তার কঠোর শাস্তি হবে।

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۲﴾

১২. যখন তোমরা এ কথা শুনেছিলে, তখন মুসলমান পুরুষগণ এবং মুসলমান নারীগণ কেন আপন লোকদের সম্বন্ধে ভালো ধারণা করল না এবং এরূপ কেন বলল না যে, এটা তো স্পষ্ট মিথ্যা?

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. এ লোকগুলো এতদ্বিষয়ে চারজন সাক্ষী কেন আনয়ন করল না? সুতরাং যখন এরা সাক্ষী আনয়ন করেনি, তখন এরাই হচ্ছে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۴﴾

১৪. আর (হে মেসতাহ, হাসসান ও হামনা!) যদি তোমাদের প্রতি ইহলোকে ও পরলোকে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ না হতো, তবে যে কাজে তোমরা লিপ্ত হয়েছিলে তজ্জন্য তোমাদের কঠোর শাস্তি হতো।

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿۱۵﴾

১৫. যখন তোমরা সে অপবাদকে নিজেদের মুখে রটনা করছিলে এবং স্বীয় মুখসমূহ দ্বারা এমন কথা বলছিলে যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। আর তোমরা তাকে হালকা ব্যাপার মনে করছিলে, অথচ তা আল্লাহর নিকট খুবই গুরুতর ব্যাপার ছিল।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. لَوْلَآ কেন করল না اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ যখন তোমরা একথা শুনেছিলে ظَنَّ ধারণা الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ তখন মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারীগণ بِاَنْفُسِهِمْ আপন লোকদের সম্বন্ধে خَيْرًا ভালো। وَقَالُوْا এবং এরূপ কেন বলল না যে هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ এটা তো স্পষ্ট মিথ্যা।

১৩. لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ এ লোকগুলো এতদ্বিষয়ে কেন আনয়ন করল না بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ চারজন সাক্ষী فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ সুতরাং যখন এরা সাক্ষী আনয়ন করেনি فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ তখন এরাই হচ্ছে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী।

১৪. وَلَوْلَا আর যদি না হতো فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ তোমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ইহলোকে ও পরলোকে لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ তবে যে কাজে তোমরা লিপ্ত হয়েছিলে তজ্জন্য তোমাদের হতো عَذَابٌ عَظِيْمٌ কঠোর শাস্তি।

১৫. اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ যখন তোমরা সে অপবাদকে নিজেদের মুখে রটনা করছিলে وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ এবং স্বীয় মুখসমূহ দ্বারা এমন কথা বলছিলে مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না وَتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا আর তোমরা তাকে হালকা ব্যাপার মনে করছিলে وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ অথচ তা আল্লাহর নিকট খুবই গুরুতর ব্যাপার ছিল।

১৬. আর যখন তোমরা তা শুনেছিলে, তখন এরূপ কেন বললে না যে, আমাদের জন্য শোভনীয় নয় যে, এমন কথা মুখ দিয়ে বের করি, আল্লাহ পবিত্র মহান! এটা তো গুরুতর অপবাদ।	وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾
১৭. আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নসিহত করছেন যে, পুনরায় এরূপ কাজ করো না যদি মুমিন হও।	يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে আহকামসমূহ বর্ণনা করছেন; এবং আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, বড় হেকমতওয়ালা।	وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ আর যখন তোমরা তা শুনেছিলে তখন এরূপ কেন বললে না যে مَّا يَكُوْنُ لَنَآ আমাদের জন্য শোভনীয় নয় যে اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا এমন কথা মুখ দিয়ে বের করি سُبْحٰنَكَ আল্লাহ পবিত্র মহান هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ এটা তো গুরুতর অপবাদ।

১৭. يَعِظُكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নসিহত করছেন যে اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا পুনরায় এরূপ কাজ করো না اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি মুমিন হও।

১৮. وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন لَكُمُ الْاٰيٰتِ তোমাদের নিকট আহকামসমূহ وَاللّٰهُ, عَلِيْمٌ এবং আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী حَكِيْمٌ বড় হেকমতওয়ালা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ [١١]

শানে নুযূল : গযওয়ায়ে বনী মুস্তালিক মতান্তরে মুরায়সী অভিযান হতে ফিরে আসার পথে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হন। এই সুযোগে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ রটনা করে। এরই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য সূরা থেকে দশটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর নিষ্কলুষতার সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন এবং সে মিথ্যা অপবাদ প্রচারকারীদের শাস্তির বিধানও আরোপ করেছেন। –[বুখারী ৬৯৬/২, ইবনে কাছীর ২৭৭/৩, তাবারী ২৭৮/৯, দররে মানছূর ২৫/৫, রূহুল মা'আনী ১১২/৯/১৮, সাভী ১৩১/৩]

পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নূরের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্যে প্রবর্তিত বিধানাবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে সতীত্ব ও পবিত্রতার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি ও পারলৌকিক মহা বিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের হদ্দ, অতঃপর অপবাদের হদ্দ ও পরে লে'আনের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের হদ্দ প্রসঙ্গে চারজন সাক্ষীর অবর্তমানে কোনো সতী-সাধ্বী- নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি

আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে। এ বিষয়টি সাধারণ মুসলিম সতী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ষষ্ঠ হিজরিতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর প্রতি এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের পক্ষে অত্যধিক গুরুতর ছিল। তাই কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এস্থলে উপরিউক্ত দশটি আয়াত নাজিল করেছেন। এসব আয়াতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করত তাঁর ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে হুশিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কুরআন ও হাদীসে 'ইফকের ঘটনা' নামে খ্যাত। ইফক শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। এসব আয়াতের তাফসীর বোঝার জন্য অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে।

মিথ্যা অপবাদের কাহিনী : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ হিজরিতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরায়সী যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) সাথে ছিলেন। ইতঃপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশা (রা.) -এর উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) প্রথমে পর্দাবিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদিনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনজিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হলো যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয় হযরত আয়েশা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তথায় তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশার পর্দাবিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বাহকরা মনে করেছে যে, তিনি ভেতরেই আছেন। উঠানোর সময়ও সন্দেহ হলো না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গিনী ছিলেন। ফলে আসনটি যে শূন্য-এরূপ ধারণাও কারো মনে উদয় হলো না। হযরত আয়েশা (রা.) ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা কিংবা এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাঁদের জন্যে তালাশ করে নেওয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষ রাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মাঝেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজের জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোনো কিছু থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে হযরত আয়েশা (রা.) কে চিনে ফেললেন। কারণ পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত পরিতাপের সাথে তাঁর মুখ থেকে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' উচ্চারিত হয়ে গেল। এ বাক্য হযরত আয়েশা (রা.)-এর কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। হযরত সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকের রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফিক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শত্রু। সে একটা সুর্বণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হযরত হাসসান, মিস্তাহ্ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ্ ছিল এ শ্রেণিভুক্ত। তাফসীরে দুররে-মনসূরে ইবনে মারদুভিয়ার বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে,

أَعَانَهُ أَيْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيٍّ حَسَّانُ وَمِسْطَحٌ وَحَمْنَةُ

যখন এই মুনাফিক-রচিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশা (রা.) -এর তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। একমাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা (রা.) -এর পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরিউক্ত আয়াতসমূহ নাজিল করেন। আয়াতগুলোর তাফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হদ-এ বর্ণিত কুরআনি-বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হলো। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত করা হলো। বাযযার ও ইবনে মারদূভিয়াহ্ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনজন মুসলমান মিসতাহ্, হামনাহ্ ও হাসসানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসল অপবাদ-রচয়িতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেয় এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়েম থাকে।

–[বয়ানুল-কুরআন]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলি এবং অপবাদ-কাহিনীর অবশিষ্টাংশ : শত্রুরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত অপকৌশল প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেনি। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যে যে উপায় তাদের মস্তিষ্কে উদিত হতে পারত, তার সবগুলোই তারা সন্নিবেশিত করেছে। কাফেরদের তরফ থেকে তিনি যেসব কষ্ট পেয়েছেন, তন্মধ্যে সম্ভবত এটাই ছিল সর্বশেষ কঠোর ও মানসিক কষ্ট। মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই পবিত্র বিবিগণের মধ্যে সর্বাধিক বিদুষী, জ্ঞান-গরিমায় সমুন্নত ও পবিত্রতমা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ও তাঁর সাথে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালের ন্যায় ধর্মপ্রাণ সাহাবীর বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ রটনা করল। মুনাফিকরা এতে রঙ চরিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। এতে সর্বাধিক দুঃখজনক বিষয় ছিল এই যে, কয়েকজন সরলপ্রাণ মুসলমানও তাদের চক্রান্তে প্রভাবান্বিত হয়ে অপবাদের চর্চা করতে লাগল। এই ভিত্তিহীন, প্রমাণহীন ও উড়ে আসা অপবাদের স্বরূপ কয়েকদিনের মধ্যে আপনা-আপনিই খুলে যেত; কিন্তু স্বয়ং রাসূল ﷺ ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর মানসিক ক্লেশ মোচনের জন্য আল্লাহ তা'আলা ওহীর কোনো প্রকার ইঙ্গিতকে যথেষ্ট মনে করেননি; বরং কুরআনের প্রায় দুইটি রুকূ' তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য নাজিল করেন। যারা এই অপবাদ রচনা করে অথবা এর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে, তাদের সবার প্রতি এমন কঠোর ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়, যা বোধ হয় ইতঃপূর্বে অন্য কোনো ক্ষেত্রে উচ্চারণ করা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে এই অবপাদ-ঘটনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার সতীত্ব ও পবিত্রতার সাথে সাথে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমাকেও ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। এ কারণেই উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তোমরা এই দুর্ঘটনাকে তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। বলাবাহুল্য, এর চাইতে বড় মঙ্গল আর কি হবে যে, আল্লাহ তা'আলা দশটি আয়াতে তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই আয়াতগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হবে। স্বয়ং হযরত আয়েশা সিদ্দীক (রা.) বলেন : আমার নিজের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আমার সাফাই ও পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন; কিন্তু আমি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে করতাম না যে, কুরআনে চিরকাল পঠিত হবে, এমন আয়াতসমূহ আমার ব্যাপারে নাজিল করা হবে। এ স্থলে ঘটনার আরো কিছু বিবরণ জেনে নেওয়াও আয়াতসমূহের তাফসীর হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে সহায়ক হবে! তাই সংক্ষেপে তা বর্ণিত হচ্ছে :

সফর থেকে ফিরে আসার পর হযরত আয়েশা (রা.) গৃহকর্মে মশগুল হয়ে গেলেন। মুনাফিকরা তাঁর সম্পর্কে কি কি খবর রটনা করছে, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। বুখারীর রেওয়ায়েতে স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : সফর থেকে ফিরে আসার পর আমি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এই অসুস্থতার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আমি এ যাবৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে যে ভালোবাসা ও কৃপা পেয়ে এসেছিলাম, তা অনেকটা হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তিনি প্রত্যহ গৃহে এসে সালাম করতেন এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করে ফেরত চলে যেতেন। আমার সম্পর্কে কি খবর রটনা করা হচ্ছে, আমি যেহেতু তা জানতাম না, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই ব্যবহারের হেতু আমার কাছে উদ্ঘাটিত হতো না। আমি এই

আগুনেই দগ্ধ হতে লাগলাম। একদিন দুর্বলতার কারণে মিসতাহ্ সাহাবীর জননী উম্মে মিস্তাহকে সাথে নিয়ে আমি বাহ্যের প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে গৃহের বাইরে গেলাম। কেননা, তখন পর্যন্ত গৃহে পায়খানা তৈরি করার প্রচলন ছিল না। যখন আমি প্রয়োজন সেরে গৃহে ফিরতে লাগলাম, তখন উম্মে মিস্তাহ্‌র পা তার বড় চাদরে জড়িয়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে গেল। তখন তার মুখ থেকে এই বাক্য বেরিয়ে পড়ল تَعِسَ مِسْطَحٌ (মিস্তাহ্ নিপাত যাক)। আরবে এই বাক্যটি বদদোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। জননীর মুখে পুত্রের জন্য বদদোয়ার বাক্য শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বিস্মিতা হলেন। তিনি বললেন : এ তো খুবই খারাপ কথা! তুমি একজন সৎ লোককে মন্দ বলছ। সে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তখন উম্মে মিস্তাহ্ আশ্চর্যান্বিতা হয়ে বলল : মা, তুমি কি জান না আমার পুত্র মিস্তাহ্ কি বলে বেড়ায়? আমি জিজ্ঞেস করলাম : সে কি বলে? তখন তার জননী আমাকে অপবাদকারীদের অপবাদ, অভিযানের আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং মিস্তাহ্‌র তাদের সাথে জড়িত থাকার কথা বর্ণনা করল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : একথা শুনে আমার অসুস্থতা দ্বিগুণ হয়ে গেল। আমার গৃহে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যথারীতি গৃহে এলেন, সালাম করলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি তাঁর কাছে পিতামাতার গৃহে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন! পিতামাতার কাছে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমি সেখানে পৌঁছে মাতাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : মা, তোমার মতো মেয়েদের শত্রু থাকেই এবং তারাই এ ধরনের কথাবার্তা ছড়ায়। তুমি চিন্তা করো না। আপনা-আপনিই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি বললাম : সুবহানাল্লাহ! সাধারণের মধ্যে এ বিষয়ের চর্চা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আমি কিরূপে সবর করব? আমি সারারাত কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। মুহূর্তের জন্যও আমার অশ্রু থামেনি এবং চক্ষু লাগেনি। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার কারণে দারুণ মর্মাহত ছিলেন। এই কয়দিনে এ ব্যাপারে কোনো ওহীও তাঁর কাছে আগমন করেনি। তাই পরিবারেরই লোক হযরত আলী (রা.) ও উসামা ইবনে যায়েদের কাছে পরামর্শ চাইলেন যে, এমতাবস্থায় আমার কি করা উচিত? হযরত উসামা (রা.) পরিষ্কার আরজ করলেন : যতদূর আমি জানি, হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে কোনোরূপ কুধারণাই করা যায় না। তাঁর চরিত্রে এমন কিছু নেই, যদ্বারা কুধারণার পথ সৃষ্টি হতে পারে। আপনি এসব গুজবের পরওয়া করবেন না। হযরত আলী (রা.) তাঁকে চিন্তা ও অস্থিরতার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য পরামর্শ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার ব্যাপারে কোনো সংকীর্ণতা করেননি। গুজবের কারণে হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মন কিছুটা মলিন হয়ে থাকলে আরো অনেক মহিলা আছে। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাঁদী বরীরার কাছ থেকে খোঁজখবর নিলেও আপনার মনের এই মলিনতা দূর হতে পারে! সেমতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বরীরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বরীরা আরজ করল : অন্য কোনো দোষ তো তাঁর মধ্যে দেখিনি; তবে এতটুকু জানি যে, তিনি কচি বয়সের মেয়ে। মাঝে মাঝে আটা গুলিয়ে রেখে দেন এবং নিজে ঘুমিয়ে পড়েন। ছাগল এসে আটা খেয়ে যায়। (এরপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষণ দান, মিম্বরে দাঁড়িয়ে অপবাদ ও গুজব রটনাকারীদের অভিযোগ বর্ণনা ইত্যাকার দীর্ঘ কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই যে) হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : আমার সারাদিন ও পরবর্তী সারারাতও অবিরাম কান্নার মধ্যে অতিবাহিত হলো। আমার পিতামাতাও আমার কাছে চলে এসেছিলেন। তারা আশঙ্কা করছিলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে আমার কলিজা যদি ফেটে যায়! আমার পিতামাতা আমার কাছেই উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে এসে আমার কাছে বসে গেলেন। যেদিন থেকে এই ঘটনা চালু হয়েছিল, তারপর থেকে এর পূর্বে তিনি কখনো আমার কাছে এসে বসেননি। এরপর তিনি সংক্ষেপে শাহাদাতের খুতবা পাঠ করে বললেন : হে আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমার কানে এই এই কথা পৌঁছেছে। যদি তুমি দোষমুক্ত হও, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে মুক্ত ঘোষণা করবেন (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন।) পক্ষান্তরে যদি তুমি ভুল করে থাক, তবে আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর। বান্দা তার গোনাহ্ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই আমার অশ্রু একেবারে শুকিয়ে গেল। আমার চোখে একবিন্দু অশ্রুও আর রইল না। আমি পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বললাম : আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার উত্তর দিন। পিতা বললেন : আমি এ কথার কি উত্তর দিতে পারি। অতঃপর আমি মাকে বললাম : আপনি উত্তর দিন। তিনিও ওজর পেশ করে বললেন : আমি কি জবাব দেব! তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই মুখ

খুলতে হলো। আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা বালিকা। এখন পর্যন্ত কুরআনও বেশি পড়িনি। পঠকবর্গ চিন্তা করুন, এহেন দুশ্চিন্তা ও চরম বিষাদময় অবস্থায় শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষেও যুক্তিপূর্ণ কথা বলা সহজ হয় না। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) যা বললেন, তা নিঃসন্দেহে প্রগাঢ় জ্ঞানী ও বিজ্ঞসুলভ উক্তি। নিম্নে তাঁর বক্তব্য হুবহু তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করা হলো :

وَاللّٰهِ لَقَدْ عَرَفْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ حَتّٰى اِسْتَقَرَّ فِىْ اَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّىْ بَرِيْئَةٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنِّىْ بَرِيْئَةٌ لَا تُصَدِّقُوْنِىْ وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِاَمْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنِّىْ مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُوْنِىْ وَاللّٰهِ لَا اَجِدُ لِىْ وَلَكُمْ مَثَلًا اِلَّا كَمَا قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَّاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ.

"আল্লাহর কসম, আমার জানা হয়ে গেছে যে, এই অপবাদ বাক্যটি উপর্যুপরি শোনার কারণে আপনার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং আপনি কার্যত তা সমর্থন করেছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি এই দোষ থেকে মুক্ত: যেমন আল্লাহ তা'আলাও জানেন যে, আমি মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে আমি যদি এমন দোষ স্বীকার করে নেই, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা মেনে নেবেন। আল্লাহর কসম, আমি নিজের ও আপনার ব্যাপারে এটা ব্যতীত দৃষ্টান্ত পাই না যা ইউসুফ (আ.)-এর পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.) পুত্রদের ভ্রান্ত কথাবার্তা শুনে বলেছিলেন : আমি সবরে জামীল অবলম্বন করছি এবং তোমরা যা কিছু বর্ণনা করছ, সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।"

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : এতটুকু কথা বলে আমি পৃথক নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আমি বাস্তবে যেমন দোষমুক্ত আছি আল্লাহ তা'আলা আমার দোষমুক্ততার বিষয় অবশ্যই ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ করে দেবেন। কিন্তু এরূপ কল্পনাও ছিল না যে, আমার ব্যাপারে চিরকাল পঠিত হবে, কুরআনের এমন আয়াত নাজিল হবে। কারণ, আমি আমার মর্তবা এর চাইতে অনেক কম অনুভব করতাম। এরূপ ধারণা ছিল যে, সম্ভবত স্বপ্নযোগে আমার দোষমুক্ততার বিষয় প্রকাশ করা হবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিসেই বসা ছিলেন এবং গৃহের লোকদের মধ্যেও কেউ তখনও উঠেনি, এমতাবস্থায় তাঁর মধ্যে এমন ভাবান্তর উপস্থিত হলো, যা ওহী অবতরণের সময় উপস্থিত হতো। ফলে, কন্‌কনে শীতের মধ্যেও তাঁর কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এই ভাবান্তর দূর হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসিমুখে গাত্রোত্থান করলেন এবং সর্বপ্রথম যে কথা বললেন, তা ছিলো এই :

اَبْشِرِىْ يَا عَائِشَةُ اَمَّا اللّٰهُ فَقَدْ اَبْرَاكِ –অর্থাৎ হে আয়েশা, সুসংবাদ শোন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দোষমুক্ত করেছেন। আমার মা বললেন : দাঁড়াও আয়েশা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাও। আমি বললাম : না মা, আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত কারো ঋণ স্বীকার করি না। আমি দাঁড়াব না। আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে মুক্ত করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য : ইমাম বগভী উপরিউক্ত আয়াতসমূহের তাফসীরে বলেছেন : হযরত আয়েশা (রা.)-এর এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কোনো মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে বর্ণনা করতেন।

প্রথম : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন : এ আপনার স্ত্রী। –(তিরমিযী) কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন।

দ্বিতীয় : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ছাড়া কোনো কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি।

তৃতীয় : তাঁর কোলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হয়।

চতুর্থ : হযরত আয়েশার গৃহেই তিনি সমাধিস্থ হন।

পঞ্চম : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি তখনও ওহী অবতীর্ণ হতো, যখন তিনি হযরত আয়েশার সাথে এক লেপের নীচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোনো বিবির এরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল না।

ষষ্ঠ : আসমান থেকে তাঁর দোষমুক্ততার বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে।

সপ্তম : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই যাঁদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছে, তিনি তাঁদেরও অন্যতমা।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর ফকীহ্ ও পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য দেখে হযরত মূসা ইবনে তালহা (রা.) বলেন : আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর চাইতে অধিক শুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে দেখিনি। –[তিরমিযী]

তাফসীরে-কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ্য দ্বারা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর শিশু পুত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর সাক্ষ্য দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের দশটি আয়াত নাজিল করে তাঁর দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তাঁর গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ - إِفْك শব্দের আভিধানিক অর্থ পাল্টে দেওয়া, বদলে দেওয়া। যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিলরূপে, বাতিলকে সত্যরূপে বদলে দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ্‌ভীরুকে ফাসেক ও ফাসেককে আল্লাহভীরু পরহেজগার করে দেয়, সেই মিথ্যাকে إفك বলা হয়। عُصْبَةٌ শব্দের অর্থ দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত লোকের দল। এর কম-বেশির জন্যও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। مِنكُمْ বলে মুমিনদেরকে বোঝানো হয়েছে। এই অপবাদের প্রকৃত রচয়িতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুমিন নয়-মুনাফিক ছিল, কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমান দাবি করত বিধায় তাদের ক্ষেত্রেও মুমিনদের বাহ্যিক বিধানাবলি প্রযোজ্য হতো। তাই مِنكُمْ শব্দে তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এতে জড়িত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। অতঃপর মুমিনগণ সবাই তওবা করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের তওবা কবুল করেন। হযরত হাসসান ও মিসতাহ্ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। তাঁরা উভয়েই বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যোদ্ধাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে মাগফেরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রা.)-এর সামনে কেউ হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না; যদিও তিনি অপবাদের শাস্তি-প্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, হাসসান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে কবিতা রচনার মাধ্যমে কাফেরদের চমৎকার মোকাবিলা করেছেন। কাজেই তাঁকে মন্দ বলা সঙ্গত নয়। হাসসান কোনো সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে আগমন করলে তিনি সসম্ভ্রমে তাঁকে আসন দিতেন। –[মাযহারী]

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ –এতে নবী করীম ﷺ হযরত আয়েশা, সাফওয়ান ও সকল মুমিন-মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁরা সবাই এই গুজবের কারণে মর্মাহত ছিলেন। অর্থ এই যে, এই গুজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাঁদের দোষমুক্ততা নাজিল করে তাঁদের সম্মান আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যারা এই কুকাণ্ড করেছিল, তাদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী নাজিল করেছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ –অর্থাৎ যারা এই অপবাদে যতটুকু অংশ নিয়েছে, সেই পরিমাণে তার গোনাহ্ লিখিত হয়েছে এবং সে অনুপাতেই তার শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি এই খবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আজাব ভোগ করবে, যে খবর শুনে সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিশ্চুপ রয়েছে, সে আরও কম আজাবের যোগ্য হবে।

وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ - كِبْر শব্দের অর্থ– বড়। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্য গুরুতর আজাব রয়েছে। বলাবাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। –[বগভী]

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ –অর্থাৎ তোমরা যখন এই অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ মুসলমান ভাই-বোনদের সম্পর্কে সুধারণা করলে না কেন এবং একথা বললে না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা? এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত بِأَنفُسِهِمْ শব্দ দ্বারা কুরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ ধরনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের

প্রতি দোষারোপ করো না। উদ্দেশ্য, কোনো মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না। অন্যত্র বলা হয়েছে لَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ নিজেদেরকে হত্যা করো না। এখানেও কোনো মুসলমান ভাইকে হত্যা করা বোঝানো হয়েছে। আরো এক জায়গায় আছে وَلَا تُخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ কোনো মুসলমান ভাইকে গৃহ ত্যাগে বাধ্য করো না। আরো বলা হয়েছে وَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ মুসলমান ভাইকে সালাম কর। কুরআন পাকের এসব আয়াতের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ এই যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করে কিংবা তার ক্ষতি সাধন করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে দোষী ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা, সমগ্র জাতির অপমান ও দুর্নামই হলো এর পরিণতি।

সাদী বলেন : چو از قومے یکی بے دانشی کرد ٭ نہ کہ را منزلت ماند نہ مہ را

কুরআনের এই শিক্ষার প্রভাবেই মুসলমানগণ যখন উন্নতি করেছে, তখন সমগ্র জাতি উন্নতি করেছে, প্রত্যেক ব্যক্তি করেছে। এই শিক্ষা পরিত্যাগের ফলেই আজ দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র জাতি অধঃপতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েছে।

এই আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে স্থানের দিকে লক্ষ্য করলে لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَنْتُمْ بِاَنْفُسِكُمْ خَيْرًا সম্বোধন পদে বলা উচিত ছিল; যেমন শুরুতে سَمِعْتُمُوْهُ সম্বোধন পদে বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআন পাক এই সংক্ষিপ্ত বাক্য ছেড়ে দিয়ে পদ্ধতি পরিবর্তন করত সম্বোধনপদের পরিবর্তে ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ বলেছে। এতে হালকা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের প্রেক্ষাপটে মুমিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে এটাই ছিল ঈমানের দাবি।

এখানে তৃতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই, আয়াতের শেষ বাক্য هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনামাত্রই মুসলমানদের 'এটা প্রকাশ্য মিথ্যা' বলে দেওয়াই ছিল ঈমানের দাবি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো মুসলমান সম্পর্কে কোনো গোনাহ্ অথবা দোষ শরিয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা না জানা পর্যন্ত তার প্রতি সুধারণা রাখা এবং প্রমাণ ছাড়াই তাকে গোনাহ ও দোষে অভিযুক্ত করাকে মিথ্যা মনে করা সাক্ষাৎ ঈমানের পরিচয়।

মাসআলা : এতে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব। তবে শরিয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বিপরীত প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যদি কেউ শরিয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়া মুসলমানকে অভিযুক্ত করে, তার কথা প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কারণ, এটা নিছক গীবত (পরনিন্দা) এবং অহেতুক মুসলমানকে হেয় করা। –[মাযহারী]

لَوْلَا جَآءُوْا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ –এ আয়াতের প্রথম বাক্যে শিক্ষা আছে যে, এরূপ খবর রটনাকারীদের কথা চালু করার পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবি করা। ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে শরিয়তসম্মত প্রমাণ চারজন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরূপ দাবি করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখবন্ধ কর। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এক ব্যক্তি স্বচক্ষে কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করল এবং সে অন্য সাক্ষী পেল না, এটা অসম্ভব ও অবাস্তব নয়। এখন যদি এই ব্যক্তি নিজের চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে, তবে তাকে মিথ্যাবাদী কিরূপে বলা যায়, বিশেষত আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী বলা তো কোনোরূপেই বুঝে আসে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সব ঘটনার স্বরূপ জানেন এবং এই ঘটনাও তিনি জানেন। এমতাবস্থায় সে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে কিরূপে? এই প্রশ্নের দুই জবাব আছে। প্রথম এখানে 'আল্লাহর কাছে' বলার অর্থ আল্লাহর বিধান ও আইন। অর্থাৎ এ ব্যক্তি আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে অপবাদের শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ, আল্লাহর বিধান ছিল এই যে, চারজন সাক্ষী না হলে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তা বর্ণনা না করা। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ব্যতিরেকেই বর্ণনা করে, সে আইনত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে।

দ্বিতীয় জবাব এই যে, অনর্থক কোনো কাজ না করা মুসলমানের কর্তব্য: বিশেষত এমন কাজ, যার ফলে অন্য মুসলমানের প্রতি অভিযোগ আরোপিত হয়। অতএব এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনো দোষ অথবা গোনাহের সাক্ষ্য

গোনাহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই দিতে পারে। কাউকে হেয় করা অথবা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে দিতে পারে না। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের দাবি করে: সে যেন দাবি করে যে, আমি মানব জাতির সংশোধন, সমাজকে কলুষমুক্ত করণ এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে এ দাবি করছি। কিন্তু সে যখন শরিয়তের আইন জানে যে, চারজন সাক্ষী ছাড়া এরূপ দাবি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাজা পাবে না এবং অপরাধও প্রমাণিত হবে না; বরং উল্টা মিথ্যা বলার শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন সে আল্লাহর কাছে উপরিউক্ত সদুদ্দেশ্যের দাবিতে মিথ্যাবাদী। কেননা শরিয়তের ধারা মোতাবেক দাবি না হওয়ার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কর্ম সদুদ্দেশ্য হতেই পারে না। –[মাযহারী]

একটি গুরুত্বপূর্ণ হুশিয়ারী : উপরিউক্ত উভয় আয়াতে প্রত্যেক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং এর বিপরীত প্রমাণহীন কথাবার্তা নাকচ করে দেওয়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বেই সংবাদটিকে ভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করলেন না কেন এবং এর খণ্ডন করলেন না কেন? তিনি এক মাস পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কেন রইলেন? এমন কি, তিনি হযরত আয়েশাকে একথাও বলেছেন যে, দেখ, যদি তোমার দ্বারা কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে তওবা করে নাও।

কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা সুধারণার আদেশের পরিপন্থি নয়। কেননা, তিনি খবরটির সত্যায়নও করেন নি এবং তদনুযায়ী কোনো কর্মও করেন নি। তিনি এর চর্চা করাও পছন্দ করেন নি। সাহাবায়ে-কেরামের সমাবেশে তিনি এ কথাই বলেছেন যে, مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلَّا خَيْرًا অর্থাৎ আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছুই জানি না। -(তহাভী) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই কর্ম-পন্থা উপরিউক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল এবং সুধারণা পোষণ করার সাক্ষ্য বহন করে। তবে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাও দূর হয়ে যায়, এরূপ অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান আয়াত অবতরণের পরে অর্জিত হয়েছে।

মোকটকথা এই যে, অন্তরে কোনোরূপ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হওয়া এবং সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা– যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন– মুসলমানদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার পরিপন্থি ছিল না। তিনি তো খবর অনুযায়ী কোনো কর্মও করেন নি। যেমন মুসলমানদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উভয় আয়াতে যাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে তারা খবর অনুযায়ী কর্ম করেছিল। তারা এর চর্চা করেছিল এবং ছড়িয়েছিল। তাদের এ কাজ আয়াত অবতরনের পূর্বেও অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য ছিল।

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَاۤ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ– যেসব মুসলমান ভুলক্রমে এই অপবাদে কোনো না কোনোরূপে অংশ গ্রহণ করেছিল, এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল এই আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াত তাদের সবাইকে একথাও বলেছে যে, তোমাদের অপরাধ খুবই গুরুতর ছিল। এর কারণে দুনিয়াতেও আজাব আসতে পারত, যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং পরকালেও কঠোর শাস্তি হতো। কিন্তু মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহমূলক ইহকালেও এবং পরকালেও। তাই এই শাস্তি তোমাদের উপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তাওফীক দিয়েছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসর্গ দান করেছেন। এটা আজাব অবতরণের পথে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃতগুনাহের জন্যে সত্যিকার তওবার তাওফীক দিয়েছেন এবং তওবা কবুল করেছেন। পরকালে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফেরাতের ওয়াদা দিয়েছেন।

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ - تَلَقِّىْ শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করে বর্ণনা করে। এখানে কোনো কথা শুনে তার সত্যতা যাচাই না করে সামনে চালু করে দেওয়া বোঝানো হয়েছে।

وَتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ- অর্থাৎ তোমরা একে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করেছিলে যে, যা শুনলে তাই অন্যের কাছে বলতে শুরু করেছিলে। তোমরা সত্যতা যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলে, যদ্দরুন অন্য মুসলমান দারুণ মর্মাহত হয়, লাঞ্ছিত হয়, এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ -অর্থাৎ তোমরা যখন এই গুজব শুনেছিলে, তখন একথা কেন বলে দিলে না যে, এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের জন্যে বৈধ নয়। আল্লাহ পবিত্র। এ তো গুরুতর অপবাদ। এই আয়াতে পুনর্বার সেই আদেশই ব্যক্ত হয়েছে, যা পূর্বেকার এক আয়াতে ব্যক্ত হয়েছিল। এতে আরো প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের সংবাদ শুনে মুসলমানদের কি করা উচিত। অর্থাৎ তারা পরিষ্কার বলে দেবে যে, কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করাও আমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা গুরুতর অপরাধ।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, কোনো ঘটনার সত্যতা যেমন প্রমাণ ছাড়া জানা যায় না, ফলে তার চর্চা করা ও মুখে উচ্চারণ করা অবৈধ হয়েছে, তেমনি কোনো কথার অসত্যতাও তো প্রমাণ ছাড়া বোঝা যায় না। কাজেই এরূপ কথাকে গুরুতর অপবাদ কিরূপে বলা যেতে পারে? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মুসলমানকে গোনাহ্ থেকে পাক-পবিত্র মনে করা শরিয়তের মূলনীতি। এই মূলনীতির বিরুদ্ধে বিনা দলিলে যে কথা বলা হবে, তাকে মিথ্যা মনে করার জন্য অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। এতটুকুই যথেষ্ট যে, একজন মুমিন-মুসলমানের প্রতি শরিয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কাজেই এটা মিথ্যা অপবাদ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَدْرَأُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার دَرْءٌ মূলবর্ণ (د - ر - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– রহিত হতে পারে।

جَاءُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَجِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ج - ى - أ) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– রচনা করেছে।

تَوَلَّى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَوَلِّيْ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

مَا أَفَضْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِفَاضَةٌ মূলবর্ণ (ف - ى - ض) জিনস اجوف يائى অর্থ– যে কাজে তোমরা লিপ্ত হয়েছিল।

تَلَقَّوْنَهُ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَلَقِّيْ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা সে অপবাদকে রটনা করছিলে।

أَنْ نَتَكَلَّمَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَكَلُّمٌ মূলবর্ণ (ك - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– আমরা মুখ দিয়ে বের করি।

أَنْ تَعُوْدُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَوْدَةٌ মূলবর্ণ (ع - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা পুনরায় করো না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ : এখানে تَحْسَبُوْنَهُ ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী আর هَيِّنًا হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী واو টি হলো حالية আর هُوَ মুবতাদা আর عِنْدَ اللّٰهِ হলো حال আর عَظِيْمٌ হলো খবর। আর বাক্যটি হলো حالية। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২৫৪]

১৯. যারা চায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতার কথা চর্চা হোক, তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতে; আর আল্লাহ তা'আলা পরিজ্ঞাত আছেন, কিন্তু তোমরা (পূর্ণ তথ্য) জান না।	إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾
২০. আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ না হতো এবং এটাও না হতো যে, আল্লাহ বড় দয়ালু ও অনুগ্রহশীল, তবে তোমরাও রক্ষা পেতে না।	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾
২১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না; আর যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে, তবে সে (শয়তান) তো (সর্বদা) নির্লজ্জ এবং অসঙ্গত কাজ করার জন্যই আদেশ করবে; আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো, তবে তোমাদের মধ্যে কেউ কস্মিনকালেও পবিত্র হতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা পাক-পবিত্র করে দেন; আর আল্লাহ তা'আলা সবই শুনেন, সবই জানেন।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ যারা চায় যে أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ অশ্লীলতার কথা চর্চা হোক فِي الَّذِينَ آمَنُوا মুসলমানদের মধ্যে لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ দুনিয়া ও আখেরাতে وَاللَّهُ يَعْلَمُ আর আল্লাহ তা'আলা পরিজ্ঞাত আছেন وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ কিন্তু তোমরা জান না।

২০. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ না হতো وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ এবং এটাও না হতো যে, আল্লাহ বড় দয়ালু ও অনুগ্রহশীল, তবে তোমরাও রক্ষা পেতে না।

২১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে ঈমানদারগণ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না وَمَن يَتَّبِعْ আর যে ব্যক্তি অনুসরণ করে চলে خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ শয়তানের পদাঙ্ক فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ তবে সে তো নির্লজ্জ এবং অসঙ্গত কাজ করার জন্যই আদেশ করবে وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا তবে তোমাদের মধ্যে কেউ কস্মিনকালেও পবিত্র হতে পারত না وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা পাক-পবিত্র করে দেন وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ আর আল্লাহ তা'আলা সবই শুনেন, সবই জানেন।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

২২. আর তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ করে না বসে যে, তারা দান করবে না আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্রগণকে এবং আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীগণকে, আর তারা যেন ক্ষমা করে ও মার্জনা করে; তোমরা কি এটা চাও না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ত্রুটি ক্ষমা করেন; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৩. যারা (জেনার) অপবাদ দেয় সতীত্ব রক্ষাকারিণীদেরকে, (ও) এ ব্যাপারে একেবারে অনবহিত ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের প্রতি ইহলোকে ও পরলোকে লা'নত করা হচ্ছে এবং তাদের ভীষণ আজাব হবে।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. যেদিন তাদের জবানগুলো ও তাদের হস্তসমূহ এবং তাদের পদসমূহ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

২৫. সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের অবধারিত প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন এবং তারা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহই সঠিক মীমাংসাকারী, (এবং) ঘটনার স্পষ্ট ব্যক্তকারী।

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. وَلَا يَأْتَلِ আর তারা যেন শপথ না করে বসে যে أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী أَن يُؤْتُوا তারা দান করবে না أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্রগণকে وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ এবং আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীগণকে وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا আর তারা যেন ক্ষমা করে ও মার্জনা করে أَلَا تُحِبُّونَ তোমরা কি এটা চাওনা যে أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ত্রুটি ক্ষমা করেন وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৩. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ যারা অপবাদ দেয় الْمُحْصَنَاتِ সতীত্ব রক্ষাকারিণীদেরকে الْغَافِلَاتِ এ ব্যাপারে একেবারে অনবহিত الْمُؤْمِنَاتِ ঈমানদার নারীদেরকে لُعِنُوا তাদের প্রতি লা'নত করা হচ্ছে فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ইহলোকে ও পরলোকে وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ এবং তাদের ভীষণ আজাব হবে।

২৪. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ যে দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে أَلْسِنَتُهُمْ তাদের জবানগুলো وَأَيْدِيهِمْ ও তাদের হস্ত সমূহ وَأَرْجُلُهُم এবং তাদের পদসমূহ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।

২৫. يَوْمَئِذٍ সেদিন يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ আল্লাহ তাদেরকে তাদের অবধারিত প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন وَيَعْلَمُونَ এবং তারা বুঝতে পারবে যে أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ আল্লাহই সঠিক মীমাংসাকারী (এবং) ঘটনার স্পষ্ট ব্যক্তকারী।

২৬. অপবিত্রা নারীগণ– অপবিত্র পুরুষদের জন্য এবং অপবিত্র পুরুষগণ-অপবিত্রা নারীদের জন্য উপযোগী, আর পবিত্রা নারীগণ-পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষগণ-পবিত্রা নারীদের জন্য উপযোগী, তাঁরা ঐ কথা হতে পবিত্র যা তারা বলে বেড়াচ্ছে, তাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. اَلْخَبِيْثٰتُ অপবিত্রা নারীগণ لِلْخَبِيْثِيْنَ অপবিত্র পুরুষদের জন্য وَالْخَبِيْثُوْنَ এবং অপবিত্র পুরুষগণ لِلْخَبِيْثٰتِ অপবিত্রা নারীদের জন্য উপযোগী وَالطَّيِّبٰتُ আর পবিত্রা নারীগণ لِلطَّيِّبِيْنَ পবিত্র পুরুষদের জন্য وَالطَّيِّبُوْنَ এবং পবিত্র পুরুষগণ لِلطَّيِّبٰتِ পবিত্রা নারীদের জন্য উপযোগী اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ তারা ঐ কথা হতে পবিত্র مِمَّا يَقُوْلُوْنَ যা তারা বলে বেড়াচ্ছে لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. [٢٢]

শানে নুযূল : হযরত মিসতাহ ইবনে আছাছাহ (রা.) ছিলেন একজন মুহাজির বদরী সাহাবী, তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকটাত্মীয় ও দরিদ্র ছিলেন। তিনি তার খালাত ভাই মতান্তরে ভাগ্নে ছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তার জীবন নির্বাহে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ রটনা করার সাথে হযরত মিসতাহ (রা.) জড়িত থাকার কারণে হযরত আবূ বকর (রা.) তাকে কোনো প্রকারের সাহায্য সহযোগিতা করবেন না বলে শপথ গ্রহণ করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তার প্রতি যে সহযোগিতা করে আসছিলেন, তা যেন বন্ধ না করেন, সে জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.) সে সহযোগিতা পূর্বের ন্যায় যথারীতি চালু রাখবেন বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। –[কুরতুবী ১৮৫/১২, তাবারী ২৮৯/৯, ফাতহুল কাদীর ১৮/৪, ইবনে কাছীর ২৮৪/৩, রূহুল মা'আনী ১২৫/৯, দুররে মানছূর ৩১/৫]

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ [٢٣]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত নির্দিষ্টভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে।
–[ইবনে কাছীর ২৮৫/৩, দুররে মানছূর ৩৫/৫, ফাতহুল কাদীর ১৮/৪]

اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولٰئِكَ مُبَرَّؤُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ [٢٦]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং হযরত আয়েশা (রা.) এর প্রতি যারা অপবাদ রটনা করেছিল, তাদের মন্দাচারী সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে।
–[ইবনে কাছীর ২৮৬/৩]

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ –যারা এই অপবাদে কোনো-না-কোনোরূপে অংশগ্রহণ করেছিল, এই আয়াতে পুনরায় তাদের নিন্দা এবং ইহকাল ও পরকালের শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, যারা এরূপ খবর রটনা করে, তারা যেন মুসলমানদের মধ্যে ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার প্রসারই কামনা করে।

নির্লজ্জতা দমনের কুরআনী ব্যবস্থা ও একটি জরুরি উপায়, যার উপেক্ষার ফলে আজ নির্লজ্জতার প্রসার ঘটেছে : কুরআন পাক নির্লজ্জতা দমনের জন্য এই বিশেষ কর্মসূচি তৈরি করেছে যে, প্রথমত এ ধরনের সংবাদ কোথাও রটিত হতে পারবে না। রটিত হলেও শরিয়তসম্মত প্রমাণ সহকারে রটিত হতে হবে, যাতে রটনার সাথে সাথে সাধারণ সমাবেশে ব্যভিচারের হদ্দ প্রয়োগ করে রটনাকেই দমনের উপায় করে দেওয়া যায়। যে ক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত প্রমাণ নেই, সেখানে এ ধরনের নির্লজ্জতার শাস্তিবিহীন সংবাদ চালু করা ও ব্যাপক প্রচার করা সাধারণভাবে মানুষের মন থেকে নির্লজ্জতার ও ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা হ্রাস করে দিতে এবং অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে। আজকাল পত্র-পত্রিকায় প্রত্যহ দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের সংবাদ প্রত্যহ প্রত্যেক পত্রিকায় ঢালাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা সেগুলো পাঠ করে। এর অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, আস্তে আস্তে এই দুষ্কর্ম তাদের কাছে হালকা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই কুরআন পাক এ ধরনের সংবাদ প্রদানের অনুমতি তখনই দেয়, যখন এর সাথে শরিয়তসম্মত প্রমাণ থাকে। ফলে এর সাথে সাথে এই নির্লজ্জতার ভয়াবহ শাস্তিও দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে এসে যাবে। প্রমাণ ও শাস্তি ছাড়া এ ধরনের সংবাদ প্রচারকে কুরআন মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতা ছড়ানোর উপায়রূপে আখ্যা দিয়েছে। আফসোস, মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করত! এই আয়াতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নির্লজ্জতার সংবাদ প্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। পরলোকের শাস্তি তো কিয়ামতের পরেই হবে, যা এখানে প্রত্যক্ষ করা যাবে না; কিন্তু ইহলোকের শাস্তি তো প্রত্যক্ষভাবে আসা উচিত। যাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের ইহলোকের শাস্তি তো হয়েই গেছে। যদি কোনো ব্যক্তি শর্তাবলির অনুপস্থিতির কারণে অপবাদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে দুনিয়াতেও সে কিছু না কিছু শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়াতের সত্যতার জন্য এতটুকই যথেষ্ট।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢)

সাহাবায়ে কেরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে : وَلَا يَأْتَلِ - اِئْتِلَاءُ শব্দের অর্থ কসম খাওয়া। হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ্ ও হাসসান জড়িয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ্দ প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তাঁরা খাঁটি তওবার তওফীক লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা যেমন হযরত আয়েশা (রা.)-এর দোষমুক্ততা নাজিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কবুল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ্ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হলো, তখন কন্যা-বৎসল পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহ্র প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনোরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলাবাহুল্য, কোনো বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোনো বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারো আর্থিক সাহায্য করার পর যদি বন্ধ করে দেয়, তবে গোনাহ্র কোনো কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের দলকে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের জন্যে একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তওবা এবং ভবিষ্যত সংশোধনের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বাভাবিক মনোকষ্টের কারণে গরিবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিলেন, তাদেরকেও আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে কাফ্ফারা দিয়ে দেয়। গরিবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া তাদের উচ্চমর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ তা'আলা যেমন তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

হযরত মিসতাহ্কে আর্থিক সাহায্য করা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর দায়িত্ব বা ওয়াজিব কর্তব্য ছিল না; তাই আল্লাহ তা'আলা কথাটি এভাবে বলেছেন : যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ তা'আলা ধর্মীয় উৎকর্ষতা দান করেছেন এবং যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার আর্থিক সামর্থ্যও রাখে, তাদের এরূপ কসম খাওয়াই উচিত নয়। আয়াতে أُولُوا الْفَضْلِ ও وَالسَّعَةِ এ অর্থেই ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে : أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন? আয়াত শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ তৎক্ষণাৎ বলে উঠেন : وَاللّٰهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِي অর্থাৎ আল্লাহর কসম আল্লাহ আমাকে মাফ করুন, আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি হযরত মিসতাহর আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন : এ সাহায্য কোনো দিন বন্ধ হবে না। –[বুখারী, মুসলিম]

এধরণের উচ্চাঙ্গের চরিত্রগুণ দ্বারাই সাহাবায়ে কেরাম লালিত হন। বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا –অর্থাৎ যারা আত্মীয়দের অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়, তারাই আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়; বরং প্রকৃত আত্মীয়তার হক আদায়কারী সেই ব্যক্তি, যে আত্মীয়গণ কর্তৃক সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও তাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখে।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ –এই আয়াতে বাহ্যত ইতঃপূর্বে অপবাদের আয়াতে বর্ণিত সেই বিষয়বস্তু পুনরায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا وَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা শেষোক্ত আয়াতের শেষে তওবাকারীদের ব্যতিক্রম এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরূপ নেই; বরং ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহকালের ও পরকালের অভিশাপ এবং গুরুতর শাস্তি উল্লিখিত আছে। এতে বোঝা যায় যে, এই আয়াত তাদের সাথে সম্পর্কশীল, যারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর চরিত্রে অপবাদ আরোপ করার পর তওবা করে নি। এমন কি কুরআনে তাঁর দোষমুক্ততা নাজিল হওয়ার পরও তারা এই দুরভিসন্ধিতে অটল ও অপবাদ চর্চায় মশগুল থাকে। বলাবাহুল্য, এ কাজ কোনো মুসলমান দ্বারা সম্ভবপর নয়। কোনো মুসলমানও কুরআনের এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। তাই এই বিষয়বস্তু মুনাফিকদের সম্পর্কে, যারা দোষমুক্ততার আয়াত নাজিল হওয়ার পরও এই অপবাদবৃত্তি পরিত্যাগ করে নি। তারা যে কাফের মুনাফিক, এ ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। তওবাকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهُ বলে উভয় জাহানে রহমতপ্রাপ্ত আখ্যায়িত করেছেন। যারা তওবা করে নি, তাদেরকে এই আয়াতে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলেছেন। তওবাকারীদেরকে আজাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করেনি, তাদের জন্য গুরুতর আজাবের হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। তওবাকারীদেরকে إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ বলে মাগফেরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করে নি তাদেরকে পরবর্তী يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ আয়াতে ক্ষমাপ্রাপ্ত না হওয়ার এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন। –[বয়ানুল-কুরআন]

একটি জরুরি হুশিয়ারী : হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা.)-এর প্রতি অপবাদের ব্যাপারে কতক মুসলমানও অংশগ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু এটা তখনকার ব্যাপার ছিল, যখন কুরআনে দোষমুক্ততার আয়াত নাজিল হয় নি। আয়াত নাজিল হওয়ার পর যে ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহে কাফের, কুরআনে অবিশ্বাসী। যেমন শিয়াদের কোনো কোনো দল ও ব্যক্তিকে এতে লিপ্ত দেখা যায়। তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফের।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ যেদিন তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহ্বা ও হস্তপদ কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যে গোনাহ্গার তার গোনাহ্ স্বীকার করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গোনাহ্ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি; পরিদর্শক ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছে, তখন তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্য দেবে। اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ আয়াতে একথাই বর্ণিত

হয়েছে। তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে। উভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ তারা তাদের জিহ্বাকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে না যে, সত্য মিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে, বরং তাদের জিহ্বা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা স্বীকার করবে। এটাও সম্ভবপর যে, এক সময় মুখ ও জিহ্বাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর জিহ্বাকে সত্য কথা বলার আদেশ প্রদান করা হবে।

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে উপযুক্ত। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্র নারীকুলের জন্যে উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

এই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমত সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। দুশ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষদের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সচ্চরিত্রা নারীদের আগ্রহ সচ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং সচ্চরিত্র পুরুষদের আগ্রহ সচ্চরিত্রা নারীদের প্রতি হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়।

এই সামগ্রিক অভ্যাস ও রীতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যেহেতু পয়গম্বরগণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার মূর্তপ্রতীক ছিলেন তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের মর্তবানুযায়ী উপযুক্তা পত্নী দান করেন। এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় তাঁরই মতো রমণীকুল দান করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এই বিবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টতমা ছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিই যার ঈমান নেই, কেবল সে-ই হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। কুরআন পাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ.)-এর বিবিগণ কাফের ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, কাফের হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : مَا بَغَتْ اِمْرَاَةُ نَبِيٍّ قَطُّ অর্থাৎ কোনো পয়গম্বরের বিবিই কোনোদিন ব্যভিচার করেনি। (দুররে-মানসূর) এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরের বিবি কাফের হবে- এটা তো সম্ভবপর, কিন্তু ব্যভিচারিণী হবে– এটা সম্ভবপর নয়। কেননা, ব্যভিচারী স্বাভাবিকভাবেই জনগণের ঘৃণার পাত্র। কিন্তু কুফর প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণার কারণ হয় না। –[বয়ানুল–কুরআন]

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُحِبُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْبَابٌ মূলবর্ণ (ح - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা চায়।

اَنْ تَشِيْعَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার شُيُوْعٌ মূলবর্ণ (ش - ى - ع) জিনস اجوف يائى অর্থ– চর্চা হোক।

لَا تَتَّبِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّبَاعٌ মূলবর্ণ (ت - ب - ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অনুসরণ করে চলো না।

يُزَكِّىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْكِيَةٌ মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি পাক-পবিত্র করে দেন।

لَا يَأْتَلِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِئْتِلَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ل ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– তারা যেন শপথ করে না বসে।

اَنْ يُّؤْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– তারা দান করবে না।

وَلْيَعْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَفْوٌ মূলবর্ণ (ع ـ ف ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা যেন ক্ষমা করে।

وَلْيَصْفَحُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব فَتَحَ মাসদার صَفْحٌ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তারা যেন মার্জনা করে।

يُوَفِّيْهِمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْفِيَةٌ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তিনি তাদেরকে পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন।

مُبَرَّءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْرِئَةٌ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তারা পবিত্র।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ : এখানে واو আতেফা لٰكِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল তার اَللّٰهَ তার اسم আর يُزَكِّىْ বাক্যটি তার খবর مَنْ يَّشَاءُ হলো يُزَكِّىْ এর মাফউল আর وَاللّٰهُ মুবতাদা আর سَمِيْعٌ হলো প্রথম খবর আর عَلِيْمٌ হলো দ্বিতীয় খবর। –[ই'রাবুল কুরআন ৫/২৬১]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৭. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অপরের গৃহসমূহে প্রবেশ করিও না, যে পর্যন্ত না (তাদের হতে) অনুমতি গ্রহণ কর এবং (তৎপূর্বে) তার বাসিন্দাগণকে সালাম কর; এ পন্থাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۲۸﴾

২৮. অতঃপর যদি সে ঘরে কেউ আছে বলে তোমরা জানতে না পার, তবে তোমরা সে ঘরে প্রবেশ করো না যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়, আর যদি তোমাদেরকে বলে দেওয়া হয় যে, ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে এসো, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলির সকল খবরই অবগত আছেন।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿۲۹﴾

২৯. এরূপ ঘরে প্রবেশ করলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না– যেখানে কেউ (স্থায়ীভাবে) বাস করে না, (এবং) তথায় তোমাদের কোনো জিনিস রয়েছে; আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ্যে করে থাক এবং যা কিছু গোপনে করে থাক সবই আল্লাহ জানেন।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩০. আপনি মুসলমান পুরুষদেরকে বলে দিন, যেন তারা স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজ নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কথা; নিশ্চয় আল্লাহ সবই জানেন– তারা যা কিছু করে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا তোমরা অপরের গৃহসমূহে প্রবেশ করো না غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ নিজেদের গৃহ ব্যতীত حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا যে পর্যন্ত না অনুমতি গ্রহণ কর وَتُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا এবং তার বাসিন্দাগণকে সালাম কর ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এ পন্থাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণ কর لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর

২৮. فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ اَحَدًا অতঃপর যদি সে ঘরে কেউ আছে বলে তোমরা জানতে না পার فَلَا تَدْخُلُوْهَا তবে তোমরা সে ঘরে প্রবেশ করো না حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ আর যদি তোমাদেরকে বলে দেওয়া হয় যে ارْجِعُوْا ফিরে যাও فَارْجِعُوْا তবে তোমরা ফিরে এসো هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ এটাই তোমাদের জন্য উত্তম وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ, আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলির সকল খবরই অবগত আছেন।

২৯. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ তোমাদের কোনো পাপ হবে না اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا এরূপ ঘরে প্রবেশ করলে غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ যেখানে কেউ বাস করে না فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ তথায় তোমাদের কোনো জিনিস রয়েছে وَاللّٰهُ يَعْلَمُ, আর সবই আল্লাহ জানেন مَا تُبْدُوْنَ তোমরা যা কিছু প্রকাশ্যে করে থাক وَمَا تَكْتُمُوْنَ এবং যা কিছু গোপনে করে থাক।

৩০. قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ আপনি মুসলমান পুরুষদেরকে বলে দিন يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ যেন তারা স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখে وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ, এবং নিজ নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কথা اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ নিশ্চয় আল্লাহ সবই জানেন তারা যা কিছু করে থাকে।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১. আর মুসলমান নারীদেরকে বলে দিন, যেন স্বীয় দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখে আর নিজ নিজ লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে এবং স্বীয় যীনতসমূহ প্রকাশ না করে, কেবল সেই স্থানসমূহ ব্যতীত যা (সাধারণত) খোলা থাকে, আর যেন নিজের চাদর স্বীয় বক্ষের উপর জড়িয়ে রাখে, আর যেন স্বীয় যীনতসমূহ প্রকাশ হতে না দেয়, কিন্তু স্বীয় স্বামীর সমক্ষে, কিংবা স্বীয় পিতার সমক্ষে, কিংবা স্বীয় স্বামীর পিতার সমক্ষে, কিংবা নিজ পুত্রদের, কিংবা নিজ স্বামীর পুত্রগণের, কিংবা নিজ ভ্রাতাগণের, কিংবা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রগণের, কিংবা স্বীয় ভগ্নীর পুত্রগণের, কিংবা স্বীয় (স্বধর্মী) নারীগণের, কিংবা স্বীয় ক্রীতদাসীগণের, কিংবা ঐ সমস্ত পুরুষগণের যারা (কেবল খাওয়া পরার উদ্দেশ্যে) সঙ্গে থাকে এবং তাদের (অনুভূতি না থাকায় নারীদের প্রতি) কিছুই আকর্ষণ হয় না, কিংবা ঐ সমস্ত বালকের– যারা নারীদের গুপ্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ (এ সমস্ত লোকের সমক্ষে যীনত মুক্ত করাতে কোনো দোষ নেই,) আর যেন তারা নিজেদের পা সজোরে না ফেলে যাতে তাদের আবৃত অলংকার উপলব্ধি করা যায়; আর হে মুসলমানগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, যেন তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ আর মুসলমান নারীদেরকে বলে দিন يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ যেন স্বীয় দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখে وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ আর নিজ নিজ লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ এবং স্বীয় যীনতসমূহ প্রকাশ না করে اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا কেবল সেই স্থানসমূহ ব্যতীত যা (সাধারণত) খোলা থাকে وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ আর যেন নিজের চাদর জড়িয়ে রাখে عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ স্বীয় বক্ষের উপর وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ আর যেন স্বীয় যীনত সমূহ প্রকাশ হতে না দেয় اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ কিন্তু স্বীয় স্বামীর সম্মুখে اَوْ اٰبَآئِهِنَّ কিংবা স্বীয় পিতার সমক্ষে اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ কিংবা স্বীয় স্বামীর পিতার সমক্ষে اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ কিংবা নিজ পুত্রদের اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ কিংবা নিজ স্বামীর পুত্রগণের اَوْ اِخْوَانِهِنَّ কিংবা নিজ ভ্রাতাগণের اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ কিংবা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রগণের اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ কিংবা স্বীয় ভগ্নীর পুত্রগণের اَوْ نِسَآئِهِنَّ কিংবা স্বীয় (স্বধর্মী) নারীগণের اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ কিংবা স্বীয় ক্রীতদাসীগণের اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ কিংবা ঐ সমস্ত পুরুষগণের যারা সঙ্গে থাকে এবং তাদের কিছু আকর্ষণ হয় না اَوِ الطِّفْلِ কিংবা ঐ সমস্ত বালকের الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ যারা নারীদের গুপ্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ আর যেন তারা নিজেদের পা সজোরে না ফেলে لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ যাতে তাদের আবৃত অলঙ্কার উপলব্ধি করা যায় وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا আর তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ হে মুসলমানগণ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ যেন তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ [٢٧]

শানে নুযূল : হযরত আদী ইবনে ছাবেত এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম তাবারী (র.) বলেন যে, আনসারী কোনো এক মহিলা হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি আমার ঘরে এমন অবস্থায় থাকি, যে অবস্থায় আমার পিতা পুত্র কেউ এসে আমাকে দেখতে পাক তা আমি আদৌ পছন্দ করিনা। এমতাবস্থায় আমার পিতা এসে আমার নিকট গমন করেন এবং আমার পরিবারে অন্যান্য লোকজনও এসে প্রবেশ করে। তৎকালে আমি সে অবস্থায়ই থেকে যাই। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে আমি কি করতে পারি? আনসারী মহিলা কর্তৃক পেশকৃত সে সমস্যার সমাধান কল্পে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে পরিবারিকভাবে চলাফেরা করার জন্য একটি নীতিমালা বেধে দিয়েছেন। –[কুরতুবী ১৯১/১২, ইবনে কাছীর ২৮৯/৩, তাবারী ২৯৭/৯, রূহুল মা'আনী ১৩৩/৯/১৮, দুররে মানছূর ৩৮/৫, ফাতহুল কাদীর ২০/৪, বাহরে মুহীত্ব ৪১০/৬, সাভী ১৩৫/৩]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ [٢٩]

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম মুকাতিল এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কুরাইশের অনেক বণিকইতো মক্কা, মদিনা, সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাসে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিচরণ করে, রাস্তার ধারে অনেক গৃহই নির্মিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সে ঘরগুলোতে মানুষেরা বসবাস করে না, সে গৃহগুলোতে প্রবেশ করার জন্যে কিভাবে অনুমতি গ্রহণ করবে? এ সকল ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিধানে আংশিক শৈথিল্য করে যে সকল ঘরে বসবাস করা হয় না সে সকল ঘরে অনুমতি গ্রহণ করা ব্যতিরেকেই প্রবেশ করার বৈধতা করে দেন।

–[রূহুল মা'আনী ১৩৭/৯/১৮, কুরতুবী ১৯৯/১২, দুররে মুনছুর ৪০/৫, সাভী ১৩৬/৩]

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ [٣٠]

শানে নুযূল : ইবনে মারদূভিয়া হযরত আলী (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় এক লোক মদিনায় কোনো এক গলি পথে যাচ্ছিল। তখন একটি রমণীর প্রতি তার দৃষ্টি পতিত হয়। মহিলারও তার প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। শয়তান সে দু'জনের মাঝে কু'মন্ত্রনা যুগিয়ে দেয়; ফলে তারা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তাকাতে থাকে। পুরুষ লোকটি একটি দেয়ালের দিকে চলতেছিল। দেয়ালের কাছে যখন গিয়ে পৌছল হঠাৎ করে দেয়ালে ধাক্কা খায়। এতে তার নাক ফেটে যায়। তখন সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তা ধৌত করবনা। সুতরাং সে লোকটি রক্তাক্ত অবস্থায়ই রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন। তা শোনে রাসূল ﷺ বললেন, هٰذَا عُقُوْبَةُ ذَنْبِكَ এ হলো তোমার গুনাহের শাস্তি। সে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৩৮/৯/১৮, ফাতহুল কাদীর ২৫/৫]

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ .... وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ [٣١]

শানে নুযূল : মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (র.) বর্ণনা করেন, আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌছেছে যে, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে মারছাদ তার বনী হারেছার একটি কক্ষে ছিল। মহিলারা সাজ সজ্জা পরে আসতে লাগল। তখন তাদের পায়ের নূপুর, বক্ষদেশ ও মাথার চুলের খুপরীগুলো দেখা যাচ্ছিল। তাদের অবস্থা দেখে হযরত আসমা (রা.) বললেন যে, এ তো অত্যন্ত কুৎসিত ও অশোভনীয় বিষয়। সে প্রেক্ষাপটের দৃষ্টিকোণে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ২৭১/৩, দুররে মানছূর ৪১/৫]

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ [٣١]

শানে নুযূল : জাহিলিয়া যুগের মহিলারা রাস্তায় যখন বের হতো, তখন তারা পায়ে নূপুর ব্যবহার করত। নূপুরের ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ সৃষ্টির জন্যে পা দ্বারা জমিনে আঘাত করে চলত, যাতে পুরুষেরা সে আওয়াজ শুনতে পায়। এতে করে তাদের অন্তর মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মহিলাদেরকে এহেন চরিত্রহরণ মূলক চলা-ফেরা করা থেকে বিরত থাকার জন্যে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত্ব ৪১৪/৬, ইবনে কাছীর ২৯৪/৩]

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ [٣١]

শানে নুযূল : আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন যে, তৎকালে একশ্রেণির মহিলারা এ প্রকৃতির ছিল যে, তারা যখন বাহিরে চলা ফেরা করত, তখন তারা উড়না দিয়ে তাদের মাথা আবরণ করত এবং উড়নার অপর একটি মাথা পিছন দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখত। এ ধরনের চলা-ফেরা করা মূলত শিষ্টাচার বিরোধী বিধায় এ ভাবে চলা-ফেরা করতে নিষেধ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[২০৯/১২]

পঞ্চম বিধান অনুমতি গ্রহণ এবং দেখা-সাক্ষাতের শিষ্টাচার এবং কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা : সূরা নূরের শুরু থেকেই আশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা দমন করার জন্য এতদসম্পর্কিত অপরাধসমূহের শাস্তির বর্ণনা এবং বিনা প্রমাণে কারো প্রতি অপবাদ আরোপের নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এসব অশ্লীলতা দমন এবং সতীত্ব সংরক্ষণের জন্য এমন বিধানাবলি দেওয়া হয়েছে, যাতে নির্লজ্জতা সুগম হবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলি এসবের অন্যতম। অর্থাৎ কারো গৃহে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা এবং উঁকি দিয়ে দেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাহ্রাম নয় এমন নারীদের উপর দৃষ্টি না পড়া এর অন্যতম রহস্য। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিভিন্ন প্রকার গৃহের বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে।

গৃহ চার প্রকার : ১. নিজস্ব বাসগৃহ, যাতে অন্য কারো আসার সম্ভবনা নেই; ২. যে গৃহে অন্য লোকও থাকে, যদিও সে মাহ্রাম হয় অথবা যাতে অন্যের আসার সম্ভাবনা আছে; ৩. যে গৃহে কারো কার্যত থাকা অথবা না থাকা উভয়েরই সম্ভাবনা আছে; ৪. যে গৃহ কোনো বিশেষ ব্যক্তির বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট নয়; যেমন মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ্ ইত্যাদি সাধারণের আসা-যাওয়ার স্থান। প্রথম প্রকার গৃহের বিধান তো সুপরিজ্ঞাত যে, এতে প্রবেশের জন্য কারো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই আয়াতে পরিষ্কারভাবে এই বিধান উল্লেখ করা হয়নি। অবশিষ্ট তিন প্রকার গৃহের প্রথম প্রকার হলো, এমন গৃহ যা নিজেদের বিশেষ বসবাসের জন্য নয় এবং যাতে অন্য লোক বসবাস করে চাই তারা মাহরাম হোক অথবা যাতে অন্যের আসার সম্ভবনা আছে। চাই সেসব গৃহ তাদের মালিকানাধীন হোক কিংবা বসবাসের জন্য ধার করা হোক কিংবা ভাড়া করা হোক -এ ধরণের গৃহে প্রবেশের পূর্বে প্রথম সালাম দিতে হবে অতঃপর অনুমতি নিতে হবে। অবশিষ্ট তিন প্রকার গৃহের দ্বিতীয় প্রকার হলো।

এমন গৃহ যাতে কারো কার্যত থাকা অথবা না থাকা উভয়েরই সম্ভাবনা রয়েছে। এ ধরণের গৃহেও প্রবেশের পূর্বে অনুমতির প্রয়োজন আছে। চাই গৃহে কোনো মানুষ না থাকারই ধারণা হোক না কেন। কারণ, হতেও তো পারে যে, সেখানে কোনো মানুষ আছে– যে সম্পর্কে আমার ধারণা নাই। তাছাড়া ভিতরে কেউ না থাকলেও কারো গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা তার মালিকানায় অবৈধ হস্তক্ষেপের শামিল, যা জায়েজ নয়। যদি অনুমতি মিলে যায় তাহলে তো ভালো। আর যদি ভেতর হতে বলা হয় যে, পরে এসো, এখন ফিরে যাও তাহলে ফিরে আসা বিধেয়। একগুয়েমি করে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয় যে, সে তো এক পর্যায়ে বের হবেই। আর যদি ভেতর থেকে হ্যাঁ বা না-কোনো উত্তরই না আসে, তা এই মনে করে তিনবার অনুমতি চাবে যে, হয়তো সে শুনে নি। তিন বারের পরও যদি কোনো উত্তর পাওয়া না যায় তাহলে ফিরে আসা উচিৎ।

অবশিষ্ট তিন প্রকার গৃহের তৃতীয় প্রকার হলো এমন গৃহ যা বিশেষ কোনো ব্যক্তির বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ যাতে কেউ বাগৃহ হিসেবে বসবাস করে না এবং এসব গৃহ ভোগ করারও ব্যবহার করার অনুমতি সবারই থাকে। যেমন মসজিদ, মাদরাসা, খানকাই ইত্যাদি। এমন গৃহে প্রবেশের জন্য বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন নেই।

কুরআনী সামাজিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় : কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রথমে তার অনুমতি নাও, অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে প্রবেশ করো না : পরিতাপের বিষয়, ইসলামি শরিয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কুরআনে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জোর দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন। লেখা-পড়া জানা সৎ লোকেরাও একে গোনাহ্ মনে

করে না এবং একে বাস্তবায়িত করার চেষ্টাও করে না। জগতের অন্যান্য সভ্যজাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত করে নিয়েছে, কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামি বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানের প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন শুরু হয়েছে। মোটকথা, অনুমতি চাওয়া কুরআন পাকের একটি অপরিহার্য বিধান, যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তনকেও হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) কুরআনের আয়াত অস্বীকার করার মতো গুরুতর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা এসব বিধানের প্রতি এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, যেন তাদের মতে এগুলো কুরআনের বিধানই নয়। ইন্নালিল্লাহ ....

অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক, সর্বাবস্থায় তারই গৃহ তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম। কুরআন পাক অমূল্য নিয়ামতরাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছে : جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্যে শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেওয়ার নামান্তর। এটা খুবই কষ্টের কথা। ইসলাম কাউকে অহেতুক কষ্ট দেওয়াকে হারাম করেছে। অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলির একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি ও কষ্টদান থেকে বিরত থাকা, যা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও বটে। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাৎপ্রার্থীর। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাৎ করবে, তখন প্রতিপক্ষ তার বক্তব্য যত্নসহকারে শুনবে। তার কোনো অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীত অভদ্রজনোচিত পন্থায় কোনো ব্যক্তির উপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে আকস্মিক বিপদ মনে করে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং হিতাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা থাকলেও তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার পাপে পাপী হবে।

তৃতীয় উপকারিতা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন : কারণ বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করলে মাহ্‌রাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোনো রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। এদিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলিকে কুরআন পাক ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদি শাস্তির বিধি-বিধান সংলগ্নে বর্ণনা করেছে।

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ করে, যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। করো গোপন কথা জবরদস্তি জানার চেষ্টা করাও গোনাহ্ এবং অপরের জন্যে কষ্টের কারণ। অনুমতি গ্রহণের কিছু মাসআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিবিধ মাসআলা পরে বর্ণিত হবে।

মাসআলা : আয়াতে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা পুরুষের জন্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নারীরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত; যেমন কুরআনের অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদের সম্বোধন করা সত্ত্বেও মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কতিপয় বিশেষ মাসআলা এর ব্যতিক্রম। তবে এগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে বিশেষত্বের কথাও বর্ণনা করে দেওয়া হয়। সাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীগণের অভ্যাসও তাই ছিল। তাঁরা কারো গৃহে গেলে প্রথমে অনুমতি নিতেন। হযরত উম্মে আয়াস (রা.) বলেন : আমরা চার জন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে যেতাম এবং প্রথমে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম। –[ইবনে কাছীর]

মাসআলা : এই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা গেল যে, অন্য কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেওয়ার বিধানে নারী, পুরুষ, মাহ্‌রাম ও গায়রে মাহ্‌রাম সবাই শামিল রয়েছে। নারী নারীর কাছে গেলে অথবা পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সবার জন্যেই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব! এমনিভাবে এক ব্যক্তি যদি তার মা, বোন অথবা কোনো মাহ্‌রাম নারীর কাছে যায়, তবুও অনুমতি চাঁওয়া আবশ্যক। ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল : আমি আমার মাতার কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব? তিনি বললেন : হ্যাঁ, অনুমতি চাও। সে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো আমার মাতার গৃহেই বসবাস করি। তিনি বললেন, তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। তুমি কি তোমার মাতাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? সে বলল : না। তিনি বললেন : তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। কেননা গৃহে কোনো প্রয়োজনে তার অপ্রকাশযোগ্য কোনো অঙ্গ খোলা থাকতে পারে। –[মাযহারী]

এই হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে তোমাদের নিজেদের গৃহ বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একা থাকে- পিতা-মাতা, ভাই-বোন প্রমুখ থাকে না।

মাসআলা : যে গৃহে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে তাতে প্রবেশ করার জন্যে যদিও অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব নয়; কিন্তু মোস্তাহাব ও সুন্নত এই যে, সেখানেও হঠাৎ বিনা খবরে যাওয়া উচিত নয়; বরং প্রবেশের পূর্বে পদধ্বনি দ্বারা অথবা গলা ঝেড়ে হুশিয়ার করা দরকার। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী বলেন, আব্দুল্লাহ যখন বাইরে থেকে গৃহে আসতেন, তখনই প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে হুশিয়ার করে দিতেন, যাতে তিনি আমাকে অপছন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন। (ইবনে কাছীর) এক্ষেত্রে অনুমতি চাওয়া যে ওয়াজিব নয়, তা এ থেকে জানা যায় যে, ইবনে জুরায়জ হযরত আতাকে জিজ্ঞেস করলেন : নিজের স্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি চাওয়া জরুরি? তিনি বললেন : না। ইবনে কাছীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন : এর অর্থ ওয়াজিব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও মোস্তাহাব ও উত্তম।

অনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরিকা : আয়াতে حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا বলা হয়েছে; অর্থাৎ দুটি কাজ না করা পর্যন্ত কারো গৃহে প্রবেশ করো না। প্রথম اِسْتِيْنَاسٌ শাব্দিক অর্থ প্রীতি বিনিময় করা। বিশিষ্ট তাফসীরকারগণের মতে এর অর্থ অনুমতি হাসিল করা। এখানে اِسْتِيْنَاسٌ শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি লাভ করার দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়- সে আতঙ্কিত হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোনো কোনো তাফসীরকার এর অর্থ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ করা এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম করা। কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতে অগ্র-পশ্চাৎ নেই। তিনি আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যস্ত করেছেন। মাওয়ারদী বলেন, যদি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে গৃহের কোনো ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নত তরিকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে চায়।

ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দিও না। কারণ সে সুন্নত তরিকা ত্যাগ করেছে। -(রূহুল-মা'আনী) আবূ দাউদের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বাইরে থেকে বলল : اَاَلِجُ আমি কি ঢুকে পড়ব? তিনি খাদেমকে বললেন : লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলুক : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ অর্থাৎ সালাম করার পর বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কি? খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ বলল। অতঃপর তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন -(ইবনে কাছীর) বায়হাকী হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন لَا تَاْذَنُوْا لِمَنْ لَا يَبْدَاُ بِالسَّلَامِ অর্থাৎ যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না। -(মাযহারী) এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি সংশোধন করেছেন : প্রথমে সালাম করা উচিত এবং اَاَدْخُلُ -এর স্থলে اَاَلِجُ শব্দের ব্যবহার অসমীচীন। কেননা اَلِجُ শব্দটি وُلُوْجٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়া। শব্দটি মার্জিত ভাষার পরিপন্থি। মোটকথা, এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, আয়াতে যে সালাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি গ্রহণের জন্যে বাইরে থেকে এই সালাম করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এদিকে মনোনিবেশ করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে।

মাসআলা : উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এতে নিজের নাম উল্লেখ করে অনুমতি চাওয়াই উত্তম। হযরত ওমর ফারুক (রা.) তাই করতেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দ্বারে এসে বললেন اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَيَدْخُلُ عُمَرُ অর্থাৎ সালামের পর বললেন, ওমর প্রবেশ করতে পারে কি? -(ইবনে কাছীর) সহীহ্ মুসলিমে আছে, হযরত আবূ মূসা হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং অনুমতি চাওয়ার জন্যে বললেন اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا اَبُوْ مُوْسٰى اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا الْاَشْعَرِىُّ এতেও তিনি প্রথমে নিজের নাম আবূ মূসা বলেছেন, এরপর আরও নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যে আশআরী বলেছেন। এর কারণ এই যে, অনুমতি প্রার্থীকে না চেনা পর্যন্ত নিরুদ্বেগে জবাব দেওয়া যায় না।

মাসআলা : এ ব্যাপারে কোনো কোনো লোকের পন্থা মন্দ। তারা বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চায়; কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ করে না। ভেতর থেকে গৃহকর্তা জিজ্ঞাসা করে, কে? উত্তরে বলা হয়, আমি। বলাবাহুল্য, এটা জিজ্ঞাসার জবাব নয়। যে প্রথম শব্দে চেনেনি, সে 'আমি' শব্দ দ্বারা কিভাবে চিনবে?

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, আলী ইবনে আসেম বসরায় হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। দরজার কড়া নাড়লেন। হযরত মুগীরা (রা.) ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে? উত্তর হলো, انا অর্থাৎ আমি। হযরত মুগীরা (রা.) বললেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে তো কারো নাম 'আনা' নেই। এরপর তিনি বাইরে এসে তাকে হাদীস শুনালেন যে, একদিন জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুমতির জন্য দরজার কড়া নাড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে? উত্তরে জাবের (রা.) 'আনা' বলে দিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে শাসিয়ে বললেন : 'আনা' 'আনা' অর্থাৎ 'আনা' 'আনা' বললে কাউকে চেনা যায় নাকি?

মাসআলা : এর চাইতেও আরো মন্দ পন্থা আজকাল অনেক লেখাপড়া জানা লোকেরাও অবলম্বন করে থাকে। দরজায় কড়া নাড়ার পর যখন ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করা হয়, কে? তখন তারা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে– কোনো জবাবই দেয় না। এটা প্রতিপক্ষকে উদ্বিগ্ন করার নিকৃষ্টতম পন্থা। এতে অনুমতি চাওয়ার উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়।

মাসআলা : উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, দরজার কড়া নেড়ে নিজের নাম প্রকাশ করে বলে দেওয়া যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ কামনা করে– অনুমতি চাওয়ার এ পন্থাও জায়েজ।

মাসআলা : কিন্তু এত জোরে কড়া নাড়া উচিত নয়, যাতে শ্রোতা চমকে ওঠে, বরং মাঝারি ধরনের আওয়াজ দেবে, যাতে যথাস্থানে আওয়াজ পৌঁছে যায় এবং কোনোরূপ কর্কশতা প্রকাশ না পায়। যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজায় কড়া নাড়তেন তারা নখ দিয়ে দরজার কড়া নাড়তেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট না হয়। –(কুরতুবী) অনুমতি চাওয়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষকে আপন করে অনুমতি লাভ করা। যারা এই উদ্দেশ্য বোঝে তারা আপনা-আপনি সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাকে জরুরি মনে করবে। প্রতিপক্ষ কষ্ট পায়, এমন বিষয়াদি থেকে তারা বেঁচে থাকবে।

জরুরি হুঁশিয়ারি : আজকাল অধিকাংশ লোক অনুমতি চাওয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না, যা প্রকাশ্য ওয়াজিব তরক করার গোনাহ্। যারা সুন্নত তরীকায় অনুমতি নিতে চায়, তাদের জন্য বর্তমান যুগে কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়। সাধারণত যার কাছ থেকে অনুমতি নিতে চায়, সে দরজা থেকে দূরে থাকে। সেখানে সালামের আওয়াজ ও অনুমতি চাওয়ার কথা পৌঁছা মুশকিল হয়। তাই বুঝে নেওয়া উচিত যে, অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে প্রবেশ না করাটাই আসল ওয়াজিব। অনুমতি লাভ করার পন্থা প্রতি যুগে ও প্রতি দেশে বিভিন্নরূপ হতে পারে। দরজায় কড়া নাড়ার এক পন্থা তো হাদীস থেকেই জানা গেল। এমনিভাবে যারা দরজায় ঘণ্টা লাগায়, তাদের এই ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়াও অনুমতি চাওয়ার জন্য যথেষ্ট। শর্ত এই যে, ঘণ্টা বাজানোর পর নিজের নামও এমন জোরে প্রকাশ করবে, যা প্রতিপক্ষের কানে পৌঁছে। এছাড়া অন্য কোনো পন্থা কোনো স্থানে প্রচলিত থাকলে তা অবলম্বন করাও জায়েজ। আজকাল ইউরোপে পরিচয়পত্রের প্রথা চালু হয়েছে। এই প্রথা যদিও ইউরোপীয়রা চালু করেছে; কিন্তু অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য এতে সুন্দরভাবে অর্জিত হয়। অনুমতিদাতা অনুমতিপ্রার্থীর সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা জায়গায় বসে অনায়াসে জেনে নিতে পারে। তাই এই পন্থা অবলম্বন করাও দোষের কথা নয়।

মাসআলা : যদি কেউ কারো কাছে অনুমতি চায় এবং উত্তরে বলা হয়, এখন সাক্ষাৎ হতে পারবে না- ফিরে যান, তবে একে খারাপ মনে না করা উচিত। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা ও চাহিদা বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সে বাইরে না আসতে বাধ্য হয় এবং আপনাকেও ভেতরে ডেকে নিতে পারে না। এমতাবস্থায় তার ওজর মেনে নেওয়া উচিত। উল্লিখিত আয়াতেরও নির্দেশ তাই। বলা হয়েছে :

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ –অর্থাৎ যদি আপনাকে আপাতত ফিরে যেতে বলা হয়, তখন আপনার হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসা উচিত। একে খারাপ মনে করা অথবা সেখানেই অটল হয়ে বসে থাকা উভয়ই অসঙ্গত। পরবর্তী কালের জনৈক বুযুর্গ বলেন : আমি সারা জীবন এই আশায় ছিলাম যে, কারো কাছে গিয়ে অনুমতি চাই এবং সে আমাকে জবাবে ফিরে যেতে বলে, তখন আমি ফিরে এসে কুরআনের এই আদেশ পালনের ছওয়াব হাসিল করি; কিন্তু হায়, এই নিয়ামত কখনো আমার ভাগ্যে জুটল না।

মাসআলা : ইসলামি শরিয়ত সুন্দর সামাজিকতা শিক্ষা দিয়েছে এবং সবাইকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য দ্বিমুখী সুষম ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এই আয়াতে যেসব আগন্তুককে অনুমতি না দিলে এবং ফিরে যেতে বললে হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে এক হাদীসে এর অপর পিঠ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا অর্থাৎ সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিরও আপনার উপর হক আছে। তাকে কাছে ডাকুন, বাইরে তার সাথে মোলাকাত করুন, তার সম্মান করুন, কথা শুনুন এবং গুরুতর অসুবিধা ও ওজর ছাড়া সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করবেন না। এটাই তার হক।

মাসআলা : কারো দরজায় অনুমতি চাইলে যদি ভেতর থেকে জবাব না আসে, তবে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার অনুমতি চাওয়া সুন্নত। যদি তৃতীয়বারও জবাব না আসে, তবে ফিরে আসারই নির্দেশ আছে। কারণ তৃতীয়বার বলতে এটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আওয়াজ শুনেছে; কিন্তু নামাজরত থাকা অথবা গোসলরত থাকা অথবা পায়খানায় থাকার কারণে সে জবাব দিতে পারছে না। কিংবা এমুহূর্তে তার সাক্ষতের ইচ্ছা নেই। উভয় অবস্থায় সেখানে অটল হয়ে থাকা এবং অবিরাম কড়া নাড়াও কষ্টের কারণ, যা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। অনুমতি চাওয়ার আসল লক্ষ্যই কষ্ট দান থেকে বেঁচে থাকা।
হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে কারীম ﷺ বললেন : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ –অর্থাৎ তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি জবাব না আসে, তবে ফিরে আসা উচিত। –(ইবনে কাছীর) মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সাদ ইবনে ওবাদার গৃহে গমন করলেন এবং বাইরে থেকে অনুমতি চাওয়ার জন্য সালাম করলেন। হযরত সাদ সালামের জবাব দিলেন; কিন্তু খুবই আস্তে, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ না শোনেন। তিনি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার সালাম করলেন। হযরত সা'দ প্রত্যেকবার শুনতেন এবং আস্তে জবাব দিতেন। তিনবার এরূপ করার পর তিনি ফিরে আসলেন। সা'দ যখন দেখলেন যে, আওয়াজ আসছে না, তখন গৃহ থেকে বের হয়ে পিছনে দৌড় দিলেন এবং ওজর পেশ করে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি প্রত্যেকবার আপনার আওয়াজ শুনেছি এবং জবাবও দিয়েছি, কিন্তু আস্তে দিয়েছি, যাতে আপনার পবিত্র মুখ থেকে আমার সম্পর্কে আরো বেশি সালামের শব্দ উচ্চারিত হয়। এটা আমার জন্যে বরকতময়। অতঃপর তিনি তাকে সুন্নত বলে দিলেন যে, তিনবার জবাব পাওয়া না গেলে ফিরে যাওয়া উচিত। এরপর হযরত সা'দ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গৃহে নিয়ে যান এবং কিছু খাবার পেশ করেন। তিনি তা কবুল করেন।
হযরত সা'দের এই কার্য ছিল অধিক ইশক ও মহব্বতের প্রতিক্রিয়া। তখন তিনি এদিকে চিন্তাও করেন নি যে, দু'জাহানের সরদার হুযুর পাক ﷺ দরজায় উপস্থিত আছেন। কালবিলম্ব না করে তাঁর পদচুম্বন করা উচিত। বরং তাঁর চিন্তাধারা এদিকে নিবদ্ধ ছিল যে, রাসূলে পাক ﷺ-এর পবিত্র মুখ থেকে আমার উদ্দেশে যত বেশি 'আসসালামু আলাইকুম' শব্দ উচ্চারিত হবে, আমার জন্য তা ততবেশি কল্যাণকর হবে। মোটকথা, এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর জবাব না আসলে ফিরে যাওয়া সুন্নত। সেখানেই অটল হয়ে বসে যাওয়া সুন্নত বিরোধী এবং প্রতিপক্ষের জন্য কষ্টদায়ক।

মাসআলা : এই বিধান তখনকার জন্য, যখন সালাম, কড়া নাড়া ইত্যাদির মাধ্যমে অনুমতি লাভ করার জন্য তিনবার চেষ্টা করা হয়। তখন সেখানে অনড় হয়ে বসে যাওয়া কষ্টদায়ক। কিন্তু যদি কোনো আলেম অথবা বুযুর্গের দরজায় অনুমতি চাওয়া ব্যতীত ও খবর দেওয়া ব্যতীত এই অপেক্ষায় বসে থাকে যে, অবসর সময়ে বাইরে আগমন করলে সাক্ষাৎ করবে, তবে উপরিউক্ত বিধানের মধ্যে দাখিল নয়; এবং এটাই আদব ও শিষ্টাচার। স্বয়ং কুরআন নির্দেশ দেয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গৃহাভ্যন্তরে থাকেন, তখন তাঁকে আওয়াজ দিয়ে আহ্বান করা আদবের খেলাফ; বরং এমতাবস্থায় অপেক্ষা করা উচিত। যখন তিনি প্রয়োজন মোতাবেক বাইরে আগমন করেন, তখন সাক্ষাৎ করা উচিত। আয়াত এই : وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ –হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মাঝে মাঝে আমি কোনো আনসারী সাহাবীর দরজায় পূর্ণ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করি, যাতে তিনি বাইরে আগমন করলে তাঁর কাছে কোনো হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমি যদি তাঁর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইতাম, তবে অবশ্যই তিনি আমাকে অনুমতি দিতেন। কিন্তু আমি একে আদবের খেলাফ মনে করি। তাই অপেক্ষার কষ্ট স্বীকার করে নেই। –[বুখারী]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ

مَتَاعٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া। যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তাকেও مَتَاعٌ বলা হয়। এই আয়াতে আভিধানিক অর্থই বোঝানো হয়েছে। অনুবাদ করা হয়েছে 'ভোগ' অর্থাৎ ভোগ করার অধিকার। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যখন বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশের

নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই নিষেধাজ্ঞার পর কোরাইশদের ব্যবসাজীবী লোকেরা কি করবে? মক্কা ও মদিনা থেকে সুদূর শামদেশ পর্যন্ত তারা বাণিজ্যিক সফর করে। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সরাইখানা আছে। তারা এগুলোতে অবস্থান করে। এগুলোতে কোনো স্থায়ী বাসিন্দা থাকে না। এখানে অনুমতি চাওয়ার কি উপায়? কার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করা হবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয় (মাযহারী) শানে নুযূলের এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আয়াতে بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যা কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন, বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ এবং একই কারণে মসজিদ, খানকাহ, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিত্তবিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে।

মাসআলা : জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের যে স্থানে প্রবেশের জন্য মালিক অথবা মুতাওয়াল্লীদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার শর্ত ও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে, সেগুলো পালন করা শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। উদাহরণত রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে টিকিট ব্যতীত যাওয়ার অনুমতি নেই। কাজেই প্লাটফর্ম-টিকিট নেওয়া জরুরি; এর বিরুদ্ধাচরণ অবৈধ। বিমান বন্দরের যে অংশে যাওয়া কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নিষিদ্ধ, সেখানে অনুমতি ব্যতীত যাওয়া শরিয়তে নাজায়েজ।

মাসআলা : এমনিভাবে মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, হাসপাতাল ইত্যাদিতে যেসব কক্ষ ব্যবস্থাপক অথবা অন্য লোকদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট; যেমন এসব প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কক্ষ, অফিস গৃহ ও কর্মচারীদের বাসস্থান ইত্যাদিতে অনুমতি ব্যতীত যাওয়া নিষিদ্ধ ও গোনাহ্।

অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত আরো কতিপয় মাসআলা

পূর্বেই জানা গেছে যে, অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলির আসল উদ্দেশ্য অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সুষম সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া। এই একই কারণের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত মাসআলাসমূহও জানা যায়।

টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা : কোনো ব্যক্তিকে স্বাভাবিক নিদ্রা, অন্য কোনো দরকারি কাজ অথবা নামাজে মশগুল থাকার সময় গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত টেলিফোনে সম্বোধন করা জায়েজ নয়। কেননা এতেও বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করে তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার অনুরূপ কষ্ট প্রদান করা হবে।

মাসআলা : যে ব্যক্তির সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতে হয়, তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজনক সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং তা মেনে চলা উচিত।

টেলিফোনে দীর্ঘ কথাবার্তা বলতে হলে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আপনার ফুরসত থাকলে আমি আমার কথা আরম্ভ করব। কারণ, প্রায়ই টেলিফোনের শব্দ শুনে মানুষ স্বভাবতই রিসিভার হাতে নিতে বাধ্য হয়। এ কারণে সে দরকারি কাজে মশগুল থাকলেও তা ছেড়ে টেলিফোনের কাছে আসে। কোনো নির্দয় ব্যক্তি তখন লম্বা কথা বলতে শুরু করলে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হয়।

কেউ কেউ টেলিফোনের শব্দ শুনেও কোনোরূপ পরওয়া করে না এবং জিজ্ঞেস করে না যে, কে ও কি বলতে চায়? এটা ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থি এবং যে কথা বলতে চায় তার হক নষ্ট করার শামিল। হাদীসে বলা হয়েছে : إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا অর্থাৎ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগন্তুক ব্যক্তির তোমার উপর হক আছে। তার সাথে কথা বল এবং বিনা প্রয়োজনে দেখা করতে অস্বীকার করো না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি টেলিফোনে কথা বলতে চায়, তার হক এই যে, আপনি তার জবাব দিন।

কারো গৃহে পৌঁছে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখা নিষিদ্ধ। কেননা অনুমতি চাওয়ার উপকারিতা এই যে, প্রতিপক্ষ যে বিষয়ে আপনার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, সে সম্পর্কে আপনি অবগত না হন। প্রথমে গৃহের ভেতরে উঁকি মেরে দেখা হলে এই উপকারিতা পণ্ড হয়ে যায়। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। -(বুখারী, মুসলিম) রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অনুমতি লাভ করার জন্য অপেক্ষা করতেন, তখন দরজার বিপরীত দিকে না দাঁড়িয়ে ডানে কিংবা বামে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। দরজার বিপরীতে না দাঁড়ানোর কারণ ছিল এই যে, প্রথমত তখনকার যুগে দরজায় পর্দা খুব কম থাকত; থাকলেও তা খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। -[মাযহারী]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে অনুমতি ব্যতীত গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সাধারণ অবস্থায় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি দৈবাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, অগ্নিকাণ্ড হয় কিংবা গৃহ ধসে পড়ে, তবে অনুমতি ব্যতিরেকেই তাতে প্রবেশ করা এবং সাহায্যের জন্য যাওয়া উচিত। –[মাযহারী]

যাকে কেউ দূত মারফত ডেকে পাঠায়, সে যদি দূতের সাথেই এসে যায়, তবে অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই; দূতের আগমনই অনুমতি। তবে যদি কিছুক্ষণ পরে আসে, তবে অনুমতি নেওয়া জরুরি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَإِنَّ ذٰلِكَ لَهُ إِذْنٌ অর্থাৎ যাকে ডেকে পাঠানো হয়, সে যদি দূতের সাথেই আগমন করে, তবে এটাই তার ভেতরে আসার অনুমতি। –[আবূ দাউদ, মাযহারী]

পর্দাপ্রথা : নির্লজ্জতা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় : মহিলাদের পর্দা সম্পর্কিত প্রথম আয়াত সূরা আহ্যাবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়। এর তারিখ কারো মতে তৃতীয় হিজরি এবং কারো মতে পঞ্চম হিজরি। তাফসীরে ইবনে কাছীর ও নায়লুল আওতার গ্রন্থে পঞ্চম হিজরিকে অগ্রগণ্যতা দান করা হয়েছে। রূহুল মা'আনীতে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চম হিজরির যিলকদ মাসে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, পর্দার আয়াত এই বিয়ের সময়ই অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতসমূহ বনী মুস্তালিক যুদ্ধ অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত অপবাদের ঘটনার সাথে সাথে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত হয়। এই আলোচনা থেকে জানা যায় যে, সূরা নূরের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ পরে এবং সূরা আহ্যাবের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ আগে অবতীর্ণ হয়। সূরা আহযাবের আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলি প্রবর্তিত হয়। তাই সূরা আহযাবেই ইনশা আল্লাহ্ পর্দা সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু সূরা নূরের আয়াতসমূহের তাফসীর লিখিত হচ্ছে।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

–এখানে يَغُضُّوْا শব্দটি غَضٌّ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কম করা এবং নত করা। (রাগিব) দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেওয়া যার প্রতি দেখা শরিয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে কাছীর ও ইবনে হাইয়ান এ তাফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং বিনা নিয়তে দেখা মাকরূহ্ -এ বিধানটি এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর মধ্যে দাখিল। (চিকিৎসা ইত্যাদির কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত।) এ ছাড়া কারো গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরিয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ –যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ যাতে কামভাব পূর্ণ হয় এবং হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কাম-প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে– দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দু'টিকে স্পষ্টত উল্লেখ করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তবর্তী হারাম ভূমিকাসমূহ যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে কাছীর হযরত ওবায়দা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, كُلُّ مَاعَصَى اللّٰهُ بِهِ فَهُوَ كَبِيْرَةٌ وَقَدْ ذَكَرَ الطَّرْفَيْنِ অর্থাৎ যা দ্বারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ হয়, তাই কবীরা। কিন্তু আয়াত তার দুই প্রান্ত-সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। তাবারানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : اَلنَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِيْ أَبْدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِيْ قَلْبِهِ অর্থাৎ দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিষাক্ত শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (র.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোনো বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। –(ইবনে কাছীর) হযরত আলী (রা.)-এর হাদীসে আছে, প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত গোনাহ। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্হ নয়।

শ্মশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করার বিধানও অনুরূপ : ইবনে কাছীর লিখেছেন : পূর্ববর্তী অনেক মনীষী শ্মশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন এবং অনেক আলেমের মতে এটা হারাম। সম্ভবত এটা তখনকার ব্যাপারে, যখন বদনিয়ত ও কামভাব সহকারে দেখা হয়।

বেগানাকে দেখা হারাম সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ : وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ এ দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্যে ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু জোর দেওয়ার জন্যে তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মাহ্‌রাম ব্যতীত কোনো পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্যে হারাম। অনেক আলেমের মতে নারীদের জন্যে মাহ্‌রাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম; কামভাব সহকারে বদ-নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তাঁদের প্রমাণ হযরত উম্মে-সালমা (রা.) বর্ণিত হাদীস। যাতে বলা হয়েছে : একদিন হযরত উম্মে-সালমা ও মায়মূনা (রা.) উভয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম তথায় আগমন করলেন। এই ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো অন্ধ, সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ। – (আবূ দাউদ, তিরমিযী) অপর কয়েকজন ফিকহ্‌বিদ বলেন : কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্যে দূষণীয় নয়। তাদের প্রমাণ হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস, যাতে বলা হয়েছে : একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তাঁর আড়ালে দাঁড়িয়ে হযরত আয়েশা (রা.) ও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিষেধ করেননি। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্তম। আয়াতের ভাষাদৃষ্টে আরো বোঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও হারাম। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের গোপন অঙ্গ এবং সমস্ত দেহ মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত বাকিগুলো নারীর গোপন অঙ্গ। সবার কাছেই এসব জায়গা গোপন রাখা ফরজ। কোনো পুরুষ কোনো পুরুষের গোপন অঙ্গ যেমন দেখতে পারে না, তেমনি কোনো নারী অপর কোনো নারীর গোপন অঙ্গও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোনো নারীর গোপন অঙ্গ এবং নারী কোনো পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখলে তা আরো সন্দেহাতীত রূপে হারাম হবে। এটা আলোচ্য আয়াতের বিধান 'দৃষ্টি নত রাখার' পরিপন্থি। কেননা আয়াতের উদ্দেশ্য শরিয়তে নিষিদ্ধ এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে দৃষ্টি নত রাখা। এতে নারী কর্তৃক নারীর গোপন অঙ্গ দেখাও অন্তর্ভুক্ত।

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ
অভিধানে زِيْنَةٌ এমন বস্তুকে বলা হয়, যা দ্বারা মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করে। এটা উৎকৃষ্ট বস্ত্র হতে পারে এবং অলংকারও হতে পারে। এসব বস্তু যদি কোনো নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো দেখা পুরুষদের জন্যে হালাল; যেমন বাজারে বিক্রির জন্যে মেয়েলী পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি দেখায় কোনো দোষ নেই। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতে زِيْنَةٌ -এর অর্থ নিয়েছেন সাজ-সজ্জার স্থান; অর্থাৎ, যেসব অঙ্গে সাজ-সজ্জার অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, সাজ-সজ্জার স্থানসমূহ প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব।- (রূহুল-মা'আনী) আয়াতের পরবর্তী অংশে নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে; একটি যার প্রতি দেখা হয়, তার হিসেবে এবং অপরটি যে দেখে, তার হিসেবে।

পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম : প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে– مَا ظَهَرَ مِنْهَا অর্থাৎ নারীর কোনো সাজ-সজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত, যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় সেসব অঙ্গ স্বভাবত খুলেই যায়। এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোনো গোনাহ্ নেই। - (ইবনে কাছীর) এতে কোন কোন অঙ্গ বোঝানো হয়েছে– এ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন مَا ظَهَرَ مِنْهَا বাক্যে উপরের কাপড়; যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজ-সজ্জার পোশাককে আবৃত রাখার জন্যে পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশত বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, সেগুলো ব্যতীত সাজ-সজ্জার কোনো বস্ত্র প্রকাশ করা জায়েজ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বোঝানো হয়েছে। কেননা কোনো নারী প্রয়োজনবশত বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলাফেরা ও লেন-দেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয়। অতএব হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী নারীর জন্যে বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও খোলা জায়েজ নয়। শুধু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশত খুলতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েজ। এ কারণে ফিকহ্‌বিদগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো দেখাও জায়েজ নয় এবং নারীর জন্যে এগুলো প্রকাশ করাও জায়েজ নয়। এমনিভাবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাজে সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ এবং নামাজের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরজ, তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত। এগুলো খুলে নামাজ পড়লে নামাজ শুদ্ধ ও দুরস্ত হবে।

কাযী বায়যাভী ও 'খাযেন' এ আয়াতের তাফসীরে বলেন : নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজ-সজ্জার কোনোকিছুই প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্যও তাই মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবত যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে। বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নারী কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেন-দেনের প্রয়োজনে কোনো সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্হ গোনাহ্ নয়। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্যে জায়েজ; বরং পুরুষদের জন্যে দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরিয়তসম্মত ওজর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্যে অপরিহার্য। এই ব্যাখ্যায় উল্লিখিত উভয় তাফসীরই স্থান পেয়েছে। ইমাম মালেক (র.)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাবও এই যে, বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েজ নয়। 'যাওয়াজের' গ্রন্থে ইবনেহাজার মক্কী শাফেয়ী ইমাম শাফেয়ী (র.) -ও এই মাযহাব বর্ণনা করেছেন। নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামাজ হয়ে যায়, কিন্তু বেগানা পুরুষদের জন্যে এগুলো দেখা শরিয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে জায়েজ নয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফিকহ্‌বিদের মতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েজ, তাঁরাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েজ। বলাবাহুল্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফাসাদ, কামাধিক্য ও গাফলতির যুগ। তাই বিশেষ প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ছাড়া বেগানা পুরুষের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্যে নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্যে জায়েজ নয়।

আলোচ্য আয়াতে বাহ্যিক সাজ-সজ্জার ব্যতিক্রম বর্ণনা করার পর ইরশাদ হচ্ছে–

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ –অর্থাৎ তারা যেন বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে। خُمُرٌ শব্দটি خِمَارٌ-এর বহুবচন; অর্থ ঐ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তা দ্বারা-গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়। جُيُوبٌ শব্দটি جَيْبٌ-এর বহুবচন এর অর্থ জামার কলার। প্রাচীনকাল থেকে জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই প্রচলিত। তাই জামার কলার আবৃত করার অর্থ বক্ষদেশ আবৃত করা। আয়াতের শুরুতে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই বাক্যে সাজ-সজ্জা গোপন রাখার তাগিদ এবং এর একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এর আসল কারণ জাহেলিয়াত যুগের একটি প্রথার বিলোপ সাধন করা। সে যুগে নারীরা ওড়না মাথার উপর ফেলে তার দুই প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে গলা, বক্ষদেশ ও কান অনাবৃত থাকত। তাই মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরূপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পর উল্টিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে। –(রূহুল মা'আনী) এরপর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যাদের কাছে শরিয়তে পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। (এক), যেসব পুরুষকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোনো অনর্থের আশঙ্কা নেই। তারা মাহ্‌রাম আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে; স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনর্থের সম্ভাবনা নেই। (দুই), সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরের প্রতি সহজ ও সরল হয়ে থাকে। স্মর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহ্‌রামকে যে, ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারী যে গোপন অঙ্গ নামাজে খোলা জায়েজ নয়, তা দেখা মাহ্‌রামদের জন্যেও জায়েজ নয়।

আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহ্রাম পুরুষের এবং চার প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহ্যাবের আয়াতে মাত্র সাত প্রকার উল্লিখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাঁচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

হুঁশিয়ারী : স্মরণ রাখা দরকার যে, এ স্থলে মাহ্রাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামীও এর অন্তর্ভুক্ত। ফিকহ্বিদদের পরিভাষায় যার সাথে বিবাহ শুদ্ধ নয়, তাকে মাহ্রাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থে এখানে উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বারজন ব্যতিক্রমভুক্ত লোকের পূর্ণ বিবরণ এরূপ : প্রথমত স্বামী, যার কাছে স্ত্রীর কোনো অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন مَا رَاٰى مِنِّيْ وَلَا رَاَيْتُ مِنْهُ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বিশেষ অঙ্গ দেখেননি এবং আমিও তাঁর বিশেষ অঙ্গ দেখিনি।

দ্বিতীয় : পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়, শ্বশুর। তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চতুর্থ, নিজ গর্ভজাত সন্তান। পঞ্চম, স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ষষ্ঠ, ভ্রাতা, সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায়ের-মাহ্রাম। সপ্তম, ভ্রাতুষ্পুত্র। এখানেও সহোদর, বৈমাত্রেয়ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতার পুত্র বোঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অষ্টম, ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোন বোঝানো হয়েছে। এই আট প্রকার হলো মাহ্রাম। নবম اَوْ نِسَآئِهِنَّ অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক; উদ্দেশ্য মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমনসব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তার মাহ্রাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোনো মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনেও খোলা জায়েজ নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদির প্রয়োজনে খোলা ভিন্ন কথা।

نِسَآئِهِنَّ মুসলমান স্ত্রীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফের মুশরিক স্ত্রীলোকদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাছীর হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, এ থেকে জানা গেল যে, কাফের নারীদের সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোনো মুসলমান নারীর জন্যে জায়েজ নয়। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিদের সামনে কাফের রমণীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে কাফের নারী বেগানা পুরুষের মতো। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফের উভয় প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন; অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাজি (র.) বলেন : প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান কাফের– সব নারীই نِسَآئِهِنَّ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কাফের নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা মোস্তাহাব আদেশ। রুহুল মা'আনীতে মুফতী আল্লামা আলূসী (র.) এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন : هٰذَا الْقَوْلُ اَوْفَقُ بِالنَّاسِ الْيَوْمَ فَاِنَّهٗ لَا يَكَادُ يُمْكِنُ اِحْتِجَابُ الْمُسْلِمَاتِ عَنِ الذِّمِّيَّاتِ অর্থাৎ এই উক্তিই আজকাল মানুষের অবস্থার সাথে বেশি খাপ খায়। কেননা, আজকাল মুসলমান নারীদের জন্য কাফের নারীদের সাথে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

দশম প্রকার اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ অর্থাৎ যারা নারীদের মালিকানাধীন। এতে দাস-দাসী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ফিকহ্বিদের মতে এখানে শুধু দাসী বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের সাথেও সাধারণ মাহ্রামের ন্যায় পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব তাঁর সর্বশেষ উক্তিতে বলেন : لَا يَغُرَّنَّكُمْ اٰيَةُ النُّوْرِ فَاِنَّهٗ فِي الْاِمَاءِ دُوْنَ الذُّكُوْرِ অর্থাৎ তোমরা সূরা নূরের আয়াতদৃষ্টে বিভ্রান্ত হয়ো না যে, مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ শব্দের মধ্যে দাসরাও শামিল রয়েছে। এই আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.), হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন (র.) বলেন : পুরুষ দাসের জন্যে তার প্রভু নারীর কেশ পর্যন্ত দেখা জায়েজ নয়। (রুহুল-মা'আনী) এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে যখন শুধু দাসীদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তখন তারা তো পূর্ববর্তী اَوْ نِسَآئِهِنَّ শব্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাদেরকে আলাদা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? জাসসাস এর জওয়াবে বলেন : نِسَآئِهِنَّ শব্দটি বাহ্যিক দিক দিয়ে শুধু মুসলমান নারীদের জন্যে প্রযোজ্য। দাসীদের মধ্যে যদি কেউ কাফেরও থাকে, তবে তাকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার জন্যে এই শব্দটি আলাদা ভাবে আনা হয়েছে।

একাদশ প্রকার اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ –হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বোঝানো হয়েছে, যাদের নারী জাতির প্রতি কোনো আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই নেই। (ইবনে কাছীর) ইবনে জারীর এই বিষয়বস্তুই আবূ আব্দুল্লাহ, ইবনে জুবায়ের, ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন।

কাজেই আয়াতে এমন সব পুরুষকে বোঝানো হয়েছে , যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোনো আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপ-গুণের প্রতিও কোনো ঔৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলির সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ -এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন।

এ কারণেই ইবনে হাজার মক্কী মিনহাজের টীকায় বলেন : পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশি বৃদ্ধ হয়, তবুও সে غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। এখানে غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ শব্দের সাথে أَوِ التَّابِعِينَ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহুত মেহমান হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। একথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা অনাহূত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে গৃহে মধ্যে প্রবেশ করত। বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার উপর-অনাহূত মেহমান হওয়ার উপর নয়।

দ্বাদশ প্রকার أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বোঝানো হয়েছে, যে এখনো সাবালকত্বের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে মোরাহিক অর্থাৎ সাবালকত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব।– (ইবনে কাছীর) ইমাম জাসসাস (র.) বলেন : এখানে طِفْل বলে এমন বালককে বুঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ কারবারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বোঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভুক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হলো।

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ –অর্থাৎ নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যদ্দরুন অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে উঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ-সজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

অলঙ্কারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো বৈধ নয় : আয়াতের শুরুতে বেগানা পুরুষদের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। উপসংহারে এর প্রতি আরো জোর দেওয়া হয়েছে যে, সাজসজ্জার স্থান মস্তক, বক্ষদেশ ইত্যাদি আবৃত করা তো ওয়াজিব ছিলই –গোপন সাজসজ্জা যে কোনোভাবেই প্রকাশ করা হোক, তাও জায়েজ নয়। অলঙ্কারের ভেতরে এমন জিনিস রাখা, যদ্দরুন অলঙ্কার ঝঙ্কৃত হতে থাকে কিংবা অলঙ্কারাদির পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে বাজা কিংবা মাটিতে সজোরে পা রাখা, যার ফলে অলঙ্কারের শব্দ হয় ও বেগানা পুরুষের কানে পৌঁছে, এসব বিষয় আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে নাজায়েজ। এ কারণেই অনেক ফিকহবিদ বলেন : যখন অলঙ্কারের আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো এই আয়াত দ্বারা অবৈধ প্রমাণিত হলো, তখন স্বয়ং নারীর আওয়াজ শোনানো আরো কঠোর এবং প্রশ্নাতীতরূপে অবৈধ হবে। তাই তারা নারীর আওয়াজকেও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'নাওয়াজেল, গ্রন্থে বলা হয়েছে, যতদূর সম্ভব নারীগণকে কুরআনের শিক্ষাও নারীদের কাছে থেকেই গ্রহণ করা উচিত। তবে নিরুপায় অবস্থায় পুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জায়েজ।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, নামাজে যদি কেউ সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তবে পুরুষের উচিত 'সুবহানাল্লাহ' বলে তাকে সতর্ক করা। কিন্তু নারী আওয়াজ করতে পারবেন না; বরং এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে তাকে সতর্ক করে দেবে।

নারীর আওয়াজের বিধান : নারীর আওয়াজ গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কি না এবং বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শোনানো জায়েজ কি না, এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। ইমাম শাফেয়ীর গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াজকে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। হানাফীদের উক্তিও বিভিন্ন রূপ। ইবনে হুমাম নাওয়াজেলের বর্ণনার ভিত্তিতে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফীদের মতে নারীর আজান মাকরূহ। কিন্তু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিগণ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও পর্দার অন্তরাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য কথা এই যে, যে স্থানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে নিষিদ্ধ এবং যেখানে আশঙ্কা নেই, সেখানে জায়েজ। –(জাসসাস) কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।

সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া : নারী যদি প্রয়োজনবশত বাইরে যায়, তবে সুগন্ধি লাগিয়ে না যাওয়াও উপরিউক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সুগন্ধিও গোপন সাজ-সজ্জা। বেগানা পুরুষের কাছে এই সুগন্ধি পৌছা নাজায়েজ। তিরমিযীতে হযরত আবূ মূসা আশআরীর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারিণী নারীর নিন্দা করা হয়েছে।

সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েজ : ইমাম জাসসাস বলেন : কুরআন পাক অলঙ্কারের আওয়াজকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত রঙ্গিন কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়া আরো উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হবে। এ থেকে আরো জানা গেল যে, নারীর মুখমণ্ডল যদিও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু তা সৌন্দর্যের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে একেও আবৃত রাখা ওয়াজিব। তবে প্রয়োজনের কথা স্বতন্ত্র। –[জাসসাস]

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ –অর্থাৎ মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আলাদা আদেশ দান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম। অপরের তা জানা কঠিন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লিখিত বিধানসমূহে কোনো সময় যদি কারো দ্বারা কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তবে তার জন্যে তওবা করা নেহায়েত জরুরি। সে অতীত কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্যে দৃঢ় সংকল্প করবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَسْتَأْنِسُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِئْنَاسٌ মূলবর্ণ (أ - ن - س) জিনস مهموز فاء অর্থ– যে পর্যন্ত না তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর।

تُسَلِّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْلِيْمٌ মূলবর্ণ (س - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সালাম কর।

لَمْ تَجِدُوْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব ضرب মাসদার وجود মূলবর্ণ (و - ج - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা জানতে না পার।

يُؤْذَنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اِذْنٌ মূলবর্ণ (ا - ذ - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– অনুমতি দেওয়া হয়।

اِرْجِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার رُجُوْعٌ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ– ফিরে যাও।

اَزْكٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার زَكٰىٌ মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– উত্তম।

تُبْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبْدَاءٌ মূলবর্ণ (ب - د - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তোমরা প্রকাশ্যে করে থাক।

يَغُضُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার غَضٌّ মূলবর্ণ (غ - ض - ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যেন তারা অবনত রাখে।

لَا يُبْدِيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبْدَاءٌ মূলবর্ণ (ب - د - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– যেন তারা প্রকাশ না করে।

مَا يُخْفِيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْفَاءٌ মূলবর্ণ (خ - ف - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আবৃত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ : এখানে واو টি استئنافية আর اَللّٰهُ মুবতাদা يَعْلَمُ বাক্যটি হলো খবর। আর مَا হলো اسم موصول যা مفعول به হয়েছে। আর تُبْدُوْنَ বাক্যটি হলো সেলাহ। আর وَمَا تَكْتُمُوْنَ টা مَاتُبْدُوْنَ এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২৬৫]

৩২. আর তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদেরকে বিবাহ করিয়ে দাও এবং তোমাদের ক্রীতদাস এবং দাসীগণের মধ্যে যারা এর সমর্থ হয় তাদেরকেও; যদি তারা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন; এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী।

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর যারা বিবাহ করতে অসমর্থ তাদের উচিত, যেন তারা সংযমী হয়ে থাকে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেন; এবং তোমাদের ক্রীতদাসদের মধ্যে যারা মুকাতাব (অর্থাৎ অর্থ বিনিময়ের শর্তে মুক্তি-পত্র প্রাপ্ত) হতে চায়, তবে তাদেরকে মুকাতাব বানিয়ে দাও, যদি (তখন) তাদের মধ্যে সদ্ভাব দেখতে পাও এবং আল্লাহর সে সম্পদ হতে তাদেরকে দাও যা তিনি তোমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন; আর তোমরা স্বীয় ক্রীতদাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না- যখন তারা সতীত্ব বজায় রাখতে চায়- শুধু পার্থিব জীবনে তোমাদের কিছু স্বার্থ লাভ হওয়ার উদ্দেশ্যে; আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি (তাদের অনিচ্ছায়) বল প্রয়োগ করবে, তবে বল-প্রযুক্ত হওয়ার পর আল্লাহ (তাদের প্রতি) ক্ষমাকারী, পরম দয়াবান।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ আর তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদেরকে বিবাহ করিয়ে দাও وَالصَّالِحِينَ এবং যারা এর সমর্থ হয় তাদেরকেও مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ তোমাদের ক্রীতদাস এবং দাসীগণের মধ্যে إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ যদি তারা দরিদ্র হয় يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন وَاللَّهُ وَاسِعٌ এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, عَلِيمٌ মহাজ্ঞানী।

৩৩. وَلْيَسْتَعْفِفِ এবং তাদের উচিত যেন তারা সংযমী হয়ে থাকে الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا যারা বিবাহ করতে অসমর্থ حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেন وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ এবং যারা মুকাতাব হতে চায় مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ তোমাদের ক্রীতদাসদের মধ্যে فَكَاتِبُوهُمْ তবে তাদেরকে মুকাতাব বানিয়ে দাও। إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا যদি তাদের মধ্যে সদ্ভাব দেখতে পাও وَآتُوهُم এবং তাদেরকে দাও مِّن مَّالِ اللَّهِ আল্লাহর সেই সম্পদ হতে الَّذِي آتَاكُمْ যা তিনি তোমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন। وَلَا تُكْرِهُوا আর তোমরা বাধ্য করো না فَتَيَاتِكُمْ স্বীয় ক্রীতদাসীদেরকে عَلَى الْبِغَاءِ জেনায় إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا যদি তারা সতীত্ব বজায় রাখতে চায় لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا শুধু পার্থিব জীবনে তোমাদের কিছু স্বার্থ লাভ হওয়ার উদ্দেশ্যে وَمَن يُكْرِههُّنَّ আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বল প্রয়োগ করবে فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ তবে বল প্রযুক্ত হওয়ার পর আল্লাহ (তাদের প্রতি) غَفُورٌ رَّحِيمٌ ক্ষমাকারী পরম দয়াবান।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর আমি তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট হুকুমসমূহ এবং তোমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের কতক কাহিনী এবং মুত্তাকীদের জন্য নসিহতসমূহ (পাঠিয়েছি)।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۗ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ۗ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۗ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ۗ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫. আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের (অধিবাসীদের হেদায়েতের) আলো প্রদানকারী; তাঁর আলোর বিস্ময়কর অবস্থা এরূপ– যেমন একটি দীপাধার– যাতে একটি প্রদীপ আছে; সে প্রদীপটি একটি (কাঁচের) ফানূসের মধ্যে রয়েছে; সে ফানূসটি এরূপ (স্বচ্ছ) যেমন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র– ঐ প্রদীপটি একটি বিশেষ হিতকর বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা জ্বালানো হয়ে থাকে– এটা যায়তূন (বৃক্ষ)– যা পূর্বমুখীও নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়, সে তৈল (এরূপ যে,) যদিও এটাকে অগ্নি স্পর্শ না করে, তবুও যেন স্বয়ংই জ্বলে উঠবে; (অগ্নি স্পর্শ করলে) আলোর উপর আলো হয়ে যায়; আল্লাহ যাকে চান স্বীয় আলো পর্যন্ত পথ প্রদর্শন করেন; আল্লাহ মানুষের (হেদায়েতের) জন্য (এ) দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন; এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে খুব অবগত আছেন,

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ, আর আমি তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ সুস্পষ্ট হুকুমসমূহ وَّمَثَلًا এবং তাদের কতক কাহিনী مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গিয়েছে وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ, এবং মুত্তাকীদের জন্য নসিহতসমূহ।

৩৫. اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের আলো প্রদানকারী مَثَلُ نُوْرِهٖ তাঁর আলোর বিস্ময়কর অবস্থা كَمِشْكٰوةٍ এরূপ যেমন একটি দীপাধার فِيْهَا مِصْبَاحٌ যাতে একটি প্রদীপ আছে اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ সে প্রদীপটি একটি ফানুসের মধ্যে রয়েছে اَلزُّجَاجَةُ সে ফানুসটি এরূপ (স্বচ্ছ) كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ যেমন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ ঐ প্রদীপটি একটি বিশেষ হিতকর বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা জ্বালানো হয়ে থাকে زَيْتُوْنَةٍ তা যয়তুন (বৃক্ষ) لَّا شَرْقِيَّةٍ যা পূর্বমুখীও নয় وَّلَا غَرْبِيَّةٍ এবং পশ্চিমমুখীও নয় يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ সে তৈল (এরূপ যে,) যেন স্বয়ংই জ্বলে উঠবে وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, যদিও তাকে অগ্নি স্পর্শ না করে نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ আলোর উপর আলো হয়ে যায় يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ আল্লাহ যাকে চান স্বীয় আলো পর্যন্ত পথ প্রদর্শন করেন وَيَضْرِبُ اللّٰهُ আল্লাহ বর্ণনা করেন الْاَمْثَالَ দৃষ্টান্তসমূহ لِلنَّاسِ মানুষের জন্য وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ, এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে খুব অবগত আছেন।

৩৬. তারা এমন গৃহসমূহে আছে, যে গৃহ (মসজিদ) সম্বন্ধে আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন যে, তাদের সম্মান করা হোক এবং তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়া হোক, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় এমন সব লোক আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে।

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿٣٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. فِيْ بُيُوْتٍ তারা এমন গৃহসমূহে আছে اَذِنَ اللّٰهُ যে গৃহ সম্বন্ধে আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন যে اَنْ تُرْفَعَ তাদের সম্মান করা হোক وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ এবং তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়া হোক يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا তাতে এমন সব লোক আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ সকাল ও সন্ধ্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ [٣٣]

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবীহ তদীয় পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমি একজন কৃতদাস ছিলাম। আমার মনিব ছিলেন হুয়াইতাব ইবনে আব্দুল উয্যা। সুতরাং আমি টাকার বিনিময়ে যেন মুক্তি অর্জন করে দাসত্বের জীবনের অবসান ঘটাতে পারি, সে জন্যে তার নিকট কিতাবত তথা লিখে দেওয়ার আবেদন করে ছিলাম, তিনি তাতে সম্মতি হননি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।-[দুররে মানছূর ৪৫/৫, কুরতুবী ২২২/১২, রূহুল মা'আনী ১৫২/৯/১৮]

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ [٣٤]

শানে নুযূল-১ : মুসলিম ও আবূ দাউদ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সালূলের মুসাইকা ও আমীমাহ মতান্তরে মুআযা ও মুসাইকা নামে দু'টি বাদী কৃতদাসী ছিল। সে তাদেরকে পতিতা বৃত্তিতে বাধ্য করত। এর দ্বারা পতিতা বৃত্তির বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করা আর সন্তান লাভ করার মতো হীন উদ্দেশ্য ছিল। তবে বাদী দু'জন তাতে আদৌ সম্মত ছিলনা। সুতরাং তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট নিজেদের সমস্যার কথা জানালো। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ১৫৬/৯/১৮, কুরতুবী ২৩১/১২, ইবনে কাছীর ২৯৭/৩, দুররে মানছূর ৫৬/৫, ফতহুল কাদীর ৩১/৪, তাবারী ৩১৮/৯]

অপর এক বর্ণনা মতে মু'আযা, মুসাইকাহ, আমীমাহ, আম্মারা, আরওয়া ও কাতীলাহ নাম্মী দুর্ভাগা ছয়জন বাদী ছিল, যাদেরকে পতিতার কাজে বাধ্য করা হতো। তাদের হতে দু'জন রাসূল ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করে। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।-[রূহুল মা'আনী ১৫৮/৯/১৮]

শানে নুযূল-২ : ইবনে আবী হাতেম সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের মাআযাহ নাম্মী এক বাদী ছিল। তার নিকট যখন কোনো মেহমান আসত, তখন সে বাদীকে সেই মেহমানের জন্যে পাঠিয়ে দিত, মেহমান যেন তাকে ব্যবহার করতে পারে। এ কাজটি সে ছওয়াব এবং মেহমানের জন্যে সম্মান জনক বলে বিশ্বাস করত। সুতরাং সে বাদীটি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট এসে অভিযোগ পেশ করল। পরক্ষণেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূল ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সুতরাং রাসূল ﷺ তাকে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই চিৎকার করে বলল যে, মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট আমার ওজর পেশকারী কেউ আছে কি? আমি যাতে আমার মালিকানাধীন বস্তুর উপর কর্তৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হতে পারি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। -[রূহুল মা'আনী ১৫৭/৯/১৮]

শানে নুযূল—৩ : তাবারানী, বায্যার ও ইবনে মারদূভিয়া বিশুদ্ধতম সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের একটি বাদী ছিল। সে জাহিলিয়া যুগে জেনা করে অনেক সন্তান প্রসব করেছে। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা যখন জেনাকে হারাম করে দিয়েছেন, তখন সে বাদীকে বলল যে, কি হচ্ছে তোর তুই জেনা করছিস না কেন? বাঁদি জবাবে বলল, আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনো জেনার মতো নোংরা কাজ আর করব না। সে জন্যে পাপিষ্ট ইবনে উবাই তাকে প্রহার করল। বাঁদিকে অপকর্মে বাধ্য না করার নির্দেশ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৫৮/৯/১৮]

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ - اَيَامٰى শব্দটি اَيِّمٌ এর বহুবচন; অর্থ প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী, যার বিবাহ বর্তমান নেই; আসলেই বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্যে তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্যে কোনো পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে একাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মাসনূন ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা রয়েছে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে, এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই কোনো কোনো হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেওয়া হয়েছে। ইমাম আজম ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে, এই বিধানটি একটি বিশেষ সুন্নত ও শরিয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত 'কুফূ' তথা সমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও সুন্নতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরস্কারের যোগ্য হবে, যদি সে কোনোরূপে বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহই বাতিল ও না হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। এটা বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও উভয় পক্ষের প্রমাণাদির বর্ণনা করার স্থান নয়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাবকদের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা আয়াত এ ব্যাপারে নিশ্চুপ; বিশেষত এ কারণেও যে, اَيَامٰى (বিবাহহীন লোক) শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ। কেউ একে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতবিরোধী কাজ করার কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরস্কার করা হবে।

বিবাহ ওয়াজিব, না সুন্নত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপ : মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না করলে শরিয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না, গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং বিবাহ করার শক্তি-সামর্থ্যও রাখে, এরূপ ব্যক্তির জন্যে বিবাহ করা ফরজ অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন বিবাহ না করবে, ততদিন গোনাহ্গার থাকবে। হাঁ, যদি বিবাহের উপায়াদি না থাকে: যেমন কোনো উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুআজ্জল মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগত না হয়, ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে। এরূপ ব্যক্তির জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ইরশাদ করেন যে, সে উপর্যুপরি রোজা রাখবে। রোজার ফলে কামোত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওকাফ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার স্ত্রী আছে কি? তিনি বললেন : না! আবার জিজ্ঞেস করলেন : কোনো শরিয়তসম্মত বাঁদি আছে কি? উত্তর হলো : না। প্রশ্ন হলো : তুমি কি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল? উত্তর হলো : হাঁ। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য রাখ? তিনি উত্তরে হাঁ বললে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই। তিনি আরো বললেন : বিবাহ আমাদের সুন্নত। আমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে সর্বাধিক নীচ, যে বিবাহ না করে মারা গেছে। –[মাযহারী]

যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গোনাহ্র আশঙ্কা প্রবল, ফিকহ্বিদগণের মতে এই হাদীসটিও সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকাফের অবস্থা সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জানা ছিল যে, সে সবর করতে পারে না। এমনিভাবে মুসনাদে আহ্মদে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। -(মাযহারী) এমনি ধরনের আরো অনেক হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল থাকে। এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফিকহ্বিদ একমত যে, কোনো ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিবাহ করলে গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে। উদাহরণত সে দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর উপর জুলুম করবে কিংবা অন্য কোনো গোনাহ নিশ্চিত হয়ে যাবে, তবে এরূপ ব্যক্তির জন্যে বিবাহ করা হারাম অথবা মাকরূহ।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অর্থাৎ বিবাহ না করলেও যার গোনাহের সম্ভাবনা প্রবল নয় এবং বিবাহ করলেও কোনো গোনাহের আশঙ্কা জোরদার নয়– এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে ফিকহ্বিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, বিবাহ না করাই উত্তম। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নফল ইবাদতে মশগুল হওয়ার চাইতে বিবাহ করা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন , নফল ইবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ সত্তাগতভাবে পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি মোবাহ্ তথা শরিয়তসিদ্ধ কাজ। যদি কেউ এই নিয়তে বিবাহ করে যে, এর মাধ্যমে সে গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্মদান করবে; তবে তা ইবাদতে পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও ছওয়াব পায়। মানুষ যদি এরূপ সদুদ্দেশে যে কোনো মোবাহ্ কাজ করে, তা পরোক্ষভাবে তার জন্যে ইবাদত হয়ে যায়। পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিও এরূপ নিয়তের ফলে ইবাদত হয়ে যায়। ইবাদতে মশগুল হওয়া আপন সত্তায় একটি ইবাদত। তাই ইমাম শাফেয়ীই ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাসকে বিবাহের চাইতে উত্তম বলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে বিবাহের মধ্যে ইবাদতের দিক অন্যান্য মোবাহ্ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ্ হাদীসসমূহে বিবাহকে পয়গম্বরগণের ও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত আখ্যা দিয়ে এর উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সাধারণ মোবাহ্ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মোবাহ্ কর্ম নয়; বরং এটা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এতে ইবাদতের মর্যাদা শুধু নিয়তের কারণে নয়; বরং পয়গম্বরগণের সুন্নত হওয়ার কারণেও বলবৎ থাকে। কেউ বলতে পারে যে, এভাবে তো পানাহার ও নিদ্রাও পয়গম্বরগণের সুন্নত। কারণ তাঁরা সবাই এসব কাজ করেছেন। এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গম্বরগণের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ একথা বলেননি এবং কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নিদ্রা পয়গম্বরগণের সুন্নত বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পয়গম্বরগণের কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিবাহ এরূপ নয়। বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে পয়গম্বরগণের সুন্নত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজের সুন্নত বলা হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে এ প্রসঙ্গে একটি সুষম কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মধ্যাবস্থায় আছে অর্থাৎ অতিরিক্ত কামভাবের হাতে পরাভূতও নয় এবং বিবাহ করলে কোনো গোনাহতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাও নেই, এরূপ ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, বিবাহ করা সত্ত্বেও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব তার জিকির ও ইবাদতের অন্তরায় হবে না, তবে তার জন্য বিবাহ করা উত্তম। সকল পয়গম্বর ও সাধু ব্যক্তির অবস্থা তদ্রূপই ছিল। পক্ষান্তরে যদি তার এরূপ প্রত্যয় থাকে যে, বিবাহ ও পরিবার পরিজনের দায়িত্ব পালন তাকে ধর্মীয় উন্নতি ও অধিক জিকির ইত্যাদি থেকে বিরত রাখবে, তবে তার জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাস এবং বিবাহ বর্জন উত্তম। কুরআন পাকের অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। একটি আয়াত এই : يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ এতে নির্দেশ আছে যে, অর্থকড়ি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ করে দেওয়ার কারণ না হওয়া সমীচীন।

وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ –অর্থাৎ তোমাদের ক্রীতদাস ও বাদীদের মধ্যে যারা যোগ্য, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এখানে মালিক ও প্রভুদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। صَالِحِيْنَ শব্দটি এ স্থলে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ প্রভুদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। সামর্থ্যের অর্থ স্ত্রীর বৈবাহিক অধিকার, ভরণ-পোষণ ও তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য মোহর আদায় করার যোগ্যতা যদি صَالِحِيْنَ শব্দের সুবিদিত অর্থ সৎকর্মপরায়ণ নেওয়া হয়, তবে বিশেষভাবে তাদের কথা বলার কারণ এই যে, বিবাহের আসল লক্ষ্য হারাম থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যেই হতে পারে।

মোটকথা, ক্রীতদাস ও বাঁদিদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ মনিবদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তারা বিবাহের প্রয়োজন প্রকাশ করে এবং বিবাহের খাহেশ করে, তবে কোনো কোনো ফিকহ্‌বিদের মতে তাদের বিবাহ সম্পাদন করা মবিনদের উপর ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ ফিকহ্‌বিদের মতে তাদের বিবাহে বাধা সৃষ্টি না করা বরং অনুমতি দেওয়া মনিবদের জন্য অপরিহার্য হবে। কারণ, ক্রীতদাস ও বাঁদিদের বিবাহ মনিবের অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। এমতাবস্থায় এ আদেশটি কুরআন পাকের এ আয়াতের অনুরূপ হবে–
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ –অর্থাৎ নারীদেরকে বিবাহে বাধা না দেওয়া অভিভাবকদের জন্যে অপরিহার্য। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বলেছেন, তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরূপ না করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে। –[তিরমিযী]
সারকথা এই যে, মনিবরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতস্তত ও না করে, সেজন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের জিম্মায় ওয়াজিব–এটা জরুরি নয়।

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ –যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্ম কর্মের হেফাজতের জন্যে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই; আয়াতে তাদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হেফাজত ও সুন্নতে রাসূল ﷺ পালন করার সদুদ্দেশ্যে বিবাহ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দান করবেন। যাদের কাছে দরিদ্র লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায় আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তারা যেন শুধু বর্তমান দারিদ্র্যের কারণেই বিবাহে অস্বীকৃতি না জানায়। অর্থকড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্তু। এই আছে এই নেই। কাজেই যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে বিবাহে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে সব মুসলমানকে বিবাহ করার উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিবাহের কারণে তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করার ওয়াদা করেছেন। –(ইবনে কাছীর)। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একবার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন : তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন কর। তাহলে তিনি যে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন : إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ –হযরত ইবনে-মাসউদ (রা.) বলেন : তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ। –[ইবনে-কাছীর]

হুশিয়ারি : তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : স্মর্তব্য যে, বিবাহ করার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সুন্নত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, অতঃপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা হয়। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াত : وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ। অর্থাৎ যারা অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ করলে আশঙ্কা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গোনাহগার হয়ে যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালদার করে দেন। এই ধৈর্যের জন্যে হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বেশি পরিমাণে রোজা রাখবে। তারা এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণে অর্থ-সম্পদ দান করবেন।

পূর্ববর্তী আয়াতে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদিদের বিবাহের প্রয়োজন দেখা দিলে মালিকদেরকে বিবাহের অনুমতি দেওয়ার আদেশ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, তারা যেন নিজেদের স্বার্থের খাতিরে গোলাম ও বাঁদিদের স্বভাবজাত স্বার্থকে উপেক্ষা না করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। এই আদেশের সার-সংক্ষেপ হচ্ছে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদিদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানো। এর সাথে সম্পর্ক রেখে আলোচ্য আয়াতে মনিবদেরকে দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে, গোলাম ও বাঁদিরা যদি মনিবদের সাথে মুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তবে তাদের এই বাসনা পূর্ণ করাও মনিবদের জন্য উত্তম ও সওয়াবের কাজ। হিদায়ার গ্রন্থকার এবং অধিকাংশ ফিকহ্‌বিদ এই নির্দেশকে মুস্তাহাবই স্থির করেছেন। অর্থাৎ অধিকারভুক্তদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মনিবদের জন্য ওয়াজিব নয়; কিন্তু মোস্তাহাব ও উত্তম। এই চুক্তির রূপরেখা এরূপ : কোনো গোলাম অথবা বাঁদি তার মনিবকে বলবে, আপনি আমার উপর টাকার একটি অঙ্ক নির্ধারণ করে দিন। আমি পরিশ্রম ও উপার্জনের মাধ্যমে এই টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। এরপর মনিব এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। অথবা মনিব স্বেচ্ছায় গোলামকে প্রস্তাব দেবে যে, এই পরিমাণ টাকা আমাকে দিতে পারলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। গোলাম এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি হয়ে যাবে।

যদি মনিব ও গোলামের মধ্যে প্রস্তাব পেশ ও গ্রহণের মাধ্যমে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে শরিয়তের আইনে তা অপরিহার্য হয়ে যায়। মনিবের তা ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। যখনই গোলাম নির্ধারিত অঙ্ক পরিশোধ করে দেবে, তখনই আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে।

টাকার এই অঙ্ককে 'বদলে-কিতাবত' বা চুক্তির বিনিময় বলা হয়। শরিয়ত এর কোনো সীমা নির্ধারণ করেনি। গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হোক কিংবা কম বেশি, উভয় পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণই স্থিরীকৃত হবে, তাই চুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত হবে। ইসলামি শরিয়ত সেদিকে লক্ষ্য রাখে, যে পন্থা অবলম্বন করলে শরিয়তসম্মত গোলাম ও বাঁদির মুক্তির পথ অধিক পরিমাণে সুগম হয়। এর দ্বারা একথা বুঝে আসে যে, গোলাম ও বাঁদির সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ ও তাকে মোস্তাহব সাব্যস্ত করার বিধানও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এরই ধারাবাহিকতায় যাবতীয় কাফফারার মধ্যে গোলাম অথবা বাঁদী মুক্ত করার বিধান রয়েছে। একারণেই গোলাম মুক্ত করার মধ্যে বিরাট ছওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। লিখিত চুক্তির ব্যাপারটিও তারই একটি পথ। তাই এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তবে এর সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا অর্থাৎ লিখিত চুক্তি করা তখনই দুরস্ত হবে, যখন তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের চিহ্ন দেখতে পাও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং অধিকাংশ ইমাম এই কল্যাণের অর্থ বলেছেন উপার্জন ক্ষমতা। অর্থাৎ যার মধ্যে এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তার সাথে চুক্তি করলে উপার্জনের মাধ্যমে নির্ধারিত টাকা সঞ্চয় করতে পারবে, তবে তার সাথে চুক্তি করা যায়। নতুবা অযোগ্য লোকের সাথে চুক্তি করলে তার পরিশ্রমও পণ্ড হবে এবং মালিকেরও ক্ষতি হবে। হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন : এখানে কল্যানের অর্থ এই যে, সে মুক্ত হলে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নেই; উদাহরণত সে কাফের হলে এবং তার কাফের ভাইদের সাহায্য করলে বুঝতে হবে যে, এখানে উভয় বিষয়ই কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। গোলামের মধ্যে উপার্জনশক্তিও থাকতে হবে এবং তার মুক্তির কারণে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কাও না থাক চাই। –[মাযহারী]

وَاٰتُوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ করার উপর নির্ভরশীল থাকবে, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত। জাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির বিনিময় কিছু হ্রাস করে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম তাই করতেন। তাঁরা চুক্তির বিনিময় সামর্থ্য অনুযায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা আরো কম হ্রাস করে দিতেন। –[মাযহারী]

অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা এবং সে সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা : আজকাল দুনিয়াতে বস্তুবাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব পরকাল বিস্মৃত হয়ে কেবল অর্থোপার্জনের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের জ্ঞানগত গবেষণা ও চিন্তাভাবনার পরিধি শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এতে আলোচনা ও গবেষণার তোড়জোড় এত বেশি যে, এক একটি সাধারণ বিষয় বিরাট বিরাট শাস্ত্রের আকার ধারণ করে ফেলেছে। তন্মধ্যে অর্থশাস্ত্রই সর্ববৃহৎ।

এ ব্যাপারে আজকাল বিশ্বের মনীষীদের দু'টি মতবাদ অধিক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত এবং উভয় মতবাদই বিপরীতমুখী। মতবাদের এই সংঘর্ষ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ধাক্কাধাক্কি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের এমন দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাসীর কাছে শান্তি একটি অচেনা বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

একটি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যাকে পরিভাষায় ক্যাপিট্যালিজম বলা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাকে কমিউনিজম অথবা সোশ্যালিজম বলা হয়। এ কথা চাক্ষুষ এবং সর্ববাদীসম্মত যে, এই বিশ্বচরাচরে মানুষ তার শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা যা কিছু উপার্জন ও সৃষ্টি করে, সেসবের আসল ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ, মৃত্তিকার ফসল, পানি ও খনিতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের উপর স্থাপিত। মানুষ চিন্তাভাবনা ও শ্রমের মাধ্যমে এসব সম্পদের মধ্যে জোড়াতালি ও সংমিশ্রণ দ্বারা প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য তৈরি করে। বিবেকের দাবি ছিল এই যে, উপরিউক্ত উভয় ব্যবস্থার প্রবক্তরা প্রথমে চিন্তা করত যে, এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে যায় নি। এগুলোর কোনো একজন স্রষ্টা আছেন। একথাও বলাবাহুল্য যে, এগুলোর আসল মালিকও তিনিই হবেন, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। আমরা এসব সম্পদ কুক্ষিগত করা, এগুলোর মালিক হওয়া অথবা ব্যবহার করার ব্যাপারে স্বাধীন নই। বরং প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টা যদি কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেগুলো মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বস্তুপূজার উন্মাদনা তাদের সবাইকে প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টার ধারণা থেকেই গাফেল করে দিয়েছে। তাদের মতে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু এতটুকুই যে, যে ব্যক্তি এসব সম্পদ অধিকারভুক্ত করে

এগুলো দ্বারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে, সে আপনা-আপনি এগুলোর স্বাধীন মালিক হয়ে যায়, না এগুলো সাধারণ ওয়াকফ ও যৌথ মালিকানাধীন যে, প্রত্যেকেই এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে?

প্রথম মতবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে এসব বস্তুর উপর স্বাধীন মালিকানা অধিকার দান করে। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যথা ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে। এ ব্যাপারে কোনোরূপ বাধা-নিষেধ সহনীয় নয়। এই মতবাদই প্রাচীন কালে মুশরিক ও কাফেরদের ছিল। তারা হযরত শোয়াইব (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিল : এসব ধন-সম্পত্তি আমাদের। আমরা এগুলোর মালিক। আমাদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করার এবং জায়েজ-নাজায়েজের কথা বলার আধিকার আপনি কোথায় পেলেন? কুরআনের اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا আয়াতে উদ্দেশ্য তাই। দ্বিতীয় মতবাদ সোশ্যালিজম মানুষকে কোনো বস্তুর উপর কোনোরূপ মালিকানার অধিকার দেয় না; বরং প্রত্যেক বস্তুকে সব মানুষের যৌথ মালিকানাধীন সাব্যস্ত করে এবং সবাইকে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার দান করে। এটাই সমাজতন্ত্রের আসল ভিত্তি। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এ ধারণার বাস্তবায়ন অসম্ভব এবং এর ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায় না, তখন কিছু বস্তুকে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমভূক্তও করে দেওয়া হলো।

কুরআন পাক এই উভয় বাজে মতবাদ খণ্ডন করে মূলনীতি এই দিয়েছে যে, বিশ্বের সকল বস্তুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। এরপর তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় মানুষকে বিশেষ আইনের অধীনে মালিকানা দান করেছেন। এই আইনের দৃষ্টিতে যাকে যেমন জিনিসের মালিক করা হয়েছে, সেগুলোতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত অপরের হস্তক্ষেপ করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মালিক হওয়ার পরও তাকে স্বাধীন মালিকানা দেওয়া হয়নি যে, যেভাবে ইচ্ছা, উপার্জন করবে ও যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবে; বরং উভয় দিকের একটি ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক আইন রাখা হয়েছে যে, উপার্জনের অমুক পথ হালাল, অমুক পথ হারাম এবং অমুক জায়গায় ব্যয় করা হালাল ও অমুক জায়গায় হারাম। এছাড়া যে সব বস্তুর মালিকানা দান করা হয়েছে, সেগুলোতে অপরের অধিকারও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা আদায় করা তার দায়িত্ব।

আলোচ্য আয়াতে যদিও ভিন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ের কতিপয় মূলনীতিও এতে ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করুন : وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ অর্থাৎ এই অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলার সেই ধন-সম্পদ থেকে দান কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। এতে তিনটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এক, ধন-সম্পদ তথা প্রত্যেক বস্তুর আসল মালিক আল্লাহ। দুই, তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে এর এক অংশের মালিক করেছেন। তিন, তিনি যে বস্তুর মালিক বানিয়েছেন, তার জন্য কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যয় করা অপরিহার্য, ওয়াজিব, মোস্তাহাবও উত্তম করেছেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

এবং মূর্খতাযুগের কুপ্রথা উৎপাটন, ব্যভিচার ও নির্লজ্জতা দমন করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ অর্থাৎ তোমাদের বাঁদিদেরকে এ কাজে বাধ্য করো না যে, তারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ কড়ি উপার্জন করে তোমাদেরকে দেবে। মূর্খতাযুগের অনেক মানুষ বাঁদিদেরকে এ কাজে ব্যবহার করত। ইসলাম যখন ব্যভিচারের কঠোর শাস্তি জারি করল এবং মুক্ত ও গোলাম নির্বিশেষে সবাইকে এর আওতাভুক্ত করে দিল, তখন এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিশেষ বিধান প্রদান করাও জরুরি ছিল।

اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا –অর্থাৎ যদি বাঁদিরা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার ও সতীত্ব রক্ষা করার ইচ্ছা করে, তবে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করা খুবই নির্লজ্জ কাজ। বাক্যটি যদিও শর্তের আকারে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সর্বসম্মত মতানুসারে প্রকৃতপক্ষে এ শর্ত উদ্দেশ্য নয় যে, বাঁদিরা ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চাইলে তাদের উপর জবরদস্তি করা জায়েজ নয় এবং বাঁচতে না চাইলে জায়েজ। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ চাল-চলন ও অভ্যাসের দিক দিয়ে বাঁদিদের মধ্যে লজ্জাশরম ও সতীত্ববোধ মূর্খতাযুগে বিদ্যমান ছিল না। ইসলামি বিধানাবলি আগমনের পর তারা যখন তওবা করল, তখনও তাদের মনিবরা অর্থাৎ ইবনে-উবাই প্রমুখ মুনাফিক জবরদস্তি করতে চাইল। এই পরিস্থিতিতে আলোচ্য বিধান অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, তারা যখন ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চায়, তখন তোমরা তাদেরকে বাধ্য করো না। এতে করে তাদের মনিবদেরকে শাসানো উদ্দেশ্য যে, বাঁদিরা তো সতীসাধ্বী থাকতে ইচ্ছুক, আর তোমরাই তাদেরকে ব্যভিচার করতে বাধ্য কর–এটা নিরতিশয় বেহায়াপনার কাজ।

فَإِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ –এই বাক্যের সারমর্ম এই যে, বাঁদিদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হারাম। কেউ এরূপ করলে এবং মনিবের জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে কোনো বাঁদি ব্যভিচার করলে আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং সমস্ত গোনাহ্ জবরদস্তকারীর উপর বর্তাবে। –[মাযহারী]

নূরের সংজ্ঞা : নূরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাযযালী (র.) বলেন : اَلظَّاهِرُ بِنَفْسِهِ وَالْمُظْهِرُ لِغَيْرِهِ অর্থাৎ যে বস্তু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল এবং অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে। তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায়– এমন সব বস্তুকে অনুভব করে। যেমন, সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে; অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে। এ থেকে জানা গেল যে, নূর শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্যে প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি পদার্থও নন এবং পদার্থজাতও নন; বরং এগুলোর বহু ঊর্ধ্বে। কাজেই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্যে ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ সকল তাফসীরবিদের মতে 'মুনাওয়ের' অর্থাৎ, ঔজ্জ্বল্যদানকারী। অথবা অতিশয়ার্থবোধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে 'নূর' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন দানশীলকে 'দান' বলে ব্যক্ত করা হয় এবং ন্যায়পরায়ণশীলকে ন্যায়পরায়ণতা বলে দেওয়া হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্টজীবের নূরদাতা। এই নূর বলে হেদায়েতের নূর বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাছীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর তাফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেন : اَللّٰهُ هَادِى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীদের হেদায়েতকারী।

মুমিনের নূর : مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ মুমিনের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার যে নূরে-হেদায়েত আসে, এটা তার একটা বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ইবনে জারীর হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন :

هُوَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ جَعَلَ اللّٰهُ الْاِيْمَانَ وَالْقُرْاٰنَ فِىْ صَدْرِهٖ فَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلَهٗ فَقَالَ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَبَدَأَ بِنُوْرِ نَفْسِهٖ ثُمَّ ذَكَرَ نُوْرَ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ مَثَلُ نُوْرِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ فَكَانَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يَقْرَأُهَا مَثَلُ نُوْرِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ

অর্থাৎ– "এটা সেই মুমিনের দৃষ্টান্ত, যার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও কুরআনের নূরে-হেদায়েত রেখেছেন"। আয়াতে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের নূর উল্লেখ করেছেন: اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অতঃপর মুমিনের অন্তরের নূর উল্লেখ করেছেন مَثَلُ نُوْرِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ উবাই ইবনে কা'ব এই আয়াতের কেরাতও مَثَلُ نُوْرِهٖ-এর পরিবর্তে পড়তেন। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের এই কেরাত এবং আয়াতের এই অর্থ হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাছীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর লিখেছেন : مَثَلُ نُوْرِهٖ-এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের দু'রকম উক্তি আছে। (এক), এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর নূরে হেদায়েত যা মুমিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত كَمِشْكٰوةٍ এটা হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.)-এর উক্তি। (দুই), সর্বনাম দ্বারা মুমিনকেই বোঝানো হয়েছে। বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে মুমিনই বোঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, মুমিনের বক্ষ একটি দীপাধারের মতো এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে যে স্বচ্ছ যয়তুন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে-হেদায়েতের দৃষ্টান্ত যা মুমিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তুন তৈল অগ্নি স্পর্শে প্রজ্বলিত হয়ে যেমন অপরকে আলোকিত করে; এমনিভাবে মুমিনের অন্তরে রাখা নূরে-হেদায়েত যখন খোদায়ী ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে-কেরাম ও তাবেয়ীগণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এর কারণও সম্ভবত এই যে, এই নূর দ্বারা শুধু মুমিনই উপকার লাভ করে। নতুবা এই সৃষ্টিগত নূরে-হেদায়েত যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরে রাখা হয়। তা বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরেই রাখা হয় না; বরং প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় ও স্বভাবে এই নূরে-হেদায়েত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক, কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের স্বভাব ধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

একটি সহীহ্ হাদীস থেকে এই ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে: كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ অর্থাৎ, প্রত্যেকটি শিশু ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা- মাতা তাকে ফিতরতের দাবি থেকে সরিয়ে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। এই ফিতরতের অর্থ ঈমানের হেদায়েত। ঈমানের হেদায়েত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। যখন পয়গম্বর ও তাঁদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌঁছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুকর্মের দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপকাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সবাই শামিল। এতে মুমিন ও কাফেরেরও প্রভেদ করা হয়নি। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, তাঁর নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এখানে আল্লাহর ইচ্ছার শর্তটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়; বরং এর সম্পর্ক কুরআনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহর তাওফীক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক, বরং মাঝে মাঝে ক্ষতিকরও হয়। কবি বলেন : اِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللّٰهِ لِلْفَتٰى • فَاَوَّلُ مَنْ يَّجْنِىْ عَلَيْهِ اجْتِهَادُهٗ

অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে সাহায্য করা না হলে তার চেষ্টাই উল্টা তার জন্য ক্ষতিকর হয়।

নবী করীম ﷺ-এর নূর : ইমাম বগভী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন : এই আয়াতের তাফসীরে আপনি কি বলেন? কা'ব আহবার তাওরাত ও ইঞ্জিলে সুপণ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি বললেন : এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। মিশকাত তথা দীপাধার মানে তাঁর বক্ষদেশ, زُجَاجَةٌ তথা কাঁচপাত্র মানে তাঁর পূতঃপবিত্র অন্তর এবং مِصْبَاحٌ তথা প্রদীপ মানে নবুয়ত। এই নবুয়তরূপী নূরের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্যে আলো ও ঔজ্জ্বল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হলে এটা এমন নূরে পর্যবসিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত প্রকাশ বরং তাঁর জন্মেরও পূর্বে তাঁর নবুয়তের সুসংবাদবাহী অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় এসব ঘটনাকে 'এরহাসাত' বলা হয়। কেননা 'মু'জিযা' শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলি বোঝাবার জন্যে প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুয়তের দাবির সত্যতা প্রকাশ করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পয়গম্বরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে নবুয়ত দাবির পূর্বে এ ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তার নাম দেওয়া হয় 'এরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। শায়েখ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) 'খাসায়েসে কোবরা' গ্রন্থে, আবূ নু'আঈম 'দালায়েলে-নবুয়ত' গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলেমগণও স্বতন্ত্র গ্রন্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। এ স্থলে তাফসীরে-মাযহারীতেও অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে।

যয়তূন তেলের বৈশিষ্ট্য : شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ এতে প্রমাণিত হয় যে, যয়তূন ও যয়তূন-বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলেমগণ বলেন : আল্লাহ তা'আলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চাইতে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল বের করার জন্যে কোনো যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। আপনা-আপনি ফল থেকে তৈল বের হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যয়তূন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও কর। কেননা এটা কল্যাণময় বৃক্ষ। –[মাযহারী]

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ– পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অন্তরে নিজের নূরে-হেদায়েত রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন : এই নূর দ্বারা সেই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ চান ও তাওফীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মুমিনদের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরূপ মুমিনদের আসল আবাসস্থল, যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়- সেসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্যে এবং যেগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এই বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী فِىْ بُيُوْتٍ -এর সম্পর্কে يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ বাক্যের সাথে হবে। কেউ কেউ এর সম্পর্ক يُسَبِّحُ উহ্য শব্দের সাথে করেছেন, যার প্রমাণ পরবর্তী يسبح শব্দটি। কিন্তু প্রথমোক্ত সম্পর্ক বাক্যের বর্ণনাধারা দৃষ্টে উত্তম মনে হয়। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার নূরে-হেদায়েত পাওয়ার স্থান সেসব গৃহ, যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে মসজিদ।

মসজিদ : আল্লাহর ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব : কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ اَحَبَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُحِبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ فَلْيُحِبَّ اَصْحَابِىْ وَمَنْ اَحَبَّ اَصْحَابِىْ فَلْيُحِبَّ الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَحَبَّ الْقُرْاٰنَ فَيُحِبُّ الْمَسَاجِدَ فَاِنَّهَا اَفْنِيَةُ اللّٰهِ اَذِنَ اللّٰهُ فِىْ رَفْعِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا مَيْمُوْنَةٌ مَيْمُوْنٌ اَهْلُهَا مَحْفُوْظَةٌ مَحْفُوْظٌ اَهْلُهَا هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ حَوَائِجِهِمْ هُمْ فِى الْمَسَاجِدِ وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবীগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবীগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন কুরআনকে মহব্বত করে। সে কুরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে। কেননা মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদ ও বরকতময় এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্তরাও বরকতময়। মসজিদও আল্লাহর হেফাজতে এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কিতরাও আল্লাহর হেফাজতে থাকে। যারা নামাজে মশগুল হয়, আল্লাহ তাদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা পশ্চাতে তাদের জিনিসপত্রের হেফাজত করেন। -[কুরতুবী]

رَفْعٌ تُرْفَعَ শব্দটি اِذْنٌ শব্দটি اَذِنَ - اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ : -এর অর্থ : رَفْعُ مَسَاجِدَ থেকে উদ্ভূত। অর্থ অনুমতি দেওয়া। থেকে উদ্ভূত। অর্থ উচ্চ করা, সম্মান করা। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা মসজিদসমূহকে উচ্চ করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেওয়ার মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করার মানে সম্মান করা। হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) বলেন : উচ্চ করার অর্থে আল্লাহ তা'আলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন। -[ইবনে-কাছীর]

ইকরিমা ও মুজাহিদ বলেন : رَفْعٌ বলে মসজিদ নির্মাণ বোঝানো হয়েছে; যেমন কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ এখানে رَفْعُ قَوَاعِدَ বলে ভিত্তি নির্মাণ বোঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : رَفْعُ مَسَاجِدَ বলে মসজিদসমূহের সম্মান, ইজ্জত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা বোঝানো হয়েছে। যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে, মসজিদে কোনো নাপাকী আনা হলে মসজিদ এমন কুঞ্চিত হয়, যেমন আগুনের স্পর্শে মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয়। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে নাপাকী, নোংরামি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করে দেবেন। -[ইবনে মাজাহ]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ নামাজ পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরি করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্যে আদেশ করেছেন। -[কুরতুবী]

প্রকৃত কথা এই যে, تُرْفَعَ শব্দের অর্থে মসজিদ নির্মাণ করা, পাক-পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাক-পবিত্র রাখার মধ্যে নাপাকী ও নোংরামি থেকে পবিত্র রাখা এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা উভয়ই দাখিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ রসুন ও পিঁয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ হাদীস গ্রন্থসমূহে একথা বর্ণিত আছে। সিগারেট, হুক্কা, পান, তামাক খেয়ে মসজিদে যাওয়াও তেমন নিষিদ্ধ। মসজিদে দুর্গন্ধযুক্ত কেরোসিন তৈল জ্বালানোও তেমনি নিষিদ্ধ।

সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে হযরত ফারুকে আযম (রা.) বলেন : আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পেঁয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন :

যে ব্যক্তি রসুন-পেঁয়াজ খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায় যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। এ হাদীসের আলোকে ফিকহ্‌বিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার কাছে দাঁড়ালে কষ্ট হয়, তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। তার নিজেরও উচিৎ যতদিন এই রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামাজ পড়া।

رَفْعِ مَسَاجِدْ -এর অর্থ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে মসজিদ নির্মাণ করা এবং তাকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থেকে পাক-পবিত্র রাখা। কেউ কেউ মসজিদের বাহ্যিক শান-শওকত ও সুউচ্চ নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের প্রমাণ এই যে, হযরত উসমান (রা.) শাল কাঠ দ্বারা মসজিদে নববীর নির্মাণগত শান-শওকত বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) মসজিদে নববীতে সুদৃশ্য কারুকার্য ও নির্মাণগত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট যত্নবান হয়েছিলেন। তখন ছিল বিশিষ্ট সাহাবীগণের যুগ; কিন্তু কেউ তাঁর একাজ অপছন্দ করেননি। পরবর্তী বাদশাহ্‌রা তো মসজিদ নির্মাণে অঢেল অর্থকড়ি ব্যয় করেছেন। ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেক তাঁর খেলাফতকালে দামেশকের জামে মসজিদ নির্মাণ ও সুসজ্জিত করণে সমগ্র সিরিয়ার বার্ষিক আমদানির তিন গুণেরও অধিক অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাঁর নির্মিত এই মসজিদ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি নাম-যশ খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে না হয়, আল্লাহর নাম ও আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেউ সুরম্য, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই; বরং ছওয়াব আশা করা যায়।

মসজিদের কতিপয় ফজিলত : আবূ দাউদে হযরত আবূ উমামাহ্ থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি গৃহে অজু করে ফরজ নামাজের জন্যে মসজিদের দিকে যায়, তার ছওয়াব সেই ব্যক্তির সমান, যে এহ্‌রাম বেঁধে গৃহ থেকে হজের জন্যে যায়। যে ব্যক্তি এশরাকের নামাজ পড়ার জন্যে গৃহ থেকে অজু করে মসজিদের দিকে যায়, তার ছওয়াব ওমরাকারীর অনুরূপ। এক নামাজের পরে অন্য নামাজ عليين -এ লিখিত হয় যদি উভয়ের মাঝখানে কোনো কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হযরত বুরায়দার রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। –[মুসলিম]

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পুরুষের নামাজ জামাআতে আদায় করা গৃহে অথবা দোকানে নামাজ পড়ার চাইতে বিশ গুণেরও অধিক শ্রেষ্ঠ। এর কারণ এই যে, যখন কেউ উত্তমরূপে সুন্নত অনুযায়ী অজু করে, এরপর মসজিদে শুধু নামাজের নিয়তে যায়, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার মর্তবা একগুণ বৃদ্ধি পায় এবং একটি গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত এই অবস্থা বহাল থাকে। এরপর যতক্ষণ জামাতের অপেক্ষায় বসে থাকবে, ততক্ষণ নামাজেরই ছওয়াব পেতে থাকবে এবং ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে যে– ইয়া আল্লাহ! তার প্রতি রহমত নাজিল করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার অজু না ভাঙ্গে।" হযরত হাকাম ইবনে ওমায়রের বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : দুনিয়াতে মেহমানের ন্যায় বসবাস কর এবং মসজিদকে নিজের গৃহ বানাও। অন্তরে নম্রতার অভ্যাস সৃষ্টির কর অর্থাৎ নম্রচিত্ত হও। আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা কর এবং (আল্লাহর ভয়ে) অধিক পরিমাণে ক্রন্দন কর। দুনিয়ার কামনা-বাসনা যেন তোমাকে এমন করে না দেয় যে, তুমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণে মত্ত হয়ে পড়, যেখানে বসবাসও করতে হয় না, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় মশগুল হয়ে পড় এবং ভবিষ্যতের জন্য এমন আজগুবি আশা পোষণ করতে থাক, যা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। হযরত আবূ দারদা (রা.) তাঁর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেন : তোমার গৃহ মসজিদ হওয়া উচিত। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে শুনেছি-মসজিদ মুত্তাকী লোকদের গৃহ। যে ব্যক্তি মসজিদকে (অধিক জিকির দ্বারা) নিজের গৃহ করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য আরাম, শান্তি ও পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করার জিম্মাদার হয়ে যান। হযরত আবূ সাদেক ইজদী শোআয়ব ইবনে হারহাবের নামে এক পত্রে লিখেছেন : মসজিদকে আঁকড়ে থাক। আমি এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, মসজিদ পয়গম্বরগণের মজলিস ছিল।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : শেষ জমানায় এমন লোক হবে, যারা মসজিদে এসে স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে বসে যাবে এবং দুনিয়ার ও তার মহব্বতের কথাবার্তা বলবে। তোমরা এমন লোকদের সাথে উপবেশন করো না। কেননা, এ ধরনের মসজিদে আগমনকারীদের কোনো প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার নেই।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন : যে ব্যক্তি মসজিদে বসল, সে যেন তার পালনকর্তার মজলিসে বসল। কাজেই মুখ থেকে ভালো কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বের না করা তার দায়িত্ব। –[কুরতুবী]

মসজিদের পনেরোটি আদব : আলেমগণ মসজিদের পনেরোটি আদব উল্লেখ করেছেন। ১. মসজিদে পৌঁছে কিছু লোককে উপবিষ্ট দেখলে তাদেরকে সালাম করবে। যদি কেউ না থাকে, তবে اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ বলবে। কিন্তু এটা তখন, যখন মসজিদের লোকগণ নফল নামাজ, তিলাওয়াতে-কুরআন, তাসবীহ ইত্যাদিতে মশগুল না থাকে। কেননা এমতাবস্থায় সালাম করা দুরস্ত নয়। ২. মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল-মসজিদ নামাজ পড়বে। এটাও তখন, যখন সময়টি নামাজের জন্য মাকরূহ সময় না হয়; অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় না হওয়া। ৩. মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় না করা। ৪. মসজিদে তীর-তরবারি বের না করা। ৫. মসজিদে নিখোঁজ বস্তুর তল্লাশী ঘোষণা না করা। ৬. মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলা। ৭. মসজিদে দুনিয়াদারির কথাবার্তা না বলা। ৮. মসজিদে বসার জায়গায় কারো সাথে ঝগড়া না করা। ৯. যেখানে কাতারে পুরাপুরি জায়গা নেই, সেখানে ঢুকে পড়ে অন্যকে অসুবিধায় না ফেলা। ১০. নামাজী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা। ১১. মসজিদে থুথু ফেলা ও নাক সাফ করা থেকে বিরত থাকা। ১২. অঙ্গুলি না ফুটানো। ১৩. শরীরের কোনো অংশ নিয়ে খেলা না করা। ১৪. নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা এবং শিশু ও উন্মাদ ব্যক্তিকে সঙ্গে না নেওয়া। ১৫. অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকা। কুরতুবী এই পনেরোটি আদব লিখার পর বলেন : যে এগুলো পালন করে, সে মসজিদের প্রাপ্য পরিশোধ করে এবং মসজিদ তার জন্য হেফাজত ও শান্তির জায়গা হয়ে যায়। বর্তমান তাফসীরকার মসজিদের আদব-কায়দা ও এ প্রাসঙ্গিক আহকাম সম্বলিত 'আদাবুল মাসাজিদ' শিরোনামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, প্রয়োজনবোধ করলে আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা দেখে নিতে পারেন

যেসব গৃহ আল্লাহর জিকির, কুরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ : তাফসীরে বাহরে-মুহীতে আবূ হাইয়্যান বলেন : কুরআনের فِيْ بُيُوْتٍ শব্দটি ব্যাপক। এতে যেমন মসজিদ বোঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব গৃহে কুরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়াজ-নসিহত অথবা জিকিরের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত, সেগুলোও বোঝানো হয়েছে, যেমন মাদরাসা, খানকাহ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

اَذِنَ اللّٰهُ বাক্যে اَذِنَ শব্দের বিশেষ রহস্য : তাফসীরবিদগণ সবাই একমত যে, এখানে اَذِنَ শব্দের অর্থ আদেশ করা। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এখানে اَمَرَ ও حَكَمَ শব্দের পরিবর্তে اَذِنَ শব্দ ব্যবহার করার রহস্য কি? রূহুল-মা'আনীতে এর একটি সূক্ষ্ম রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং আদেশের অপেক্ষা না করে শুধু অনুমতি লাভের আশায় থাকে।

يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ– এখানে তাসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) তাহমীদ (প্রশংসা কীর্তন), নফল নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার জিকির বোঝানো হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَنْكِحُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْكَاحٌ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বিবাহ করিয়ে দাও।

اَيَامٰى : اَيِّمٌ-এর বহুবচন। অর্থ– অবিবাহিতগণ, স্ত্রী বিহীন পুরুষ। স্বামীহীনা নারী।

اِمَائِكُمْ : এখানে اِمَاءٌ শব্দটি اَمَةٌ-এর বহুবচন মুযাফ। كُمْ যমীর মুযাফ ইলাইহি। অর্থ– তোমাদের দাসীগণ, তোমাদের বাঁদিরা।

وَلْيَسْتَعْفِفْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِعْفَافٌ মূলবর্ণ (ع ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদের উচিৎ যেন তারা সংযমী হয়ে থাকে।

يَبْتَغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِغَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যারা হতে চায়।

كَاتِبُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُكَاتَبَةٌ মূলবর্ণ (ك ـ ت ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তবে তাদেরকে মুকাতাব বানিয়ে দাও।

اٰتُوهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ– তোমরা তাদেরকে দাও।

اَرَدْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَادَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা চায়।

خَلَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার خُلُوٌّ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা অতীত হয়ে গিয়েছে।

يُوْقَدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْقَادٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– তাকে জ্বালানো হয়ে থাকে।

يُضِيْئُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِضَاءَةٌ মূলবর্ণ (ض ـ و ـ أ) জিনস মুরাক্কাব (اجوف واوى ও مهموز لام) অর্থ– স্বয়ংই জ্বলে উঠবে।

لَمْ تَمْسَسْهُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَسٌّ মূলবর্ণ (م ـ س ـ س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– এটাকে স্পর্শ না করে।

يُسَبِّحُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ : এখানে واو টি আতেফা, مَنْ মুবতাদা اسم شرط আর يُكْرِهْهُنَّ ফে'লে শর্ত। আর فاء হলো রাবেতা। আর পরবর্তী বাক্য হলো জওয়াব। اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল শব্দটি الله اسم ان আর مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ হলো حال আর غَفُوْرٌ হলো اِنَّ-এর প্রথম খবর, আর رَحِيْمٌ হলো اِنَّ-এর দ্বিতীয় খবর। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২৭৫]

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿۳۷﴾

৩৭. যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় গাফেল করে রাখতে পারে না আল্লাহর জিকির হতে এবং নামাজ আদায় করা ও জাকাত দেওয়া হতে। তারা সেই দিনের ভয় করতে থাকে যেদিন বহু অন্তর ও চক্ষু বিপর্যস্ত হবে।

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾

৩৮. (তাদের পরিণাম এরূপ হবে যে,) আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজের জন্য অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো অধিক প্রদান করবেন; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করে থাকেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾

৩৯. আর যারা কাফের তাদের আমলসমূহ যেন একটি মরুভূমির মরীচিকা– পিপাসার্ত লোক যাকে পানি বলে মনে করে; অবশেষে যখন সে এর নিকটে আসে, তখন তাতে কিছুই পায় না এবং তথায় (পানির পরিবর্তে) আল্লাহর নির্ধারিত (মৃত্যু)-কে পায়, তখন আল্লাহ তার (আয়ুর) হিসাব পুরোপুরি চুকিয়ে দেন; এবং আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ যাদেরকে গাফেল করে রাখতে পারে না تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ আল্লাহর জিকির হতে وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ এবং নামাজ আদায় করা وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ও জাকাত দেওয়া হতে يَخَافُوْنَ يَوْمًا তারা সেদিনের ভয় করতে থাকে تَتَقَلَّبُ فِيْهِ যেদিন বিপর্যস্ত হবে الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ বহু অন্তর ও চক্ষু।

৩৮. لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজের জন্য অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো অধিক প্রদান করবেন وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক দান করে থাকেন।

৩৯. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কাফের اَعْمَالُهُمْ তাদের আমলসমূহ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ যেন একটি মরুভূমির মরিচিকা يَحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً পিপাসার্ত লোক যাকে পানি বলে মনে করে حَتّٰى اِذَا جَآءَهٗ অবশেষে যখন সে তার নিকটে আসে لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا তখন তাতে কিছুই পায় না وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ এবং তথায় (পানির পরিবর্তে) আল্লাহর নির্ধারিত (মৃত্যু) কে পায় فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ তখন আল্লাহ তার (আয়ুর) হিসাব পুরোপুরি চুকিয়ে দেন وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ এবং আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

৪০. অথবা (তাদের) ঐ আমলসমূহ এরূপ, যেমন গভীর সমুদ্র-তলে অন্ধকারপুঞ্জ, এক প্রচণ্ড তরঙ্গ তাকে ঢেকে ফেলেছে, তার উপর আর এক তরঙ্গ, তার উপরে মেঘমালা (ফলে তথায় আলো পৌছতে পারে না); উপরে নীচে বহু অন্ধকাররাশি বিদ্যমান; যদি কেউ নিজের হাত বের করে, তবে দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনাও নেই; আর আল্লাহ যাকে নূর দান না করেন তার জন্য নূর নেই।	اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿٤٠﴾
৪১. তুমি কি দেখনা যে, সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে আছে, এবং পক্ষীরা (-ও) যারা পাখা বিস্তার করে উড়ে বেড়ায়; প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দোয়া এবং নিজ নিজ তসবীহ জানা আছে; আর তাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহর পূর্ণ অবগতি আছে।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤١﴾
৪২. আর আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে আসমানসমূহ ও জমিনে, এবং আল্লাহরই সমীপে সকলকে ফিরে যেতে হবে।	وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪০. اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ অথবা (তাদের) ঐ আমলসমূহ এরূপ, যেমন গভীর সমুদ্র তলে অন্ধকারপুঞ্জ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ এক প্রচণ্ড তরঙ্গ তাকে ঢেকে ফেলেছে مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ তার উপর আর এক তরঙ্গ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ তার উপরে মেঘমালা ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ উপরে নীচে বহু অন্ধকাররাশি বিদ্যমান اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا যদি কেউ নিজের হাত বের করে তবে দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনাও নেই وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا আর আল্লাহ যাকে নূর দান না করেন فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ তার জন্য নূর নেই।

৪১. اَلَمْ تَرَ তুমি কি দেখ না যে اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে আছে وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ এবং পক্ষীরাও যারা পাখা বিস্তার করে উড়ে বেড়ায় كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দোয়া এবং নিজ নিজ তাসবীহ জানা আছে وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ আর তাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহর পূর্ণ অবগতি আছে।

৪২. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আর আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে আসমানসমূহ ও জমিনে وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ এবং আল্লাহরই সমীপে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

৪৩. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা মেঘমালাকে চালিত করেন, অতঃপর সেই মেঘকে পরস্পর সংযুক্ত করে দেন, তৎপর তাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেন, অনন্তর তুমি বৃষ্টিকে দেখতে পাও যে, সে মেঘের ভিতর হতে নির্গত হয়। আর তিনি সেই মেঘ অর্থাৎ তার বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডগুলো হতে শিলা বর্ষণ করে থাকেন। অতঃপর তাকে যার উপর ইচ্ছা পতিত করেন, আর যার হতে ইচ্ছা তার থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেন; আর ঐ মেঘমালার বিদ্যুৎ-প্রভার অবস্থা এই যে, মনে হয় যেন তা এখনই দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যাবে;

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. أَلَمْ تَرَ তুমি কি দেখনা যে أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا আল্লাহ তা'আলা মেঘমালাকে চালিত করেন ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ অতঃপর সেই মেঘকে পরস্পর সংযুক্ত করে দেন ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا তৎপর তাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেন فَتَرَى الْوَدْقَ অনন্তর তুমি বৃষ্টিকে দেখতে পাও يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ সে মেঘের ভিতর হতে নির্গত হয় وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ আর তিনি সেই মেঘ হতে বর্ষণ করে থাকেন مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ অর্থাৎ তার বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডগুলো হতে শিলা فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ অতঃপর তাকে যার উপর ইচ্ছা পতিত করেন وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ আর যার হতে ইচ্ছা তার থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেন يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ আর ঐ মেঘমালার বিদ্যুৎ-প্রভার অবস্থা এই যে, মনে হয় يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ তা এখনই দৃষ্টি শক্তি নিয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ [٣٧]

শানে নুযূল-১ : ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম ইবনে ওমরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা বাজারে ছিলেন। এ মুহূর্তেই নামাজ আদায় করার সময় হলো। তখন বাজারের দোকানদাররা তাদের দোকানগুলো তালা বন্ধ করে মসজিদে গমন করে নামাজ আদায়ে রত হয়ে গেল। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন : যে, এ সকল মানুষদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[ইবনে কাছীর ৩০৪/৩, ফতহুল কাদীর ৩৭/৪, কুরতুবী ২৫৭/১২]

শানে নুযূল-২ : কারোও মতে নবী করীম ﷺ-এর যুগে দু'জন লোক ছিলেন একজন ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি যখন নামাজের আজান শুনতে পেতেন, তখনই হাতে যদি পাল্লা থাকত, তাহলে সে পাল্লাকে হাত হতে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। তাকে গুছিয়ে রাখতেন না। পাল্লা যদি জমিনে থাকত, তাহলে মাটি হতে তা আর উঠাতেন না। দ্বিতীয়জন ছিল একজন কর্মকার, সে ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে তলোয়ার তৈরি করত। কাজ করার সময় হাতুড়ি যদি কর্মকারের নিহাই এর উপর থাকত তাহলে সেখানে রেখে দিতেন, আর তা যদি উঠানো থাকত, তাহলে পিছন দিক দিয়েই তা ফেলে দিতেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করণার্থে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। যারা তাদের অনুকরণ করে চলবে তারাও সে প্রশংসা পাবার অধিকারী হবে। -[কুরতুবী ২৫৭/১২]

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ [٣٩]

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন, আলোচ্য আয়াত শাইবা ইবনে রবীআ ইবনে আব্দে শাম্‌স সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে ধর্মীয় ব্যাপারে সংসার ত্যাগীতে পরিণত হয়ে যেত। তবে রাসূল ﷺ যখন প্রেরিত হলেন, তখন সে কুফরিতে পরিণত হয়ে গেল। এহেন বিচিত্রপূর্ণ আশু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।
–[কুরতুবী ২৫৯/১২/১৮]

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ [٤٠]

শানে নুযূল : ছা'লাবী বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর আবেসিনিয়া বর্তমান ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পরও পুনরায় খ্রিস্টানে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তার এ পট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করা হয়েছে।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ –যেসব মুমিন আল্লাহ তা'আলার নূরে হেদায়েতের বিশেষ স্থান-মসজিদকে আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। এখানে رِجَالٌ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান মূলত পুরুষদের জন্যে আর নারীদের জন্যে গৃহে নামাজ পড়া উত্তম।

মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ অর্থাৎ নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ।

আয়াতে সৎ কর্মপরায়ণ মুমিনদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না। বিক্রয়ও 'তেজারত' শব্দের মধ্যে দাখিল। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ মোকাবিলা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এখানে তেজারতের অর্থ ক্রয় এবং بَيْعٌ শব্দের অর্থ বিক্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ তেজারতকে ব্যাপক অর্থই রেখেছেন অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য। এরপর بَيْعٌ কে পৃথকভাবে বর্ণনা করার রহস্য এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য একটি বিস্তৃত অর্থবোধক শব্দ। এর উপকারিতা ও মুনাফা মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন পরে অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কোনো কোনো বস্তু বিক্রয় করার পর মুনাফাসহ মূল্য নগদ উসূল করার উপকারিতা তাৎক্ষণিক অর্জিত হয়। একে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহর জিকির ও নামাজের মোকাবিলায় মুমিনগণ কোনো বৃহত্তম পার্থিব উপকারের প্রতিও লক্ষ্য করে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন : এই আয়াত বাজারে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাঁর পুত্র হযরত সালেম (র.) বলেন : একদিন আমার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর নামাজের সময় বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, দোকানদাররা দোকান বন্ধ করে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন : এদের সম্পর্কেই কুরআনের এই আয়াত নাজিল হয়েছে : رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে দু'জন সাহাবী ছিলেন। একজন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন ও অপরজন কর্মকার ছিলেন এবং তরবারি নির্মাণ করে বিক্রয় করতেন। প্রথম সাহাবীর অবস্থা ছিল এই যে, সওদা ওজন করার সময় আজানের শব্দ শ্রুতিগোচর হলে তিনি দাড়িপাল্লা ফেলে দিয়ে নামাজের জন্য ছুটে যেতেন। দ্বিতীয়জন এমন ছিলেন যে, উত্তপ্ত লোহায় হাতুড়ি মারার সময় আজানের শব্দ কানে আসলে যদি হাতুড়ি কাঁধ বরাবর উত্তোলিত থাকত, তবে তা কাঁধের পেছনে ফেলে দিয়ে নামাজে রওয়ানা হয়ে যেতেন। উত্তোলিত হাতুড়ি মারার কাজ সেরে নেওয়াও তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁদের প্রশংসায়ই এই আয়াত অবতীর্ন হয়েছে। –[কুরতুবী]

অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামই ব্যবসাজীবি ছিলেন : এ আয়াতে থেকে আরো জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের বেশির ভাগই ব্যবসায়ী অথবা শিল্পী ছিলেন। ফলে তাঁদেরকে বাজারেই অবস্থান করতে হতো। কেননা আল্লাহর স্মরণে ব্যবসাবাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া ব্যবসাজীবীদেরই গুণ হতে পারে। নতুবা একথা বলা অনর্থক হবে।–[রূহুল-মা'আনী]

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ –এটা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত মুমিনদের সর্বশেষ গুণ। এতে বলা হয়েছে যে,তারা সর্বদা আল্লাহর জিকির, আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্য হয়ে যায় না; বরং কিয়ামতের হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে। এটা আল্লাহ প্রদত্ত নূরে হেদায়েতেরই শুভ প্রতিক্রিয়া। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেবেন। এরপর বলা হয়েছে, وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ অর্থাৎ, শুধু কর্মের প্রতিদানই শেষ নয়; বরং আল্লাহ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নিয়ামতও দান করবেন।

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো আইনের অধীন নন এবং তাঁর ভাণ্ডারে কোনো সময় অভাবও দেখা দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা অপরিসীম রুজি দান করেন। এ পর্যন্ত যেসব সৎকর্মপরায়ণ মুমিনের বক্ষ নূরে-হেদায়েতের দীপাধার এবং যারা বিশেষভাবে নূরে-হেদায়েতকে গ্রহণ করে, সেসব মুমিনের আলোচনা ছিল। অতঃপর সেসব কাফেরের কথা বলা হচ্ছে, যাদের স্বভাবে আল্লাহ তা'আলা নূরে-হেদায়েতের উপকরণ রেখেছিলেন, কিন্তু যখন এই উপকরণকে ঔজ্জ্বল্য দানকারী ওহী তাদের কাছে পৌঁছল, তখন তারা তা অস্বীকার করে নূর থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং অতল অন্ধকারেই রয়ে গেল। তারা কাফের ও অস্বীকারকারী –এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর বলা হয়েছে : وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ এই বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা নূরে-হেদায়েত থেকে বঞ্চিত। তারা খোদায়ী বিধি-বিধানের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে স্বভাবজাত নূরকেও বিলীন করে দিয়েছে। সুতরাং তারা আল্লাহর নূর কোথায় পাবে?

আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, শুধু জ্ঞান ও গুণের উপকরণ সংগৃহীত হলেই কেউ জ্ঞানী ও গুণী হয়ে যায় না; বরং এটা একান্ত আল্লাহর দান। এ কারণেই অনেক মানুষ, যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর, তারা পরকালের ব্যাপারে অত্যন্ত জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মান হয়ে থাকে। এমনিভাবে এর বিপরীতে যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাদের অনেকেই পরকালের ব্যাপারে বেওকুফ ও মূর্খ হয়ে থাকে। –[মাযহারী]

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ হযরত সুফিয়ানের বর্ণনা মতে এই যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু আসমান, জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সে কাজে ব্যাপৃত আছে– এর চুল পরিমাণও বিরোধিতা করে না। এই আনুগত্যকেই তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা এই যে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থাগত; উক্তিগত নয়। তাদের দেখেই মনে হয় যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর আনুগত্যে ব্যাপৃত আছে।

আল্লামা জমখশারী ও অন্যান্য তাফসীরবিদ বলেন : এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যা দ্বারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবান্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তাসবীহ ও ইবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে তারা মশগুল থাকে। كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও নামাজে সমগ্র সৃষ্টজগতই ব্যাপৃত আছে কিন্তু প্রত্যেকের নামাজ ও তাসবীহের পদ্ধতি ও আকার ভিন্ন রূপ। ফেরেশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন। মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন। উদ্ভিদরা অন্য পদ্ধতিতে নামাজ ও তাসবীহ আদায় করে। জড়পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্নরূপ। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াত থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে : أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শন এছাড়া আর কিছুই নয় যে, সে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া তার নিজের জীবনধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও তাকে এমন পথ প্রদর্শন করা হয়েছে যে, বড় বড় চিন্তাশীলদের চিন্তা তার কাছে হার মানে। বসবাসের জন্যে সে কেমন আশ্চর্যজনক বাসা, গর্ত ইত্যাদি তৈরি করে এবং খাদ্য ইত্যাদি হাসিল করার জন্যে কেমন কৌশল অবলম্বন করে।

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ –এখানে سَمَاءٌ মানে মেঘমালা এবং جِبَالٌ মানে বড় বড় মেঘখণ্ড। بَرْدٌ -এর অর্থ শিলা।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا تُلْهِيْهِمْ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব إفْعَالٌ মাসদার اِلْهَاءٌ মূলবর্ণ (ل. ه. و) জিনস ناقص واوى অর্থ- যাদেরকে গাফেল করে রাখতে পারে না।

تَتَقَلَّبُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَقَلُّبٌ মূলবর্ণ (ق. ل. ب) জিনস صحيح অর্থ- বিপর্যস্ত হবে।

لِيَجْزِيَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج. ز. ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি তাদের কে বিনিময় প্রদান করবেন।

كَسَرَابٍ : এখানে ك হরফে জর। سَرَابٌ মাজরূর। অর্থ- মরীচিকা। গরমের সময়, দুপুরের সময় সূর্যের তাপের তীব্রতায় মরুভূমিতে বালু পানির ন্যায় চমকাতে দেখা যায়। মনে হয় যেন পানি প্রবাহিত হচ্ছে। একে سراب বলা হয়। অধিকাংশ সময় দূর থেকে মানুষ পানি মনে করে ধোঁকা খায়, এজন্য একে ধোঁকা এবং প্রবঞ্চনার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হয়।

بِقِيْعَةٍ : এখানে باء হরফে জার। قِيْعَةٌ মাজরূর। এটা قَاعٌ -এর বহুবচন। অর্থ- মরুভূমি। (কামুস) কেউ কেউ قيعة -কে একবচন লিখেছেন।

فَوَفَّهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْفِيَةٌ মূলবর্ণ (و. ف. ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তখন আল্লাহ তাকে পুরোপুরি চুকিয়ে দেন।

يَغْشٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার غَشْىٌ মূলবর্ণ (غ. ش. ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তাকে ঢেকে ফেলেছে।

مَوْجٌ : ইসমে মুফরাদ, নাকেরা। أَمْوَاجٌ বহুবচন আসে। ঢেউ, তরঙ্গ, পানির সেচ। مَوْجٌ বাব نَصَرَ -এর মাসদার। দোল খাওয়া, পানিতে ঢেউ উঠা, হক ও সত্য কথা থেকে ফিরে যাওয়া।

يُؤَلِّفُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَأْلِيْفٌ মূলবর্ণ (أ. ل. ف) জিনস مهموز فاء অর্থ- তিনি সংযুক্ত করে দেন।

فَيُصِيْبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব إفْعَالٌ মাসদার اِصَابَةٌ মূলবর্ণ (ص. و. ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- অতঃপর তিনি পতিত করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ : এখানে واو টি হলো استئنافية আর مَنْ হলো اسم شرط ما نُوْرًا এবং মুবতাদা لَمْ يَجْعَلْ ফে'লে শর্ত لَمْ يَجْعَلْ -এর সাথে لَهٗ হলো ফায়েল اللّٰهُ শব্দটি متعلق আর جازم হলো মাফউলে বিহী فَمَا এর فاء হলো جواب -এর জন্য رابطة আর مَا হলো نافية আর لَهٗ হলো خبر مقدم এবং مِنْ হলো হরফে জার অতিরিক্ত আর نُوْرٍ হলো মাজরূর। আর পূর্ণ বাক্যটি হলো جواب شرط এখন ফে'লে শর্ত ও جواب شرط মিলে مَنْ মুবতাদার খবর হয়েছে। -[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২৮৮]

অনুবাদ	আয়াত
৪৪. আল্লাহ রাত্র ও দিনকে পরিবর্তন করেন; এতে জ্ঞানবানদের জন্য (তাওহীদের) শিক্ষা রয়েছে।	يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর আল্লাহ প্রত্যেক জীব-জন্তুকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর সেগুলোর কতিপয় প্রাণী এমনও আছে, যারা পেটের উপর (ভর দিয়ে) চলে এবং তাদের কতক এমনও আছে, যারা দুই পায়ে চলে। আবার তাদের কতক এমনও আছে যারা চার পায়ে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।	وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾
৪৬. আমি সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী আয়াতসমূহ নাজিল করেছি; আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।	لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর এই মুনাফেকরা দাবি করে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং (তাঁদের) অনুগত হয়েছি। আবার এর পরে তাদের মধ্যকার এক দল (আদেশ) অমান্য করে; মূলত এরা একেবারেই ঈমান রাখে না।	وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. يُقَلِّبُ اللّٰهُ আল্লাহ পরিবর্তন করেন الَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্র ও দিনকে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً এতে শিক্ষা রয়েছে لِّاُولِي الْاَبْصَارِ জ্ঞানবানদের জন্য।

৪৫. وَاللّٰهُ خَلَقَ আর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন كُلَّ دَآبَّةٍ প্রত্যেক জীব-জন্তুকে مِّنْ مَّآءٍ পানি হতে فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ অনন্তর সেগুলোর কতিপয় প্রাণী এমনও আছে যারা পেটের উপর (ভর দিয়ে) চলে وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ এবং তাদের কতক এমনও আছে যারা দুপায়ে চলে وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ আবার তাদের কতক এমনও আছে যারা চার পায়ে চলে يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৪৬. لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ আমি নাজিল করেছি اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী আয়াতসমূহ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ আর আল্লাহ তা'আলা পরিচালিত করেন مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সরল সঠিক পথে।

৪৭. وَيَقُوْلُوْنَ আর এই মুনাফেকরা দাবি করে যে اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ আমরা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি وَاَطَعْنَا, এবং অনুগত হয়েছি ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ আবার তাদের মধ্যকার একদল (আদেশ) অমান্য করে مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ এর পরে وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ, মূলত এরা একেবারেই ঈমান রাখে না।

৪৮. আর যখন এদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে এজন্য ডাকা হয় যে, রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন, তখন তাদের মধ্যকার এক দল বিমুখ হয়ে যায়।	وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আর যদি সত্য (ফয়সালা) তাদের পক্ষে হয়, তবে তারা একান্ত অনুগত হয়ে তাঁর দরবারে চলে আসে;	وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. তাদের অন্তরে কি কোনো ব্যাধি রয়েছে? না তারা (নবুয়ত সম্পর্কে) সন্দেহের মধ্যে রয়েছে? নাকি এ আশঙ্কা করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন; বরং এরাই তো জালিম।	اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ۭ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. মুসলমানদের কথা তো এটাই, যখন তাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তাদের মীমাংসার জন্য, তখন তারা বলে দেয়– আমরা শুনলাম এবং (আদেশ) মেনে নিলাম; এবং এরূপ লোকেরাই সফলকাম হবে।	اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۭ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. وَاِذَا دُعُوْٓا আর যখন এদেরকে এজন্য ডাকা হয় যে اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ তখন তাদের মধ্যকার একদল বিমুখ হয়ে যায়।

৪৯. وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ আর যদি সত্য তাদের পক্ষে হয় يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ তবে তারা তাঁর দরবারে চলে আসে مُذْعِنِيْنَ একান্ত অনুগত হয়ে।

৫০. اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ তাদের অন্তরে কি কোনো ব্যাধি রয়েছে اَمِ ارْتَابُوْٓا না তারা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে اَمْ يَخَافُوْنَ নাকি এ আশঙ্কা করে যে اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ আল্লাহ ও তার রাসূল তার প্রতি অবিচার করবেন بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ বরং এরাই তো জালেম।

৫১. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের কথা তো এটাই اِذَا دُعُوْٓا যখন তাদেরকে আহবান করা হয় اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ তাদের মীমাংসার জন্য اَنْ يَّقُوْلُوْا তখন তারা বলে দেয় سَمِعْنَا আমরা শুনলাম وَاَطَعْنَا, এবং মেনে নিলাম وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এবং এরূপ লোকেরাই সফলকাম হবে।

৫২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের কথা মান্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকে, এরূপ লোকই সফলকাম হবে।	وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. আর তারা (মুনাফেকরা) দৃঢ়ভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে থাকে যে, যদি আপনি তাদেরকে আদেশ করেন, তবে তারা অবশ্যই বের হবে; আপনি বলে দিন শপথ করো না, তোমাদের আনুগত্য জানা আছে; আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলির পূর্ণ খবর রাখেন।	وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের কথা মান্য করে وَيَخْشَ اللّٰهَ এবং আল্লাহকে ভয় করে وَيَتَّقْهِ এবং তার বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ এরূপ লোকই সফলকাম হবে।

৫৩. وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ আর তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে যে لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ যদি আপনি তাদেরকে আদেশ করেন لَيَخْرُجُنَّ তবে তারা অবশ্যই বের হবে قُلْ আপনি বলে দিন لَّا تُقْسِمُوْا শপথ করো না طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ তোমাদের আনুগত্য জানা আছে اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলির পূর্ণ খবর রাখেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ [٤٧]

শানে নুযূল : ইবনে মুনযির বলেন যে, আলোচ্য আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারো মতানুসারে আলোচ্য আয়াত বাশার নামক এক মুনাফিক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, বাশার এবং এক ইহুদির মাঝে একটি বিরোধ ছিল। সুতরাং ইহুদি বাশারকে রাসূল ﷺ -এর নিকট এ বিরোধ নিরোসনের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বলল। কিন্তু সেই মুনাফিক ইহুদি দলপতি কা'আব ইবনে আশরাফ এর নিকট এ বিষয়টি নিয়ে যাওয়ার জন্যে ইহুদিকে বলল। পরিশেষে উভয়জন বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্যে রাসূল ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলো। রাসূল ﷺ ইহুদির পক্ষে রায় দিলেন। মুনাফিক রাসূল ﷺ-এর ফয়সালাকে না মেনে সে বলল যে, চল আমরা এ বিষয়টি নিয়ে হযরত ওমর এর নিকট যাব। অতঃপর উভয়জন যখন হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট বলল যে, আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর নিকট বিষয়টি নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমার পক্ষে ফয়সালা দিয়েছেন। সে তা মানেনি। ওমর (রা.) মুনাফিককে জিজ্ঞেস করলেন যে ঘটনা কি তাই? সে বলল হ্যাঁ! তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা এখানে থাক, একথা বলেই তিনি ঘরে গিয়ে তরবারি এনে মুনাফিকের মাথা উড়িয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন যে, যে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের ফয়সালাকে মানবেনা, তার জন্যে এমন বিচারই হওয়া উচিৎ। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। হযরত জিবরাইল (আ.) বললেন যে, ওমর সত্য ও অসত্যের মাঝে পার্থক্য করে দিলেন। সেই থেকেই হযরত ওমর (রা.)-কে ফারুক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। -[রুহুল মা'আনী ১৯৪/৯/১৮]

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ [٤٨]

শানে নুযূল- ১ : তাবারী বলেন, বাশার নামক এক মুনাফিক ছিল। সেই মুনাফিক ও ইহুদি এক লোকের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ ছিল। সুতরাং ইহুদি লোকটি সঠিক ফয়সালা পাবার আশায় তা নিষ্পত্তি করার জন্যে হযরত রাসূলে

আকরাম ﷺ -এর নিকট আসার জন্যে বলল। কিন্তু মুনাফিক লোকটি দাবিতে মিথ্যুক ছিল বিধায় সে তাতে অসম্মতি জানাল। সে আরোও মন্তব্য করল যে, মুহাম্মদ আমাদের প্রতি ক্ষুব্ধ রয়েছেন। সুতরাং ফয়সালাকারী হিসাবে আমি কা'আব ইবনে আশরাফকে ধার্য করব। সে প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল : অপর এক বর্ণনানুসারে বনী উমাইয়ার মুগীরা ইবনে ওয়ায়েল ও হযরত আলী (রা.) -এর মাঝে পানি ও জমি সংক্রান্ত একটি বিরোধ ছিল। মুগীরা ইবনে ওয়ায়েল হযরত আলী (রা.)-কে রাসূল ﷺ -এর নিকট এ বিরোধ পেশ করতে নিষেধ করল একথা বলে যে, তিনি আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৬৮-৬৯/১২]

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوْا طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ [٥٣]

শানে নুযূল : ইবনে মারদূভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর নিকট একদল লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আল্লাহর শপথ আপনি যদি আমাদেরকে মাল ধন-সম্পদ পরিবার পরিজন ছেড়ে বের হয়ে যেতে নির্দেশ করেন, তাহলে অবশ্য আমরা এসব কিছু ছেড়ে চলে যাব। আপনি যদি আমাদেরকে জিহাদ করার আদেশ করেন, তাহলে আমরা জিহাদে নেমে যাব। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৭১/১২, ফতহুল কাদীর ৪৯/৪, দুররে মানছুর ৫৪/৫]

আলোচ্য আয়াত বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী প্রমুখ এ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইহুদির মধ্যে জমি সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ ছিল। ইহুদি তাকে বলল : চল, তোমাদেরই রাসূল দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে নেই। মুনাফিক বিশর ছিল অন্যায়ের উপর। সে জানত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এজলাসে মকদ্দমা গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবর্তে কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদীর কাছে মকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

সাফল্য লাভের চারটি শর্ত : وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ –এই আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এই চারটি বিষয় যথাযথ পালন করে, সেই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হবে।

একটি আশ্চর্য ঘটনা : তাফসীর-কুরতুবীতে এস্থলে হযরত ফারুকে আযমের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য ফুটে উঠে। হযরত ফারুকে আযম একদিন মসজিদে নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক রুমী গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ হযরত ফারুকে আযম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কি? সে বলল : আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমান হয়ে গেছি। হযরত ফারুকে আযম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন : এর কোনো কারণ আছে কি? সে বলল : হ্যাঁ, আমি তাওরাত, ইঞ্জিল, যবূর ও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান কয়েদীর মুখে একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, এই ছোট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত। ফারুকে আযম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন : আয়াতটি কি? রুমী ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াতটিই তেলাওয়াত করল এবং সাথে সাথে তার অভিনব তাফসীরও বর্ণনা করল যে, وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ আল্লাহর ফরজ কার্যাদির সাথে, وَرَسُوْلَهٗ রাসূলে সুন্নতের সাথে, وَيَخْشَ اللّٰهَ অতীত জীবনের সাথে এবং وَيَتَّقْهِ ভবিষ্যত জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। মানুষ যখন এই চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ -এর সুসংবাদ দেওয়া হবে। فَائِزٌ তথা সফলকাম সে ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে ও জান্নাতে স্থান পায়। ফারুকে আযম একথা শুনে বললেন : রাসূলে কারীম ﷺ -এর কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন : اُوْتِيْتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুদূরপ্রসারী অর্থবোধক বাক্যবলি দান করেছেন। এগুলোর শব্দ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ সুদূর বিস্তৃত। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُقَلِّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার تَقْلِيْبٌ মূলবর্ণ (ق ـ ل ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তিনি পরিবর্তন করেন।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ– ইচ্ছা।

اَطَعْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা অনুগত হয়েছি।

دُعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– এদেরকে ডাকা হয়।

يَأْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– তারা চলে আসে।

مُذْعِنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِذْعَانٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ع ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– একান্ত অনুগত হয়ে।

اِرْتَابُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِيَابٌ মূলবর্ণ (ر ـ ى ـ ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা (নবুয়ত সম্পর্কে) সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

يَخَافُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَوْفٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা আশঙ্কা করে।

يَتَّقْهِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তার বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকে।

لَيَخْرُجُنَّ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার خُرُوْجٌ মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ج) জিনস صحيح অর্থ– তবে তারা অবশ্যই বের হবে।

لَا تُقْسِمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقْسَامٌ মূলবর্ণ (ق ـ س ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা শপথ করো না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِنْ مَّاءٍ এখানে واو টি استئنافية আর اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা আর خَلَقَ كُلَّ বাক্যটি খবর। دَآبَّةَ হলো مفعول به আর مِنْ مَّاءٍ জার ও মাজরুর মিলে خَلَقَ -এর সাথে متعلق হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন : ৫/২৯৭]

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٤﴾

৫৪. আপনি বলুন, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলেরও আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফেরাও, তবে জেনে রাখ যে, রাসূলের কর্তব্য তো তাই- যার ভার তাঁকে দেওয়া হয়েছে। আর তোমাদের কর্তব্য তাই- যার ভার তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা তাঁর অনুগত থাক তাহলে সুপথ প্রাপ্ত হবে; আর রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়াই।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۖ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ۖ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং সৎকার্যসমূহ করবে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে তিনি প্রতিনিধিত্ব দিয়েছিলেন। আর তিনি তাদের জন্য যে ধর্মকে পছন্দ করেছেন, তাকে তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। আর তাদের এ ভয়-ভীতির পর তাকে নিরাপত্তায় পবিরর্তিত করে দিবেন; এ শর্তে যে, তারা আমার ইবাদত করবে, (এবং) আমার সাথে কোনো প্রকার অংশী স্থির করবে না; আর যারা এর পরও অকৃতজ্ঞ হবে মূলত তারাই নাফরমান।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৪. قُلْ আপনি বলুন اَطِيْعُوا اللّٰهَ আল্লাহর আনুগত্য কর وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ এবং রাসূলেরও আনুগত্য কর فَاِنْ تَوَلَّوْا অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফেরাও فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ তবে জেনে রাখ যে, রাসূলের কর্তব্য তো তাই-যার ভার তাঁকে দেওয়া হয়েছে وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ আর তোমাদের কর্তব্য তাই-যার ভার তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ আর যদি তোমরা তার অনুগত থাক تَهْتَدُوْا তাহলে সুপথ প্রাপ্ত হবে وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ আর রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়াই।

৫৫. وَعَدَ اللّٰهُ আল্লাহ ওয়াদা দিচ্ছেন যে الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে তাদেরকে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং সৎ কার্যসমূহ করবে لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন كَمَا اسْتَخْلَفَ যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দিয়েছিলেন الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্ববর্তীদেরকে وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ আর তিনি তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ তাদের জন্য যে ধর্ম কে পছন্দ করেছেন তাকে وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ আর তাকে পরিবর্তিত করে দিবেন مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ তাদের এই ভয় ভীতির পর اَمْنًا নিরাপত্তায় يَعْبُدُوْنَنِىْ এ শর্তে যে, তারা আমার ইবাদত করবে لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا আমার সাথে কোনো প্রকার অংশী স্থির করবে না; وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ আর যারা এর পরও অকৃতজ্ঞ হবে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ মূলত তারাই নাফরমান।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর নামাজের পাবন্দি কর এবং জাকাত প্রদান কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর, যেন তোমাদের প্রতি (পূর্ণ) অনুগ্রহ করা যেতে পারে।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾

৫৭. কাফেরদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করো না যে, তারা পৃথিবীর (কোনো অংশের) মধ্যে (পালিয়ে যাবে এবং আমাকে) হারিয়ে দিবে। আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে দোজখ; এবং তা বড়ই নিকৃষ্ট বাসস্থান।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ۗ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۗ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۗ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٨﴾

৫৮. হে মুমিনগণ! তোমাদের ক্রীতদাসদের জন্য এবং তোমাদের মধ্যে যারা পরিণত বয়সে উপনীত হয় নি তাদের জন্য উচিত যে, তিন সময়ে তোমাদের নিকট (আসবার জন্য) অনুমতি গ্রহণ করবে; ফজরের নামাজের পূর্বে এবং দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা স্বীয় পোশাক খুলে রাখ এবং এশার নামাজের পর। (কেননা) এ তিনটি সময় তোমাদের পর্দার সময়; উক্ত সময়সমূহ ব্যতীত তোমাদের উপর কোনো দোষ নেই এবং তাদেরও কোনো দোষ নেই; (কেননা) তারা তোমাদের নিকট একে অন্যের সচরাচর যাওয়া-আসা করে থাকে; এভাবেই আল্লাহ তা'আলা আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন; আর আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৬. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি কর وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান কর وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ আর রাসূলের আনুগত্য কর لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ যেন তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে।

৫৭. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেরদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করো না যে مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ তারা পৃথিবীর মধ্যে হারিয়ে দিবে وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ আর তাদের আশ্রয় স্থল হবে দোজখ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ এবং তা বড়ই নিকৃষ্ট বাসস্থান।

৫৮. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ لِيَسْتَاْذِنْكُمُ তাদের জন্য উচিত যে, তারা তোমাদের নিকট অনুমতি গ্রহণ করবে الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ তোমাদের ক্রীতদাসদের জন্য وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ এবং তোমাদের মধ্যে যারা পরিণত বয়সে উপনীত হয়নি তাদের জন্য ثَلٰثَ مَرّٰتٍ তিন সময়ে مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ ফজরের নামাজের পূর্বে وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ এবং দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা স্বীয় পোশাক খুলে রাখ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ এবং এশার নামাজের পর ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ এই তিনটি সময় তোমাদের পর্দার সময় لَيْسَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর কোনো দোষ নেই وَلَا عَلَيْهِمْ এবং তাদের উপরও নেই جُنَاحٌ কোনো দোষ بَعْدَهُنَّ উক্ত সময়সমূহ ব্যতীত طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ তারা তোমাদের নিকট সচরাচর যাওয়া আসা করে থাকে بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ একে অন্যের নিকট كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ এভাবেই আল্লাহ তা'আলা আয়াত সমূহ তোমাদের নিকট পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ .... وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ [৫৫]

শানে নুযূল : ১. মালেক বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.) ও ওমর (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আবুল আলিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে আব্দ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম বলেন, নবী করীম ﷺ তদীয় সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কায় দশ বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করে এক আল্লাহর প্রতি এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আল্লাহর বান্দাদেরকে আহ্বান করেছেন। তারা সর্বদাই শঙ্কিত ছিলেন। কাফেরদের মোকাবিলায় জিহাদ করার জন্যে তাদেরকে আদেশ করা হতো না। অবশেষে মদিনায় হিজরত করার আদেশ হলো। তখন তারা মদিনায় গমন করলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সশস্ত্র জিহাদ করার হুকুম দান করেন। তারা সেখানে সকাল-সন্ধ্যা অস্ত্রসজ্জিত থেকে শঙ্কিত অবস্থায় জীবন যাপন করতেন। সে অবস্থায় থেকে রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অস্ত্র রেখে নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করার মতো এমন দিন কি আমাদের আসবে? রাসূল ﷺ বললেন যে, বেশি দিন তোমাদেরকে অস্ত্র বহন করতে হবে না। খুব শীঘ্রই মানুষেরা কাপড়ে সুসজ্জিত হয়ে মহা আনন্দে বসে থাকবে। তার সাথে একটি লোহাও থাকবে না। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৭৩/১২, ফতহুল কাদীর ৪৯/৯, ইবনে আছীর ৩১০/৩, দুররে মানছূর ৫৫/৫]

শানে নুযূল : ২. উবাই ইবনে কা'আবের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে মারদূভিয়া ও ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন হিজরত করে মদিনায় গমন করেন, তখন আনসারগণ তাদেরকে আশ্রয় দিলেন এবং সশস্ত্রভাবে আরবদের মোকাবিলাও করলেন। তারা সকাল বিকাল এবং রাতে নিদ্রা পর্যন্তও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কাটাতেন। এহেন পরিস্থিতিতে আনসারগণ বললেন যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ব্যতিরেকে আর কাউকে ভয় না করে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করার মতো সুযোগ পাব কি? আনসারগণের হতাশা ব্যঞ্জক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ৪৯/৪, ইবনে কাছীর ৩১০/৩, দুররে মানছূর ৫৫/৫]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ......... يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ [৫৮]

শানে নুযূল –১ : সুদ্দী বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ স্ত্রীর সাথে এমন কোনো সময় মিলন করা ভালোবাসতেন যে, তারা যাতে পরক্ষণেই গোসল করে বের হয়ে নামাজের উদ্দেশ্যে চলে যেতে পারেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের বাসনানুপাতে আদেশ জারি করলেন যে, দাস-দাসীরা ও তরুণ-তরুণীরা যেন অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের নিকট গমন না করেন।

শানে নুযূল– ২ : মুকাতিল ইবনে হাইয়ান ইবনে আবী হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা বিশেষ সূত্রে জানতে পারলাম, আনসারী এক সাহাবী তার স্ত্রী আসমা বিনতে মুর্শিদা সহ রাসূল ﷺ-এর জন্যে খাবার প্রস্তুত করেন। মানুষেরা অনুমতি ছাড়াই ঘরে আসা যাওয়া করতে থাকে। সুতরাং হযরত আসমা বিনতে মুর্শিদাহ বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটাতো অত্যন্ত অশুভনীয় কাজ যে, দাস-দাসী, স্বামী-স্ত্রীর নিকট আসতে থাকবে, এমতাবস্থায় তারা দু'জন একই কাপড়ে জড়িয়ে থাকবে অথচ তারা কোনো প্রকারের অনুমতি গ্রহণ করবে না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ মুদলিজ নামক এক আনসারী ক্রীতদাসকে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। সে গিয়ে দরজায় করাঘাত করে ঘরে প্রবেশ করে সে সময় হযরত ওমর (রা.) জাগ্রত হয়ে বসেন কিন্তু তার ছতর খোলা ছিল। অবস্থা এমন দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন যে, এমন মুহূর্তে আমাদের ছেলে মেয়েরা অনুমতি ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হতাম। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) রাসূল ﷺ-এর দরবারে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সে প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনি শুকরিয়া স্বরূপ সেজদা আদায় করেন। –[ইবনে কাছীর ৩১৩/৩, রূহুল মা'আনী ২০৯/৯১৮, বাহরে মুহীত্ব ৪৩২/৬, ফাতহুল কাদীর ৫৪/৪, কুরতুবী ২৭৭/১২, দুররে মানছূর ৫৫/৫]

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। ১. আপনার উম্মতকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে, ২. আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে প্রবল করা হবে এবং ৩. মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্যবীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শত্রুর কোনো ভয়-ভীতি থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুণ্যময় আমলে মক্কা, খায়বর, বাহ্‌রাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়ামন তাঁরই হাতে বিজিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিজিয়া কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস' মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আম্মান ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী প্রমুখ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করেন ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তিনি তার খতম করেন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্যভিযান করেন। বসরা ও দামেস্ক তাঁরই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ করতলগত হয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ওমর ইবনে খাত্তাব কে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যস্ত করলেন যে, পয়গম্বরগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁর আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ করতলগত হয়। তাঁর হাতে কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। এরপর উসমানী খেলাফতের আমলে ইসলামি বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দুরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়াজ ইত্যাদি সব তাঁর আমলেই মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্রিত করে দেখানো হয়েছে। আমার উম্মতের রাজত্ব যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌঁছবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি উসমানী খেলাফতের আমলেই পূর্ণ করে দেন। (ইবনে কাছীর) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, খেলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর থাকবে। এখানে খেলাফত অর্থ খেলাফতে রাশেদা, যা সম্পূর্ণরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এই খেলাফত হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কেননা ত্রিশ বছরের মেয়াদ হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়।

ইবনে কাছীর এ স্থলে সহীহ মুসলিমের একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হযরত জাবের ইবনে যমরা (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের কাজ অব্যাহত থাকবে যে পর্যন্ত বারজন খলিফা থাকবেন। ইবনে কাসীর বলেন : এই হাদীসটি উম্মতের মধ্যে বারজন খলীফা হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। এর বাস্তবায়ন জরুরি। কিন্তু এটা জারুরি নয় যে, তারা সবাই উপর্যুপরি ও সংলগ্নই হবেন; বরং কিছু বিরতির পরও হতে পারে। তাদের মধ্যে চারজন খলীফা তো একের পর এক হয়ে গেছেন অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন। অতঃপর কিছুকাল বিরতির পর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ খলীফা হয়েছেন। তাঁর পরেও বিভিন্ন সময়ে এরূপ খলীফা হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন। সর্বশেষ খলীফা হবেন হযরত মাহদী। রাফেযী সম্প্রদায় যে বারজন খলীফা নির্দিষ্ট করেছে, তার কোনো প্রমাণ হাদীসে নেই; বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন, খেলাফাতের সাথে যাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এটাও জরুরি নয় যে, তাঁদের সবার মর্যাদা সমান হবে এবং সবার আমলে দুনিয়ার শান্তি ও শৃঙ্খলা সমান হবে; বরং শান্তির ওয়াদা ঈমান, সৎকর্ম, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পূর্ণ অনুসরণের উপর ভিত্তিশীল। এগুলোর বিভিন্ন রূপ হলো রাষ্ট্রের প্রকার ও শক্তির মধ্যেও পার্থক্য ও বিভিন্নতা অপরিহার্য। ইসলামের চৌদ্দশত বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে যখন ও যেখানে কোনো ন্যায়পরায়ণ ও সৎকর্মী বাদশাহ্ হয়েছেন, তিনি তাঁর কর্ম ও সততার পরিমাণে এই আল্লাহর প্রতিশ্রুতির অংশ লাভ করেছেন। কুরআন পাকের অন্যত্র বলা হয়েছে إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহর দলই প্রবল থাকবে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার প্রমাণ : এই আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের প্রমাণ। কেননা আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ারও প্রমাণ। কেননা আয়াতে আল্লাহ

তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি স্বীয় রাসূল ﷺ ও উম্মতকে দিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। যদি তাঁদের খেলাফতকে সত্য ও বিশুদ্ধ স্বীকার করা না হয়; যেমন রাফেযীদের ধারণা তদ্রূপই:, তবে বলতে হবে যে, কুরআনের এই প্রতিশ্রুতি হযরত মাহদীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার বৈ নয়। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, শত শত বছর পর্যন্ত সমগ্র উম্মত অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কিয়ামতের নিকটতম সময় ক্ষণকালের জন্যে তারা রাজত্বলাভ করবে। এই প্রতিশ্রুতিতেই সেই রাজত্ব বোঝানো হয়েছে। নাউজুবিল্লাহ! সত্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্মের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেসব শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহর ওয়াদাও সম্পূর্ণরূপে তাদের আমলে পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের পরে ঈমান ও সৎকর্মের সে মাপকাঠি আর বিদ্যমান নেই; এবং খেলাফত ও রাজত্বের সে গাম্ভীর্যও আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ - كُفْر শব্দের আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞতা এবং পারিভাষিক অর্থ ঈমানের বিপরীত। এখানে উভয় প্রকার অর্থই বোঝানো যেতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেন, মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় শক্তি, শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে এবং তাদের ধর্ম সুসংহত হয়ে যায়, তখনও যদি কোনো ব্যক্তি কুফর করে অর্থাৎ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তবে এরূপ লোকেরাই সীমালঙ্ঘনকারী। প্রথমাবস্থায় ঈমানের গণ্ডি অতিক্রম করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের সীমা পার হয়ে যায়। কুফর ও অকৃতজ্ঞতা সর্বদা, সর্বাবস্থায় মহাপাপ। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং শৌর্যবীর্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব কাজ দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। তাই بَعْدَ ذٰلِكَ বলে একে জোরদার করা হয়েছে। ইমাম বগভী বলেন : তাফসীরবিদ আলেমগণ বলেছেন যে, কুরআনের এই বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের উপর প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীফা হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করেছিল। তাদের দ্বারা এই মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত নিয়ামতসমূহও হ্রাস পেয়ে যায়। তারা পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞের কারণে ভয় ও ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়। যারা ছিল পরস্পর ভাই ভাই, তারাই একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে। বগভী নিজস্ব সনদ দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (র.)-এর নিম্নোক্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি হযরত উসমানের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হওয়ার সময় এই ভাষণটি দেন। ভাষণটি এই :

"যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় পদার্পণ করেন, সেদিন থেকে আল্লাহর ফেরেশতারা তোমাদের শহর পরিবেষ্টন করে তোমাদের হেফাজতে নিয়োজিত রয়েছে। যদি তোমরা উসমানকে হত্যা কর, তবে এই ফেরেশতারা ফিরে চলে যাবে এবং কখনও প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, সে আল্লাহর সামনে হস্তকর্তিত অবস্থায় হাজির হবে; তার হাত থাকবে না। সাবধান, আল্লাহর তরবারি এখনও পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে। আল্লাহর কসম! যদি এই তরবারি কোষ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে কখনো কোষে ফিরে যাবে না। কেননা যখন কোনো নবী নিহত হন, তখন তাঁর পরিবর্তে সত্তর হাজার মানুষ নিহত হয় এবং যখন কোনো খলীফাকে হত্যা করা হয়, তখন পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।" –[মাযহারী]

সে মতে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার পর যে পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়, তা মুসলমানদের মধ্যে অব্যাহতই রয়েছে। হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীরা খেলাফত ও ধর্মীয় সংহতির ন্যায় নিয়ামতের বিরোধিতা এবং অকৃতজ্ঞতা করেছিল, তাদের পর রাফেযী ও খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা খোলাফায়ে রাশেদীনের বিরোধিতায় দলবদ্ধ হয়েছিল। এই ঘটনা পরম্পরার মধ্যেই হযরত হোসাইন (রা.) -এর শাহাদাতের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

আত্মীয়স্বজন ও মাহ্‌রামদের জন্যে বিশেষ সময়ে অনুমতি গ্রহণের আদেশ : সামাজিকতা ও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের উত্তম রীতিনীতি ইতঃপূর্বে এই সূরার ২৭,২৮ ও ২৯ নম্বর আয়াতে 'অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলি' শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে অনুমতি ব্যতীত তার গৃহে প্রবেশ করো না। পুরুষের গৃহ হোক কিংবা নারীর। আগন্তুক পুরুষ হোক কিংবা নারী সবার জন্যে অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিধান ছিল বাইরে থেকে আগমনকারী অপরিচিতদের জন্যে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্য এক প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক এমন আত্মীয় ও মাহ্‌রাম ব্যক্তিদের সাথে, যারা সাধারণত : এক গৃহে বসবাস করে ও সর্বক্ষণ যাতায়াত করতে থাকে, আর তাদের কাছে

নারীদের পর্দাও জরুরি নয়। এ ধরনের লোকদের জন্যে গৃহে প্রবেশের সময় খবর দিয়ে কিংবা কমপক্ষে সশব্দে পদচারণা করে অথবা গলা ঝেড়ে গৃহে প্রবেশের আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অনুমতি গ্রহণ এরূপ আত্মীয়দের জন্যে ওয়াজিব নয় বরং মোস্তাহাব এবং এটা তরক করা মাকরূহ তানযিহী। তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে :

فَمَنْ اَرَادَ الدُّخُوْلَ فِىْ بَيْتِ نَفْسِهٖ وَفِيْهِ مُحَرَّمَاتُهٗ يُكْرَهُ لَهُ الدُّخُوْلُ فِيْهِ مِنْ غَيْرِ اِسْتِيْذَانٍ تَنْزِيْهًا لِاحْتِمَالِ رُؤْيَةِ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ عُرْيَانَةً وَهُوَ اِحْتِمَالٌ ضَعِيْفٌ مُقْتَضَاهُ التَّنَزُّهُ.

এটা হচ্ছে গৃহে প্রবেশের পূর্বের বিধান। কিন্তু গৃহে প্রবেশের পর তারা সবাই এক জায়গায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে অপরের কাছে যাতায়াত করে। এমতাবস্থায় তাদের জন্যে তিনটি বিশেষ নির্জনতার সময়ে আরও এক প্রকার অনুমতি চাওয়ার বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি সময় হচ্ছে ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুরে বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশার নামাজের পরবর্তী সময়। এই তিন সময়ে মাহরাম, আত্মীয়স্বজন এমনকি সমঝদার অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা এবং দাস-দাসীদেরকেও আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন কারো নির্জন কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে। কেননা এসব সময়ে মানুষ স্বাধীন ও খোলাখুলি থাকতে চায়, অতিরিক্ত বস্ত্রও খুলে ফেলে এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি মেলামেশায় মশগুল থাকে। এসব সময়ে কোনো বুদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কোনো নারী অথবা নিজ সন্তানদের মধ্যে কেউ অনুমতি ব্যতীত ভেতরে প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন হতে হয় ও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলিভাব ও বিশ্রামে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহুল্য। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জন্যে বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধানের পর একথাও বলা হয়েছে যে لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ অর্থাৎ এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত করায় কোনো দোষ নেই কেননা, সেসব সময় সাধারণত প্রত্যেকের কাজকর্মের ও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার সময়। এ সময়ে স্বভাবতই মানুষ স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও করে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আদেশ দান করা তো বিধেয়; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা তো শরিয়তের কোনো আদেশ নিষেধের আওতাভুক্ত নয়, তাই তাদেরকে এই আদেশ দেওয়া নীতি বিরুদ্ধ। জওয়াব এই যে, এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এই সময়ে জিজ্ঞাসা না করে ভেতরে আসবেনা। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যায়, তখন নামাজ শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ কর। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে কঠোরভাবে নামাজের আদেশ কর এবং দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামাজ পড়তে বাধ্য কর। এমনিভাবে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আসল আদেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যে বলা হয়েছে যে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় যদি তোমরা বিনানুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের উপর এবং অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের উপর কোনো جُنَاحٌ নেই। جُنَاحٌ শব্দটি সাধারণত : গোনাহ্ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিছক 'অসুবিধা' ও 'দোষ' অর্থেও আসে। এখানে لَاجُنَاحَ -এর অর্থ তাই; অর্থাৎ, কোনো অসুবিধা নেই। এর ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের গোনাহ্গার হওয়ার সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল। –[বয়ানুল-কুরআন]

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর অর্থে মালিকানাধীন দাস ও দাসী– উভয়ই শামিল রয়েছে। দাস যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তবে সে মাহ্রাম নয়, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম রাখে। তার নারী মনিরও তার কাছে পর্দা করতে হবে। তাই এখানে এর অর্থ হবে দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস যারা সর্বদাই গৃহে যাতায়াতে অভ্যস্ত।

মাসআলা : এই বিশেষ অনুমতি গ্রহণ আত্মীয়দের জন্যে ওয়াজিব, না মোস্তাহাব– এ ব্যাপারে আলেম ও ফিকহ্‌বিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এই বিধান এখনও কার্যকর আছে, না রহিত হয়ে গেছে– এতেও তাঁরা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফিকহবিদদের মতে আয়াতটি মুহ্‌কাম ও অরহিত এবং নারী পুরুষ সবার জন্যে এর বিধান ওয়াজিব। – (কুরতুবী) কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণত : মানুষ এই তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে, এ

সময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথেও লিপ্ত থাকে এবং মাঝে মাঝে আবৃত অঙ্গও খুলে যায়। যদি কেউ সাবধানতা অবলম্বন করত এসব সময়েও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও কেবল তখনই করে, যখন কারো আগমনের সম্ভাবনা থাকে না, তবে তার জন্যে আত্মীয় ও অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং আত্মীয়দের জন্যেও ওয়াজিব নয়। তবে এটা সর্বাবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম। কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে এর আমল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই হযরত ইবনে-আবাবাস (রা.) এক রেওয়ায়েতে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে যারা আমল করে না, তাদের কিছুটা ওজর বর্ণনা করেছেন।

প্রথম রেওয়ায়েতটি ইবনে কাছীর ইবনে আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : তিনটি আয়াতের আমল লোকেরা ছেড়েই দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি অনুমতি চাওয়ার আয়াত – يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ এতে আত্মীয়-স্বজন ও অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকেও অনুমতি গ্রহণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ এতে উত্তরাধিকার বন্টনের সময় ওয়ারিশদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিধি অনুযায়ী অংশীদার নয়, এমন কিছু আত্মীয় বন্টনের সময় উপস্থিত হলে তাদেরকেও কিছু দান কর, যাতে তারা মনঃক্ষুণ্ন না হয়। তৃতীয় আয়াত হচ্ছে إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ এতে বলা হয়েছে যে, সে ব্যক্তি সর্বাধিক সম্মান ও সম্ভ্রমের পাত্র, যে সর্বাধিক মুত্তাকী। আজকাল যার কাছে পয়সা বেশি, যার বাংলো ও কুঠি সুরম্য ও সুদৃশ্য, তাকেই মানুষ সম্মানের পাত্র মনে করে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর ভাষা এরূপ : তিনটি আয়াতের ব্যাপারে শয়তান মানুষকে পরাভূত করে রেখেছে। আবশেষে তিনি বলেছেন : আমি আমার দাসীকেও এই তিন সময়ে অনুমতি ব্যতিত আমার কাছে না আসতে বাধ্য করে রেখেছি।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে ইবনে-আবী হাতেমেরই সূত্র ধরে হযরত ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) কে আত্মীয়দের অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলল যে, কেউ তো এই আদেশ পালন করে না। হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) বললেন, إِنَّ اللَّهَ سِتِّيرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ অর্থাৎ আল্লাহ্ পর্দাশীল। তিনি পর্দার হেফাজত পছন্দ করেন। আসল কথা এই যে, এসব আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন সামাজিক চালচলন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। মানুষের দরজায় পর্দা ছিল না এবং গৃহের ভেতরেও পর্দাবিশিষ্ট মশারি ছিল না। তখন মাঝে মাঝে চাকর অথবা পুত্র-কন্যা হঠাৎ এমন সময়ে গৃহে প্রবেশ করত যে, গৃহকর্তা তখন স্ত্রীর সাথে মেলামেশায় লিপ্ত থাকত। তাই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে দেন। বর্তমানে মানুষের দরজায় পর্দা আছে এবং গৃহমধ্যে মশারির ব্যবস্থা প্রচলিত হচ্ছে, তাই মানুষ মনে করে নিয়েছে যে, এই পর্দাই যথেষ্ট। অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। –(ইবনে কাছীর)। ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এই দ্বিতীয় রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, স্ত্রীর সাথে লিপ্ত থাকা, আবৃত অঙ্গ খুলে যাওয়া, কারো আগমনের সম্ভাবনা ইত্যাদি ঘটনার আশঙ্কা না থাকলে অনুমতি গ্রহণের বিধান শিথিল হতে পারে। কিন্তু কারো স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করা উচিত। সবারই সুখে শান্তিতে থাকা দরকার। যারা পরিবারের সদস্যদেরকে এ ধরনের অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করে না, তারা স্বয়ং কষ্টে পতিত থাকে। তারা নিজেদের প্রয়োজন ও বাঞ্ছিত কাজ সম্পন্ন করতে অসুবিধা বোধ করে।

নারীদের পর্দার তাগিদ এবং এর মধ্যে আরো একটি ব্যতিক্রম : ইতঃপূর্বে দুইটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিধান বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে দুইটি ব্যতিক্রমও উল্লেখ করা হয়েছে। এক ব্যতিক্রম দর্শকের দিক দিয়ে এবং অপর ব্যতিক্রম যাকে দেখা হয়, তার দিক দিয়ে। দর্শকের দিক দিয়ে মাহ্রাম, দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে ব্যতিক্রমভূক্ত করা হয়েছিল এবং যে বস্তু দৃষ্টি থেকে গোপন করা উদ্দেশ্য, তার দিক দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছিল। এতে উপরের পোশাক বলে বোরকা অথবা বড় চাদর বোঝানো হয়েছিল এবং কারো কারো মতে নারীর মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও এই ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখানে আসন্ন ৬০ নম্বর আয়াতে একটি তৃতীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান এরূপ শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহ্রামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহ্রামদের কাছে যে সব অঙ্গ আবৃত করা জরুরি নয়,

এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরি নয়। তাই বলা হয়েছে وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ.... الاية -এর তাফসীর উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে যে, যেসব অঙ্গ মাহ্‌রামের সামনে খোলা যায়- যে মাহ্‌রাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে। কিন্তু শর্ত এই যে, যেন সাজসজ্জা না করে। পরিশেষে আরও বলা হয়েছে وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ –অর্থাৎ সে যদি মাহ্‌রাম নয় এরূপ ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরাপুরি বিরত থাকে, তবে তা তার জন্য উত্তম।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَا حُمِّلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْمِيْل মূলবর্ণ (ح - م - ل) জিনস : صحيح অর্থ– যার ভার তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

اِنْ تُطِيْعُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– যদি তোমরা তাঁর অনুগত থাক।

تَهْتَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাহলে সুপথ প্রাপ্ত হবে।

وَلَيُمَكِّنَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْكِيْنٌ মূলবর্ণ (م - ك - ن) জিনস صحيح অর্থ– তিনি প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন।

اِرْتَضٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِضَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি পছন্দ করেছেন।

لَيُبَدِّلَنَّهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْدِيْل মূলবর্ণ (ب - د - ل) জিনস صحيح অর্থ– তাকে পরিবর্তিত করে দিবেন।

اَقِيْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجواف واوى অর্থ– পাবন্দি কর।

تُرْحَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার رَحْمَةٌ মূলবর্ণ (ر - ح - م) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে।

لَاتَحْسَبَنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل نهى بانون ثقيلة বাব حَسِبَ ও سَمِعَ মাসদার حُسْبَانٌ মূলবর্ণ (ح - س - ب) জিনস صحيح অর্থ– তুমি এরূপ ধারণা করো না।

لِيَسْتَأْذِنْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِيْذَانٌ মূলবর্ণ (ا - ذ - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তাদের উচিত যে, তারা তোমাদের নিকট অনুমতি গ্রহণ করবে।

تَضَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার وَضْعٌ মূলবর্ণ (و - ض - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা খুলে রাখ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا : এখানে وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ টা পূর্বের উপর আতফ হয়েছে هُمْ হলো প্রথম মাফউলে বিহী এবং مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ হলো حال আর اَمْنًا হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/৩০৮]

৫৯. আর যখন তোমাদের মধ্যকার বালকগণ বয়ঃপ্রাপ্ত সীমায় উপনীত হয়, তখন তাদেরও তদ্রূপ অনুমতি নেওয়া উচিত, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তী (বয়োবৃদ্ধ) ব্যক্তিগণ অনুমতি নিয়ে থাকে; এরূপে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর বিধানসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٩﴾
৬০. আর বয়স্কা বৃদ্ধা নারীগণ– যাদের বিবাহের কোনো আশা নেই– তাদের এতে কোনো অপরাধ নেই যে, তারা তাদের (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখবে, যদি নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে;(২) আর যদি এটা হতেও সতর্কতা অবলম্বন করে, তবে সেটা তাদের জন্য আরো অধিক উত্তম; এবং আল্লাহ সবকিছুই শুনেন, সবকিছুই জানেন।	وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاۗءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۢ بِزِيْنَةٍ ۭ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾
৬১. অন্ধ ব্যক্তির পক্ষেও কোনো দোষ নেই এবং খঞ্জ ব্যক্তিরও কোনো দোষ নেই এবং রুগ্ণ ব্যক্তিরও কোনো দোষ নেই এবং স্বয়ং তোমাদের জন্যও কোনো দোষ নেই যে, তোমরা স্বয়ং (অথবা সেই মা'যুরগণসহ) নিজেদের গৃহসমূহে আহার কর,	لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓي اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৯. وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ আর যখন তোমাদের মধ্যকার বালকগণ বয়ঃপ্রাপ্ত সীমায় উপনীত হয় فَلْيَسْتَاْذِنُوْا তখন তাদেরও তদ্রূপ অনুমতি নেওয়া উচিত كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যেরূপ তাদের পূর্ববর্তী (বয়োবৃদ্ধ) ব্যক্তিগণ অনুমতি নিয়ে থাকে كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ এরূপে আল্লাহ তোমাদের নিকট তার বিধানসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

৬০. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاۗءِ আর বয়স্কা বৃদ্ধা নারীগণ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا যাদের বিবাহের কোনো আশা নেই فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ তাদের এতে কোনো অপরাধ নেই যে اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ তারা তাদের (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখবে غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۢ بِزِيْنَةٍ যদি নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ আর যদি এটা হতেও সতর্কতা অবলম্বন করে خَيْرٌ لَّهُنَّ তবে সেটা তাদের জন্য আরো অধিক উত্তম وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ এবং আল্লাহ সবকিছুই শুনেন সবকিছুই জানেন।

৬১. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ অন্ধ ব্যক্তির পক্ষেও কোনো দোষ নেই وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ এবং খঞ্জ ব্যক্তিরও কোনো দোষ নেই وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ এবং রুগ্ন ব্যক্তিরও কোনো দোষ নেই وَّلَا عَلٰٓي اَنْفُسِكُمْ এবং স্বয়ং তোমাদের জন্যও কোনো দোষ নেই اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ যে, তোমরা স্বয়ং নিজেদের গৃহসমূহে আহার কর

أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

** অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহ হতে কিংবা তোমাদের মাতৃগণের গৃহ হতে কিংবা তোমাদের ভ্রাতৃগণের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের ভগ্নীদের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের চাচাদের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের ফুফুদের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের মামুদের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের খালাগণের গৃহ হতে, অথবা সেই সমস্ত গৃহ হতে যার চাবি তোমাদের হাতে রয়েছে, অথবা তোমাদের বন্ধুগণের গৃহ হতে। (আর এ ব্যাপারে) তোমাদের উপর কোনো অপরাধ নেই যে, তোমরা সকলে আহার কর একত্রে বসে অথবা পৃথক পৃথকভাবে; অনন্তর যখন তোমরা গৃহসমূহে প্রবেশ করতে উদ্যত হও, তখন আপন লোকদেরকে (মু'মিনদেরকে) সালাম করো দোয়াস্বরূপ- যা আল্লাহর নিকট হতে নির্ধারিত (এবং) বরকতময়, উত্তম বস্তু; এরূপে আল্লাহ তোমাদের নিকট হুকুমসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তোমরা বুঝ।

শাব্দিক অনুবাদ :

** أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহ হতে أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ কিংবা তোমাদের মাতৃগণের গৃহ হতে أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ কিংবা তোমাদের ভ্রাতৃগণের গৃহ হতে أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ কিংবা তোমাদের ভগ্নীদের গৃহ হতে أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ কিংবা তোমাদের চাচাদের গৃহ হতে أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ কিংবা তোমাদের ফুফুদের গৃহ হতে أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ কিংবা তোমাদের মামুদের গৃহ হতে أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ কিংবা তোমাদের খালাগণের গৃহ হতে, أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ অথবা সেই সমস্ত গৃহ হতে যার চাবি তোমাদের হাতে রয়েছে أَوْ صَدِيقِكُمْ অথবা তেমাদের বন্ধুগণের গৃহ হতে لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ তোমাদের উপর কোনো অপরাধ নেই أَنْ تَأْكُلُوا যে, তোমরা সকলে আহার কর جَمِيعًا একত্রে বসে أَوْ أَشْتَاتًا অথবা পৃথক পৃথকভাবে فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا অনন্তর যখন তোমরা গৃহসমূহে প্রবেশ করতে উদ্যত হও فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ তখন আপন লোকদেরকে সালাম করো تَحِيَّةً দোয়াস্বরূপ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ যা আল্লাহর নিকট হতে নির্ধারিত مُبَارَكَةً طَيِّبَةً বরকতময় উত্তম বস্তু كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ এরূপে আল্লাহ তোমাদের নিকট হুকুমসমূহ বর্ণনা করেন لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ যেন তোমরা বুঝ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ .... كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [٦١]

শানে নুযূল – ১ : আলী ইবনে আবী তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করোনা" -এ আয়াতটি যখন নাজিল হয়, তখন মুসলমানরা বলল যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরস্পরের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। খাদ্য হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ। সুতরাং আমাদের

মধ্যে কেউই একে অন্যের নিকট খাবার খাওয়া হালাল হবে না। সে জন্যে মানুষেরা একে অন্যের ঘরে আহার বিহার করা ছেড়ে দিল। সাহাবায়ে কেরামের এ কর্মপন্থা অবলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন।-[ইবনে কাছীর ৩১৪/৩, কুরতুবী ২৮৬/১২, ফাতহুল কাদীর ৫৬/৪]

শানে নুযূল–২ : যুহরী হযরত উরওয়া হতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করে বলেন যে, মুসলমানরা যখন রাসূল ﷺ-এর সাথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে বের হতেন, তখন তারা তাদের জিম্মাদারদের নিকট তাদের চাবিগুলো দিয়ে যেতেন এবং বলতেন যে, তোমাদের যা কিছুর প্রয়োজন হয়, তা তোমরা এ সম্পদ থেকে আহার করবে। আমরা তোমাদের জন্যে তার অনুমতি দিয়ে গেলাম। তার পরও তারা বলত যে, তার থেকে কিছু আহার করা আমাদের জন্যে হালাল হবে না। তারা তো খুশিমনে অনুমতি প্রদান করেনি। আমরা আমানতদার বৈ অন্য কিছু নই। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ আয়াতাংশ নাজিল করেন।

কারো মতে আলোচ্য আয়াতাংশটি জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়ে নাজিল হয়েছে। অর্থাৎ অন্ধ, পঙ্গু ও অসুস্থরা যদি জিহাদে অংশগ্রহণ না করে গৃহে উপবিষ্ট থাকে, তাহলে তাতে কোনো প্রকারের খারাবি নেই।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত বনূ লাইছ ইবনে বকর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা বনূ কিনানা গোত্রের একটি শাখা ছিল। তাদের লোকজন একাকী ঘরে খাবার খেতনা, প্রয়োজন বোধে এক দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকত, যতক্ষণ না তারা কোনো ব্যক্তিকে পেত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে বলে দেন যে, মেহমান নিয়ে সাথে খাওয়াতে অথবা একা একা খাওয়াতে কোনো প্রকারের দোষ নেই। ইবনে আতিয়্যাহ বলেন তাদের এ আদর্শ, হযরত সায়্যিদিনা ইবরাহীম (আ.) হতে উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের মধ্যে ছিল। কারণ ইবরাহীম (আ.) মেহমান ছাড়া কখনো খানা খেতেন না।

শানে নুযূল –২ : আহলে আরবদের মাঝে কোনো কোনো মানুষ এমনও ছিল যাদের নিকট কোনো মেহমান থাকত, তাহলে তিনি মেহমানকে রেখে খাবার খেতেন না। সুতরাং খাবার খাওয়ার বিধি আরোপ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৯০/১২, ইবনে কাছীর ৩১৫/৩]

শানে নুযূল – ৩ : ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম মুফাস্‌সিরে কুরআন হযরত কাতাদাহ (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তৎকালের মদিনায় বনূ কেননা ইবনে খুযাইমা নামক একটি গোত্র ছিল। জাহিলিয়া যুগে তাদের সকলেরই একটি ধারণা অন্তরে বদ্ধমূল ছিল যে, কোনো ব্যক্তি অতিথি ছাড়া একা একা খেয়ে নেওয়া নির্লজ্জতা। যার দরুন তারা অধিক সম্পদের আধিকারী হলেও পানাহার করার মতো কাউকে যতক্ষণ পর্যন্ত না পেত, ততক্ষণ পর্যন্ত উপবাস থেকে অপেক্ষমান থাকত। তা শিথিল করণার্থে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[দুররে মানছূর ৫৮/৫, ফতহুল কাদীর ৫৬/৪, ইবনে কাছীর ৩১৫/৩]

এখানে ৬০ নম্বর আয়াতে একটি তৃতীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্যে পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহ্‌রামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহ্‌রামদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরি নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্যে বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরি নয়। তাই বলা হয়েছে। وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الْآيَةَ -এর তাফসীর উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে, যেসব অঙ্গ মাহ্‌রামের সামনে খোলা যায় যে মাহ্‌রাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে যদি সাজ-সজ্জা না করে। পরিশেষে আরো বলা হয়েছে وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ অর্থাৎ সে যদি মাহ্‌রাম নয় এরূপ ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরোপুরি বিরত থাকে, তবে তা তার জন্যে উত্তম।

গৃহে প্রবেশের পরবর্তী কতিপয় বিধান ও সামাজিক রীতিনীতি : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সেসব বিধান ও রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশের পর মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব। আয়াতের মর্ম ও বিধানাবলি হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে প্রথমে সেই পরিস্থিতি জেনে নেওয়া উচিত, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কুরআন পাক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাধারণ শিক্ষার মধ্যে হাক্কুল-ইবাদত তথা বান্দার হকের হেফাজতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা কোনো মুসলমানের অজানা নয়। অপরের অর্থ-সম্পদে তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করার কারণে ভীষণ শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ রাসূলের সংসর্গে থাকার জন্যে এমন ভাগ্যবান লোকদের মনোনীত করেছিলেন, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশের প্রতি উৎসর্গ হয়ে থাকতেন এবং প্রত্যেকটি আদেশ পালনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতেন। কুরআনি শিক্ষার বাস্তবায়ন ও তার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র সংসর্গের পরশ পাথর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এমন একটি দল সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁদের জন্যে ফেরেশতারাও গর্ববোধ করে। অপরের অর্থ-সম্পদে তার ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত সামান্যতম হস্তক্ষেপ সহ্য না করা, কাউকে সামান্যতম কষ্টপ্রদান থেকে বিরত থাকা এবং এ ব্যাপারে খোদাভীতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত থাকা, এগুলো সকল সাহাবীরই গুণ ছিল। এ ধরনেরই কয়েকটি ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে সংঘটিত হয় এবং এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধানাবলি অবতীর্ণ হয়। তাফসীরবিদগণ এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে এবং কেউ অন্য ঘটনাকে আয়াতের শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এতে কোনো বিরোধ নেই। ঘটনাবলির সমষ্টিই আয়াতের শানে নুযূল। ঘটনাবলি নিম্নরূপ।

১. ইমাম বগভী তাফসীরবিদ সাঈদ ইবনে জুবায়র ও যাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জগতের সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের স্বভাব এই যে, খঞ্জ, অন্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তির সাথে বসে খেতে তারা ঘৃণা বোধ করে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তাঁরা মনে করলেন যে, আমরা কারো সাথে বসে একত্রে আহার করলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাই তাঁরা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে যোগদান থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। অন্ধ ব্যক্তিও চিন্তা করল যে, কয়েকজন একত্রে আহারে বসলে ন্যায় ও মানবতা এই যে, একজন অপরজনের চাইতে বেশি খাবে না। আমি অন্ধ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবত অন্যের চাইতে বেশি খেয়ে ফেলব। এতে অন্যের হক নষ্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি ধারণা করল, আমি সুস্থ লোকের মতো বসতে পারি না, দু'জনের জায়গা নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের সাথে বসলে সম্ভবত : তার কষ্ট হবে। তাঁদের এই চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তাঁরাই অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হতেন। এর পরিপ্রেক্ষিত্রে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাঁদেরকে অন্যের সাথে একত্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা সাবধানতা পরিহার করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

২. বগভী ইবনে-জারীরের জবানী হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা উপরিউক্ত ঘটনার অপর পিঠ। তা এই যে, কুরআন পাকে لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায় ভাবে খেয়ো না। আয়াতটি নাজিল হলে সবাই অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করতে লাগল। তারা ভাবল, রুগ্ণ ব্যক্তি তো স্বভাবতই কম আহার করে, অন্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য কোন্‌টি তা জানতে পারে না এবং খঞ্জ সোজা হয়ে বসতে অক্ষম হওয়ার কারণে খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। অতএব সম্ভবত তারা কম আহার করবে এবং আমরা বেশি খেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক নষ্ট হবে। যৌথ খাদ্যদ্রব্যে সবার অংশ সমান হওয়া উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের সূক্ষ্মদর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সবাই একত্রে আহার কর। মামুলী কম-বেশি হওয়ার চিন্তা করো না।

৩. হযরত সাঈদ ইবনে-মুসাইয়িব বলেন : মুসলমানগণ জেহাদের যাওয়ার সময় নিজ নিজ গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে যেত এবং বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু আছে, তা তোমরা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা সাবধানতাবশত তাদের গৃহ থেকে কিছুই খেত না। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে বাযযারে হযরত আয়েশা (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো যুদ্ধে গমন করলে সাধারণ সাহাবীগণও তাঁর সাথে জেহাদে যোগদানকরতে আকাঙ্ক্ষী হতেন। তাঁরা তাদের গৃহের চাবি দরিদ্র বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে অনুমতি দিতেন যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা আমাদের গৃহে যা আছে, তা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা চরম আল্লাহ ভীতিবশত আপন মনের ধারণায় 'অনুমতি হয়নি' আশঙ্কা করে পানাহার থেকে বিরত থাকত। বগভী হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের اَوْ صَدِيْقِكُمْ (অর্থাৎ বন্ধুর গৃহে পানাহার করায় দোষ নেই) শব্দটি হারেস-ইবনে আমরের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কোনো এক জেহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে চলে যান এবং বন্ধু মালেক ইবনে জায়েদের হাতে গৃহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভার সোপর্দ করেন। হারেস ফিরে এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে জায়েদ দুর্বল ও শুষ্ক হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার গৃহে খাওয়া-দাওয়া আমি পছন্দ করিনি। (মাযহারী) বলাবাহুল্য, এ ধরনের সব ঘটনাই আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ হয়েছে।

মাসআলা : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যেসব গৃহে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পানাহার করার অনুমতি এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তি এই যে, আরবের সাধারণ লোকাচার অনুযায়ী এসব নিকট আত্মীয়দের মধ্যে লৌকিকতার বালাই ছিল না। একে অপরের গৃহে কিছু খেলে গৃহকর্তা মোটেই কষ্ট ও পীড়া অনুভব করত না। বরং এতে সে আনন্দিত হতো। এমনিভাবে আত্মীয় যদি নিজের সাথে কোনো বিকলাঙ্গ, রুগ্ন ও মিসকীনকেও খাইয়ে দিত, তাতেও সে কোনোরূপ অস্বস্তি বোধ করত না। এসব বিষয়ের স্পষ্টত অনুমতি না দিলেও অভ্যাসগতভাবে অনুমতি ছিল। বৈধতার এই কারণ দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, যেকালে অথবা যেস্থানে এরূপ লোকাচার নেই এবং গৃহকর্তার অনুমতি সন্দেহযুক্ত হয়, সেখানে গৃহকর্তার স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে পানাহার করা হারাম। যেমন আজকাল সাধারণত এই লোকাচার নেই এবং কেউ এটা পছন্দ করে না যে, কোনো আত্মীয় তার গৃহে যা ইচ্ছা পানাহার করবে অথবা অপরকে পানাহার করাবে। তাই আজকাল সাধারণভাবে এই আয়াতের অনুমতি অনুযায়ী পানাহার জায়েজ নয়। তবে যদি কোনো বন্ধু ও স্বজন সম্পর্কে কেউ নিশ্চিতরূপে জানে যে, সে পানাহার করলে অথবা অপরকে পানাহার করালে কষ্ট কিংবা অস্বস্তি বোধ করবে না, বরং আনন্দিত হবে, তবে বিশেষ করে তার গৃহে পানাহার করার ব্যাপারে এই আয়াত অনুযায়ী আমল করা জায়েজ।

মাসআলা : উল্লিখিত বর্ণনা থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে– এ কথা বলা ঠিক নয়। বরং বিধানটি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কার্যকর আছে। তবে গৃহকর্তার নিশ্চিত অনুমতি এর জন্য শর্ত। এরূপ অনুমতি না থাকলে তা আয়াতের আওতায় পড়ে না। ফলে পানাহার করা জায়েজ নয়। –[মাযহারী]

মাসআলা : এমনিভাবে এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান কেবল আয়াতে বর্ণিত বিশেষ আত্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তার তরফ থেকে পানাহার করা ও করানোর অনুমতি আছে, এতে সে আনন্দিত হবে এবং কষ্ট অনুভব করবে না, তবে তার ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য। (মাযহারী) কারো গৃহে অনুমতিক্রমে প্রবেশের পর যেসব কাজ জায়েজ অথবা মোস্তাহাব, উল্লিখিত বিধান সেসব কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এসব কাজের মধ্যে পানাহার ছিল প্রধান, তাই একে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কাজ গৃহে প্রবেশের আদব-কায়দা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ কর, তখন সেখানে যত মুসলমান আছে, তাদেরকে সালাম বল। আয়াতে وَلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। কেননা মুসলমান সকলেই এক অভিন্ন দল। অনেক সহীহ্ হাদীসে মুসলমানদের পরস্পরে একে অন্যকে সালাম করার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে এবং এর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِسْتَأْذَنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِئْذَانٌ মূলবর্ণ (أ - ذ - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– অনুমতি নিয়ে থাকে।

لَا يَرْجُوْنَ : সীগাহ جمع غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– যাদের কোনো আশা নেই।

اَنْ يَّضَعْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার وَضْعٌ মূলবর্ণ (و - ض - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা খুলে রাখবে।

مُتَبَرِّجَاتٌ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَرُّجٌ মূলবর্ণ (ب - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ– প্রকাশ করে।

اَشْتَاتًا : شَتٌّ এবং شَتَاتٌ -এর বহুবচন। অর্থ– পৃথক পৃথকভাবে।

فَسَلِّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَسْلِيْمٌ মূলবর্ণ (س - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– অতঃপর সালাম করো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ : এখানে كَذٰلِكَ -এর كاف টি উহ্য মাসদারের نعت হয়েছে يُبَيِّنُ ফে'ল اللّٰهُ শব্দটি ফায়েল لَكُمْ টি يُبَيِّنُ ফেলের সাথে متعلق আর اٰيٰتِهٖ হলো মাফঊলে বিহী আর وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -এর اللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা। আর عليم হলো প্রথম খবর আর حَكِيْمٌ হলো দ্বিতীয় খবর। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/৩১৪]

৬২. মুসলমান তো কেবল তারাই- যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে। আর যখন তারা রাসূলের নিকট এমন কোনো কাজে রত থাকে যার জন্য সমবেত করা হয়েছে, তখন তারা তাঁর নিকট হতে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত গমন করে না; যারা আপনার নিকট অনুমতি চায়, কেবলমাত্র তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে। অতএব যখন এ সকল লোক নিজেদের কোনো কাজে আপনার নিকট অনুমতি চায়, তখন আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিয়ে দিবেন এবং আপনি তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফেরাতের দোয়া করুন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾
৬৩. তোমরা রাসূলের আহ্বানকে এমন মনে করো না, যেমন তোমরা পরস্পর একে অন্যকে আহ্বান করে থাক; আল্লাহ সে সমস্ত লোকদেরকেও জানেন- যারা তোমাদের মধ্য হতে সরে পড়ে গোপনে, সুতরাং যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের এ ভয় হওয়া উচিত যে, তাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়বে কিংবা তাদের উপর কোনো যন্ত্রণাময় আজাব নাজিল হবে।	لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

শব্দ বিশ্লেষণ :

৬২. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ মুসলমান তো কেবল তারাই الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ আর তারা যখন রাসূলের নিকট এমন কোনো কাজে রত থাকে যার জন্য সমবেত করা হয়েছে لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ তখন তারা তাঁর নিকট হতে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত গমন করে না إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ যারা আপনার নিকট অনুমতি চায় أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ কেবলমাত্র তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ অতএব যখন এ সকল লোক আপনার নিকট অনুমতি চায় لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ নিজেদের কোনো কাজে فَأْذَن তখন আপনি অনুমতি দিয়ে দিবেন لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ এবং আপনি তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফেরাতের দোয়া করুন إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬৩. لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ তোমরা রাসূলের আহ্বানকে এমন মনে করো না كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا যেমন তোমরা পরস্পর একে অন্যকে আহ্বান করে থাক قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ আল্লাহ সে সমস্ত লোকদেরকেও জানেন الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا যারা তোমাদের মধ্যে হতে গোপনে সরে পড়ে فَلْيَحْذَرِ সুতরাং, তাদের এ ভয় হওয়া উচিত যে الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ তাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়বে أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ কিংবা তাদের উপর কোনো যন্ত্রণাময় আজাব নাজিল হবে।

৬৪. স্মরণ রেখ যে, সবই আল্লাহর জন্য, যা কিছু আসমানসমূহে এবং জমিনে রয়েছে; আল্লাহ তা'আলা সেই অবস্থা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছেন যাতে তোমরা আছ; এবং যেদিন সকলকে তাঁর সমীপে আনয়ন করা হবে, তখন তিনি তাদেরকে সবই জানিয়ে দিবেন– যা কিছু তারা করেছিল: আর আল্লাহ সর্ববিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٦٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৪. أَلَآ স্মরণ রেখ যে إِنَّ لِلَّهِ সবই আল্লাহর জন্য مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে এবং জমিনে রয়েছে قَدْ يَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা সে অবস্থা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছেন مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ যাতে তোমরা আছ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ এবং যেদিন সকলকে তাঁর সমীপে আনয়ন করা হবে فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ তখন তিনি তাদেরকে সবই জানিয়ে দিবেন যা কিছু তারা করেছিল وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟...... وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٦٢]

শানে নুযূল – ১ : ইবনে ইসহাক ও ইবনে মুনযির উরওয়াহ ও মুহাম্মদ ইবনে কা'আব আল-কুরাযী (র.) হয়ের উক্তি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, খন্দক অভিযানকালে কুরাইশ বাহিনী যখন রণ প্রস্তুতি নিয়ে মদিনার রুমা কূপের নিকট অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের দলপতি ছিল আবূ সুফিয়ান। গাত্বফান বাসীরাও উহুদের এক প্রান্তদেশে নকমায় অবস্থান গ্রহণ করেছিল। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ-এর নিকট সে খবর পৌঁছে। তখন রাসূল ﷺ মদিনার আশ-পাশে পরিখা খনন করেন। মুসলমানেরা তাতে জানে প্রাণে পরিখা খনন কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। যারা মুনাফিক ছিল তারা পিছুটান দিয়ে থাকত। এমন কি তারা রাসূল ﷺ-এর অনুমতি ব্যতিরেকে এবং রাসূল ﷺ-এর অজান্তে নিজেদের বাড়িতে চলেও যেত। পক্ষান্তরে যারা মুসলমান ছিলেন, তারা কোনো প্রয়োজনের সম্মুখীন হলেই রাসূল ﷺ-এর শরণাপন্ন হতেন এবং বাড়ি যাওয়ার অনুমতি প্রাপ্তির আবেদন করে অনুমতি সাপেক্ষে বাড়ি যেতেন। অতঃপর প্রয়োজন সেরে ফিরে চলে আসতেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[ফতহুল কাদীর ৫৯/৪, কুরতুবী ২৯৩/১২, দুররে মানছুর ৬১/৫]

শানে নুযূল– ২ : মুকাতিল বলেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর ফারুক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি তাবুক যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করার জন্যে অনুমতি চান। তখন রাসূল ﷺ তাকে প্রত্যাবর্তন করার জন্যে অনুমতি দান করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন –[কুরতুবী]

لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا [٦٣]

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম সাঈদ ইবনে জুবায়র এবং যাহহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, প্রাথমিক দিক দিয়ে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করে ডাকতে হলে তারা রাসূল ﷺ-এর নাম ধরে অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! কিংবা হে আবুল কাসেম বলে ডাকতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর সম্মানার্থে তাদেরকে এরূপভাবে নাম ধরে ডাক দিতে নিষেধ করেন। হে আল্লাহর নবী ও হে আল্লাহর রাসূল বলে ডাক দেওয়ার আদেশ করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন –[ইবনে কাছীর ৩১৬/৩, ফাতহুল কাদীর ৫৯/৪]

قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٦٣]

শানে নুযূল : আবূ দাউদ স্বীয় মারাসীল গ্রন্থে হযরত মুকাতিল (রা.)-এর উক্তি দিয়ে বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, কারো যদি নাযাক অথবা অজু ভঙ্গ হবার কোনো কারণ দেখা দিত কিংবা তাদের কোনো প্রয়োজন দেখা দিত, তখন তার রাসূল ﷺ-এর সাথে কথা না বলে বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত দেখিয়ে অনুমতি সাপেক্ষে বের হতেন। পক্ষান্তরে

মুনাফিকদের জন্য মসজিদে বসে থেকে খোতবা শ্রবণ করা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য বিষয় ছিল। তাই কোনো মুসলমান অনুমতির আবেদন করলেই কোনো না কোনো মুনাফিক তার আড়ালে পার্শ্বেই দাঁড়িয়ে যেত। এমন কি বেরও হয়ে যেত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করেন।

–[দুররে মানুছুর ৬১/৫, ফাতহুল কাদীর ৫৭/৪, ইবনে কাছীর ৩১৬/৩, রুহুল মা'আনী ২২৬/৯/১৮]

বিশেষভাবে রাসূলে কারীম ﷺ-এর মজলিসের এবং সাধারণ সামাজিকতার কতিপয় রীতিনীতি ও বিধান : আলোচ্য আয়াতে দু'টি আদেশ বর্ণিত হয়েছে। এক. যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে কোনো ধর্মীয় জেহাদ ইত্যাদির জন্যে একত্রিত করেন, তখন ঈমানের দাবি হলো সমবেত হওয়া এবং তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে সমাবেশ ত্যাগ না করা। কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁর কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি গ্রহণ করা। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিশেষ অসুবিধা ও প্রয়োজন না থাকলে অনুমতি প্রদান করুন। এই প্রসঙ্গে মুনাফিকদেরও নিন্দা করা হয়েছে, তারা ঈমানের দাবির বিরুদ্ধে দুর্নামের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে মসজিদে উপস্থিত হয়, কিন্তু এরপর কারো আড়ালে চুপিসারে সরে পড়ে। আহযাব যুদ্ধের সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন আরবের মুশরিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যুক্তফ্রন্ট সম্মিলিতভাবে মদিনা আক্রমণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে পরিখা খনন করেন। এ কারণেই একে 'গযওয়ায়ে খন্দক' তথা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধ পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। –[কুরতুবী] বায়হাকী ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং এবং সকল সাহাবী পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা প্রথমত আসতেই চাইত না। এসেও দেখানোর জন্যে সামান্য কাজ করে চুপিসারে সরে পড়ত। এর বিপরীতে মুসলমানগণ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করে যেত এবং প্রয়োজন দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[মাযহারী]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিস থেকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে যাওয়া হারাম। অথচ সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য ঘটনায় দেখা যায় যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে উপস্থিত থাকার পর যখন ইচ্ছা প্রস্থান করতেন এবং অনুমতি নেওয়া জরুরি মনে করতেন না। জবাব এই যে, আয়াতে সাধারণ মজলিসের বিধান বর্ণনা করা হয় নি; বরং কোনো প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে মজলিস ডাকা হয়, তার বিধান; যেমন খন্দক যুদ্ধের সময় হয়েছিল। এই বিশেষত্বের প্রতি আয়াতের শব্দ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ -এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে।

أَمْرٍ جَامِعٍ বলে কি বোঝানো হয়েছে : এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে; কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, এতে এমন কাজ বোঝানো হয়েছে, যার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে একত্র করা জরুরি মনে করেন ; যেমন আহযাব যুদ্ধে পরিখা খনন করার কাজ টি জরুরি ছিল, তাই এ বিষয়ে সাহাবীদেরকে নিয়ে পরামর্শ সভাও গুরুত্ববহ ছিল।

এই আদেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, না ব্যাপক? ফিকহ্‌বিদগণ সবাই একমত যে, এই আদেশ একটি ধর্মীয় ও ইসলামি প্রয়োজনের খাতিরে জারি করা হয়েছে। এরূপ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে। তাই এটা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং মুসলমানদের প্রত্যেক ইমাম ও আমীর তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ও তার মজলিসেরও এই বিধান। তিনি সবাইকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিলে, তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিনানুমতিতে ফিরে যাওয়া নাজায়েজ। –(কুরতুবী, মাযহারী, বয়ানুল কুরআন)। বলাবাহুল্য, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসের জন্যে এই আদেশ অধিক জোরদার এবং এর বিরোধিতা প্রকাশ্য দুর্ভাগ্য; যেমন মুনাফিকরা তা করেছে। ইসলামি সামাজিকতার রীতিনীতির দিক দিয়ে এই আদেশ পারস্পরিক সমাবেশ ও সাধারণ সভা-সমিতির জন্যেও কমপক্ষে মোস্তাহাব ও উত্তম। মুসলমানগণ যখন কোনো মজলিসে কোনো সমষ্টিগত ব্যাপারে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অথবা কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্যে একত্রিত হয়, তখন চলে যেতে হলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।

দ্বিতীয় আদেশ সর্বশেষ আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ -এর অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরফ থেকে মুসলমানদেরকে ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা اِضَافَةُ اِلَى الْفَاعِلِ) আয়াতের অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ডাকেন, তখন একে সাধারণ মানুষের ডাকার মতো মনে করো না যে, সাড়া দেওয়া, না দেওয়া ইচ্ছাধীন; বরং তখন সাড়া দেওয়া ফরজ হয়ে যায় এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া হারাম হয়ে যায়। আয়াতের বর্ণনাধারার সাথে এই তাফসীর অধিক খাপ খায়। তাই মাযহারী ও বয়ানুল-কুরআনে এই তাফসীর গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অপর একটি তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ইবনে কাছীর, কুরতুবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, دُعَاءُ الرَّسُولِ -এর অর্থ মানুষের তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো কাজের জন্যে ডাকা। –[ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা اِضَافَةُ اِلَى الْمَفْعُوْلِ]

এই তাফসীরের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো প্রয়োজনে আহ্বান কর অথবা সম্বোধন কর, তখন সাধারণ লোকের ন্যায়, তাঁর নাম নিয়ে 'ইয়া মুহাম্মদ' ﷺ বলবে না। এটা বেয়াদবি; বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' অথবা 'ইয়া নবী আল্লাহ' বলবে। এর সারমর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করা মুসলমানদের জন্যে ওয়াজিব এবং যা আদবের পরিপন্থি কিংবা যা দ্বারা তিনি ব্যথিত হন, তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। এই আদেশের অনুরূপ সূরা হুজুরাতে আরো কতিপয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণত : وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ অর্থাৎ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কথা বল, তখন আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না; যেমন লোকেরা পরস্পর বলে। আরো একটি উদাহরণ, إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرٰتِ অর্থাৎ তিনি যখন গৃহে অবস্থান করেন, তখন বাইরে থেকে আওয়াজ দিয়ে ডেকো না; বরং বের হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাক।

হুশিয়ারি : এই দ্বিতীয় তাফসীরে বুযুর্গ এবং বড়দেরও একটি আদব জানা গেল। তা এই যে, মুরুব্বী ও বড়দেরকে নাম নিয়ে ডাকা বেয়াদবি। সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা আহ্বান করা উচিত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أٰمَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মূলবর্ণ (ا - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা ঈমান রাখে।

فَأْذَنْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اِذْنٌ মূলবর্ণ (ا - ذ - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– আপনি অনুমতি দিয়ে দিবেন।

شِئْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش - ى - أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ– আপনি ইচ্ছা করেন।

لَا تَجْعَلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার جَعْلٌ মূলবর্ণ (ج - ع - ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা এমন মনে করো না।

يَتَسَلَّلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَسَلُّلٌ মূলবর্ণ (س - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা সরে পড়ে গোপনে।

فَلْيَحْذَرْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব سَمِعَ মাসদার حَذَرٌ মূলবর্ণ (ح - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ– সুতরাং তাদের ভয় হওয়া উচিত।

اَنْ تُصِيْبَهُمْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصَابَةٌ মূলবর্ণ (ص - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ–তাদের উপর এসে পড়বে।

يُرْجَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার رُجُوْعٌ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ সকলকে আনয়ন করা হবে।

فَيُنَبِّئُهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْبِئَةٌ মূলবর্ণ (ن - ب - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তখন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه : এখানে اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর اَلَّذِيْنَ হলো তার ইসম يَسْتَاْذِنُوْنَكَ বাক্যটি তার সেলাহ, আর اُولٰٓئِكَ হলো মুবতাদা اَلَّذِيْنَ হলো তার খবর। আর يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه হলো দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ মওসূলের সেলাহ আর جمله اسمية খবর ان হলো।

–[ই'রাবুল কুরআন : ৫/৩২২]

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ
সূরা ফুরকান

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৭৭, রুকূ'–৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়: দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. মহামহিমান্বিত সত্তা তাঁর– যিনি এই মীমাংসার গ্রন্থটি স্বীয় বিশিষ্ট বান্দার উপর নাজিল করেছেন, যেন তিনি সমগ্র পৃথিবীবাসীদের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হন।	تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ ﴿١﴾
২. (তিনি) এমন সত্তা যার জন্য আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর বাদশাহী রয়েছে এবং তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, আর না তাঁর রাজত্বে কেউ অংশী আছে এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারিত করে রেখেছেন।	الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿٢﴾
৩. আর ঐ মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন বহু উপাস্য স্থিরীকৃত করছে– যারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করেনি, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং না তারা নিজেদের কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে আর না কোনো উপকারের। আর কারো মৃত্যুর উপরও তাদের অধিকার নেই এবং কারো জীবনদানের উপরও না এবং কাউকে পুনর্বার জীবিত করারও না।	وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ﴿٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. تَبٰرَكَ মহামহিমান্বিত সত্তা তাঁর الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ যিনি এই মীমাংসার গ্রন্থটি নাজিল করেছেন عَلٰى عَبْدِهٖ স্বীয় বিশিষ্ট বান্দার উপর لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا যেন তিনি সমগ্র পৃথিবীবাসীদের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হন।

২. اَلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (তিনি) এমন সত্তা যার জন্য আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর বাদশাহী রয়েছে وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا এবং তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ আর না তার রাজত্বে কেউ অংশী আছে وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারিত করে রেখেছেন।

৩. وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً আর ঐ মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন বহু উপাস্য স্থিরীকৃত করছে لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করেনি وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا এবং না তারা নিজেদের কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে وَّلَا نَفْعًا আর না কোনো উপকারের وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا আর কারো মৃত্যুর উপর ও তাদের অধিকার নেই وَّلَا حَيٰوةً এবং কারো জীবনদানের উপরও না وَّلَا نُشُوْرًا এবং কাউকে পুনর্বার জীবিত করারও না

৪. আর কাফেরেরা বলে থাকে, এটা তো কিছুই নয়, নিছক মিথ্যা– যা এ ব্যক্তি রচনা করে নিয়েছে এবং অন্যান্যরা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে। সুতরাং এরা বড়ই অনাচার ও মিথ্যায় জড়িত হয়েছে।	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨ افْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۝٤
৫. আর এরা বলে থাকে যে, এটা ভিত্তিহীন কথাসমূহ– যা পূর্ববর্তী লোকগণ হতে কথিত হয়ে আসছে– যা এ ব্যক্তি লিখে নিয়েছে। অতঃপর এটাই তাঁর সমক্ষে সকাল ও সন্ধ্যায় পঠিত হয়ে থাকে।	وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٥
৬. আপনি বলে দিন যে, এটা তো তিনি নাজিল করেছেন, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সকল রহস্য জানেন; নিশ্চয় তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল, দয়ালু।	قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٦
৭. আর তারা বলে যে, এ রাসূলের কি হলো যে, সে খাদ্য খায় এবং বাজারে চলাফেরা করে; এই ব্যক্তির নিকট ফেরেশতা কেন পাঠানো হয়নি, ফলে সে তার সঙ্গে থেকে ভয় দেখাত?	وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ۭ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۝٧

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর কাফেররা বলে থাকে اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ এটা তো কিছুই নয় নিছক মিথ্যা افْتَرٰىهُ যা এ ব্যক্তি রচনা করে নিয়েছে وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ এবং অন্যান্যরা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا সুতরাং এরা বড়ই অনাচার ও মিথ্যায় জড়িত হয়েছে।

৫. وَقَالُوْا আর এরা বলে থাকে যে اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ এটা ভিত্তিহীন কথাসমূহ যা পূর্ববর্তী লোকগণ হতে কথিত হয়ে আসছে اكْتَتَبَهَا যা এ ব্যক্তি লিখিয়ে নিয়েছে فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ অতঃপর এটাই তার সমক্ষে পঠিত হয়ে থাকে بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا সকাল ও সন্ধ্যায়।

৬. قُلْ আপনি বলে দিন যে اَنْزَلَهُ এটা তো তিনি নাজিল করেছেন الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সকল রহস্য জানেন اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا নিশ্চয় তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল দয়ালু।

৭. وَقَالُوْا আর তারা বলে যে مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ এ রাসূলের কি হলো যে يَاْكُلُ الطَّعَامَ সে খাদ্য খায় وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ এবং বাজারে চলাফেরা করে لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ এই ব্যক্তির নিকট ফেরেশতা কেন পাঠানো হয়নি فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ফলে সে তার সঙ্গে থেকে ভয় দেখাত।

৮. অথবা তার নিকট কোনো ধনভাণ্ডার এসে পড়ত কিংবা তার জন্য কোনো বাগান থাকত, যা হতে সে খেত; আর এ জালিমরা এরূপও বলে থাকে যে, তোমরা একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।	أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٨﴾
৯. দেখুন তো, এরা আপনার সম্বন্ধে কেমন কেমন বিস্ময়কর উক্তি করছে! ফলত তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং তারা আর পথ পেতে পারে না।	انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾
১০. সেই সত্তা অতি মহান, তিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু দিবেন, অর্থাৎ, উদ্যানসমূহ- যার নিম্নদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, এবং আপনাকে প্রাসাদসমূহও দিবেন।	تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾
১১. বরং এরা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করছে। আর আমি এরূপ লোকদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি নির্ধারিত করে রেখেছি যারা কিয়ামতকে মিথ্যা বলে মনে করে।	بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ অথবা তার নিকট কোনো ধন ভাণ্ডার এসে পড়ত أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ কিংবা তার জন্য কোনো বাগান থাকত يَأْكُلُ مِنْهَا যা হতে সে খেত وَقَالَ الظَّالِمُونَ আর এ জালিমরা এরূপও বলে থাকে যে إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا তোমরা একজন জাদুগ্রস্থ ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।

৯. انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ দেখুন তো এরা আপনার সম্বন্ধে কেমন কেমন বিস্ময়কর উক্তি করছে। فَضَلُّوا ফলত তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا সুতরাং তারা আর পথ পেতে পারে না।

১০. تَبَارَكَ الَّذِي সেই সত্তা অতি মহান إِن شَاءَ তিনি ইচ্ছা করলে جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ আপনাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু দিবেন جَنَّاتٍ অর্থাৎ উদ্যানসমূহ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ যার নিম্ন দেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا এবং আপনাকে বহু প্রাসাদসমূহও দিবেন।

১১. بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ বরং এরা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করছে وَأَعْتَدْنَا আর আমি নির্ধারিত করে রেখেছি لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ এরূপ লোকদের জন্য যারা কিয়ামতকে মিথ্যা বলে মনে করে। سَعِيرًا জ্বলন্ত অগ্নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা ফুরকানের তাৎপর্য ও পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ অর্থাৎ তিনি ভালোভাবেই জানেন যে অবস্থায় তোমরা আছ অর্থাৎ তোমাদের আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। এরপর এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ফিরে আসবে, সেদিন তোমাদেরকে অবহিত করা হবে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে। এতে সতর্কবাণী

উচ্চারিত হয়েছে কাফেরদের উদ্দেশ্যে, তাই এ সূরার শুরুতে ইরশাদ হয়েছে– تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ অর্থাৎ কত মহান, মহিমাময় তিনি, যিনি বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার জন্যে তাঁর বান্দার প্রতি পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন, যা সত্য অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জমায় হিজরতের পূর্বে এমন সময় নাজিল হয়েছে যখন আরবের কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল। তারা ছিল গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অন্যায়-অনাচার, জুলুম অত্যাচার এক কথায় যাবতীয় পাপাচারে লিপ্ত। তারা এ কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না যে, আল্লাহ পাক এমন এক ব্যক্তির উপর তাঁর মহান বাণী নাজিল করেছেন, যিনি তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর তাদেরই মাঝে অতিবাহিত করেছেন, এ কথাটি তাদের নিকট যেমন বিস্ময়কর ছিল, তেমনি ছিল অবিশ্বাস্য। অথচ এটিই ছিল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং চিরসত্য। পৌত্তলিকরা আল্লাহ পাকের একাত্ববাদে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের হাতে বানানো মূর্তিই ছিল তাদের উপাস্য। মিথ্যা ছিল তাদের নিকট প্রিয়। আর সত্য ও সুন্দর ছিল তাদের নিকট অপ্রিয়। এমনি অবস্থায় আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি সূরা ফুরকান নাজিল করেছেন। যেহেতু পবিত্র কুরআনই সত্য-অসত্য, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দেয় তাই আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কুরআনকে ফুরকান বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ সূরায় হক্ব ও বাতিল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে বিশেষভাবে পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে ফুরকান। এ সূরায় তাওহীদ, রিসালাত এবং কিয়ামত সম্পর্কীয় বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি যারা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে অস্বীকার করত, তাদের যাবতীয় সন্দেহ খণ্ডন করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন যুগে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামকে যারা অস্বীকার করেছে এবং যারা তাঁদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণামের উল্লেখও করা হয়েছে এ আয়াতে। যাতে করে পবিত্র কুরআনকে যারা অস্বীকার করে, প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে যারা অবিশ্বাস করে, তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং শিরক বা পৌত্তলিকতা থেকে বিরত থাকে।

–[তাফসীরে হক্কানী পারা. ১৮, পৃ. ৪৯]

ইবনে মারদূভিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জামায় নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে হক্কানী পারা. ১৮, পৃ. ৪৯]

এ সূরা প্রসঙ্গে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এ সূরায় বিশেষভাবে তাওহীদ, রিসালাত এবং কিয়ামতের সঠিক দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এর পাশাপাশি নেককার মুমিনদের কিছু বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে। –[দুররুল মানসূর খ. ৫, পৃ. ৬৮]

আল্লামা আলূসী বাগদাদী (র.) এ সূরা সম্পর্কে লিখেছেন, অধিকাংশ তাফসীরকারগণ একমত যে, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, তিন আয়াত ব্যতীত সাতাত্তর আয়াত বিশিষ্ট এ সূরাখানি মক্কা মোয়াজ্জামায় অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ তিনটি আয়াত মদিনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর যাহহাক (র.) বলেছেন, এ সূরার প্রথমাংশ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে, আর অবশিষ্টাংশ মদিনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১৮, পৃ. ২৩০]

এই সূরার সারমর্ম কুরআনের মাহাত্ম্য এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শত্রুর পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব প্রদান করা।

وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ......... إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا [৭ – ৮]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত একদল কুরাইশ নেতৃবর্গ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ইবনে আবী ইসহাক, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তারা হলো উতবা, শাইবা, রবীআর দু'পুত্র, আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব, নযর ইবনে হারিছ, আবুল বুহতারী, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, যুমআ ইবনে আসওয়াদ, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আবূ জাহেল ইবনে হিশাম, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া, উমাইয়া ইবনে খালফ, আস ইবনে ওয়ায়েল, নাবীহ ইবনে হাজ্জাজ ও মুনাব্বিহ ইবনে হাজ্জাজ প্রমুখ একত্রিত হয়ে পরস্পরে মতবিনিময় করল যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট তোমরা প্রতিনিধি দল প্রেরণ কর। তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে বিতর্কমূলক আলোচনা করে তাঁকে পরাজিত করে দেবে। সুতরাং তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট একথা বলে পাঠাল যে, আপনার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকজন একত্রিত হয়েছে, আপনার সাথে মতবিনিময় করার জন্যে। রাসূল ﷺ তাদের নিকট আসলেন তখন নেতৃবর্গ বলল, মুহাম্মদ! আমরা তো আপনার নিকট একত্রিত হয়েছি। উদ্দেশ্য হলো আপনার নিকট আমরা কিছু মতবিনিময় করব। বস্তুত : কথা হলো আপনি যদি মাল কামনা করেন তাহলে আমরা আপনাকে তা দেওয়ার জন্যে আমাদের থেকে অঢেল মাল জমায়েত করব। আপনি যদি নেতৃত্ব কামনা করেন, তাহলে আমরা আপনাকে নেতা বানিয়ে নেব।

যদি রাজত্বের অভিলাষী হন, তাহলে আপনাকে আমরা আমাদের অধিনায়ক বানিয়ে নেব। রাসূল ﷺ -এর প্রত্যুত্তরে বললেন যে, তোমরা যা বলছ, তা নিয়ে আমি আবির্ভূত হইনি। আমি তোমাদের মাল, তোমাদের উপর মর্যাদা লাভ ও রাজ্য বিস্তার করার উদ্দেশ্য নিয়ে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইনি। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের প্রতি রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমার প্রতি কিতাব নাজিল করে আদেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং ঈমানদারদেরকে যেন বেহেশতের সু-সংবাদও দান করি। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট আমার পালনকর্তার রিসালাত পৌছিয়ে থাকি এবং উপদেশ করি। আমি যা কিছু নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি, তা যদি তোমরা মেনে নাও তাহলে তোমরা উভয় জাহানে সাফল্য মণ্ডিত হবে। আর তোমরা যদি তা গ্রহণ না করে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ, তাহলে আমি আল্লাহর ফরমান নিয়ে অটুট থাকব। যতদিন না পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যেকার ফয়সালা করবেন। অতঃপর তারা বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা আপনার নিকট যে প্রস্তাব পেশ করলাম তা যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে আপনি আপনার রবকে বলুন, তিনি যেন আপনার সাথে আপনার কথা সমর্থন ও সত্যায়িত করার জন্যে একজন ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করেন। এতে করে আমরা প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হব।

বস্তুত আপনি তার নিকট উদ্যান ও স্বর্ণ রৌপ্যের অট্টালিকা প্রার্থনা করুন। আপনি হাটে-বাজারে যান জীবিকা অন্বেষণ করেন, তা থেকে যেন আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যান সে জন্যে আপনার রবের নিকট দোয়া করুন। তাহলে আপনার রবের নিকট আপনার মর্যাদা কি তা আমরা বুঝতে পারব। আপনার রাসূল হবার দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তা করে দেখান। রাসূল ﷺ তাদের লক্ষ্য করে বললেন। আমি এ সব প্রার্থনা করব না। আমি তোমাদের প্রতি এ ধরনের কোনো কাজ নিয়ে প্রেরিতও হইনি। আল্লাহ আমাকে সু-সংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রূহুল মা'আনী ২৩৭/৯/১৮, ফাতহুল কাদীর ৬৩/৪, দুররে মানছূর ৬৩/৫]

تَبَارَكَ الَّذِيْٓ إِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا [١٠]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ খাইছামার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হলো যে, আপনি যদি এমন ধন-ভাণ্ডার কামনা করেন যা পূর্বে কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি এবং আপনার পরবর্তী কাউকে দেওয়াও হবে না তাহলে আপনাকে দেওয়া হবে এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর নিকট আপনার জন্যে যা রয়েছে তাতে কোনো প্রকারের হ্রাস কৃত হবে না। তার পরও পরজগত কামনা করলে সেখানে তাও দেওয়া হবে। ধন ভাণ্ডার যদি আপনি কামনা করেন তা সব কিছুই আপনাকে দেওয়া হবে। সে প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[কুরতুবী ৯/১৩, দুররে মানছূর ৬৩/৫, ফাতহুল কাদীর ৬৫/৪, তাবারী ৩৬৯/৯, ইবনে কাছীর ৩২০/৩]

সূরার বৈশিষ্ট্য : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ (র.) তিনটি আয়াতকে মদিনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ এবং কিছু আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। (কুরতুবী) এ সূরার সারমর্ম কুরআনের মাহাত্ম্য এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও রেসালাতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব প্রদান করা।

تَبٰرَكَ শব্দটি بَرَكَتْ থেকে উদ্ভূত। বরকতের অর্থ প্রভূত কল্যাণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। فُرْقَانٌ –কুরআন পাকের উপাধি। এর আভিধানিক অর্থ, পার্থক্য করা। কুরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মু'জিযার মাধ্যমে সত্যপন্থি ও মিথ্যাপন্থিদের প্রভেদ ফুটিয়ে তোলে। তাই একে ফুরকান বলা হয়।

لِلْعٰلَمِيْنَ –এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালাত ও নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্যে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এরূপ নন। তাঁদের নবুয়ত ও রিসালাত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থানের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের যে ছয়টি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য ব্যাপক।

فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا - تَخْلِيْق -এর পর تَقْدِيْر উল্লেখ করা হয়েছে। تَخْلِيْق এর অর্থ কোনোরূপ নমুনা ব্যতিরেকেই কোনো বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা। তা যেমনই হোক।

প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর বিশেষ বিশেষ রহস্য : تَقْدِيْر -এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সে কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের জন্যে বস্তুটি সৃজিত হয়েছে। আকাশের গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি সে কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহ ও নক্ষত্র সৃজনে এমনসব উপাদান রাখা হয়েছে, যেগুলো তার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। ভূপৃষ্ঠেও তার গর্ভে সৃজিত প্রত্যেকটি বস্তুর গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, কোমলতা ও কঠোরতা সে কাজের উপযোগী যার জন্যে এগুলো সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল করা হয়নি যে, তার উপরে কিছু রাখলে ডুবে যায় এবং পাথর বা লোহর ন্যায় শক্তও করা হয়নি যে, খনন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা ভূপৃষ্ঠকে খনন করার প্রয়োজনও আছে, যাতে ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা যায় এবং এতে ভিত্তি খনন করে সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করা যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত আছে। বাতাসও তরল, কিন্তু পানি থেকে ভিন্নরূপ। পানি সর্বত্র আপনা-আপনি পৌঁছে না। এতে মানুষকে কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে আল্লাহ তা'আলা বাধ্যতামূলক নিয়ামত করেছেন; কোনোরূপ কষ্ট ছাড়াই তা সর্বত্য পৌঁছে যায়; বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্যে তাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সৃষ্ট বস্তুসমূহের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান এটা নয়। প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ব নমুনা। ইমাম গাযালী (র.) এ বিষয়ে اَلْحِكْمَةُ فِىْ مَخْلُوْقَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে শুরু থেকেই কুরআনের মাহাত্ম্য এবং যাঁর প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে عبده খেতাব দিয়ে তাঁর সম্মান ও গৌরবের বিস্ময়কর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা কোনো সৃষ্ট মানবের জন্যে এর চাইতে বড় সম্মান কল্পনা করা যায় না যে, স্রষ্টা তাকে 'আমার' বলে পরিচয় দেন।

بندہ حسن بصد زبان گفت کے بندہ توام ٭ تو بزبان خود بگو بندہ نواز کیستی

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ الخ এখান থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তি ও তার জবাবের বর্ণনা শুরু হয়ে কিছুদূর পর্যন্ত চলেছে।

তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালাম নয়; বরং মুহাম্মদ ﷺ নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন করেছেন অথবা পুরাকালের উপকথা ইহুদি, খ্রিস্টানদের কাছে শুনে নিজের সঙ্গীদের দ্বারা লিখিয়ে নেন। যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত উপকথাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর মানুষের কাছে গিয়ে বলেন যে, এটা আল্লাহর কালাম।

কুরআন এই আপত্তির জবাবে বলেছে, اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -এর সারমর্ম এই যে, কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এর নাজিলকারী আল্লাহ তা'আলা সেই পবিত্র সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপন রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ কারণেই তিনি কুরআনকে এক অলৌকিক কালাম করেছেন এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা একে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার না কর, কোনো মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ; এর অনুরূপ কালাম বেশি না হলেও একটি সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী লোকদের জন্যে এই চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে এবং কুরআনের এক আয়াতের মোকাবিলায় অনুরূপ অন্য আয়াত রচনা করে আনার দুঃসাহস করাও হয়নি। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরোধিতায় নিজেদের ধন-সম্পত্তি বরং সন্তান-সন্ততি ও প্রাণ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে কুণ্ঠিত ছিল না। কিন্তু কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা লিখে আনার মতো ছোট্ট কাজটি করতে তারা সক্ষম হলো না। এটা এ বিষয়ের জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে, কুরআন কোনো মানবরচিত কালাম নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরূপ কালাম রচনা করতে পারত। এটা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলারই কালাম। অলঙ্কারগুণ ছাড়া এর অর্থ-সম্ভার ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাতসত্তার পক্ষ থেকেই সম্ভবপর হতে পারে। এই বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ সূরা বাকারায় বিশদ আলোচনার আকারে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রাসূল হতেন, তবে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না, বরং ফেরেশতাদের মতো পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এত ধন-ভাণ্ডার

অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁকে জীবিকার কোনো চিন্তা করতে হতো না, হাটে-বাজারে চলাফেরা করতে হতো না। এছাড়া তিনি যে আল্লাহর রাসূল একথা আমরা কিরূপে মানতে পারি? প্রথমত তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয়ত কোনো ফেরেশতা তাঁর সাথে থাকেও না যে, তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয়, তিনি জাদুগ্রস্ত। ফলে তাঁর মস্তিষ্ক বিকল হয়ে গেছে এবং আগাগোড়াই বল্গাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে– اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا অর্থাৎ দেখুন, এরা আপনার সম্পর্কে কেমন অদ্ভুত কথাবার্তা বলে। এর অর্থ এই যে, এরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ পাওয়ার কোনা উপায় নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَبَارَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلْ মাসদার تَبَارُكٌ মূলবর্ণ (ب - ر - ك) জিনস صحيح অর্থ– মহামহিমান্বিত।

لِيَكُوْنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার كَوْنٌ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– যেন তিনি হন।

لَمْ يَتَّخِذْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (أ - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তিনি গ্রহণ করেন নি।

لَايَخْلُقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার خَلْقٌ মূলবর্ণ (خ - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ– যারা সৃষ্টি করেনি।

اِفْتَرَاهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যা এ ব্যক্তি রচনা করে নিয়েছে।

اَعَانَهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعَانَةٌ মূলবর্ণ (ع - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তাকে সাহায্য করেছে।

جَاؤُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَجِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ج - ى - أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ– জড়িত হয়েছে।

يُلْقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– এসে পড়ত।

مَسْحُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব فَتَحَ মাসদার سِحْرٌ মূলবর্ণ (س - ح - ر) জিনস صحيح অর্থ– জাদুগ্রস্ত।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْتَادٌ মূলবর্ণ (ع - ت - د) জিনস صحيح অর্থ– আমি নির্ধারিত করে রেখেছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا : এখানে تَبَارَكَ ফে'লটি জামেদ এটা রূপান্তর হয় না। الَّذِىْ হলো تَبَارَكَ-এর ফায়েল, আর نَزَّلَ الْفُرْقَانَ বাক্যটি হলো তার সেলাহ عَلٰى عَبْدِهٖ এটা نَزَّلَ-এর সাথে متعلق হয়েছে لِيَكُوْنَ-এর লাম টি تعليل-এর জন্য। আর يَكُوْنَ ফে'লে নাকেস তার উহ্য যমীর هُوَ হলো তার ইসিম لِلْعٰلَمِيْنَ হলো متعلق আর نَذِيْرًا হলো তার খবর। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/৩২৭]

১২. যখন তা (দোজখ) তাদেরকে দূর হতে দেখবে, তখন তারা তার তর্জন-গর্জন শুনতে পাবে।	إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾
১৩. আর যখন তাদেরকে হাত-পা বেঁধে তার কোনো সংকীর্ণ গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা তথায় কেবল মৃত্যুকেই ডাকবে;	وَإِذَآ أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾
১৪. (তখন তাদেরকে বলা হবে) তোমরা একটি মৃত্যুকে ডেকো না, বরং বহু মৃত্যুকে ডাক।	لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدًا وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾
১৫. আপনি বলুন যে, এ অবস্থাই কি উত্তম না সেই চিরন্তন জান্নাত–মুত্তাকী লোকদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে? এটা তাদের জন্য প্রতিদান এবং তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।	قُلْ أَذٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيرًا ﴿١٥﴾
১৬. আর তথায় তারা যা কিছু চাবে সবই পাবে, অনন্তকাল তারা সেখানে থাকবে; এ প্রতিশ্রুতি পূরণ আপনার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।	لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خٰلِدِينَ ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ﴿١٦﴾
১৭. আর যেদিন আল্লাহ তা'আলা সে লোকদেরকে, আর আল্লাহ ভিন্ন তারা যাদের পূজা করত– তাদেরকে একত্রিত করবেন, তৎপর বলবেন, তোমরাই কি আমার এ বান্দাগণকে বিপথগামী করেছিলে, নাকি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. إِذَا رَأَتْهُمْ যখন তা (দোজখ) তাদেরকে দেখবে مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ দূর হতে سَمِعُوا তখন তারা শুনতে পাবে لَهَا تَغَيُّظًا وَّ তার তর্জন ও زَفِيرًا গর্জন।

১৩. وَإِذَآ أُلْقُوا আর যখন তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا তার কোনো সংকীর্ণ গহ্বরে مُّقَرَّنِينَ হাত-পা বেঁধে دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا তখন তারা তথায় কেবল মৃত্যুকেই ডাকবে।

১৪. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدًا তোমরা একটি মৃত্যুকে ডেকো না وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا বরং বহু মৃত্যুকে ডাক।

১৫. قُلْ আপনি বলুন যে أَذٰلِكَ خَيْرٌ এ অবস্থাই কি উত্তম أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ না সেই চিরন্তন জান্নাত الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ মুত্তাকী লোকদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيرًا তা তাদের জন্য প্রতিদান এবং তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

১৬. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ আর তথায় তারা যা কিছু চাবে সবই পাবে خٰلِدِينَ অনন্তকাল তারা সেখানে থাকবে كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا এ প্রতিশ্রুতি পূরণ আপনার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।

১৭. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ আর যেদিন আল্লাহ তা'আলা সেই লোকদেরকে একত্রিত করবেন وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ আর আল্লাহ ভিন্ন তারা যাদের পূজা করত তাদেরকে فَيَقُولُ তৎপর বলবেন ءَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هٰٓؤُلَآءِ তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে বিপথগামী করেছিলে أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ নাকি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল।

১৮. তারা বলবে, পবিত্র ও মহান আপনি! আমাদের কি সাধ্য ছিল যে, আমরা আপনাকে ভিন্ন অন্য কোনো কার্য-নির্বাহক পরিগ্রহণ করি; বরং আপনি তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষগণকে এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলেন যে, আপনার স্মরণ ভুলে গিয়েছিল, এবং তারা নিজেরাই এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল।	قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًاۢ بُوْرًا ﴿١٨﴾
১৯. (দেখ!) তোমরা যা বলছিলে সে সম্বন্ধে তোমাদের এই উপাস্যগণ তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে দিল, অতএব, (এখন) তোমরা নিজেরাও (নিজেদের উপর হতে আজাবকে) প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং (কারো পক্ষ হতে) সাহায্যও পেতে পার না, আর তোমাদের মধ্যে যারা অনাচারী আমি তাদেরকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব।	فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿١٩﴾
২০. আর আমি আপনার পূর্বে যত পয়গম্বর প্রেরণ করেছি তাঁরা সকলেই খাদ্যও গ্রহণ করতেন এবং বাজারেও চলাফেরা করতেন। আর আমি তোমাদের একেকে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ (সৃষ্টি) করেছি; তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? আর আপনার প্রতিপালক খুব প্রত্যক্ষ করছেন।	وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. قَالُوْا তারা বলবে سُبْحٰنَكَ পবিত্র ও মহান আপনি مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ আমাদের কি সাধ্য ছিল যে اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ আমরা আপনাকে ভিন্ন অন্য কোনো কার্যনির্বাহক পরিগ্রহণ করি وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ বরং আপনি তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ দিয়েছিলেন যে حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ আপনার স্মরণ ভুলে গিয়েছিল। وَكَانُوْا قَوْمًاۢ بُوْرًا, এবং তারা নিজেরাই এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

১৯. فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ তোমাদের এই উপাস্যগণ তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে দিল بِمَا تَقُوْلُوْنَ তোমরা যা বলছিলে সে সম্বন্ধে। فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا অতএব তোমরা নিজেরাও (নিজেদের উপর হতে আজাবকে) প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও পেতে পার না وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ আর তোমাদের মধ্যে যারা অনাচারী। نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا আমি তাদেরকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব।

২০. وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ আর আমি আপনার পূর্বে যত পয়গম্বর প্রেরণ করেছি اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ তাঁরা সকলেই খাদ্যও গ্রহণ করতেন وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ এবং বাজারেও চলাফেরা করতেন وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً আর আমি তোমাদের একেকে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ (সৃষ্টি) করেছি اَتَصْبِرُوْنَ তোমরা কি ধৈর্য ধারণ করবে? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا, আর আপনার প্রতিপালক খুব প্রত্যক্ষ করছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا [٢٠]

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিক কাফেররা রাসূল ﷺ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল যে, এ আবার কেমন রাসূল পানাহার করে। হাটে বাজারেও যায়। তাদের এহেন প্রহসনমূলক মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দান করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুশরিক সম্প্রদায় রাসূল ﷺ-কে দরিদ্রতার কারণে যখন উপহাস করে বলত যে, এ আবার কি ধরনের রাসূল, পানাহার করেন, এতে রাসূল ﷺ ব্যথিত হন। তখন রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আলোচ্য আয়াতের অবতারণা হয়। তৎকালে হযরত জিবরাঈল আমীন এসে বলল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (হে আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক) আপনার রব আল্লাহও আপনার প্রতি সালাম বলেছেন এবং তিনি আপনার উদ্দেশ্যে বলছেন। –[কুরতুবী ১৫/১৩]

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর কিছু বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একথা বলছ যে, তিনি আল্লাহর রাসূল হলে তাঁর কাছে অগাধ ধন-ভাণ্ডার থাকত, বিপুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই যে, এরূপ করা আমার জন্যে মোটেই কঠিন নয় যে, আমি আমার রাসূলকে বিরাট ধনভাণ্ডার দান করি এবং বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিপতি করি; যেমন ইতঃপূর্বে আমি হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-কে অগাধ ধন-দৌলত ও বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে এই শক্তি সামর্থ্য প্রকাশও করেছি। কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গম্বর সম্প্রদায়কে বস্তুনিষ্ঠ ও পার্থিব ধন-দৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নবীকুল-শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের কাতারে এবং তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই পছন্দ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও নিজের জন্যে এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযীতে হযরত আবূ উমামার জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার পালনকর্তা আমাকে বলেছেন, আমি আপনার জন্যে সমগ্র মক্কাভূমি ও তার পর্বতসমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেই। আমি আরজ করলাম : না, হে আমার পালনকর্তা, আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে আপনার শোকর আদায় করব ও একদিন উপবাস করে সবর করব -এ অবস্থাই আমি পছন্দ করি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে ঘোরাফেরা করত। –[মাযহারী]

সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই পয়গম্বরগণ সাধারণত : দরিদ্র ও উপবাসক্লিষ্ট থাকতেন। এটাও তাঁদের বাধ্যতামূলক অবস্থা নয়; বরং তারা চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বিত্তশালী ও ঐশ্বর্যশালী করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ধন-দৌলতের প্রতি তাঁদের কোনো ঔৎসুক্যই হয় নি। তাঁরা দারিদ্র্য ও উপবাসকেই পছন্দ করতেন।

কাফেরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি পয়গম্বর হলে সাধারণ মানুষের মতোই পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্যে হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না। এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাফেরের এই ধারণা ছিল যে, আল্লাহর রাসূল মানব হতে পারে না। ফেরেশতাই রাসূল হওয়ার যোগ্য। কুরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, যেসব পয়গম্বরকে তোমার ও নবী ও রাসূল বলে স্বীকার কর, তাঁরাও তো মানুষই ছিলেন; তাঁরা মানুষের মতো পানাহার করতেন এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন। এ থেকে তোমাদের বুঝে নেওয়া উচিত ছিল যে, পানাহার করা ও হাট-বাজারে চলাফেরা করা নবুয়ত ও রেসালাতের পরিপন্থি নয় وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ আয়াতে এই বিষয়টিই বর্ণিত আছে।

মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহস্যের উপর ভিত্তিশীল : وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার সবকিছু করার শক্তি ছিল। তিনি সকল মানবকে সমান বিত্তশালী করতে, সবাইকে সুস্থ সবল রাখতে এবং সবাইকে সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে পারতেন; কেউ

হীনমন্য ও নীচ থাকতে পারত না; কিন্তু এর কারণে বিশ্বব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা কাউকে ধনী ও কাউকে নির্ধন করেছেন, কাউকে সবল ও কাউকে দুর্বল করেছেন, কাউকে সুস্থ ও কাউকে অসুস্থ করেছেন এবং কাউকে সম্মানী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও কাউকে অখ্যাত করেছেন। শ্রেণি, জাতি ও অবস্থার এই বিভেদের মধ্যে প্রতি স্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। ধনীর কৃতজ্ঞতার এবং দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। রুগ্ণ ও সুস্থের অবস্থাও তদ্রূপ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা এই যে, যখন তোমার দৃষ্টি এমন ব্যক্তির উপর পতিত হয়, যে টাকা পয়সা ও ধন-দৌলতে তোমার অপেক্ষা বেশি কিংবা স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্মান ও প্রতিপত্তিতে তোমার চাইতে বড়, তখন তুমি কালবিলম্ব না করে এমন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে তোমার চাইতে নিম্নস্তরের-যাতে তুমি হিংসার গোনাহ্ থেকে বেঁচে যাও এবং নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর করতে পার।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اُلْقُوْا : সীগাহ জمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

مُقَرَّنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْرِيْنٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ن) জিনস صحيح অর্থ– হাত পা বেঁধে।

دَعَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা ডাকবে।

لَا تَدْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা ডেকো না।

اَضْلَلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِضْلَالٌ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা বিপথগামী করেছিলে।

ضَلُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার ضَلَالٌ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল।

نَسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার نِسْيَانٌ মূলবর্ণ (ن - س - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ভুলে গিয়েছিল।

فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اجوف واوى বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– সুতরাং তোমরা পারবে না।

نُذِقْهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِذَاقَةٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব।

يَمْشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَشْىٌ মূলবর্ণ (م - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা চলাফেরা করতেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُوْنَ خَالِدِيْنَ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُوْلًا : এ বাক্যটি পূর্ববর্তী جَنَّةُ الْخُلْدِ হতে দ্বিতীয় حال হয়েছে। لَهُمْ হলো خبر مقدم আর فِيْهَا হলো حال আর مَا হলো متبدا موخر আর يَشَاءُوْنَ আর বাক্যটি সেলাহ হয়েছে। আর خَالِدِيْنَ টা لَهُمْ থেকে বা يَشَاءُوْنَ-এর যমীর থেকে حال হয়েছে, আর كَانَ ফে'লে নাকেস তার ইসম উহ্য রয়েছে এবং এর দিকে ফিরেছে যা عَلٰى مَا يَشَاءُوْنَ থেকে বুঝা যায়। অথবা وَعْدُ الْمُتَّقُوْنَ আর عَلٰى رَبِّكَ হলো حال কেননা এটা وَعْدًا-এর সিফাত হয়েছে। আর مَسْئُوْلًا হলো وَعْدًا-এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন : ৫/৩৩৭-৩৩৮]

পারা : ১৯

২১. আর যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে, [আপনি যে নবী তা বলে দেওয়ার জন্য] ফেরেশতাগণ কেন আমাদের নিকট আসে না? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না কেন? [তিনি স্বয়ং বলে দেন যে, ইনি আমার রাসূল, তবে বিশ্বাস করব]; এরা মনে মনে নিজেদেরকে খুব বড় বলে মনে করে এবং সীমা হতে বহু দূরে চলে গেছে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ﴿٢١﴾

২২. যেদিন এরা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোনো আনন্দের বিষয় হবে না এবং তারা [আজাব দেখে ভয়ে] বলবে পানাহ, পানাহ।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾

২৩. আর আমি তাদের ঐ সমস্ত কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করব যা তারা করেছিল, তখন সেগুলোকে এরূপ করে দিব, যেমন উৎক্ষিপ্ত ধূলারাশি।

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾

২৪. সেদিন জান্নাতবাসীদের আবাসস্থলও খুব উত্তম হবে এবং বিশ্রামাগারও খুব উত্তম হবে।

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾

২৫. আর যেদিন আসমান বিদীর্ণ হয়ে একটি মেঘ বের হবে এবং বহুসংখ্যক ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হবে।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا আর যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার আশঙ্কা করে না তারা বলে لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ কেন আমাদের নিকট আসে না اَوْ نَرٰى رَبَّنَا অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না কেন لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ এরা মনে মনে নিজেদের খুব বড় বলে মনে করছে। وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا এবং সীমা হতে বহু দূরে চলে গেছে।

২২. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ যেদিন এরা ফেরেশতাদেরকে দেখবে لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ সেদিন অপরাধীদের জন্য কোনো আনন্দের বিষয় হবে না। وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا এবং তারা বলবে পানাহ, পানাহ।

২৩. وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ আর আমি তাদের ঐ সকল কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করব যা তারা করেছিল فَجَعَلْنٰهُ তখন সেগুলোকে এরূপ করে দিব। هَبَآءً مَّنْثُوْرًا যেমন উৎক্ষিপ্ত ধূলারাশি।

২৪. اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ জান্নাতবাসীদের يَوْمَئِذٍ সেদিন। خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا আবাসস্থলও খুব উত্তম হবে وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا এবং বিশ্রামাগারও খুব উত্তম হবে।

২৫. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ আর যেদিন আসমান বিদীর্ণ হয়ে একটি মেঘ বের হবে وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا এবং বহুসংখ্যক ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হবে।

২৬. সেদিন সত্যিকারের কর্তৃত্ব করুণাময় আল্লাহরই হবে এবং সেদিনটি কাফেরদের পক্ষে বড়ই কঠিন দিন হবে।	اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾
২৭. আর যেদিন অনাচারী ব্যক্তি [চরম দুঃখে] স্বীয় হস্তদ্বয় কামড়াতে থাকবে। [এবং] বলবে, কি উত্তম হতো, যদি আমি রাসূলের সাথে ধর্মের পথ অবলম্বন করতাম।	وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾
২৮. হায় আমার দুর্ভাগ্য! কি উত্তম হতো যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।	يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾
২৯. আমার নিকট উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা হতে প্রতারিত করেছে; আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।	لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ۚ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾
৩০. আর [সেদিন] রাসূল বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত করে রেখেছিল।	وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾
৩১. আর এরূপে আমি সৃষ্টি করেছি প্রত্যেক নবীর জন্যই অপরাধপরায়ণ লোকদের মধ্য হতে শত্রু; এবং পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট।	وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ সেদিন সত্যিকারের কর্তৃত্ব لِلرَّحْمٰنِ করুণাময় আল্লাহরই হবে। وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا এবং সেদিনটি কাফেরদের পক্ষে বড়ই কঠিন দিন হবে।

২৭. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ আর যেদিন অনাচারী ব্যক্তি স্বীয় হস্তদ্বয় কামড়াতে থাকবে يَقُوْلُ বলবে يٰلَيْتَنِى কি উত্তম হতো اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا যদি রাসূলের সাথে ধর্মের পথ অবলম্বন করতাম।

২৮. يٰوَيْلَتٰى হায় আমার দুর্ভাগ্য لَيْتَنِىْ কি উত্তম হতো لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

২৯. لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ সে আমাকে উপদেশ হতে প্রতারিত করেছে بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ আমার নিকট তা আসার পর وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।

৩০. وَقَالَ الرَّسُوْلُ রাসূল বললেন, يٰرَبِّ হে আমার প্রতিপালক اِنَّ قَوْمِى আমার সম্প্রদায় اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا এই কুরআনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত করে রেখেছিল।

৩১. وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا আর এরূপে আমি সৃষ্টি করেছি لِكُلِّ نَبِىٍّ প্রত্যেক নবীর জন্য عَدُوًّا শত্রু مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ অপরাধ পরায়ণ লোকদের মধ্য হতে وَكَفٰى بِرَبِّكَ এবং আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট هَادِيًا وَّنَصِيْرًا পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী রূপে।

৩২. আর কাফেররা এরূপ বলে যে, কেন নাজিল করা হয়নি তার প্রতি এ কুরআন একবারে? [উত্তর এই] এরূপে এজন্য [নাজিল করেছি] যে, এর দ্বারা আপনার অন্তরকে শক্তিশালী রাখি এবং আমি তাকে ক্রমে ক্রমে [২৩ বৎসরে] অবতীর্ণ করেছি।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا আর কাফেররা এরূপ বলে যে لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ কেন নাজিল করা হয়নি তার প্রতি এ কুরআন جُمْلَةً وَاحِدَةً একবারে? كَذَٰلِكَ এরূপে এজন্য (নাজিল করেছি) لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ এর দ্বারা আপনার অন্তরকে শক্তিশালী রাখি وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا এবং আমি তাকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا - ٢٧

শানে নুযূল : সুহাইল বলেন, উকবা বিন আবি মুআইত্, উমাইয়্যা বিন খালফ আল জুমাহী এর বন্ধু ছিল, মতান্তরে উবাই বিন খালফ উমাইয়্যার ভাই পরস্পর বন্ধু ছিল। উকবা অলিমার খানা প্রস্তুত করে কুরাইশ বংশের লোকজনদের দাওয়াত করল। সে রাসূল ﷺ-কে ও দাওয়াত করল। রাসূল ﷺ ইসলাম গ্রহণ না করলে দাওয়াতে যেতে অসম্মত জানালেন। কুরাইশদের একজন নেতৃস্থানীয় মানব তার খানা থেকে বিরত থাকবেন, তাও সে পছন্দ করেনি। সুতরাং সে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর রাসূল ﷺ তার দাওয়াতে এসে তার খাবার খান। পরক্ষণেই তার বন্ধু উমাইয়্যাহ বিন খালফ মতান্তরে উবাই বিন খালফ তাকে মন্দাচারী করল। তখন সে অনুপস্থিত ছিল। জবাবে উকবা বলল যে, আমার প্রস্তুত করা খাবারের মধ্যে কুরাইশের সম্ভ্রান্ত একজন লোক অনুপস্থিত থাকবে তা আমার নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হলো। তার বন্ধু তাকে বলল যে, যতক্ষণ না তুমি ফিরে আসবে এবং মুহাম্মদের চেহারায় থুথু দেবে আমি সন্তুষ্ট হবো না। তার বন্ধু তাকে যা বলল, পাপিষ্ঠ তাই করল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৭.১৩, দুররে মানছুর ৬৯/৫]

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম হাকেম ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেন, মুশরিকরা বলে যে, মুহাম্মদ নবী হওয়ার যেরূপভাবে ধারণা করছে, যদি নবীই হতো, তাহলে অল্প অল্প করে কুরআন নাজিল করে বার বার তাকে কষ্ট দিচ্ছে কেন? সমুদয় কুরআন মাজিদ তো এক সাথে অবতরণ করলেই পারত সুতরাং মুশরিকরা যা বলে ছিল আল্লাহর নবীকে তার জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[দুররে মানছুর-৭০/৫]

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ : رَجَا শব্দের সাধারণ অর্থ কোনো প্রিয় ও কাম্য বস্তুর আশা করা এবং কোনো সময় আশঙ্কা করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। –(কিতাবুল-আযদাদ -ইবনুল-আম্বারী) এখানে এ অর্থই অধিক স্পষ্ট। অর্থাৎ, যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অনর্থক মূর্খতাসুলভ প্রশ্ন ও ফরমায়েশ করার দুঃসাহস সেই করতে পারে, যে পরকালে মোটেই বিশ্বাসী নয়। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর পরকালের ভয় এত প্রবল থাকে যে, এ ধরনের প্রশ্ন করার ফুরসতই তারা পায় না। নব্যশিক্ষার প্রভাবে অনেক লোক ইসলাম ও তার বিধানাবলি সম্পর্কে আপত্তি ও তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। এটাও অন্তরে পরকালের সত্যিকার বিশ্বাস না থাকার আলামত। সত্যিকার বিশ্বাস থাকলে এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন অন্তরে দেখাই দিত না।

حِجْرًا مَّحْجُورًا حِجْرًا এর শাব্দিক অর্থ- সুরক্ষিত স্থান। مَّحْجُورًا -এর তাকীদ। আরবীর বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে বলা হয় : আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই। অর্থাৎ, আমাকে এই বিপদ থেকে আশ্রয় দাও : কিয়ামতের দিনেও যখন কাফেররা ফেরেশতাদেরকে আজাবের সাজ সরঞ্জাম আনতে দেখবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী একথা বলবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর অর্থ حَرَامًا مُّحَرَّمًا বর্ণিত আছে, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তারা ফেরেশতাদেরকে আজাবসহ দেখবে এবং তাদের কাছে ক্ষমা করার ও জান্নাতে যাওয়ার আবেদন করবে কিংবা অভিপ্রায় প্রকাশ করবে, তখন ফেরেশতারা জবাবে حِجْرًا مَّحْجُورًا বলবে। অর্থাৎ কাফেরদের জন্যে জান্নাত হারাম ও নিষিদ্ধ। –[মাযহারী]

خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيلًا : مُسْتَقَرٌّ শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র আবাসস্থল। مَقِيلٌ শব্দটি قَيْلُولَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করার স্থান। এখানে مَقِيلٌ -এর উল্লেখ সম্ভবতঃ এ কারণেও বিশেষভাবে করা হয়েছে যে, এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দুপুরের সময় সৃষ্ট জীবের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দুপুরে নিদ্রার সময় জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। –[কুরতুবী]

تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ: এখানে بِالْغَمَامِ এর অর্থ عَنِ الْغَمَامِ অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে একটি হালকা মেঘমালা নিচে নামবে, যাতে ফেরেশতারা থাকবে। এই মেঘমালা চাঁদোয়ার আকারে আকাশ থেকে আসবে এবং এতে আল্লাহ তা'আলার দ্যুতি থাকবে, আশেপাশে থাকবে ফেরেশতাদের দল। এটা হবে হিসাব নিকাশ শুরু হওয়ার সময়। তখন কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিদারণ নয়, যা শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য হবে। কেননা, আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেবার পর হবে। তখন আকাশও পৃথিবী পুনরায় বহাল হয়ে যাবে। –[বয়ানুল কুরআন]

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا : এই আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার ফলে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এর বিধান ব্যাপক। ঘটনাটি এই : ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত মক্কার অন্যতম মুশরিক সর্দার ছিল। সে কোনো সফর থেকে ফিরে আসলে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করত এবং প্রায়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথেও সাক্ষাৎ করত। একবার নিয়ম অনুযায়ী সে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেও আমন্ত্রণ জানাল। সে তাঁর সামনে খানা উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না, যে পর্যন্ত তুমি সাক্ষ্য না দাও যে, আল্লাহ এক, ইবাদতে তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। ওকবা এই কালেমা উচ্চারণ করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ শর্ত অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন।

উবাই ইবনে খালফ ছিল ওকবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে যখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগান্বিত হলো। ওকবা ওজর পেশ করল যে, কুরাইশ বংশের সম্মানিত অতিথি মুহাম্মদ ﷺ আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হতো। তাই আমি তাঁকে মনোরঞ্জনের জন্য এই কালেমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল : আমি তোমার এই ওজর কবুল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ না করবে। হতভাগ্য ওকবা বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সম্মত হলো এবং তদ্রূপ করেও ফেলল। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে উভয়কে লাঞ্ছিত করেছেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। (বগভী) আয়াতে তাদের পরকালীন শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তি সামনে দেখে তারা পরিতাপ সহকারে হস্তদ্বয় দংশন করবে এবং বলবে : হায় আমি যদি অমুককে অর্থাৎ উবাই ইবনে খালফকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! –[মাযহারী, কুরতুবী]

দুষ্কর্মপরায়ণ ও ধর্মদ্রোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন অনুতাপ ও দুঃখের কারণ হবে : তাফসীরে-মাযহারীতে আছে, আয়াতটি যদিও বিশেষভাবে ওকবার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য সম্ভবত আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে فُلَانًا (অমুক) শব্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে সম্মিলিত হয় এবং শরিয়ত বিরোধী কার্যাবলিতে একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কিয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কান্নাকাটি করবে। মুসনাদে-আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.)-এর জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেন : لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ مَالَكَ إِلَّا تَقِيٌّ কোনো অমুসলিমকে সঙ্গী করো না এবং তোমার ধন-সম্পদ (বন্ধুত্বের দিক দিয়ে) যেন পরহেজগার ব্যক্তিই খায় অর্থাৎ পরহেজগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর জবানী রেওয়ায়েতে রাসূল ﷺ বলেন : اَلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ প্রত্যেক মানুষ (অভ্যাসগতভাবে) বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন অবলম্বন করে। তাই কিরূপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত। -[বুখারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমাদের মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কার উত্তম? তিনি বললেন, مَنْ ذَكَّرَكُمْ بِاللّٰهِ رُؤْيَتُهُ وَزَادَ فِيْ عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ ـ وَذَكَّرَكُمْ بِالْاٰخِرَةِ عَمَلُهُ অর্থাৎ যাকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যার কথাবার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কাজ দেখে পরকালের স্মৃতি তাজা হয়। -[কুরতুবী]

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় এই কুরআন পরিত্যাগ করেছে। আল্লাহর দরবারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই অভিযোগ কিয়ামতের দিন হবে, না দুনিয়াতেই এই অভিযোগ করেছে, এ ব্যাপার তাফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত আছে যে, তিনি দুনিয়াতেই এই অভিযোগ পেশ করেছেন এবং জওয়াবে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ অর্থাৎ আপনার শত্রুরা কুরআন অমান্য করলে তজ্জন্যে আপনার সবর করা উচিত। কেননা এটাই আল্লাহর চিরন্তন রীতি যে, প্রত্যেক নবীর কিছুসংখ্যক অপরাধী শত্রু থাকে এবং পয়গম্বরগণ তজ্জন্যে সবর করেছেন।

কুরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ : কুরআনকে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কুরআনকে অস্বীকার করা, যা কাফেরদের-ই কাজ। কিন্তু কোনো রেওয়ায়েত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কুরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমতো তেলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সেও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّقَ مُصْحَفَهُ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ وَلَمْ يَنْظُرْ فِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِهِ يَقُوْلُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ اِنَّ عَبْدَكَ هٰذَا اتَّخَذَنِيْ مَهْجُوْرًا فَاقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ

যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে, কিন্তু এরপর তাকে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে, রীতিমতো তেলাওয়াতও করে না এবং তার বিধানাবলিও পালন করে না, কিয়ামতের দিন সে গলায় কুরআন ঝুলন্ত অবস্থায় উপস্থিত হবে। কুরআন আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে বলবে, আপনার এই বান্দা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার ব্যাপারে ফয়সালা দিন-[কুরতুবী]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً الخ

সূরার শুরু থেকে কাফের মুশরিকদের আপত্তিসমূহের জওয়াব দেওয়া হচ্ছিল, এটা সেই পরম্পরারই অংশ। আপত্তির জওয়াবে কুরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক তাৎপর্য এই বর্ণিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আপনার অন্তরকে মজবুত রাখা উদ্দেশ্য। পর্যায়ক্রমে অবতারণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তর মজবুত হওয়ার বিবিধ কারণ আছে। প্রথম, এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়ে গেছে। একটি বৃহদাকার গ্রন্থ এক দফায় নাজিল হয়ে গেলে এই সহজসাধ্যতা থাকত না। সহজে মুখস্থ হতে থাকার ফলে অন্তরে কোনোরূপ পেরেশানি থাকে না। দ্বিতীয়ত : কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি অথবা তাঁর সাথে কোনো অশালীন ব্যবহার করত, তখনই তাঁর সান্ত্বনার জন্যে কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। সমগ্র কুরআন এক দফায় নাজিল হলে সেই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত সান্ত্বনা বাণী কুরআন থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং মস্তিষ্ক সেদিকে ধাবিত হওয়াও স্বভাবত : জরুরি ছিল না। তৃতীয়ত : আল্লাহ সঙ্গে আছেন, এই অনুভূতিই অন্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহর পয়গাম আগমন করা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ সঙ্গে আছেন। পর্যায়ক্রমে নাজিল হওয়ার রহস্য এ তিনের মধ্যেই সীমিত নয়, আরও অনেক রহস্য রয়েছে। তন্মধ্যে কতক সূরা বনী ইসরাঈলের وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ আয়াতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। -[বয়ানুল কুরআন]

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا يَرْجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجَاءٌ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা কামনা করে না।

عَتَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَتُوُّ মূলবর্ণ (ع ـ ت ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা সীমা হতে চলে গেছে।

يَرَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– এরা দেখবে।

مَنْثُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ বাব نَصَرَ মাসদার نَثْرٌ মূলবর্ণ (ن ـ ث ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– উৎক্ষিপ্ত।

مُسْتَقَرًّا : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِقْرَارٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আবাসস্থল, অবস্থান করা।

تَشَقَّقُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَشَقُّقٌ মূলবর্ণ (ش ـ ق ـ ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিদীর্ণ হয়ে বের হবে। ফেঁটে যাবে।

يَعَضُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার عَضٌّ মূলবর্ণ (ع ـ ض ـ ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে কামড়াতে থাকবে।

لَمْ اَتَّخِذْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ نفى حجد بلم در فعل مستقبل معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز الفاء অর্থ– আমি গ্রহণ না করতাম।

مَهْجُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ বাব نَصَرَ মাসদার هَجْرٌ মূলবর্ণ (ه ـ ج ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাক্ত।

لِنُثَبِّتَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيل মাসদার تَثْبِيْتٌ মূলবর্ণ (ث ـ ب ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– এজন্য যে, আমি শক্তিশালী রাখি।

رَتَّلْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيل মাসদার تَرْتِيْلٌ মূলবর্ণ (ر ـ ت ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– আমি তাকে অবতীর্ণ করেছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا : এখানে اَلْمُلْكُ মুবতাদা يَوْمَئِذٍ (ظرف) তার সাথে متعلق আর اَلْحَقُّ হলো اَلْمُلْكُ -এর সিফাত لِلرَّحْمٰنِ হলো মুবতাদার খবর। আর وَكَانَ -এর واو টি استنافية আর كَانَ হলে ফে'লে নাকেস তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর হলো তার ইসম। আর يَوْمًا হলো তার খবর। আর عَلَى الْكَافِرِيْنَ টা عَسِيْرًا -এর সাথে متعلق مقدم হয়েছে। আর عَسِيْرًا টা সিফাত হয়েছে يَوْمَ -এর।

–[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭]

৩৩. তারা যত বিস্ময়কর প্রশ্নই আপনার নিকট উপস্থাপিত করুক না কেন, আমি আপনাকে [তার] সঠিক এবং সুবোধ্য বর্ণনাভঙ্গিতে উৎকৃষ্ট উত্তর বলে দেই।	وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾
৩৪. এরাই তারা যাদেরকে তাদের মুখের উপর ভর করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা আবাসস্থলেও নিকৃষ্টতর এবং মতবাদেও অতিশয় বিভ্রান্ত।	ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُو۟لَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾
৩৫. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছিলাম এবং আমি তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারূনকে সাহায্যকারী করেছিলাম।	وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾
৩৬. অতঃপর আমি [উভয়কে] নির্দেশ দিলাম, তোমরা সে সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা আমার প্রমাণসমূহকে মিথ্যা বলেছে; ফলে আমি তাদেরকে একেবারেই ধ্বংস করে দিলাম।	فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا فَدَمَّرْنَٰهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾
৩৭. আর নূহের সম্প্রদায়কেও [ধ্বংস করেছি], যখন তারা নবীদের প্রতি অসত্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং আমি তাদেরকে মানবমণ্ডলীর জন্য একটি নিদর্শন করে দিলাম। আর আমি [সে] অনাচারীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا۟ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَٰهُمْ وَجَعَلْنَٰهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ তারা যত বিস্ময়কর প্রশ্নই আপনার নিকট উপস্থাপিত করুক না কেন إِلَّا جِئْنَٰكَ আমি আপনাকে বলে দেই। بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا সঠিক এবং সুবোধ্য বর্ণনা ভঙ্গিতে উৎকৃষ্ট উত্তর।

৩৪. ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ এরাই তারা যাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ তাদের মুখের উপর ভর করিয়ে إِلَىٰ جَهَنَّمَ দোজখের দিকে أُو۟لَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا তারা আবাসস্থলে নিকৃষ্টতর وَأَضَلُّ سَبِيلًا এবং মতবাদেও অতিশয় বিভ্রান্ত

৩৫. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছিলাম وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ এবং আমি তাঁর সাথে করেছিলাম أَخَاهُ هَٰرُونَ তাঁর ভাই হারূনকে। وَزِيرًا সাহায্যকারী।

৩৬. فَقُلْنَا অতঃপর আমি নির্দেশ দিলাম ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا যারা আমার প্রমাণসমূহকে মিথ্যা বলেছে। فَدَمَّرْنَٰهُمْ تَدْمِيرًا ফলে আমি তাদেরকে একেবারেই ধ্বংস করে দিলাম।

৩৭. وَقَوْمَ نُوحٍ আর নূহের সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছি لَّمَّا كَذَّبُوا۟ ٱلرُّسُلَ। যখন তারা নবীদের প্রতি অসত্যারোপ করল أَغْرَقْنَٰهُمْ তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম وَجَعَلْنَٰهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً এবং আমি তাদেরকে মানবমণ্ডলীর জন্য একটি নিদর্শন করে দিলাম وَأَعْتَدْنَا আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি لِلظَّٰلِمِينَ অনাচারীদের জন্য عَذَابًا أَلِيمًا যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

অনুবাদ	আয়াত
৩৮. আর আমি আ'দ ও সামূদ ও আসহাবে রাস্‌স এবং তাদের পার্শ্ববর্তী বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি।	وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۟ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا ۢ بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٨﴾
৩৯. এবং আমি প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেছি, এবং আমি সকলকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছি।	وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۫ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿٣٩﴾
৪০. আর তারা সে জনপদ অতিক্রম করেছে যার উপর শোচনীয়ভাবে অকল্যাণের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল; তবে কি তারা তা দেখতেছে না? বরং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকেই সম্ভব বলে মনে করে না।	وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْۤ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؕ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ﴿٤٠﴾
৪১. আর যখন তারা আপনাকে দেখতে পায়, তখন তারা কেবল আপনাকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে শুরু করে। ইনিই কি তিনি– যাকে আল্লাহ তা'আলা রাসূল করে পাঠিয়েছেন?	وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿٤١﴾
৪২. এই ব্যক্তি তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের হতে বিভ্রান্ত করেই ফেলেছিল, যদি না আমরা তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতাম। আর সত্বরই তারা জানতে পারবে যখন আজাব স্বচক্ষে দর্শন করবে– কে পথভ্রষ্ট ছিল।	اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَاۤ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ؕ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. وَعَادًا وَثَمُوْدَ আর আমি ধ্বংস করেছি আ'দ ও সামূদ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ ও আসহাবে রাস্‌স। وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا এবং তাদের পার্শ্ববর্তী বহু সম্প্রদায়কে।

৩৯. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ এবং আমি প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেছি। وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا এবং আমি সকলকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছি।

৪০. وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ আর তারা সেই জনপদ অতিক্রম করেছে الَّتِيْ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ যার উপর শোচনীয়ভাবে অকল্যাণের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا তবে কি তারা তা দেখছেনা। بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ; বরং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকেই সম্ভব বলে মনে করে না।

৪১. وَاِذَا رَاَوْكَ আর যখন তারা আপনাকে দেখতে পায় اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا তখন তারা কেবল আপনাকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করে اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ইনিই কি তিনি– যাকে আল্লাহ তা'আলা রাসূল করে পাঠিয়েছেন।

৪২. اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا এই ব্যক্তি তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল لَوْلَا اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا যদি না আমরা তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতাম وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ আর সত্বরই তারা জানতে পারবে حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ যখন আজাব স্বচক্ষে দর্শন করবে مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا কে পথভ্রষ্ট ছিল।

৪৩. হে পয়গম্বর! আপনি কি সে ব্যক্তির অবস্থাও দেখেছেন, যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে স্বীয় উপাস্য করে রেখেছে; অতএব, আপনি কি তার তত্ত্বাবধান করতে পারেন?	أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾
৪৪. অথবা আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশই শুনে কিংবা উপলব্ধি করে? তারা তো নিছক চতুষ্পদ জন্তুর তুল্য, [কোনো কথা শুনেও না, বুঝেও না,] বরং তারা তাদের চেয়েও অধিক বিপথগামী।	أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. أَرَءَيْتَ হে পয়গম্বর! আপনি কি সে ব্যক্তির অবস্থাও দেখেছেন مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে স্বীয় উপাস্য করে রেখেছে أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا অতএব আপনি কি তার তত্ত্বাবধান করতে পারেন।

৪৪. أَمْ تَحْسَبُ অথবা আপনি কি মনে করেন যে, أَنَّ أَكْثَرَهُمْ তাদের অধিকাংশই يَسْمَعُونَ শ্রবণ করে أَوْ يَعْقِلُونَ কিংবা উপলব্ধি করে إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ এরা তো নিছক চতুষ্পদ জন্তুর তুল্য بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا বরং এরা তাদের চেয়েও অধিক বিপথগামী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا - ٤٣

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জাহেলিয়া যুগে এক লোক একটি সাদা পাথরের পূজা করে আসছিল দীর্ঘদিন যাবৎ। পরবর্তীতে তদপেক্ষাও সুন্দর মনোরম অপর একটি পাথর দেখতে পেল, তখন তা ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় পাথরের পূজা করতে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[দুররে মানছুর- ৭২/৫]

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا : এতে ফেরাউন সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অথচ তখন পর্যন্ত তাওরাত মূসা (আ.) -এর প্রতি অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই এখানে তাওরাতের আয়াতকে মিথ্যারোপ করার অর্থ হতে পারে না; বরং এ আয়াতের অর্থ –হয় তাওহীদের প্রমাণাদি, যা প্রত্যেক মানুষ নিজ বুদ্ধি-জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারে, এগুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা না করাকেই মিথ্যারোপ করা বলা হয়েছে, না হয় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ঐতিহ্য, যা কিছু না কিছু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে, মিথ্যারোপ দ্বারা সেসব ঐতিহ্যের অস্বীকৃতি বোঝানো হয়েছে। যেমন কুরআন পাকের وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শিক্ষা তাদের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে। –[বয়ানুল কুরআন]

নূহের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। অথচ তাদের যুগের পূর্বে কোনো রাসূল ছিলেন না এবং তারাও কোনো রাসূলকে মিথ্যারোপ করেনি। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হযরত নূহ (আ.)-কে প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ধর্মের মূলনীতি সব পয়গম্বরেরই অভিন্ন, তাই একজনকে মিথ্যারোপ করা সবাইকে মিথ্যারোপ করার শামিল

وَاَصْحٰبُ الرَّسِّ : অভিধানে رَسّ শব্দের অর্থ কাঁচা কূপ। কুরআন পাক ও কোনো সহীহ হাদীসে তাদের বিস্তারিত অবস্থা উল্লিখিত হয়নি। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিভিন্নরূপ। অধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, তারা ছিল সামূদ গোত্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি এবং তারা কোনো একটি কূপের ধারে বাস করত। [কামূস, দুররে মনসূর] তাদের শাস্তি কি ছিল, তাও কুরআনে ও কোনো সহীহ্ হাদীসে বিবৃত হয়নি।–[বয়ানুল -কুরআন]

শরিয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসরণ এক প্রকার মূর্তিপূজা : اَرَئَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ এই আয়াতে ইসলাম ও শরিয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসারীকে প্রবৃত্তির পূজারী বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, শরিয়তবিরোধী প্রবৃত্তিও এক প্রকার মূর্তি যার পূজা করা হয়। তিনি এর প্রমাণ হিসেবে এই আয়াত তেলাওয়াত করেন। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُحْشَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার حَشْرٌ মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– যাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে।

دَمَّرْنَاهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَدْمِيْرٌ মূলবর্ণ (د - م - ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْتَادٌ মূলবর্ণ (ع - ت - د) জিনস صحيح অর্থ– আমি প্রস্তুত করে রেখেছি।

تَبَّرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَتْبِيْرٌ মূলবর্ণ (ت - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি বিধ্বস্ত করে দিয়েছি।

اُمْطِرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْطَارٌ মূলবর্ণ (م - ط - ر) জিনস صحيح অর্থ– বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল।

لَيُضِلُّنَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِضْلَالٌ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– এই ব্যক্তি তো আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে।

تَحْسَبُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব حَسِبَ ও سَمِعَ মাসদার حِسْبَانٌ মূলবর্ণ (ح - س - ب) জিনস صحيح অর্থ– আপনি মনে করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا : এখানে اِنْ টি হলো نافية আর هُمْ হলো মুবতাদা আর اِلَّا হলো اَدَاة حصر আর كَالْاَنْعَام হলো هُمْ এর খবর। بَلْ হলো حرف عطف আর هُمْ মুবতাদা اَضَلُّ হলো তার খবর এবং سَبِيْلًا হলো تمييز।

অনুবাদ	আয়াত
৪৫. আপনি কি আপনার প্রতিপালকের [কুদরতের] প্রতি লক্ষ্য করেননি যে, তিনি ছায়াকে কিরূপে বিস্তৃত করেছেন, আর যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তবে তাকে একই অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন। অনন্তর আমি সূর্যকে তার উপর নিদর্শন করেছি।	أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾
৪৬. অতঃপর আমি তাকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে সংকুচিত করেছি।	ثُمَّ قَبَضْنٰهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾
৪৭. আর তিনি এমন, যিনি রাতকে তোমাদের জন্য আবরণস্বরূপ এবং নিদ্রাকে বিশ্রামের উপকরণ করেছেন এবং দিবসকে বানিয়েছেন জীবিত হওয়ার সময়।	وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾
৪৮. আর তিনি এমন যিনি বায়ুপুঞ্জকে স্বীয় রহমতের [বৃষ্টির] পূর্বে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন, আর আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধকারী পানি বর্ষণ করি।	وَهُوَ الَّذِىٓ أَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾
৪৯. যেন তা দ্বারা মৃত [শুষ্ক] ভূমিকে সঞ্জীবিত করি, আর আমার সৃষ্ট জগতের বহু চতুষ্পদ জন্তুর ও অসংখ্য মানুষের পিপাসা নিবারণ করি।	لِّنُحْۦِىَ بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعٰمًا وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾
৫০. আর আমি সেই পানি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেই, যেন তারা ভেবে দেখে, পরন্তু অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞ না হয়ে রইল না।	وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৫. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ আপনি কি আপনার প্রতিপালকের (কুদরতের) প্রতি লক্ষ্য করেননি যে, كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ তিনি ছায়াকে কিরূপে বিস্তৃত করেছেন وَلَوْ شَآءَ, যদি তিনি ইচ্ছা করতেন لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا তবে তাকে একই অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ অনন্তর আমি সূর্যকে নির্ধারিত করেছি عَلَيْهِ دَلِيلًا তার উপর নিদর্শন।

৪৬. ثُمَّ قَبَضْنٰهُ অতঃপর আমি তাকে সংকুচিত করেছি إِلَيْنَا নিজের দিকে। قَبْضًا يَسِيرًا ধীরে ধীরে।

৪৭. وَهُوَ الَّذِى আর তিনি এমন جَعَلَ لَكُمُ যিনি তোমাদের জন্য করেছেন الَّيْلَ لِبَاسًا রাত্রিকে আবরণ স্বরূপ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا এবং নিদ্রাকে বিশ্রামের উপকরণ وَجَعَلَ النَّهَارَ, এবং দিবসকে বানিয়েছেন। نُشُورًا জীবিত হওয়ার সময়।

৪৮. وَهُوَ الَّذِىٓ আর তিনি এমন أَرْسَلَ الرِّيٰحَ বায়ুপুঞ্জকে প্রেরণ করেন بُشْرًا সুসংবাদবাহীরূপে بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ স্বীয় রহমতের (বৃষ্টির) পূর্বে وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ, আর আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি। مَآءً طَهُورًا বিশুদ্ধকারী পানি।

৪৯. لِّنُحْۦِىَ بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا যেন তা দ্বারা মৃত (শুষ্ক) ভূমিকে সঞ্জীবিত করি وَنُسْقِيَهُۥ আর পিপাসা নিবারণ করি مِمَّا خَلَقْنَآ আমার সৃষ্টিজগতের أَنْعٰمًا বহু চতুষ্পদ জন্তুর। وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًا ও অসংখ্য মানুষের।

৫০. وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ, আর আমি সেই পানি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেই। لِيَذَّكَّرُوا যেন তারা ভেবে দেখে فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا। পরন্তু অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞ না হয়ে রইল না।

৫১. আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে প্রত্যেক জনপদেই এক একজন সতর্ককারী [পয়গাম্বর] প্রেরণ করতাম।	وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ۝٥١
৫২. সুতরাং আপনি কাফেরদের আনন্দাদায়ক কাজ করবেন না। এবং কুরআন দ্বারা জোরে শোরে তাদের মোকাবিলা করুন।	فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۝٥٢
৫৩. আর তিনি এমন যিনি দুটি সাগরকে সম্মিলিত করেছেন, যাদের একটি তো মিষ্ট, শান্তিদায়ক আর অপরটি লবণাক্ত, তিক্ত এবং তাদের মধ্যস্থলে একটি পর্দা এবং শক্তিশালী অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন।	وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝٥٣
৫৪. আর তিনি এমন যিনি পানি [শুক্র] হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তাকে বংশগত সম্পর্কীয় এবং বৈবাহিক সম্পর্কীয় করেছেন; আর আপনার প্রতিপালকই বড় ক্ষমতাবান।	وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۝٥٤
৫৫. আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে ঐ পদার্থের উপাসনা করে যা তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোনো অপকারও করতে পারে না; আর কাফেররা তো হচ্ছে নিজ প্রতিপালকের বিরোধী।	وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ؕ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ۝٥٥

শাব্দিক অনুবাদ :

৫১. وَلَوْ شِئْنَا আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম لَبَعَثْنَا তবে প্রেরণ করতাম فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ প্রত্যেক জনপদেই نَذِيْرًا এক একজন সতর্ককারী [পয়গাম্বর]।

৫২. فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ সুতরাং আপনি কাফেরদের আনন্দদায়ক কাজ করবেন না وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ এবং কুরআনের দ্বারা তাদের মোকাবিলা করুন। جِهَادًا كَبِيْرًا জোরে শোরে।

৫৩. وَهُوَ الَّذِيْ আর তিনি এমন مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ যিনি দু'টি সাগরকে সম্মিলিত করেছেন هٰذَا عَذْبٌ যাদের একটি তো মিষ্টি فُرَاتٌ শান্তিদায়ক وَهٰذَا مِلْحٌ আর অপরটি লবণাক্ত اُجَاجٌ তিক্ত وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا, এবং তাদের মধ্যস্থলে সৃষ্টি করেছেন بَرْزَخًا একটি পর্দা وَحِجْرًا مَحْجُوْرًا এবং শক্তিশালী অন্তরায়।

৫৪. وَهُوَ الَّذِيْ আর তিনি এমন خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا যিনি পানি (শুক্র) হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন فَجَعَلَهٗ অনন্তর তাকে করেছেন نَسَبًا বংশগত সম্পর্কীয় وَصِهْرًا এবং বৈবাহিক সম্পর্কীয় وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا আর আপনার প্রতিপালকই বড় ক্ষমতাবান।

৫৫. وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর এরা আল্লাহকে ছেড়ে ঐ সমস্ত পদার্থের উপাসনা করে مَا لَا يَنْفَعُهُمْ যা তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না وَلَا يَضُرُّهُمْ এবং তাদের কোনো অপকারও করতে পারেনা وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا আর কাফেররা তো হচ্ছে নিজ প্রতিপালকের বিরোধী।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٥٦﴾	৫৬. আর আমি আপনাকে শুধু এজন্য পাঠিয়েছি যে, সুসংবাদ শুনান এবং ভয় প্রদর্শন করেন।
قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٥٧﴾	৫৭. আপনি বলে দিন যে, আমি তার [এই তাবলীগের] জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না, হ্যাঁ, [তবে আমি এটা চাই যে,] যে কেউ এরূপ ইচ্ছা করে যে, সে তার প্রতিপালক পর্যন্ত [পৌছবার] পথ অবলম্বন করে নেয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৬. وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا, আর আমি আপনাকে শুধু এজন্য পাঠিয়েছি যে, مُبَشِّرًا সুসংবাদ শুনান। وَّنَذِيْرًا এবং ভয় প্রদর্শন করেন।

৫৭. قُلْ আপনি বলে দিন যে, مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ আমি তার জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাইনা اِلَّا مَنْ شَآءَ হ্যাঁ, (তবে আমি এটা চাই যে) যে কেউ এরূপ ইচ্ছা করে যে, اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا সে তার প্রতিপালক পর্যন্ত পৌছবার পথ অবলম্বন করে নেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলীর সম্পর্ক এবং সবগুলোই আল্লাহর কুদরতের অধীন : উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বান্দার প্রতি তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও প্রমাণিত হয়।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ : রৌদ্র ও ছায়া দু'টি এমন নিয়ামত, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ-কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রৌদ্রই রৌদ্র থাকলে মানুষ ও জীব জন্তুর জন্যে যে কি ভীষণ বিপদ হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিন্নরূপ নয়। সর্বদা ও সর্বত্র কেবল ছায়া থাকলে রৌদ্র না আসলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না এবং অন্যান্য হাজারো কাজ এতে বিঘ্নিত হবে। আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা এই নিয়ামত দুটি সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্য আরাম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞানও প্রজ্ঞা দ্বারা দুনিয়ার সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অস্তিত্ব লাভ করে, তখন এই বস্তুসমূহও অস্তিত্ব লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বস্তুও অনুপস্থিত থাকে। কারণ শক্তিশালী কিংবা বেশি হলে ঘটনার অস্তিত্বও শাক্তিশালী ও বেশি হয়ে যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ মাটি, পানি ও বায়ুকে, আলোর কারণ চন্দ্র সূর্যকে এবং বৃষ্টির কারণ মেঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তার প্রভাবাদির মধ্যে এমন অটুটও শক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারো বছর ধরে তাতে বিন্দুমাত্র তফাৎ দেখা দেয়নি। সূর্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্ট দিবারাত্রি ও রৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন অটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যে, শত শত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক মিনিট বরং এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র সূর্য ইত্যাদির যন্ত্রপাতিতে কখনও দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোর সংস্কার ও মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে গতিশীল রয়েছে। অঙ্ক কষে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেওয়া হয়।

কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত এবং তাঁর অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ। ব্যবস্থাপনার এই দক্ষতাই মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কারণাদিই রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভু মনে করতে শুরু করেছে। আসল শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত হয়ে গেছেন। তাই পয়গম্বরগণ ও আল্লাহর কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য উর্ধ্বে তোল এবং তীক্ষ্ণ কর। প্রকৃত কারণাদির যবনিকার

অন্তরালে যিনি এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাঁকে দেখলেই স্বরূপ উদঘাটিত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে। اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ আয়াতে গাফেল মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ দেখে সকালে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে লম্বমান থাকে, এরপর আস্তে আস্তে হ্রাস পেয়ে দুপুরে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিতপ্রায় হয়ে যায়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আস্তে আস্তে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং স্বচক্ষে দেখে যে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, ঊর্ধ্বে গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অপরিহার্য পরিণতি ও ফল। কিন্তু সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে রাখার কাজটি কে করেছে, এটা চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না। এর জন্যে অন্তশ্চক্ষু ও দিব্যদৃষ্টি দরকার।

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে এই অন্তশ্চক্ষু দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার হ্রাস বৃদ্ধি যদিও তোমাদের দৃষ্টিতে সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু একথাও চিন্তা কর যে, সূর্যকে এমন অত্যুজ্জ্বল করে কে সৃষ্টি করল এবং তার গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে কে কায়েম রাখল? যাঁর সর্বময় ক্ষমতা এগুলো করেছে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই রৌদ্র -ছায়ার নিয়ামত দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে রৌদ্র- ছায়াকে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন। যেখানে রৌদ্র, সেখানে সর্বদা রৌদ্র থাকত এবং যেখানে ছায়া, সেখানে সর্বদাই ছায়া থাকত। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি এরূপ করেননি। وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا এর অর্থ তাই।

মানুষকে এই স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করার জন্যে ছায়ার প্রত্যাবর্তনও হ্রাস পাওয়াকে আলোচ্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে : قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا অর্থাৎ, অতঃপর ছায়াকে আমি নিজের দিকে গুটিয়ে নেই। বলাবাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা শরীর, শারীরিক বিষয় এবং দিকের উর্ধ্বে। তাঁর দিকে ছায়া সংকুচিত হওয়ার অর্থ এটাই যে, তাঁর সর্বময় ক্ষমতার দ্বারাই এসব কাজ হয়।

রাত্রিকে নিদ্রার এবং দিনকে কর্মব্যস্ততার জন্যে নির্ধারণের রহস্য :

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا

আয়াতে রাত্রিকে 'লেবাস' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেন মানব-দেহকে আবৃত করে, রাত্রিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্ট- জগতের উপর ফেলে দেয়া হয়। سُبَاتًا শব্দটি سَبْتٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিন্ন করা। سُبَاتًا এমন বস্তু, যা দ্বারা অন্য বস্তুকে ছিন্ন করা হয়।

নিদ্রাকে আল্লাহ তা'আলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারাদিনের ক্লান্তি ও শান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই سُبَاتٌ এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ।

এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথম নিদ্রা যে, আরাম, বরং আরামের প্রাণ তা সবাই জানে, কিন্তু আলোর মধ্যে নিদ্রা আসা স্বভাবতঃই কঠিন হয়। নিদ্রা এলেও দ্রুত চক্ষু খুলে যায়। আল্লাহ তা'আলা নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্নও করেছেন এবং শীতলও করেছেন। এমনিভাবে রাত্রি একটি নিয়ামত এবং নিদ্রা দ্বিতীয় নিয়ামত। তৃতীয় নিয়ামত এই যে, সারা বিশ্বের মানুষ জীবজন্তুর নিদ্রা একই সময় রাত্রে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা একজনের নিদ্রার সময় অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু লোক নিদ্রামগ্ন থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত ও হট্টগোলের কারণ হয়ে থাকত। এমনিভাবে যখন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত তখন যারা কাজ করত চলা ফেরা করত তারা তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের অনেক দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে। এর ফলে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাও গুরুতররূপে বিঘ্নিত হতো। কারণ, যে ব্যক্তির সাথে আপনার কাজ; তখন তার নিদ্রার সময় এবং যখন তার জাগরণের সময় হবে, তখন আপনার নিদ্রার সময় এসে যাবে।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যদি কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি হতো যে, সবাইকে নিদ্রার জন্য একই সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমতঃ এরূপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকি করার জন্য হাজারো বিভাগ খুলতে হতো। এতদসত্ত্বেও সাধারণ আইনগত ও চুক্তিগত পদ্ধতিতে স্থিরকৃত বিষয়াদিতে ঘুষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে, যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হতো। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর এ সময়েই নিদ্রা আসে। কখনও কোনো প্রয়োজনে জাগ্রত থাকতে হলে এর জন্যে আয়াস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا বাক্যে দিনকে نُشُوْرٌ অর্থাৎ জীবন বলা হয়েছে। কেননা এর বিপরীত অর্থাৎ নিদ্রা এক প্রকার মৃত্যু এই জীবনের সময়কে ও সমগ্র মানব মণ্ডলীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে এক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা কিছু কারখানাও দোকান দিনে বন্ধ থাকত, রাত্রে খুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বন্ধ হয়ে যেত। ফলে উভয়েই ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হতো।

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে নির্দিষ্ট করে আল্লাহ তা'আলা যেমন একটি বড় অনুগ্রহ করেছেন, তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারস্পরিক অভিন্ন প্রয়োজনের জন্যও এমনি এক ও অভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উদাহরণতঃ সকাল-সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও আহারের প্রয়োজন একটি অভিন্ন বিষয়। এসব সময়ে সবাই এর চিন্তা করে। ফলে প্রত্যেকের জন্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে যায়। হোটেল ও রেস্তোরাঁয় এসব সময়ে খাদ্যদ্রব্যে ভরপুর হয়ে উঠে। প্রত্যেক গৃহে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার জন্যে এসব সময় নির্দিষ্টকরণের এই নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا : طَهُوْرٌ শব্দটি আরবি ভাষায় অতিশায়ার্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এমন জিনিসকে طَهُوْرٌ বলা হয়, যা নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তা দ্বারা পবিত্র করা যায়। আল্লাহ তা'আলা পানিকে এই বিশেষ গুণ দান করেছেন যে, সে নিজেও পবিত্র এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার অপবিত্রতাকে ও দূর করা যায়। সাধারণত আকাশ থেকে কোনো সময় বৃষ্টির আকারে এবং কোনো সময় বরফ ও শিলার আকারে পতিত পানিই মানুষ ব্যবহার করে। অতঃপর এই পানিই পাহাড়-পর্বতের শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ লাইনের আকারে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পানি কোথাও আপনা-আপনি ঝরণার আকারে নির্গত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে কূপের আকারে বের করা হয়। সব পানিই নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিত্রকারী। কুরআন, সুন্নাহ, ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা এর প্রমাণ।

পর্যাপ্ত পানি- যেমন পুকুর হাউস ও নহরের পানিতে কোনো অপবিত্রতা পতিত হলেও তা অপবিত্র হয় না। এ ব্যাপারেও সবাই একমত, যদি তাতে অপবিত্রতার চিহ্ন প্রকাশ না পায় এবং রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত না হয়। কিন্তু অল্প পানিতে অপবিত্রতা পতিত হলে তা অপবিত্র হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনিভাবে পর্যাপ্ত ও অল্প পানির পরিমাণ নির্ধারণেও বিভিন্নরূপ উক্তি আছে। তাফসীর মাযহারী ও কুরতুবীতে এ স্থলে পানি সম্পর্কিত সমস্ত মাস'আলা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। ফিকাহর সাধারণ কিতাবাদিতেও এসব মাস'আলা উল্লিখিত আছে। তাই এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا : اَنَاسِيَّ শব্দটি اِنْسِيٌّ -এর বহুবচন এবং কেউ কেউ বলেন, اِنْسَانٌ -এর বহুবচন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীবজন্তু ও অনেক মানুষেরও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, জীবজন্তু যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এতদসত্ত্বেও আয়াতে 'অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি, বলার কারণ কি? এতে বোঝা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত আছে। উত্তর এই যে, এখানে 'অনেক মানুষ' বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা সাধারণতঃ বৃষ্টির পানির উপর ভরসা করেই জীবন অতিবাহিত করে। নগরের অধিবাসীরা তো নহরের কিনারায় কূপের ধারে-কাছেই বসবাস করে। ফলে বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ : আয়াতের বক্তব্য এই যে, আমি বৃষ্টিকে মানুষের মাঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি; কোনো সময় এক জনপদে এবং কোনো সময় অন্য জনপদে বর্ষণ করি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রায়ই মানুষের মধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ বছর বৃষ্টি বেশি, এ বছর কম। এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে সঠিক নয়; বরং বৃষ্টির পানি প্রতিবছর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একই রূপে অবতীর্ণ হয়; তবে আল্লাহর নির্দেশে এর পরিমাণ কোনো জনপদে বেশি করে দেওয়া হয় এবং কোনো জনপদে কম করে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ্রাস করে কোনো জনপদের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেওয়া ও হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টি ও আজাব হয়ে যায়। যে পানি আল্লাহর বিশেষ রহমত, তাকেই অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানদের জন্যে আজাবও শাস্তি করে দেওয়া হয়।

কুরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ : وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا -এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। তখন পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের বিধি- অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জেহাদকে بِهٖ অর্থাৎ, কুরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের সাথে বড় জিহাদ করুন। কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থ তার বিধি–বিধান বিধান প্রচার করা এবং কুরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সর্বদা সর্বাত্মক চেষ্টা করা, মুখে হোক, কলমের সাহায্যে হোক কিংবা অন্য কোনো পন্থায় হোক- এখানে সবগুলোকেই বড় জিহাদ বলা হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا : مَرَجَ শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া। এ কারণেই চারণভূমিকে مَرَجَ বলা হয়। সেখানে জন্তু জানোয়ার স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ঘাস খায়। عَذْبٌ মিঠা পানিকে বলা হয় فُرَاتٌ-এর অর্থ সুপেয় مِلْحٌ এর অর্থ লোনা এবং اُجَاجٌ এর অর্থ তিক্ত বিস্বাদ। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। (এক) সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়। গোটা পৃথিবী এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক -চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানবসমাজ বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশতঃ তীব্র লোনা ও বিস্বাদ। পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝরণা, নদ-নদী নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। এগুলোর পানি সবই মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের তৃষ্ণা নিবারণে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ আ'আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থল ভাগের চাইতে অনেক বেশি সামুদ্রিক জন্তু জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পঁচে এবং সেখনেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হতো, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন ধারণ করা দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে এক তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী সে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে তারাও পচতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমতঃ এই নিয়ামত ও অনুগ্রহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজন কথা বিবেচনা করে আল্লাহ তা'আলা দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত : এ সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী অথবা নহর সমুদ্রে পতিত হয় এবং মিঠা ও লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, কিন্তু পরস্পর মিশ্রিত হয় না, অথচ উভয়ের মাঝখানে কোনো অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا : পিতা-মাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয়, তাকে نَسَبٌ বলা হয় এবং স্ত্রীর তরফ থেকে যে, আত্মীয়তা হয়, তাকে صِهْر বলা হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্যে এগুলো অপরিহার্য। কারণ একা মানুষ কোনো কাজই করতে পারে না।

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেই, আল্লাহ তা'আলার বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্যে চেষ্টা করি। এতে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোনো পুরস্কার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া আমার কোনো উপকারও নেই যে, যার মন চায়, সে আল্লাহর পথ অবলম্বন করবে। বলাবহুল্য, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে আসলে উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা পয়গম্বরসুলভ স্নেহ-মমতার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের উপকার মনে করি। এর উদাহরণ যেমন, কোনো বৃদ্ধ দুর্বল পিতা তার সন্তানকে বলে, তুমি খাও, পান করো ও সুখে থাক- এটাই আমার খাওয়া, পান করা ও সুখে থাকা। একে নিজের উপকার বলার কারণ এরূপও হতে হয়েছে যে, এর ছওয়াব তিনিও পাবেন, যেমন সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ মোতাবেক সৎকাজ করে, এই সৎকাজের ছওয়াব কর্মী নিজেও পুরোপুরি পাবে এবং যে নির্দেশ দেয় সে-ও পাবে। –[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

لِنُحْيِيَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْيَاءٌ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– যেন আমি সঞ্জীবিত করি।

نُسْقِيَهٗ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْقَاءٌ মূলবর্ণ (س ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি পিপাসা নিবারণ করি।

لِيَذَّكَّرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَذَكُّرٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– যেন তারা ভেবে দেখে।

فَاَبٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اِبَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ب ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– পরন্তু তারা অস্বীকার করল।

شِئْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ– আমি ইচ্ছা করতাম।

لَبَعَثْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার بَعْثٌ মূলবর্ণ (ب ـ ع ـ ث) জিনস صحيح অর্থ– তবে প্রেরণ করতাম।

لَا تُطِعْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– আপনি আনন্দদায়ক কাজ করবেন না, আপনি অনুসরণ করবেন না।

جَاهِدْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُجَاهَدَةٌ মূলবর্ণ (ج ـ ه ـ د) জিনস صحيح অর্থ– আপনি মোকাবিলা করুন।

مَرَجَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَرْجٌ মূলবর্ণ (م ـ ر ـ ج) জিনস صحيح অর্থ– তিনি সম্মিলিত করেছেন।

لَا يَضُرُّهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার ضَرٌّ মূলবর্ণ (ض ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদের কোনো অপকারও করতে পারে না।

مُبَشِّرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيل মাসদার تَبْشِيْرٌ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সুসংবাদ শুনান। সুসংবাদ দাতা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ: এখানে واو টি হলো استئنافيه আর يَعْبُدُوْنَ বাক্যটি مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ হলো حال আর مَا হলো মাফউলে বিহী আর لَا يَنْفَعُهُمْ বাক্যটি হলো مَا মওসূলের সেলাহ আর لَا يَضُرُّهُمْ টা يَنْفَعُهُمْ -এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন]

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ۚ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۚ ۝٥٨

৫৮. এবং নির্ভর করুন সেই চিরঞ্জীব সত্তার প্রতি– যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ ও প্রশংসা বর্ণনায় রত থাকুন। এবং তিনি নিজ বান্দাদের পাপসমূহ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত আছেন।

الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ۝٥٩

৫৯. তিনি এমন যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর [তার মহিমা উপযোগীরূপে] কায়েম হলেন, তিনি অতিশয় দয়ালু। অতএব, তাঁর মহিমা সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ ۚ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۩ ۝٦٠

৬০. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, রহমানকে সেজদা কর, তখন তারা [মূর্খতা ও বিরোধিতাবশত] বলে, রহমান কি জিনিস? আমরা কি তাকেই সেজদা করব যাকে সেজদা করার জন্য তুমি আমাদেরকে বলবে? এবং এতে তাদের ঘৃণা আরো বর্ধিত হয়।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ۝٦١

৬১. তিনি মহিমান্বিত যিনি আসমানে বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রমালা সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে একটি প্রদীপ [সূর্য] এবং আলোকময় চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۝٦٢

৬২. আর তিনি এমন সত্তা যিনি রাত্রি এবং দিবসকে একে অন্যের পশ্চাতে গমনাগমনকারী করে বানিয়েছেন সে ব্যক্তির জন্য যে বুঝতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. وَتَوَكَّلْ এবং নির্ভর করুন عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ সেই চিরঞ্জীব সত্তার প্রতি لَا يَمُوْتُ যাঁর মৃত্যু নেই। وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ ও প্রশংসা বর্ণনায় রত থাকুন। وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا এবং তিনি নিজ বান্দাগণের পাপসমূহ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত আছেন।

৫৯. الَّذِيْ خَلَقَ তিনি এমন যিনি সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিনকে وَمَا بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ছয়দিনে ثُمَّ اسْتَوٰى অতঃপর কায়েম হলে عَلَى الْعَرْشِ আরশের উপর اَلرَّحْمٰنُ তিনি অতিশয় দয়ালু। فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا অতএব তাঁর মহিমা সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত।

৬০. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ আর যখন তাদেরকে বলা হয় اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ রহমানকে সিজদা কর। قَالُوْا তখন তারা বলে وَمَا الرَّحْمٰنُ রহমান কি জিনিস? نَسْجُدُ আমরা কি তাকেই সেজদা করব لِمَا تَأْمُرُنَا যাকে সেজদা করার জন্য তুমি আমাদেরকে বলবে। وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا এবং এতে তাদের ঘৃণা আরো বর্ধিত হয়।

৬১. تَبٰرَكَ তিনি মহিমান্বিত الَّذِيْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ যিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন بُرُوْجًا বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রমালা وَجَعَلَ فِيْهَا এবং তাতে সৃষ্টি করেছেন سِرٰجًا একটি প্রদীপ (সূর্য) وَقَمَرًا مُّنِيْرًا এবং আলোকময় চন্দ্র।

৬২. وَهُوَ الَّذِيْ আর তিনি এমন সত্তা جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ যিনি রাত্রি এবং দিবসকে বানিয়েছেন خِلْفَةً একে অন্যের পশ্চাতে গমনাগমনকারী لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ সেই ব্যক্তির জন্য যে বুঝতে চায়। اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا অথবা শোকর করতে ইচ্ছা করে।

৬৩. আর রহমানের বান্দা তারাই, যারা জমিনের উপর বিনীতভাবে চলাফেলা করে, আর যখন জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা শান্তি বজায় রেখে কথা বলে ।	وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾
৬৪. আর যারা রাত্রিকালে নিজ প্রতিপালকের সম্মুখে সেজদা ও কেয়াম অবস্থায় [নামাজে] মশগুল থাকে ।	وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾
৬৫. আর যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের রব! আমাদের হতে জাহান্নামের আজাব দূরে রাখুন, কেননা তার আজাব হচ্ছে একেবারে সর্বনাশকারী ।	وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾
৬৬. নিশ্চয়ই তা [জাহান্নাম] নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল এবং নিকৃষ্ট বাসস্থান ।	اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٦﴾
৬৭. আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয়ও করে না এবং কার্পণ্যও করে না এবং তাদের ব্যয় করা তার [অর্থাৎ কার্পণ্য ও অপব্যয়ের] মধ্যস্থ মাঝামাঝি পন্থা হয়ে থাকে ।	وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾
৬৮. আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মা'বুদের উপাসনা করে না এবং আল্লাহ যাকে [হত্যা করা] হারাম করেছেন তাকে হত্যা করে না শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতীত এবং তারা ব্যভিচার করে না, আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে, তবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে ।	وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ আর রহমানের বান্দা তারাই الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ যারা চলাফেরা করে عَلَى الْاَرْضِ জমিনের উপর هَوْنًا বিনীতভাবে وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ আর যখন জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলে قَالُوْا سَلٰمًا তখন তারা শান্তি বজায় রেখে কথা বলে ।

৬৪. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ আর যারা রাত্রিকালে মশগুল থাকে لِرَبِّهِمْ নিজ প্রতিপালকের সম্মুখে سُجَّدًا وَّقِيَامًا সেজদা ও কেয়াম অবস্থায় ।

৬৫. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ আর যারা প্রার্থনা করে رَبَّنَا হে আমাদের রব اصْرِفْ عَنَّا আমাদের থেকে দূরে রাখুন عَذَابَ جَهَنَّمَ দোজখের আজাব اِنَّ عَذَابَهَا কেননা তার আজাব হচ্ছে كَانَ غَرَامًا একেবারে সর্বনাশকারী ।

৬৬. اِنَّهَا নিশ্চয় ঐ দোজখ سَآءَتْ নিকৃষ্ট مُسْتَقَرًّا বিশ্রামস্থল وَّمُقَامًا এবং বাসস্থান ।

৬৭. وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا আর যখন তারা ব্যয় করে لَمْ يُسْرِفُوْا তখন অপব্যয় করেনা وَلَمْ يَقْتُرُوْا এবং কার্পণ্য করেনা وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا এবং তাদের ব্যয় করা তার মধ্যস্থ মাঝামাঝি পন্থা হয়ে থাকে ।

৬৮. وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ আর যারা উপাসনা করেনা مَعَ اللّٰهِ আল্লাহর সাথে اِلٰهًا اٰخَرَ অন্য কোনো মা'বুদের وَلَا يَقْتُلُوْنَ এবং তাকে হত্যা করে না النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ আল্লাহ যাকে (হত্যা করা) হারাম করে দিয়েছেন اِلَّا بِالْحَقِّ শরিয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত وَلَا يَزْنُوْنَ এবং তারা ব্যভিচার করেনা وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে يَلْقَ اَثَامًا তবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا- ٦٨

শানে নুযূল : ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির ও ইবনে মারদুভিয়া প্রমুখ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কোন গুনাহ সর্বাপেক্ষা বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম অতঃপর কোন গুনাহটি ? রাসূল ﷺ বললেন যে, তোমার সন্তান তোমার সাথে খানা খাবে ভয়ে অর্থাৎ দারিদ্রতার ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা কর। আমি আবারও বললাম অতঃপর কোন গুনাহটি? রাসূল ﷺ বললেন যে, তোমার পরশীর কারো স্ত্রীর সাথে জেনা করা। নবী করীম ﷺ-এর এ বাণীর সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। –(দুররে মানছুর-[৭৭/৫, কুরতুবী ৭৪/১৩]

ইমাম মুসলিম, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুশরিকদের মাঝে এক শ্রেণির লোক ছিল, তারা বেশি বেশি হত্যা ও খুন খারাবি করত, আবার অধিক হারে জেনা ও অশ্লীল, ঘৃণিত কর্মকাণ্ড করত। অতঃপর রাসূল ﷺ-এর নিকট তারা এসে বলল যে, আপনি যে দীনের প্রতি আহ্বান করেছেন তা তো ভালো! সুতরাং আমরা যদি ঈমান গ্রহণ করি, তাহলে কি আমাদের কৃতকর্মগুলো মুছে যাবে? তাদের এ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৭৫/১৩]

فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا : অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা অতঃপর নিজ অবস্থা অনুযায়ী আরশের উপর সমাসীন হওয়া, এগুলো সব দয়াময় আল্লাহর কাজ। এ বিষয়ে সত্যায়ন ও অনুসন্ধান করতে হলে কোনো ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর। 'ওয়াকিফহাল' বলে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং অথবা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহের পণ্ডিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ পয়গম্বরের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিল। –[মাযহারী]

قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ : رَحْمٰنُ আরবি শব্দ,এর অর্থ আরবরা সবাই জানত, কিন্তু আল্লাহর জন্যে শব্দটি তারা ব্যবহার করত না; তাই প্রশ্ন করল যে, রহমান কে এবং কি?

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاۤءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا - وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا-

এসব আয়াতে মানুষকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবারাত্রির পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমগ্র সৃষ্টজগত এ কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও তাওহীদের প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিন্তা ভাবনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়, তার সময় অযথা নষ্ট হয় তার এবং পুঁজি ও ধ্বংস হয়ে যায়।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ

ইবনে আরবী বলেন, আমি শহীদে আকবরের কাছে শুনেছি যে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, যার বয়স ষাট বছর হয় এবং তার অর্ধেক ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়ে যায় ও ছয় ভাগের এক অর্থাৎ দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে যায়; অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে লাগে। কুরআন পাক এস্থলে বড় বড় নক্ষত্র, গ্রহ ও সৌরজগতের কথা উল্লেখ করার পর এ কথাও বলেছে যে, কুরআন এসব বিষয়ের উল্লেখ বার বার এজন্যে করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃষ্টি, গতিও এ থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এগুলোর স্রষ্টা ও পরিচালককে চিন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁকে স্মরণ কর, এখন নভোমণ্ডলও সৌরজগতের স্বরূপ ও আকার কি, এগুলো আকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, না বাইরে শূন্য জগতে অবস্থিত –এ প্রশ্নের সাথে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ও কোনো বিষয় জড়িত নয় এবং এগুলোর স্বরূপ জানা মানুষের জন্য সহজও নয়। যারা সারাজীবন এসব বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাও কোনো অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌঁছতে পারেন নি। তারা যে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, তাও বিজ্ঞানীদের বিপরীত গবেষণার ফলে সংশয়াম্বিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাই তাফসীরে এর চাইতে বেশি কোনো আলোচনায় যাওয়াও কুরআনের জরুরি খেদমত নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, চন্দ্রে পৌঁছা

এবং সেখানকার মাটি, শিলা, এবং গুহা- পাহাড়ের আলোকচিত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কুরআন পাক এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে যে সত্যানুসন্ধানের সবক দিতে চায়, তারা তাদের গবেষণা প্রচেষ্টায় অহংকারে বিভোর হয়ে তা থেকে আরও দূরে সরে পড়েছে এবং সাধারণ লোকদের চিন্তা-ধারাকেও বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে কেউ এসব বিষয়কে কুরআন বিরোধী মনে করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে বসে, আবার কেউ কুরআন পাকের সমর্থন বর্ণনা করতে শুরু করে। তাই প্রশ্নের প্রয়োজন মাফিক বিস্তারিত আলোচনা জরুরি মনে করি। সূরা হিজরের وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا আয়াতের অধীনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, সূরা আল-ফুরকানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে : সেই আলোচনা নিম্নরূপ : وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ

নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে মহাশূন্যে? প্রাচীন ও আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কুরআন পাকের বাণী : এ বাক্য থেকে ব্যহ্যতঃ বুঝা যায় যে, بُرُوْجٌ অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীল অভ্যন্তরে অবস্থিত। কেননা فِي অব্যয়টি পাত্রের অর্থ দেয়। এমনিভাবে সূরা নূহে আছে :

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا -এতে فِيْهِنَّ-এর সর্বনাম سَبْعَ سَمٰوٰتٍ-কে বোঝায়। এ থেকে বাহ্যতঃ এটাই বোঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে। কিন্তু এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কুরআনে سَمَاء শব্দটি একটি বিরাটকায় এবং ধারণা ও কল্পনাতীত বিস্তৃতিশীল সৃষ্টবস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এই সৃষ্টবস্তুর মধ্যে দরজা আছে এবং দরজাগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত আছে। এই সৃষ্টবস্তুর সংখ্যা সাত বলা হয়েছে। سَمَاء শব্দটির আরও একটি অর্থ আছে, অর্থাৎ আকাশের দিকে অবস্থিত প্রত্যেক সুউচ্চ বস্তুকেও سَمَاء বলা হয়। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য পরিমণ্ডল, যাকে আজকালের পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়, এটাও سَمَاء শব্দের অর্থের আওতাভুক্ত। وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا ও এমনি ধরনের অন্য সেসব আয়াতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোকে অধিকাংশ তাফসীরবিদ দ্বিতীয় অর্থেই ধরেছেন। কারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও একথা প্রমাণিত যে, বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়, সেসব মেঘমালার উচ্চতার কোনো তুলনাই আকাশের উচ্চতার সাথে হয় না। স্বয়ং কুরআন পাকও অন্যান্য আয়াতে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার কথা স্পষ্টঃ উল্লেখ হয়েছে। বলা হয়েছে ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ -এতে مُزْنٌ শব্দটি مُزْنَةٌ-এর বহুবচনে। এর অর্থ শুভ্র মেঘমালা। আয়াতের অর্থ এই যে, শুভ্র মেঘমালা থেকে তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করেছ, না আমি করেছি? অন্যত্র বলা হয়েছে, وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا এখানে مُعْصِرَاتٌ-এর অর্থ পানি ভর্তি মেঘ। আয়াতের অর্থ এই যে, আমিই পানিভর্তি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি।

কুরআন পাকের এসব বর্ণনা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোতে অধিকাংশ তাফসীরবিদ سَمَاء শব্দের দ্বিতীয় অর্থই নিয়েছেন অর্থাৎ শূন্য পরিমণ্ডল।

সারকথা এই যে, কুরআন পাক ও তাফসীরবিদগণের বর্ণনা অনুযায়ী سَمَاء শব্দটি শূন্য পরিমণ্ডল ও আকাশলোক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় যেসব আয়াতে নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহের পাত্র হিসেবে فِي السَّمَاءِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোতে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান। অর্থাৎ নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহ আকাশলোকের অভ্যন্তরেও হতে পারে এবং আকাশের নীচে শূন্য পরিমণ্ডলেও হতে পারে। এই উভয় সম্ভাবনার বর্তমানে কোনো অকাট্য ফয়সালা কর যায় না যে, কুরআন নক্ষত্র ও গ্রহ- উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরে সাব্যস্ত করেছে অথবা আকাশের বাইরের শূন্য পরিমণ্ডলে; বরং কুরআনে ভাষাদৃষ্টে উভয়টিই সম্ভবপর সৃষ্টজগতের গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কুরআনের কোনো বর্ণনা তার পরিপন্থি হবে না।

সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কুরআন : এখানে নীতিগতভাবে একথা বুঝে নেওয়া জরুরি যে, কুরআন পাক কোনো বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে সৃষ্টজগতের স্বরূপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার, গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কুরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সৃষ্টজগতের কথা বার বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়। কুরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণতঃ কুরআন পাক আকাশ, পৃথিবী নক্ষত্র গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি থেকে উদ্ভূত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার এ কারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিস্ময়কর নির্মাণ-কৌশল ও অলৌকিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এ বিশ্বাস করে যে,

এগুলো আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর। এই বিশ্বাসের জন্য আকাশমণ্ডলীর শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদানের স্বরূপ, এগুলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কস্মিনকালেও জরুরি নয়; বরং এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, যতটুকু প্রত্যেকেই নিজের চোখে দেখে ও বোঝে। সূর্য চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, দিবারাত্রি পরিবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডেও দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, এক সেকেণ্ডের ও পার্থক্য হয়নি-এসব বিষয় দ্বারা নূন্যতম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, এসব বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয়; বরং এর একজন পরিচালক আছেন। এতটুকু বোঝার জন্য কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কুরআন পাকও এর প্রতি আহ্বান জানায়নি, কুরআন শুধু এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনারই দাওয়াত দেয়, যা সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এ কারণেই রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি তৈরি করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা এবং আকাশলোকের আকার-আকৃতি নির্ণয় করার প্রতি মোটেই কোনো গুরুত্ব দেন নি। সৃষ্টজগত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ চিন্তা ভাবনা করার অর্থ যদি এর স্বরূপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হতো, তবে এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুরুত্ব না দেওয়া অসম্ভব ছিল; বিশেষতঃ যখন এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালেও বিদ্যমান ছিল। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত ও এগুলো নিয়ে গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হযরত ঈসা (আ.)-এর পাঁচশত বছর পূর্বে ফিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে বেৎলীমুসের মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে পবিত্র সত্তার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং যেসব সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা কোনো সময় এদিকে ভ্রুক্ষেপও করেন নি। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সৃষ্টজগত সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার উদ্দেশ্য কস্মিণকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতাপ্রিয় আলেমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণাকার্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অবলম্বন করেছেন : তাঁরা মনে করেন যে, মহাশূন্য ভ্রমণ চন্দ্র মঙ্গলগ্রহ ও শুক্রগ্রহ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কুরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল।

নির্ভুল তথ্য এই যে, কুরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না এবং বিরোধিতাও করেনা। সৃষ্ট-জগত সৃষ্টবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কুরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত নীতি ও পন্থা এটাই যে, সে প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ততটুকু গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয়ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, যতটুকু যে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে আনুমানিক নিশ্চয়তাও লাভ করতে পারে। যেসব দার্শনিকসুলভ ও অনাবশ্যক আলোচনা গবেষণা সাধারণর মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন করার পরও অকাট্যরূপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভুল ; বরং সন্দেহ ও অস্থিরতা আরও বাড়ে, কুরআন এ ধরনের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করে না। কেননা কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মনজিলে-মকসুদ এসব পৃথিবীও আকাশস্থ সৃষ্টজগতের উর্ধ্বে স্রষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তি অর্জন করা। এর জন্যে সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরি নয় এবং এ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করাও মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান বিশারদদের মতবাদে গুরুতর মতানৈক্য এবং প্রাত্যহিক নব নব আবিষ্কার এর প্রকৃষ্ট প্রমাণকে কোনো মতবাদ ও গবেষণাকেই নিশ্চিত ও সর্বশেষ বলা যায় না। মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান, সৌরজগত শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টজগত, মেঘ ও বৃষ্টি, মহাশূন্য, ভূগর্ভস্থ স্তর পৃথিবীতে সৃষ্ট মাখলুক, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু মনুষ্যজগৎ মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়দির মধ্য থেকে কুরআন পাক কেবল এগুলোর নির্যাস ও চাক্ষুষ অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে যা দ্বারা মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক তথ্যানুসন্ধানের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে না। তবে কোথাও কোথাও কোনো বিশেষ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পষ্টোক্তিও পাওয়া যায়।

কুরআনের তাফসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি : প্রাচীন ও আধুনিক সত্যাপন্থি আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোনো প্রাচীন অথবা আধুনিক মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কুরআনের আয়াতে টানা-হেঁচড়া ও সদর্থ বর্ণনা করা বৈধ

নয়; বরং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তবে সেসব বিষয়ে কুরআনে কোনো স্পষ্টোক্তি নেই : কুরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে ; সেখানে যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে কুরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। যেমন, আলোচ্য আয়াত جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا সম্পর্কে বলা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে আছে, এ সম্পর্কে কুরআন পাক কোনো সুস্পষ্ট ফয়সালা দেয়নি। আজকাল মহাশূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছতে পারে। এতে ফিশাগোর্সীয় মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শনিক ফিশাগোর্স বলেন, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কুরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীর বেষ্টনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। তাতে যে, কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে যে, নক্ষত্রসমূহকে শূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোনো পদার্থ নয়; বরং দুই অর্থের মধ্য থেকে একটিকে নির্দিষ্টকরণ। কিন্তু যদি কেউ মূলতই আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে; যেমন আজকাল কোনো কোনো আধুনিক সৌর বিজ্ঞানী একথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবি করে যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব; তবে কুরআনের দৃষ্টিতে এরূপ দাবি ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা কুরআন পাক একাধিক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশের দরজা আছে এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইচ্ছা, আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরিউক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনোরূপ সদর্থ বর্ণনা করা হবে না; বরং দাবিকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে।

এমনিভাবে কুরআন পাকের وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বেৎলীমূসীয় মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তার মতে নক্ষত্রসমূহ আকাশগাত্রে প্রোথিত আছে। তারা নিজেরা গতিশীল নয় ; বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে।

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন তাফসীরবিদগণের মধ্যে যারা সৌরজগৎ সম্পর্কে বেৎলীমূসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন, তাঁরা কুরআনের সেই সব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা করতেন, যেগুলো দ্বারা বেৎলীমূসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বুঝা যেত। এমনিভাবে আজকাল কিছু সংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এই উভয় পন্থাই অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞান যেসব নুতন গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া কুরআন ও সুন্নতের খেলাফ কোনো কিছু নেই। কিছু সংখ্যক লোক জ্ঞানের ত্রুটিবশতঃ এগুলোক কুরআন ও সুন্নতের খেলাফ মনে করতঃ সদর্থের পেছনে পড়ে যায়।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তাফসীরবিদ সাইয়েদ মাহমূদ আলূসী বাগদাদীর তাফসীরে রূহুল মা'আনী পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীরসমূহের চমৎকার সংক্ষিপ্তসার এবং আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তাফসীর। এই তাফসীরকার যেমন কুরআন ও সুন্নায় গভীর জ্ঞানী, তেমনি প্রাচীন এবং আধুনিক দর্শন ও সৌর-বিজ্ঞানেরও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি তাঁর তাফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে উপরোল্লিখিত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তাঁর পৌত্র আল্লামা সাইয়্যেদ মাহমূদ শুকরী আলূসী এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের নাম مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ مِمَّا يَعْضُدُ الْهَيْئَةَ الْجَدِيْدَةَ الْقَوِيْمَةَ الْبُرْهَانَ এই গ্রন্থে কুরআন পাকের আলোকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের মতবাদসমূহের সমর্থন পেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আধুনিকতাপ্রিয় আলেমগণের ন্যায় কুরআনের আয়াতে কোনো প্রকার সদর্থের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের সমর্থনে লিখিত তাঁর কয়েকটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়াই যথেষ্ট। তিনি বলেন :

رَاَيْتُ كَثِيْرًا مِنْ قَوَاعِدِهَا لَايُعَارِضُ النُّصُوْصَ الْوَارِدَةَ فِى الْكِتٰبِ وَالسُّنَّةِ عَلٰى اَنَّهَا لَوْ خَالَفَتْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يَلْتَفِتْ اِلَيْهَا وَلَمْ نُؤَوِّلِ النُّصُوْصَ لِاَجْلِهَا وَالتَّاوِيْلُ فِيْهَا لَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِ السَّلَفِ الْحَرِيَّةِ بِالْقَبُوْلِ بَلْ لَابُدَّ اَنْ نَقُوْلَ اِنَّ الْمُخَالِفَ لَهَا مُشْتَمِلٌ عَلٰى خَلَلٍ فِيْهِ فَاِنَّ الْعَقْلَ الصَّرِيْحَ لَايُخَالِفُ النَّقْلَ الصَّحِيْحَ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا يُصَدِّقُ الْاٰخَرَ وَيُؤَيِّدُهٗ

"আমি আধুনিক সৌরজগতের অনেক রীতি-নীতিকে কুরআন ও সুন্নাহর বিপক্ষে দেখিনি। এতদসত্ত্বেও যদি তা কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ ফেরাব না। এবং এর কারণে কুরআনও সুন্নাহর সদর্থ করব না। কেননা এরূপ

সদর্থ পূর্ববর্তী মনীষীগণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই। বরং আমরা তখন একথা বলব যে, যে মতবাদ কুরআনও সুন্নাহবিরোধী, তাতে কোনো না কোনো ত্রুটি আছে। কারণ সুস্থ বিবেক কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে যেতে পারে না; বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে।"

সারকথা এই যে, সৌরজগতে, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও আকার -আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোনো নতুন বিষয়বস্তু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু ফিশাগোর্স ইতালীর ক্রুতোনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা দিতেন। তারপর খ্রিস্টের জন্মের প্রায় একশত চল্লিশ বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় গুরু বেৎলীমূস রুমীর আবির্ভাব ঘটে.। সে সময়েই অপর একজন দার্শনিক হেয়ারখোস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জ্যামিতিক কোনো পরিমাপের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।

সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেৎলীমূসের মতবাদ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ছিল। বেৎলীমূস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর মতবাদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মোকাবিলায় ফিশাগোর্সের মতবাদ অখ্যাতই থেকে যায়। যখন আরবি ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন বেৎলীমূসের মতবাদই আরবি গ্রন্থাদিতে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পরিচিতি লাভ করে। অনেক তাফসীরকার কুরআনের আয়াতের তাফসীরেও এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। হিজরি একাদশ শতাব্দী ও খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিকাস জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলিও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে বেৎলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ফিসাগোর্সের মতবাদকে আরো শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ভারি বস্তু শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা বেৎলীমূসীয় মতবাদ ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে এবং সব ভারি বস্তু স্বভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই মতবাদে ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মহাকর্ষণ শক্তি রয়েছে। পৃথিবীও এমন একটি শক্তি এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে সীমা পর্যন্ত এই মহাকর্ষণের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত, সেখান থেকে প্রত্যেক ভারি বস্তু নীচে পতিত হবে। কিন্তু যদি কোনো বস্তু এই মহাকর্ষণের প্রভাব-বলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নিচে পতিত হবে না।

অধুনা সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবূ রায়হান আল -বেরুনীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার করত: এ বিষয়ে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, বিপুল শক্তি ও দ্রুতগতির কারণে রকেট যখন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে যায়, তখন তা আর নিচে পতিত হয় না; বরং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের আকার ধারণ করতঃ তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার কৌশল উদ্ভাবন করতে শুরু করেন এবং অবশেষে চন্দ্রে পদার্পণ করতে সক্ষম হন। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের সব শত্রু-মিত্র এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে গমন, সেখানকার মাটি, শিলা ইত্যাদি আনয়ন এবং বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশূন্য পরিক্রমার ও পরিমাপের অনুশীলনী চালু রয়েছে।

তন্মধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশূন্য ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভোচারী জন গ্লেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শত্রু-মিত্র সবারই আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁর একটি বিবৃতি আমেরিকার খ্যাতনামা মাসিক 'রিডার্স ডাইজেস্ট' -এ এবং তার উর্দু অনুবাদ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত উর্দু মাসিক 'সায়রবীন' -এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হলো। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হয়। জন গ্লেন তার দীর্ঘ প্রবন্ধে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশূন্যে আল্লাহর অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং একথা বোঝায় যে, এমন কোন শক্তি আছে যে. এগুলোকে কেন্দ্রের সাথে জড়িত রাখে। অতঃপর লিখেন :

এতদসত্ত্বেও মহাশূন্যে পূর্ব থেকেই যে ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, তদৃষ্টে আমাদের প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশূন্য পরিমাপ অসম্ভব ব্যাপার।

অতঃপর উড়োজাহাজের যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে লিখেন :

কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহারও সীমিত ও অনর্থক হয়ে যায়। কেননা লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। একে আমরা দেখতে পারি না, শুনতে পারি না এবং তার ঘ্রাণ নিতে পারি না। অথচ ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার বোঝাতে থাকে যে, এখানে কোনো গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান।

অতঃপর সব ভ্রমণ-পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন :

খ্রিস্টধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূলনীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে অনুভব করতে অক্ষম, কিন্তু পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফলও প্রভাব আমরা নিজেদেরও অন্য ভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব। এ কারণেই আমরা আমাদের জানার ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্টজগতে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজয়ীদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম। মার্কিন নভোচারীর উপরিউক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্টজগতে গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌছা তো দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়। তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মোকাবিলায় যৎসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই যে, সৃষ্টজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থপনা আপনা আপনি নয়, বরং কোনো মহান ও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। একথাটিই পয়গম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছেন এবং কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্য আকাশ পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশূন্য নক্ষত্র, গ্রহও উপগ্রহের তথ্যানুসন্ধান এবং আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারীগণ যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি এবং অবশেষে নিজেদের অপারগতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে লাখো মাইল উচ্চে ভ্রমণকারী ও চন্দ্র গ্রহের পাথর, মাটি শিলা ও চিত্র সংগ্রহকারীগণ ও স্বরূপ উদঘাটনের ক্ষেত্রে এর চাইতে বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এসব তথ্যানুসন্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে : মানুষের চেষ্টা-সাধনা,চিন্তাগত ক্রমোন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ দৃষ্টিতে প্রশংসার্হও; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যে ঐন্দ্রজালিকতা দ্বারা মানব ও মানবতার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য -উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাজ হতে পারে না। দেখা দরকার যে, এই পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং কোটি অর্বুদ টাকা, যা অনেক মানুষের দুঃখ দুর্দশা : লাঘব করার জন্যে যথেষ্ট হতো, তার বহুৎসব করে এবং চন্দ্র পর্যন্ত পৌছে সেখানকার মাটি, শিলা কুড়িয়ে এনে মানব ও মানবতার কি উপকার সাধিত হয়েছে? বিপুল সংখ্যক মানব এখনও ক্ষুধায় মরছে, তাদের বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান নেই। এই সাধনা ও প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্র্য ও বিপদাপদের কোনো সমাধান দিতে পেরেছে কি? অথবা তাদের রোগ-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির কোনো ব্যবস্থা করেছে কি? অথবা তাদের জন্যে অন্তরগত শান্তি ও আরামের কোনো উপকরণ সংগ্রহ করেছে কি? নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এসব প্রশ্নের জওয়াবে 'না' ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পারবে না।

একারণেই কুরআন ও সুন্নাহ মানুষকে এমন নিষ্ফল কাজে লিপ্ত করা থেকে বিরত থাকে এবং কেবল দু'টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে মানুষকে সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়। প্রথম, মানুষ যাতে এসব অত্যাশ্চর্য প্রভাবাদি দেখে সত্যিকার প্রভাব সৃষ্টিকারী ও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত শক্তিকে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি এই ব্যবস্থার পরিচালক তাঁরই নাম আল্লাহ। দ্বিতীয়, আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। মানুষের কাজ এই যে, জ্ঞান-বুদ্ধি চেতনাও সাধনার সাহায্যে এসব বস্তুকে ভূপৃষ্ঠের গোপনভাণ্ডার থেকে বের করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা করা। প্রথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্রয়োজন মেটানোর জন্য - কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়ের। তাই এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোনিবেশ পছন্দনীয় নয়। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার এ দু'টি দিকই মানুষের জন্যে যেমন সহজ, তেমনি ফলপ্রসূ। এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে

কোনো মতভেদও নেই। তাদের সব মতভেদ সৌরজগৎ এবং গ্রহ উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ত। কুরআন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অর্জনের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বাদ দিয়েছে। মিসরের মুফতি আল্লামা নজীত তাঁর গ্রন্থ 'তাওফীফুর রহমান' এ সৌর বিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। একভাগ, গুণগত যা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব সম্পর্কিত দ্বিতীয়ভাগ কার্যগত ,যা এসব হিসাব জানার উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত। তৃতীয়ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগৎ ও গ্রহ উপগ্রহের আকার -আকৃতি এবং স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরও লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই বললেই চলে। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও অধিকাংশ ফলাফলে সবাই একমত। তাদের ঘোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত।

চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকঠিন। এ কারণেই কুরআন সুন্নাহ এবং সাধারণভাবে পয়গম্বরগণও এই তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেননি। এবং পূর্ববর্তী মনীষীগণের উপদেশ এই যে :

زباں تازہ کردن باقرار تو - نینگیختن علق از کار تو * مہندس بسے جویرا زر از شاد - نو از کجود کردی اغاز شاد

সূফী বুযুর্গগণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এসব বস্তু দেখেন। অবশেষে তাঁদের ফয়সালাও তাই, যা শায়খ সাদী ব্যক্ত করেছেন :

چہ شبہا نشستم دریں سیر گم * کہ حیرت گرفت آستینم کہ قم

হাফেজ শিরাজী নিজের সুরে বলেছেন : سخن از مطرب ومی گوئی وراز دہر کمتر جو * کہ کسی نکشود ونکشاید بحکمت ایں معمارا

এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাওহীদ ও তাঁর অদ্বিতীয় জ্ঞানও ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডল ও ভূজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হুবহু কুরআনের উদ্দেশ্য। কুরআন যত্রতত্র এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বস্তুর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে, এদিক দিয়ে এসব বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করাও কুরআনের উদ্দেশ্য। কুরআন এর প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য স্থির করে তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে ; বরং বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের পানে একটি সফর সাব্যস্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিপ্ত হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা অর্জন সুকঠিনও, তাই কুরআন তাতে জীবনপাত করা থেকে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে। এ থেকে আরো বোঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি ও তথ্যানুসন্ধানকে হুবহু কুরআনের উদ্দেশ্য মনে করা ভুল। কিছুসংখ্যক আধুনিকপন্থি আলেম তাই মনে করেন। এমনিভাবে কুরআনকে এগুলোর বিরোধী বলা ও ভ্রান্ত। কিছুসংখ্যক রক্ষণশীল আলেম তাই বলেন। সত্য এই যে, কুরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্যে আগমন করেনি। কুরআনের আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের জন্য এগুলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে এর কোনো সম্পর্কও নেই। কুরআন এসব ব্যাপারে নিশ্চুপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কুরআনের পরিপন্থি বলা শুদ্ধ নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌঁছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি কোনো বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই এবং যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বুনা এবং তাতে জীবনপাত করে দেওয়াও কোনো বুদ্ধিমত্তা নয়।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا الخ

সূরা -আল ফুরকানের বেশির ভাগ বিষয়বস্তু ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রেসালত ও নবুয়তের প্রমাণ এবং এতদসম্পর্কে কাফেরও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব। এতে কাফের মুশরিক এবং নির্দেশাবলি অমান্যকারীদের শাস্তির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শেষ প্রান্তে আল্লাহ তা'আলা সেই বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা রেসালতে পূর্ণরূপে বিশ্বাসী এবং যাদের বিশ্বাস, কর্ম চরিত্র, অভ্যাস সব আল্লাহ ও রাসূলের ইচ্ছার অনুসারী ও শরিয়তের নির্দেশাবলির সাথে সুসমঞ্জস।

কুরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে 'ইবাদুর রহমান'-(রহমানের বান্দা) উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্যে সর্ববৃহৎ সম্মান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্ট-জীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর দাস এবং তাঁর ইচ্ছার অনুসারী। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু করতে পারে না; কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা বাসনা ও কর্মকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেওয়া। এ

ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের বান্দা অভিহিত করে সম্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কুফর ও গোনাহ্ থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে 'নিজের বান্দা' বলে সম্মানসূচক উপাধি দান করা উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামাবলি ও গুণবাচক বিশ্লেষণাবলির মধ্যে থেকে এখানে শুধু 'রহমান' শব্দকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবতঃ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলি আল্লাহ তা'আলার রহমান (দয়াময়) গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত।

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলি ও আলামত : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ, দিবারাত্রি ইবাদত পালনের সাথে আল্লাহভীতি যাবতীয় গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে।

তাদের **সর্বপ্রথম গুণ** عِبَادٌ হওয়া। عِبَادٌ শব্দটি عَبْدٌ -এর বহুবচন। অর্থ বান্দা, দাস, যে তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং তার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম প্রভুর আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তা'আলার বান্দা কথিত হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি হতে পারে যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্য সদা উৎকর্ণ থাকে।

দ্বিতীয় গুণ : يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। هون শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাম্ভীর্য ও বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নতবিরোধী। শামায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ধীরে চলতেন না বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষা এরূপ, كَاَنَّمَا الْاَرْضُ تَطْوِىْ لَهٗ অর্থাৎ চলার সময় পথ যেন তার জন্য কুঞ্চিত হত। –(ইবনে কাসীর)

এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত ওমর ফারূক (রা.) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি অসুস্থ? সে বলল : না : তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন। –[ইবনে কাসীর]

হযরত হাসান বসরী (রা.) يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا -আয়াতের তাফসীরে বলেন, খাঁটি মুমিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ হাত পা আল্লাহর সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারগ ও পঙ্গু মনে করে; অথচ তারা রুগ্ণ ও নয় এবং পঙ্গুও নয়; বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহভীতি প্রবল যা অন্যদের উপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা দুঃখই দুঃখ ভোগ করে। কারণ সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহর নিয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প এবং তার জন্যে শাস্তি তৈরি রয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

তৃতীয় গুণ : وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا অর্থাৎ যখন অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে সালাম। এখানে جَاهِلُوْنَ শব্দের অনুবাদ 'অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এর অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। 'সালাম' শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়নি; বরং নিরাপত্তার কথাবার্তা বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহ্হাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে تَسْلِيْمٌ শব্দটি تَسَلُّمٌ থেকে নয়; বরং سَلَامٌ থেকে উদ্ভূত; যার অর্থ নিরাপদ থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খদের জবাবে তাঁরা নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে যাতে অন্যরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা গোনাহ্গার না হয়। হযরত মুজাহিদ, মোকাতিল (রা.) প্রমুখ থেকে এই তাফসীরই বর্ণিত আছে। –[মাযহারী]

চতুর্থ গুণ : اَلَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا অর্থাৎ তারা রাত্রি যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সেজদা করা অবস্থায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায়। ইবাদতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি

নিদ্রা ও আরামের। এতে নামাজ ও ইবাদতের জন্যে দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোক দেখানো ও নামজশের আশঙ্কাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জিহাদ ইত্যাদি কাজে থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহর সামনে ইবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদের নামাজের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেকবান্দার অভ্যস্ত কর্ম ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য দানকারী মন্দ কাজের কাফ্ফারা এবং গোনাহ্ থেকে নিবৃত্তকারী। –[মাযহারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি এশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকাত পড়ে নেয়, সেও তাহাজ্জুদের ফজিলতের অধিকারী بَاتَ لِلّٰهِ سَاجِدًا وَقَائِمًا –(মাযহারী, বগভী)। হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রি ও ইবাদতে অতিবাহিতকারী গণ্য করা হবে। –[আহমদ, মুসলিম, মাযহারী]

পঞ্চম গুণ : وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণ দিবারাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না; বরং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখেরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্দরুন কার্যত চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে থাকে।

ষষ্ঠ গুণ : وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا –অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ত্রুটি করে না। বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে اِسْرَافْ এবং বিপরীতে اِقْتَارْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

اِسْرَافْ –এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরিয়তের পরিভাষায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা اِسْرَافْ তথা অপব্যয়; যদিও তা এক পয়সাও হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা تَبْذِيْر তথা অনর্থক ব্যয় কুরআনের আয়াত দ্বারা হারাম গুনাহ। আল্লাহ বলেন اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ –এদিক দিয়ে এই তাফসীরের সারমর্ম ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের তাফসীরের অনুরূপ হয়ে যায়; অর্থাৎ গুনাহর কাজে যা-ই ব্যয় করা হয় তা অপব্যয়। –[মাযহারী]

اِقْتَارْ শব্দের অর্থ ব্যয়ে ত্রুটি ও কৃপণতা করা। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ যেসব কাজে আল্লাহ ও রাসূল ব্যয় করার আদেশ দেন, তাতে কম ব্যয় করা। (সুতরাং মোটেই ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অন্তর্ভুক্ত হবে)। এই তাফসীর ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। –(মাযহারী) আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ত্রুটির মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهٗ مَعِيْشَتَهٗ অর্থাৎ ব্যয় করতে গিয়ে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। –[আহমদ, ইবনে কাসীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ অর্থাৎ যে বক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কায়েম থাকে, সে কখনও ফকির ও অভাবগ্রস্ত হয় না। –[আহমদ-ইবনে কাসীর]

সপ্তম গুণ : وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ –পূর্বোক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গুনাহ্ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ তারা ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না। এতে জানা গেল যে, শিরক সর্ববৃহৎ গোনাহ্।

অষ্টম গুণ : وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ এখান থেকে কার্যগত গুনাহসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর গোনাহ্ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এসব গোনাহের কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গুনাহ বর্ণনা করার পর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا –অর্থাৎ যে ব্যক্তি উল্লিখিত গুনাহসমূহ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে। এ স্থলে হযরত আবূ উবায়দা (রা.) اَثَامْ শব্দের তাফসীর কারেছেন গুনাহের শাস্তি। কেউ কেউ বলেন, اَثَامْ জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম, যা নির্মম শাস্তিতে পূর্ণ। কোনো কোনো হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। –[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস : মুরাক্কাব لفيف مقرون অর্থ– তিনি কায়েম হলেন।

زَادَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার زِيَادَةٌ মূলবর্ণ (ز - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ– তাদের আরো বর্ধিত হয়।

مُنِيْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنَارَةٌ মূলবর্ণ (ن - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– আলোকময়।

يَمْشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَشْىٌ মূলবর্ণ (م - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা চলাফেরা করে।

يَبِيْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَبِيْتٌ মূলবর্ণ (ب - ى - ت) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা রাত্রিকালে মশগুল থাকে।

اَنْفَقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْفَاقٌ মূলবর্ণ (ن - ف - ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা ব্যয় করে।

لَمْ يُسْرِفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْرَافٌ মূলবর্ণ (س - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– তারা অপব্যয়ও করে না।

لَمْ يَقْتُرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم বাব نَصَرَ মাসদার قَتْرٌ মূলবর্ণ (ق - ت - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা কার্পণ্যও করে না।

لَا يَدْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ–তারা উপাসনা করে না।

لَا يَزْنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার زِنَاءٌ মূলবর্ণ (ز - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ব্যভিচার করে না।

يَلْقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার لِقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাকে সম্মুখীন হতে হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ : এখানে واو টি আতেফা اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল পূর্ণ يَقُوْلُوْنَ বাক্যটি হলো সেলাহ, আর رَبَّنَا হলো منادى مضاف তাঁর হরফে নেদা উহ্য রয়েছে। اصْرِفْ হলো ফে'ল আর عَذَابَ جَهَنَّمَ হলো اِصْرِفْ-এর মাফউল। আর বাক্যটি مقول-এর قول হয়েছে।

৬৯. কিয়ামত দিবসে তার শাস্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে তাতে অনন্তকাল লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে।	يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾
৭০. কিন্তু যারা তওবা করে নেয় এবং ঈমান আনয়ন করে এবং নেক কাজ করতে থাকে, তবে এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ তাদের পাপসমূহের পরিবর্তে পুণ্যসমূহ দান করবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।	اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾
৭১. আর যে ব্যক্তি তওবা করে এবং নেক কাজ করে, তবে তো সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশেষভাবে প্রত্যাবর্তন করতেছে।	وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾
৭২. এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না যদি বেহুদা কাজ-কথার সংস্রবে গিয়ে পড়ে, তবে ভদ্রভাবে এড়িয়ে যায়।	وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾
৭৩. আর তারা এমন, যখন তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়– আল্লাহর নির্দেশাবলির দ্বারা, তখন তারা তার উপর পতিত হয় না বধির ও অন্ধভাবে।	وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৯. يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ তার শাস্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا এবং সে তাতে অনন্তকাল লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে।

৭০. اِلَّا مَنْ تَابَ কিন্তু যারা তওবা করে নেয় اٰمَنَ, এবং ঈমান আনয়ন করে وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا এবং নেক কাজ করতে থাকে فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ তবে এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ দান করবেন سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ পাপসমূহের পরিবর্তে পুণ্যসমূহ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا, আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।

৭১. وَمَنْ تَابَ, আর যে ব্যক্তি তওবা করে وَعَمِلَ صَالِحًا এবং নেক কাজ করে فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا তবে তো সেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশেষভাবে প্রত্যাবর্তন করেছে।

৭২. وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ, এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ, আর যদি বেহুদা কাজ কথার সংস্রবে গিয়ে পড়ে مَرُّوْا كِرَامًا তবে ভদ্রভাবে এড়িয়ে যায়।

৭৩. وَالَّذِيْنَ, আর তারা এমন اِذَا ذُكِّرُوْا যখন তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয় بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ আল্লাহর নির্দেশাবলি দ্বারা لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا তখন তারা এর উপর পতিত হয় না صُمًّا وَّعُمْيَانًا বধির ও অন্ধভাবে।

অনুবাদ	আয়াত
৭৪. আর তারা এমন যে, তারা দোয়া করতে থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তানবর্গ হতে চোখের শীতলতা [শান্তি] দান করুন, আর আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের ইমাম [নেতা] বানিয়ে দিন।	وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾
৭৫. এই সমস্ত লোক প্রাপ্ত হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ তাদের দৃঢ় থাকার কারণে এবং তারা তাতে স্থায়ী অবস্থানের দোয়া ও সালাম প্রাপ্ত হবে।	اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ﴿٧٥﴾
৭৬. [এবং] তাতে তারা অনন্তকাল বাস করতে থাকবে, তা কেমন উত্তম ঠিকানা ও বাসস্থান।	خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾
৭৭. আপনি [কাফেরদেরকে] বলে দিন, আমার প্রতিপালক তোমাদের একটুও পরোয়া করবেন না যদি তোমরা ইবাদত না কর, তোমরা তো [আল্লাহর আদেশসমূহকে] মিথ্যা মনে করতেছ, সুতরাং অচিরেই এটা মহা বিপদ হবে।	قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاۗؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৪. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ আর তারা এমন যে, তারা দোয়া করতে থাকে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! هَبْ لَنَا আমাদেরকে দান করুন مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا আমাদের স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তানবর্গ হতে قُرَّةَ اَعْيُنٍ চোখের শীতলতা (শান্তি) وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا আর আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের ইমাম বানিয়ে দিন।

৭৫. اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ এ সমস্ত লোক প্রাপ্ত হবে الْغُرْفَةَ প্রাসাদসমূহ بِمَا صَبَرُوْا তাদের দৃঢ় থাকার কারণে وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا তারা তথায় প্রাপ্ত হবে تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا স্থায়ী অবস্থানের দোয়া ও সালাম।

৭৬. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাতে তারা অনন্তকাল বাস করতে থাকবে حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا তা কেমন উত্তম ঠিকানা ও বাসস্থান

৭৭. قُلْ আপনি বলে দিন مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ আমার প্রতিপালক তোমাদের একটুও পরোয়া করবেন না لَوْلَا دُعَاۗؤُكُمْ যদি তোমরা ইবাদত না করো فَقَدْ كَذَّبْتُمْ তোমরা তো (আল্লাহর আদেশ সমূহকে) মিথ্যা মনে করছ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا সুতরাং অচিরেই এটা মহাবিপদ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অতঃপর উল্লিখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে একথা নির্দিষ্ট যে, এই শাস্তি বিশেষভাবে কাফেরদের হবে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা প্রথমে তো يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ কথাটি মুসলমান গুনাহগারদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ তাদের এক গুনাহের জন্যে একই শাস্তি কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত আছে। শাস্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মু'মিনদের জন্যে হবে না। এটা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য কুফরের যে শাস্তি, যদি কাফের ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই

শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ এই শাস্তি সম্পর্কে আয়াতে وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا কথাটিও বলা হয়েছেঃ অর্থাৎ, তারা চিরকাল এই আজাবে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। কোনো মু'মিন চিরকাল আজাবে থাকবে না। মু'মিন যত বড় পাপই করুক, পাপের শাস্তি ভোগ করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ীও হবে। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শাস্তির কথা এখানে বলা হলো, এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা এই যে, শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করতঃ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সেসব বিগত পাপ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও গুনাহ্ ও মন্দ কর্মে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন ঈমান গ্রহণ করার কারণে সেগুলো সব মাফ হয়ে গেছে এবং গুনাহ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎকর্ম দখল করে নিয়েছে। মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার এই তাফসীর হযরত ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে জুবায়র, মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। -[মাযহারী]

নবম গুণ : إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ - وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا - বাহ্যতঃ এটা পূর্বোক্ত صَالِحًا বাক্যে বিধৃত বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি। কুরতুবী কাফফাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে ভিন্ন ও আলাদা। কারণ প্রথমটি ছিল কাফের ও মুশরিকদের তওবা যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। এখন মুসলমান পাপীদের তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে وَآمَنَ অর্থাৎ, বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে বোঝা যায় যে, এটা তাদের তওবা, যারা পূর্ব থেকে মু'মিনই ছিল; কিন্তু অসাবধানতাবশত : হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক তওবা করার পর যদি মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য তাদের কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তওবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জওয়াবে শুধু يَتُوبُ উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা শর্তে শুধু মৌখিক তওবার উল্লেখ আছে এবং জওয়াবে যে তওবা উল্লিখিত হয়েছে, তা সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তওবা করে, অতঃপর সৎ কর্ম দ্বারাও তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মনে করা হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অতীত গোনাহ্ থেকে তওবা তো করে কিন্তু ভবিষ্যত ক্রিয়াকর্মে এর কোনো প্রমাণ দেয় না, তার তওবা যেন তওবাই নয়। আয়াতের বিষয় বস্তুর সংক্ষিপ্তসার এই যে, যে মুসলমান অসাবধানতাবশত পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, যা দ্বারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যতঃ এর উপকারিতাও তাই হবে,যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার মন্দ-কাজকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে।

আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলির বর্ণনা চলছিল। মাঝখানে পাপের পর তওবা করার বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলি বর্ণিত হচ্ছে।

দশম গুণঃ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ –অর্থাৎ, তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কুফর। এরপর সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বান্দগণ এরূপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র.) বলেন, এখানে গান-বাজনার মাহফিল বুঝানো হয়েছে। আমর ইবনে কায়েস বলেন, নির্লজ্জতা ও নৃত্যগীতের মাহফিল বুঝানো হয়েছে। যুহরী ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, মদ্যপান করা ও করানোর মজলিস বোঝানো হয়েছে। -[ইবনে -কাসীর]

সত্য এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহর নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখা ও তাতে যোগদান করার সমর্থনেরই অন্তর্ভুক্ত। -[মাযহারী]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ আয়াতের يَشْهَدُوْنَ শব্দটিকে شَهَادَةٌ অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থে নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবীরা গুনাহ তা কুরআন ও সুন্নাতে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ আখ্যা দিয়েছেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার। এছাড়া তার মুখে চুন-কালি মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত করা দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। –[মাযহারী]

একাদশ গুণ : وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا –অর্থাৎ যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনোদিন গমন করে, তবে গাম্ভীর্যও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃত ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্যে এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃণার্হ জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিপ্ত হয় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা জানতে পেরে বললেন, ইবনে মাসউদ করীম অর্থাৎ ভদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে।

–[ইবনে-কাসীর]

দ্বাদশ গুণ : وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا –অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও আখেরাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না; বরং শ্রবণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। (এক) আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয় কাম্য ও বিরাট পুণ্য কাজ। (দুই) অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া: অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে, কিন্তু আমলের ব্যাপারে এমন করা যেন শোনেইনি ও দেখেইনি অথবা আমলও করা হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মতামতের খেলাফ নিজের মতে কিংবা জনশ্রুতি অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ-বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

শরিয়তের বিধানাবলি পাঠ করাই যথেষ্ট নয়; বরং পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীর অনুযায়ী বুঝে আমল করা জরুরি : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে; তেমনি না বুঝে না শুনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমি এমন কোনো মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সেজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন প্রকার সেজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সেজদায় শরিক হয়ে যাব? হযরত শা'বী বললেন, না। না বুঝে না শুনে কোনো কাজে লেগে যাওয়া মু'মিনের জন্যে বৈধ নয়; বরং বুঝে-শুনে আমল করা তার জন্যে জরুরি। তুমি যখন সেজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সেজদা করছে এবং তুমি তাদের সেজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সেজদায় শরিক হয়ে যাওয়া জায়েজ নয়।

এ যুগে যুব-সম্প্রদায় ও নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে কুরআন পাঠ ও কুরআন বুঝার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে তারা নিজেরা কুরআনের অনুবাদ অথবা কারও তাফসীর দেখে কুরআনকে নিজেরা বুঝার চেষ্টাও করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ; কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নীতিবিবর্জিত। ফলে তারা কুরআনকে বিশুদ্ধরূপে বুঝার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। নীতির কথা এই যে, জগতের কোনো সাধারণতম বিদ্যাও নিছক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে

কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করতে পারে না, যে পর্যন্ত তা কোনো ওস্তাদের কাছে থেকে শিক্ষা না করে। জানিনা কুরআন ও কুরআনের বিদ্যাকেই কেন এমন মনে করে দেওয়া হয়েছে যে, যার মন চায় সে নিজেই তরজমা দেখে যা ইচ্ছা অর্থ নির্দিষ্ট করে নেয়। কোনো পারদর্শী ওস্তাদের পথপ্রদর্শন ব্যতীত এই নীতিবিবর্জিত কুরআন পাঠও আল্লাহর আয়াতে অন্ধ বধির হয়ে পতিত হওয়ার শামিল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সরল পথের তাওফীক দান করুন।

চক্ষুশীতলকারী **স্ত্রী ও সন্তান** : وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا এতে নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করা হয়েছে যে, তাদেরকে আমার জন্য চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হযরত হাসান বসরী (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে মশগুল দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের প্রকৃত শীতলতা। যদি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবে তাও দুরস্ত।

এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয়বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না, বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরও আমল সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসেবে তাদের সৎকর্ম পরায়ণতার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই অংশটিও প্রণিধানযোগ্য وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا আমাদেরকে মুত্তাকীগণের নেতা ও ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যতঃ নিজের জন্যে জাঁকজমক, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে যে, যা কুরআনের অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে নিষিদ্ধ, যেমন এক আয়াতে আছে : تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا –অর্থাৎ আমি পরকালের গৃহ তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোনো কোনো আলেম আয়াতের তাফসীরে বলেন : প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিকভাবে হয়েই থাকেন। কাজেই এই দোয়ার সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী করে দিন। তারা মুত্তাকী হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা কথিত হবেন। সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি; বরং সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে মুত্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) বলেন, এই দোয়ায় নিজের জন্যে কোনো সরদারী ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে এরূপ যোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর ছওয়াব পাব। হযরত মাকহুল শামী (র.) বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতির এমন উচ্চস্তর অর্জন করা, যা দ্বারা মুত্তাকীগণ লাভবান হয়। কুরতুবী উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই অর্থাৎ যে সরদারী ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয় জায়েজ। পক্ষান্তরে لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا আয়াতে সেই সরদারী ও নেতৃত্বেরই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ এ পর্যন্ত ইবাদুর রহমান অর্থাৎ কামেল মু'মিনদের প্রধান গুণাবলির বর্ণনা সমাপ্ত হলো। অতঃপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে। اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ - غُرَفٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ বালাখানা তথা উপরতলার কক্ষ। বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন বালাখানা পাবে, যা সাধারণ জান্নাতিগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়ে। (বুখারী, মুসলিম, মাযহারী) মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, তিরমিযী ও হাকিমে হযরত আবূ মালিক আশ'আরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ -এসব কক্ষ কাদের জন্য? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে। –[মাযহারী]

وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا –অর্থাৎ জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের সাথে তাঁরা এই সম্মান ও লাভ করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মোবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত খাঁটি মু'মিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এ সবের প্রতিদান ও ছওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বার কাফের ও মুশরিকদেরকে আজাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ : এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে অনেক উক্তি রয়েছে, তন্মধ্যে যা অধিক স্পষ্ট ও সহজ তা এই যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো গুরুত্ব থাকত না, যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করা না হতো। কেননা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহর ইবাদত করা। যেমন অন্য আয়াতে আছে وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ : অর্থাৎ আমি মানব ও জিনকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, ইবাদত ব্যতীত মানুষের কোনো মূল্য গুরুত্ব ও সম্মান নেই। এরপর রিসালাত এবং ইবাদতে অবিশ্বাসী কাফের ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে : فَقَدْ كَذَّبْتُمْ অর্থাৎ তোমরা সব কিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। এখন আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো গুরুত্ব নেই।

فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا : অর্থাৎ এখন এই মিথ্যারোপ ও কুফর তোমাদের কণ্ঠহার হয়ে গেছে। তোমাদেরকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আজাবে লিপ্ত না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُضٰعَفْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُضَاعَفَةٌ মূলবর্ণ (ض - ع - ف) জিনস صحيح অর্থ- বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

يَخْلُدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার خُلُوْدٌ মূলবর্ণ (خ - ل - د) জিনস صحيح অর্থ- সে অনন্তকাল থাকবে।

مُهَانًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهَانَةٌ মূলবর্ণ (ه - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- লাঞ্ছিত অবস্থায়।

مَرُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مُرُوْرٌ ও مَرٌّ মূলবর্ণ (م - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা গিয়ে পড়ে।

لَمْ يَخِرُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جهد بلم বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার خَرٌّ ও خُرُوْرٌ মূলবর্ণ (خ - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা পতিত হয় না।

يُجْزَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা প্রাপ্ত হবে।

يُلَقَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَلْقِيَةٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা প্রাপ্ত হবে।

حَسُنَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার حُسْنٌ মূলবর্ণ (ح - س - ن) জিনস صحيح অর্থ- উত্তম হয়েছে।

مَا يَعْبَؤُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার عَبْؤٌ মূলবর্ণ (ع - ب - ء) জিনস مهموز اللام অর্থ- তিনি একটুও পারোয়া করবেন না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا : এখানে خَالِدِيْنَ টা حال হয়েছে আর فِيْهَا টা خَالِدِيْنَ এর সাথে متعلق হয়েছে। আর حَسُنَتْ হলো ফে'ল, আর তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর (যা اَلْغُرْفَة -এর দিকে ফিরেছে) হলো ফায়েল, مُسْتَقَرًّا হলো تميز আর مُقَامًا টা مُسْتَقَرًّا -এর উপর আতফ হয়েছে আর حَسُنَتْ পূর্ণ বাক্য টি اَلْغُرْفَة -এর حال ثانيه হয়েছে।

سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ مَكِّيَّةٌ

সূরা শু'আরা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত-২২৭, রুকূ'-১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. ত্বোয়া-সীন-মীম।	طٰسٓمٓ ﴿١﴾
২. এটা বিশদ বর্ণনাকারী গ্রন্থের আয়াসমূহ।	تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾
৩. মনে হয় আপনি এদের ঈমান না আনার কারণে [দুঃখে] নিজের জীবন দিয়ে দিবেন।	لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾
৪. যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে আসমান হতে তাদের প্রতি বড় একটি নিদর্শন নাজিল করে দিতে পারি, অনন্তর ঐ নিদর্শনের কারণে তাদের গ্রীবাসমূহ অবনমিত হয়ে যাবে। [কিন্তু এভাবে বাধ্য করলে, পরীক্ষার কোনো অর্থ থাকে না]।	اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ﴿٤﴾
৫. আর তাদের নিকট দয়াময় আল্লাহ হতে এমন কোনো নতুন উপদেশ উপনীত হয় না- যা হতে তারা বিমুখ না হয়।	وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. طٰسٓمٓ ত্বোয়া- সীন-মীম।

২. تِلْكَ এটা اٰيٰتُ আয়াতসমূহ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ বিশদ বর্ণনাকারী গ্রন্থের।

৩. لَعَلَّكَ মনে হয় আপনি بَاخِعٌ نَّفْسَكَ নিজের জীবন দিয়ে দিবেন اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ এদের ঈমান না আনার কারণে।

৪. اِنْ نَّشَاْ যদি আমি ইচ্ছা করি نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ তবে তাদের প্রতি নাজিল করে দিতে পারি مِّنَ السَّمَآءِ আসমান হতে اٰيَةً এক বড় নিদর্শন فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ অনন্তর তাদের গ্রীবাসমূহ হয়ে যাবে لَهَا ঐ নিদর্শনের কারণে خٰضِعِيْنَ অবনমিত।

৫. وَمَا يَاْتِيْهِمْ আর তাদের নিকট উপনীত হয় না مِّنْ ذِكْرٍ এমন কোনো উপদেশ مِّنَ الرَّحْمٰنِ দয়াময় আল্লাহ হতে اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ যা হতে তারা বিমুখ হয় না।

৬. অনন্তর তারা [সত্য ধর্মকে] মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, সুতরাং শীঘ্রই তারা ঐ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য জানবে যে সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করত।	فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦﴾
৭. তারা কি জমিনকে দেখে না যে, আমি তাতে কিরূপ উত্তম উত্তম শাক-সবজি উৎপন্ন করেছি?	اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿٧﴾
৮. তাতে এক বিরাট নিদর্শন রয়েছে, আর তাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনয়ন করে না।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾
৯. আর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক মহাপরাক্রান্ত, করুণাময়।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٩﴾
১০. এবং [স্মরণ করুন] যখন আপনার প্রতিপালক মূসাকে ডাকলেন [এবং বললেন] তুমি গমন কর সেই অনাচারী লোকদের নিকট।	وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠﴾
১১. অর্থাৎ ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট, তারা কি [আমার গজবকে] ভয় করে না?	قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ﴿١١﴾
১২. তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই আশঙ্কা হয় যে, তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।	قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. فَقَدْ كَذَّبُوْا অনন্তর তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا সুতরাং শীঘ্রই তারা ঐ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য জানবে مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যে সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করত।

৭. اَوَلَمْ يَرَوْا তারা কি দেখেনা اِلَى الْاَرْضِ জমিনকে كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا আমি তাতে কিরূপ উৎপন্ন করেছি مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ উত্তম শাক-সবজি।

৮. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً এতে এক বিরাট নিদর্শন রয়েছে وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ আর তাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনয়ন করে না।

৯. وَاِنَّ رَبَّكَ আর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ মহাপরাক্রান্ত, করুণাময়।

১০. وَاِذْ نَادٰى এবং (স্মরণ করুন) যখন ডাকলেন رَبُّكَ আপনার রব مُوْسٰٓى মূসাকে اَنِ ائْتِ তুমি গমন কর الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ সেই অনাচারী লোকদের নিকট।

১১. قَوْمَ فِرْعَوْنَ ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকট اَلَا يَتَّقُوْنَ তারা কি ভয় (আমার গজব) করে না?

১২. قَالَ তিনি বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اِنِّيْٓ اَخَافُ আমার এই আশঙ্কা হয় যে, اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

১৩. এবং আমার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং আমার জবান [ভালোরূপে] সঞ্চালিত হয় না। অতএব, হারূনের প্রতি ওহী প্রেরণ করুন।	وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾
১৪. আর আমার উপর তাদের একটি অপরাধের অভিযোগও আছে, অতএব, আমার আশঙ্কা হয় যে, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।	وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾
১৫. আল্লাহ তা'আলা বললেন, কি সাধ্য আছে? সুতরাং তোমরা আমার নিদর্শনাবলিসহ প্রস্থান কর, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, [সব] শুনতে থাকব।	قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾
১৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা সারা বিশ্বের প্রতিপালকের প্রেরিত।	فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾
১৭. যেন তুমি বনী ইসরাঈলদেরকে আমাদের সাথে যেতে দাও।	أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾
১৮. ফেরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে শৈশবকালে প্রতিপালন করিনি? এবং তুমি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে অবস্থান করেছ।	قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾
১৯. এবং তুমি সেই [কিবতী] হত্যাকাণ্ডও করেছিলে যা করেছিলে এবং তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ।	وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَيَضِيقُ صَدْرِي এবং আমার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায় وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي এবং আমার জবান (ভালোরূপে) সঞ্চালিত হয় না فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ অতএব হারূনের প্রতি ওহী প্রেরণ করুন।

১৪. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ আর আমার উপর তাদের একটি অপরাধের অভিযোগও আছে فَأَخَافُ অতএব, আমার আশঙ্কা হয় যে, أَن يَقْتُلُونِ তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

১৫. قَالَ আল্লাহ তা'আলা বললেন, كَلَّا কি সাধ্য আছে فَاذْهَبَا সুতরাং তোমরা প্রস্থান করো بِآيَاتِنَا আমার নিদর্শনাবলিসহ إِنَّا مَعَكُم আমি তোমাদের সঙ্গে আছি مُّسْتَمِعُونَ শুনতে থাকব।

১৬. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ সুতরাং তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও فَقُولَا এবং বল إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ আমরা সারা বিশ্বের প্রতিপালকের প্রেরিত।

১৭. أَنْ أَرْسِلْ যেন তুমি যেতে দাও مَعَنَا আমাদের সাথে بَنِي إِسْرَائِيلَ বনী ইসরাঈলদেরকে।

১৮. قَالَ ফেরাউন বলল أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا আমরা কি তোমাকে শৈশবকালে প্রতিপালন করিনি وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ এবং তুমি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে অবস্থান করেছ।

১৯. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ এবং তুমি সেই (কিতাবী) হত্যাকাণ্ডও করেছিলে যা করেছিলে وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ এবং তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

২০. মূসা বললেন, তখন আমি তা করে ফেলেছিলাম এবং আমার ভুলক্রমে হয়ে গিয়েছিল।	قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّآلِّينَ ﴿٢٠﴾
২১. অনন্তর যখন আমার ভয় হলো, তখন আমি তোমাদের এখান থেকে পলায়ন করলাম, অতঃপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।	فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْمًا وَّجَعَلَنِى مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾
২২. এবং ঐ নিয়ামত, যার অনুগ্রহ তুমি আমার প্রতি দেখাচ্ছ, তা তো এই যে, বনী ইসরাঈলদেরকে ভীষণ অপমানের মধ্যে ফেলে রেখেছিলে।	وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿٢٢﴾
২৩. ফেরাউন বলল, [যাকে] রাব্বুল আলামীন [বল] তা কি?	قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِينَ ﴿٢٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. قَالَ মূসা বললেন فَعَلْتُهَآ إِذًا তখন আমি তা করে ফেলেছিলাম وَّأَنَا مِنَ الضَّآلِّينَ এবং আমার ভুলক্রমে হয়ে গিয়েছিল।

২১. فَفَرَرْتُ مِنكُمْ অনন্তর তখন আমি তোমাদের এখান থেকে পলায়ন করলাম لَمَّا خِفْتُكُمْ যখন আমার ভয় হলো فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْمًا অতঃপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করলেন وَّجَعَلَنِى مِنَ الْمُرْسَلِينَ এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

২২. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ এবং ঐ নিয়ামত تَمُنُّهَا عَلَىَّ যার অনুগ্রহ তুমি আমার প্রতি দেখাচ্ছ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ তা তো এই যে, বনী ইসরাঈলদেরকে ভীষণ অপমানের মধ্যে ফেলে রেখেছিলে।

২৩. قَالَ فِرْعَوْنُ ফেরাউন বলল وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِينَ রাব্বুল আলামীন তা কি?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণ : যেহেতু এ সূরায় কবিদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, তাই আলোচ্য সূরার এ নামকরণ করা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কবিদের আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যেন তাদের মধ্যে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা প্রকাশ করা যায়। আম্বিয়া কেরাম মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হন, পক্ষান্তরে কবিগণ শুধু সাময়িকভাবে কোনো কোনো মানুষকে আনন্দ দিতে পারেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কাফের মুশরিকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করতো, তাই তিনি আন্তরিকভাবে ব্যথিত হতেন। তার এ আকাঙ্ক্ষা হতো, যদি তারা ঈমান আনতো তবে কত ভালো হতো! তাই এ সূরার প্রারম্ভে প্রিয়নবী ﷺ -কে একথা বলে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, হে রাসূল ﷺ ! যদি এ কাফের মুশরিকরা ঈমান না আনে, তবে কি আপনি তাদের চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন? এরপর কয়েকজন প্রখ্যাত নবী রাসূলের বর্ণনা রয়েছে এবং তাঁদের উম্মতরা তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছে? তা উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে যে, অবাধ্য কাফেরদের অন্যায় আচরণ নতুন কোনো বিষয় নয়. পূর্বকালের আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথেও এমন অন্যায় আচরণ করা হয়েছে, যা কাফের-মুশরিকদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

এ সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা পবিত্র কুরআন প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের সুস্পষ্ট দলিল ও জ্বলন্ত প্রমাণ। এরপর প্রিয়নবী ﷺ-এর সান্ত্বনার জন্যে এবং তাঁর নবুয়ত অস্বীকারকারীদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে সাতজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর পবিত্র কুরআনের সত্যতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ মহান গ্রন্থ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে প্রিয়নবী ﷺ-এর মুবারক কলবে নাজিল করা হয়েছে। এরপর একথাও ইরশাদ হয়েছে যে, এ মহান গ্রন্থ সম্পর্কে আহলে কিতাবদের জ্ঞানী ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অবগত, তারা খুব ভালো করেই জানে যে এটি আল্লাহ তা'আলার ওহী; কাব্য বা জাদু নয়; বরং এটা স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী যা দ্বারা সত্য অসত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং যাতে রয়েছে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ। কাব্য ও জাদুর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। –[তাফসীরে মাযহারী খ, ৮, পৃ. ৫০৫]

স্বপ্নের তাবীর : যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে সে এ সূরা তেলাওয়াত করেছে, তবে তার তাৎপর্য হবে এই -যদি তার আর্থিক সংকট থাকবে, কিন্তু তাকে সর্বদা মিথ্যা এবং অহেতুক কথা থেকে হেফাজত করা হবে।

শানে নুযূল : মক্কাবাসীরা যখন প্রিয়নবী ﷺ-কে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাদের এ আচরণ তাঁর জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়। কেননা প্রিয়নবী ﷺ-এর একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন মক্কাবাসীরা ঈমানদার হয়ে যায়। সম্ভবত প্রিয়নবী ﷺ মক্কাবাসীরা ঈমান না আনার কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন, এজন্যে যে, হয়তো আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ-কে এ মর্মে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তারা ঈমান আনে না দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না, আপনি কি তাদের দুশ্চিন্তায় নিজেকে শেষ করে দেবেন?

قَوْلُهُ طٰسٓمٓ : আল্লামা বগভী (র.) ইকরিমা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম এ অক্ষরগুলোর ব্যাখ্যা করতে অপারগ।

আলী ইবনে তালহা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটি হলো শপথ, আল্লাহ পাকের নাম দ্বারা তিনি শপথ করেছেন, কেননা এ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের অন্যতম। তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, এটি হলো পবিত্র কুরআনের অন্যতম নাম। মুহাম্মদ ইবনে কারজী (র.) বলেছেন– ط -এর অর্থ হলো কুদরত বা শক্তি আর س অর্থ নূর এবং م অর্থ مَجْدٌ বা শ্রেষ্ঠত্ব।

অতএব, এ অক্ষরগুলোর দ্বারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতা, তাঁর নূর এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ অক্ষরগুলো অন্যান্য 'মুকাত্তাআতের' ন্যায় আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর মধ্যে রহস্য একটি ব্যতীত আর কিছুই নয়। –[তাফসীরে তাবারী খ. ১৯, পৃ. ৩৭]

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ [٣]

শানে নুযূল : অনুপম শ্রুতি মধুর এবং ভাষা শৈলিতার নৈপুণ্যতায় পরিপূর্ণ আসমানি গ্রন্থ কুরআন মাজিদে রাসূল ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আরবের কাফের সম্প্রদায় তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করেনি। রাসূল ﷺ সে জন্যে অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয় চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন। কারণ রাসূল ﷺ তাদের ঈমান গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহে ব্যকুল হয়ে পড়ে ছিলেন। অপর দিকে তারা রাসূল ﷺ-এর উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালনাও শুরু করেছে। আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আলোচ্য সূরা নাজিল করেন এবং পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের কিছু ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন।

–[ফাতহুল কাদীর ৯৩/৪]

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ - بَاخِعٌ শব্দটি بَخْعٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জবাই করতে করতে বিখা' (গর্দানের একটি শিরা) পর্যন্ত পৌঁছা। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কষ্ট ও ক্লেশে পতিত করা। আল্লামা আসকারী (র.) বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার খবরবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য, নিষেধ করা। অর্থাৎ হে পয়গম্বর, স্বজাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন দেখে দুঃখ ও বেদনায় আত্মঘাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই- কোনো কাফের সম্পর্কে এরূপ জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকে তার জন্যে অধিক দুঃখ না করা উচিত।

إِنْ نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ

আল্লামা যামাখশরী (র.) বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে فَظَلُّوْا لَهَا خٰضِعِيْنَ অর্থাৎ কাফেররা এই বড় নিদর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে اَعْنَاقٌ (গর্দান) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা নত হওয়া ও বিনয়ী হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গর্দানে প্রকাশ পায়। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, আমি নিজ তাওহীদ ও কুদরতের এমন কোনো নিদর্শন প্রকাশ করতেও সক্ষম, যাতে শরিয়তের নির্দেশাবলিও আল্লাহ তা'আলার স্বরূপ জাজ্বল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারো পক্ষে অস্বীকার করার সুযোগ না থাকে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ত্ব জাজ্বল্যমান না হওয়া বরং চিন্তাভাবনার উপর নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবি। চিন্তা-ভাবনাই মানুষের পরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতেই ছওয়াব ও আজাব বর্তিত। জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহকে স্বীকার করা তো একটি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। এতে ইবাদত ও আনুগত্যের শান নেই। –[কুরতুবী]

زَوْجٍ كَرِيْمٍ : زَوْجٌ শাব্দিক অর্থ যুগল। একারণেই পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারীকে زَوْجٌ বলা হয়। অনেক বৃক্ষের মধ্যেও নর ও নারী থাকে; সেগুলোকে এ দিক দিয়ে زَوْجٌ বলা যায়। কোনো সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসাবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে زَوْجٌ বলা যায়। كَرِيْمٌ শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু।

আনুগত্যের জন্য সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয় :

قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো আদেশ পালনের ব্যাপারে কোনো সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয়; বরং বৈধ। যেমন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কাজেই এখানে একথা বলা ভুল হবে যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশকে নির্দ্বিধায় শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরি করলেন কেন? কারণ হযরত মূসা (আ.) যা করেছেন, তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন।

হযরত মূসা (আ.) এর জন্যে ضَلَالٌ শব্দের অর্থ : قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ : তুমি এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে : ফেরাউনের অভিযোগের জওয়াবে হযরত মূসা (আ.) বললেন, হ্যাঁ, আমি হত্যা অবশ্যই করেছিলাম; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না, বরং কিবতীকে তার ভুল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে ঘুষি মেরেছিলাম যার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সারকথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নবুয়্যতের পরিপন্থি; আর এ হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে ضَلَالٌ শব্দের অর্থ অজ্ঞাতে তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া। হযরত কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদের রেওয়ায়েত থেকেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আরবি ভাষায় ضَلَالٌ শব্দের অর্থ একাধিক এবং সর্বত্রই এর এর অর্থ পথভ্রষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ 'পথভ্রষ্ট' করা ঠিক নয়।

মহিমান্বিত আল্লাহর সত্তা ও স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা মানুষের জন্যে সম্ভবপর নয় : قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিমান্বিত আল্লাহর স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয়। কারণ ফেরাউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে। হযরত মূসা (আ.) স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে আল্লাহ তা'আলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং এরূপ প্রশ্ন করাই অযথা। –[রুহুল মা'আনী]

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ : বনী ইসরাঈল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা। ফেরাউন তাদেরকে স্বদেশে যেতে বাধা দিত। এভাবে চারশত বছর ধরে তারা ফেরাউনের বন্দিশালায় জীবন যাপন করছিল। তখন তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় লাখ ত্রিশ হাজার। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে সত্যের পয়গাম পৌছানোর সাথে সাথে বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্যাতন থেকে বিরত হওয়া এবং তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْمُبِيْنِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبَانَةٌ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– বিশদ বর্ণনাকারী।

بَاخِعٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার بَخْعٌ মূলবর্ণ (ب - خ - ع) জিনস صحيح অর্থ– দিয়ে দিবেন, আত্মহত্যাকারী।

خَاضِعِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার خُضُوْعٌ মূলবর্ণ (خ - ض - ع) জিনস صحيح অর্থ– অবনমিত।

يَسْتَهْزِئُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِهْزَاءٌ মূলবর্ণ (ه - ز - ء) জিনস مهموز اللام অর্থ– তারা বিদ্রূপ করত।

اِئْتِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– তুমি গমন কর।

يَضِيْقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার ضَيْقٌ মূলবর্ণ (ض - ى - ق) জিনস اجوف يائى অর্থ– সংকীর্ণ হয়ে যায়।

لَا يَنْطَلِقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْطِلَاقٌ মূলবর্ণ (ط - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ– সঞ্চালিত হয় না।

اَلَمْ نُرَبِّكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى جحد بلم বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَرْبِيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ب - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি কি তোমাকে প্রতিপালন করিনি।

ضَالِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার ضَلَالٌ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পথভ্রষ্টগণ।

خِفْتُكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَوْفٌ মূলবর্ণ (خ - و - ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি তোমাদেরকে ভয় করলাম।

تَمُنُّهَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَنٌّ মূলবর্ণ (م - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যার অনুগ্রহ তুমি দেখাচ্ছ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ : এখানে لَعَلَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, আর كَ হলো তার اسم এবং بَاخِعٌ তার খবর। আর نَفْسَكَ হলো بَاخِعٌ-এর মাফউল বিহী, এবং اَنْ ও তার অধীনে যা রয়েছে তা مفعول له অর্থাৎ خِيْفَةَ اَنْ لَا يُؤْمِنُوْا আর مُؤْمِنِيْنَ হলো يَكُوْنَ-এর খবর।

বাংলা	আরবি
২৪. মূসা বললেন, তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের এবং তাদের মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুরই প্রতিপালক, যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে চাও।	قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿۲۴﴾
২৫. ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনতেছ না?	قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿۲۵﴾
২৬. মূসা বললেন, তিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণের প্রতিপালক।	قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۲۶﴾
২৭. ফেরাউন [বুঝতে না পেরে আবার] বলতে লাগল, এই যে তোমাদের রাসূল– যিনি তোমাদের নিকট রাসূলরূপে এসেছেন, পাগল [বলে মনে হয়]।	قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿۲۷﴾
২৮. মূসা বললেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক এবং তার মধ্যস্থিত সকল বস্তুরও; যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।	قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۲۸﴾
২৯. ফেরাউন বলল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত কর, তবে তোমাকে কারাগারে প্রেরণ করব।	قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿۲۹﴾
৩০. মূসা বললেন, আমি যদি কোনো স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করি, তবুও [মানবে না]?	قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۰﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. قَالَ মূসা বললেন رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের এবং তাদের মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুরই প্রতিপালক اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে চাও।

২৫. قَالَ ফেরাউন বলল لِمَنْ حَوْلَهٗۤ তার পরিষদবর্গকে اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ তোমরা কি শুনতেছনা?

২৬. قَالَ মূসা বললেন رَبُّكُمْ তিনি তোমাদের প্রতিপালক وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণের প্রতিপালক।

২৭. قَالَ ফেরাউন বলতে লাগল اِنَّ رَسُوْلَكُمُ তোমাদের রাসূল اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ যিনি তোমাদের নিকট রাসূলরূপে এসেছেন لَمَجْنُوْنٌ পাগল (বলে মনে হয়)

২৮. قَالَ মূসা বললেন رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক وَمَا بَيْنَهُمَا এবং তার মধ্যস্থিত সকল বস্তুরও اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।

২৯. قَالَ ফেরাউন বলল لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত কর لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ তবে তোমাকে কারাগারে প্রেরণ করব।

৩০. قَالَ মূসা বললেন اَوَلَوْ جِئْتُكَ আমি যদি উপস্থাপন করি بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ কোনো স্পষ্ট প্রমাণ তবুও (মানবে না)?

অনুবাদ	আয়াত
৩১. ফেরাউন বলল, আচ্ছা তবে সে প্রমাণ উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হও।	قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. অতঃপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তখন অমনি তা একটি সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হয়ে গেল।	فَأَلْقٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾
৩৩. এবং স্বীয় হাত বের করলেন, তখন অমনি তা দর্শকবৃন্দের সম্মুখে শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে গেল।	وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. ফেরাউন তার পার্শ্বস্থ সভাসদবৃন্দকে বলল, নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি বড় অভিজ্ঞ জাদুকর।	قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾
৩৫. তার উদ্দেশ্য এই যে, সে নিজের জাদুবলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কার করবে, অতএব, তোমরা কি পরামর্শ দিচ্ছ?	يُرِيْدُ أَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তারা বলল, আপনি তাকে এবং তার ভ্রাতাকে অবকাশ দিন এবং শহরগুলোতে সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করুন	قَالُوْا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. যেন তারা প্রতিটি অভিজ্ঞ জাদুকরদেরকে আপনার নিকট উপস্থিত করে।	يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿٣٧﴾
৩৮. মোটকথা, এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো।	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. قَالَ ফেরাউন বলল فَأْتِ بِهِ আচ্ছা, তবে সেই প্রমাণ উপস্থিত কর إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৩২. فَأَلْقٰى عَصَاهُ অতঃপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ তখন অমনি তা একটি সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হয়ে গেল।

৩৩. وَنَزَعَ يَدَهُ এবং স্বীয় হাত বের করলেন فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ তখন অমনি তা দর্শকবৃন্দের সম্মুখে শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে গেল।

৩৪. قَالَ ফেরাউন বলল لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ তার পার্শ্বস্থ সভাসদবৃন্দকে إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি বড় অভিজ্ঞ জাদুকর।

৩৫. يُرِيْدُ তার উদ্দেশ্য এই যে, أَنْ يُّخْرِجَكُمْ সে তোমাদেরকে বহিষ্কার করবে مِّنْ أَرْضِكُمْ তোমাদের দেশ হতে بِسِحْرِهِ নিজের জাদু বলে فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ অতএব তোমরা কি পরামর্শ দিচ্ছ?

৩৬. قَالُوْا তারা বলল أَرْجِهْ وَأَخَاهُ আপনি তাকে ও তার ভ্রাতাকে অবকাশ দিন وَابْعَثْ, এবং প্রেরণ করুন فِي الْمَدَائِنِ শহরগুলোতে حٰشِرِيْنَ সংগ্রহকারীদেরকে।

৩৭. يَأْتُوْكَ যে তারা আপনার নিকট নিয়ে আসে بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ সমস্ত অভিজ্ঞ জাদুকরদেরকে।

৩৮. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ মোটকথা জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।

৩৯. এবং লোকদেরকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হলো যে, তোমরা কি সমবেত হবে?	وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾
৪০. যেন আমরা জাদুকরদের পন্থায় থাকতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।	لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾
৪১. অতঃপর যখন জাদুকররা উপস্থিত হলো, তখন ফেরাউনকে বলতে লাগল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে কি আমরা কোনো বিরাট প্রতিদান পাব?	فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾
৪২. ফেরাউন বলল, হ্যাঁ, এবং তোমরা তদবস্থায় নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾
৪৩. মূসা তাদেরকে বললেন, তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করতে হয়, নিক্ষেপ কর।	قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. وَقِيلَ لِلنَّاسِ এবং লোকদেরকে এই বিজ্ঞাপন প্রদান করা হলো যে, هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ তোমরা কি সমবেত হবে?

৪০. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ যেন আমরা জাদুকরদের পন্থায় থাকতে পারি إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ যদি তারা বিজয়ী হয়।

৪১. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ অতঃপর যখন জাদুকররা উপস্থিত হলো قَالُوا لِفِرْعَوْنَ তারা ফেরাউনকে বলতে লাগল। أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا তবে কি আমরা কোনো বিরাট প্রতিদান পাব? إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ যদি আমরা বিজয়ী হই।

৪২. قَالَ نَعَمْ ফেরাউন বলল হ্যাঁ, وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ এবং তোমরা তদবস্থায় নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪৩. قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ মূসা তাদেরকে বললেন। أَلْقُوا নিক্ষেপ কর مَا أَنتُم مُّلْقُونَ তোমাদের যা কিছু নিক্ষেপ করতে হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পয়গম্বরসুলভ বিতর্কের একটি নমুনা ও বিতর্কের কার্যকরী রীতিনীতি : দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে আদর্শগত বাকবিতণ্ডা যাকে পরিভাষায় মুনাযারা বা বিতর্ক বলা হয়, প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক একটি হারজিতের খেলায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের সারমর্ম এতটুকুই যে, নিজের দাবি সর্বাবস্থায় উচ্চে থাকতে হবে যদিও এর ভ্রান্তি নিজেরও জানা হয়ে যায়। এই দাবিকে নির্ভুল ও জোরদার প্রমাণ করার জন্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ ও মেধাশক্তি নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে। এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোনো দাবি সত্য ও নির্ভুল হলেও তা খণ্ডনই করতে হবে। এবং খণ্ডনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামই এই বিতর্কে বিশেষ সভ্যতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করে একে প্রচার ও সংশোধনকার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করা যায়। হযরত মূসা ও হারুন (আ.) যখন ফেরাউনের মতো স্বৈরাচারী ও খোদায়ীর দাবিদারকে তার দরবারে সত্যের পয়গাম পৌঁছালেন, তখন সে হযরত মূসা (আ.) -এর ব্যক্তিগত দুটি বিষয় দ্বারা বিরোধী আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করল, যেমন সুচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণতঃ যখন আসল বিষয়ের জওয়াব

দিতে সক্ষম হয় না; তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা খোঁজ করে এবং বর্ণনা করে, যাতে সে লজ্জিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়। এখানেও ফেরাউন দু'টি বিষয় বর্ণনা করল। (এক) তুমি আমাদের লালিত-পালিত এবং আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছ। তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ আছে। কাজেই তোমার সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বল? (দুই) তুমি একজন কিবতীকে অহেতুক হত্যা করেছ। এটা যেমন জুলুম, তেমনি নিমকহারামি ও কৃতঘ্নতা। তুমি যে সম্প্রদায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে পদার্পণ করেছ, তাদেরই একজনকে তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে হযরত মূসা (আ.)-এর পয়গম্বরসুলভ জওয়াব দেখুন। প্রথমত তিনি জওয়াবে প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে কিবতীর হত্যাকাণ্ডের জওয়াব প্রথমে দিলেন; যা ফেরাউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহ, যা ফেরআউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জওয়াব পরে দিলেন। এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য এরূপ মনে হয় যে, হত্যা ঘটনার ব্যাপারে তাঁর একটি দুর্বলতা অবশ্যই ছিল। আজ কালকার বিতর্কে এরূপ বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল এর জওয়াবকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং জবাবও মোটামুটি দোষ স্বীকারের মাধ্যমেই দিলেন। প্রতিপক্ষ বলবে যে, তিনি দোষ স্বীকার করে পরাজয় মেনে নিয়েছেন, তিনি মোটেই এদিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি।

হযরত মূসা (আ.) জবাবে এ কথা স্বীকার করে নিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ভুল ও বিচ্যুতি হয়ে গেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে তুললেন যে, এটা একটা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পদক্ষেপ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে ফেলে। লক্ষ্য ছিল, কিবতীকে ইসরাঈলীর প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত করা। এই লক্ষ্যেই তাকে একটি ঘুষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ হত্যাকাণ্ড ছিল ভ্রান্তিপ্রসূত। কাজেই আমার নবুয়ত দাবির সত্যতায় এটা কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভুল জানতে পেরে আইনগত ধরপাকড়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা অতঃপর আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাকে নবুয়ত ও রেসালত দ্বারা ভূষিত করেন।

চিন্তা করুন, শত্রুর বিপক্ষে তখন হযরত মূসা (আ.)-এর সোজা ও পরিষ্কার জওয়াব এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি কিবতীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে তার হত্যার বৈধতার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতেন। তাঁকে মিথ্যারোপ করার মতোও কেউ সেখানে বিদ্যমান ছিল না। হযরত মূসা (আ.)-এর স্থলে অন্য কেউ হলে সে তাই করত। কিন্তু সেখানে তো আল্লাহ তা'আলার একজন নিষ্ঠাবান এবং সততার মূর্তমান প্রতীক পয়গম্বর ছিলেন, যিনি সত্য ও সততা প্রকাশ করাকেই বিজয় বলে গণ্য করতেন। তিনি শত্রুর জনাকীর্ণ দরবারে একদিকে নিজের বিচ্যুতি স্বীকার করে নিলেন এবং অপরদিকে এর কারণে নবুয়ত ও রেসালতে যে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিতে পারত, তারও জওয়াব প্রদান করলেন

এরপর প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াব প্রদানে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ফেরাউনের বাহ্যিক অনুগ্রহের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, চিন্তা কর, আমি কোথায় এবং ফেরাউনের দরবার কোথায়। যে কারণের উপর ভিত্তি করে আমি তোমার গৃহে লালিত-পালিত হয়েছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলেই এ সত্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। তুমি বনী ইসরাঈলের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলে এবং তাদের নিরপরাধ ও নিষ্পাপ ছেলে-সন্তানদেরকে হত্যা করছিলে। বাহ্যত তোমার এই জুলুম ও উৎপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য আমার জননী আমাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করেন। ঘটনাক্রমে তুমি আমার সিন্দুক দরিয়া থেকে উদ্ধার করে আমাকে স্বগৃহে লালন-পালন কর। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ তা'আলা বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থা এবং তোমার নির্যাতনের অদৃশ্য শাস্তি ছিল। যে ছেলের বিপদাশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তুমি হাজারো ছেলেকে হত্যা করেছিলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তোমারই গৃহে লালন-পালন করিয়েছেন। এখন চিন্তা কর, আমার লালন-পালনে তোমার কি অনুগ্রহ ছিল। এই পয়গম্বরসুলভ জওয়াব থেকে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী এ কথা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নিল যে, ইনি প্রগলভ নন, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেন না। এরপর বিভিন্ন মু'জিযা দেখে এ কথার সত্যতা আরও পরিস্ফুট হয়ে গেল। তারা মুখে স্বীকার করেনি বটে; কিন্তু ভীত ও প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। ফলে একদিকে মাত্র দুইজন ব্যক্তি, যাদের অগ্র-পশ্চাতে তৃতীয় কোনো সাহায্যকারী ছিল না এবং অপরদিকে দরবার ফেরাউনের, শহর ও দেশ ফেরাউনের; কিন্তু ভয় ও আশঙ্কা এই যে, এরা দুইজন আমাদেরকে এই দেশ ও রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে ছাড়বে।

এ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত প্রভাব এবং সততা ও সত্যের ভয়ভীতি। পয়গম্বরগণের বাকবিতণ্ডা ও বিতর্ক এবং সততা ও প্রতিপক্ষের ধর্মীয় হিতাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। এরূপ বিতর্কই অন্তরে স্থায়ী আসন নিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং বড় বড় পাষণ্ডকে বশীভূত করে ছাড়ে।

اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) জাদুকরদেরকে বললেন, তোমাদের যা জাদু প্রদর্শন করবার, প্রদর্শন কর। এতে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সন্দেহ হয় যে, হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ দিচ্ছেন কেমন করে? কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল না; বরং তাদের যা কিছু করার ছিল, তা বাতিল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তবে যেহেতু প্রকাশ করা ব্যতীত বাতিল করা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি জাদুকরদেরকে জাদু প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন; যেমন, কোনো আল্লাহদ্রোহীকে বলা হয় যে, তুমি তোমার আল্লাহদ্রোহিতার প্রমাণাদি পেশ কর, যাতে আমি সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। বলাবাহুল্য, একে আল্লাদ্রোহিতায় সম্মতি বলা যায় না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَمَجْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার جَنٌّ মূলবর্ণ (ج - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পাগল।

اَلْمَسْجُوْنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার سِجْنٌ মূলবর্ণ (س - ج - ن) জিনস صحيح অর্থ– কারাগারে, কারাবন্দীগণ।

يُرِيْدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَادَةٌ মূলবর্ণ (ر - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তার উদ্দেশ্য, সে চায়।

اَرْجِهْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرْجَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ج - أ) জিনস مهموز اللام অর্থ– আপনি অবকাশ দিন।

حَاشِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার حَشْرٌ মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– সংগ্রহকারী।

فَجُمِعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَتَحَ মাসদার جَمْعٌ মূলবর্ণ (ج - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– একত্র করা হলো।

اَلْمُقَرَّبِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْرِيْبٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অথ– নৈকট্য প্রাপ্তগণ।

مُّلْقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিক্ষেপ করতে হয়, নিক্ষেপ্য।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ : এখানে فَاَلْقٰى -এর فاء হলো আতেফা আর اَلْقٰى ফে'ল উহ্য যমীর هو হলো তার ফায়েল আর عَصَاهُ হলো তার مفعول به আর فَاِذَا -এর فا টি আতেফা, আর اِذَا হলো افجائية : আর هِىَ হলো মুবতাদা ثُعْبَانٌ হলো তার খবর। আর مُّبِيْنٌ হলো ثُعْبَانٌ -এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০১]

৪৪. সুতরাং তারা নিক্ষেপ করল নিজেদের রশি ও লাঠিসমূহ এবং বলল, ফেরাউনের সৌভাগ্যের শপথ, নিশ্চয় আমরাই জয়লাভ করব।	فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. অতঃপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তখন অমনি তা [অজগর হয়ে] তাদের কৃত্রিম ধাঁধাগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।	فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. তখন জাদুকররা [তা দেখে] সকলে সেজদায় পতিত হলো,	فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. বলল, আমরা বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।	قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।	رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. ফেরাউন বলল, আচ্ছা আমার অনুমতি দেওয়া ব্যতিরেকেই তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই [আমার মনে হয়] এ ব্যক্তি [জাদুবিদ্যায়] তোমাদের সকলের গুরু, যে তোমাদেরকে জাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব, এখনই তোমরা প্রকৃত তথ্য জানতে পারবে; [তা এই যে,] আমি তোমাদের এক পার্শ্বের হাত এবং অপর পার্শ্বের পা কর্তন করব এবং তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।	قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۬ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. فَاَلْقَوْا সুতরাং তারা নিক্ষেপ করল حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ নিজেদের রশি ও লাঠিসমূহ। وَقَالُوْا এবং বলল بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের সৌভাগ্যের শপথ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ নিশ্চয় আমরাই জয়লাভ করব।

৪৫. فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ অতঃপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ তখন অমনি তা (অজগর হয়ে) গ্রাস করতে লাগল مَا يَاْفِكُوْنَ তাদের কৃত্রিম ধাঁধাগুলোকে।

৪৬. فَاُلْقِيَ তখন পতিত হলো السَّحَرَةُ জাদুকররা সকলে سٰجِدِيْنَ সেজদায়।

৪৭. قَالُوْا বলল اٰمَنَّا আমরা ঈমান আনলাম بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতি।

৪৮. رَبِّ যিনি প্রতিপালক مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ মূসা ও হারূনের।

৪৯. قَالَ ফেরাউন বলল اٰمَنْتُمْ لَهٗ আচ্ছা তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনলে قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ আমার অনুমতি দেওয়া ব্যতিরেকেই اِنَّهٗ নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি لَكَبِيْرُكُمْ তোমাদের সকলের গুরু الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ যে তোমাদেরকে জাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অতএব, এখনই তোমরা প্রকৃত তথ্য জানতে পারবে لَاُقَطِّعَنَّ আমি কর্তন করব اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ তোমাদের এক পার্শ্বের হাত এবং অপর পার্শ্বের পা وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ এবং তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।

৫০. তারা উত্তরে বলল, কোনো ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সমীপে প্রত্যাবর্তন করব।	قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۫ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন, যেহেতু আমরা সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি।	اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾
৫২. আর আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম আমার বান্দাদেরকে রাতারাতি [মিসর হতে] বের করে নিয়ে যাও, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।	وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. ফেরাউন নগরসমূহে [লোক] সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করল।	فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. তারা [বনী ইসরাঈলরা আমাদের তুলনায়] একটি ক্ষুদ্র দল।	اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. এবং তারা আমাদেরকে অত্যন্ত উত্যক্ত করেছে।	وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. পক্ষান্তরে আমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি সম্প্রদায়।	وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. অবশেষে আমি তাদেরকে [ফেরাউন কওমকে] বাগানসমূহ ও ঝরণাসমূহ হতে বের করে দিলাম।	فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. قَالُوْا তারা উত্তরে বলল لَا ضَيْرَ কোনো ক্ষতি নেই اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ আমরা আমাদের প্রতিপালকের সমীপে প্রত্যাবর্তন করব।

৫১. اِنَّا نَطْمَعُ আমরা আশা রাখি যে, اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا আমাদের প্রতিপালক ক্ষমা করবেন خَطٰيٰنَاۤ আমাদের অপরাধসমূহ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ যেহেতু আমরা সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি।

৫২. وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى আর আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْۤ আমার বান্দাদেরকে রাতারাতি বের করে নিয়ে যাও اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

৫৩. فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ ফেরাউন প্রেরণ করল فِى الْمَدَآئِنِ নগরসমূহে حٰشِرِيْنَ সংগ্রহকারীদেরকে।

৫৪. اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ তারা لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ একটি ক্ষুদ্র দল।

৫৫. وَاِنَّهُمْ لَنَا এবং তারা আমাদেরকে لَغَآئِظُوْنَ অত্যন্ত উত্যক্ত করেছে।

৫৬. وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ পক্ষান্তরে আমরা একটি সম্প্রদায় حٰذِرُوْنَ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

৫৭. فَاَخْرَجْنٰهُمْ অবশেষে আমি তাদেরকে বের করে দিলাম مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ বাগানসমূহ ও ঝরণা সমূহ হতে।

৫৮. এবং ধন-ভাণ্ডারসমূহ এবং উত্তম প্রাসাদ হতেও।	وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٥٨﴾
৫৯. [আমি] এরূপ করলাম, আর তাদের পরে বনী ইসরাঈলদেরকে তৎসমুদয়ের মালিক করে দিলাম।	كَذٰلِكَ ؕ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾
৬০. মোটকথা, তারা [একদিন] সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।	فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখতে পেল, তখন মূসার সঙ্গীগণ বলতে লাগল, আমরা তো তাদের হাতে ধৃত হলাম।	فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. মূসা বললেন, কখনই নয়, কেননা আমার পরওয়ারদেগার আমার সঙ্গে আছেন, তিনি এখনই আমাকে পথ দেখাবেন।	قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٦٢﴾
৬৩. অতঃপর আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল, এবং প্রত্যেক অংশই বৃহৎ পর্বতসদৃশ ছিল।	فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿٦٣﴾
৬৪. আর অপর দলটিকেও ঐ স্থানের নিকট পৌঁছিয়ে দিলাম।	وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. وَكُنُوْزٍ এবং ধন ভাণ্ডারসমূহ وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ এবং উত্তম প্রাসাদ হতেও।

৫৯. كَذٰلِكَ এরূপ করলাম وَاَوْرَثْنٰهَا আর তাদের পরে তৎসমুদয়ের মালিক করে দিলাম بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলদেরকে।

৬০. فَاَتْبَعُوْهُمْ মোটকথা তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল مُّشْرِقِيْنَ সূর্যোদয়কালে।

৬১. فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ অতঃপর যখন উভয়দল পরস্পরকে দেখতে পেল قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى তখন মূসার সঙ্গীগণ বলতে লাগল اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ আমরা তো তাদের হাতে ধৃত হলাম।

৬২. قَالَ মূসা বললেন كَلَّا কখনই নয় اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ কেননা আমার পরওয়ারদেগার আমার সঙ্গে আছেন سَيَهْدِيْنِ তিনি এখনই আমাকে পথ দেখাবেন।

৬৩. فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى অতঃপর আমি মূসাকে নির্দেশ করলাম اَنِ اضْرِبْ আঘাত কর بِّعَصَاكَ তোমার লাঠি দ্বারা الْبَحْرَ সাগরে فَانْفَلَقَ ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ এবং প্রত্যেক অংশই বৃহৎ পর্বতসদৃশ ছিল।

৬৪. وَاَزْلَفْنَا আর ঐ স্থানের নিকট পৌঁছিয়ে দিলাম ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ অপর দলটিকেও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ : এ বাক্যটি জাদুকরদের জন্য কসম পর্যায়ের। মূর্খতা যুগে এর প্রচলন ছিল। পরিতাপের বিষয়! আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ কসম প্রচলিত হয়ে গেছে, যা এর চাইতেও মন্দ। উদাহরণত : বাদশাহর কসম, তোমার বাপের কবরের কসম ইত্যাদি। এ ধরনের কসম শরিয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েজ; বরং এগুলো সম্পর্কে একথা বলা ভুল হবে না যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যেমন বিরাট পাপ, এসব নামের সত্য কসম খাওয়াও তার চাইতে কম পাপ নয়। –[রূহুল -মা'আনী]

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ : অর্থাৎ যখন ফেরাউন জাদুকরদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে হত্যা, হস্তপদ কর্তন ও শূলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে জওয়াব দিল, তুমি যা করতে পার কর; আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাব। সেখানে আরামই আরাম।

এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আজীবন জাদুর কুফরে লিপ্ত, ফেরাউনের উপাস্যতা স্বীকারকারী এবং ফেরাউন পূজা-অর্চনাকারী এই জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা দেখে স্বজাতির পক্ষে ফেরাউনের মতো স্বৈরাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে ঈমানের কথা ঘোষণা করল কিরূপে? এটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এখানে শুধু ঈমানের ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের এমন গভীর রঙও প্রকাশ পেয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে, তারা পরকালের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোনো শাস্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ (তোমার যা করবার, করে ফেল) বলে দিয়েছে। এটাও প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসা (আ.) -এর মু'জিযা, যা লাঠি ও শুভ্র হাতের মু'জিযার চাইতে কোনো অংশে কম নয়। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমাদের প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে সত্তর বছরের কাফেরের মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যে, সে শুধু মু'মিনই নয়; বরং যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِيٓ إِسْرَآئِيلَ : আয়াতে বাহ্যতঃ বলা হয়েছে যে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি, বাগ-বাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈলকে করে দেওয়া হয়। কিন্তু এতে একটি ঐতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং কুরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফেরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী-ইসরাঈল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্র ভূমি শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফের জাতির সাথে জেহাদ করে তাদের শহর অধিকার করার আদেশ প্রাপ্ত হয়। বনী ইসরাঈল এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে আজাব হিসাবে তীহের উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। তারা সেই ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই তীহ প্রান্তরেই তাদের উভয় পয়গম্বর হযরত মূসা ও হারুন (আ.) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসগ্রন্থ থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাঈল কোনো সময় দলবদ্ধও জাতিগত পরিচিতি মর্যাদা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফেরাউন সম্প্রদায়ের বিষয় -সম্পত্তি ও ধন-ভাণ্ডারের উপর বনী ইসরাঈলের অধিকার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দু'টি জওয়াব তাফসীরবিদ হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (র) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত হাসান (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু একথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফেরাউনের ধ্বংসের তাৎক্ষণিক পর ঘটবে। তীহ প্রান্তরের ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিসরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থ কোনোরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিসরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তিটি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ তখনকার ইতিহাস ইহুদি ও খ্রিস্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এ কারণে কুরআনের আয়াতে কোনোরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হযরত কাতাদাহ (র.)

বলেন, এই ঘটনাটি কুরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে, যেমন সূরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, ১৩৭, এ সূরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সূরা দুখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং সূরা শু'আরার আলোচ্য ৫৯ নম্বর আয়াতে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। এসব আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, বনী ইসরাঈলকে বিশেষভাবে ফেরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বাগ-বাগিচা ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য বনী-ইসরাঈলের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরি। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান আছে যে, বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ বাগ-বাগিচা ধন-ভাণ্ডারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরি নয়; বরং অনুরূপ বাগ-বাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হতে পারে। সূরা আ'রাফের আয়াত اَلَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا শব্দ থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, শামদেশকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে بٰرَكْنَا ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হযরত কাতাদাহ্ (রা.) বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে কুরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয়। সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল কোনো সময়ই সমষ্টিগতভাবে মিসর অধিকার করেনি, তবে হযরত কাতাদাহ এর তাফসীর অনুযায়ী উল্লিখিত সব আয়াত শামদেশে তার বাগ-বাগিচা ও অর্থ ভাণ্ডারের মালিক হওয়া বোঝানো যেতে পারে।

قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ قَالَ كَلَّاۤ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ : পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাউন সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এসে গেল, তখন সমগ্র বনী ইসরাঈল চিৎকার করে উঠলো, হায়! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরিই বা কি ছিল, পশ্চাতে অমিতবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সম্মুখে সমুদ্র অন্তরায়। এই পরিস্থিতি হযরত মূসা (আ.)-এরও অগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তখনও সজোরে বললেন كَلَّا আমরা কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে, اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। ঈমানের পরীক্ষা এরূপ স্থলেই হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ.) -এর চোখে মুখে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। হুবহু এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরিগুহায় আত্মগোপনের সময় আমাদের রাসূলে মাকবূল ﷺ-এর সাথেও ঘটেছিল। পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রু এই গিরিগুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য নিচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি হুবহু এই উত্তরই দেন لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই ঘটনার মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে, হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ জওয়াবে مَعَنَا বলেছেন। অর্থাৎ আমাদের উভয়ের সাথে আল্লাহ আছেন। এটা উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য যে, এ উম্মতের ব্যক্তিবর্গ ও তাদের রাসূলের সাথে আল্লাহর সঙ্গ দ্বারা ভূষিত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَاَلْقَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সুতরাং তারা নিক্ষেপ করল।

تَلْقَفُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার لَقْفٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ف) জিনস صحيح অর্থ– তা গ্রাস করতে লাগল।

يَأْفِكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِفْكٌ মূলবর্ণ (أ - ف - ك) জিনস مهموز الفاء অর্থ– তাদের কৃত্রিম ধাঁধাগুলো।

لَاُقَطِّعَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة درفعل مستقبل معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْطِيْعٌ মূলবর্ণ (ق - ط - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– আমি কর্তন করব।

لَأُصَلِّبَنَّكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ معروف مستقبل درفعل تاكيد ثقيلة بانون تاكيد لام বাব تَفْعِيل মাসদার تَصْلِيْبٌ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– আমি তোমাদেরকে শূলে চড়াব।

نَطْمَعُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার طَمْعٌ মূলবর্ণ (ط ـ م ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– আমরা আশা রাখি।

مُتَّبَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّبَاعٌ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

لَغَائِظُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার غَيْظٌ মূলবর্ণ (غ ـ ى ـ ظ) জিনস اجوف يائى অর্থ– অত্যন্ত উত্ত্যক্ত করেছে।

حٰذِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার حَذَرٌ মূলবর্ণ (ح ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত।

أَوْرَثْنٰهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْرَاثٌ মূলবর্ণ (و ـ ر ـ ث) জিনস مثال واوى অর্থ– আমি তৎসমুদয়ের মালিক করে দিলাম।

لَمُدْرَكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْرَاكٌ মূলবর্ণ (د ـ ر ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– তাদের হাতে ধৃত হলাম।

فَانْفَلَقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْفِلَاقٌ মূলবর্ণ (ف ـ ل ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : এখানে قَالُوْا ফে'ল ও ফায়েল মিলে قول হয়েছে। আর اٰمَنَّا ফে'ল আর যমীর نَا ফায়েল আর بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ হলো اٰمَنَّا-এর সাথে متعلق এখন ফে'ল, ফায়েল ও متعلق মিলে مقول

–ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫।

৬৫. এবং আমি মূসাকে ও তার সঙ্গীর সকলকে উদ্ধার করে নিলাম।	وَاَنۡجَيۡنَا مُوۡسٰى وَمَنۡ مَّعَهٗۤ اَجۡمَعِيۡنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. তৎপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম।	ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. এই ঘটনাটিতে বড় উপদেশ রয়েছে এবং তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।	اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. আর আপনার প্রতিপালক মহাপরাক্রান্ত, পরম দয়াময়।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ ﴿٦٨﴾
৬৯. আর আপনি তাদের সম্মুখে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা করুন।	وَاتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَاَ اِبۡرٰهِيۡمَ ﴿٦٩﴾
৭০. যখন তিনি স্বীয় পিতা এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের উপাসনা কর?	اِذۡ قَالَ لِاَبِيۡهِ وَقَوۡمِهٖ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ﴿٧٠﴾
৭১. তারা বলল, আমরা মূর্তিসমূহের উপাসনা করি এবং আমরা তাদেরই নিকট একনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকি।	قَالُوۡا نَعۡبُدُ اَصۡنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيۡنَ ﴿٧١﴾
৭২. ইবরাহীম বললেন, তারা কি তোমাদের [ডাক] শুনে যখন তোমরা তাদেরকে ডাক?	قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُوۡنَكُمۡ اِذۡ تَدۡعُوۡنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের কোনো উপকার বা কোনো অপকার করতে পারে?	اَوۡ يَنۡفَعُوۡنَكُمۡ اَوۡ يَضُرُّوۡنَ ﴿٧٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৫. وَاَنۡجَيۡنَا এবং আমি উদ্ধার করে নিলাম مُوۡسٰى وَمَنۡ مَّعَهٗۤ মূসাকেও তার সঙ্গীর اَجۡمَعِيۡنَ সকলকে।

৬৬. ثُمَّ তৎপর اَغۡرَقۡنَا নিমজ্জিত করলাম الۡاٰخَرِيۡنَ অপর দলটিকে।

৬৭. اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً এ ঘটনাটিতে বড় উপদেশ রয়েছে وَمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ এবং তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

৬৮. وَاِنَّ رَبَّكَ আর আপনার প্রতিপালক لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ মহাপরাক্রান্ত, পরম দয়াময়।

৬৯. وَاتۡلُ عَلَيۡهِمۡ আর আপনি তাদের সম্মুখে বর্ণনা করুন نَبَاَ اِبۡرٰهِيۡمَ ইবরাহীমের ঘটনা।

৭০. اِذۡ قَالَ যখন তিনি বললেন لِاَبِيۡهِ وَقَوۡمِهٖ স্বীয় পিতা এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে مَا تَعۡبُدُوۡنَ তোমরা কিসের উপাসনা কর?

৭১. قَالُوۡا তারা বলল نَعۡبُدُ اَصۡنَامًا আমরা মূর্তিসমূহের উপাসনা করি فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيۡنَ এবং আমরা তাদেরই নিকট একনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকি।

৭২. قَالَ ইবরাহীম বললেন هَلۡ يَسۡمَعُوۡنَكُمۡ তারা কি তোমাদের (ডাক) শুনে اِذۡ تَدۡعُوۡنَ যখন তোমরা তাদেরকে ডাক।

৭৩. اَوۡ يَنۡفَعُوۡنَكُمۡ অথবা এরা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে اَوۡ يَضُرُّوۡنَ বা কোনো অপকার করতে পারে।

অনুবাদ	আয়াত
৭৪. তারা বলল; না বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এভাবে করতে দেখেছি।	قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾
৭৫. ইবরাহীম বললেন, আচ্ছা তোমরা কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেছ, যাদের উপাসনা করছ।	قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾
৭৬. তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণও?	أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾
৭৭. বস্তুত এগুলো হচ্ছে আমার অনিষ্টের কারণ, তবে হ্যাঁ, বিশ্বপ্রতিপালক।	فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾
৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন।	الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾
৭৯. এবং যিনি আমাকে আহার করান এবং পান করান।	وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾
৮০. এবং যখন আমি পীড়িত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।	وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾
৮১. এবং যিনি [নির্দিষ্ট সময়ে] আমাকে মৃত্যু দান করবেন, তৎপর আমাকে জীবিত করবেন।	وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾
৮২. আর যার নিকট এই আশা আছে যে, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার সকল ভুল-ত্রুটি মার্জনা করবেন।	وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾
৮৩. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে হেকমত [বিচার-বুদ্ধি] দান করুন এবং আমাকে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।	رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৪. قَالُوا তারা বলল بَلْ না, বরং وَجَدْنَا آبَاءَنَا, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে দেখেছি كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ এভাবে করতে।

৭৫. قَالَ ইবরাহীম বললেন أَفَرَأَيْتُم আচ্ছা তোমরা কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেছ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ যাদের উপাসনা করছ।

৭৬. أَنتُمْ তোমরা وَآبَاؤُكُمُ ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণও الْأَقْدَمُونَ পূর্ববর্তী।

৭৭. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي বস্তুত : এগুলো হচ্ছে আমার অনিষ্টের কারণ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ তবে হ্যাঁ বিশ্বপ্রতিপালক।

৭৮. الَّذِي خَلَقَنِي যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন فَهُوَ يَهْدِينِ অনন্তর তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন।

৭৯. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي এবং যিনি আমাকে আহার করান وَيَسْقِينِ ও পান করান।

৮০. وَإِذَا مَرِضْتُ এবং যখন আমি পীড়িত হই فَهُوَ يَشْفِينِ তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।

৮১. وَالَّذِي يُمِيتُنِي, এবং যিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন ثُمَّ يُحْيِينِ তৎপর আমাকে জীবিত করবেন।

৮২. وَالَّذِي أَطْمَعُ আর যার নিকট এ আশা আছে যে, أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي তিনি আমার সকল ভুল-ত্রুটি মার্জনা করবেন يَوْمَ الدِّينِ কিয়ামত দিবসে।

৮৩. رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! هَبْ لِي حُكْمًا আমাকে হেকমত দান করুন وَأَلْحِقْنِي এবং আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন بِالصَّالِحِينَ নেককার লোকদের।

অনুবাদ	আয়াত
৮৪. এবং ভবিষ্যতে-আগমনকারীদের মধ্যে আমার উল্লেখ অব্যাহত রাখুন।	وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. এবং আমাকে জান্নাতে নাঈম-এর উপযোগীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।	وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٥﴾
৮৬. এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, যেহেতু তিনি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।	وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. আর যেদিন সকলে জীবিত হয়ে উঠবে সেদিন আমাকে অপমানিত করবেন না।	وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. যেদিন ধন-সম্পদও কোনো কাজে আসবে না এবং সন্তানসন্ততিও না।	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মা নিয়ে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে।	اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾
৯০. এবং মুত্তাকী লোকদের জন্য জান্নাতকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।	وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৪. وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ এবং আমার উল্লেখ অব্যাহত রাখুন فِي الْاٰخِرِيْنَ ভবিষ্যতে আগমনকারীদের মধ্যে।

৮৫. وَاجْعَلْنِيْ এবং আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ জান্নাতে নাঈম -এর উপযোগীদের ।

৮৬. وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ যেহেতু তিনি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

৮৭. وَلَا تُخْزِنِيْ আর সেদিন আমাকে অপমানিত করবেন না يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ যেদিন সকলে জীবিত হয় উঠবে।

৮৮. يَوْمَ যেদিন لَا يَنْفَعُ কেনো কাজে আসবে না مَالٌ ধন-সম্পদ ও وَّلَا بَنُوْنَ এবং সন্তান-সন্ততিও ।

৮৯. اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ পবিত্র আত্মা নিয়ে

৯০. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ এবং জান্নাতকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে لِلْمُتَّقِيْنَ মুত্তাকী লোকদের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি বজায় রাখার দোয়া : وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ এই আয়াতে لِسَانَ বলে আলোচনা বোঝানো হয়েছে এবং এর লাম উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, হে আল্লাহ আমাকে এমন সুন্দর তরিকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সদগুণাবলি দ্বারা স্মরণ করে। (ইবনে কাসীর, রূহুল মা'আনী) আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। ফলে ইহুদি, খ্রিস্টান এমন কি মক্কার মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতকে ভালোবাসে এবং নিজেদেরকে এর অনুসারী বলে। যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর, শিরকে পরিপূর্ণ তথাপি তাদের দাবি এই যে; আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায় তো যথার্থরূপেই মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হওয়াকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করে।

খ্যাতি ও যশপ্রীতি নিন্দনীয়, কিন্তু কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বৈধ : যশপ্রীতি অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কুরআন পাক পরকালের নিয়ামত লাভকে যশপ্রীতি বর্জনের উপর নির্ভরশীল ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে :

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করেছেন যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার প্রশংসা গুণকীর্তন হোক। এটা বাহ্যতঃ যশপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। কিন্তু আয়াতের ভাষার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এই দোয়ার আসল লক্ষ্য যশপ্রীতি নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দোয়া যে, আমাকে এমন সৎকর্মের তাওফীক দান করুন, যা আমার আখেরাতের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও সৎকর্মের প্রেরণা জাগে এবং আমার পরেও যেন মানুষ সৎকর্মে আমার অনুসরণ করে। সারকথা এই যে, এই দোয়ার দ্বারা কোনো সুখ্যাতি ও যশলাভের উপকার লাভ উদ্দেশ্যই নয়। কুরআন ও হাদীসে যে যশপ্রীতি নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তা দ্বারা পার্থিব মুনাফা অর্জন।

ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী হযরত কা'ব ইবনে মালেকের জবানী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগপালের এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, যতটুকু দুইটি অভ্যাস মানুষের ধর্মের ক্ষতি করে। এক. অর্থসম্পদের ভালোবাসা এবং দুই. সম্মান ও যশ অন্বেষণ। দায়লামী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যশ ও প্রশংসাপ্রীতি মানুষকে অন্ধ-বধির করে দেয়। এসব রেওয়ায়েতে সেই যশপ্রীতি ও প্রশংসা অন্বেষণ বুঝানো হয়েছে, যা পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাম্য হয়ে থাকে কিংবা যার খাতিরে ধর্মে শৈথিল্য অথবা কোনো গুনাহ্ করতে হয়। এগুলো না হলে যশপ্রীতি নিন্দনীয় নয়। হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এই দোয়া বর্ণিত আছে : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَّفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا হে আল্লাহ আমাকে আমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এবং অন্য লোকদের দৃষ্টিতে মহান করে দিন। এখানেও অন্য লোকদের দৃষ্টিতে বড় করার লক্ষ্য এই যে, মানুষ সৎকর্মে আমার ভক্ত হয়ে আমার অনুসরণ করুক। এ কারণেই ইমাম মালেক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি বাস্তবে সৎকর্মপরায়ণ, মানুষের দৃষ্টিতে সৎ হওয়ার জন্য সে যেন রিয়াকারী না করে। সে যদি মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তনকে ভালোবাসে, তবে তা নিন্দনীয় নয়।

ইবনে আরাবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয় সে সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েজ। ইমাম গাযযালী (রা.) বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও যশপ্রীতি তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। **এক.** যদি উদ্দেশ্য নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়; বরং এরূপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে। **দুই.** মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে নেই। তার ভিত্তিতে মানুষের কাছে থেকে প্রশংসা কামনা না করা। **তিন.** যদি তা অর্জন করার জন্য কোনো গুনাহ্ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করতে না হয়।

মুশরিকদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া বৈধ নয় : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ অন্যত্র কুরআন পাকের এই ফরমান জারি হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কুফরের উপর নিশ্চিত ও অবধারিত, তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা অবৈধ ও হারাম। কেননা আয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও মুমিনদের জন্য মুশরিকদের মাগফেরাতের দোয়া করা দ্ব্যর্থহীনরূপে না-জায়েজ ; যদিও তারা নিকটাত্মীয় ও হয়, যদিও তাদের জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

একটি জিজ্ঞাসা ও জওয়াব : وَاغْفِرْ لِاَبِىْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ- এ আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য কেন মাগফেরাতের দোয়া করলেন? আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত নিজেই কুরআন মাজীদে এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন :

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ

জওয়াবের সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) পিতার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় ঈমানের তাওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছিলেন। ঈমানের পর মাগফেরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধারণা

ছিল যে, তাঁর পিতা গোপনে ঈমান কবুল করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে দেন।

পিতার কুফর ও শিরক পিতার জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরাহীম (আ.) জানতে পেরেছিলেন, না তার মৃত্যুর পর, না কিয়ামতের দিন জানবেন, এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায় উল্লিখিত হয়েছে।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোনো অর্থসম্পদ সন্তান-সন্ততি কারো কোনো উপকারে আসবে না। একমাত্র সে ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছবে। এই আয়াতের اِسْتِثْنَاء কে اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعْ সাব্যস্ত করে কেউ কেউ তাফসীর করেছেন যে, সেদিন কারো অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, একমাত্র কাজে আসবে নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ, যাতে শিরক ও কুফর নেই। এই বাক্যের দৃষ্টান্ত হলো যদি কেউ যায়েদ সম্পর্কে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, যায়েদের কাছে অর্থসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও আছে কি? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সুস্থ অন্তঃকরণই তার অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। এর অর্থ এই যে, অর্থসম্পদ সন্তান-সন্ততি তো কিছুই নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার কাছে তার নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ আছে। এই তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের সার বিষয়বস্তু দাঁড়ায় এই যে, সেদিন অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কোনো কাজেই আসবে না, কাজে আসবে শুধু নিজের ঈমান ও সৎকর্ম। একেই 'সুস্থ অন্তঃকরণ' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে প্রসিদ্ধ তাফসীর এই যে, আয়াতের اِسْتِثْنَاء টি مُتَّصِلْ এবং অর্থ- এই যে, কিয়ামতের দিন অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো ব্যক্তির কাজে আসবে না সেই ব্যক্তি ছাড়া, যার অন্তঃকরণ সুস্থ অর্থাৎ সে ঈমানদার। সারকথা এই যে, কিয়ামতেও এসব বস্তু উপকারী হতে পারে, কিন্তু শুধু ঈমানদারের জন্যই উপকারী হবে- কাফেরের কোনো উপকারে আসবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ স্থলে وَلَا بَنُوْنَ বলা হয়েছে, যার অর্থ পুত্র সন্তান। সাধারণ সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবত এই যে, দুনিয়াতেও বিপদের সময় পুত্র সন্তানের কাছ থেকে উপকারের আশা করা যায়। কন্যা-সন্তানদের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা দুনিয়াতেও বিরল। তাই কিয়ামতে বিশেষ করে পুত্র সন্তানদের উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এদের কাছ থেকে উপকারের আশা হতো।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, قَلْبٍ سَلِيْمٍ এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ অন্তঃকরণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এতে সেই অন্তঃকরণ বোঝানো হয়েছে, যা কালেমায়ে তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শিরক থেকে পবিত্র। এই বিষয়বস্তুই মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন, সুস্থ অন্তঃকরণ একমাত্র মু'মিনের হতে পারে। কাফেরের অন্তঃকরণ রুগ্ণ হয়ে থাকে, যেমন কুরআন বলে فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَنَظَلُّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ ও سَمِعَ মাসদার ظُلُوْلٌ ও ظَلٌّ মূলবর্ণ (ظ - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আমরা থাকি।

يَضُرُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার ضَرٌّ মূলবর্ণ (ض - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- কোনো অপকার করতে পারে।

يُطْعِمُنِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطْعَامٌ মূলবর্ণ (ط - ع - م) জিনস صحيح অর্থ- তিনি আমাকে আহার করান।

يَسْقِيْنِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَقْىٌ মূলবর্ণ (س - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি আমাকে পান করান।

مَرِضْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার مَرَضٌ মূলবর্ণ (م - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ- আমি পীড়িত হই।

يُمِيْتُنِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمَاتَةٌ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اجوف واوى অর্থ- তিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন।

يُحْيِيْنِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْيَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- তিনি আমাকে জীবিত করবেন।

اَطْمَعُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার طَمَعٌ মূলবর্ণ (ط - م - ع) জিনস صحيح অর্থ- আমি আশা করি।

اَلْحِقْنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব افعَالٌ মাসদার اِلْحَاقٌ মূলবর্ণ (ل - ح - ق) জিনস صحيح অর্থ- আপনি আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন।

لاَ تُخْزِنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْزَاءٌ মূলবর্ণ (خ - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আপনি আমাকে অপমানিত করবেন না।

يُبْعَثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার بَعْثٌ মূলবর্ণ (ب - ع - ث) জিনস صحيح অর্থ- সকলে জীবিত হয়ে উঠবে।

اُزْلِفَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِزْلاَفٌ মূলবর্ণ (ز - ل - ف) জিনস صحيح অর্থ- তাকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ : এখানে قَالُوْا হলো ফে'ল ও যমীর هُمْ ফায়েল মিলে قول আর نَعْبُدُ হলো নসবের স্থলে قول -এর مقول হয়েছে। আর فَنَظَلُّ -এর فاء টি আতেফা আর نَظَلُّ ফে'লে নাকেস আর তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর نَحْنُ হলো তার اسم আর لَهَا মুতাআল্লিক হয়েছে عَاكِفِيْنَ -এর সাথে আর عَاكِفِيْنَ হলো ফে'লে নাকেসের খবর। اَصْنَامًا -[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪]

৯১. আর পথভ্রষ্টদের জন্য জাহান্নামকে সম্মুখে প্রকাশিত করা হবে।	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾
৯২. এবং তাদেরকে বলা হবে, সেই উপাস্যরা কোথায় গেল, তোমরা যাদের পূজা করতে?	وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. আল্লাহর পরিবর্তে তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা নিজেদেরই রক্ষা করতে পারে?	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾
৯৪. অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্ট লোকদেরকে নিচের দিকে মুখ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে,	فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. এবং ইবলীসের সমস্ত সৈন্যসামন্তকেও;	وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾
৯৬. সেই কাফেররা সেখানে বাকবিতণ্ডা করতে করতে বলবে,	قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে আমরা স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলাম।	تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾
৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-প্রতিপালকের সমতুল্য [মনে] করতাম।	اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾
৯৯. আর আমাদেরকে তো কেবলমাত্র এই অপরাধীরাই বিভ্রান্ত করেছে।	وَمَاۤ اَضَلَّنَاۤ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾
১০০. অতএব, আমাদের কোনো সুপারিশকারীও নেই।	فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯১. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ আর জাহান্নামকে সম্মুখে প্রকাশিত করা হবে لِلْغٰوِيْنَ পথভ্রষ্টদের জন্য।

৯২. وَقِيْلَ لَهُمْ এবং তাদেরকে বলা হবে اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ সেই উপাস্যরা কোথায় গেল তোমরা যাদের পূজা করতে?

৯৩. مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহর পরিবর্তে هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ অথবা নিজেদেরই রক্ষা করতে পারে?

৯৪. فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا অতঃপর নিচের দিকে মুখ করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে هُمْ وَالْغَاوٗنَ তাদেরকে এবং পথভ্রষ্ট লোকদেরকে।

৯৫. وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ এবং ইবলীসের সমস্ত সৈন্যসামন্তকেও।

৯৬. قَالُوْا সেই কাফেররা বলবে وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ সেখানে বাকবিতণ্ডা করতে করতে

৯৭. تَاللّٰهِ আল্লাহর শপথ اِنْ كُنَّا নিঃসন্দেহে আমরা ছিলাম لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে।

৯৮. اِذْ نُسَوِّيْكُمْ যখন আমরা তোমাদেরকে সমতুল্য (মনে) করতাম بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বপ্রতিপালকের।

৯৯. وَمَاۤ اَضَلَّنَاۤ আর আমাদেরকে তো বিভ্রান্ত করেছে اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ কেবলমাত্র এই অপরাধীরাই।

১০০. فَمَا لَنَا অতএব, আমাদের নেই مِنْ شَافِعِيْنَ কোনো সুপারিশকারীও।

১০১. এবং কোনো খাঁটি বন্ধুও নেই।	وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾
১০২. সুতরাং কি উত্তম হতো যদি [পৃথিবীতে] পুনরায় ফিরে যাওয়া আমাদের সুযোগ ঘটত, তা হলে আমরা মুসলমান হয়ে যেতাম।	فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. নিশ্চয়ই এই ঘটনার মধ্যে একটি উপদেশ রয়েছে; অথচ তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾
১০৪. নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, বড় দয়াময়।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾
১০৫. নূহ সম্প্রদায় সকল রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।	كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. যখন তাদের [সামাজিক] ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বলল যে, তোমরা কি [আল্লাহকে] ভয় করো না?	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾
১০৭. আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল।	إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾
১০৮. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুগত হও।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾
১০৯. আর আমি তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো কেবল বিশ্বপালকের জিম্মায় রয়েছে।	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০১. وَلَا এবং নেই صَدِيقٍ حَمِيمٍ খাঁটি বন্ধুও।

১০২. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً সুতরাং কি উত্তম হতো যদি (পৃথিবীতে) পুনরায় ফিরে যাওয়া আমাদের সুযোগ হতো فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ তবে আমরা মুসলমান হয়ে যেতাম।

১০৩. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً নিশ্চয়ই এই ঘটনার মধ্যে একটি উপদেশ রয়েছে وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ অথচ তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

১০৪. وَإِنَّ رَبَّكَ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক لَهُوَ الْعَزِيزُ মহাপরাক্রমশালী الرَّحِيمُ বড় দয়াময়।

১০৫. كَذَّبَتْ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে قَوْمُ نُوحٍ নূহ-সম্প্রদায় الْمُرْسَلِينَ সকল রাসূলগণকে।

১০৬. إِذْ قَالَ لَهُمْ যখন তাদেরকে বলল أَخُوهُمْ نُوحٌ তাদের (সামাজিক) ভ্রাতা নূহ أَلَا تَتَّقُونَ তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করো না?

১০৭. إِنِّي لَكُمْ আমি তোমাদের জন্য رَسُولٌ أَمِينٌ বিশ্বস্ত রাসূল।

১০৮. فَاتَّقُوا اللَّهَ অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো وَأَطِيعُونِ এবং আমার অনুগত হও।

১০৯. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, আর আমি তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাইনা إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ আমার বিনিময় তো কেবল বিশ্বপ্রতিপালকের জিম্মায় রয়েছে।

১১০. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার কথা মান্য করো।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ؕ ﴿١١٠﴾
১১১. তারা বলতে লাগল, আমরা কি তোমার প্রতি আনুগত্য করব? অথচ নীচ লোকগুলো তোমার সহচর হয়েছে?	قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ؕ ﴿١١١﴾
১১২. নূহ বললেন, তাদের কাজ সম্বন্ধে আমার জানার দরকার কি?	قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ ﴿١١٢﴾
১১৩. তাদের নিকট হতে হিসাব গ্রহণ করা তো আল্লাহর কাজ, কি উত্তম হয় যদি তোমরা তা বুঝ।	اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۚ ﴿١١٣﴾
১১৪. আর আমি ঈমানদারগণকে বিতাড়িত করতে পারি না।	وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ ﴿١١٤﴾
১১৫. আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।	اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ؕ ﴿١١٥﴾
১১৬. তারা বলতে লাগল, হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তবে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে বধ করা হবে।	قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ؕ ﴿١١٦﴾
১১৭. নূহ প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।	قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ۚ ﴿١١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১০. فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো وَاَطِيْعُوْنِ এবং আমার কথা মান্য করো,

১১১. قَالُوْٓا তারা বলতে লাগল اَنُؤْمِنُ لَكَ আমরা কি তোমার প্রতি আনুগত্য করব وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ অথচ নীচ লোকগুলো তোমার সহচর হয়েছে।

১১২. قَالَ নূহ বললেন وَمَا عِلْمِيْ, আমার জানার দরকার কি? بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের কাজ সম্বন্ধে।

১১৩. اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ তাদের নিকট হতে হিসাব গ্রহণ করা তো আল্লাহর কাজ لَوْ تَشْعُرُوْنَ কি উত্তম হয় যদি তোমরা তা বুঝ।

১১৪. وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ আর আমি বিতাড়িত করতে পারিনা الْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদারগণকে।

১১৫. اِنْ اَنَا اِلَّا আমি তো কেবল نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ একজন সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

১১৬. قَالُوْا তারা বলতে লাগল لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ যদি তুমি বিরত না হও يٰنُوْحُ হে নূহ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ তবে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে বধ করা হবে।

১১৭. قَالَ নূহ প্রার্থনা করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অর্থসম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে : আলোচ্য আয়াতের বহুল প্রচলিত তাফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থসম্পদ কিয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোনো সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মুমিনদের তালিকাভুক্ত হয় তবে এ ব্যয়কৃত অর্থ ও সদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব হাশরের ময়দানে ও হিসাবের দাঁড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ্ না করুন মৃত্যুর পূর্বে বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোনো সৎকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারেও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করবে অথবা ছওয়াব পৌঁছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সৎকর্মের ছওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্য সুপারিশ করবে যেমন কোনো কোনো হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবুল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত আছে: বিশেষতঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় তাদের সৎকর্ম পিতামাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌঁছে, তবে পরকালে আল্লাহ তা'আলা বাপ-দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপদাদার উচ্চতম স্তরে পৌঁছিয়ে দেবেন। কুরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ আমি আমার সৎবান্দাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও মিলিত করে দেব। আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত প্রসিদ্ধ তাফসীর থেকে জানা গেল যে, কুরআন ও হাদীসে যেখানেই কিয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মুমিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমন কি, পয়গম্বরের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীও যদি মুমিন না হয়, তবে তাঁর পয়গম্বরী দ্বারা কিয়ামতের দিন তাদের কোনো উপকার হবেনা যেমন, হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র, হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার ব্যাপার তাই। কুরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের মর্মও তাই হতে পারে।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ- فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَاۤ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

এবং لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ

সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান : وَمَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ এ আয়াত থেকে জানা যায়, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত নয়। তাই পূর্ববর্তী মণীষীগণ একে হারাম বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীগণ অপারগ অবস্থায় একে জায়েজ সাব্যস্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا আয়াতের অধীনে এসে গেছে।

জ্ঞাতব্য বিষয় : فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ আয়াতটি তাকীদের জন্য এবং একথা ব্যক্ত করার জন্য আনা হয়েছে যে, রাসূলের আনুগত্য ও আল্লাহকে ভয় করার জন্য কেবল রাসূলের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা অথবা কেবল প্রচারকার্যে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যে রাসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহকে ভয় করা তো আর ও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি কর্ম ও চরিত্র-পরিবার ও জাঁকজমক নয় :

قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

এই আয়াতে প্রথমত মুশরিকেদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই সকলেই নীচ লোক আমরা সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন হয়ে তাদের সাথে কিরূপে একাত্ম হতে পারি? হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার এটাই ছিল কারণ। হযরত নূহ (আ.) জওয়াবে বললেন, আমি তাদের কাজ-কর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পরিবারিক ভদ্রতা অথবা ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁকজমককে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর! এটা ভুল; বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইতরজন বলে দেওয়াটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আমরা প্রত্যেক কর্ম ও চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতরজন এবং কে ভদ্রজন, আমরা তার ফয়সালা করতে পারি না। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَكُبْكِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার كَبْكَبَةٌ মূলবর্ণ (ك - ب - ك) জিনস مضاعف رباعى ب) অর্থ- তাদেরকে নিচের দিকে মুখ করে নিক্ষেপ করা হবে।

اَلْغَاوُنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার غَوَايَةٌ মূলবর্ণ (غ - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- পথভ্রষ্ট লোকগণ।

نُسَوِّيْكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْوِيَةٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- আমরা তোমাদেরকে সমতুল্য মনে করতাম।

شَافِعِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার شَفَاعَةٌ মূলবর্ণ (ش - ف - ع) জিনস صحيح অর্থ- সুপারিশকারী।

تَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা ভয় কর।

اَطِيْعُوْنِ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা আমার কথা মান্য কর।

بِطَارِدٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার طَرْدٌ মূলবর্ণ (ط - ر - د) জিনস صحيح অর্থ- বিতাড়িত করতে পারি, বিতাড়িতকারী।

لَمْ تَنْتَهِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى حجد بلم বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِنْتِهَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তুমি বিরত না হও।

لَتَكُوْنَنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة درفعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার كَوْنٌ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- অবশ্যই তুমি হবে।

اَلْمَرْجُوْمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার رَجْمٌ মূলবর্ণ (ر - ج - م) জিনস صحيح অর্থ- প্রস্তরাঘাতে হত্যাকৃত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ : এখানে واو টি استئنافية আর اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর رَبَّكَ হলো তার اسم এবং لَهُوَ এর লাম টি হলো المزحلفة আর هُوَ হলো ضمير فصل কিংবা মুবতাদা। আর اَلْعَزِيْزُ হলো خبر ان অথবা هُوَ মুবতাদার খবর। আর الرَّحِيْمُ হলো দ্বিতীয় খবর।

১১৮. অতএব, আপনি আমার ও তাদের মধ্যে একটা [কার্যকরী] মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথি ঈমানদেরকে নাজাত দিন।	فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾
১১৯. তখন আমি তাকে এবং তাঁর সঙ্গে যারা বোঝাইপূর্ণ নৌকায় ছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম।	فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١١٩﴾
১২০. এরপর অবশিষ্টদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম।	ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ﴿١٢٠﴾
১২১. এতে বিরাট উপদেশ রয়েছে; আর তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٢١﴾
১২২. নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, করুণাময়।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٢﴾
১২৩. 'আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।	كَذَّبَتْ عَادُ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾
১২৪. যখন তাদের ভ্রাতা হূদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় করো না?	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾
১২৫. আমি তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত নবী [রূপে প্রেরিত]।	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٢٥﴾
১২৬. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৮. فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا অতএব আপনি আমার ও তাদের মধ্যে একটা (কার্যকরী) মীমাংসা করে দিন وَنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং আমাকে ও আমার সাথি ঈমানদারদেরকে নাজাত দিন।

১১৯. فَاَنْجَيْنٰهُ তখন আমি তাকে নাজাত দিলাম وَمَنْ مَّعَهٗ এবং তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ বোঝাইপূর্ণ নৌকায়।

১২০. ثُمَّ اَغْرَقْنَا অনন্তর নিমজ্জিত করে দিলাম بَعْدُ الْبٰقِيْنَ এরপর অবশিষ্টদেরকে।

১২১. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً এতে বিরাট উপদেশ রয়েছে وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ এবং তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

১২২. وَاِنَّ رَبَّكَ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ মহাপরাক্রমশালী, করুণাময়।

১২৩. كَذَّبَتْ عَادُ আদ সম্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে الْمُرْسَلِيْنَ রাসূলগণকে।

১২৪. اِذْ قَالَ لَهُمْ যখন তাদেরকে বললেন اَخُوْهُمْ তাদের ভ্রাতা هُوْدٌ হূদ اَلَا تَتَّقُوْنَ তোমরা কি ভয় করো না?

১২৫. اِنِّيْ لَكُمْ আমি তোমাদের প্রতি رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ বিশ্বস্ত নবী (রূপে প্রেরিত)।

১২৬. فَاتَّقُوا اللّٰهَ সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো وَاَطِيْعُوْنِ এবং আমার আনুগত্য করো।

১২৭. আর আমি তোমাদের নিকট তার কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো জগতসমূহের প্রতিপালকের জিম্মায় রয়েছে।	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾
১২৮. তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চস্থানে একটি স্মৃতি [সৌধ] নির্মাণ করছ? যা কেবল অনর্থক করছ।	أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾
১২৯. আর তোমরা বড় বড় অট্টালিকাসমূহ নির্মাণ করছ। যেন তোমরা পৃথিবীতে চিরকাল থাকবে।	وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾
১৩০. আর যখন তোমরা কাউকে আঘাত কর, তখন একেবারে স্বৈরাচারী হয়ে আঘাত কর।	وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾
১৩১. অতএব, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো এবং আমার অনুসরণ করো।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾
১৩২. এবং তাকেই ভয় করো যিনি ঐ সমস্ত বস্তু দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, যা তোমরা অবগত আছ।	وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾
১৩৩. অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তানাদি দ্বারা।	أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾
১৩৪. এবং উদ্যান ও প্রস্রবণ দ্বারা।	وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২৭. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ আর আমি তোমাদের নিকট এর কোনো বিনিময় চাই না إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ আমার বিনিময় তো জগতসমূহের প্রতিপালকের জিম্মায় রয়েছে।

১২৮. أَتَبْنُونَ তোমরা কি নির্মাণ করছ بِكُلِّ رِيعٍ প্রত্যেক উচ্চস্থানে آيَةً একটি স্মৃতি (সৌধ) تَعْبَثُونَ যা কেবল অনর্থক করছ।

১২৯. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ আর তোমরা বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করছ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ যেন তোমরা পৃথিবীতে চিরকাল থাকবে।

১৩০. وَإِذَا بَطَشْتُمْ আর যখন তোমরা কাউকে আঘাত কর بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ তখন একেবারে স্বৈরাচারী হয়ে আঘাত কর।

১৩১. فَاتَّقُوا اللَّهَ অতএব তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো وَأَطِيعُونِ আর আমার অনুসরণ করো।

১৩২. وَاتَّقُوا এবং তাকে ভয় করো الَّذِي أَمَدَّكُمْ যিনি ঐ সমস্ত বস্তু দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন بِمَا تَعْلَمُونَ যা তোমরা অবগত আছ।

১৩৩. أَمَدَّكُمْ তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ চতুষ্পদজন্তু ও সন্তানাদি দ্বারা।

১৩৪. وَجَنَّاتٍ এবং উদ্যান وَعُيُونٍ ও প্রস্রবণ দ্বারা।

অনুবাদ	আয়াত
১৩৫. আমি তোমাদের উপর এক কঠিন দিনের আজাবের আশঙ্কা করি।	إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ ﴿١٣٥﴾
১৩৬. তারা বলল, আমাদের নিকট তো উভয় কথাই সমান, চাই তুমি উপদেশ প্রদান কর অথবা উপদেষ্টা না হও।	قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡنَآ أَوَعَظۡتَ أَمۡ لَمۡ تَكُن مِّنَ ٱلۡوَٰعِظِينَ ﴿١٣٦﴾
১৩৭. এটা তো কেবল প্রাচীন লোকদের নিকট [সাধারণ] প্রথা,	إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلۡأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾
১৩৮. এবং আমাদের কখনো আজাব হবে না।	وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾
১৩৯. মোটকথা তারা হূদকে মিথ্যা প্রতিপাদন করল, তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম, নিঃসন্দেহে তাতে বিরাট উপদেশ রয়েছে। আর তাদের [মক্কার কাফেরদের] অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।	فَكَذَّبُوهُ فَأَهۡلَكۡنَٰهُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿١٣٩﴾
১৪০. এবং নিশ্চয় আপনার রব মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾
১৪১. ছামূদ সম্প্রদায় [-ও] রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছিল।	كَذَّبَتۡ ثَمُودُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ﴿١٤١﴾
১৪২. যখন তাদের ভ্রাতা সালেহ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি [আল্লাহকে] ভয় করো না?	إِذۡ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡ صَٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩৫. إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ আমি তোমাদের উপর আশঙ্কা করছি عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٍ এক কঠিন দিবসের আজাবের।

১৩৬. قَالُوا তারা বলল سَوَآءٌ عَلَيۡنَا আমাদের নিকট তো উভয় কথাই সমান أَوَعَظۡتَ চাই তুমি উপদেশ প্রদান কর أَمۡ لَمۡ تَكُن مِّنَ ٱلۡوَٰعِظِينَ অথবা উপদেষ্টা না হও।

১৩৭. إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا এটা তো কেবল خُلُقُ ٱلۡأَوَّلِينَ প্রাচীন লোকদের একটি (সাধারণ) প্রথা।

১৩৮. وَمَا نَحۡنُ, আমাদের কখনো بِمُعَذَّبِينَ আজাব হবে না।

১৩৯. فَكَذَّبُوهُ মোটকথা তারা হূদকে মিথ্যা প্রতিপাদন করল فَأَهۡلَكۡنَٰهُمۡ তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةً নিঃসন্দেহে এতে বিরাট উপদেশ রয়েছে وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ, এবং তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

১৪০. وَإِنَّ رَبَّكَ, নিশ্চয় আপনার রব لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

১৪১. كَذَّبَتۡ ثَمُودُ ছামূদ সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল ٱلۡمُرۡسَلِينَ রাসূলগণকে।

১৪২. إِذۡ قَالَ لَهُمۡ যখন তাদেরকে বললেন أَخُوهُمۡ صَٰلِحٌ তাদের ভ্রাতা সালেহ أَلَا تَتَّقُونَ তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করো না?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কতিপয় দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা : اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ : ইবনে জারীর হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, رِيْعٍ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অধিকাংশে তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, رِيْع উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই উদ্ভূত رِيْعُ النَّبَاتِ হয়েছে। অর্থাৎ, বর্ধনশীল উদ্ভিদ। اٰيَةً এর আসল অর্থ– নিদর্শন। এস্থলে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধ বুঝানো হয়েছে। تَعْبَثُوْنَ শব্দটি عَبَثٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– অযথা, যাতে কোনো প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। مَصَانِعُ শব্দটি مَصْنَعٌ -এর বহুবচন। হযরত কাতাদা (র.) বলেন– مَصَانِعُ বলে পানির চৌবাচ্চা বুঝানো হয়েছে, কিন্তু হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন যে, এখানে, সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে।

لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ : ইমাম বুখারী সহীহ্ বুখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে لَعَلَّ শব্দটি تَشْبِيْه অর্থাৎ, রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর অনুবাদে বলেন– كَاَنَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ অর্থাৎ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে। –(রূহুল মা'আনী)

বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয় : এ আয়াতে থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা শরিয়ত মতে দূষণীয়। হযরত আনাস (রা.)-এর ভাষ্যে ইমাম তিরমিযী বর্ণিত এই হাদীসের অর্থও তাই- اَلنَّفَقَةُ كُلُّهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ অর্থাৎ, প্রয়োজনাতিরিক্ত দালান-কোঠার মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই। হযরত আনাস (রা.)-এর অপর একটি রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়- اِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلٰى صَاحِبِهٖ اِلَّا مَا لَا يَغْنِيْ اِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ অর্থাৎ, প্রত্যেক দালান-কোঠা তার মালিকের জন্য বিপদ, কিন্তু যে দালান-কোঠা জরুরি তা বিপদ নয়। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ব্যতীত সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা মুহাম্মদী শরিয়তেও নিন্দনীয় ও দূষণীয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْمَشْحُوْنَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব فَتَحَ মাসদার شَحْنٌ মূলবর্ণ (ش ـ ح ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– বোঝাইপূর্ণ।

اَتَبْنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بِنَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা কি নির্মাণ করছ?

رِيْعٌ : একবচন, বহুবচন أَرْيَاعٌ ও رُيُوْعٌ অর্থ– উচ্চস্থান।

تَعْبَثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার عَبْثٌ মূলবর্ণ (ع ـ ب ـ ث) জিনস صحيح অর্থ– যা কেবল অনর্থক করছ।

بَطَشْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضي معروف বাব نَصَرَ মাসদার بَطْشٌ মূলবর্ণ (ب ـ ط ـ ش) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা আঘাত কর।

اَخَافُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَوْفٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি আশঙ্কা করি।

اَلْوَاعِظِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْظٌ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ ظ) জিনস مثال واوى অর্থ– উপদেষ্টাগণ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : এখানে واو টি আতেফা আর مَا হলো نافية আর اَسْئَلُكُمْ ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী, আর عَلَيْهِ উহ্য শব্দের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে। مِنْ হলো হরফে জার অতিরিক্ত আর اَجْرٍ হলো শাব্দিকভাবে মাজরূর তবে স্থানগতভাবে মানসূব। কেননা তা মাফউলে বিহী, আর اِنْ হলো نافية আর اَجْرِىَ মুবতাদা, আর اِلَّا হলো اداة حصر আর عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ হলো খবর।

অনুবাদ	আয়াত
১৪৩. আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত নবী [রূপে প্রেরিত]।	إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾
১৪৪. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুসরণ করো।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾
১৪৫. এবং আমি তোমাদের নিকট তার কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, আমার বিনিময় তো জগতসমূহের প্রতিপালকের জিম্মায়।	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾
১৪৬. তোমাদেরকে কি এই সমস্ত বস্তুতে নিরাপদে থাকতে দেওয়া হবে যা এখানে আছে?	أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾
১৪৭. অর্থাৎ বাগ-বাগিচা ও প্রস্রবণসমূহে।	فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾
১৪৮. এবং শস্যক্ষেত্রসমূহে আর সেই খেজুর বৃক্ষসমূহে যার গুচ্ছগুলো খুব ঘন।	وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾
১৪৯. আর তোমরা কি পর্বতসমূহকে কেটে কেটে সগর্বে গৃহ নির্মাণ করছ?	وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾
১৫০. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾
১৫১. আর সেসব সীমালঙ্ঘনকারীদের অনুসরণ করো না।	وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪৩. إِنِّي لَكُمْ আমি তোমাদের জন্য رَسُولٌ أَمِينٌ বিশ্বস্ত নবী (রূপে প্রেরিত)।

১৪৪. فَاتَّقُوا اللَّهَ অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো وَأَطِيعُونِ, এবং আমার অনুসরণ করো।

১৪৫. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, এবং আমি তোমাদের নিকট এর কোনো বিনিময় চাই না إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ আমার বিনিময় তো জগতসমূহের প্রতিপালকের জিম্মায়।

১৪৬. أَتُتْرَكُونَ তোমাদেরকে কি এ সমস্ত বস্তুতে থাকতে দেওয়া হবে فِي مَا هَاهُنَا যা এখানে আছে آمِنِينَ নিরাপদে

১৪৭. فِي جَنَّاتٍ অর্থাৎ, বাগ-বাগিচা وَعُيُونٍ ও প্রস্রবণসমূহে।

১৪৮. وَزُرُوعٍ এবং শস্য ক্ষেত্রসমূহে وَنَخْلٍ, এবং খেজুর বৃক্ষসমূহে طَلْعُهَا هَضِيمٌ যার গুচ্ছগুলো খুব ঘন।

১৪৯. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ, তোমরা কি পর্বতসমূহকে কেটে কেটে নির্মাণ করছ بُيُوتًا গৃহ فَرِهِينَ সগর্বে।

১৫০. فَاتَّقُوا اللَّهَ সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো وَأَطِيعُونِ, এবং আমার আনুগত্য করো।

১৫১. وَلَا تُطِيعُوا, আর অনুসরণ করো না أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ সেসব সীমালঙ্ঘনকারীদের।

১৫২. যারা ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ করে থাকে এবং সংশোধন করে না।	الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾
১৫৩. তারা বলল, তোমাকে তো কেউ ভীষণ জাদু করেছে।	قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٥٣﴾
১৫৪. তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র, অতএব, কোনো নিদর্শন উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হও।	مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَأْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٤﴾
১৫৫. সালেহ বললেন, এই একটি উটনী পানি পান করার জন্য এক পালা তার আর এক পালা তোমাদের কোনো নির্দিষ্ট দিনে।	قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٥﴾
১৫৬. এবং তোমরা তাকে অসদভিপ্রায়ে স্পর্শও করো না, অন্যথায় তোমাদেরকে এক ভীষণ দিবসের আজাব এসে ধৃত করবে।	وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾
১৫৭. পরন্তু তারা সে উটনীকে মেরে ফেলল, অতঃপর তারা অনুতপ্ত হলো।	فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٧﴾
১৫৮. অনন্তর আজাব এসে তাদেরকে ধৃত করল, নিঃসন্দেহে তাতে উপদেশ রয়েছে। এবং তাদের [অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের] অধিকাংশ লোকই ঈমান আনয়ন করে না।	فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫২. اَلَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ যারা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে থাকে فِى الْاَرْضِ ভূ-পৃষ্ঠে وَلَا يُصْلِحُوْنَ এবং সংশোধন করে না।

১৫৩. قَالُوْٓا তারা বলল اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ তোমাকে তো কেউ ভীষণ জাদু করেছে।

১৫৪. مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র فَأْتِ بِاٰيَةٍ অতএব কোনো নিদর্শন উপস্থিত কর اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি তুমি সত্যবাদী হও।

১৫৫. قَالَ সালেহ বললেন هٰذِهٖ نَاقَةٌ এই একটি উটনী لَّهَا شِرْبٌ পানি পান করার জন্য এক পালা তার وَلَكُمْ شِرْبُ আর একপালা তোমাদের يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ কোনো নির্দিষ্ট দিনে।

১৫৬. وَلَا تَمَسُّوْهَا এবং তোমরা তাকে স্পর্শ করো না بِسُوْٓءٍ অসদভিপ্রায়ে فَيَاْخُذَكُمْ অন্যথায় তোমাদেরকে ধৃত করবে عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ এক ভীষণ দিবসের আজাব এসে।

১৫৭. فَعَقَرُوْهَا পরন্তু তারা সেই উটনীকে মেরে ফেলল فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ অতঃপর তারা অনুতপ্ত হলো।

১৫৮. فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ অনন্তর আজাব এসে তাদেরকে ধৃত করল اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً নিঃসন্দেহে এতে উপদেশ রয়েছে وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ এবং এদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনয়ন করে না।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১৫৯. এবং নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, পরম করুণাময়।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٩﴾
১৬০. লূতের সম্প্রদায়ও রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছিল।	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦٠﴾
১৬১. যখন তাদের ভ্রাতা লূত তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না?	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٦١﴾
১৬২. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল।	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٦٢﴾
১৬৩. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুসরণ করো।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٦٣﴾
১৬৪. আর আমি তোমাদের নিকট তার কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, আমার বিনিময় তো জগতসমূহের প্রতিপালকের জিম্মায়।	وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٤﴾
১৬৫. তোমরা কি সমস্ত বিশ্ববাসীদের মধ্য হতে পুরুষদের সাথে [অপ] কর্ম করছ?	اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾
১৬৬. এবং তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন করছ? তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।	وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫৯. وَاِنَّ رَبَّكَ এবং নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক হচ্ছেন لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ মহাপরাক্রমশালী, পরম করুণাময়।

১৬০. كَذَّبَتْ অবিশ্বাস করেছিল قَوْمُ لُوْطِ লূতের সম্প্রদায় الْمُرْسَلِيْنَ রাসূলগণকে

১৬১. اِذْ قَالَ لَهُمْ যখন তাদেরকে বললেন اَخُوْهُمْ لُوْطٌ তাদের ভ্রাতা লূত اَلَا تَتَّقُوْنَ তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না।

১৬২. اِنِّيْ لَكُمْ নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ বিশ্বস্ত রাসূল।

১৬৩. فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো وَاَطِيْعُوْنِ এবং আমার অনুসরণ করো।

১৬৪. وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ আর আমি তোমাদের নিকট এর কোনো বিনিময় চাচ্ছি না اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আমার বিনিময় তো জগতসমূহের প্রতিপালকের জিম্মায়।

১৬৫. اَتَاْتُوْنَ তোমরা কি (অপকর্ম) করছ الذُّكْرَانَ পুরুষদের সাথে مِنَ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্ববাসীদের মধ্যে।

১৬৬. وَتَذَرُوْنَ এবং তাদেরকে বর্জন করছ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ তোমাদের রব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ যে স্ত্রীগণকে بَلْ اَنْتُمْ তোমরা তো قَوْمٌ عٰدُوْنَ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে فٰرِهِيْنَ -এর তাফসীর বলা হয়েছে অহংকারী। আবূ সালেহ ও ইমাম রাগে (র.)-এর মতে فٰرِهِيْنَ -এর তাফসীর حَاذِقِيْنَ অর্থাৎ নিপুণ। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

উপকারী পেশা আল্লাহর নিয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা না হয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং তা দ্বারা উপকার লাভ করা জায়েজ। কিন্তু তা দ্বারা যদি গুনাহ, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগ্ন থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন নাজায়েজ, যেমন পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে।

অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম : وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ আয়াতের مِنْ অব্যয়টি বর্ণনাবোধক হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্য আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছ। এটা হীনমন্যতার পরিচায়ক। مِنْ অব্যয়টি এখানে تَبْعِيْض -এর জন্যও হতে পারে। এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের স্ত্রীদের যে স্থান তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক, সেই স্থান ছেড়ে স্ত্রীদের সাথে এমন অস্বাভাবিক কাজ তোমরা কর, যা নিশ্চিতই হারাম। এই দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ –(রূহুল মা'আনী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَنْحِتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نَحْتٌ মূলবর্ণ (ن - ح - ت) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা কাটছ।

فٰرِهِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব كَرُمَ মাসদার فَرَاهَةٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ه) জিনস صحيح অর্থ– সগর্বে।

لَا تُطِيْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهي حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা অনুসরণ করো না।

اَلْمُسْرِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْرَافٌ মূলবর্ণ (س - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– সীমালঙ্ঘনকারী।

فَأْتِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– উপস্থিত কর।

شِرْبٌ : একবচন, اَشْرَابٌ বহুবচন অর্থ– একপালা।

لَا تَمَسُّوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهي حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَسٌّ মূলবর্ণ (م - س - س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা তাকে স্পর্শও করো না।

فَعَقَرُوْهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَقْرٌ মূলবর্ণ (ع - ق - ر) জিনস صحيح অর্থ– পরন্তু তারা সে উটনীকে মেরে ফেলল।

نٰدِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার نَدَامَةٌ মূলবর্ণ (ن - د - م) জিনস صحيح অর্থ– তারা অনুতপ্ত হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ : এখানে فاء টি আতেফা, আর اَخَذَ এর- اَخَذَهُمْ ফে'ল হলো هُمْ مفعول به مقدم আর اَلْعَذَابُ হলো তার ফায়েলে মুয়াখখার। আর اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً হলো اَخَذَ -এর তা'লীল। وَمَا كَانَ -এর- واو টি حاليه বা আতেফা, আর كَانَ হলো ফে'লে নাকেস اَكْثَرُهُمْ হলো তার ইসম এবং مُؤْمِنِيْنَ হলো তার খবর। –[ই'রাবুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৪৩৯]

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
১৬৭. তারা বলল, হে লূত! তুমি যদি বিরত না থাক, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কার করা হবে।	قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾
১৬৮. লূত বললেন, আমি তোমাদের এই কার্যের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করি।	قَالَ اِنِّیْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾
১৬৯. [তারা মানল না, আজাবের লক্ষণ পেয়ে লূত দোয়া করলেন,] হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার সংশ্লিষ্টদেরকে এটা হতে রক্ষা করুন।	رَبِّ نَجِّنِیْ وَاَهْلِیْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾
১৭০. সুতরাং আমি তাকে ও তার সংশ্লিষ্টদের সকলকে রক্ষা করলাম।	فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾
১৭১. এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে [আজাবে] নিপতিতদের মধ্যে রয়ে গেল।	اِلَّا عَجُوْزًا فِی الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾
১৭২. অনন্তর আমি অন্যান্য সকলকে ধ্বংস করে দিলাম।	ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾
১৭৩. আর আমি তাদের উপর এক বিশেষ প্রকারের [প্রস্তর] বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, অতএব কি নিকৃষ্ট বৃষ্টি ছিল যা সে ভয় প্রদর্শিতদের উপর বর্ষিত হয়েছিল।	وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾
১৭৪. নিশ্চয় এতে নসিহত রয়েছে, অথচ তাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।	اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬৭. قَالُوْا তারা বলল لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ তুমি যদি বিরত না থাক يٰلُوْطُ হে লূত! لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কার করা হবে।

১৬৮. قَالَ লূত বললেন اِنِّیْ لِعَمَلِكُمْ আমি তোমাদের এই কার্যের প্রতি مِّنَ الْقَالِيْنَ অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করি।

১৬৯. رَبِّ হে আমার রব! نَجِّنِیْ وَاَهْلِیْ আমাকে এবং আমার সংশ্লিষ্টদেরকে রক্ষা করুন مِمَّا يَعْمَلُوْنَ এটা হতে।

১৭০. فَنَجَّيْنٰهُ সুতরাং আমি তাকে রক্ষা করলাম وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ও তার সংশ্লিষ্টদের সকলকে।

১৭১. اِلَّا عَجُوْزًا এক বৃদ্ধাকে ব্যতীত فِی الْغٰبِرِيْنَ সে আজাবে নিপতিতদের মধ্যে রয়ে গেল।

১৭২. ثُمَّ دَمَّرْنَا অনন্তর আমি ধ্বংস করে দিলাম الْاٰخَرِيْنَ অন্যান্য সকলকেই।

১৭৩. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا আর আমি তাদের উপর এক বিশেষ প্রকারের (প্রস্তর) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম فَسَآءَ مَطَرُ অতএব, কি নিকৃষ্ট বৃষ্টি ছিল যা সেই ভয় প্রদর্শিতদের উপর বর্ষিত হয়েছিল। الْمُنْذَرِيْنَ

১৭৪. اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً নিশ্চয় এতে নসিহত রয়েছে وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অথচ তাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

১৭৫. এবং নিশ্চয় আপনার রব মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾
১৭৬. আইকাবাসীরা রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলল ।	كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾
১৭৭. যখন শু'আইব তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না?	اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾
১৭৮. আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গাম্বর ।	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾
১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর ।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾
১৮০. এবং আমি তোমাদের নিকট তার কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো জগতসমূহের প্রতিপালকের জিম্মায় রয়েছে ।	وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾
১৮১. তোমরা পূর্ণরূপে ওজন করিও এবং [কারও] ক্ষতি করো না ।	اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾
১৮২. আর সঠিক পাল্লা দ্বারা ওজন করো ।	وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾
১৮৩. এবং লোকদেরকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিও না । আর ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ বিস্তার করো না ।	وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭৫. وَاِنَّ رَبَّكَ এবং নিশ্চয় আপনার রব لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।

১৭৬. كَذَّبَ মিথ্যাবাদী বলল اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ আইকাবাসীরা الْمُرْسَلِيْنَ রাসূলগণকে ।

১৭৭. اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ যখন শু'আইব তাদেরকে বললেন اَلَا تَتَّقُوْنَ তোমরা কি (আল্লাহহকে) ভয় করো না ।

১৭৮. اِنِّيْ لَكُمْ আমি তোমাদের رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ বিশ্বস্ত পয়গম্বর ।

১৭৯. فَاتَّقُوا اللّٰهَ সুতরাং, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর وَاَطِيْعُوْنِ এবং আমার আনুগত্য কর ।

১৮০. وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ এবং আমি তোমাদের নিকট এর কোনো বিনিময় চাচ্ছি না اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আমার বিনিময় তো সারা বিশ্বের প্রতিপালকের জিম্মায় রয়েছে ।

১৮১. اَوْفُوا الْكَيْلَ তোমরা পূর্ণরূপে ওজন করো وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ এবং কারো ক্ষতি করো না ।

১৮২. وَزِنُوْا ওজন করো بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ সঠিক পাল্লা দ্বারা ।

১৮৩. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ এবং লোকদেরকে কম দিও না اَشْيَآءَهُمْ তাদের দ্রব্যাদি وَلَا تَعْثَوْا আর বিস্তার করো না فِي الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে مُفْسِدِيْنَ ফ্যাসাদ ।

১৮৪. আর তাঁকেই [আল্লাহ তা'আলাকেই] ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন।	وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾
১৮৫. তারা বলল, তোমার উপর তো কেউ বড় ভীষণ জাদু করেছে।	قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾
১৮৬. এবং তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র, আর আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি।	وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾
১৮৭. অতএব আসমানের এক টুকরা আমাদের উপর পতিত কর যদি তুমি সত্যবাদীদের মধ্যে হয়ে থাক।	فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾
১৮৮. শু'আইব (আ.) বললেন, আমার প্রতিপালক তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে অধিক অবগত আছেন।	قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾
১৮৯. অতএব তারা তাকে অবিশ্বাস করতেই রইল, অতঃপর ছায়াচ্ছন্ন দিনের ঘটনা তাদেরকে এসে ধৃত করল। নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত কঠিন দিনের আজাব ছিল।	فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮৪. وَاتَّقُوا আর তাঁকেই ভয় করো الَّذِي خَلَقَكُمْ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ এবং পূর্ববর্তী সমস্ত সৃষ্টিকে।

১৮৫. قَالُوا তারা বলল إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ তোমার উপর তো কেউ বড় ভীষণ জাদু করেছে।

১৮৬. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا এবং তুমি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ মাত্র وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ আর আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি।

১৮৭. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا অতএব, আমাদের উপর পতিত কর كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ আসমানের একটি টুকরা إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ যদি তুমি সত্যবাদীদের মধ্যে হয়ে থাক।

১৮৮. قَالَ শু'আইব বললেন رَبِّي আমার রব أَعْلَمُ খুব অবগত আছেন بِمَا تَعْمَلُونَ তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে।

১৮৯. فَكَذَّبُوهُ অতএব, তারা তাকে অবিশ্বাস করতেই রইল فَأَخَذَهُمْ অতঃপর তাদেরকে এসে ধৃত করল عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ছায়াচ্ছন্ন দিনের ঘটনা إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত কঠিন দিনের আজাব ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ : এখানে عَجُوزً বলে হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে কওমে লূতের এই কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফের ছিল। লূত (আ.)-এর এই কাফের স্ত্রী বাস্তবে বৃদ্ধা হলে তার জন্য عَجُوزٌ শব্দের ব্যবহার যথার্থই। পক্ষান্তরে বয়সের দিক দিয়ে সে যদি বৃদ্ধা না হয়ে থাকে, তবে তাকে عَجُوزٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, পয়গাম্বরের স্ত্রী উম্মতের জন্য মাতার স্থলাভিষিক্ত। এ ছাড়া অধিক সন্তানের জননীকে বৃদ্ধা বলে অভিহিত করা অসঙ্গত নয়।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নিচে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়া জায়েজ। হানাফী আলেমদের মাযহাব তা-ই। কেননা, লূত সম্প্রদায়কে এমনিভাবে নিপাত করা হয়েছিল। তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টা করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। –(শামী : কিতাবুল হুদূদ)

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ : কারো কারো মতে, قِسْطٌ গ্রীক শব্দ, যার অর্থ– ন্যায় ও সুবিচার। কেউ কেউ একে আরবি শব্দ قِسْطٌ থেকে উদ্ভূত বলেছেন।

এর অর্থও সুবিচার। উদ্দেশ্য এই যে, দাঁড়িপাল্লা এবং এমনি ধরনের মাপ ও ওজনের অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, যাতে কম হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ : অর্থাৎ লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না। উদ্দেশ্য এই যে, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে তার চেয়ে কম দেওয়া হারাম; তা কোনো মাপ ও ওজনের বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু। এ থেকে জানা গেল যে, কোনো শ্রমিক-কর্মচারী নির্ধারিত সময় চুরি করলে এবং কম সময় ব্যয় করলে তাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালেক (র.) মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ফারুক (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে আসরের নামাজে শরিক না হতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে কিছু অজুহাত পেশ করলে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, طَفَّفْتَ অর্থাৎ তুমি ওজনে কম করেছ। যেহেতু নামাজ ওজনের বস্তু নয়, তাই এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর ইমাম মালেক (র.) বলেন, وَفَاءٌ وَتَطْفِيْفٌ অর্থাৎ প্রাপ্য অনুযায়ী করা অথবা কম করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হতে পারে; শুধু মাপ ও ওজনের সাথেই এ বিধান সংশ্লিষ্ট নয়, বরং কারো হক কম দেওয়া, তা যেভাবেই হোক না কেন– হারাম। وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ আয়াতে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর কাছে অপরাধী ব্যক্তি নিজ পায়ে হেঁটে আসে; গ্রেফতারি পরোয়ানা দরকার হয় না :

فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ তা'আলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘের নীচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নীচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ শুরু করল। ফলে সবাই ছাই-ভস্ম হয়ে গেল। –(রূহুল মা'আনী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَجِّنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْجِيَةٌ মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

دَمَّرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَدْمِيْر মূলবর্ণ (د ـ م ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি ধ্বংস করে দিলাম।

أَمْطَرْنَا : সীগাহ جمع متكلم ماضى معروف বহছ افْعَالٌ বাব امْطَارٌ মাসদার (م - ط - ر) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– আমি বৃষ্টি বর্ষণ করলাম।

اَلْمُنْذَرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم مفعول বহছ افْعَالٌ বাব انْذَارٌ মাসদার (ن - ذ - ر) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– ভয় প্রদর্শিত ব্যক্তিগণ।

اَوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ افْعَالٌ বাব ايْفَاءٌ মাসদার (و - ف - ى) মূলবর্ণ জিনস মুরাক্কাব لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পূর্ণরূপে করিও।

اَلْمُخْسِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ افْعَالٌ বাব اخْسَارٌ মাসদার (خ - س - ر) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– অনিষ্টকারীগণ, হ্রাসকারীগণ।

زِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ ضَرَبَ বাব زِنَةٌ ও وَزْنٌ মাসদার মূলবর্ণ (و - ز - ن) জিনস مثال واوى অর্থ– ওজন করো।

لَا تَبْخَسُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر فعل نهى বহছ فَتَحَ বাব بَخْسٌ মাসদার (ب - خ - س) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– তোমরা কম দিয়ো না।

لَا تَعْثَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر نهى حاضر معروف বহছ سَمِعَ বাব عَثْىٌ মাসদার (ع - ث - ى) মূলবর্ণ জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ফাসাদ বিস্তার করো না।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب امر حاضر معروف বহছ افْتِعَالٌ বাব اتِّقَاءٌ মাসদার (و - ق - ى) মূলবর্ণ জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ভয় করো।

فَاَسْقِطْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ افْعَالٌ বাব اسْقَاطٌ মাসদার মূলবর্ণ (س - ق - ط) জিনস صحيح অর্থ– অতএব তুমি পতিত কর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ : এখানে اَوْفُوْا হলো ফে'লে আমর আর তার যমীর হলো ফায়েল اَلْكَيْلَ হলো مفعول به আর وَلَا تَكُوْنُوْا -এর واو হল হরফে আত্ফ আর لَا হলো نَاهِيه এবং تَكُوْنُوْا ফে'লে নাকেস তার মধ্যস্থ যমীর হলো ইসমে নাকেস এবং مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ হলো খবরে নাকেস। –[ই'রাবুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৪৫০]

অনুবাদ	আয়াত
১৯০. এতে [-ও বড়] উপদেশ রয়েছে, অথচ তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾
১৯১. এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, বড় দয়াময়।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾
১৯২. আর এই কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের অবতারিত।	وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾
১৯৩. বিশ্বস্ত ফেরেশতা [হযরত জিবরাঈল (আ.)] এটা নিয়ে এসেছেন।	نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾
১৯৪. আপনার অন্তরে– যেন আপনি ভয় প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।	عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾
১৯৫. পরিষ্কার আরবি ভাষায়।	بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾
১৯৬. এবং এর [এই কুরআনের] উল্লেখ পূর্ববর্তী উম্মতদের কিতাবসমূহে রয়েছে।	وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾
১৯৭. এ কথা কি তাদের জন্য প্রমাণ নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছেন।	أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾
১৯৮. আর যদি আমি তা কোনো অনারবীর উপর নাজিল করতাম।	وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾
১৯৯. অতঃপর সে তা তাদের সম্মুখে পাঠ করত, তবুও এরা তা মানত না।	فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯০. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً এতে উপদেশ রয়েছে وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ অথচ এদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

১৯১. وَإِنَّ رَبَّكَ এবং নিশ্চয় আপনার রব لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ মহাপরাক্রমশালী, বড় দয়াময়।

১৯২. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ আর এই কুরআন অবতারিত رَبِّ الْعَالَمِينَ জগতসমূহের প্রতিপালকের।

১৯৩. نَزَلَ بِهِ একে নিয়ে এসেছেন الرُّوحُ الْأَمِينُ বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরাঈল।

১৯৪. عَلَىٰ قَلْبِكَ আপনার অন্তরে لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ যেন আপনি ভয় প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৫. بِلِسَانٍ ভাষায় عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ পরিষ্কার আরবি।

১৯৬. وَإِنَّهُ এবং এর উল্লেখ রয়েছে لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ পূর্ববর্তী উম্মতদের কিতাবসমূহে।

১৯৭. أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً এ কথা কি তাদের জন্য প্রমাণ নয় যে, أَن يَعْلَمَهُ এটা অবগত আছেন عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ বনী ইসরাঈলের আলেমগণ।

১৯৮. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ আর যদি আমি তা নাজিল করতাম عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ কোনো অনারবীর উপর।

১৯৯. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم অতঃপর সে তাদের সম্মুখে তা পাঠ করত مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ তবুও এরা তা মানত না।

২০০. এভাবেই আমি নাফরমানদের অন্তরে ঈমান না আনার সংকল্পকে ঢুকিয়ে রেখেছি।	كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٠٠﴾
২০১. তারা এতে ঈমান আনয়ন করবে না, যে পর্যন্ত না কঠোর শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।	لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٢٠١﴾
২০২. যা হঠাৎ তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে অথচ তাদের খবরও হবে না।	فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾
২০৩. তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পেতে পারি?	فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾
২০৪. তারা কি আমার আজাবের দ্রুত আগমন চাচ্ছে?	اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٢٠٤﴾
২০৫. হে শ্রোতা! বল তো যদি আমি তাদেরকে কয়েক বছরের জন্য সুখের জীবন ভোগ করতে দেই,	اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ﴿٢٠٥﴾
২০৬. তৎপর তাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা তাদের মাথার উপরে এসে পড়ে,	ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾
২০৭. তবে কী কাজে আসবে তাদের সেই উপভোগ [বরং তা কোনো কাজেই আসবে না]।	مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ﴿٢٠٧﴾
২০৮. এবং যে সমস্ত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, সবগুলোতেই ভীতিপ্রদর্শক নবী এসেছিলেন।	وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴿٢٠٨﴾
২০৯. এটা উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, আর আমি অবিচারী নই।	ذِكْرٰى وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٠٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০০. كَذٰلِكَ এভাবেই سَلَكْنٰهُ ঈমান না আনার সংকল্পকে ঢুকিয়ে রেখেছি فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ নাফরমানদের অন্তরে।

২০১. لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ তারা এতে ঈমান আনবে না। حَتّٰى يَرَوُا যে পর্যন্ত না প্রত্যক্ষ করে الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ কঠোর শাস্তি।

২০২. فَيَاْتِيَهُمْ যা তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে بَغْتَةً হঠাৎ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অথচ তাদের খবরও হবে না।

২০৩. فَيَقُوْلُوْا তখন তারা বলবে هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ আমরা কি অবকাশ পেতে পারি?

২০৪. اَفَبِعَذَابِنَا তারা কি আমার আজাবের يَسْتَعْجِلُوْنَ দ্রুত আগমন চাচ্ছে?

২০৫. اَفَرَءَيْتَ হে শ্রোতা! বল তো اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ যদি আমি তাদেরকে সুখের জীবন ভোগ করতে দেই سِنِيْنَ কয়েক বছরের জন্য।

২০৬. ثُمَّ جَآءَهُمْ তৎপর তা তাদের মাথার উপর এসে পড়ে مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ তাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

২০৭. مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ তবে কি কাজে আসবে مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ তাদের সেই উপভোগ।

২০৮. وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ এবং যে সমস্ত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ সব গুলোতেই ভীতিপ্রদর্শক নবী এসেছিলেন।

২০৯. ذِكْرٰى উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ আর আমি অবিচারী নই।

২১০. এবং এটা [কুরআন] শয়তান নিয়ে আসেনি।	وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢١٠﴾
২১১. আর এটা তাদের অবস্থার উপযোগীও নয় এবং তারা তাতে [কুরআন আনয়ন করতে] সক্ষমও নয়।	وَمَا يَنۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٢١١﴾
২১২. কেননা সে শয়তানদেরকে [আসমানি ওহী] শ্রবণ করা হতে দূরে রাখা হয়েছে।	اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٢﴾
২১৩. অতএব আপনি আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কোনো উপাস্যের ইবাদত করবেন না; করলে আপনার শাস্তি হবে।	فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٣﴾
২১৪. এবং আপনি [সর্বপ্রথম] আপনার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করুন।	وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾
২১৫. এবং সে সমস্ত লোকের সাথে আপনি নম্র ব্যবহার করুন, যারা মুসলমানদের দলভুক্ত হয়ে আপনার পথে চলে।	وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٥﴾
২১৬. আর তারা যদি আপনার কথা না মানে, তবে আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের কার্যে অসন্তুষ্ট।	فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٦﴾
২১৭. এবং আপনি সর্বক্ষমতাবান, দয়াময় আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন।	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٧﴾
২১৮. যিনি আপনাকে লক্ষ্য করেন, যখন আপনি [নামাজে] দণ্ডায়মান হন।	الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১০. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ আর এটা নিয়ে আসেনি الشَّيٰطِيْنُ শয়তান।

২১১. وَمَا يَنۢبَغِيْ لَهُمْ আর এটা তাদের অবস্থার উপযোগীও নয় وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ এবং তারা এটাতে সক্ষমও নয়।

২১২. اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ কেননা সেই শয়তানদেরকে (আসমানি ওহী) শ্রবণ করা হতে لَمَعْزُوْلُوْنَ দূরে রাখা হয়েছে।

২১৩. فَلَا تَدْعُ অতএব, আপনি ইবাদত করবেন না مَعَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সাথে اِلٰهًا اٰخَرَ অন্য কোনো উপাস্যের فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ করলে আপনার শাস্তি হবে।

২১৪. وَاَنْذِرْ এবং আপনি ভয় প্রদর্শন করুন عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আপনার নিকটাত্মীয়গণকে।

২১৫. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ এবং সেই সমস্ত লোকদের সাথে আপনি নম্র ব্যবহার করুন لِمَنِ اتَّبَعَكَ যারা আপনার পথে চলে مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমান হয়ে।

২১৬. فَاِنْ عَصَوْكَ আর তারা যদি আপনার কথা না মানে فَقُلْ তবে আপনি বলে দিন اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ আমি তোমাদের কার্যে অসন্তুষ্ট।

২১৭. وَتَوَكَّلْ এবং আপনি ভরসা রাখুন عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ সর্বক্ষমতাবান দয়াময় আল্লাহর উপর।

২১৮. الَّذِيْ يَرٰىكَ যিনি আপনাকে লক্ষ্য করেন حِيْنَ تَقُوْمُ যখন আপনি (নামাজে) দণ্ডায়মান হন।

২১৯. এবং সেজদাকারীদের [নামাজিদের] সাথে আপনি উঠা-বসা করুন।	وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾
২২০. তিনি অতিশয় শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।	اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٢٠﴾
২২১. আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব যে, শয়তানের দল কার প্রতি অবতীর্ণ হয়?	هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢٢١﴾
২২২. এমন সব লোকের নিকট অবতরণ করে থাকে যারা অতিশয় মিথ্যাবাদী পাপাচারী।	تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٢٢﴾
২২৩. যারা [শয়তানের প্রতি] কান পেতে রাখে এবং অত্যধিক মিথ্যা কথা বলে।	يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿٢٢٣﴾
২২৪. আর কবিদের পথে তো পথভ্রষ্ট লোকেরাই চলে থাকে।	وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٤﴾
২২৫. হে শ্রোতা! তুমি কি অবগত নও যে, তারা প্রত্যেক ময়দানে হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরতে থাকে।	اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٥﴾
২২৬. এবং মুখে এমন বাক্যসমূহ উচ্চারণ করতে থাকে– যা তারা করে না।	وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٦﴾
২২৭. কিন্তু হ্যাঁ, যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করে এবং [স্বীয় কবিতায় দীনের প্রচার দ্বারা] অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করে, আর যারা অত্যাচারিত হবার পর [নিন্দাসূচক কবিতা দ্বারা] তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। [তারা ভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত নয়।] আর যারা অত্যাচার করেছে অচিরেই তারা জানতে পারবে, কেমন স্থানে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿٢٢٧﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

২১৯. وَتَقَلُّبَكَ এবং আপনি উঠাবসা করেন فِي السّٰجِدِيْنَ সেজদাকারীদের সাথে।

২২০. اِنَّهٗ তিনি هُوَ السَّمِيْعُ অতিশয় শ্রবণকারী, الْعَلِيْمُ সর্বজ্ঞ।

২২১. هَلْ اُنَبِّئُكُمْ আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব যে, عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ শয়তানের দল কার প্রতি অবতীর্ণ হয়।

২২২. تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ এমন সব লোকের নিকট অবতরণ করে থাকে اَفَّاكٍ যারা অতিশয় মিথ্যাবাদী اَثِيْمٍ পাপাচারী।

২২৩. يُلْقُوْنَ السَّمْعَ যারা কান পেতে রাখে وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ, এবং অত্যধিক মিথ্যা কথা বলে।

২২৪. وَالشُّعَرَآءُ, আর কবিদের পথে তো يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ পথভ্রষ্ট লোকেরাই চলে থাকে।

২২৫. اَلَمْ تَرَ হে শ্রোতা! তুমি কি অবগত নও যে, اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ তারা প্রত্যেক ময়দানে يَهِيْمُوْنَ হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরতে থাকে।

২২৬. وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ, এবং মুখে এমন বাক্যসমূহ উচ্চারণ করতে থাকে مَا لَا يَفْعَلُوْنَ যা তারা করে না।

২২৭. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا কিন্তু হ্যাঁ যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ, এবং ভালো কাজ করে। وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا, এবং অধিক পরিমাণ আল্লাহর জিকির করে। وَانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا আর যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا, আর যারা অত্যাচার করেছেন অচিরেই তারা জানতে পারবে اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ কেমন স্থানে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٢٠٤)

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন যে, মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় রাসূলে আকরাম ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলেছিল যে, হে মুহাম্মদ! কোন সময়কার আজাবের প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিচ্ছ? সে আজাব তো আর আনলে না। তাদের এ বিদ্রূপের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –(কুরতুবী ১২৭/১৩)

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ (٢١٠)

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় কুরআন ও রাসূল ﷺ সম্পর্কে মন্তব্য করত যে, মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুগামী জিন রয়েছে। জিন জ্যোতিষীদের নিকট খবরা-খবর যেরূপভাবে পৌঁছিয়ে থাকে, অনুরূপভাবে অনুগামী সে জিনটি মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকটও তা পৌঁছিয়ে থাকে। তাদের এহেন উদ্ভট মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১২৩/১০/১৯]

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ (٢١٣)

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় রাসূল ﷺ -এর সাথে সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে একটি সাম্যের পথ খুঁজে বের করে, রাসূল ﷺ-এর নিকট প্রস্তাব করল যে, হে মুহাম্মদ! আমাদের মা'বুদগুলোকে এক বছর ইবাদত করুন, আমরাও আপনার মাবুদকে এক বছর ইবাদত করব। তাহলেই তো আমাদের মাঝে আর কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকেনা। তাদের এ বিভ্রান্তিকর কৌশলী প্রস্তাবের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[সাভী ১৮৩/৩]

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢١٠)

শানে নুযূল : ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির (র.) ইবনে জুরাইজ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আয়াত যখন নাজিল হলো, রাসূল ﷺ তখন নিজ পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই কাজ আরম্ভ করেন, তবে অন্যান্য মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র রাসূল ﷺ -এর নিজ পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের মাঝে সতর্কীকরণের কাজ সীমাবদ্ধতার কারণে অন্য সকল ঈমানদারদের অন্তরে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ১৩৬/১০/১৯]

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ۞ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۞ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ (٢٢٤-٢٢٦)

শানে নুযূল : ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মক্কার কতিপয় মুশরিক কবি ছিল, যারা হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ কে নিয়ে কবিতা রচনা করে এ মর্মে কুৎসা রটনা করত যে, "তোমরা এসো, মুহাম্মদ ﷺ-এর ন্যায় আমরাও পুরা কালের কথা বলতে পারি।" তারা হলো আব্দুল্লাহ বিন যাবারী, হুবাইরা বিন ওহাব আল মখযূমী, মুনফি' বিন আব্দে মানাফ, আব্দুল উয্যা আল-জামাহী ও উমাইয়্যাহ বিন আবী সালত প্রমুখ। তারা বলত যে, মুহাম্মদ ﷺ যে ধরনের কথা বলে, অনুরূপভাবে আমরাও বলতে পারি। তারা রাসূল ﷺ কে নিয়ে ব্যঙ্গ করত, আরব গোত্রগুলো সমবেত হয়ে তারা তাদের রচিত ব্যাঙ্গাত্মক কবিতাগুচ্ছ শোনত। কুরুচিপূর্ণ সেসব কবিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুভীয়া (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় দুজন কবি ছিল। একজন আনসারী অপরজন অন্য কোনো গোত্রীয়। তারা একে অপরের ব্যঙ্গ বর্ণনা করত কবিতার মাধ্যমে। তাদের সাথে নিজেদের গোত্রীয় নির্বোধ ও বোকা শ্রেণির লোকেরা তাদের পক্ষালম্বনে দলবদ্ধ হয়ে যেত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রূহুল মা'আনী ১৪৬/১০/১৯, ইবনে কাছীর ৩৬৫/৩, দুররে মানছুর ৯৯/৫]

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ (٢٢٧)

শানে নুযূল ঃ-১ আব্দ বিন হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম হযরত কাতাদা (র.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আলোচ্য আয়াত রাসূল ﷺ -এর পক্ষ থেকে মুশরিকদের জবাবে যারা ব্যঙ্গ করত সেসব মুসলিম কবিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা হলেন, আনসারী কবি কা'ব বনি মালেক, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, হাস্‌সান বিন ছাবেত, মতান্তরে হযরত আবূ বকর, ওমর ও আলী (রা.) প্রমুখও ছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতে যে কবিদের সম্পর্কে ভর্ৎসনা প্রকাশ করা হয়েছে, তারা ঈমানদীপ্ত কবিতা রচনাকারী নয়, ঈমানদার কবিগণ ছাড়া ; তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

শানে নুযূল ঃ-২ আবুল হাসান সালেম -এর উদ্ধৃতি দিয়ে কতিপয় বর্ণনা কারী বর্ণনা করেছেন যে, وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ। আয়াত যখন নাজিল হয় তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা , হাস্‌সান বিন ছাবেত কা'ব বিন মালেক প্রমুখ কান্না করে দরবারে রেসালতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা وَالشُّعَرَاءُ আয়াত নাজিল করেছেন। তিনি তো জানেন, আমরাও তো কবিদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি। আমরাও তো ধ্বংস হয়ে গেলাম। সুতরাং সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ১৪৭/১০/১৯ ইবনে কাছীর ৩৬৬, দূররে মানছূর ৯৯/৫]

শব্দ ও অর্থসম্ভারের সমষ্টির নাম কুরআন : بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবি ভাষায় লিখিত কুরআনই কুরআন। অন্য যে কোনো ভাষায় কুরআনের কোনো বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কুরআন বলা হবে না।

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِيْنَ থেকে বাহ্যত এর বিপরীতে একথা জানা যায় যে, কুরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোনো ভাষায় থাকলে তাও কুরআন। কেননা, انه এর সর্বনামটি বাহ্যত: কুরআনকে বোঝায়। زبر শব্দটি زبور -এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআন পাক পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। বলা বাহুল্য, তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাব আরবি ভাষায় ছিল না। কেবল কুরআনের অর্থসম্ভার সেসব কিতাবে উল্লিখিত আছে বলেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস এই যে, কোনো সময় শুধু কুরআনের বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক অর্থে কুরআন বলে দেওয়া হয়। কারণ, কোন কিতাবের বিষয়বস্তুই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কুরআন উল্লিখিত হওয়ার অর্থও এই যে, কুরআনের কোনো কোনো বিষয়বস্তু সেগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। অনেক হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুস্তাদরাক হাকেম বর্ণিত হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন , আমাকে সূরা বাক্বারা, 'প্রথম আলোচনা' থেকে দেওয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও যেসব সূরা طٰسٓ দ্বারা শুরু হয় এবং যেসব সূরা حٰمٓ দ্বারা শুরু হয়, সেগুলো হযরত মূসা (আ.)-এর ফলক থেকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সূরা ফাতেহা আরশের নিচ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকিম ও বায়হাকী (র.) প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মূলক তাওরাতে বিদ্যমান আছে। আর সূরা সাব্বিহিসমা সম্পর্কে তো স্বয়ং কুরআন বলে যে,

إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ, এই সূরার বিষয়বস্তু হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আ.) -এর সহীফাসমূহেও আছে। সব আয়াত ও রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, কুরআনের অনেক বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরি নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কুরআন বলতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কুরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু অর্থসম্ভারের নামও নয়। যদি কেউ কুরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিম্নরূপ বাক্য গঠন করে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَهُوَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْمُسْتَعَانُ তবে একে কেউ কুরআন বলতে পারবে না। এমনিভাবে শুধু কুরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কুরআন বলা যায় না।

নামাজে কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধঃ এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাজে ফরজ তেলাওয়াতের স্থলে কুরআনের শব্দাবলির অনুবাদ ফারসী, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা ইত্যাদি কোনো ভাষায় পাঠ করা অপারগ অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয়। কোনো কোনো ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন উক্তিও বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে সেই উক্তির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে।

কুরআনের বাংলা অনুবাদকে 'বাংলা কুরআন' বলা জায়েজ নয় : এমনিভবে আরবীর মূল বাক্যাবলি ছাড়া শুধু কুরআনের অনুবাদ কোনো ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার কুরআন বলা জায়েজ নয়। যেমন আজকাল অনেকেই শুধু বাংলা অনুবাদকে 'বাংলা কুরআন' ইংরেজী অনুবাদকে 'ইংরেজি কুরআন' বলে থাকে। এটা নাজায়েজ ও ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলি ছাড়া কুরআনকে অন্য কোনো ভাষার 'কুরআন' নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েজ।

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ : এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করাও আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামত। কিন্তু যারা এই নিয়ামতের নাশুকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘ জীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোনো কাজে আসবে না। ইমাম যুহরী (র.) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রা.) প্রতিদিন সকালে তার শ্মশ্রু ধরে নিজেকে সম্বোধন করে এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন- أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ ; এরপর আঝোরে কাঁদতে থাকতেন এবং নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করতেন-

نَهَارُكَ بِالْغُرُوْرِ سَهْوٌ وَغَفْلَةٌ ۞ وَلَيْلُكَ نَوْمٌ وَالرَّدٰى لَكَ لَازِمٌ

فَلَا اَنْتَ فِى الْاِيْقَاظِ يَقْظَانٌ حَازِمٌ ۞ وَلَا اَنْتَ فِى النَّوْمِ نَاجٍ وَسَالِمٌ
وَتَسْعٰى اِلٰى مَا سَوْفَ تَكْرَهُ غِبَّهٗ ۞ كَذٰلِكَ فِى الدُّنْيَا تَعِيْشُ الْبَهَائِمُ

অর্থাৎ, তোমার সমগ্র দিন গাফিলতিতে এবং রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। অথচ মৃত্যু তোমার জন্য অপরিহার্য। তুমি জাগ্রতদের মধ্যে হুশিয়ার ও জাগ্রত নও এবং নিদ্রামগ্নদের মধ্যে তোমার মুক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত নও তোমার চেষ্টাচরিত্র এমন কাজের জন্য, যার অশুভ পরিণাম শীঘ্রই সামনে আসবে। দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তুরাই এমনিভাবে জীবন ধারণ করে।

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ : عَشِيْرَةٌ শব্দের অর্থ– পরিবারবর্গ। -এর সঙ্গে اَقْرَبِيْنَ বিশেষণ যুক্ত করে তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বোঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, সমগ্র উম্মতের কাছে রিসালাত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফরজ ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশদানের রহস্য কী? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তাবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভালো ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চাইতে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোনো মিথ্যা দাবিদার সুবিধা করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিদিত, তার সত্য দাওয়াত কবুল করা তাদের জন্যে সহজও। নিকটতম আত্মীয়রা যখন কোনো আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়। তখন তাদের সহমর্মিতা এবং সাহায্য ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের একটি পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলি পালন করা সহজ হয়ে যায় এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরি হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ, নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ ও সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সে পর্যন্ত কোনো মানুষের পক্ষে নিজে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি একজন লোক পূর্ণরূপে নামাজ পালন করতে চায়, তবে পাকা নামাজির পক্ষেও যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এই নয় যে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ করা কঠিন কাজ; বরং কারণ এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জ্ঞাতিগোষ্ঠী যে ক্ষেত্রে গুনাহে লিপ্ত, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবারের সাবইকে একত্র করে সত্যের এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আস্তে আস্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ঈমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃব্য হযরত হামজার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে ফেলে।

কবিতার সংজ্ঞা : وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ : অভিধানে এমন বাক্যবলিকে কবিতা বলা হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর জন্য ছন্দ, ওজন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশাস্ত্রেও এ ধরনের বিষয়বস্তুকে 'কবিতাধর্মী প্রমাণ' এবং কবিতা-দাবিযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গজলেও সাধারণত কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যবলিকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোনো কোনো তাফসীরকারক কুরআনের شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ - شَاعِرٌ مَّجْنُوْنٌ - بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ইত্যাদি আয়াতে পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে, মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওজনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দবিশিষ্ট বাক্যাবলি নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফেরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ তারা কবিতার রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিল। বলাবহুল্য, কুরআন কবিতাবলির সমষ্টি নয়।

একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না। প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা তো দূরের কথা; বরং কাফেররা তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থেই কবি অর্থাৎ, কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে

(নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী বলা । কারণ شِعْر (কবিতা) মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং كَاذِبٌ তথা মিথ্যাবাদীকে شَاعِرٌ বলা হয় । তাই প্রমাণাদিকে কবিতাধর্মী প্রমাণাদি বলা হয়ে থাকে । মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলিকে যেমন কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনুমানিক বাক্যবলিকেও কবিতা বলা হয় । এটা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষা ।

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ – আলোচ্য আয়াতে কবিতার পারিভাষিক ও প্রসিদ্ধ অর্থই বোঝানো হয়েছে । অর্থাৎ যারা ওজন বিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলি রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে । ফতহুল বারীর এক রেওয়ায়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় । রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাজিল হবার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবেত ও কা'ব ইবনে মালেক (রা.) প্রমুখ কবি সাহাবী ক্রন্দনরত অবস্থার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতের উপস্থিত হন এবং এবং আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেছেন । আমরাও তো কবিতা রচনা করি । এখন আমাদের কী উপায়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর । উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা যেন অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয় । কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল । এর পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদেরকে বোঝানো হয়েছে । কেননা পথভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত । –(ফতহুল বারী) ।

ইসলামি শরিয়তে কাব্যচর্চার মান : উল্লিখিত আয়াতের প্রথামাংশ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বুঝা যায় । কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় । পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গোনাহ্ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ আয়াতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভুক্ত করে দিয়েছেন । কোনো কোনো কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়াজ ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে ইবাদত ও ছওয়াবের অন্তর্ভুক্ত । হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে আছে– إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً অর্থাৎ, কতক কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে । –(বোখারী) হাফেয ইবনে হাজার (র.) বলেন, এই রেওয়ায়েতে 'হেকমত' বলে সত্য ভাষণ বুঝানো হয়েছে । ইবনে বাত্তাল (র.) বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার একত্ব, তাঁর জিকির এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয় । উপরিউক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বুঝানো হয়েছে । পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয় । এর আরো সমর্থন নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে পাওয়া যায় । (১) ওমর ইবনে শারীদ (র.) তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবু সলতের একশ' লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন । ২. মুতারিক (র.) বলেন, আমি কূফা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.)-এর সাথে সফর করেছি । প্রতি মনজিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে শুনাতেন । (৩) তাবারী (র.) প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা কবিতা রচনা করতেন, শুনতেন এবং শুনাতেন । ৪. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) কবিতা বলতেন । ৫. আবূ ইয়া'লা (র.) ইবনে ওমর (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভাল এবং বিষয়বস্তু মন্দ গুনাহের হলে কবিতা মন্দ । –(ফতহুল বারী)

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে মদীনা মুনাওয়ারার দশ জন জ্ঞান-গরিমায় সেরা ফিকহ বিশারদদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন । কাযী যুবাইর ইবনে বাক্কারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল । কুরতুবী (র.) আবূ আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারেন না । কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শুনেননি ও পছন্দ করেননি ।

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর স্মরণ, ইবাদত ও কুরআন থেকে গাফেল হয়ে কাব্যচর্চার নিমগ্ন হওয়া নিন্দনীয় । ইমাম বুখারী (র.) একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন– لِأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا অর্থাৎ পুঁজ দ্বারা পেট ভর্তি করা কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চেয়ে উত্তম । ইমাম বুখারী (রা.) বলেন, আমার মতে এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহর স্মরণ, কুরআন ও জ্ঞান চর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে

মন্দ নয়। এমনিভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি ভর্ৎসনা, বিদ্রূপ অথবা অন্য কোনো শরিয়ত-বিরোধী বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও নাজায়েজ। এটা শুধু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্যে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত হলে তাও হারাম। –(কুরতুবী)

খলীফা হযরত ওমর (রা.) প্রশাসক আদী ইবনে নযলাকে অশ্লীল কবিতা বলার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) আমর ইবনে রবীয়া ও আবুল আহওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশান্তরিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমর ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়। –(কুরতুবী)

যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফেল করে দেয়, তা নিন্দনীয় : ইবনে আবী জমরা (র.) বলেন, যে জ্ঞান ও শাস্ত্র অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

سَلَكْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার سُلُوْكٌ মূলবর্ণ (س ـ ل ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– আমি ঈমান না আনার সংকল্পকে ঢুকিয়ে রেখেছি।

يَسْتَعْجِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِعْجَالٌ মাসদার (ع ـ ج ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা দ্রুত আগমন চাচ্ছে।

مَا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْدٌ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– তাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْتِيْعٌ মূলবর্ণ (م ـ ت ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তাদের উপভোগের উপকরণ।

مَا يَسْتَطِيْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা তাতে সক্ষমও নয়।

لَمَعْزُوْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার عَزْلٌ মূলবর্ণ (ع ـ ز ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে দূরে রাখা হয়েছে।

اِخْفِضْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خَفْضٌ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– আপনি নিচু করুন।

عَصَوْكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عِصْيَانٌ মূলবর্ণ (ع ـ ص ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা আপনার কথা না মানে।

يُلْقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যারা পেতে রাখে।

يَهِيْمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هَيْمٌ মূলবর্ণ (ه ـ ى ـ م) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরতে থাকে।

مُنْقَلَبٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْقِلَابٌ মূলবর্ণ (ق ـ ل ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– স্থান।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ : এখানে ثُمَّ হলো হরফে আতফ আর جَاءَهُمْ -এর جَاءَ হলো ফে'ল আর هُمْ হলো مفعول به আর مَا হলো তার ফায়েল (যায় اسم موصول) আর كَانُوْا বাক্যটি مَا -এর সেলাহ। আর كَانُوْا ফে'লে নাকেস আর তার যমীর হলো ইসমে নাকেস আর يُوْعَدُوْنَ হলো খবরে নাকেস। –[ই'রাবুল কুরআন খ. ৭ পৃ. ৪৬১]

سُوْرَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ

সূরা নামল

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৯৩, রুকূ'–৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. ত্বোয়া-সীন। এগুলো [যা আপনার প্রতি নাজিল হয়] কুরআনের এবং একটি বিশদ গ্রন্থের আয়াত।	طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ﴿١﴾
২. এটা মুমিনদের জন্য হেদায়েত [পথনির্দেশ] এবং শুভসংবাদ প্রদানকারী।	هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾
৩. যারা সালাত কায়েম করে এবং জাকাত প্রদান করে আর তারা পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।	الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٣﴾
৪. যারা পরকালে বিশ্বাস করে না আমি তাদের কার্যসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করে রেখেছি, সুতরাং তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়।	اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٤﴾
৫. তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্য [দুনিয়াতে মৃত্যুকালেও] কঠিন আজাব রয়েছে এবং তারা পরকালেও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. طٰسٓ ত্বোয়া-সীন تِلْكَ এগুলো اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ কুরআনের আয়াত وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ এবং একটি বিশদ গ্রন্থের।

২. هُدًى এটা হেদায়েত وَّبُشْرٰى এবং শুভ সংবাদ প্রদানকারী لِلْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদারদের জন্য।

৩. الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ যারা নামাজ কায়েম করে وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করে وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ আর তারা পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

৪. اِنَّ الَّذِيْنَ যারা لَا يُؤْمِنُوْنَ বিশ্বাস করেন بِالْاٰخِرَةِ পরকালে زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ আমি তাদের কার্যসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করে রেখেছি فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ সুতরাং তারা বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়।

৫. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ তারা ঐ সমস্ত লোক لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ যাদের জন্য কঠিন আজাব রয়েছে وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ আর তারা পরকালেও هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬. আর নিশ্চয় আপনাকে প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতার সন্নিধান হতে কুরআন প্রদান করা হয়েছে।	وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ﴿٦﴾
৭. যখন মূসা স্বীয় পরিজনকে বললেন, আমি অগ্নি অবলোকন করেছি। এখনই আমি তথা হতে কোনো সন্ধান আনব অথবা তোমার নিকট জ্বলন্ত অঙ্গার আনব, যেন তুমি আগুন পোহাতে পার।	اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖۤ اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٧﴾
৮. অতঃপর যখন তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, তখন তাকে ডেকে বলা হলো, যারা এই অগ্নির মধ্যে রয়েছেন, তাদের প্রতিও বরকত হোক এবং যে তার পার্শ্বে রয়েছে তার প্রতিও। আর আল্লাহ পবিত্র, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।	فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨﴾
৯. হে মূসা! ব্যাপার এই যে, আমি আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	يٰمُوْسٰۤى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾
১০. এবং তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর; অনন্তর যখন তিনি তাকে সর্প সদৃশ নড়াচড়া করতে দেখলেন, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলেন এবং পশ্চাৎ দিকে ফিরেও দেখলেন না। হে মূসা! ভয় করো না। আমার সমীপে রাসূলগণ ভয় পায় না।	وَاَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۟ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَاِنَّكَ আর নিশ্চয় আপনাকে لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ কুরআন প্রদান করা হয়েছে مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতার সন্নিধান হতে।

৭. اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖ যখন মূসা স্বীয় পরিজনকে বললেন। اِنِّيْ اٰنَسْتُ نَارًا আমি অগ্নি অবলোকন করেছি سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ এখনই আমি তথা হতে কোনো সন্ধান আনব اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ অথবা তোমার নিকট জ্বলন্ত অঙ্গার আনব لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ যেন তুমি আগুন পোহাতে পার।

৮. فَلَمَّا جَآءَهَا অনন্তর যখন তিনি তার নিকটবর্তী হলেন نُوْدِيَ তখন তাকে ডেকে বলা হলো اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ যারা এই অগ্নির মধ্যে রয়েছেন তাদের প্রতিও বরকত হোক وَمَنْ حَوْلَهَا এবং যে তার পার্শ্বে রয়েছে তার প্রতিও وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ আর আল্লাহ পবিত্র رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

৯. يٰمُوْسٰى হে মূসা اِنَّهٗ ব্যাপর এই যে, اَنَا اللّٰهُ আমি আল্লাহ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

১০. وَاَلْقِ عَصَاكَ এবং তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর فَلَمَّا رَاٰهَا অনন্তর যখন তিনি তাকে দেখলেন تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ সর্পসদৃশ নড়াচড়া করতে। وَلّٰى مُدْبِرًا তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলেন وَلَمْ يُعَقِّبْ এবং পশ্চাৎ দিকে ফিরেও দেখলেন না يٰمُوْسٰى হে মূসা! لَا تَخَفْ ভয় করো না اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ আমার সমীপে রাসূলগণ ভয় পায় না।

১১. কিন্তু হ্যাঁ, যারা জুলুম করার পর অসৎ কাজের পরিবর্তে নেক কাজ করে, তবে আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾
১২. এবং তুমি তোমার হাত স্বীয় বগলে রাখ, তা কোনো দোষ ব্যতীত শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে বের হবে। [এই দুটি মু'জিযা সেই] নয়টি মু'জিযার মধ্যে [যা সহ তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে] ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি; তারাতো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।	وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِى تِسْعِ ءَايَٰتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿١٢﴾
১৩. মোটকথা আমার সুস্পষ্ট মু'জিযাগুলো যখন তাদের নিকট পৌঁছল তখন বলল, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।	فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ ءَايَٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾
১৪. এবং অনাচার ও অহংকারের সাথে ঐ মু'জিযাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল, অথচ তাদের অন্তর সেগুলোকে [সত্য বলে] বিশ্বাস করেছিল, অতএব দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কীরূপ পরিণাম হয়েছিল।	وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾
১৫. আর আমি দাউদ ও সুলায়মানকে বিশেষ জ্ঞান দান করলাম এবং তাঁরা উভয়ে বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আমাদেরকে তার বহু মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।	وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. إِلَّا مَنْ ظَلَمَ তবে হ্যাঁ, যারা জুলুম করার পর ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا অতঃপর সে তার পরিবর্তে নেক কাজ করে بَعْدَ سُوٓءٍ অসৎ কাজের পর فَإِنِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ তবে আমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

১২. وَأَدْخِلْ يَدَكَ এবং তুমি তোমার হাত রাখ فِى جَيْبِكَ স্বীয় বগলে تَخْرُجْ بَيْضَآءَ তা শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে বের হবে مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ কোনো দোষ ব্যতীত। فِى تِسْعِ ءَايَٰتٍ নয়টি মু'জিযার মধ্যে إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِۦٓ ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

১৩. فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ ءَايَٰتُنَا مُبْصِرَةً মোট কথা আমার সুস্পষ্ট মু'জিযাগুলো যখন তাদের নিকট পৌঁছল قَالُوا۟ তখন বলল هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ এটাতো সুস্পষ্ট জাদু।

১৪. وَجَحَدُوا۟ بِهَا এবং ঐ মু'জিযাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ অথচ তাদের অন্তর সেগুলোকে বিশ্বাস করেছিল ظُلْمًا وَعُلُوًّا অনাচার ও অহংকারের সাথে فَٱنظُرْ অতএব দেখুন كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কীরূপ পরিণাম হয়েছিল।

১৫. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا আর আমি দান করলাম دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ দাউদ ও সুলায়মানকে عِلْمًا বিশেষ জ্ঞান وَقَالَا এবং তাঁরা উভয়ে বললেন ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য ٱلَّذِى فَضَّلَنَا যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ তাঁর বহু মুমিন বান্দার উপর।

১৬. আর সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলেন এবং তিনি বললেন, হে লোকগণ! আমাকে পাখির বুলি [ভাষা বুঝবার জ্ঞান] শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর আমাকে সর্বপ্রকারের বস্তু প্রদান করা হয়েছে, নিশ্চয় এটা স্পষ্ট অনুগ্রহ।

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ আর সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলেন وَقَالَ, এবং তিনি বললেন يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে লোকগণ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ আমাকে পাখির বুলি (ভাষা বুঝবার জ্ঞান) শিক্ষা দেওয়া হয়েছে وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ আর আমাকে সর্বপ্রকার বস্তু প্রদানকর হয়েছে اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ নিশ্চয় এটা স্পষ্ট অনুগ্রহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নামলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ৯৩ আয়াত, ৭ রুকূ, ১১৪৯ বাক্য এবং ৪৭৬৭ অক্ষর রয়েছে। নামল শব্দটির অর্থ হলো পিপীলিকা। যেহেতু এ সূরায় নামল বা পিপীলিকার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আন নামল'। পিপীলিকার এ ঘটনা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়তের প্রমাণ বহন করে, তাই এ ঘটনার গুরুত্ব সর্বাধিক। প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর হিজরতের রাতে যখন তিনি মক্কার অদূরে অবস্থিত সওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে ক্ষণিকের মধ্যে ঐ গুহার মুখে মাকড়সা তার জাল বিস্তার করেছিল, আর তা ছিল মহানবী ﷺ -এর মু'জিযা ও নবুয়তের দলিল। ঠিক তেমনিভাবে হুদহুদ নামক পাখির চিঠি নিয়ে যাওয়ার ঘটনা এবং বিলকিস রাণীর সিংহাসন তুলে আনা প্রভৃতি ছিল হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সূরায় আল্লাহ পাক হযরত সুলায়মান (আ.)-এর তাবলীগের পন্থা উল্লেখ করেছেন। পিপীলিকার এ ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রাণী মাত্রই এ সম্পর্কে অবগত যে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাথীগণ কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেন না।

এ সূরায় তাওহীদ এবং নবুয়ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইবনে মরদূভিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।

-[তাফসীরে হক্কানী পারা ১৯, পৃ.৩]

এই সূরার আমল : যদি কেউ এই সূরা হরিণের চামড়ার উপর লিপিবদ্ধ করে স্বগৃহে হেফাজত করে তবে সেই গৃহ সাপ বিচ্ছুসহ সর্বপ্রকার কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে সংরক্ষিত থাকবে। -[দুরারুন নাজিম]

স্বপ্নের তাবীর : সুয়ূতী (র.) বলেন, যদি কেউ স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, তবে সে তার সমাজের নেতৃত্ব লাভ করবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাও শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআন ও প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কীয় আলোচনা দ্বারা। এ প্রসঙ্গে পূর্বকালের নবীগণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রিসালাতের প্রমাণ বর্ণিত হবার পর তাওহীদ এবং তার দলিলের বিবরণ স্থান পেয়েছে। পরে রয়েছে আখিরাত সম্পর্কীয় আলোচনা।

طس : এ অক্ষরসমূহকে মুকাত্তায়াত বলা হয়, এর অর্থ আল্লাহ পাকই জানেন। এ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, ইবনে আবি হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া-সীন" হলো আল্লাহ পাকের ইসমে আজম।

আব্দুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ এবং ইবনে আবি হাতেম (র.) তাফসীরকার কাতাদা (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া-সীন" হলো পবিত্র কুরআনের নামসমূহের অন্যতম। -[তাফসীরে দুররুল মানসুর খ. ৫, পৃ. ১১১]

زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ : অর্থাৎ যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এখানে أَعْمَالَهُمْ বলে তাদের সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সৎকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু জালিমরা এদিকে ভ্রূক্ষেপও করেনি; বরং কুফর ও শিরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত তাফসীর অধিক স্পষ্ট। কারণ প্রথমত সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ কুকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

১. زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ২. وَزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ৩. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ.

সৎকর্মের জন্য এই শব্দের ব্যবহার খুবই কম। যেমন– حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ দ্বিতীয়ত আয়াতে উল্লিখিত أَعْمَالَهُمْ [তাদের কর্ম] শব্দও এ কথা বোঝায় যে, এর অর্থ হলো– কুকর্ম; সৎকর্ম নয়।

إِذْ قَالَ مُوسٰى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ.

মানুষের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয় : হযরত মূসা (আ.) এ স্থলে দুইটি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। এক. বিস্মৃত পথ জিজ্ঞাসা। দুই. অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা, রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। তাই তিনি তূর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সাথে সাথে এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবি করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বান্দাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্য চেষ্টা করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। তাঁকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সম্ভবত এই রহস্য ছিল যে, এতে তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত, পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ করা। -(রূহুল মা'আনী)

এ স্থলে হযরত মূসা (আ.) تَصْطَلُونَ ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন। অথচ তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ শোয়াইব (আ.)-এর কন্যাও ছিলেন। তার জন্য সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্বোধন করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পত্নীদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করে বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উত্তম : আয়াতে قَالَ مُوسٰى لِأَهْلِهِ বলা হয়েছে। أَهْل শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও শামিল থাকে। এ স্থলে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে একমাত্র তাঁর স্ত্রীই ছিলেন, অন্য কেউ ছিল না; কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন সাধারণভাবে এ কথা বলার প্রচলন আছে যে, "আমার পরিবারের লোক এ কথা বলে"।

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. يَا مُوسٰى إِنَّهُ أَنَا اللّٰهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

মূসা (আ.)-এর আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্য থেকে আওয়াজ আসার স্বরূপ : মূসা (আ.)-এর এই ঘটনা কুরআন পাকের অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নামলের আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দুইটি বাক্য চিন্তাসাপেক্ষ- ১. بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ এবং ২. إِنَّهُ أَنَا اللّٰهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ; সূরা তোয়াহায় এই ঘটনা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে–

إِذْ رَأَى نَارًا .... نُودِيَ يَا مُوسٰى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى إِنَّنِي أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي.

এ সব আয়াতেও দুইটি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তাসাপেক্ষ ১. إِنِّي أَنَا رَبُّكَ এবং ২. إِنَّنِي أَنَا اللّٰهُ ; সূরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسٰى إِنِّي أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

এই সূরাত্রয়ে বর্ণনাভঙ্গি বিভিন্ন রূপ হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। তা এই যে, সেই রাত্রিতে একাধিক কারণে হযরত মূসা (আ.)-এর অগ্নি প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলা তূর পাহাড়ের এক বৃক্ষে তাঁকে অগ্নি দেখালেন। সেই অগ্নি বা বৃক্ষ থেকে এ আওয়াজ শুনা গেল إِنَّهُ أَنَا اللّٰهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - إِنِّي أَنَا رَبُّكَ إِنِّي أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ إِنَّنِي أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا। এটা সম্ভবপর যে, এই আওয়াজ বারবার হয়েছে একবার এক শব্দে এবং অন্যবার অন্য শব্দে। তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়ান এবং রূহুল-মা'আনীতে আল্লামা আলূসী (র.) এই আওয়াজ শ্রবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই যে, এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে এই রূপ শোনা যাচ্ছিল, যার কোনো বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রবণও বিচিত্র ভঙ্গিতে হয়েছে-শুধু কর্ণ নয়; বরং হাত পা ও অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই আওয়াজ শুনছিল। এটা ছিল একটা বিশেষ মু'জিযা।

এই গায়েবী আওয়াজ নির্দিষ্ট কোনো দিক ও অবস্থা ছাড়াই শ্রুত হচ্ছিলো। কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথবা বৃক্ষ, যা থেকে অগ্নির আকৃতি দেখানো হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে মানুষের জন্য বিভ্রান্তি ও তার প্রতিমা পূজার কারণ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বর্ণনায় তাওহীদের বিষয়বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ সাথে সাথে করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে سُبْحَانَ اللّٰهِ শব্দ এই হুঁশিয়ারির জন্যই সংযুক্ত করা হয়েছে। সূরা তোয়াহায় لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا এবং সূরা কাসাসে أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ এই বিষয়বস্তুকেই জোরদার করার জন্য আনা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আ.) তখন আগুন ও আলোর প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করছিলেন বলেই তাকে আগুনের আকৃতি দেখানো হয়েছিল। নতুবা আগুনের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহর কালাম ও আল্লাহর সত্তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় আগুনও আল্লাহ তা'আলার একটি সৃষ্ট বস্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে- أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ ধন্য সে, যে অগ্নিতে আছে এবং যে আশেপাশে আছে। উপরিউক্ত কারণেই এর তাফসীরে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ হয়ে গেছে। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে- مَنْ فِي النَّارِ বলে হযরত মূসা (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা অগ্নিটি তো সত্যিকার অগ্নি ছিল না। যে বরকতময় স্থানে মূসা (আ.) উপস্থিত হয়েছিলেন, দূর থেকে সেটা সম্পূর্ণ অগ্নি মনে হচ্ছিল। তাই মূসা (আ.) অগ্নির মধ্যে হলেন। وَمَنْ حَوْلَهَا বলে আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে। কোনো কোনো তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে- مَنْ فِي النَّارِ বলে ফেরেশতা এবং وَمَنْ حَوْلَهَا বলে হযরত মূসা (আ.) -কে বুঝানো হয়েছে। সার-সংক্ষেপে এই উক্তিই বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ বুঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান বসরী (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েত ও তার পর্যালোচনা : ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদূভিয়াহ (র.) প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) থেকে مَنْ فِي النَّارِ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে- مَنْ فِي النَّارِ বলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ও মহান সত্তা বুঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, অগ্নি একটি সৃষ্ট বস্তু এবং কোনো সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে স্রষ্টার অনুপ্রবেশ হতে পারে না যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা আগুনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল; যেমন অনেক প্রতিমাপূজারী মুশরিক প্রতিমার অস্তিত্বে আল্লাহ তা'আলার সত্তার অনুপ্রবেশে বিশ্বাস করে। এটা তাওহীদের ধারণার নিশ্চিত পরিপন্থি; বরং রেওয়ায়েতের অর্থ হচ্ছে আত্মপ্রকাশ করা। উদাহরণঃ আয়নায় যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তা আয়নার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে না-তা থেকে আলাদা ও বাইরে থাকে। এই আত্মপ্রকাশকে 'তাজাল্লী' তথা জ্যোতিবিকীরণও বলা হয়। বলা বাহুল্য, এই তাজাল্লী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সত্তার তাজাল্লী ছিল না। নতুবা আল্লাহ তা'আলার সত্তা মূসা (আ.) অবলোকন করে থাকলে পরবর্তী সময়ে তাঁর এই আবেদনের কোনো অর্থ থাকে না যে, رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আপন সত্তা প্রদর্শন করুন, যাতে আমি দেখতে পারি। এর জওয়াবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে لَنْ تَرَانِي বলারও কোনো অর্থ থাকে না। এ থেকে বুঝা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাসের উপরিউক্ত উক্তিতে আল্লাহ তা'আলার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ অগ্নির আকারে জ্যোতিবিকীরণ বুঝানো হয়েছে। এটা যেমন অনুপ্রবেশ ছিল না, তেমনি সত্তার তাজাল্লীও ছিল না; বরং لَنْ تَرَانِي উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বস্তুজগতে আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করার শক্তি কারো নেই। এমতাবস্থায় এই আত্মপ্রকাশ ও তাজাল্লীর অর্থ কী হবে? এর জওয়াব এই যে, এটা 'মিছালী' তথা দৃষ্টান্তগত তাজাল্লী ছিল,

যা সূফী -বুযুর্গদের মধ্যে সুবিদিত। মানুষের পক্ষে এর স্বরূপ বুঝা কঠিন। প্রয়োজনমাফিক কিঞ্চিৎ বোধগম্য করার জন্য আমি আমার আরবী ভাষায় লিখিত 'আহকামুল-কুরআন' গ্রন্থে সূরা কাসাসে এর কিছু বিবরণ লিখেছি। উৎসাহী পাঠকগণ সেখানে দেখে নিতে পারেন। إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ -এর পূর্বের আয়াতে মূসা (আ.)-এর লাঠির মু'জিযা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, লাঠিকে সর্প হয়ে যেতে দেখে মূসা (আ.) নিজেও ভয়ে পালাতে থাকেন। এরপরও মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় মু'জিযা সুশুভ্র হাতের বর্ণনা আছে। মাঝখানে এই ব্যতিক্রম কেন উল্লেখ করা হলো এবং এটা اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ না مُتَّصِلٌ এ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ কেউ একে مُنْقَطِعٌ সাব্যস্ত করেছেন। তখন আয়াতের বিষয়বস্তু হবে এই যে, পূর্বের আয়াতে পয়গম্বরগণের মধ্যে ভয় না থাকার কথা বলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যাদের দ্বারা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, এরপর তওবা করে সৎকর্ম অবলম্বন করে : তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যদিও আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন; কিন্তু ক্ষমার পরেও গুনাহের কোনো কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। ফলে তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে اِسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ সাব্যস্ত করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহর রাসূল ভয় করেন না তাদের ব্যতীত, যাদের দ্বারা ত্রুটি-বিচ্যুতি অর্থাৎ সগিরা গুনাহ্ হয়ে যায়। এরপর তা থেকেও তওবা করে নেন। এই তওবার ফলে সগিরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। কারণ, পয়গাম্বরগণের যেসব পদস্খলন হয়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সগিরা বা কবিরা কোনো প্রকার গুনাহ্ নয়। তবে আকার আকৃতি থাকে গুনাহের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইজতিহাদী ভ্রান্তি। এই বিষয়বস্তুর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মূসা (আ.)-এর দ্বারা কিবতী হত্যার যে পদস্খলন ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তখনও বিদ্যমান ছিল এবং মূসা (আ.)-এর মধ্যে ভয়ভীতি সঞ্চারিত ছিল। এই পদস্খলন না ঘটলে সাময়িক ভয়ভীতিও হতো না। -(কুরতুবী)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا : বলা বাহুল্য, এখনে পয়গম্বরগণের নবুয়ত ও রিসালাত সম্পর্কিত জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবান্তর নয়; যেমন দাউদ (আ.)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গাম্বরগণের মধ্যে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদেরকে নবুয়ত ও রেসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্বও এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয়; বরং জিন ও জন্তু-জানোয়ারদের উপরও তাঁরা শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এসব মহান নেয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানরূপী নেয়ামত উল্লেখ করা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নেয়ামত অন্যান্য সব নেয়ামতের ঊর্ধ্বে। -(কুরতুবী)

পয়গাম্বরগণের মধ্যে অর্থসম্পদের উত্তরাধিকার হয় না : وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ : وَرِثَ বলে এখানে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার বুঝানো হয়েছে; আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ لَا نَرِثُ وَلَا نُوْرَثُ অর্থাৎ পয়গাম্বরগণ উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাঁদের উত্তরাধিকারীও হয় না। তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلٰكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ অর্থাৎ আলেমগণ পয়গাম্বরগণের উত্তরাধিকারী; কিন্তু পয়গাম্বরগণের মধ্যে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে; আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। সুতরাং যিনি কোনো নবীর উত্তরাধিকারী হন, তিনি একাই উক্ত নবীর উত্তরাধিকারের পূর্ণ অংশের অধিকারী হন। হযরত আবূ আব্দুল্লাহর রেওয়ায়েতে এই বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে দেয়। তা এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-এর উত্তরাধিকারী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সুলায়মান (আ.)-এর উত্তরাধিকারী। -(রূহুল মা'আনী)

যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝানো যেতে পারে না। কারণ, হযরত দাউদ (আ.)-এর ওফাতের সময় তাঁর উনিশজন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত সুলায়মান (আ.)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোনো অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বুঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার ছিল না; বরং একমাত্র সুলায়মান (আ.) -ই উত্তরাধিকারী হন। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর রাজত্বও হযরত সুলায়মান (আ.)-কে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তাঁর রাজত্ব জিন,

জন্তু-জানোয়ার ও বিহংগকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব প্রমাণের পর তাবারীর সেই রেওয়ায়েত ভ্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবারের কোনো কোনো ইমামের বরাত দিতে আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝাতে চেয়েছেন। -(রূহুল মা'আনী)

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ওফাত ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর জন্মের মাঝখানে এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদিরা এক হাজার চারশ' বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে থাকে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি ছিল। -(কুরতুবী)

অহংকারবশত না হলে নিজের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করা জায়েজ : عُلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا الخ: হযরত সুলায়মান (আ.) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহর আনুগত্যে ও সুলায়মান (আ.)-এর আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্নর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজেদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক বাকপদ্ধতি অনুযায়ী হয় এবং নিয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়; অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য না হয়।

বিহংগকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান : এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পশুপক্ষী ও সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরিয়তের নির্দেশাবলি পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণমাত্রায় বুদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পাখিদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইবনে আতিয়্যা বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। তার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যে কোনো বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, তা যেন অঙ্কুরিত না হয়। সে শীতকালের জন্য তার খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে। -(কুরতুবী)

জ্ঞাতব্য : আয়াতে হুদহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে مَنْطِقَ الطَّيْرِ তথা বিহংগকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। হুদহুদ পাখি জাতীয় প্রাণী। নতুবা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে সমস্ত পশুপক্ষী ও কীট-পতঙ্গের বুলি শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি বুঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে এ স্থলে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সুলায়মান (আ.) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোনো-না কোনো উপদেশ বাক্য।

وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : আভিধানিক দিক দিয়ে كُلٌّ শব্দের মধ্যে কোনো বস্তুর সমস্ত ব্যক্তিসত্তা শামিল থাকে। কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক ব্যাপকতা বুঝানো হয় না; বরং কোনো বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা বুঝানো হয়; যেমন এখানে সেই সব বস্তুর ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্য শাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ী ইত্যাদি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে ছিল না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُؤْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তারা প্রদান করে।

يُوْقِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْقَانٌ মূলবর্ণ (ى ـ ق ـ ن) জিনস مثال يائى অর্থ– তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ।

يَعْمَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ ও فَتَحَ মাসদার عَمْهٌ মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়।

اَلْأَخْسَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার خَسَارَةٌ ও خُسْرَانٌ মূলবর্ণ (خ ـ س ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

آنَسْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব افْعَالٌ মাসদার اِيْنَاسٌ মূলবর্ণ (أ - ن - س) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমি অবলোকন করেছি।

تَصْطَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اِصْطِلَاءٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা আগুন পোহাতে পার।

نُوْدِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার نِدَاءٌ মূলবর্ণ (ن - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাকে ডেকে বলা হলো।

تَهْتَزُّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِهْتِزَازٌ মূলবর্ণ (ه - ز - ز) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তা নড়াচড়া করছে।

لَمْ يُعَقِّبْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جهد بلم বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَعْقِيْبٌ মূলবর্ণ (ع - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ– তিনি পশ্চাদ দিকে ফিরেও দেখলেন না।

مُبْصِرَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبْصَارٌ মূলবর্ণ (ب - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– সুস্পষ্ট।

اِسْتَيْقَنَتْهَا : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِيْقَانٌ মূলবর্ণ (ى - ق - ن) জিনস مثال يائى অর্থ– তা (কাফেরদের অন্তর) সেগুলোকে বিশ্বাস করেছিল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ এখানে اَلَّذِيْنَ হলো পূর্বের لِلْمُؤْمِنِيْنَ-এর সিফাত (না'ত)। আবার এটাকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, এটা উহ্য মুবতাদা তথা هُمْ اَلَّذِيْنَ খবর আর يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ বাক্যটি اَلَّذِيْنَ-এর সেলাহ আর يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ বাক্যটি يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর وَهُمْ-এর واو টি حاليه অথবা واو টি আতফের জন্য আর هُمْ হলো মুবতাদা এবং يُوْقِنُوْنَ বাক্যটি তার খবর। بِالْاٰخِرَةِ টা يُوْقِنُوْنَ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর هُمْ হলো মুবতাদা যাকে মুবতাদা ও খবরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য আনা হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৪৭৭]

১৭. আর সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হয়েছিল তার সৈন্যবাহিনী জিন, মানব ও পক্ষীকুল এবং [চলবার সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ভয়ে] তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে।	وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. এমনকি, যখন তারা পিপীলিকাদের এক ময়দানে পৌছলেন, তখন একটি পিপীলিকা বলে উঠল, হে পিপীলিকাগণ! তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান ও তার সেনাদল অজ্ঞাতসারে তোমাদের নিষ্পেষিত করে না ফেলে।	حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. তখন সুলায়মান তার কথা শ্রবণ করে মৃদু হাসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এতে স্থায়িত্ব প্রদান করুন। আমি যেন আপনার সেই নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা আপনি আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে দান করেছেন, আর যেন নেক কাজ করতে থাকি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন এবং আমাকে আপনার অনুগ্রহে নিজ নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত রাখুন।	فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾
২০. আর সুলায়মান পাখিদের হাজিরা গ্রহণ করলেন, অতঃপর বললেন, ব্যাপার কী? হুদহুদ [কাঠঠোকরা পাখী]-কে দেখছি না কেন? নাকি সে কোথাও গায়েব হলো?	وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَاۤ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ এবং সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হয়েছিল جُنُوْدُهٗ তার সেন্যবাহিনী مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ জিন, মানব ও পক্ষীকুল فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে।

১৮. حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا এমনকি যখন তারা পৌছলেন عَلٰى وَادِ النَّمْلِ পিপীলিকাদের এক ময়দানে قَالَتْ نَمْلَةٌ তখন একটি পিপীলিকা বলে উঠল يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ হে পিপীলিকাগণ اُدْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ যেন সুলায়মান ও তার সেনাদল তোমাদেরকে নিষ্পেষিত করে না ফেলে وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অজ্ঞাতসারে।

১৯. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا তখন সুলায়মান মৃদু হাসলেন مِّنْ قَوْلِهَا তার কথা শ্রবণ করে وَقَالَ এবং বলতে লাগলেন رَبِّ হে আমার রব اَوْزِعْنِيْۤ আমাকে এতে স্থায়িত্ব প্রদান করুন اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ আমি যেন আপনার সেই নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ যা আপনি আমাকে দান করেছেন وَعَلٰى وَالِدَيَّ এবং আমার পিতামাতাকে وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا যেন নেক কাজ করতে থাকি تَرْضٰىهُ যাতে আপনি সন্তুষ্ট হোন وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ এবং আমাকে আপনার অনুগ্রহ অন্তর্ভুক্ত রাখুন فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ নিজ নেক বান্দাগণের।

২০. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ এবং সুলায়মান পাখিদের হাজিরা গ্রহণ করলেন فَقَالَ অতঃপর বললেন مَا لِيَ ব্যাপার কী لَاۤ اَرَى الْهُدْهُدَ হুদহুদকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ নাকি সে কোথাও গায়েব হলো?

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاْذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾

২১. আমি তাকে কঠোর শাস্তি দিব নতুবা তাকে জবাই করে ফেলব, না হয় সে আমার সমীপে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করবে।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾

২২. অনন্তর একটু পরেই সে আসল এবং [সুলায়মানকে] বলল, আমি এমন বিষয় অবগত হয়ে এসেছি, যা আপনি অবগত হন নি এবং আমি আপনার নিকট 'সাবা' সম্প্রদায়ের এক সুনিশ্চিত সংবাদ আনয়ন করেছি।

اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾

২৩. আমি একজন স্ত্রীলোককে দেখেছি, সে তাদের উপর রাজত্ব করছে এবং প্রত্যেক প্রকারের সরঞ্জামই তার আয়ত্তাধীনে রয়েছে এবং তার নিকট একটি বিরাট সিংহাসন রয়েছে।

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. আমি তাকে ও তার কওমকে দেখলাম যে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যের সেজদা করে এবং শয়তান তাদের কার্যগুলোকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে রেখেছে এবং তাদেরকে [সৎ] পথ হতে বিরত রেখেছে, অতএব, তারা সত্য পথে চলে না।

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. অর্থাৎ সে আল্লাহকে সেজদা করে না, যিনি আসমান ও জমিনের সমস্ত অদৃশ্য বস্তুকে বাইরে আনেন এবং তোমরা যা কিছু গোপন রাখ এবং যা কিছু প্রকাশ কর, তিনি সবই জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا আমি তাকে কঠোর শাস্তি দিব اَوْ لَاَاْذْبَحَنَّهٗٓ নতুবা তাকে জবাই করে ফেলব اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ না হয় সে আমার সমীপে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করবে।

২২. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ অনন্তর একটু পরেই সে আসল فَقَالَ এবং বলল اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ আমি এমন বিষয় অবগত হয়ে এসেছি যা আপনি অবগত হননি وَجِئْتُكَ এবং আমি আপনার নিকট আনয়ন করেছি مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ সাবা সম্প্রদায়ের এক সুনিশ্চিত সংবাদ।

২৩. اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً আমি একজন স্ত্রীলোককে দেখেছি تَمْلِكُهُمْ সে তাদের উপর রাজত্ব করছে وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ এবং প্রত্যেক প্রকার সরঞ্জামই তার আয়ত্তাধীনে রয়েছে وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ এবং তার নিকট একটি বিরাট সিংহাসন রয়েছে।

২৪. وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا আমি তাকে এবং তার কওমকে দেখলাম যে, يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ তারা সূর্যকে সেজদা করে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ এবং শয়তান তাদের দৃষ্টিতেও শোভনীয় করে রেখেছে اَعْمَالَهُمْ তাদের কার্যগুলোকে فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ এবং তাদেরকে (সৎ) পথ হতে বিরত রেখেছে فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ অতএব তারা (সত্য) পথে চলে না।

২৫. اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ অর্থাৎ, সে আল্লাহকে সেজদা করে না الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ যিনি সমস্ত অদৃশ্য বস্তুকে বের করে আনেন فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের وَيَعْلَمُ এবং তিনি সবই জানেন مَا تُخْفُوْنَ তোমরা যা কিছু গোপন রাখ وَمَا تُعْلِنُوْنَ এবং যা কিছু প্রকাশ কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

رَبِّ اَوْزِعْنِیْ : اَوْزَاعْ শব্দটি وَزَعْ থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ– বিরত রাখা। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি। তা থেকে কোনো সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগে আয়াতে فَهُمْ يُوزَعُونَ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, বাহিনীকে প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ : এখানে রেজার অর্থ– কবুল। অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে এমন সৎকর্মের তাওফীক দিন, যা আপনার কাছে মকবুল হয়। রূহুল মা'আনীতে এর মাধ্যমে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, সৎকর্ম মকবুল হওয়াই জরুরি নয়; বরং এটা কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গাম্বরগণ তাঁদের সৎকর্মসমূহ মকবুল হওয়ার জন্য দোয়া করতেন; যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) কাবাগৃহ নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন– رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ; এতে বোঝা গেল যে, কোনো সৎকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং তা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করাও বাঞ্ছনীয়।

সৎকর্ম মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না : وَاَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ : সৎকর্ম সম্পাদন এবং তা মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার কৃপা দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোনো ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জান্নাতে যাবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও। কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহর অনুগ্রহ বেষ্টন করে আছে। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত সুলায়মান (আ.)–ও এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্যে আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করেছেন অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে সেই পাওনা দান কর, যা দ্বারা জান্নাতের উপযুক্ত হই।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ : تَفَقَّدَ –এর শাব্দিক অর্থ– কোনো জনসমাবেশে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির খবর নেওয়া। তাই এর অনুবাদে খোঁজ নেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়েছে। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা মানব, জিন, জন্তু ও পশু-পক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। রাজ্যশাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করাও খোঁজ-খবর নেওয়া শাসনকর্তার অন্যতম কতর্ব্য। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে– وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ অর্থাৎ, হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর পক্ষী প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন যে তাদের মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরও এই সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্যে তাশরিফ নিয়ে যেতেন, সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং কেউ কোনো কষ্টে থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন।

শাসকের জন্য জনসাধারণের এবং পীর-মুর্শিদের জন্য শিষ্য ও মুরিদদের খোঁজ-খবর নেওয়া জরুরি: আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) সর্বস্তরের প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমন কি, যে হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য পাখির তুলনায় কম, সেই হুদহুদও তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি; বরং বিশেষভাবে হুদহুদ সম্পর্কে তার প্রশ্ন করার এক কারণ এটাও হতে পারে যে, হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে কম সংখ্যক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্নবান হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর ফারুক (রা.) তার খেলাফতের আমলে পয়গাম্বরগণের এই সুন্নতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে -গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তার জীবনীতে উল্লিখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোনো ব্যাঘ্র কোনো ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যও ওমরকে প্রশ্ন করা হবে। -(কুরতুবী)

এ হচ্ছে রাজ্যশাসনও প্রজাপালনের রীতি-নীতি, যা পয়গাম্বরগণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং যার ফলে মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণির জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। তাঁদের তিরোধানের পর পৃথিবী এমন সুবিচার, ইনসাফ, সাধারণ বিশ্বের শান্তি, সুখ ও নিশ্চয়তার সে দৃশ্য আর দেখেনি।

مَا لِىَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ –সুলায়মান (আ.) বললেন, আমার কী হলো যে, আমি হুদহুদকে সমাবেশে দেখতে পাচ্ছি না? ।

আত্মসমালোচনা : এখানে স্থান ছিল এ কথা বলার–"হুদহুদের কী হলো যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই' বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবত: এই যে, হুদহুদ ও অন্যান্য পক্ষীকুলের অধীনস্থ হওয়া আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হুদহুদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মনে এই আশঙ্কা দেখা দিল যে, সম্ভবত: আমার কোনো ত্রুটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণির পাখি অর্থাৎ, হুদহুদ গায়েব হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হলো? সূফী-বুযুর্গদেরও অভ্যাস তাই। তাঁরা যখন কোনো নিয়ামত হ্রাস পেতে দেখেন অথবা কোনো কষ্ট ও উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনের জন্য বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ দানের পূর্বে আত্ম-সমালোচনা করেন যে, আমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কি কোনো ত্রুটি হলো, যদ্দরুন এই নিয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছে? ইমাম কুরতুবী (র.) ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে এ স্থলে বুযুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে– إِذَا فَقَدُوْا أَمَالَهُمْ تَفَقَّدُوْا أَعْمَالَهُمْ অর্থাৎ, তাঁরা যখন উদ্দেশ্যে সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবলির খবর নেন যে, তাদের দ্বারা কী ত্রুটি হয়ে গেছে?

এই প্রাথমিক আত্মসমালোচনা চিন্তা-ভাবনার পর হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন– أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ ; এখানে أَمْ শব্দটি بَلْ -এর সমার্থবোধক। –[কুরতুবী] অর্থাৎ, হুদহুদকে দেখার ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ভুল করেনি, বরং সে উপস্থিতই নয়।

পক্ষীকুলের মধ্যে হুদহুদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, এতসব পক্ষীর মধ্যে শুধু হুদহুদকে খোঁজার কী কারণ ছিল? তিনি বললেন, হযরত সুলায়মান (আ.) তখন এমন জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভের প্রবাহিত ঝরনাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। হুদহুদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্রগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত। হুদহুদ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– قِفْ يَا وَقَّافُ كَيْفَ يَرَى الْهُدْهُدُ بَاطِنَ الْأَرْضِ وَهُوَ لَا يَرَى الْفَخَّ حِيْنَ يَقَعُ فِيْهِ জ্ঞানীগণ! এই সত্য জেনে নাও যে, হুদহুদ পাখি মাটির গভীরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে, কিন্তু মাটির উপর বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না, যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কারও জন্য যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তবস্বরূপ লাভ করা অবশ্যম্ভাবী। কোনো ব্যক্তি জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারে না।

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ : প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর এটা হচ্ছে শাসকসুলভ নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শাস্তি দিতে হবে।

যে জন্তু কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শাস্তি দেওয়া জায়েজ : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা জন্তুদেরকে এরূপ শাস্তি দেওয়া হালাল করে দিয়েছিলেন, যেমন সাধারণ উম্মতের জন্য জন্তুদেরকে জবাই করে তাদের গোশ্ত, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া এখনও হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্তু তথা গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজন মাফিক প্রহারের সুষম শাস্তি দেওয়া এখনও জায়েজ। অন্যান্য জন্তুকে শাস্তি দেওয়া আমাদের শরিয়তে নিষিদ্ধ। –(কুরতুবী)

أَوْلَيَأْتِيَنِّىْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ : অর্থাৎ, হুদহুদ যদি তার অনুপস্থিতির কোনো উপযুক্ত অজুহাত পেশ করে, তবে সে এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত ওজর পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ : অর্থাৎ, হুদহুদ তার ওজর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ, আমি এখন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না।

পয়গাম্বরগণ 'আলেমুল গায়েব' ছিলেন না : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পয়গাম্বরগণ আলিমুল গায়েব নন যে, সবকিছুই তাঁদের জানা থাকবে।

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِيْنٍ : 'সাবা' ইয়েমেনের একটি প্রসিদ্ধ শহর, যার অপর নাম মাআরিবও। সাবা ও ইয়েমেনের রাজধানী সান্‌আর মধ্যে তিনদিনের দূরত্ব ছিল।

ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চেয়ে বেশি? : হুদহুদের উপরিউক্ত কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, কোনো শাগরেদ তার ওস্তাদকে এবং আলেম নয় এমন কোনো ব্যক্তি আলেমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার চাইতে আমার বেশি, যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, পীর, মুরুব্বিদের সামনে এ ধরনের কথাবার্তা শিষ্টাচার-বিরোধী। কাজেই বর্জনীয়। হুদহুদের উক্তিকে প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না। কারণ সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং ওজরকে জোরদার করার জন্য এ কথা বলেছে। এহেন প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোনো কথা বললে তাতে দোষ নেই।

إِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ : অর্থ আমি এক নারীকে পেয়েছি, সে সাবা সম্প্রদায়ের রাণী। অর্থাৎ, তাদের উপর রাজত্ব করে। সাবার এই সম্রাজ্ঞীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান। -[কুরতুবী] তার পিতামহ হুদাহুদ ছিল সমগ্র ইয়ামেনের একচ্ছত্র সম্রাট। তার চল্লিশটি পুত্রসন্তান ছিল। সবাই সম্রাট হয়েছিল। বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভে বিলকীসের জন্ম হয়। জিন নারীকে বিবহ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, সে সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুলে-কৌলীন্যে আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তার বিবাহ ঘটিয়ে দেয়। -(কুরতুবী) প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার সমান স্বীকার করেনি। সম্ভবত: এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ তার বিবাহ এমন নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও ছিল না।

জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি? এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তাঁরা জিন জাতিকে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য মনে করে না। ইবনে আরাবী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে বলেন, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানবজাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্যে হালাল কিনা? এতে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েজ বলেছেন। কেউ কেউ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ "আ-কামুল মারজান ফী আহকামিল জান" কিতাবে উল্লিখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না, তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। তার কর্ম দ্বারা এই বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরিয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানবনন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে যে, তা দ্বারা জিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ বিলকীস নিজে জিন ছিল না। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বিবাহ সম্পর্কে আরও বর্ণনা পরে আসছে।

নারীর জন্যে বাদশাহ্ হওয়া অথবা কোনো সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েজ কিনা? সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন- لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً অর্থাৎ, যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোনো নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খেলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না; বরং নামাজের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ, শাসন কর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত। বিলকীসের সম্রাজ্ঞী হওয়া দ্বারা ইসলামি শরিয়তের কোনো বিধান প্রমাণিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন। বলাবাহুল্য যে, একথা কোনো সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : অর্থাৎ কোনো সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্য যেসব সাজসরঞ্জাম দরকার, তার সবই বিদ্যমান ছিল; সেই যুগে যেসব বস্তু অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থি নয়।

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ : আরশের শাব্দিক অর্থ- রাজসিংহাসন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল এবং মোতি, ইয়াকুত ও মণিমাণিক্য দ্বারা কারুকার্য খচিত ছিল। তার পায়া ছিল মোতি ও জওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের। একের পর একটি সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরের অভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল।

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ : এতে জানা গেল যে, বিলকীসের সম্প্রদায় নক্ষত্রপূজারী ছিল। তারা সূর্যের ইবাদত করত। কেউ কেউ বলেন, অগ্নিপূজারী ছিল। -[কুরতুবী]

أَلَّا يَسْجُدُوا : এর সম্পর্ক وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ অথবা فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ -এর সাথে। অর্থাৎ আল্লাহকে সেজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্য পথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, তারা আল্লাহকে সেজদা করবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

- حُشِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার حَشْرٌ মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ- তাকে সমবেত করা হয়েছিল।
- يُوزَعُونَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার وَزْعٌ মূলবর্ণ (و - ز - ع) জিনস مثال واوى অর্থ- তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে।
- لَا يَحْطِمَنَّكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى معروف بانون ثقيلة বাব ضَرَبَ মাসদার حَطْمٌ মূলবর্ণ (ح - ط - م) জিনস صحيح ; كم যমীরে جمع مذكر حاضر মাফঊল অর্থ- যেন সে তোমাদেরকে নিষ্পেষিত করে না ফেলে।
- فَتَبَسَّمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَسُّمٌ মূলবর্ণ (ب - س - م) জিনস صحيح অর্থ- (তখন সুলায়মান) হেসে ফেললেন।
- أَوْزِعْنِي : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِيزَاعٌ মূলবর্ণ (و - ز - ع) জিনস مثال واوى : نى -এর نون وقاية টি نون আর ياء متكلم টি মাফঊলে বিহী অর্থ- আমাকে সুযোগ প্রদান করুন।
- تَرْضَاهُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার رِضَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ض - ى) জিনস ناقص يائى ه : যমীরে واحد مذكر غائب মাফঊল অর্থ- যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।
- لَا أَرَى : সীগাহ واحد متكلم বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ- আমি দেখছি না।
- لَأَذْبَحَنَّهُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مستقبل برفعل لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব فَتَحَ মাসদার ذَبْحٌ মূলবর্ণ (ذ - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ- আমি (তাকে) জবাই করে ফেলব।
- أَحَطْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِحَاطَةٌ মূলবর্ণ (ح - و - ط) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি অবগত হয়ে এসেছি।
- أُوتِيَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِيتَاءٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ- তার আয়ত্তাধীন রয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ : এখানে لَأُعَذِّبَنَّ ফে'ল ফায়েল ও মাফঊলে বিহী, عَذَابًا হলো মাফঊলে মুতলাক আর شَدِيدًا হলো সিফাত لَأَذْبَحَنَّهُ হলো لَأُعَذِّبَنَّهُ -এর উপর আতফ, أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ বাক্যটিও لَأُعَذِّبَنَّهُ -এর উপর আতফ হয়েছে আর لَيَأْتِيَنِّي টা بِسُلْطَانٍ -এর সাথে মুতাআল্লিক হয়েছে, আর مُبِينٍ হলো سُلْطَانٍ -এর সিফাত। -[ই'রাবুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৫০০]

২৬. আল্লাহই এমন যিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই, তিনি মহা আরশের মালিক।	اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾
২৭. সুলায়মান বললেন, আমি এখনই দেখছি, তুমি সত্য বলছ, নাকি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত?	قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং তা তাদের সম্মুখে নিক্ষেপ কর, অতঃপর সরে থাক এবং দেখ, তাদের পরস্পরে কী প্রতিক্রিয়া হয়?	اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. [পত্র পেয়ে] বিলকীস বলল, হে সভাসদবৃন্দ! আমার নিকট একখানা সম্মানিত পত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছে।	قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾
৩০. তা সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তাতে লিখিত আছে– বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।	اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾
৩১. তোমরা আমার মোকাবিলায় অহংকার করো না এবং আমার নিকট অনুগত হয়ে চলে এসো।	اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. বিলকীস বলল, হে পরিষদবৃন্দ! তোমরা এই ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও, আমি কোনো বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার সম্মুখে উপস্থিত না হও।	قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আল্লাহ এমন যিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ তিনি মহা আরশের মালিক।

২৭. قَالَ সুলায়মান বললেন سَنَنْظُرُ আমি এখনই দেখছি اَصَدَقْتَ তুমি সত্য বলছ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ নাকি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত?

২৮. اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا আমার এই পত্র নিয়ে যাও فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ এবং তা তাদের সম্মুখে নিক্ষেপ কর ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ অতঃপর সরে থাক فَانْظُرْ এবং দেখ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ তাদের পরস্পরে কী প্রতিক্রিয়া হয়?

২৯. قَالَتْ বিলকীস বলল يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا হে সভাসদবৃন্দ! اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ আমার নিকট নিক্ষিপ্ত হয়েছে كِتٰبٌ كَرِيْمٌ একখানা সম্মানিত পত্র।

৩০. اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ তা সুলায়মানের পক্ষ থেকে وَاِنَّهٗ এবং তাতে লিখিত আছে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

৩১. اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ তোমার আমার মোকাবিলায় অহংকার করো না وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ এবং আমার নিকট অনুগত হয়ে চলে এসো।

৩২. قَالَتْ বিলকীস বলল يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا হে পরিষদবৃন্দ! اَفْتُوْنِيْ তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও فِيْٓ اَمْرِيْ এই ব্যাপারে مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا আমি কোনো বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ যতক্ষণ না তোমরা আমার সম্মুখে উপস্থিত হও।

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. তারা বলল, আমরা খুব শক্তিশালী এবং যুদ্ধে পারদর্শী [যদি যুদ্ধ করা সঙ্গত মনে করেন] আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব, আপনিই স্থির করুন, যা কিছু আদেশ করতে হয়।

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. বিলকীস বলল, রাজ্যাধিপতিগণ যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং তার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদেরকে অবনমিত করে দেয়, এবং তারাও এরূপই করবে।

وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর আমি তাদের সমীপে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, অতঃপর দেখব, প্রেরিত লোকেরা কী [উত্তর] নিয়ে আসে।

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. অনন্তর যখন সুলায়মানের দরবারে দূত পৌছল, তখন সুলায়মান বললেন, তোমরা কি আমাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করতে চাচ্ছ? পরন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা দান করেছেন, তা সেই বস্তু অপেক্ষা বহু উৎকৃষ্ট যা তোমাদেরকে দান করেছেন। হ্যাঁ, তোমরাই তোমাদের এই উপঢৌকনে উৎফুল্লবোধ করতে থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. قَالُوْا তারা বলল نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ আমরা খুব শক্তিশালী وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ এবং যুদ্ধে পারদর্শী وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনার فَانْظُرِيْ আপনিই স্থির করুন مَاذَا تَاْمُرِيْنَ যা কিছু আদেশ করতে হয়।

৩৪. قَالَتْ বিলকীস বলল اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً রাজ্যাধিপতিগণ যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করেন اَفْسَدُوْهَا তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً এবং তার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদেরকে অবনমিত করে দেয় وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ এবং তারাও এরূপই করবে।

৩৫. وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ আর আমি তাদের সমীপে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি فَنٰظِرَةٌ অতঃপর দেখব بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ প্রেরিত লোকেরা কী নিয়ে আসে।

৩৬. فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ অনন্তর যখন সুলায়মানের দরবারে দূত পৌছল قَالَ তখন সুলায়মান বললেন اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ তোমরা কি আমাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করতে চাচ্ছ ? فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ পরন্তু আল্লাহ আমাকে যা দান করেছেন خَيْرٌ তা সেই বস্তু অপেক্ষা বহু উৎকৃষ্ট مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ যা তোমাদেরকে দান করেছেন بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ হ্যাঁ, তোমরাই তোমাদের এই উপঢৌকনে উৎফুল্লবোধ করতে থাকবে।

৩৭. তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও, অনন্তর আমি তাদের প্রতি এমন এক সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছি, যাদের সাথে তারা একটুও মোকাবিলা করতে পারবে না এবং আমি তাদেরকে তথা হতে অপদস্থ করে বহিষ্কার করে দিব, আর তারা অধীনস্থ হয়ে যাবে।	ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾
৩৮. [বিলকীস অনুগত হয়ে সুলায়মানের নিকট যাত্রা করার পর] সুলায়মান বললেন, হে সভাসদবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তার অনুগত হয়ে আসার পূর্বেই তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসে?	قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾
৩৯. এক শক্তিশালী জিন বলল, আমি তা আপনার সম্মুখে পেশ করব আপনি আসন ত্যাগ করার পূর্বেই এবং আমি তাতে [তা আনতে] ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।	قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. ارْجِعْ إِلَيْهِمْ তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ অনন্তর আমি তাদের প্রতি এমন এক সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছি لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا যার সাথে তারা একটুও মোকাবিলা করতে পারবে না وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً এবং আমি তাদেরকে তথা হতে অপদস্থ করে বহিষ্কার করে দিব وَهُمْ صَاغِرُونَ আর তারা অধীনস্থ হয়ে যাবে।

৩৮. قَالَ সুলায়মান বললেন। يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ হে সভাসদবৃন্দ! أَيُّكُمْ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসে قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ তারা অনুগত হয়ে আসার পূর্বেই।

৩৯. قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ এক মহা শক্তিশালী জিন বলল أَنَا آتِيكَ بِهِ আমি তা আপনার সম্মুখে পেশ করব قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ আপনি আসন ত্যাগ করার পূর্বেই وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ এবং আমি তাতে ক্ষমতাবান বিশ্বস্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজ-কারবারে শরিয়তসম্মত দলিল : اذْهَبْ بِكِتَابِي هَٰذَا : হযরত সুলায়মান (আ.) সাবার সম্রাজ্ঞীর কাছে পত্র প্রেরণকে তাঁর সাথে দলিল সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। এতে বোঝা গেল, সাধারণ কাজ কারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য প্রমাণ। যেক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত সাক্ষ্যপ্রমাণ জরুরি, ফিকাহ্‌বিদগণ সেই ক্ষেত্রে পত্রকে যথেষ্ট মনে করেননি। কেননা পত্র, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে, এর উপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোনো আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না।

মুশরিকদের কাছে পত্র লিখে পাঠানো জায়েজ : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র দ্বারা দ্বিতীয় মাস'আলা এই প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম প্রচার ও দাওয়াতের জন্য মুশরিক ও কাফেরদের কাছে পত্র লেখা জায়েজ। সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কাফেরদের কাছে পত্র লেখা প্রামাণিত আছে।

কাফেরদের মজলিস হলেও সব মজলিসে মানবিক চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত : فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ : হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদকে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়ে মজলিসের এই শিষ্টাচারের শিক্ষা দিলেন যে, সম্রাজ্ঞীর হাতে পত্র অর্পণ করে মাথার উপর সওয়ার হয়ে থাকবে না ; বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় মজলিসের নিয়ম এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য।

قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ : كَرِيمٌ -এর শাব্দিক অর্থ– সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোনো পত্রকে তখনই সম্ভ্রান্ত বলা হয়, যখন তা মোহরাঙ্কিত হয়। এ কারণেই এই আয়াতে كِتَابٌ كَرِيمٌ -এর তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদা, যুহায়র প্রমুখ كِتَابٌ مَخْتُومٌ অর্থাৎ, "মোহরাঙ্কিত পত্র" দ্বারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত সুলায়মান (আ.) পত্রের উপর তাঁর মোহর অঙ্কিত করেছিলেন। আমাদের রাসূল ﷺ যখন অনারব বাদশাহদের অভ্যাস জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, তখন তিনিও বাদশাহদের পত্রের জন্যে মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সার ও কিসরার পত্রে মোহর অঙ্কিত করে দেন। এতে বোঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর অঙ্কিত করা প্রাপক ও স্বীয় পত্র উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামান্তর। আজকাল ইনভেলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল্প। প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্য হলে খোলা চিঠি প্রেরণ করার পরিবর্তে ইনভেলাপে পুরে প্রেরণ করা সুন্নতের নিকটবর্তী।

সুলায়মান (আ.)-এর পত্র কোন ভাষায় ছিল : হযরত সুলায়মান (আ.) আরবি ছিলেন না; কিন্তু আরবি ভাষা জানা ও বুঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি পক্ষীকুলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, সে ক্ষেত্রে আরবি ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা মোটেও অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভব যে, হযরত সুলায়মান (আ.) আরবি ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ প্রাপক (বিলকীস) আরব বংশোদ্ভুত ছিল। সে পত্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, হযরত সুলায়মান (আ.) তার মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং বিলকীস দুভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। –(রূহুল মা'আনী)

পত্র লেখার কতিপয় আদব : إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ - কুরআন পাক মানব জীবনের কোনো দিক সম্পর্কে দিকনির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয়। এ স্থলে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকীসের নামে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গাম্বরের চিঠি। কুরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত করেছে। তাই এই পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যও অনুসরণীয়।

প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এরপর প্রাপকের : এই পত্রে সর্বপ্রথম দিক নির্দেশ এই যে, পত্রটি হযরত সুলায়মান (আ.) নিজের নাম দ্বারা শুরু করেছেন। প্রাপকের নাম কিভাবে লিখেছেন, কুরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণত ঃ পত্র পাঠ করার পূর্বে প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কে এরূপ খোঁজাখুজি করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণিত ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। তিনি مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ এ কথার মাধ্যমে পত্র শুরু করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোনো বড়জন ছোটকে পত্র লিখে, তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু ছোটজন যদি তার পিতা, ওস্তাদ, পীর অথবা কোনো মুরুব্বীর কাছে পত্র লিখে তখন নাম অগ্রে থাকা আদবের খেলাফ হবে কিনা? তার এরূপ করা উচিত কিনা? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা বিভিন্নরূপ। অধিংকাশ সাহাবী সুন্নতের অনুসরণকে আদবের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতে নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। রূহুল মা'আনীতে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস ﷺ-এর নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে–

مَا كَانَ اَحَدٌ اَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اَصْحَابُهُ اِذَا كَتَبُوْا اِلَيْهِ كِتَابًا بَدَأُوْا بِاَنْفُسِهِمْ قُلْتُ وَكِتَابُ عَلَاءِ الْحَضْرَمِىْ يَشْهَدُ لَهُ عَلٰى مَا رُوِىَ-

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেয়ে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিল না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে আলায়ে হাযরামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।"

তবে রূহুল মা'আনীতে উপরিউক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই আলোচনা উত্তম অনুত্তম সম্পর্কে; বৈধতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে লিখে দেয়, তবে তাও জায়েজ। ফকীহ আবুল লাইস 'বুস্তান' গ্রন্থে লিখেন, যদি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে, এর তবে বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নির্দ্বিধায় প্রচলিত আছে।

পত্রের জবাব দেওয়াও পয়গাম্বরগণের সুন্নত : তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, কারও পত্র হস্তগত হলে তার জবাব দেওয়া সমীচীন। কেননা অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জবাবকে সালামের জবাবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন। -[কুরতুবী]

চিঠিপত্রে বিসমিল্লাহ্ লেখা : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লিখিত সব পত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। এখন বিসমিল্লাহকে লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখবে নাকি পরে? এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্রাবলি সাক্ষ্য দেয় যে, বিসমিল্লাহ্ সর্বাগ্রে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখবে। কুরআন পাকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম পূর্বে ও বিসমিল্লাহর পরে লিখিত আছে। বাহ্যত এ থেকে বিসমিল্লাহ্ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম (র.) ইয়াযীদ ইবনে রুমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আ.) প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছিলেন :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ دَاوٗدَ اِلٰى بِلْقِيْسَ اِبْنَةِ ذِىْ شَرْحٍ وَقَوْمِهَا -اَنْ لَّا تَعْلُوْا الخ-

বিলকীস তার সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। আর কুরআন পাকে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। সুলায়মান (আ.)-এর আসল পত্রে বিসমিল্লাহ আগে ছিল, নাকি পরে, কুরআনে ঐ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভিতরে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু হয়েছিল। পত্র শোনোনোর সময় বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে।

মাস'আলা ঃ প্রত্যেক পত্রের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ লেখাই পত্র-লিখনের আসল সুন্নত। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা ও ইঙ্গিত থেকে ফিকহ্‌বিদগণ এই সামগ্রিক নীতি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যে স্থানে বিসমিল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাম লিখিত কাগজকে বেয়াদবি থেকে রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা নেই, বরং পাঠান্তে যত্রতত্র ফেলে রাখা হয়, সেখানকার পত্রে বিস্‌মিল্লাহ অথবা আল্লাহ তা'আলার কোনো নাম লেখা জায়েজ নয়। লিখলে লেখক বেআদবীর গুনাহে শরীক হয়ে যাবে। আজকাল মানুষ একে অপরকে যেসব চিঠিপত্র লিখে, সেগুলোকে সাধারণত আবর্জনায় ও নর্দমায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাই সুন্নত আদায় করণার্থে মুখে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে নেওয়া এবং কাগজে লিপিবদ্ধ না করা সমীচীন।

কুরআনের আয়াত সম্বলিত লেখা কোনো কাফের ও মুশরিকের হাতে দেওয়া জায়েজ কিনা?

উপরিউক্ত পত্র হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসের কাছে তখন প্রেরণ করেন, যখন সে মুসলমান ছিল না। অথচ পত্রে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লিখিত ছিল। এতে বুঝা গেল, এরূপ করা জায়েজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব অনারব বাদশাহর নামে চিঠিপত্র লিখেছেন, তারা মুশরিক ছিল। তাঁর পত্রে কুরআনের কোনো কোনো আয়াত লিখিত থাকত। এর কারণ এই যে, কুরআন পাক কোনো কাফেরের হাতে দেওয়া জায়েজ নয়; কিন্তু যে গ্রন্থে অথবা কাগজে অন্য বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে কোনো আয়াত লিখিত হয়, সাধারণ পরিভাষায় তাকে কুরআন বলা হয় না। কাজেই এর বিধানও কুরআনের অনুরূপ হবে না। এরূপ গ্রন্থ কাফেরের হাতেও দেওয়া যায় এবং অজু ছাড়াও স্পর্শ করা যায়। -(আলমগীরি)

পত্র সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ, অলংকারপূর্ণ এবং মর্মস্পর্শী হওয়া উচিত : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর এই পত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েক লাইনের মধ্যে সব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে এবং অলংকারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ মাপকাঠিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাফেরের মুকাবিলায় নিজের রাজকীয় শান-শওকতও প্রকাশ পেয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার পূর্ণত্ববোধক গুণাবলি ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতও রয়েছে। সাথে সাথে অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার নিন্দাও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রও কুরআনী অলৌকিকতার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, পত্র লিখনে সব পয়গাম্বরের সুন্নতও এই যে, লেখা দীর্ঘ না হওয়া চাই এবং কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিত্যক্ত না হওয়া চাই। –(রূহুল মা'আনী)

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করা সুন্নত। এতে অপরের অভিমত দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং অপরের মনোরঞ্জনও হয় :

قَالَتْ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُ اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ : اَفْتُوْنِيْ শব্দটি فتونى থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– কোনো বিশেষ প্রশ্নের জবাব দেওয়া। এখানে পরামর্শ দেওয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বুঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন সুলায়মান (আ.)-এর পত্র পৌঁছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্র করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কী করা উচিত? সে তাদের অভিমত জিজ্ঞেস করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এ কথাও বলল, "আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।" এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জবাবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্যে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَأْسٍ شَدِيْدٍ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ ; হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিলকীসের পরামর্শ-সভার সদস্য তিনশ' তের জন ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা ও প্রতিনিধি ছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি সুপ্রাচীন। ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ওহী আগমন করত এবং তিনি আল্লাহর নির্দেশ লাভ করতেন। এ কারণে কোনো পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল না; কিন্তু উম্মতের জন্যে সুন্নত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তাঁকেও আদেশ করা হয়েছে– وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ; অর্থাৎ আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করুন এতে একদিকে যেমন সাহাবায়ে কেরামের সন্তুষ্টি বিধান করা হয়। অপরদিকে ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারীদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করার তাগিদও হয়ে যায়।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্রের জবাবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়া : রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গকে পরামর্শে শরীক করে তাদের সহযোগিতা অর্জন করার পর সম্রাজ্ঞী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল : হযরত সুলামায়নের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গাম্বর কিনা? তিনি কি সত্যিই আল্লাহর আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, নাকি তিনি একজন আধিপত্যবাদী সম্রাট? এই পরীক্ষা দ্বারা বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গাম্বর হলে তাঁর আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মোকাবেলা কিভাবে করা হবে? সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এরূপ স্থির করল যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপঢৌকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গাম্বর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোনো কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তু ইবনে জারীর (র.) একাধিক সনদে হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। একথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– اِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ; অর্থাৎ আমি সুলায়মান ও তাঁর সভাসদদের কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। এরপর দেখব, যেসব দূত উপঢৌকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কী পরিস্থিতি বর্ণনা করে?

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের দূতদের উপস্থিতি ঃ ঐতিহাসিক ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে বিলকীসের দূত ও উপঢৌকনের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। যে বিষয়টুকু সব রেওয়ায়েতেই পাওয়া যায়, তা এই যে, উপঢৌকনে কিছু স্বর্ণের ইট, কিছু মণিমানিক্য, একশ' ক্রীতদাস এবং একশ বাঁদি ছিল। কিন্তু বাঁদিদেরকে পুরুষের পোশাক এবং ক্রীতদাসদেরকে মেয়েলী পোশাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সাথে বিলকীসের একটি পত্রও ছিল, যাতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন লিখিত ছিল। উপঢৌকন নির্বাচনেও তাঁর পরীক্ষা কাম্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা দূতদের পৌঁছার পূর্বেই উপঢৌকনসমূহের পূর্ণ বিবরণ বলে দিয়েছিলেন। হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদেরকে আদেশ করলেন, দরবার থেকে নয় ফরসখ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সোনা-রূপার ইট দ্বারা বিছানা করে দাও। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বে অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট জন্তুদেরকে দাঁড় করিয়ে দাও। তাদের প্রস্রাব পায়খানাও যেন সোনা-রূপার বিছানার উপর হয়। এমনিভাবে তিনি নিজ দরবারকেও বিশেষ যত্ন সহকারে সুসজ্জিত করলেন। ডানে বামে চার হাজার করে স্বর্ণের চেয়ার স্থাপন করা হলো। একদিকে পণ্ডিতদের জন্য এবং অপরদিকে মন্ত্রীবর্গ ও রাজকর্মচারীদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হলো। মণিমানিক্য দ্বারা সম্পূর্ণ হল সুশোভিত করা হলো। বিলকীসের দূতরা যখন স্বর্ণের ইটের উপর জন্তুদেরকে দণ্ডায়মান দেখল, তখন তারা নিজেদের উপঢৌকনের কথা চিন্তা করে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তারা তাদের স্বর্ণের ইট সেখানেই ফেলে দিল। অতঃপর তারা যতই সামনে অগ্রসর হতে লাগল দুই দিকে জীবজন্তু ও বিহংগকুলের কাতার দেখতে পল। এরপর জিনদের কাতার দেখে তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন তারা দরবারে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সামনে হাজির হলো, তখন তিনি হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু তাদের উপঢৌকন ফেরত দিলেন এবং বিলকীসের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। -(কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত)

হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসের উপঢৌকণ গ্রহণ করলেন না : قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰنِىَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ অর্থাৎ, যখন বিলকীসের দূত উপঢৌকন নিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি দূতদেরকে বললেন, তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও?
আমাকে আল্লাহ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, তা তোমাদের অর্থ -সম্পদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই আমি উপঢৌকন গ্রহণ করব না। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও; তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরা সুখি থাক।

কোনো কাফেররের উপঢৌকন গ্রহণ জায়েজ কিনা? হযরত সুলায়মান (আ.) সম্রাজ্ঞী বিলকীসের উপঢৌকন কবুল করেননি। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরের উপঢৌকন কবুল করা জায়েজ নয় অথবা ভালো নয়। মাস'আলা এই যে, কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোনো স্বার্থ বিঘ্নিত হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল পয়ে পড়ে তবে কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েজ নয়। −(রূহুল মা'আনী) হ্যাঁ, যদি উপঢৌকন গ্রহণ করলে কোনো ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়; যেমন এর মাধ্যমে কোনো কাফের ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে, ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোনো অনিষ্ট এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবুল করার অবকাশ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোনো কোনো কাফেরের উপঢৌকন কবুল করেছেন এবং কারও কারও উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করেছেন। বুখারীর টীকা 'উমদাতুল কারী'তে এবং সিয়ারে কাবীরের টীকায় হযরত কা'ব ইনে মালেক থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে মালেক কাফের মুশরিক অবস্থায় কোনো প্রয়োজনে মদীনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমেত দু'টি অশ্ব এবং দু'টি বস্ত্রজোড়া উপঢৌকন হিসেবে পেশ করল। তিনি একথা বলে তার উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপঢৌকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হেমার মাজাশেয়ী তাঁর খেদমতে একটি উপঢৌকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুসলমান? সে বলল, না। তিনি তার উপঢৌকন একথা বলে প্রত্যাখান করলেন যে, আল্লাহ তা'আল আমাকে মুশরিকের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ রেওয়ায়েতও বিদ্যামান আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো মুশরিকের উপঢৌকন কবুল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবূ সুফিয়ান মুশরিক অবস্থায় তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খ্রিস্টান একটি অত্যুজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলে তিনি তা কবুল করেন।

এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে শামসুল আয়েম্মা বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো কারো উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করেছিলেন। পক্ষান্তরে কারও কারও উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে তার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপঢৌকন কবুল করেছেন। –[উমদাতুল কারী]

বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ.) কর্তৃক উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করাকে তাঁর নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্য মুশরিকের উপঢৌকন কবুল করা জায়েজ নয়; বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘুষ হিসেবে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিল, যাতে এর মাধ্যমে সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আক্রমণ থকে নিরাপদ থাকে।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি : কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে লিখেন, বিলকীসের দূতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে, সুলায়মান দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোনো সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহর পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। একথা বলে সে হযরত সুলায়মান (আ)-এর দরবারে হাজির হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বার হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীন এক লক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি ? তারা বলল হে আল্লাহর নবী, সম্রাজ্ঞী বিলকীস সদল-বলে আগমন করছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যখন সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবার থেকে এক ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল, তখন হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর সেনাবহিনীকে সম্বোধন করে বললেন : قَالَ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَأْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ

হযরত সুলায়মান (আ.) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তাঁর দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করতে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গাম্বরসুলভ মু'জিযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক সহায়ক হবে। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা জিন বশীভূত রাখার সাধারণ মু'জিযা দান করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌছার পূর্বেই তার সিংহাসন কোনোরূপে এখানে পৌছা দরকার। তাই পারিষদবর্গকে (তাদের মধ্যে জিনও ছিল) সম্বোধন করে এ সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধন-সম্পদের মধ্য থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেয়াও সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তালা না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এত দূরবর্তী স্থানে পৌছে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার অগাধ শক্তি বলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, সুলায়মান (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকেই কোন বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে।

قَبْلَ اَنْ يَّأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ : مُسْلِمِيْنَ শব্দটি مُسْلِمٌ-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ– অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আত্মসমর্পণকারী, অনুগত। কারণ, তখন সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কুরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাষ্য থেকেই তা-ই বোঝা যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَأَلْقِهْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ إِفْعَالٌ বাব إِلْقَاءٌ মাসদার (ل - ق - ى) মূলবর্ণ ناقص يائى জিনস ; ه যমীরে واحد مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ- এবং তুমি তা নিক্ষেপ কর।

تَوَلَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ تَفَعُّلٌ বাব تَوَلِّىٌ মাসদার (و - ل - ى) মূলবর্ণ لفيف مفروق জিনস অর্থ- তুমি সরে থাক।

أُلْقِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى مجهول বহছ إِفْعَالٌ বাব إِلْقَاءٌ মাসদার (ل - ق - ى) মূলবর্ণ ناقص يائى জিনস অর্থ- নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

أَفْتُونِى : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ إِفْعَالٌ বাব إِفْتَاءٌ মাসদার (ف - ت - و) মূলবর্ণ ناقص واوى জিনস ; نى -এর نون وقاية এবং ياء متكلم হচ্ছে মাফউলে বিহী অর্থ- তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।

فَانْظُرِى : সীগাহ واحد مؤنث حاضر امر حاضر معروف বহছ نَصَرَ বাব نَظْرٌ মাসদার ن - ظ - ر) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ- অতএব আপনিই স্থির করুন।

تَأْمُرِيْنَ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر مضارع معروف বহছ نَصَرَ বাব أَمْرٌ মাসদার (أ - م - ر) মূলবর্ণ مهموز فاء জিনস অর্থ- আপনার আদেশ করতে হয়।

أَتُمِدُّوْنَنِى : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ إِفْعَالٌ বাব إِمْدَادٌ মাসদার (م - د - د) মূলবর্ণ مضاعف ثلاثى জিনস ; نى -এর نون وقاية এবং ياء متكلم হচ্ছে মাফউলে বিহী অর্থ- তোমরা কি আমাকে সাহায্য করতে চাচ্ছ?

اِرْجِعْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ ضَرَبَ বাব رُجُوْعٌ মাসদার ر - ج - ع) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ- তুমি ফিরে যাও।

فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة درفعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার إِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) هم যমীরে جمع مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ- অনন্তর আমি তাদের প্রতি পাঠাচ্ছি।

صَاغِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ كَرُمَ বাব صِغَارٌ মাসদার (ص - غ - ر) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ- অধীনস্থ হয়ে যাবে।

يَأْتُوْنِى : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ ضَرَبَ বাব إِتْيَانٌ মাসদার (ا - ت - ى) মূলবর্ণ মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) জিনস ; نى -এর نون وقاية এবং ياء متكلم হচ্ছে মাফউলে বিহী অর্থ- তার আমার নিকট আসার পূর্বেই।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صٰغِرُوْنَ : এখানে وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ টা পূর্বের فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ -এর উপর আতফ হয়েছে। مِنْهَا টা نُخْرِجَنَّهُمْ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর ضمير সাবার দিকে ফিরেছে অর্থাৎ بلادهم আর أَذِلَّةً হলো هُمْ -এর। لَنُخْرِجَنَّهُمْ -এর এবং وَهُمْ এর واو টি حاليه হয়েছে আর هُمْ মুবতাদা صٰغِرُوْنَ হলো খবর। বাক্যটি حال থেকে حال ثانيه হয়েছে। -[ই'রাবুল কুরআন খ. ৫ : পৃ. ৫১৫]

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ ۖ لِيَبْلُوَنِىْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. যার নিকট আসমানি কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল, আমি তাকে আপনার চক্ষুর পলক পড়ার পূর্বেই আপনার সম্মুখে এনে উপস্থিত করতে পারি; অতঃপর সুলায়মান যখন তাকে নিজের সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পেলেন তখন বললেন, এটাও আমার প্রতিপালকের একটি অনুগ্রহ, যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি শুকর করি নাকি না শুকরি করি; এবং যে ব্যক্তি শুকর করে সে নিজেরই হিতের জন্য শুকর করে থাকে, আর যদি কেউ না শুকরী করে, তবে নিশ্চয় আমার রব অমুখাপেক্ষী, মহিমাময়।

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. সুলায়মান নির্দেশ দিলেন, তার জন্য তার সিংহাসনটির রূপ বদলিয়ে দাও। দেখি সে সঠিক চিনতে পারে নাকি সেই দলভুক্ত হয় যারা চিনতে পারে না।

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. যখন বিলকীস আসল, তখন তাকে বলা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, হ্যাঁ, তা এরূপই তো, এবং [বলল] এই ঘটনার পূর্বেই তো আমরা প্রকৃত তথ্য অবগত হয়েছি। আর আমরা [তখন হতেই] অনুগত হয়েছি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪০. قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ যার নিকট আসমানি কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ আমি তাকে আপনার সম্মুখে এনে উপস্থিত করতে পারি قَبْلَ পূর্বেই اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ আপনার চক্ষুর পলক পড়বার فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ অতঃপর সুলায়মান যখন তাকে নিজের সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পেলেন قَالَ তখন বললেন هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ এটাও আমার প্রতিপালকের একটি অনুগ্রহ لِيَبْلُوَنِىْ যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ শুকর করি নাকি না শুকরি করি وَمَنْ شَكَرَ, এবং যে ব্যক্তি শুকর করে فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ সে নিজেরই হিতের জন্যে শুকর করে থাকে وَمَنْ كَفَرَ, আর যে ব্যক্তি না-শুকরি করে فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ তবে নিশ্চয় আমার রব অমুখাপেক্ষী, মহিমাময়।

৪১. قَالَ সুলায়মান নির্দেশ দিলেন نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا তার জন্য তার সিংহাসনটির রূপ বদলে দাও نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْ দেখি সে সঠিক চিনতে পারে কিনা اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ নাকি সেই দলভুক্ত হয় যারা চিনতে পারে না।

৪২. فَلَمَّا جَآءَتْ যখন বিলকীস আসল قِيْلَ তখন তাকে বলা হলো اَهٰكَذَا عَرْشُكِ তোমার সিংহাসন কি এরূপই? قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ সে বলল, হ্যাঁ তা এরূপই তো وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا, এবং ঘটনার পূর্বেই তো আমরা প্রকৃত তথ্য অবগত হয়েছি وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ, এবং আমরা অনুগত হয়েছি।

৪৩. আর আল্লাহ ভিন্ন অপর বস্তুর উপাসনা তাকে [ঈমান আনয়ন করা হতে] বিরত রেখেছিল; [কারণ] সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।	وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. বিলকীসকে বলা হলো– এই প্রাসাদে প্রবেশ কর অনন্তর যখন সে তার আঙ্গিনা দেখল, [তখন] তাকে গভীর জলাশয় মনে করল এবং তার উভয় পায়ের গোছা উন্মুক্ত করল। হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, এটা তো একটি প্রাসাদ যা কাচের তৈরি। বিলকীস বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি এবং আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।	قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۬ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾ ع
৪৫. আর আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহকে পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর, অতঃপর হঠাৎ তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিবাদ করতে লাগল।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. সালেহ বললেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা নেক কাজের পূর্বে তাড়াতাড়ি আজাব চাচ্ছ কেন? তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা কেন চাচ্ছ না? যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহের আশা করা যেতে পারে।	قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. وَصَدَّهَا আর তাকে বিরত রেখেছিল مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন অপর বস্তুর উপাসনা اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ (কারণ) সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪৪. قِيْلَ لَهَا বিলকিস কে বলা হলো ادْخُلِي الصَّرْحَ এই প্রাসাদে প্রবেশ কর فَلَمَّا رَاَتْهُ অনন্তর যখন সে তার আঙ্গিনা দেখল حَسِبَتْهُ لُجَّةً (তখন) তাকে পানি (জলাশয়) মনে করল وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا এবং তার উভয় পায়ের গোছা উন্মুক্ত করল قَالَ সুলায়মান বললেন اِنَّهٗ صَرْحٌ এটা তো একটি প্রাসাদ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ যা কাঁচের তৈরি قَالَتْ বিলকীস বলল رَبِّ হে আমার রব اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি وَاَسْلَمْتُ এবং আমি ঈমান আনলাম مَعَ سُلَيْمٰنَ সুলায়মানের সাথে لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতি।

৪৫. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا আর আমি পাঠালাম اِلٰى ثَمُوْدَ ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি اَخَاهُمْ صٰلِحًا তাদের ভ্রাতা সালেহকে اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ অতঃপর হঠাৎ তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিবাদ করতে লাগল।

৪৬. قَالَ সালেহ বললেন يٰقَوْمِ ভ্রাতৃগণ! لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ তোমরা তাড়াতাড়ি আজাব চাচ্ছ কেন? قَبْلَ الْحَسَنَةِ নেক কাজের পূর্বে لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা কেন চাচ্ছ না لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহের আশা করা যেতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ : অর্থাৎ, যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল। এই ব্যক্তি কে? এ সম্পর্কে এক সম্ভাবনা তাফসীরের সারসংক্ষেপ এই যে, স্বয়ং হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই একটা মু'জিযা এবং বিলকীসকে পয়গাম্বরসুলভ মু'জিযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এব্যাপারে আপত্তির কোনো কিছু নেই। কিন্তু কাতাদা প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে ইবনে জারীর (র.) বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক তার নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে তার খালাত ভাই ছিলেন। তিনি ইসমে আজম জানতেন। ইসমে আজমের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবুল হয় এবং যাই চাওয়া হয়, তা-ই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরি নয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) ইসমে আজম জানতেন না। কেননা এটা অবাস্তব নয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর এই মহান কীর্তি তাঁর উম্মতের কোনো ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরও প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এ কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ -[ফুসূসুল হিকাম] এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ইবনে বারখিয়ার কারামত হবে।

মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য : প্রকৃত সত্য এই যে, মু'জিযার মধ্যে স্বভাবগত কারণাদির কোনো দখল থাকে না; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ। কুরআন পাকে বলা হয়েছে।

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى : কারামতের অবস্থাও হুবহু তদ্রূপ। এতেও স্বাভাবগত কারণাদির কোনো দখল থাকে না; বরং সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো কাজ হয়ে যায়। মু'জিযা ও কারামত এ উভয়টির প্রকাশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি কোনো অলৌকিক কাজ ওহীর অধিকারী পয়গাম্বরগণের হাতে প্রকাশ পায়, তবে তাকে মু'জিযা বলা হয়। পক্ষান্তরে এরূপ কাজই নবী ব্যতীত অন্য কারও হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় যদি এই রেওয়ায়েত সহীহ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পূর্ণ হয়েছে, তবে একে কারামত বলা হবে। প্রত্যেক ওলীর গুণাবলি তার পয়গাম্বরগরের গুণাবলির প্রতিবিম্ব এবং তার কাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উম্মতের ওলীদের হাতে সেসব কারামত প্রকাশ পায়, সেগুলো পয়গাম্বরের মু'জিযারূপে গণ্য হয়ে থাকে।

বিলকীসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত নাকি তাসাররুফ : শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র.) একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসাররুফ সাব্যস্ত করেছেন। পরিভাষায় তাসাররুফের অর্থ– কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিস্ময়কর কাজ প্রকাশ করা । এর জন্যে নবী, ওলী এমনকি মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্তে মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী (র.) বলেন, পয়গাম্বরগণ তাসাররুফের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হযরত সুলায়মান (আ.) এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কুরআন পাক এই তাসাররুফকে عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ (কিতাবের জ্ঞান) -এর ফলশ্রুতি বলেছে। এতে এই অর্থই অগ্রগণ্য হয় যে, এটা কোনো দোয়া অথবা ইসমে আজমের ফল ছিল, যার তাসাররুফের সাথে কোনো সম্পর্কে নেই; বরং এটা কারামতেরই সমার্থবোধক।

اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ : "আমি এই সিংহাসন চোখের পলক মারার আগেই এনে দেব" আসিফের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা তাসাররুফের আলামত। কেননা কারামত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সন্দেহের জবাব এই যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি এ কাজ এত দ্রুত করে দেব।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কিনা? এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিতা হয়ে গেল। এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কুরআন পাক নীরব। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উয়ায়নাকে

জিজ্ঞেস করল, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি বললেন, তার ব্যাপার وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, কুরআন এ পর্যন্ত তার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অতএব, আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইবনে আসাকির (র.) হযরত ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যান এবং তাকে তার রাজত্বে বহাল রেখে ইয়েমেনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন বলেও বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَنْ يَّرْتَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِدَادٌ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পড়ে যাওয়ার।

مُسْتَقِرًّا : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِقْرَارٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– উপস্থিত।

لِيَبْلُوَنِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার بَلَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائى ; نى -এর নূন نون وقاية এবং ياء متكلم হচ্ছে মাফউলে বিহী অর্থ– যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন।

نَكِّرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَنْكِيْرٌ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা রূপ বদলিয়ে দাও।

اُوْتِيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– আমরা অবগত হয়েছি।

اَلصَّرْحُ : একবচন, বহুবচন صُرُوْحٌ অর্থ– প্রাসাদে, টাওয়ার, ভবন।

حَسِبَتْهُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ ও حَسِبَ মাসদার حِسْبَانٌ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ ب) জিনস صحيح ; ه যমীরে واحد مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ– সে তাকে মনে করল।

كَشَفَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার كَشْفٌ মূলবর্ণ (ك ـ ش ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– সে উন্মুক্ত করল।

مُمَرَّدٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَمْرِيْدٌ মূলবর্ণ (م ـ ر ـ د) জিনস صحيح অর্থ– তৈরি।

يَخْتَصِمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِخْتِصَامٌ মূলবর্ণ (خ ـ ص ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তারা পরস্পর বিবাদ করতে লাগল।

تُرْحَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার رُحْمٌ মূলবর্ণ (ر ـ ح ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের প্রতি আশা করা যেতে পারে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ : এখানে قال হলো ফে'ল আর عِفْرِيْتٌ হলো ফায়েল আর مِنَ الْجِنِّ হলো সিফাত, আর اَنَا মুবতাদা اٰتِيْكَ بِهٖ হলো খবর قَبْلَ টা ظرف متعلق হয়েছে اٰتِيْكَ -এর সাথে। আর مِنْ مَّقَامِكَ টা اَنْ تَقُوْمَ -এর সাথে متعلق হয়েছে। অর্থাৎ قَبْلَ اَنْ تَبَارِحَ مَجْلِسَكَ الَّذِىْ تَجْلِسُ فِيْهِ لِلْقَضَاءِ مِنَ الْغَدَاةِ اِلَى مُنْتَصِفِ النَّهَارِ [ই'রাবুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৫১৮]

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৪৭. তারা বলতে লাগল, আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সঙ্গিদেরকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করি। সালেহ বললেন, তোমাদের অমঙ্গল আল্লাহই জানেন; বরং তোমরা সেই সম্প্রদায় যারা আজাবে পতিত হবে।	قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর উক্ত জনপদে [দলপতি] ছিল নয়জন, যারা দেশের মধ্যে ফ্যাসাদ করত এবং শান্তি স্থাপন করত না।	وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. তারা বলল যে, তোমরা সকলে পরস্পর শপথ কর যে, আমরা রাত্রিকালে যেয়ে সালেহকে ও তার পরিবার-পরিজনকে মেরে ফেলব, অতঃপর আমরা তার অভিভাবককে বলব, আমরা তার পরিবার-পরিজনকে হত্যায় উপস্থিত ছিলাম না এবং আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী।	قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. এবং তারা এক চক্রান্ত করল, আর আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম এবং তারা টেরও পেল না।	وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. অতএব দেখুন, তাদের দুষ্কৃতির পরিণাম কীরূপ হলো, আমি তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকলকেই ধ্বংস করে দিলাম।	فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. قَالُوا তারা বলতে লাগল اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সঙ্গিদেরকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করি قَالَ সালেহ বললেন طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ তোমাদের অমঙ্গল আল্লাহই জানেন بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ : বরং তোমরা সেই সম্প্রদায় যারা আজাবে পতিত হবে।

৪৮. وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ আর উক্ত জনপদে (দলপতি) ছিল تِسْعَةُ رَهْطٍ নয়জন يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ যারা দেশের মধ্যে ফ্যাসাদ করত وَلَا يُصْلِحُوْنَ, এবং শান্তি স্থাপন করত না।

৪৯. قَالُوْا তারা বলল যে, تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ তোমরা সকলে পরস্পর শপথ করো যে, لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ আমরা রাত্রিকালে যেয়ে সালেহকে এবং তার পরিবার-পরিজন মেরে ফেলব ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ অতঃপর আমরা তার উত্তরাধিকারীকে বলব مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ আমরা তার সংশ্লিষ্টদের হত্যায় উপস্থিত ছিলাম না وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ, এবং আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

৫০. وَمَكَرُوْا مَكْرًا, এবং তারা এক গোপন চক্রান্ত করল وَّمَكَرْنَا مَكْرًا আর আমিও কৌশল অবলম্বন করলাম وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ এবং তারা টেরও পেল না।

৫১. فَانْظُرْ অতএব দেখুন كَيْفَ كَانَ কীরূপ হলো عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ তাদের দুষ্কৃতির পরিণাম اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ আমি তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকলকেই ধ্বংস করে দিলাম।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۵۲﴾

৫২. বস্তুত এগুলোই তাদের বাড়িঘর, যা বিধ্বস্ত জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে তাদের সীমালঙ্ঘন তথা কুফরির কারণে, নিঃসন্দেহে তাতে জ্ঞানবানদের জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে।

وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿۵۳﴾

৫৩. এবং আমি ঈমানদার ও পরহেজগার লোকদেরকে নাজাত দিলাম।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿۵۴﴾

৫৪. এবং আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি এই নির্লজ্জতার কাজ করছ? অথচ তোমরা জ্ঞানবান লোক।

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۵۵﴾

৫৫. তোমরা কি স্ত্রী-জাতিকে ছেড়ে পুরুষদের সাথে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছ? বরং তোমরা মূর্খতার কাজ করছ।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿۵۶﴾

৫৬. তখন তার সম্প্রদায়ের পক্ষে এটা ব্যতীত কোনোই উত্তর দেওয়া সম্ভব হলো না যে, তারা পরস্পর বলতে লাগল, লূতদেরকে তোমাদের জনপদ হতে বের করে দাও, তারা বড় শুচিবাগীশ।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ বস্তুত : এগুলো তাদের বাড়ি-ঘর خَاوِيَةً যা বিধ্বস্ত জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে بِمَا ظَلَمُوْا তাদের কুফরির কারণে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً নিঃসন্দেহে এত বড় উপদেশ রয়েছে لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ জ্ঞানবানদের জন্য।

৫৩. وَاَنْجَيْنَا এবং আমি নাজাত দিলাম। الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ঈমানদার وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ও পরহেজগার লোকদেরকে।

৫৪. وَلُوْطًا এবং আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ তোমরা কি এই নির্লজ্জতার কাজ করছ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ অথচ তোমরা জ্ঞানবান লোক।

৫৫. اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً তোমরা কি পুরুষদের সাথে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছ مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ স্ত্রী জাতিকে ছেড়ে بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ; বরং তোমরা মূর্খতার কাজ করছ।

৫৬. فَمَا كَانَ তখন সম্ভব হলো না جَوَابَ قَوْمِهٖ তার সম্প্রদায়ের পক্ষে কোনোই উত্তর اِلَّا اَنْ قَالُوْا এটা ব্যতীত যে, তারা বলতে লাগল اَخْرِجُوْا اٰلَ لُوْطٍ লূতদেরকে বের করে দাও مِّنْ قَرْيَتِكُمْ তোমাদের জনপদ হতে اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ এরা বড় শুচিবাগীশ।

৫৭. সুতরাং আমি লূত ও তার সঙ্গিদেরকে রক্ষা করলাম তার স্ত্রীকে ব্যতীত, যেহেতু তাকে আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম।	فَأَنْجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَٰهَا مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٥٧﴾
৫৮. আর আমি তাদের প্রতি এক ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং তা ভীতি প্রদর্শিতদের প্রতি কতই না মন্দ বৃষ্টি ছিল।	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾
৫৯. আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য এবং শান্তি বর্ষিত হোক তার সেই বান্দাগণের উপর যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। আল্লাহ উত্তম, নাকি ঐ সমস্ত পদার্থ, যাদেরকে তারা অংশী সাব্যস্ত করছে?	قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ

৫৭. فَأَنْجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُ সুতরাং আমি লূত ও তাঁর তাঁর সঙ্গীদেরকে রক্ষা করলাম إِلَّا امْرَأَتَهُ তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত قَدَّرْنَٰهَا مِنَ الْغَٰبِرِينَ যেহেতু তাকে আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছিলাম।

৫৮. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا আর আমি তাদের প্রতি এক ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ সুতরাং যারা ভীতি প্রদর্শিত তাদের প্রতি কতই না মন্দ বৃষ্টি ছিল।

৫৯. قُلِ আপনি বলুন الْحَمْدُ لِلَّهِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সেই বান্দাগণের উপর যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ আল্লাহ উত্তম নাকি ঐ সমস্ত পদার্থ যাদেরকে তারা অংশী সাব্যস্ত করেছে?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩)

শানে নুযূল : আব্দ বিন হুমাইদ ও ইবনে জারীর (র.) সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত বিশেষ করে হযরত রাসূল ﷺ -এর আত্মত্যাগী সাহাবীগণ সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে عِبَادَهُ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ তথা 'নির্বাচিত বান্দাগণ' দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে।

-[রূহুল মা'আনী ৩/১০/২০, দুররে মানছুর ১১৩/৫]

تِسْعَةُ رَهْطٍ : رَهْطٌ শব্দের অর্থ- দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্যে থেকে প্রতেককেই رَهْط বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক, প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানস্বরূপে গণ্য হতো এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। কাজেই এই নয় ব্যক্তিকে নয়টি দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিজর জনপদের প্রধান। হিজর শামদেশের একটি স্থানের নাম।

لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ : উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার জাতি-গোষ্ঠীর উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবিদার তদন্ত করলে আমরা বলে দিব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি। এক কথায় আমরা সত্যবাদী গণ্য হব। কারণ রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্ট করে জানবো না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফেরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশেরা কুফর, শিরক, হত্যা ও লুণ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোনো চিন্তা ছাড়াই; কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন যে, মিথ্যা কত বড় গোনাহ। বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসম্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে তারা হযরত সালেহ (আ.)-এর ওলী তথা দাবিদার বলেছে, সে তো হযরত সালেহ (আ.)-এরই পরিবারভুক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যার তালিকার বাইরে কেন রাখল? জবাব এই যে, সম্ভবত: সে পারিবারিক দিক দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। হযরত সালেহ (আ.) ও তার স্বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবি করবে। এটাও সম্ভবপর যে, সে মুসলমান ছিল, কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ পূর্ববর্তী পয়গাম্বরর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রাসূলে কারীম ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আজাব থেকে নিরাপদ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গাম্বর ও আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারও কারও মতে এই বাক্যটিও হযরত লূত (আ.) -কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আয়াতে الَّذِينَ اصْطَفَى বাক্যে বাহ্যত: পয়গাম্বরগণকেই বুঝানো হয়েছে ; যেমন অন্য আয়াতে وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েত আছে যে, এখানে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে বুঝানো হযেছে। সুফিয়ান সাওরী এ মতই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতে الَّذِينَ اصْطَفَى বলে সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হলে এই আয়াত দ্বারা পয়গাম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার জন্য 'আলাইহিস সালাম' বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহযাবের صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا আয়াতের তাফসীরে ইনাশাআল্লাহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হবে।

মাসআলা : এই আয়াতে থেকে খুতবার রীতিনীতিও প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও পয়গাম্বরগণের প্রতি দরুদ ও সালাম দ্বারা খুতবা শুরু হওয়া উচিত। রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের সকল খুতবা এভাবেই শুরু হয়েছে ; বরং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহর হাম্দ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরুদ ও সালাম সুন্নত ও মোস্তাহাব। –[রূহুল মা'আনী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُفْتَنُونَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنَةٌ মূলবর্ণ (ف - ت - ن) জিনস صحيح অর্থ– যারা আজাবে পতিত হবে।

تَقَاسَمُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَقَاسُمٌ মূলবর্ণ (ق - س - م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সকলে পরস্পর শপথ করো।

لَنَقُولَنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার قَوْلٌ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা বলব।

مَكَرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَكْرٌ মূলবর্ণ (م ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আমিও কৌশল অবলম্বন করলাম।

خَاوِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার خَوَاءٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– যা বিধ্বস্ত জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে।

كَانُوْا يَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা পরহেজগারী অবলম্বন করেছিল।

تُبْصِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبْصَارٌ মূলবর্ণ (ب ـ ص ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জ্ঞানবান লোক।

تَجْهَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার جَهْلٌ মূলবর্ণ (ج ـ ه ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা মূর্খতার কাজ করছ।

يَتَطَهَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَطَهُّرٌ মূলবর্ণ (ط ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা বড় শুচিবাগীশী অবলম্বন করত।

اَمْطَرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْطَارٌ মূলবর্ণ (م ـ ط ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম।

اِصْطَفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِصْطِفَاءٌ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি মনোনীত করেছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاِذَا هُمْ فَرِيْقَانِ يَخْتَصِمُوْنَ : এখানে فَاِذَا- এর فاء আতেফা। اِذَا হলো فجائية আর هُمْ হলো মুবতাদা। فَرِيْقَانِ হলো খবর, يَخْتَصِمُوْنَ বাক্যটি فَرِيْقَانِ- এর نعت হয়েছে।

পারা : ২০

৬০. (এই সমস্ত মূর্তিই উত্তম?) না সেই সত্তা যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান হতে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছেন? অনন্তর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যানসমূহ উৎপন্ন করেছি, তোমাদের পক্ষে তো সম্ভব ছিল না যে, তার বৃক্ষগুলো উৎপন্ন করা; আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কোনো মা'বূদ আছে কি? বরং তারা এমন লোক যারা সত্য বিচ্যুত হয়।	أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. না সেই সত্তা যিনি জমিনকে বাসস্থান বানিয়েছেন এবং তার মাঝে মাঝে নহরসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে পর্বতসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং দুই নদীর মধ্যস্থলে একটি সীমারেখা সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কোনো মা'বূদ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশ তো জানে না;	أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. না সেই সত্তা যিনি বিপন্নের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ মোচন করে দেন এবং তোমাদেরকে জমিনের ব্যবহারের অধিকারী করে থাকেন; আল্লাহর সাথে আর কোনো মা'বূদ আছে কি? তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক;	أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬০. أَمَّنْ خَلَقَ না সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ আসমান ও জমিন وَأَنْزَلَ لَكُمْ এবং তোমাদের জন্য বর্ষণ করেছেন مِّنَ السَّمَآءِ আসমান হতে مَآءً পানি فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ অনন্তর আমি তা দ্বারা উৎপন্ন করেছি حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ মনোরম উদ্যানসমূহ مَا كَانَ لَكُمْ তোমাদের পক্ষে তো সম্ভব ছিলনা যে, أَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا তার বৃক্ষগুলো উৎপন্ন করা ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কোনো মাবুদ আছে কি? بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ বরং তারা এমন লোক যারা সত্য বিচ্যুত হয়।

৬১. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا না সেই সত্তা যিনি জমিনকে বাসস্থান বানিয়েছেন وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا এবং তার মাঝে মাঝে নহরসমূহ সৃষ্টি করেছেন وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ এবং তাতে পর্বতসমূহ সৃষ্টি করেছেন وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا এবং দুই নদীর মধ্যস্থানে একটি সীমারেখা সৃষ্টি করেছেন ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কোনো মা'বূদ আছে কি بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ বরং তাদের আধিকাংশ তো জানে না।

৬২. أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ না সেই সত্তা যিনি বিপন্নের ডাকে সাড়া দেন إِذَا دَعَاهُ যখন সে তাঁকে ডাকে وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ এবং বিপদ মোচন করে দেন وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ এবং তোমাদেরকে জমিনের ব্যবহারের অধিকারী করে দেন ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ আল্লাহর সাথে আর কোনো মাবুদ আছে কি قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

৬৩. না সেই সত্তা যিনি স্থল ও জলভাগের অন্ধকারপুঞ্জের মধ্যে তোমাদেরকে পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন এবং যিনি বৃষ্টির পূর্বে বায়ুরাশিকে প্রেরণ করে থাকেন, যা (বৃষ্টির আশ্বাস দিয়ে অন্তরকে) আনন্দিত করে থাকে; আল্লাহর সাথে আর কোনো মা'বূদ আছে কি? (বরং) আল্লাহ্ হচ্ছেন তাদের শিরক হতে বহু উর্ধ্বে।	أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ تَعَٰلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾
৬৪. না সেই সত্তা যিনি সৃষ্ট বস্তুগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করে থাকেন, আবার তাদেরকে পুনঃ সৃষ্টি করবেন, আর যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন হতে রিজিক প্রদান করে থাকেন; আল্লাহর সাথে আর কোনো উপাস্য আছে কি? আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আপনি বলে দিন, আসমানসমূহে ও জমিনে যত সৃষ্টজীব রয়েছে, কেউ কোনো গায়েবের বিষয় সম্বন্ধে অবগত নয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত; আর তারা এটাও অবগত নয় যে, তাদেরকে কখন পুনরায় জীবিত করা হবে।	قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾
৬৬. বরং আখেরাত সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। বরং তারা সে সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। বরং তারা সে সম্বন্ধে অন্ধ সেজে রয়েছে।	بَلِ ادَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا ۖ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ না সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন فِي ظُلُمَٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ স্থল ও জলভাগের অন্ধকার পুঞ্জের মধ্যে وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَٰحَ এবং যিনি বৃষ্টির পূর্বে বায়ুরাশিকে প্রেরণ করে থাকেন بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ যা (বৃষ্টির আশ্বাস দিয়ে অন্তরকে) আনন্দিত করে থাকে أَءِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ আল্লাহর সাথে আর কোনো মাবুদ আছে কি تَعَٰلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ আল্লাহ্ হচ্ছেন তাদের শিরক হতে বহু উর্ধ্বে।

৬৪. أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ না সেই সত্তা যিনি সৃষ্ট বস্তুগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করে থাকেন ثُمَّ يُعِيدُهُ আবার তাদেরকে পুনঃ সৃষ্টি করবেন وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ আর যিনি তোমাদেরকে রিজিক প্রদান করে থাকেন مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ আসমান ও জমিন হতে أَءِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ আল্লাহর সাথে আর কোনো উপাস্য আছে কি? قُلْ আপনি বলুন هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর إِنْ كُنْتُمْ صَٰدِقِينَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৬৫. قُلْ আপনি বলে দিন لَا يَعْلَمُ কেউই অবগত নয় مَنْ فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ আসমান সমূহে ও জমিনে যত সৃষ্টজীব রয়েছে الْغَيْبَ গায়েবের বিষয় সম্বন্ধে إِلَّا اللَّهُ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত وَمَا يَشْعُرُونَ আর তারা এটাও অবগত নয় যে, أَيَّانَ يُبْعَثُونَ তাদেরকে কখন পুনরায় জীবিত করা হবে।

৬৬. بَلِ ادَّٰرَكَ বরং লোপ পেয়েছে عِلْمُهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ আখেরাত সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا বরং তারা সে সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ বরং তারা সে সম্বন্ধে অন্ধ সেজে রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ [٦٥]

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিকরা রাসূল ﷺ -এর নিকট প্রতিশ্রুত কিয়ামত কখন প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সম্পর্কে জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে ছিল। তাদের পক্ষ থেকে এহেন নির্বাক ও নির্বুদ্ধিকর জিজ্ঞাসার জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[কুরতুবী ২০২/১৩]

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ : مُضْطَرٌ শব্দটি اِضْطِرَارٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো অভাব হেতু অপারগ ও অস্থির হওয়া। এটা তখনই হয়, যখন কোনো হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে مُضْطَرٌ বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়। এই তাফসীর সুদ্দী, যুননূন মিসরী, সহল ইবনে আব্দুল্লাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। –(কুরতুবী) রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ অসহায় ব্যক্তিকে নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করতে বলেছেন : اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ অর্থ– ইয়া আল্লাহ, আমি তোমার রহমত আশা করি। অতএব, আমাকে মুহূর্তের জন্যেও আমার নিজের নফসের কাছে সমর্পণ করো না। তুমিই আমার সবকিছু ঠিকঠাক করে দাও। তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।–[কুরতুবী]

নিঃসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবুল হয় : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নিঃসহায়ের দোয়া কবুল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। এর আসল কারণ এই যে, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই কার্যোদ্ধারকারী মনে করে দোয়া করা এখলাস। আল্লাহ তা'আলার কাছে এখলাসের বিরাট মর্তবা। মুমিন, কাফের, পরহেজগার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছে থেকেই এখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহর রহমত নিবিষ্ট হয়। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা যখন নৌকায় সওয়ার হয়ে সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে এবং চতুর্দিক থেকে প্রবল ঢেউয়ের চাপে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তারা যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পায়। সেই সময় তারা পূর্ণ এখলাস সহকারে আল্লাহকে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল করে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এক সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয় এতে কোনো সন্দেহ নেই। (এক) উৎপীড়িতের দোয়া, (দুই) মুসাফিরের দোয়া এবং (তিন) সন্তানের জন্য বদ-দোয়া। ইমাম কুরতুবী (র.) এই হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, এই দোয়াত্রয়ের মধ্যেও কবুল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্ব বিদ্যমান আছে। কোনো উৎপীড়িত ব্যক্তি যখন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহায্যকারী থেকে নিরাশ হয়ে উৎপীড়ন দূর করার জন্যে আল্লাহকে ডাকে, তখন সে-ও নিঃসহায়ই হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন ও দরদি স্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্যে পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের কারণে কখনও বদ-দোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে আল্লাহকে ডাকে। হাদীসবিদ আজেরী হযরত আবূ যার (রা.)-এর জবানী রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর উক্তি এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনও রদ করব না, যদিও সে কাফের হয়। - (কুরতুবী) যদি কোনো নিঃসহায়, মজলুম; মুসাফির অনুভব করে যে, তার দোয়া কবুল হয়নি, তবে কুধারণার বশবর্তী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হলেও রহস্য ও উপকারিতাবশত দেরিতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার এখলাস ও আল্লাহর প্রতি মনোযোগে কোনো ত্রুটি আছে কিনা।

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মখলুক আকাশে আছে; যেমন ফেরেশতা, যত মখলুক পৃথিবীতে আছে; যেমন মানবজাতি, জিন জাতি ইত্যাদি-তাদের কেউ গায়বের খবর জানে না, আল্লাহ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে, গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ–এতে কোনো ফেরেশতা অথবা নবী-রাসূলও শরিক হতে পারে না। এ বিষয়ের জরুরি ব্যাখ্যা সূরা আনআমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ : এখানে اِدّٰرَكَ শব্দে বিভিন্ন রূপের কেরাত আছে এবং অর্থ সম্পর্কেও নানা জনের নানা উক্তি রয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তাফসীরের কিতাবাদিতে এর বিবরণ দেখে নিতে পারেন। এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে, কোনো কোনো তাফসীরকার اِدّٰرَكَ শব্দের অর্থ নিয়েছেন تَكَامُلْ অর্থাৎ পরিপূর্ণ হওয়া এবং فِى الْاٰخِرَةِ -কে- اِدّٰرَكَ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করেছেন যে, পরকালে এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে সামনে এসে যাবে। তবে তখনকার জ্ঞান তাদের কোনো কাজে লাগবে না। কারণ দুনিয়াতে তারা পরকালকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত। পক্ষান্তরে কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে اِدّٰرَكَ শব্দের অর্থ ضَلَّ ও غَابَ এবং فِى الْاٰخِرَةِ শব্দটি عِلْمُهُمْ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে, তারা একে বুঝতে পারেনি।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَنْ تُنْبِتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْبَاتٌ মূলবর্ণ (ن - ب - ت) জিনস صحيح অর্থ– উৎপন্ন করা, তোমরা উৎপন্ন করবে।

حَاجِزًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার حَجْزٌ মূলবর্ণ (ح - ج - ز) জিনস صحيح অর্থ– একটি সীমারেখা।

اَلْمُضْطَرُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِضْطِرَارٌ মূলবর্ণ (ض - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিপন্ন ব্যক্তি।

يَبْدَؤُا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার بَدْءٌ মূলবর্ণ (ب - د - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করে থাকেন।

يُعِيْدُهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعَادَةٌ মূলবর্ণ (ع - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি তাদেরকে পুনঃসৃষ্টি করবেন।

هَاتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اسم فعل بمعنى امر অর্থ– তোমরা উপস্থিত কর।

يُبْعَثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার بَعْثٌ মূলবর্ণ (ب - ع - ث) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

مَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا : এই বাক্যটি পূর্ববর্তী حَدَائِق -এর দ্বিতীয় সিফাত হয়েছে অথবা তা থেকে حال হয়েছে। আর হলো مَا আর كَانَ হলো ফে'লে নাফেস আর لَكُمْ হলো كَانَ -এর خبر مقدم আর اَنْ تُنْبِتُوْا বাক্যটি হলো كَانَ -এর اسم مؤخر আর تُنْبِتُوْا হলো ফে'ল তার যমীর হলো ফায়েল এবং شَجَرَهَا হলো মাফউল।

[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড; পৃ. ৫৩৯

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৬৭. আর এই কাফেররা বলে, আমরা যখন মৃত্তিকায় পরিণত হবো এবং (তদ্রূপ) আমাদের পূর্বপুরুষেরাও, তখন কি আমাদেরকে (পুনরায় জীবিত করে কবর হতে) বের করা হবে?	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. এ বিষয়ে তো তোমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণকে পূর্ব হতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসা হচ্ছে, এই সমস্ত কেবল ভিত্তিহীন কথা, যা পূর্বপুরুষগণ হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।	لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. আপনি বলে দিন, তোমারা পৃথিবীতে বিচরণ করে দেখ, অপরাধীদের কি পরিণতি হয়েছিল।	قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. এবং আপনি তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তাতে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না।	وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. আর তারা এরূপ বলে থাকে, এ প্রতিশ্রুতি কখন কার্যকরী হবে, যদি আপনি সত্যবাদী হন।	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾
৭২. আপনি বলে দিন, যেই আজাবের জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছ, আশ্চর্য নয় যে, তার কতক অংশ তোমাদের নিকটেই এসে পৌছেছে।	قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৭. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا আর এই কাফেররা বলে ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا আমরা যখন মৃত্তিকায় পরিণত হবো وَّاٰبَآؤُنَآ এবং আমাদের পূর্বে পুরুষেরাও ءَاِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ তখন কি আমাদেরকে বের করা হবে?

৬৮. لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ এ বিষয়ে তো আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসা আছে وَاٰبَآؤُنَا এবং আমাদরে পূর্বপুরুষগণকে مِنْ قَبْلُ পূর্ব হতে اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ এ সমস্ত কেবল ভিত্তিহীন কথা যা পূর্বপুরুষগণ হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।

৬৯. قُلْ আপনি বলে দিন سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ করে দেখ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ অপরাধীদের কি পরিণতি হয়েছিল।

৭০. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ এবং আপনি তাদের জন্য দুঃখ করবেন না وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ তাতে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না مِمَّا يَمْكُرُوْنَ তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে।

৭১. وَيَقُوْلُوْنَ আর তারা এরূপ বলে থাকে مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ এই প্রতিশ্রুতি কখন কার্যকরী হবে اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি আপনি সত্যবাদী হন।

৭২. قُلْ আপনি বলে দিন عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ আশ্চর্য নয় যে, তোমাদের নিকট এসে পৌছেছে بَعْضُ الَّذِيْ তার কতক تَسْتَعْجِلُوْنَ যে আজাবের জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছ।

৫০. তারা উত্তরে বলল, কোনো ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সমীপে প্রত্যাবর্তন করব।	قَالُوا لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾
৫১. আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন, যেহেতু আমরা সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি।	إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾
৫২. আর আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম আমার বান্দাদেরকে রাতারাতি [মিসর হতে] বের করে নিয়ে যাও, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।	وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾
৫৩. ফেরাউন নগরসমূহে [লোক] সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করল।	فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾
৫৪. তারা [বনী ইসরাঈলরা আমাদের তুলনায়] একটি ক্ষুদ্র দল।	إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾
৫৫. এবং তারা আমাদেরকে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত করেছে।	وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٥﴾
৫৬. পক্ষান্তরে আমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি সম্প্রদায়।	وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٦﴾
৫৭. অবশেষে আমি তাদেরকে [ফেরাউন কওমকে] বাগানসমূহ ও ঝরণাসমূহ হতে বের করে দিলাম।	فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. قَالُوا তারা উত্তরে বলল لَا ضَيْرَ কোনো ক্ষতি নেই إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ আমরা আমাদের প্রতিপালকের সমীপে প্রত্যাবর্তন করব।

৫১. إِنَّا نَطْمَعُ আমরা আশা রাখি যে, أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا আমাদের প্রতিপালক ক্ষমা করবেন خَطَايَانَا আমাদের অপরাধসমূহ أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ যেহেতু আমরা সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি।

৫২. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ আর আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي আমার বান্দাদেরকে রাতারাতি বের করে নিয়ে যাও إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

৫৩. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ ফেরাউন প্রেরণ করল فِي الْمَدَائِنِ নগরসমূহে حَاشِرِينَ সংগ্রহকারীদেরকে।

৫৪. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ তারা لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ একটি ক্ষুদ্র দল।

৫৫. وَإِنَّهُمْ لَنَا এবং তারা আমাদেরকে لَغَائِظُونَ অত্যন্ত উত্ত্যক্ত করেছে।

৫৬. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ পক্ষান্তরে আমরা একটি সম্প্রদায় حَاذِرُونَ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

৫৭. فَأَخْرَجْنَاهُم অবশেষে আমি তাদেরকে বের করে দিলাম مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ বাগানসমূহ ও ঝরণা সমূহ হতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ [٧٠]

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিক যারা কাফের ছিল, তারা রাসূল ﷺ-কে নিয়ে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করত। সে সকল ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ কারীদের চরিত্র ও মানসিকভাবে জাগতিক শান্তির বিবরণসহ আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। -[কুরতুবী ২০৫/১৩]

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ أَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ [٧٦]

শানে নুযূল : বনূ ইসরাইলদের মাঝে ইহুদি ও নাসারা তথা খ্রিস্টান দু'টি বৃহৎ ও মৌলিক দল। তারা পরস্পরের মাঝে বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এত প্রকট ছিল যার দরুন একে অপরের প্রতি অভিসম্পাত পর্যন্ত করেছে। তাদের পারস্পরিক বহুধা-বিভক্ত হবার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ২০৭/১৩]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পরকালীন জিন্দেগীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনার পর ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেররা এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে এবং তারা এ ব্যাপারে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না যে, মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির করা হবে, তাই তাদের অজ্ঞানতার কারণে তারা এমন পরম সত্যটিকে অস্বীকার করত। ইরশাদ হয়েছে- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ অর্থাৎ আর কাফেররা বলে, আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে? তাদের এসব কথা তাদের মনের অন্ধত্বেরই প্রমাণ বহন করে।

তাদের কর্তব্য ছিল পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা, পরিণামদর্শী হওয়া, বাস্তববাদী হওয়া এবং নিজেদের কল্যাণ কামনা করা। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা আখেরাতের জিন্দেগীকে অস্বীকার করে বসে এবং বলে, এসব হলো নিতান্ত পুরাতন কথা, আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও এসব কথা বলা হয়েছে। অথচ যুগের পর যুগ অতিবাহিত হলো, শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেলে; কিন্তু কোনো মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করতে দেখা যায়নি। এতএব, আখেরাতের কথা নতুন কিছু নয়, বরং পুরাতন কথা। কাফেরদের এসব অন্যায় কথার জবাবেই তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতের বিশেষ সতর্কবাণী।

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ : কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : [হে রাসূল!] আপনি ঘোষণা করুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছে, তা লক্ষ্য করে দেখ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু জাতি উন্নতি অগ্রগতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে, কিন্তু তারা ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ। তারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনি। আখেরাতকে অস্বীকার করেছে, তাই তাদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণতি তারা ভোগ করেছে, তাদের নির্মিত আকাশচুম্বি ইমারতগুলোর ধ্বংসাবশেষ আজো রয়েছে পৃথিবীতে বিদ্যমান এবং এসব ধ্বংসাবশেষ পরিণামদর্শী মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। তাই আলোচ্য আয়াতে আখেরাতকে অস্বীকারকারী কাফেরদেরকে পূর্বকালের অবাধ্য লোকদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে-سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর।"

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হয়, তবে এমন ভ্রমণ ইবাদতে পরিণত হয়। কিন্তু যদি শুধু আনন্দ লাভের জন্যে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হয়, তবে তা মোটেই ইবাদত নয়।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআন যখন নাজিল হয়েছে, তখন যেভাবে কাফেররা আখেরাতকে অবিশ্বাস করত, ঠিক তেমনি এ আধুনিক কালে অনেক লোকই দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই সবকিছু মনে করে, আর আখেরাতকে শুধু ভুলে যায় না; বরং অবিশ্বাসও করে। তাদের উদ্দেশ্যেও পবিত্র কুরআনের একই নির্দেশ- পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের

শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করে দেখ। ফেরাউন, নমরূদ, শাদ্দাদের দৃষ্টান্ত যদি চোখে না-ও পড়ে, তবে হিটলার মুসোলিনী এবং [সাবেক] সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকেই দৃষ্টিপাত কর এবং আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কুরআন যে মহাসত্যের ঘোষণা দিয়েছে, তার বাস্তবায়ন লক্ষ্য কর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর যুগের কাফেরদের উদ্দেশ্যে এ মর্মে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করার পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। ইতঃপূর্বে যেসব জাতি কোনো নবী-রাসূলকে অস্বীকার করেছে, তারা আল্লাহ পাকের আজাবে ধ্বংস হয়েছে। এতএব, তোমরা এমন অন্যায় থেকে বিরত হও।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ : প্রিয়নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা : বর্ণিত আছে, মক্কার কোনো কোনো কাফের প্রিয়নবী ﷺ -কে শুধু যে অস্বীকার করত তাই নয়; বরং তাঁর প্রতি বিদ্রূপও করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, হে রাসূল! কাফেদের এ অন্যায় আচারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। যেহেতু কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে প্রিয়নবী ﷺ অত্যন্ত উদগ্রীব থাকতেন, তাই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না, হেদায়েত যদি তাদের নছীবে না থাকে, তবে তাদের জন্য করার কিছুই নেই।

দ্বিতীয়ত তারা আপনার প্রতি যে বিদ্রূপ করে বা যড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, এ ব্যাপারেও আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। কেননা তাদের শাস্তি অবধারিত, এ অন্যায়ের শাস্তি তারা অবশ্যই ভোগ করবে।

দুরাত্মা কাফেরদের ঔদ্ধত্য : কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হলে তাদের কর্তব্য ছিল সাবধান হওয়া কিন্তু সেই স্থলে তাদের ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে–وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ অর্থাৎ "তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল সেই প্রতিশ্রুত কিয়ামত কবে আসবে?"

এটা নিঃসন্দেহে দুরাত্মা কাফেরদের চরম ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ পৃথিবীতে সত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে, ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝাবার জন্যে তথা জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করার জন্য বহু নিদর্শন বর্তমান রয়েছে। পৃথিবীর বুকে কত জাতি এসেছে এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ার কারণে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের উন্নতি এবং অধঃপতনের ঘটনাবলি ইতিহাসের সংরক্ষিত রয়েছে। যারা ভাগ্যবান তারা এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু যারা ভাগ্যাহত, তারা দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না। তাই কাফেরদের আস্ফালনের জবাবে ইরশাদ হয়েছে– قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ "[হে রাসূল, আপনি] ঘোষণা করুন, তোমরা যে বিষয়ে তাড়াহুড়া করছো বিচিত্র নয় যে, তা তোমাদের শিয়রেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

অর্থাৎ তোমরা যে আজাবকে ত্বরান্বিত করতে চাও তা অতি সত্বরই তোমাদের নিকট পৌঁছে যেতে পারে। তাফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেরদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দ্বিতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধেই তারা সেই আজাব সম্পর্কে টের পেয়েছে, যেখানে তাদের সত্তর জন নিহত হয়েছে এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছে। আখেরাতের কঠিন শাস্তি তো অপেক্ষা করছেই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কখনো কখনো অবাধ্য কাফেরদের শাস্তি বিধানে বিলম্ব করা হয়, তা আদৌ শাস্তির ঘোষণার অসত্যতার প্রমাণ নয়; বরং আল্লাহ পাকের একান্ত করুণার কারণেই তিনি অপরাধীকে আত্ম সংশোধনের সুযোগ দিয়ে থাকেন। এজন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে মানুষ মাত্রই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু হতভাগা কাফেররা তার পরিবর্তে আজাবকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়াসী হয়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (রা.) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে যে আজাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো বদরের যুদ্ধের শাস্তি, যে যুদ্ধে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে বিজয় দান করেছেন এবং কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিখে সম্ভবপর। এতে কোনো যুক্তিগত জটিলতা নেই। যৌক্তিক সম্ভাব্যতার সাথে এর অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা পয়গম্বরগণের ও ঐশী কিতাবাদির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। বর্ণনাকারীর উপর সংবাদের বিশুদ্ধ ও প্রমাণ্য হওয়া নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা স্বয়ং কুরআন এবং কুরআনের সত্যবাদিতা অনস্বীকার্য। এমন কি, বনী ইসরাঈলের আলেমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদূরপরাহত, কুরআনপাক সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলা বাহুল্য, যে আলেমদের মতবিরোধে বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরি। এতে বুঝা গেল যে, কুরআন সর্বাধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আপনার ফয়সালা করবেন। আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। কেননা আল্লাহ সত্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাতো নিশ্চিত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

سِيْرُوْا : সীগাহ বহছ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَيْرٌ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা বিচরণ কর।

لَاتَحْزَنْ : সীগাহ বহছ واحد مذكر حاضر نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার حُزْنٌ মূলবর্ণ (ح - ز - ن) জিনস صحيح অর্থ– আপনি দুঃখ করবেন না।

تَسْتَعْجِلُوْنَ : সীগাহ বহছ جمع مذكر غائب مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِعْجَالٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাড়াহুড়া করছ।

تُكِنُّ : সীগাহ বহছ واحد مؤنث غائب مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِكْنَانٌ মূলবর্ণ (ك - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তা লুক্কায়িত রাখে।

يُعْلِنُوْنَ : সীগাহ বহছ جمع مذكر غائب مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْلَانٌ মূলবর্ণ (ع - ل - ن) জিনস صحيح অর্থ– তা প্রকাশ্যে করে থাকে।

يَقْضِىْ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قَضَاءٌ মূলবর্ণ (ق - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি মীমাংসা করবেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : এখানে وَاوْ টি হলো اِسْتِئْنَافِيَه আর يَقُوْلُوْنَ হলো ফে'ল ও ফায়েল, আর مَتٰى হলো اسم استفهام যা ظرفيه زمانيه -এর ভিত্তিতে নসবের স্থানে হয়েছে। এটা উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়ে خبر مقدم আর هٰذَا হলো مبتدا موخر আর اَلْوَعْدُ হলো بدل আর اِنْ হলো شرطية আর كُنْتُمْ হলো ফে'লে শর্ত যা ফেলে নাকেস ও তার যমীর হলো اسم ناقص আর صَادِقِيْنَ হলো خبر ناقص আর جواب شرط উহ্য রয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড : পৃ. ৫৪৭]

৭৯. অতএব, আল্লাহর উপর নির্ভর করুন; নিঃসন্দেহে আপনি প্রকাশ্য সত্যের উপর রয়েছেন।	فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۖ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿٧٩﴾
৮০. আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না এবং বধিরদেরকেও আপনার আহ্বান শুনাতে সক্ষম হবেন না যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।	اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. আর আপনি অন্ধদেরকে তাদের গোমরাহি হতে পথ প্রদর্শনকারী নন; আপনি কেবল তাদেরকে শুনাতে পারেন যারা আমার নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, অনন্তর তারাই আত্মসমর্পণকারী।	وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۗ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾
৮২. আর যখন তাদের প্রতি ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে, তখন আমি তাদের জন্য জমিন হতে এক জন্তু বের করব, সে তাদের সাথে কথা বলবে এজন্য যে, (কাফের) লোকেরা আমার (অর্থাৎ, আল্লাহর) নিদর্শনসমূহকে বিশ্বাস করত না।	وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. আর যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের এক একটি দলকে একত্রিত করব, যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করত, অতঃপর তাদেরকে সারিবদ্ধ করে দেওয়া হবে।	وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৯. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ অতএব, আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ নিঃসন্দেহে আপনি প্রকাশ্য সত্যের উপর রয়েছেন।

৮০. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ এবং বাধিদেরকেও শুনাতে সক্ষম হবেন না الدُّعَآءَ আপনার আহ্বান اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।

৮১. وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ আর আপনি অন্ধদেরকে পথপ্রদর্শনকারী নন عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ তাদের গোমরাহী হতে اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا আপনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারেন مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ অনন্তর তারাই আত্মসমর্পণকারী।

৮২. وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ আর যখন তাদের প্রতি ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে اَخْرَجْنَا لَهُمْ তখন আমি তাদের জন্য বের করব دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ জমিন হতে এক জন্তু تُكَلِّمُهُمْ সে তাদের সাথে কথা বলবে যে, اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহকে বিশ্বাস করত না।

৮৩. وَيَوْمَ نَحْشُرُ আর যেদিন আমি একত্রিত করব مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের এক একটি দলকে مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করত فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ অতঃপর তাদেরকে সারিবদ্ধ করে দেওয়া হবে।

৮৪. এমনকি যখন তারা সমুপস্থিত হবে তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আমার নিদর্শনগুলোকে অবিশ্বাস করেছিলে? অথচ তোমরা সেগুলোকে জ্ঞানের গণ্ডিতেও স্থান দাওনি, বরং আর কতকিছু কাজ করেছিলে।	حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. আর তাদের উপর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়ে গেল, এই কারণে যে, তারা অনাচার করেছিল, সুতরাং তারা কথাও বলতে পারবে না।	وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. তারা কি এর প্রতি লক্ষ্য করেনি যে, আমি রাত্রিকে সৃষ্টি করেছি, যেন মানুষ তাতে বিশ্রাম করে এবং দিবস সৃষ্টি করেছি, যেন তাতে দেখাশোনা করে; নিঃসন্দেহে এর মধ্যে বড় প্রমাণ রয়েছে তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে।	اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. আর যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন আসমান ও জমিনে যত কিছু রয়েছে, সকলেই ঘাবড়ে যাবে, কিন্তু তাকে ব্যতীত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন; এবং সকলেই তাঁর সম্মুখে অবনমিত হয়ে হাজির থাকবে।	وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۭ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৪. حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْ এমনকি যখন তারা সমুপস্থিত হবে قَالَ তখন আল্লাহ বলবেন اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ তোমরা কি আমার নিদর্শনগুলোকে অবিশ্বাস করেছিলে? وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا অথচ তোমরা সে গুলোকে জ্ঞানের গণ্ডিতেও স্থান দাও নি اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ বরং আরও কতকিছু কাজ করছিলে।

৮৫. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ আর তাদের উপর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়ে গেল بِمَا ظَلَمُوْا এ কারণে যে, তারা অনাচার করেছিল فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ সুতরাং তারা কথাও বলতে পারবে না।

৮৬. اَلَمْ يَرَوْا তারা কি এর প্রতি লক্ষ্য করেনি যে, اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ আমি রাত্রিকে সৃষ্টি করেছি لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ যেন মানুষ তাতে বিশ্রাম করে وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا এবং দিবস সৃষ্টি করেছি যেন তাতে দেখাশোনা করে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ নিঃসন্দেহে এর মধ্যে বড় প্রমাণ রয়েছে لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে।

৮৭. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ আর যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে فَفَزِعَ তখন সকলেই ঘাবড়ে যাবে مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ আসমান ও জমিনে যতকিছু রয়েছে اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ এবং সকলেই তার সম্মুখে আবনমিত হয়ে হাজির থাকবে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۭ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۭ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٨﴾	৮৮. এবং তুমি পর্বতসমূহকে এমন অবস্থায় দেখছ যাতে তোমার মনে হচ্ছে যে, তা টলবে না, অথচ (সেদিন) তা মেঘরাশির ন্যায় উড়ে বেড়াবে; এটা হবে আল্লাহর কাজ, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে মজবুত করে বানিয়েছেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত রয়েছেন।
مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾	৮৯. যে ব্যক্তি নেকী নিয়ে আসবে, বস্তুত সে তদপেক্ষা উত্তম (বিনিময়) প্রাপ্ত হবে এবং তারা সেদিন ভীষণ আতঙ্ক হতে নিরাপদে থাকবে।
وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ۭ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾	৯০. আর যারা পাপ (কুফর) নিয়ে আসবে, তাদেরকে অধোমুখে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে (বলা হবে); তোমাদেরকে তো ঐ সমস্ত কাজেরই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যা তোমরা করতে।
اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۡ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾	৯১. (আপনি বলে দিন,) আমি তো কেবল এই আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, আমি এই (মক্কা) শহরের (প্রকৃত) মালিকের ইবাদত করতে থাকি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন, আর (কেনই বা তাঁর ইবাদত করব না,) সমস্ত বস্তু তাঁরই জন্য, আর আমাকে এ হুকুম (-ও) দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৮. وَتَرَى الْجِبَالَ এবং তুমি পর্বত সমূহকে এমন অবস্থায় দেখছ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً যাতে তোমার মনে হচ্ছে যে, তা টলবে না وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ অথচ তা মেঘরাশির ন্যায় উড়ে বেড়াবে صُنْعَ اللّٰهِ এটা হবে আল্লাহর কাজ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ যিনি প্রত্যেক বস্তুকে মজবুত করে বানিয়েছেন اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত রয়েছেন।

৮৯. مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ যে ব্যক্তি নেকী নিয়ে আসবে فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا বস্তুত : সে তদপেক্ষা উত্তম (বিনিময়) প্রাপ্ত হবে وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ এবং তারা সেদিন ভীষণ আতঙ্ক হতে নিরাপদে থাকবে।

৯০. وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ আর যারা পাপ (কুফর) নিয়ে আসবে فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ তাদেরকে আধোমুখে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদেরকে ঐ সমস্ত কাজেরই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যা তোমরা করতে।

৯১. اِنَّمَآ اُمِرْتُ আমি তো কেবল এই আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ আমি এই শহরের (প্রকৃত) মালিকের ইবাদত করতে থাকি الَّذِيْ حَرَّمَهَا যিনি একে সম্মানিত করেছেন وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ আর সমস্ত বস্তু তাঁরই জন্য وَّاُمِرْتُ আর আমাকে এ হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

৯২. আর আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন কুরআন পড়ে পড়ে শুনাই, অতঃপর যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করবে, সে নিজেরই জন্য সৎপথে আসবে, আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে, আপনি তাকে বলে দিন, আমি তো শুধু ভয় প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. আর আপনি তাকে (এটাও) বলে দিন যে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য, তিনি শীঘ্রই তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তখন তোমরা তা চিনতে পারবে এবং আপনার প্রতিপালক ঐ সমস্ত কার্য সম্বন্ধে গাফিল নন যা তোমরা করছ।	وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯২. وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ আর (এটাও) আদিষ্ট যে, আমি যেন কুরআন পড়ে পড়ে শুনাই فَمَنِ اهْتَدٰى অতঃপর যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করবে فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ সে নিজেরই জন্য সৎপথে আসবে وَمَنْ ضَلَّ আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে فَقُلْ আপনি তাকে বলে দিন اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ আমি তো শুধু ভয় প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৯৩. وَقُلِ আর বলে দিন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ তিনি শীঘ্রই তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শন সমূহ দেখাবেন فَتَعْرِفُوْنَهَا তখন তোমরা তা চিনতে পারবে وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ আপনার রব ঐ সমস্ত কাজ সম্বন্ধে গাফিল নন যা তোমরা করছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সমগ্র মানব জাতির প্রতি রাসূলে কারীম ﷺ -এর স্নেহ, মমতা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আল্লাহ্‌র পয়গাম শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম কবুল না করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারও সন্তান তার কথা অমান্য করে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাই কুরআন পাক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে وَلَا تَحْزَنْ এবং وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ বাক্যসমূহ এই সান্ত্বনা প্রদান সম্পর্কিত শিরোনামই ছিল। আলোচ্য আয়াতেও সান্ত্বনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবুল করেনি, তাতে আপনার কোনো দোষ ও ত্রুটি নেই, যদ্দরুন আপনি দুঃখিত হবেন; বরং তারা কবুল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে। (এক) তারা সত্য কবুল করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ। মৃতদেহ কারও কথা শুনে লাভবান হতে পরে না। (দুই) তাদের উদাহরণ বধিরের মতো, যে বধির হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। (তিনি) তারা অন্ধের মতো। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে।

إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون অর্থাৎ আপনি তো কেবল তাদেরকে শোনাতে পারেন, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে আওয়াজ পৌঁছা নয়; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কুরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিরতারূপে ব্যক্ত করেছেন। আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে আয়াতের এই বাক্যে যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ পৌঁছানোই হতো, তবে কুরআনের এই উক্তি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বিরোধী হয়ে যেত। কেননা কাফেরদের কানে আওয়াজ পৌঁছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জওয়াব দেওয়ার প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখানে ফলদায়ক শ্রবণ বোঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, মৃতরা যদি কোনো সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কবুলও করতে চায়, তবে এটা তাদের জন্য উপকারী নয়। কেননা তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর বরযখ ও হাশরের ময়দানে তো সব কাফেরই ঈমান ও সৎকর্মের বাসনা প্রকাশ করবে, কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারও কোনো কথা শুনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিশ্চুপ। মৃতরা কারও কথা শুনতে পারে কিনা, এটা স্বস্থানে লক্ষণীয় বিষয় বটে।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা : সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যেসব বিষয়ে পরস্পরে মতভেদ করেছেন, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কুরআন পাকে প্রথমত : এই সূরা নামলে এবং দ্বিতীয়ত সূরা রূমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিরে বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে : وما أنت بمسمع من في القبور অর্থাৎ যারা কবরস্থ হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেন না।

উক্ত আয়াতত্রয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোনো আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, মৃতরা শুনতে পারবে না; তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতা বলে তাদেরকে শোনাতে পরি না।

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সে জীবন উপযোগী জীবনোপকরণও তাঁরা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। আয়াত এই : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্যে প্রযোজ্য সাধারণ মৃতদের জন্যে নয়, তবে এর জওয়াব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভূতিও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকি থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্কে দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন। মৃত ব্যক্তিরও শ্রবণ করার ক্ষমতা থাকতে পারে. এই মতের প্রবক্তা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর উক্তিও একটি সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তিশীল। হাদীস এই : ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোনো মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন করে, অতঃপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ তা'আলা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জওয়াব দেয়।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জওয়াব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হলো। (এক) মৃতরা শুনতে পারে এবং (দুই) তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, শুনিয়ে দেন। এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ তা'আলা মৃতের আত্মা ফেরত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জওয়াব দেওয়ার শক্তি দান করেন। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, মৃতরা সেগুলো শুনবে কিনা। তাই ইমাম গাযযালী ও আল্লামা সুবকী (র.) প্রমুখের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সহীহ্ হাদীস ও উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথা-বার্তা শুনে, কিন্তু এর কোনো প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতরা এক সময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে এবং অন্য সময় শোনতে পারে না। এটাও সম্ভব যে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকেরা কথা শোনে না, অথবা কতক মৃত শোনে এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা সূরা নমল, সূরা রূম ও সূরা ফাতিরের আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন। তাই যে যে ক্ষেত্রে সহীহ্ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে, অকাট্যরূপে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও সুযোগ নেই।

ভূগর্ভের জীব কি, কোথায় এবং কবে নির্গত হবে : মুসনাদে আহমদে হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, ২. ধূম্র নির্গত হওয়া, ৩. অদ্ভুত একটি জীবের আবির্ভাব হওয়া, ৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া, ৫. হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ, ৬. দাজ্জাল, ৭. তিনটি চন্দ্র গ্রহণ (এক) পশ্চিম, (দুই) পূর্বে এবং (তিন) আরব উপদ্বীপে; ৮. এক অগ্নি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্যে অবস্থান করবে, অগ্নিও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূগর্ভে থেকে একটি জীব নির্গত হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। دَابَّةً শব্দের تَنْوِيْن এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্তুটি অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট হবে। আরও জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জন্তুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মোতাবেক জন্মগ্রহণ করবে না; বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। এই হাদীস থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর আবূ দাউদ তায়ালিসির বরাত দিয়ে হযরত তালহা ইবনে-ওমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মস্তকের মাটি ঝড়তে ঝড়তে মসজিদে-হারামে কৃষ্ণ প্রস্তর ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পৌঁছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জ্বল করে দেবে। এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফেরের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন এঁকে দেবে। কেউ তারা নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনবে। (ইবনে-কাসীর) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে একটি অবিস্মরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য উপরে উঠার পর ভূগর্ভের জীব নির্গত হবে। এই আলামতদ্বয়ের মধ্যে যে কোনো একটি প্রকাশ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।

–[ইবনে-কাসীর]

শায়খ জামালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সময় 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' -এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোনো কাফের ইসলাম গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। –(মাযহারী) এ স্থলে ইবনে-কাসীর প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত

উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকাররমায় এর আবির্ভাব হবে, অতঃপর সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। সে কাফের ও মুমিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়ের উপরই বিশ্বাস রাখা দরকার। এর অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরি নয় এবং তাতে কোনো উপকারও নেই।

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে কেউ কেউ বলেন যে, কুরআনে উল্লিখিত বাক্যটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ এই বাক্যটি সে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই : অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করত না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সে সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনত : ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান বসরী ও কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে। –[ইবনে-কাসীর]

فَهُمْ يُوزَعُونَ এ শব্দটি وَزْعٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাধা দেওয়া। অর্থাৎ অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে, যাতে পেছনে পড়া লোক তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ وَزْعٌ শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেওয়া। অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ্; বিশেষত : যখন কেউ চিন্তা-ভাবনা ও বোঝা-শোনার চেষ্টা না করেই মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, যারা চিন্তা-ভাবনা করা সত্ত্বেও সত্যের সন্ধান পায় না এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ কিছুটা লঘু। তবে তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাওহীদে মিথ্যারোপ করা তাদেরকে কুফর, পথভ্রষ্টতা ও চিরস্থায়ী আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ এগুলো এমন জাজ্বল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ভ্রান্তি ক্ষমা করা হবে না।

فَفَزِعَ : وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ ..... শব্দের অর্থ অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়া। অন্য এক আয়াতে এ স্থলে فَزِعَ শব্দের পরিবর্তে صَعِقَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে সিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, সিঙ্গার ফুক দেওয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির উদ্বিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। কাতাদাহ্ প্রমুখ তাফসীরকার এই আয়াতকে দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যারপর সকল মৃত পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীতবিহ্বল অবস্থায় উত্থিত হবে। কেউ কেউ বলেন যে, তিন বার সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নাশর কায়েম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু কুরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। (কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) ইবনে মোবারক হাসান বসরী (র.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। –[কুরতুবী]

إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ : উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীতবিহ্বল হবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশরে পুনরুজ্জীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অস্থির হবেন না। –(কুরতুবী) সাঈদ ইবনে জুবায়র ও বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি বাঁধা অবস্থায় আরশের চার পার্শ্বে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন, পয়গম্বরগণ আরও উত্তমরূপে এই শ্রেণিভুক্ত। কারণ তাঁদের জন্যে রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর উপর নবুয়তের মর্যাদাও। –[কুরতুবী]

সূরা যুমারে আছে وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ এখানে فَزِعَ শব্দের পরিবর্তে صَعِقَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সংজ্ঞা হারানো। এখানে সংজ্ঞা হারিয়ে মরে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। এখানেও إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী হয়জন ফেরেশতা বুঝানো

হয়েছে ; তাঁরা শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন না। পরবর্তী সময়ে তাঁরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। যে সকল তাফসীরবিদ فَزِعَ ও صَعِقَ কে একই অর্থ ধরেছেন, তাঁরা সূরা যুমারের অনুরূপ এখানে ব্যতিক্রম দ্বারা নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে বুঝিয়েছেন। যাঁরা পৃথক পৃথক অর্থে ধরেছেন তাঁদের মতে শহীদগণ فَزِعَ তথা অস্থিরতা থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত হবেন যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ : উদ্দেশ্য এই যে, পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘ-মালাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর শুরু ও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সে বস্তু যখন কোনো একদিকে চলমান হয় তখন তা যতই দ্রুতগতি সম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিশীল মনে হয়। সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন কাল মেঘে সবাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। এরূপ কাল মেঘ এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। এই মেঘের গতিশীলতা দর্শক যখন বুঝতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত উন্মুক্ত করে দূরে চলে যায়।

মোটকথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তাফসীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, এই দুইটি অবস্থা দুই সময়কার। পাহাড়কে দেখে প্রত্যেক দর্শক যখন মনে করে যে, এই পাহাড় স্বস্থান থেকে কখনো টলবে না, অচল হওয়া সেই সময়কার। এবং تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ কথাটি কিয়ামত দিবসের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন পাহাড়সমূহের অবস্থা কুরআন পাকে বিভিন্ন রূপ বর্ণিত হয়েছেঃ (১) চূর্ণ-বিচূর্ণ ও প্রকম্পিত হওয়া হবে পাহাড়সহ সম্পূর্ণ পৃথিবীর অবস্থা।

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا এবং إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا

(২) পাহাড়ের বিশাল শিলাখণ্ডের ধুনো করা তুলার ন্যায় হয়ে যাওয়া وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ এটা তখন হবে, যখন উপর থেকে আকাশও গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে পাহাড় তুলার ন্যায় উপরে উঠে যাবে, উপর থেকে আকাশ নিচে পতিত হবে এবং উভয়ে মিলিত হয়ে যাবে। يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (৩) পাহাড়সমূহ ধুনো করা তুলার মতো একত্রিত হওয়ার পরিবর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (৪) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে যাওয়া قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (৫) চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধূলিকণার ন্যায় সারা বিশ্বে বিস্তৃত পাহাড়সমূহকে বাতাস উপরে নিয়ে যাবে। তখন যদিও তা মেঘমালার ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন হবে; কিন্তু দর্শক তাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পাবে وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ তন্মধ্যে কতক অবস্থা শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকারের সময় হবে এবং কতক দ্বিতীয় ফুকারের পরে হবে। তখন ভূপৃষ্ঠকে সমতল স্তরের মতো করে দেওয়া হবে। তাতে কোনো গুহা, পাহাড়, দালান কোঠা ও বৃক্ষ থাকবে না। قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (কুরতুবী রূহুল মা'আনী)।
وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ - صُنْعَ শব্দের অর্থ কারিগরি বিদ্যা, শিল্প। أَتْقَنَ শব্দটি إِتْقَانٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো কিছুকে মজবুত ও সংহত করা। বাহ্যত : এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ দিবারাত্রির পরিবর্তন এবং সিঙ্গার ফুৎকার থেকে নিয়ে হাশর-নাশর পর্যন্ত সব অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে, এগুলো মোটেই বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা এগুলোর স্রষ্টা কোনো সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা ফেরেশতা নয় : বরং বিশ্বজাহানের পালনকর্তা। যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً আয়াতের সাথে করা যায়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, পাহাড়সমূহের এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল, কিন্তু বাস্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়াও মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেননা এটা বিশ্বজাহানের পালনকর্তার কারিগরি, যিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا এটা হাশর-নাশর ও হিসাব নিকাশের পরবর্তী পরিণতির বর্ণনা, حَسَنَة বলে এখানে কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বোঝানো হয়েছে (কাতাদার উক্তি)। কেউ কেউ সাধারণ ইবাদত ও আনুগত্য অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে তার কর্মের চাইতে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। বলাবাহুল্য, সৎকর্ম তখনই সৎকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত ঈমান বিদ্যমান থাকে। 'উৎকৃষ্টতর প্রতিদান' বলে জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামত এবং আজাব ও যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরমুক্তি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, এক নেকির প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। –[মাযহারী]

وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ – فَزَع বলে প্রত্যেক বড় বিপদ ও পেরেশানি বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক আল্লাহভীরু পরহেজগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয়; যেমন কুরআন পাক বলে اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ অর্থাৎ পালনকর্তার আজাব থেকে কেউ নিশ্চিন্ত ও ভাবনামুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ কারণেই পয়গম্বরগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও ওলীগণ সদাসর্বদা ভীত ও কম্পিত থাকতেন। কিন্তু সেদিন হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হলে যারা সৎকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে, তারা সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে।

رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে بَلْدَة বলে মক্কা মুকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। এখানে বিশেষ করে মক্কার পালনকর্তা বলার কারণ মক্কার মাহাত্ম্য ও সম্মানিত হওয়ার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা। حَرَّمَ শব্দটি تَحْرِيْم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাধারণ সম্মানও হয়ে থাকে। এই সম্মানের কারণে মক্কা ও পবিত্র ভূমির যেসব বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন কেউ হেরেমে আশ্রয় নিলে সে নিরাপদ হয়ে যায়। হেরেমে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও হত্যাকাণ্ড সম্পাদন বৈধ নয়। হেরেমের ভূমিতে শিকার বধ করাও জায়েজ নয়। বৃক্ষ কর্তন করা জায়েজ নয়। এসব বিধানের কতকাংশ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا আয়াতে, কতকাংশ সূরা মায়েদার শুরুতে এবং কতকাংশ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَتَوَكَّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَوَكُّلٌ মূলবর্ণ (و ـ ك ـ ل) জিনস مثال واوى অর্থ– অতঃএব আপনি নির্ভর করুন।

لَايُوْقِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْقَانٌ মূলবর্ণ (ى ـ ق ـ ن) জিনস مثال يائى অর্থ– তারা বিশ্বাস করত না।

يُوْزَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার وَزْعٌ মূলবর্ণ (و ـ ز ـ ع) জিনস مثال واوى অর্থ– তাদেরকে সারিবদ্ধ করে দেওয়া হবে।

لَمْ تُحِيْطُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم বাব اِفْعَالْ মাসদার اِحَاطَةٌ মূলবর্ণ (ح ـ و ـ ط) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা স্থান দাওনি।

لَايَنْطِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نُطْقٌ মূলবর্ণ (ن ـ ط ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা কথাও বলতে পারবে না।

لَمْ يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز لام) অর্থ– তারা লক্ষ্য করেনি।

لِيَسْكُنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার سُكُوْنٌ মূলবর্ণ (س ـ ك ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– যেন মানুষ বিশ্রাম করে।

دَاخِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ فَتَحَ বাব دَخْرٌ মাসদার (د ـ خ ـ ر) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– অবনমিত হয়ে।

جَامِدَةً : সীগাহ واحد مؤنث اسم فاعل বহছ نَصَرَ বাব جُمُوْدٌ মাসদার (ج ـ م ـ د) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– তা টলবে না, জমাটবদ্ধ, অনড়।

تَمُرُّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب مضارع معروف বহছ نَصَرَ বাব مُرُوْرٌ মাসদার (م ـ ر ـ ر) মূলবর্ণ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– উড়ে বেড়াবে।

فَكُبَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب ماضى مجهول বহছ نَصَرَ বাব كَبٌّ মাসদার (ك ـ ب ـ ب) মূলবর্ণ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

فَتَعْرِفُوْنَهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر مضارع معروف বহছ ضَرَبَ বাব مَعْرِفَةٌ মাসদার (ع ـ ر ـ ف) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– তখন তোমরা তা চিনতে পারবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ : এখানে صُنْعَ টি মাফউলে মুতলাক তার পূর্ববর্তী مضمون جمله-এর তাকীদ। আর মাসদার কে ফায়েলের দিকে ইজাফত করা হয়েছে আর الَّذِىْ হলো اللّٰهِ শব্দের সিফত। আর اَتْقَنَ বাক্যটি সেলাহ হয়েছে। كُلَّ شَىْءٍ হলো اَتْقَنَ-এর মাফউল। اِنَّهٗ-এর إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর ه হলো اسم ان এবং خَبِيْرٌ হলো خبر إِنَّ আর بِمَا টা خَبِيْرٌ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর تَفْعَلُوْنَ বাক্যটি مَا মওসূলের সেলা হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড : পৃ. ৫৫৯]

سُوْرَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ

সূরা কাসাস

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৮৮, রুকূ'– ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. ত্বোয়া-সীন-মীম।	طٰسٓمّٓ ﴿١﴾
২. এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের।	تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾
৩. আমি আপনাকে মূসা ও ফেরাউনের কিছু ঘটনা যথাযথভাবে বর্ণনা করে শুনাচ্ছি তাদের জন্য যারা ঈমান আনে।	نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣﴾
৪. ফেরাউন দেশের মধ্যে অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেখেছিল, সে তাদের মধ্যকার একটি দলের শক্তি খর্ব করে রেখেছিল, তাদের পুত্র-সন্তাদেরকে হত্যা করত এবং তাদের স্ত্রীলোকদেরকে জীবিত থাকতে দিত; বস্তুত সে বড়ই অনিষ্টকারী ছিল।	اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. طٰسٓمّٓ ত্বোয়া, সীন-মীম।

২. تِلْكَ এ اٰيٰتُ আয়াত গুলো الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ সুস্পষ্ট কিতাবের।

৩. نَتْلُوْا عَلَيْكَ আমি আপনাকে বর্ণনা করে শুনাচ্ছি مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ মূসা ও ফেরাউনের কিছু ঘটনা بِالْحَقِّ যাথাযথভাবে لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ তাদের জন্য যারা ঈমান আনে।

৪. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ ফেরাউন দেশের মধ্যে অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا এবং তথাকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেখেছিল يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ সে তাদের মধ্যকার একটি দলের শক্তি খর্ব করে রেখেছিল يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ এবং তাদের স্ত্রীলোকদেরকে জীবিত থাকতে দিত اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ বস্তুত ঃ সে বড়ই অনিষ্টকারী ছিল।

৫. আর আমার এ ইচ্ছা ছিল যে, দেশে যাদের শক্তি খর্ব করা হচ্ছিল আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি এবং তাদেরকে (ধর্মীয়) নেতা করে দেই এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী করে দেই;	وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۝٥
৬. এবং তাদেরকে দেশের শাসনক্ষমতা দান করি, আর ফেরাউন ও হামান এবং তাদের অনুবর্তীগণকে তাদের (বনী ইসরাঈলদের) পক্ষ হতে সেই ঘটনা (ঘটিয়ে) দেখাই, যা হতে তারা আত্মরক্ষা করত।	وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝٦
৭. আর আমি মূসার মাতাকে গায়বি নির্দেশ প্রদান করলাম, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাক, অতঃপর যখন তার সম্বন্ধে তোমার আশঙ্কা হবে, তখন তাকে (সিন্দুকে ভরে) নদীতে ফেলে দিও, অতঃপর (নিমজ্জিত হওয়ার) আশঙ্কাও করো না এবং বিষণ্ণও হয়ো না, অবশ্যই আমি তাকে আবার তোমারই নিকটে ফিরিয়ে আনব এবং (পরে) আমি তাকে রাসূল বানিয়ে দেব।	وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٧
৮. অতঃপর (নদীতে ফেলে দেওয়ার পর) ফেরাউনের লোকেরা তাঁকে উঠিয়ে নিল– যেন তিনি তাদের জন্য শত্রু এবং চিন্তার কারণ হন; নিঃসন্দেহে ফেরাউন ও হামান এবং তাদের অনুবর্তীরা বড় ভুলকারী ছিল (কেননা শত্রু পালন করেছে)।	فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ۗ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. وَنُرِيْدُ আর আমার এই ইচ্ছা ছিল যে, اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ দেশে যাদের শক্তি খর্ব করা হচ্ছিল وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً এবং তাদেরকে (ধর্মীয়) নেতা করে দেই الْوٰرِثِيْنَ এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী করে দেই।

৬. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ এবং তাদেরকে দেশের শাসন ক্ষমতা দান করি وَنُرِىَ আর সে ঘটনা দেখাই فِرْعَوْنَ ফেরাউন وَهَامٰنَ ও হামান وَجُنُوْدَهُمَا এবং তাদের অনুবর্তীগণকে مِنْهُمْ তাদের পক্ষ থেকে مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ যা হতে তারা আত্মরক্ষা করত।

৭. وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى আর আমি মূসার মাতাকে গায়বি নির্দেশ প্রদান করলাম اَنْ اَرْضِعِيْهِ তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাক فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ অতঃপর যখন তার সম্বন্ধে তোমার আশঙ্কা হবে فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ তখন তাকে (সিন্দুকে ভরে) নদীতে ফেলে দিও وَلَا تَخَافِىْ অতঃপর (নিমজ্জিত হওয়ার) আশঙ্কা করো না وَلَا تَحْزَنِىْ এবং বিষণ্ণ হয়ো না اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ অবশ্যই আমি তাকে আবার তোমারই নিকটে ফিরিয়ে আনব وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ এবং (পরে) আমি তাকে রাসূল বানিয়ে দেব।

৮. فَالْتَقَطَهٗٓ অতঃপর তাঁকে উঠিয়ে নিল اٰلُ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের লোকেরা لِيَكُوْنَ لَهُمْ যেন তিনি তাদের জন্য হন عَدُوًّا শত্রু وَّحَزَنًا ও চিন্তার কারণ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ নিঃসন্দেহে ফেরাউন ও হামান وَجُنُوْدَهُمَا এবং তাদের অনুবর্তীরা كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ বড় ভুলকারী ছিল।

৯. এবং ফেরাউনের স্ত্রী বললেন, এই (শিশু)-টি আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী; একে হত্যা করো না, আশ্চর্য নয় যে, (বড় হয়ে) সে আমাদের কোনো উপকার করবে, কিংবা আমরা একে পুত্রই করে নেব, অথচ তারা (পরিণাম) বুঝতে পারেনি।	وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾
১০. আর মূসার মাতার অন্তর বিচলিত হয়ে পড়ল; সে মূসার অবস্থা প্রকাশ করে দিবারই উপক্রম করেছিল, যদি না আমি তাঁর অন্তরকে অটল রাখতাম (আমার প্রতিশ্রুতির উপর) বিশ্বাস করে থাকার প্রতি।	وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ۖ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠﴾
১১. আর তিনি মূসার ভগ্নীকে বললেন, মূসার একটু সন্ধান তো নাও, অনন্তর সে (রাজমহলে গিয়ে) তাদের অজ্ঞাতসারে মূসাকে দূর হতে দেখতে পেল,	وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۚ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١١﴾
১২. আর আমি পূর্ব হতেই মূসার পক্ষে ধাত্রীর দুগ্ধ প্রতিরুদ্ধ করে রেখেছিলাম, সুতরাং সে (মেয়েটি) বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন পরিবারের সন্ধান বলে দেব, যারা তোমাদের জন্য এই শিশুটির প্রতিপালন করবে আর তারা এই শিশুর মঙ্গল কামনা করবে।	وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ﴿١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ এবং ফেরাউনের স্ত্রী বললেন قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ এই (শিশু) টি আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী لَا تَقْتُلُوْهُ একে হত্যা করো না عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ আশ্চর্য নয় যে, (বড় হয়ে) সে আমাদের কোনো উপকার করবে اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا কিংবা আমরা একে পুত্রই করে নিব وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অথচ তারা (পরিণাম) বুঝতে পারেনি।

১০. وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا আর মূসার মাতার অন্তর বিচলিত হয়ে পড়ল اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ সে মূসার অবস্থা প্রকাশ করে দিবারই উপক্রম করেছিল لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا যদি না আমি তাঁর অন্তর কে অটল রাখতাম لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (আমার প্রতিশ্রুতির উপর) বিশ্বাস করে থাকার প্রতি।

১১. وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ আর তিনি মূসার ভগ্নীকে বললেন قُصِّيْهِ মূসার একটু অনুসন্ধান তো নাও فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ অনন্তর সে (রাজমহলে গিয়ে) মূসাকে দূর হতে দেখতে পেল وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ তাদের অজ্ঞাতসারে।

১২. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ আর আমি মূসার পক্ষে ধাত্রীর দুগ্ধ প্রতিরুদ্ধ করে রেখেছিলাম مِنْ قَبْلُ পূর্ব হতেই فَقَالَتْ সুতরাং সে (মেয়েটি) বলল هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান বলে দিব يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ যারা তোমাদের জন্য এই শিশুটির প্রতিপালন করবে وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ আর তারা এই শিশুর মঙ্গল কামনা করবে।

১৩. (এই উপায়ে) আমি মূসাকে তাঁর মায়ের কাছে প্রত্যর্পণ করলাম যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং যেন চিন্তান্বিত না থাকে, আর যেন এ কথা জেনে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস রাখে না।

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝١٣

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ আমি মূসাকে তাঁর মায়ের কাছে প্রত্যর্পণ করলাম كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا যাতে তার চক্ষু শীতল হয় وَلَا تَحْزَنَ এবং যেন চিন্তান্বিত না থাকে وَلِتَعْلَمَ আর যেন একথা জেনে নেয় যে, اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু আধিকাংশ লোক বিশ্বাস রাখেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা কাসাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সময় মক্কা ও জুহফা [রাবেগ]-এর মাঝখানে এই সূরা অবতীর্ণ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জুহফা অর্থাৎ রাবেগের নিকটে পৌছেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়ে বৈ কি! অতঃপর হযরত জিবরাঈলর (আ.) তাঁকে এই সূরা শুনালেন। এই সূরার শেষভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে মক্কা বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভুক্ত হবে। ইরশাদ হচ্ছে- اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ হযরত হাসান বসরী (র.), আতা (র.), তাউস (র.), ইকরামা (র.) বলেছেন, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মোকাতেল (র.) বলেছেন, এতে একটি আয়াত মাদানী রয়েছে। আয়াতটি এই -

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ .... لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ.

এ আয়াত নাজিল হয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -এর হিজরতের সময় 'জুহফা' নামক স্থানে। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কা শরীফে এবং জুহফার মধ্যস্থলে। -[রূহুল মা'আনী খ. ২০, পৃ. ৪১]

আল্লামা সুয়ূতি (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। ইবনে মরদূভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আহমদ, তাবারানী হযরত মাদীকারাব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট হাজির হয়ে বললাম, আমাদেরকে এ সূরাটি শুনিয়ে দিন, তখন তিনি বললেন, তোমরা বরং হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.)-এর নিকট যাও এবং তাঁর নিকট থেকে এ সূরা শ্রবণ কর! কেননা স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এ সূরা শিখিয়েছেন। -[তাফসীরে দুররুল মানসূর খ. ৫, পৃ. ১৩০]

এ সূরায় হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এতে কারূনের ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে। হযরত মূসা (আ.) কিভাবে দুশমনদের দেশ থেকে বের হয়ে মাদায়েনে পৌছলেন, যেখানে আল্লাহ পাকের নবী এবং তাঁর সঙ্গীগণ ছিলেন, হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহ পাক দুশমনের কবল থেকে কিভাবে রক্ষা করলেন এবং তাঁর সম্মান-মর্যাদা ও আরামের কি ব্যবস্থা করলেন, এ সূরায় তার বিবরণও স্থান পেয়েছে। এরপর যখন তিনি পুনরায় মিশরের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁকে নবুয়ত ও রেসালত প্রদানের মাধ্যমে ধন্য করলেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা নামলের প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের সত্যতার বর্ণনা রয়েছে। আর ঐ সূরার শেষে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ রয়েছে। এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার ঘোষণা দিয়েই শুরু করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : এ সূরার শুরুতেও পূর্বের সূরার ন্যায় হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে এবং পরে বিস্তারিত পরিসরে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর নবুয়তের প্রমাণ উপস্থাপন করা এবং তাঁর বিরোধীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা।

তৃতীয়ত : পূর্ববর্তী সূরা নামলে যেভাবে নবী রাসূলগণের ঘটনার বিবরণের পর তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে, এরপর আখেরাতের উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনার পর তাওহীদের দলিল প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এরপর আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাওহীদের আলোচনা দ্বারা সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, পূর্ববর্তী সূরায় যেভাবে রাণী বিলকিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এ সূরায় বিস্তারিতভাবে ফেরাউনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাণী বিলকিসের দেশ ফেরাউনের দেশ থেকে অনেক বড় ছিল; কিন্তু সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মু'জিযা দেখে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে; পক্ষান্তরে ফেরাউনের রাজত্ব রাণী বিলকিসের রাজত্ব থেকে ক্ষুদ্র ছিল, সে হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্ময়কর মু'জিযা সমূহ দেখেও ঈমান আনেনি। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হেদায়েত এবং পথভ্রষ্টতার সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়, যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন, সে-ই হেদায়েত লাভে ধন্য হয়। আর এজন্যেই পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতেহায় দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে– اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ "আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ গ্রহণের তাওফীক দান কর"।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, ফেরাউন ছিল ক্ষমতার মোহে মুগ্ধ আর কারূন ছিল ধন-সম্পদের মোহে আত্মহারা। এ দু'টি মোহ মানব চরিত্রকে কিভাবে কলুষিত করে এবং মানুষেকে কিভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, তার প্রকৃত চিত্র লক্ষ্য করা যায় এ দু'টি ঘটনায়।

পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবের সম্মুখে এ দু'টি চিত্র তুলে ধরেছে, যাতে করে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কেননা এ অত্যাধুনিক যুগেও এ দু'টি রোগই মানব চরিত্রকে কলুষিত করে রেখেছেন। এ দু'টি চারিত্রিক দুর্বলতা দূরীভূত করার মাধ্যমেই মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ ঘটে, মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর হয়। এ শিক্ষাই রয়েছে পবিত্র কুরআনে, আর এ কারণেই বিশ্ব সভ্যতার ক্রমবিকাশে পবিত্র কুরআনের অবদান অসামান্য।

হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী সমগ্র কুরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত আকারে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহাফে তাঁর কাহিনী হযরত খিজির (আ.)-এর সাথে বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে। এরপর সূরা ত্বা-হায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এর কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে, অতঃপর সূরা আল-কাসাসে এর পুনরালোচনা রয়েছে। সূরা ত্বা-হায় হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য বলা হয়েছে– وَلَقَدْ فَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ; ইমাম নাসায়ী (রা.) প্রমুখ হাদীসবিদ এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মুফতি শফী (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে এই বিবরণ সূরা ত্বা-হায় উল্লেখ করেছেন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের পূর্ণ আলোচনা, জরুরি মাসআলা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদি কিছু সূরা ত্বা-হায় এবং কিছু সূরা কাহাফে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লিখিত আয়াতসমূহের শুধু শব্দ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তাফসীর লিপিবদ্ধ করা হবে।

قَوْلُهٗ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً : এই আয়াতে বিধিলিপির মোকাবিলায় ফেরাউনী কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার কথাই নয়; বরং ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গকে চরম বোকা বরং অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালক সম্পর্কে স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফেরাউন শঙ্কিত হয়েছিল এবং যার কারণে বনী ইসরাঈলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আইন জারি করেছিল, তাকে আল্লাহ তা'আলা এই ফেরাউনেরই গৃহে তারই হাতে লালিত-পালিত করালেন এবং জননীর মনতুষ্টির জন্য তারই কোলে বিস্ময়কর পন্থায় পৌঁছিয়ে দিলেন। তদুপরি ফেরাউনের কাছ থেকে স্তন্যদানের খরচ, যা কোনো রেওয়ায়েতে দৈনিক এক দীনার বর্ণিত হয়েছে– আদায় করা হয়েছে। স্তন্যদানের এই বিনিময় একজন কাফের হরবীর কাছ থেকে তার সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এর বৈধতায়ও কোনোরূপ ত্রুটি নেই। যে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর

অত্যাচারে স্টীম রোলার চালানো হয়েছিল। অবশেষে তা তারই গৃহ থেকে আগ্নেয়গিরির এক ভয়ঙ্কর আভা হয়ে বিস্ফোরিত হলো এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা তাকে চর্মচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ مَا كَانُوا থেকে يَحْذَرُونَ পর্যন্ত আয়াতের সারমর্ম তা-ই।

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতের ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো নির্যাতিত বনী ইসরাঈলকে তাদের দেশের নেতৃত্ব দান করবেন এবং ফেরাউনের পরিবর্তে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের মর্জি হলো বনী ইসরাঈলকে তাদের দেশ তথা সিরিয়া ও মিশরের ক্ষমতা দান করবেন : আর ফেরাউন, হামান ও তাদের দলবল যে আশঙ্কা করছিল যে, বনী ইসলাঈলের কোনো ব্যক্তি ফেরাউন ও তার দলের ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেবে, আল্লাহ পাক তাদের সে আশঙ্কাকে বাস্তবে পরিণত করার ইচ্ছা করলেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে দেখিয়ে দিলেন, তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই, তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বদা অটুট থাকে।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনে এই প্রথম হামান নামটির উল্লেখ করা হলো। কথিত আছে যে, হামান ছিল ফেরাউনের প্রধানমন্ত্রী। ফেরাউনের যাবতীয় অন্যায় অনাচারে সে ছিল তার দক্ষিণ হস্ত, নিষ্ঠুর আচরণে হামান ছিল সিদ্ধহস্ত।

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর মতার নাম ছিল ইউখাবিজ বিনতে লাদী। আর লাদী ছিলেন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পুত্র। আলোচ্য আয়াতের أَوْحَيْنَا শব্দটি وَحْيٌ থেকেই নিষ্পন্ন, তবে এই ওহী নবুয়্যতের ওহী নয়, কেননা কোনো স্ত্রীলোক নবী হয়নি।

তাফসীরকার কাতাদা (রা.) এ জন্যে এ শব্দটির অর্থ করেছেন, 'আমি তার মনে একথাটি এনে দিলাম" । সুফীবাদের ভাষায় এটিকে ইলহাম বলা হয়। আর ইলহামের আরেকটি পন্থা হলো সত্য স্বপ্ন, যা মানুষের অন্তরে একীন এবং প্রশান্তি এনে দেয়। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে ইলহামও জ্ঞান অর্জনের একটি পন্থা। যারা পুণ্যাত্মা, যাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন, তাদের অন্তরে আল্লাহ পাক ইলহাম করেন এবং তারা তা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করেন। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে ইলহাম কিংবা স্বপ্ন বা অন্য কোনো পন্থায় এ নির্দেশ প্রদান করলেন- "শিশুটিকে তুমি স্তন্য পান করাতে থাক"।

শিশু হযরত মূসা (আ.) কখনো কাঁদতেন না : হযরত মূসা (আ.) তাঁর মাননীয়া মাতার স্তন্য কত দিন পান করেছিলেন? এ সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি আট মাস মায়ের দুধ পান করেছেন। কারো কারো মতে, এ সময় ছিল চার মাস, আর অন্য একটি মতে, এ সময় ছিল মাত্র তিন মাস। মা তাঁর এ শিশুকে কোলে নিয়ে দুধ পান করাতেন, কখনো তিনি কাঁদতেন না, এমনকি নড়াচড়াও করতেন না। এ বিবরণটি দিয়েছেন আল্লামা বগভী (র.)।

فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ : আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে একথাও বললেন যে, যখন তুমি এ শিশুটির প্রাণের আশঙ্কা কর, তখন তাকে একটি বাক্সে পুরে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। আর তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তার সম্পর্কে তোমার আশঙ্কা করার কিছুই নেই, তুমি দুঃখিতও হয়ো না। কেননা আমি তাকে পুনরায় তোমার কোলে পৌঁছিয়ে দেব। আমি তাকে শুধু রক্ষা করেই ক্ষান্ত হবো না; বরং ভবিষ্যতে তাকে আমার রাসূল হিসেবেও মনোনীত করব।

আলোচ্য আয়াতে اَلْيَمّ শব্দটি দ্বারা মিশরের নীলনদকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আপাতত তুমি তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দাও, এরপর আমি তাকে যথাসময়ে তোমার নিকট পৌঁছে দেব।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা : তাফসীরকার আতা (র.) এবং যাহহাক (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মিশরে যখন বনী ইসরাঈলের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তারা মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার শুরু করে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানিতে লিপ্ত হয়, তারা ভালো কাজের নির্দেশ দিত না এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখত না। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদের উপর কিবতীদেরকে বসিয়ে দিলেন, কিবতীরা তাদের উপর জুলুম অত্যাচার করলো এবং তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাতে লাগলো। এ অবস্থায় বহুদিন অব্যাহত রইলো। অবশেষে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতিকে কিবতীদের জুলুম থেকে রক্ষা করলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা হলো এই, যখন হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মগ্রহণের সময় হলো তখন তাঁর মাতা একজন ধাত্রীকে ডাকলেন। এই ধাত্রী সেই ধাত্রীদের অন্যতম, যাদেরকে ফেরাউনের লোকেরা নিযুক্ত করে রেখেছিল, যে বাড়িতে কোনো শিশুর জন্ম হতো, তাদের কাজ ছিল ফেরাউনের লোকদেরকে নবজাত শিশুর জন্মের সংবাদ দেওয়া। এ খবরের ভিত্তিতেই ফেরাউনের ঘাতক বাহিনী এসে নবজাত শিশুকে হত্যা করতো। কিন্তু এ ধাত্রীটির সঙ্গে মূসা জননীর অন্তরঙ্গতা ছিল। যথাসময়ে প্রসব বেদনা আরম্ভ হলে তাকে ডাকা হয়, সে আসে। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা তাকে বলেন, আমার যে এ অবস্থা, তা তুমি জান, তবে তোমার বন্ধুত্বের দ্বারা আমি উপকৃত হতে চাই, ধাত্রী তার দায়িত্ব পালন করলো। হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করলেন। ধাত্রী তাকে কোলে নিল। তখন মূসা (আ.)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে একটি নূর বের হয়। এ দৃশ্য দেখে ধাত্রী অত্যন্ত বিস্মিত হলো, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পমান হলো, আর হযরত মূসা (আ.)-এর মায়া মহব্বত দ্বারা তার অন্তর পরিপূর্ণ হলো। তখন ধাত্রী হযরত মূসা (আ.)-এর মাকে বলল, আমাকে যখন ডাকা হয় এবং আমি তোমার নিকট আসি, তখন আমার পেছনে তোমার সন্তানের ঘাতকরা ছিল। অর্থাৎ আমার ইচ্ছা ছিল জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে ঘাতকদের হাতে অর্পণ করবো; কিন্তু এখন আমার অন্তরে তোমার সন্তানের জন্য এমন মায়া সৃষ্টি হয়েছে যে, জীবনে এমন মায়া আমি কারো জন্যে উপলব্ধি করিনি। এজন্যে আমি বলছি, তোমার পুত্রের হেফাজত করো! এরপর যখন ধাত্রী হযরত মূসা (আ.)-এর গৃহ থেকে বের হচ্ছিল তখন ফেরাউনের একজন গোয়েন্দা তাকে দেখে ফেলেছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত হলো এবং ঘরে প্রবেশ করতে চাইলো। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর ভগ্নি দ্রুত এসে তার মাতাকে খবর দিল যে, সৈন্যবাহিনী এসে পড়েছে এবং তারা ভেতরে প্রবেশ করতে চায়। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর বোন তাকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে চুলোয় নিক্ষেপ করল, সে বুঝতেই পারেনি যে সে কি করছে। এরই মধ্যে সৈন্যরা ভিতরে প্রবেশ করল, চুলোয় আগুন জ্বলছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার চোহারায় কোনো ভাবান্তর হলো না। সৈন্যরা জিজ্ঞাসা করল, ধাত্রী এখানে কেন এসেছিল? তিনি বললেন, সে আমার বান্ধবী, আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। এরপর তারা ফিরে গেল। তখন চুলোর কাছে গিয়ে মা দেখলেন, এরই মধ্যে চুলোর আগুন নিভে গেছে এবং শিশু মূসা নিরাপদ রয়েছেন, তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন।

কিছুদন পর ফেরাউনের সৈন্যরা ঘরে ঘরে শিশু সন্তানের অনুসন্ধান করতে লাগল, তখন তিনি তার পুত্রের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়লেন। ঐ সময় আল্লাহ পাক তার অন্তরে ইলহাম করলেন যে, শিশুটিকে একটি কাষ্ঠ নির্মিত বাক্সে রেখে নীলনদে ভাসিয়ে দাও। আলোচ্য আয়তে একথাটিই বলা হয়েছে– وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰى অর্থাৎ আমি মূসা-জননীর নিকট এ প্রত্যাদেশ করলাম যে, তাকে সাগরে নিক্ষেপ কর, তথা নীলনদে ভাসিয়ে দাও। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার অন্তরে এ ধারণা আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক কাঠ মিস্ত্রীকে বাক্স তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। লোকটি বলল, এমন বাক্সের তোমার কি প্রয়োজন? তখন মূসা জননী মিথ্যা বলেননি। তিনি জবাব দিলেন, আমার একটি শিশু সন্তান রয়েছে, তাকে এর মধ্যে লুকিয়ে রাখব। কাঠ মিস্ত্রি জিজ্ঞাসা করল, লুকিয়ে রাখবে কেন? তিনি বললেন, ফেরাউনের সৈন্যদের ভয়ে। যাহোক, তিনি বাক্সটি নিয়ে রওয়ানা হলেন। এদিকে মিস্ত্রি সৈন্যদের নিকট এ খবর দেওয়ার জন্যে হাজির হলো। সে কিছু বলতে চাইল; কিন্তু আল্লাহ পাক তার বাকশক্তি ছিনিয়ে নিলেন। এরপর সে হাতের ইশারায় কিছু বুঝাতে চাইল: কিন্তু যখন সে তাতেও ব্যর্থ হলো তখন সৈন্যদের সর্দার তাকে পিটিয়ে বের করে দিতে নির্দেশ দিল। যখন সে তার স্থানে প্রত্যাবর্তন করল, তখন আল্লাহ পাক তার বাকশক্তি তাকে ফেরত দিলেন। আর সে তখন পুনরায় গোয়েন্দাগিরি করার জন্য সৈন্যদের নিকট হাজির হলো। কিন্তু এবারও তার বাকশক্তি চলে গেল, তার দৃষ্টিশক্তিও চলে গেল। অবশেষে লোকেরা তাকে মেরে বহিষ্কার করে দিল। এখন সে চরম দুরবস্থার সম্মুখীন। হাঁটতে হাঁটতে সে একটি ময়দানে উপস্থিত হলো এবং মনে মনে এ নিয়ত করলো যে যদি আল্লাহ পাক তার দর্শন ও বাকশক্তি ফিরিয়ে দেন তবে সে আর কখনো সেই শিশুটির ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করবে না। আল্লাহ পাক তার এ নিয়তের কারণে তার দর্শন ও বাকশক্তি ফেরত দিলেন। সে সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় পড়ে গেল এবং দোয়া করলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার এই নেক বান্দার ঠিকানা জানিয়ে দাও। আল্লাহ পাক তাকে হযরত মূসা (আ.)-এর ঠিকানা জানিয়ে দিলেন। সে তাঁর নিকট পৌছলো এবং ঈমান আনলো। সে এ সত্য উপলব্ধি করলো যে, সবকিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়েছে।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা যখন অন্তঃসত্ত্বা হলেন তখন তিনি তার অবস্থা গোপন রাখলেন। কেউ এ সম্পর্কে অবগত হলো না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের প্রতি ইহ্‌সান করতে ইচ্ছা করলেন, তাই তিনি পৃথিবীতে হযরত মূসা (আ.) -এর আগমনের অবস্থাকে গোপন করে রাখলেন। এখানে উল্লেখ্য, যখন বনী ইসরাইলের অনেক পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হলো, তখন ফেরাউনের জাতির পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয় এ মর্মে যে, যদি তাদেরকে এভাবে হত্যা করা হয়, তবে অবশেষে আমরা গোলাম কোথায় পাবো এবং পরিণামে আমাদেরকেই যাবতীয় কাজ করতে হবে। ফেরাউনের জাতি কিবতীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এ দাবির প্রেক্ষিতে ফেরাউন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, এক বছর বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে না, আর এক বছর করা হবে। যে বছর হত্যা না করার সিদ্ধান্ত ছিল সে বছর হযরত হারুন (আ.) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর যে বছর হত্যা করার সিদ্ধান্ত ছিল, সে বছরই হযরত মূসা (আ) -এর জন্ম হলো। যেহেতু ফেরাউনের লোকেরা বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদের ব্যাপারে ধাত্রীদেরকে গোয়েন্দাগিরির কাজে ব্যবহার করে, তাই প্রতি মুহূর্তে ঘরে ঘরে অনুসন্ধান কার্য চলত। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে এ ব্যবস্থা করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার দেহে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। যখন হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর ভগ্নি মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ তা জানতেই পারল না। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার অন্তরে এ কথার ইলহাম করলেন যে, তুমি শিশু সন্তানটিকে দুধ পান করাতে থাক, যখন ফেরাউনের লোকদের তরফ থেকে কোনো প্রকার আশঙ্কা হয়, তখন তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দিও। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা শিশু সন্তানটিকে তাঁর কোলে লুকিয়ে দুধ পান করাতে থাকেন। শিশু মূসা কাঁদতেন না এমনকি, নড়াচড়াও করতেন না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মূসা জননীর আশঙ্কা হলো যে, ফেরাউনের লোকেরা যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। তাই তিনি একটি সিন্দুক তৈরি করালেন এবং সিন্দুকের মধ্যে শিশু সন্তানকে রেখে তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ফেরাউনের শুধু একটি কন্যাসন্তান ছিল, পুত্রসন্তান ছিল না। ঐ কন্যাসন্তানটিও শ্বেতরোগে আক্রান্ত ছিল, তার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সে সুস্থ হয়নি। জাদুকররা বলেছিল, তার আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হবে নীলনদের দিক থেকে। মানবাকৃতির কোনো প্রাণী এ নীলনদে পাওয়া যাবে, তার মুখের লালা যদি ব্যবহার করা যায়, তবে শ্বেতরোগগ্রস্ত এ কন্যাটি সুস্থ হবে। আর তা পাওয়া যাবে অমুক দিন সূর্য উদিত হওয়ার সময়। ঐদিন ছিল সোমবার। ফেরাউন নীলনদের তীরে তার বসবার স্থান তৈরি করালো, তার সাথে ছিলো স্ত্রী আছিয়া বিনতে মোজাহেম। ফেরাউনের এ অসুস্থ কন্যাটিও ছিল। হঠাৎ একটি সিন্দুক ভাসমান অবস্থায় দেখা গেল, ফেরাউন আদেশ দিল ভাসমান বস্তুটি নিয়ে আসতে, ক্ষণিকের মধ্যে তার পরিচালকরা সিন্দুকটি ফেরাউনের সামনে এনে রেখে দিল। তারা সিন্দুকটি খোলার চেষ্টা করল; কিন্তু ব্যর্থ হলো। পরে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া কাছে আসলেন এবং তিনি সিন্দুকের ভেতর একটি নূর দেখতে পেলেন, যা অন্য কেউ দেখতে পায়নি।

যাহোক, তিনি সিন্দুকটি খুলে ফেললেন, যার ভিতর একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশু শায়িত অবস্থায় পাওয়া গেল। যার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে একটি নূর চমকাচ্ছিল। আল্লাহ পাক তাঁর রিজিক তাঁর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলেন, সে এ আঙ্গুল চুষে দুধ পান করত, এ নিষ্পাপ শিশুটির প্রতি অসাধারণ স্নেহমায়া আছিয়ার অন্তরে সৃষ্টি হলো, এমনকি ফেরাউনও তাকে ভালোবাসতে লাগল। সিন্দুক থেকে শিশুটিকে বের করা হলো, তার অসুস্থ কন্যা এসে পড়ল। সে এ নবজাত শিশুর মুখের লালা নিয়ে তার শ্বেতরোগগ্রস্ত দেহে মালিশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হলো। ঐ কন্যা শিশুটিকে চুম্বন করলো এবং টান দিয়ে বুকে টেনে এনে আদর করল। পবিত্র কুরআনে এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ عَدُوًّا وَّحَزَنًا "এরপর ফেরাউনের পরিবারের লোকজন তাকে উঠিয়ে নেয়, যাতে সে তাদের শত্রু এবং দুঃখের কারণ হয়"।

অর্থাৎ ভবিষ্যতে হযরত মূসা (আ.) তাদের দুশমন হবেন এবং তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হবেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে– اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ অর্থাৎ "নিশ্চয় ফেরাউন, হামান এবং তাদের সৈন্যবাহিনী ভুল করেছিল।" আর তাদের ভুল প্রত্যেক ব্যাপারেই ছিল; যেমন হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করবেন, এই ভয়ে হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে তারা হত্যা করেছে। এটি ছিলো তাদের মারাত্মক ভুল।

দ্বিতীয়ত শিশু মূসাকে তারা নীলনদ থেকে তুলে নিয়েছে এবং নিজের বাড়িতেই লালন-পালন করেছে, পরবর্তীকালে যা হবার তা হয়েছে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, নিশ্চয় ফেরাউন এবং হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল অপরাধী। হাজা হাজার নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করার মতো বড় অপরাধ আর কি হতে পারে! আর এজন্যেই আল্লাহ পাক ফেরাউন ও তার সহযোগীদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বারা শাস্তি দিয়েছেন এবং যে শিশু থেকে আত্মরক্ষার জন্যে হাজার হাজার শিশুকে ফেরাউন হত্যা করেছে, সেই শিশুটিকে আল্লাহ পাক তার বাড়িতে, তারই নাকের ডগায়, তারই দ্বারা লালন পালন করিয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। –[তাফসীরে তাবারী খ. ২০, পৃ. ২০-২১]

যে শিশুটির ভয়ে ফেরাউন বহুদিন ধরে আতঙ্কিত ছিল, যাকে প্রতিরোধ করতে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, ঐ শিশুটিই আজ আল্লাহ পাকের হুকুমে তার আদরের কোলে স্থান নিয়েছেন এবং তার বুকের উপর বসে গেছেন। আর নিরাপদে নিঃশঙ্ক অবস্থায় কাল অতিক্রম করছেন। ফেরাউন ও তার দলবল তার ভয়ে যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, তা যে কত বড় ভুল ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চক্রান্ত বা কৌশল দ্বারা অদৃষ্টের লিখনকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না এ ঘটনা এ কথারই প্রকৃত প্রমাণ।

বাতিল ফেরকা "কাদরিয়া" তকদিরে বিশ্বাস করতো না। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্য যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে হযরত মূসা (আ.)-এর এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন, আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তাকদীরকে খণ্ডন করার ক্ষমতা কারোরই নেই, তা এ ঘটনা দেখলে বুঝতে বিলম্ব হয় না।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দূ] খ. ২০, পৃ. ২০]

বর্ণিত আছে, যখন সিন্দুকটি ফেরাউনের সামনে উন্মুক্ত করা হলো এবং তাতে সংরক্ষিত সুন্দর শিশুটি তারা দেখলো তখন ফেরাউনের দরবারের গণকরা বলল, এটিই সেই শিশু যার সম্পর্কে তুমি আতঙ্কগ্রস্ত। এটি নিঃসন্দেহে বনী ইসরাঈলের সন্তান, তোমার ভয়ে তাকে নীলনদে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন ফেরাউন তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করে; কিন্তু তার স্ত্রী তাতে বাধা দেয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ "আর ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ যে আমার এবং তোমার চক্ষু শীলতকারী [নয়নের মণি] তাকে হত্যা কারো না।"

ওহাব ইবনে মোনাব্বিহ (র.) বর্ণনা করেছেন, ফেরাউন শিশু মুসাকে দেখেই রাগান্বিত হয়ে বলল, এ শিশুটি এখনো কিভাবে বেঁচে গেছে? তার স্ত্রী আছিয়া ছিলেন অত্যন্ত নেককার, নবী রাসূলগণের বংশধর, এতিম মিসকিনদের মা, অত্যন্ত বড় দানশীল। ফেরাউন যখন শিশু মুসাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করল তখন তিনি বললেন–قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ অর্থাৎ "সে আমার এবং তোমার চক্ষু শীতলকারী [নয়নের মণি], তাকে হত্যা করো না।" ফেরাউন বলল, তোমার নয়নের মণি হতে পারে, আমার নয়। এ পর্যায়ে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যদি ফেরাউন এ কথা বলতো যে, যেমন তোমার নয়নের মণি, আমার জন্যও শান্তি ও তৃপ্তির উপকরণ, তাহলে আল্লাহ পাক আছিয়ার ন্যায় ফেরাউনকেও হেদায়েত দান করতেন।"

আছিয়া ফেরাউনকে বললেন, শিশুটি আমাকে দিয়ে দাও। এ শিশুটি বড়ই সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত মনে হয়। আছিয়া আরো বললেন– عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

অর্থাৎ "সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমারা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পরি।"

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আছিয়া শিশু হযরত মূসা (আ.)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝে একটি নূর দেখেছিলেন যার কারণে প্রিয়দর্শন শিশু হযরত মূসা (আ.)-এর জন্যে তাঁর অন্তরে আল্লাহ পাক স্নেহের ঢেউ তুলে দিয়েছিলেন, এজন্যে তিনি বলেছিলেন এ শিশুটিকে দেখে আমার নয়ন জুড়াবো। আছিয়া আরো বলেছেন, অগণিত শিশু হত্যা করেছে, একটি শিশু বেঁচে গেলে সে আর কি করতে পারবে! বিশেষত আমাদের নিকট লালিত পালিত হলে, তার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَتْلُوْا : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি বর্ণনা করে শুনাচ্ছি।

عَلَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার عُلُوٌّ মূলবর্ণ (ع ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল।

يَسْتَضْعِفُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِضْعَافٌ মূলবর্ণ (ض ـ ع ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– সে শক্তি খর্ব করে রেখেছিল।

يُذَبِّحُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَذْبِيْحٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– সে হত্যা করত।

يَسْتَحْيِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِيْحَاءٌ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সে জীবিত থাকতে দিত।

نُمَكِّنُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْكِيْنٌ মূলবর্ণ (م ـ ك ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– আমি শাসনক্ষমতা দান করি।

اِلْتَقَطَهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِلْتِقَاطٌ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ط) জিনস صحيح অর্থ– সে তাকে উঠিয়ে নিল।

لَتُبْدِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبْدَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ د ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– সে প্রকাশ করে দিবে।

رَبَطْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার رَبْطٌ মূলবর্ণ (ر ـ ب ـ ط) জিনস صحيح অর্থ– আমি অটল রাখতাম।

قُصِّيْهِ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার قَصَصٌ মূলবর্ণ (ق ـ ص ـ ص) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– (মূসার) একটু সন্ধান তো নাও।

فَرَدَدْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَدٌّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– (এই উপায়ে) আমি মূসাকে প্রত্যর্পণ করলাম।

كَيْ تَقَرَّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার قُرَّةٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যাতে শীতল হয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا : এখানে اِنَّ হরফে মুশাবাহ বিল ফে'ল আর হলো اسم ان فِرْعَوْنَ আর عَلَا বাক্যটি হলো خبرانَّ আর عَلَا ফেল আল তার উহ্য যমীর هُوَ হলো ফায়েল। আর فِى الْاَرْضِ টা عَلا এর সাথে متعلق হয়েছে। আর وَجَعَلَ ফে'ল তার উহ্য যমীর হলো ফায়েল। আর اَهْلَهَا হলো প্রথম মাফউল। আর شِيَعًا হলো দ্বিতীয় মাফউল।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰۤى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪. আর যখন তিনি স্বীয় পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন এবং (জ্ঞানে ও দৈহিক শক্তিতে) পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেন, (তখন) আমি তাঁকে হেকমত ও ইলম দান করলাম এবং আমি এরূপেই পুণ্যবান লোকদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۗ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۗ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

১৫. আর মূসা (একদিন) শহরে এমন সময়ে পৌছলেন যখন তথাকার (অধিকাংশ) অধিবাসীরা অসতর্ক ছিল, তখন তিনি দুজন লোককে ঝগড়া করতে দেখতে পেলেন, একজন ছিল তাঁর সম্প্রদায় (বনী ইসরাঈল) -এর, আর অপরজন ছিল তাঁর শত্রু পক্ষীয়, অতএব তাঁর সম্প্রদায়ের লোকটি শত্রু পক্ষীয় লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য চাইল, তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন, তাতেই তার কর্ম শেষ করে দিলেন, মূসা (মনে মনে) বললেন, এটা তো শয়তানি কাণ্ড হয়ে গেল; নিঃসন্দেহে শয়তান প্রকাশ্য শত্রু, (কেমন) বিভ্রান্তকারী।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦﴾

১৬. (এবং তিনি অনুতপ্ত হয়ে) আবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন, সুতরাং আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করলেন; নিশ্চয় তিনি বড় ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ আর যখন তিনি স্বীয় পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন وَاسْتَوٰى এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেন اٰتَيْنٰهُ আমি তাঁকে দান করলাম حُكْمًا وَّعِلْمًا হেকমত ও ইলম وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ এবং আমি এরূপেই পুণ্যবান লোকদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

১৫. وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ আর মূসা (একদিন) শহরে এমন সময়ে পৌছলেন عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا যখন তথাকার আধিবাসীরা অসতর্ক ছিল فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ তখন তিনি দু'জন লোককে দেখতে পেলেন يَقْتَتِلٰنِ ঝগড়া করতে هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ একজন ছিল তার সম্প্রদায়ের وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ আর অপর জন ছিল তার শত্রু পক্ষীয় فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ অতএব তাঁর সম্প্রদায়ের লোকটি তাঁর সাহায্য চাইল عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ শত্রু পক্ষীয় লোকটির বিরুদ্ধে فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন فَقَضٰى عَلَيْهِ তাতেই তার কর্ম শেষ করে দিলেন قَالَ মূসা বললেন هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ এটা তো শয়তানি কাণ্ড হয়ে গেল اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ নিঃসন্দেহে শয়তান প্রকাশ্য শত্রু (কেমন) বিভ্রান্তকারী।

১৬. قَالَ আবেদন করলেন رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার! اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ আমার ত্রুটি হয়ে গেছে فَاغْفِرْ لِىْ আমাকে ক্ষমা করে দিন فَغَفَرَ لَهٗ সুতরাং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ নিশ্চয় তিনি বড় ক্ষমাশীল الرَّحِيْمُ অতিশয় দয়ালু।

১৭. মূসা আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন, অতএব, আমি কখনো অপরাধীদের (অর্থাৎ পাপ প্ররোচকদের) সহায়তা করব না।	قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. অতঃপর শহরের মধ্যে ভীত ও আতঙ্কিত অবস্থায় মূসার ভোর হলো, হঠাৎ (দেখতে পেলেন) সেই লোকটি, যে পূর্বদিন তাঁর নিকট সাহায্য চেয়েছিল, আবার তাঁকে ডাকতেছে; মূসা তাকে বললেন, নিশ্চয় তুমি বড় বিভ্রান্ত ব্যক্তি (কেননা প্রত্যহ মানুষের সঙ্গে ঝগড়া কর)।	فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ؕ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾
১৯. অতঃপর যখন মূসা (সেই ফেরাউনী লোকটির হতে বাড়াবাড়ি দেখে প্রতিরোধার্থে) তার দিকে হাত বাড়ালেন- যে উভয়ের শত্রু ছিল, (সেই লোকটি এই ভেবে যে, আজ হয়তো মূসা আমাকে আক্রমণ করবেন, তখন) সে বলতে লাগল, হে মূসা! তুমি কি (আজ) আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যেমন গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ? (মনে হয়) তুমি কেবল পৃথিবীতে আপন ক্ষমতা বিস্তার করতে চাচ্ছ এবং আপস ও মীমাংসা করার ইচ্ছা তোমার নেই (ফেরাউনী লোকটি এটা শুনল, আর পূর্ব দিনের হত্যাকারীর অনুসন্ধানের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল)।	فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْاَمْسِ ۖ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. قَالَ মূসা আরজ করলেন رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার! بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ যেহেতু আপনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ অতএব, আমি কখনো অপরাধীদের সহায়তা করব না।

১৮. فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ অতঃপর শহরের মধ্যে মূসার ভোর হলো خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ভীত ও আতঙ্কিত অবস্থায় فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ হঠাৎ (দেখতে পেলেন) সেই লোকটি যে তাঁর নিকট সাহায্য চেয়েছিল بِالْاَمْسِ পূর্বদিন يَسْتَصْرِخُهٗ আবার তাঁকে ডাকছে قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى মূসা তাকে বললেন اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ নিশ্চয় তুমি বড় বিভ্রান্ত ব্যক্তি।

১৯. فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ অতঃপর যখন মূসা তার দিকে হাত বাড়ালেন بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا যে উভয়ের শত্রু ছিল قَالَ সে বলতে লাগল يٰمُوْسٰٓى হে মূসা! اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ بِالْاَمْسِ গতকাল اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ তুমি কেবল চাচ্ছ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ পৃথিবীতে আপন ক্ষমতা বিস্তার করতে وَمَا تُرِيْدُ এবং তোমার ইচ্ছা নেই اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ মীমংসা করার।

২০. আর (ইতোমধ্যে) এক ব্যক্তি শহরের (অপর) প্রান্ত হতে দৌড়ে এসে বলতে লাগল, হে মূসা! সভাসদবৃন্দ আপনার সম্বন্ধে পরামর্শ করছে যে, আপনাকে হত্যা করবে, অতএব আপনি সরে পড়ুন, আমি আপনার হিত কামনা করছি।

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۚ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ۝

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. وَجَآءَ رَجُلٌ আর এক ব্যক্তি এসে مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ শহরের (অপর) প্রান্ত হতে يَسْعٰى দৌড়ে قَالَ বলতে লাগল يٰمُوْسٰٓى হে মূসা! اِنَّ الْمَلَاَ সভাসদবৃন্দ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ আপনার সম্বন্ধে পরামর্শ করছে যে, لِيَقْتُلُوْكَ আপনাকে হত্যা করবে فَاخْرُجْ অতএব, আপনি সরে পড়ুন اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ আমি আপনার হিত কামনা করছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى : اَشُدَّ -এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও জোরের চরম সীমায় পৌঁছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর এমন এক সময় আসে, যখন তার অস্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই اَشُدَّ বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজাজ অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারও দেরীতে। কিন্তু আবদ ইবনে হুমায়দের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তেত্রিশ বছর বয়সে اَشُدَّ -এর জমানা আসে। একেই পরিণত বয়স বলা হয়। এতে দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিরতিকাল। একে اِسْتَوٰى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, اَشُدَّ তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ বছর থেকে শুরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে। –[রূহুল-মা'আনী, কুরতুবী]

اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا : حُكْم বলে নবুয়ত ও রেসালত এবং عِلْم বলে বিধি-বিধানের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে مَدِيْنَة বলে মিসর নগরী বোঝানো হয়েছে। এতে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ থেকে বোঝা গেল যে, হযরত মূসা (আ.) মিশরের বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর একদিন এমন সময়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের অসাবধানতার সময় ছিল। অতঃপর কিবতী-হত্যার ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময়ে হযরত মূসা (আ.) তাঁর সত্য ধর্ম প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এরই ফলে কিছু লোক তাঁর অনুগত হয়েছিল। তাঁদেরকে তাঁর অনুসারীদল বলা হতো। مِنْ شِيْعَتِهٖ শব্দটি এর সাক্ষ্য দেয়। এসব ইঙ্গিত থেকে ইবনে-ইসহাক ও ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, হযরত মূসা (আ.) যখন জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করলেন এবং সত্য ধর্মের কিছু কিছু কথা মানুষকে বলতে শুরু করলেন, তখন ফেরাউন তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। কিন্তু স্ত্রী আছিয়ার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তবে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। এরপর হযরত মূসা (আ.) অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিসর নগরীতে আগমন করতেন। عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا বলে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে দুপুর বোঝানো হয়েছে। এ সময় মানুষ দিবানিদ্রায় মশগুল থাকত। –[কুরতুবী]

فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى : وَكَزَ শব্দের অর্থ ঘুষি মারা। فَقَضٰى عَلَيْهِ বাক পদ্ধতিতে قَضَاهُ ও فَقَضٰى عَلَيْهِ তখন বলা হয়, যখন কারও জীবলীলা সম্পূর্ণ সাঙ্গ করে দেওয়া হয়। তাই এখানে এর অর্থ হত্যা করা। –[মাযহারী]

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ : এই আয়াতের সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আ.) থেকে অনিচ্ছায় প্রকাশিত কিবতী-হত্যার ঘটনাকেও তিনি তাঁর নবুয়ত ও রেসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থি এবং তাঁর পয়গম্বরসুলভ মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে তাঁর গোনাহ সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলাও ক্ষমা করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিবতী কাফের শরিয়তের পরিভাষায় হরবী কাফের ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে

হত্যা করাও বৈধ ছিল। কেননা সে কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মি তথা আশ্রিত ছিল না এবং হযরত মূসা (আ.)-এর সাথেও তার কোনো চুক্তি ছিল না এমতাবস্থায় হযরত মূসা (আ.) একে 'শয়তানের কাজ' ও গোনাহ্ কেন সাব্যস্ত করেছেন? এর হত্যা তো বাহ্যত : ছওয়াবের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ সে একজন মুসলমানের উপর জুলুম করেছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

উত্তর এই যে, চুক্তি কোনো সময় লিখিত হয় এবং কোনো সময় কার্যগতও হয়। লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণত : মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জিম্মিদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে। এমনিভাবে কার্যগত চুক্তিও অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

কার্যগত চুক্তি এরূপ : যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোনো রাষ্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয়পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে; সেই স্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তি গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়।

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার একটি দীর্ঘ হাদীস এর প্রমাণ। হাদীসটি ইমাম বুখারী شُرُوْط অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হাদীসের ঘটনা এই যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা একদল কাফেরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতেন। কিছুদিন পর তিনি তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন সম্পত্তি অধিকার করে নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। তিনি কাফেরদের কাছ থেকে যে ধন-সম্পত্তি হস্তগত করেছিলেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পেশ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ أَمَّا الْإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ أَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِيْ شَيْءٍ আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে এর ভাষা এরূপ ঃ وَأَمَّا الْمَالَ فَمَالُ غَدْرٍ لَاحَاجَةَ لَنَا فِيْهِ অর্থাৎ তোমার ইসলাম তো আমি গ্রহণ করলাম, এখন তুমি একজন মুসলমান; কিন্তু এই ধন-সম্পদ বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পথে অর্জিত হয়েছে। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। বুখারীর টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের ধন-সম্পদ শান্তির অবস্থায় লুটে নেওয়া জায়েজ নয়। কেননা, এক জনপদের অধিবাসী অথবা যারা এক সাথে কাজ করে, তারা একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। তাদের এই কার্যগত চুক্তি একটি আমানত। এই আমানত আমানতকারীকে অর্পণ করা ফরজ, সে কাফের হোক কিংবা মুসলিম। একমাত্র লড়াই ও জয়লাভের আকারেই কাফেরদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল হয়। শান্তিকালে যখন একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, তখন কাফেরদের ধন-সম্পদ লুটে নেওয়া জায়েজ নয়। বুখারীর টীকাকার কুস্তুলানী বলেনঃ

إِنَّ أَمْوَالَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنْ كَانَتْ مَغْنُوْمَةً عِنْدَ الْقَهْرِ فَلَا يَحِلُّ أَخْذُهَا عِنْدَ الْأَمْنِ فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مُصَاحِبًا لَهُمْ فَقَدْ أَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ فَسَفْكُ الدِّمَاءِ وَأَخْذُ الْمَالِ مَعَ ذٰلِكَ غَدْرٌ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ عَلٰى سَوَاءٍ.

অর্থাৎ নিশ্চয় মুশরিকদের ধন-সম্পদ যুদ্ধাবস্থায় হালাল; কিন্তু শান্তির অবস্থায় হালাল নয়। কাজেই যে মুসলমান কাফেরদের সাথে বসবাস করে এবং কার্যগতভাবে একে অপরের কাছ থেকে নিরাপদ থাকে, তদবস্থায় কোনো কাফেরকে হত্যা করা কিংবা জোর প্রয়োগে অর্থ-সম্পদ নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও হারাম, যে পর্যন্ত তাদের এই কার্যগত চুক্তি প্রত্যাহার করার ঘোষণা না করা হয়।

সারকথা এই যে, এই কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েজ হতো না, কিন্তু হযরত মূসা (আ.) তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেন নি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার জুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবতঃ হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। হযরত মূসা (আ.) অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও কম মাত্রার প্রহারও যথেষ্ট ছিল কাজেই এই বাড়াবাড়ি আমার জন্য জায়েজ ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য : এটা হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর সুচিন্তিত অভিমত, যা তিনি আরবি ভাষায় 'আহকামুল কুরআন' সূরা কাসাস লেখার সময় ব্যক্ত করেছিলেন। এটা তাঁর সর্বশেষ গবেষণার ফল। কেননা ১৩৬২ হিজরির ২রা রজব তারিখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল, কিন্তু পয়গম্বরগণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করেন না, যতক্ষণ বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। এক্ষেত্রে হযরত মূসা (আ.) বিশেষ

অনুমতির অপেক্ষা না করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে গোনাহ্ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। –[রূহুল মা'আনী]

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ হযরত মূসা (আ.)-এর এই বিচ্যুতি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকর আদায় করণার্থে আরজ করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোনো অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বোঝা গেল যে, হযরত মূসা (আ.) যে ইসরাঈলীর সাহায্যার্থে একাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় ঘটনার পর প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সে নিজেই কলহপ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার অভ্যাস ছিল। তাই তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে কোনো অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ স্থলে مُجْرِمِيْنَ (অপরাধী)-এর তাফসীর كَافِرِيْنَ (কাফের) বর্ণিত আছে। কাতাদাহ এর বক্তব্যও এর কাছাকাছি। এই তাফসীরের ভিত্তিতে মনে হয়, হযরত মূসা (আ.) যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করেছিলেন, সে-ও মুসলমান ছিল না, তবে মজলুম মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর এই উক্তি থেকে দু'টি মাসআলা প্রমাণিত হয়।

১. মজলুম কাফের ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। ২. কোনো জালেম অপরাধীকে সাহায্য করা জায়েজ নয়। আলেমগণ এই আয়াতদৃষ্টে অত্যাচারী শাসনকর্তার চাকুরীকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ এতে জুলুমে অংশগ্রহণ বোঝা যায়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। –(রূহুল মা'আনী) কাফের অথবা জালেমদের সাহায্য-সহযোগিতার নানাবিধ পন্থা বর্তমান। এর বিধিবিধান ফিকহর গ্রন্থাবলিতে বিশদভাবে উল্লিখিত রয়েছে। বর্তমান লেখক আরবিতে লিখিত 'আহ্কামুল কোরআন' গ্রন্থে এ আয়াতের প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছে। জ্ঞানম্বেষী বিদ্বজন তা দেখে নিতে পারেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেন।

يَقْتَتِلَانِ : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِقْتِتَالٌ মূলবর্ণ (ق - ت - ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা উভয়ে ঝগড়া করছে।

اِسْتَغَاثَهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِغَاثَةٌ মূলবর্ণ (غ - و - ث) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে তার সাহায্য চাইল।

فَوَكَزَهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَكْزٌ মূলবর্ণ (و - ك - ز) জিনস مثال واوى অর্থ– (তখন) তিনি তাকে ঘুষি মারলেন।

يَتَرَقَّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَرَقُّبٌ মূলবর্ণ (ر - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ– আতঙ্কিত অবস্থায়।

يَسْتَصْرِخُهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِصْرَاخٌ মূলবর্ণ (ص - ر - خ) জিনস صحيح অর্থ– সে আবার তাকে ডাকতেছে।

اَنْ يَبْطِشَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بَطْشٌ মূলবর্ণ (ب - ط - ش) জিনস صحيح অর্থ– তিনি হাত বাড়ালেন, তিনি পাকড়াও করবেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ এখানে : فَوَجَدَ পূর্ববর্তী دَخَلَ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর فِيْهَا মুতা'আল্লিক হয়ে وَجَدَ-এর সাথে, আর رَجُلَيْنِ হলো مفعول به আর يَقْتَتِلَانِ বাক্যটি رَجُلَيْنِ এর সিফত হয়েছে। هذا মুবতাদা এবং مِنْ شِيْعَتِهٖ হলো খবর। আর বাক্যটি رَجُلَيْنِ-এর দ্বিতীয় সিফত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন حال হয়েছে। আর وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ পূর্বের বাক্যের (هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ)-এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড : পৃ.৫৮২]

২১. কাজেই মূসা তথা হতে বের হয়ে পড়লেন ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায়, (এবং) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এই অত্যাচারীদের হতে রক্ষা করুন।	فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾
২২. আর যখন মূসা মাদইয়ানের পথ ধরলেন তখন বলতে লাগলনে, আশা করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথে চালিত করবেন।	وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾
২৩. আর যখন তিনি মাদইয়ানের পানির (কূপের) নিকট পৌছলেন, তখন সেখানে একদল লোককে দেখতে পেলেন, যারা (নিজেদের পশুগুলোকে) পানি পান করাচ্ছিল, আর তাদের সকলের এক পার্শ্বে দুজন স্ত্রীলোককে দেখলেন যে, তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে, মূসা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি উদ্দেশ্য? তারা উভয়ে উত্তর করল, যে পর্যন্ত না এই রাখাল দল (তাদের পশুগুলোকে) পানি পান করিয়ে দূরে সরে যায় সে পর্যন্ত আমরা পানি পান করাই না। আর আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ।	وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ۖ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾
২৪. অনন্তর মূসা তাদের (পশুগুলোকে) পানি পান করালেন, অতঃপর (সেখান থেকে) সরে ছায়ায় গিয়ে বসলেন, অতঃপর দোয়া করলেন, হে আমার রব! যে কোনো নিয়ামতই আপনি আমার নিকট পাঠান, আমি তার মুখাপেক্ষী।	فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. فَخَرَجَ مِنْهَا কাজেই মূসা তথা হতে বের হয়ে পড়লেন خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় قَالَ বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! نَجِّنِىْ আমাকে রক্ষা করুন مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ এই অত্যাচারীদের হতে।

২২. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ আর যখন মূসা মাদইয়ানের পথ ধরলেন قَالَ তখন বলতে লাগলেন عَسٰى رَبِّىْٓ আশা করি আমার প্রতিপালক اَنْ يَّهْدِيَنِىْ আমাকে চালিত করবেন سَوَآءَ السَّبِيْلِ সরল পথে।

২৩. وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ আর যখন তিনি মাদইয়ানের পানির (কূপের) নিকট পৌছলেন وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ তখন তথায় এক দল লোককে দেখতে পেলেন يَسْقُوْنَ যারা পানি পান করাচ্ছিল وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ আর তাদের সকলের এক পার্শ্বে দেখলেন امْرَاَتَيْنِ দুজন স্ত্রী লোককে تَذُوْدٰنِ তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে قَالَ মূসা জিজ্ঞাসা করলেন مَا خَطْبُكُمَا তোমাদের কি উদ্দেশ্য? قَالَتَا তারা উভয়ে উত্তর করল لَا نَسْقِىْ সে পর্যন্ত আমরা পানি পান করাইনা حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ যে পর্যন্ত না এই রাখাল দল পানি পান করিয়ে দূরে সরে যায় وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ আর আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ।

২৪. فَسَقٰى لَهُمَا অনন্তর মূসা তাদের (পশুগুলোকে) পানি পান করালেন ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ অতঃপর সরে ছায়ায় গিয়ে বসলেন فَقَالَ অতঃপর দোয়া করলেন رَبِّ হে আমার রব! اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ যে কোনো নিয়ামত আপনি আমার প্রতি পাঠান فَقِيْرٌ আমি তার মুখাপক্ষী।

অনুবাদ	আয়াত
২৫. অতঃপর কন্যাদ্বয়ের একজন লজ্জাবনত অবস্থায় চলতে চলতে মূসার নিকট আসল (এবং) বলল, আপনি যে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন, তার বিনিময় প্রদানের জন্য আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন; অতঃপর যখন মূসা তাঁর নিকট পৌঁছলেন এবং সমস্ত অবস্থা তাঁর নিকট বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না। তুমি অত্যাচারী লোকগণ হতে রক্ষা পেয়েছ (কেননা এ এলাকা ফেরাউনের অধীনে নয়)।	فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۫ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ٝ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۵﴾
২৬. কন্যাদ্বয়ের একজন বলল, আব্বাজান! আপনি তাঁকে পরিচালক নিযুক্ত করুন, কেননা সে-ই উত্তম কর্মচারী যেই ব্যক্তি অতি শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।	قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ ﴿۲۶﴾
২৭. তিনি (শো'আয়ব (আ.) মূসা (আ.)-কে) বললেন, আমি আমার এ দুটি কন্যার একটিকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি– এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসরকাল আমার চাকরি করবে (এটাই বিবাহের মহর), অতঃপর যদি তুমি দশ বৎসরকাল পূর্ণ করে দাও, তবে এটা তোমার পক্ষ হতে (অনুগ্রহ) হবে, আর আমি তোমার উপর কোনো চাপ দিতে চাই না; ইনশা-আল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।	قَالَ اِنِّىْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِىْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۲۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا অতঃপর কন্যাদ্বয়ের একজন মূসার নিকট আসল تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ লজ্জাবনত অবস্থায় চলতে চলতে قَالَتْ (এবং) বলল اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন لِيَجْزِيَكَ প্রদানের জন্য اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا আপনি যে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন তার বিনিময়ে فَلَمَّا جَآءَهٗ অতঃপর যখন মূসা তাঁর নিকট পৌঁছলেন وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ এবং সমস্ত অবস্থা তাঁর নিকট বর্ণনা করলেন قَالَ তখন তিনি বললেন لَا تَخَفْ ভয় করো না نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ তুমি অত্যাচারী লোকগণ হতে রক্ষা পেয়েছ।

২৬. قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا কন্যাদ্বয়ের একজন বলল يٰۤاَبَتِ আব্বাজান! اسْتَاْجِرْهُ আপনি তাঁকে পরিচালক নিযুক্ত করুন اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ কেননা সেই উত্তম কর্মচারী যেই ব্যক্তি অতি শক্তিশালী الْاَمِيْنُ বিশ্বস্ত।

২৭. قَالَ তিনি বললেন اِنِّىْۤ اُرِيْدُ আমি ইচ্ছা করি اَنْ اُنْكِحَكَ তোমার সাথে বিবাহ দিতে اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ আমার এ দুটি কন্যার একটিকে عَلٰۤى এ শর্তে যে, اَنْ تَاْجُرَنِىْ তুমি আমার চাকরি করবে ثَمٰنِىَ حِجَجٍ আট বৎসরকাল فَاِنْ اَتْمَمْتَ যদি তুমি পূর্ণ করে দাও عَشْرًا দশ বৎসরকাল فَمِنْ عِنْدِكَ তবে এটা তোমার পক্ষ থেকে (অনুগ্রহ) হবে وَمَاۤ اُرِيْدُ আর আমি চাইনা اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ তোমার উপর কোনো চাপ দিতে سَتَجِدُنِىْۤ তুমি আমাকে পাবে اِنْ شَآءَ اللّٰهُ ইনশাআল্লাহ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ সদাচারী।

২৮. মূসা (রাজি হলেন এবং) বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এ কথাই সাব্যস্ত হলো; আমি এ দুটি নির্দিষ্ট মেয়াদের যেটিকে পূর্ণ করি আমার প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না; আর আমরা যে (চুক্তির) কথাবার্তা বলছি, আল্লাহ তা'আলাই এর (যথেষ্ট) সাক্ষী।

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ۭ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. قَالَ মূসা বললেন ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ আমার ও আপনার মধ্যে এ কথাই সাব্যস্ত হলো اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ আমি এ দু'টি নির্দিষ্ট মেয়াদের যেটিকেই পূর্ণ করি فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ আমার প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ আর আমরা যে কথাবার্তা বলছি আল্লাহ তা'আলাই এর (যথেষ্ট) সাক্ষী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ : শামদেশের একটি শহরের নাম মাদইয়ান। মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম (আ.)-এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চল ফেরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মিসর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মনজিল। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশঙ্কাবোধ করে মিসর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলাবাহুল্য, এই আশঙ্কাবোধ নবুয়ত ও তাওয়াক্কুল কোনোটিরই পরিপন্থি নয়। মাদইয়ানের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মাদইয়ানেও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের বসতি ছিল। হযরত মূসা (আ.) ও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত মূসা (আ.) সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিসর থেকে বের হন। তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, عَسٰى رَبِّيْ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ। অর্থাৎ আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তা'আলা এই দোয়া কবুল করলেন। তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেন, এই সফরে হযরত মূসা (আ.)-এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা ছিল হযরত মূসা (আ.) সর্বপ্রথম পরীক্ষা। তাঁর পরীক্ষাসমূহের বিশদ বিবরণ সূরা তোয়াহায় একটি দীর্ঘ হাদীসের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ : مَاءَ مَدْيَنَ বলে একটি কূপকে বোঝানো হয়েছে, যা থেকে এই জনপদের অধিবাসীরা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাত। وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ অর্থাৎ দু'জন রমণীকে দেখলেন, তারা তাদের ছাগপালকে পানির দিকে যেতে বাধা দিচ্ছিল, যাতে তাদের ছাগলগুলো অন্যদের ছাগলের সাথে মিশে না যায়।

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ :

خَطْبٌ শব্দের অর্থ শান, অবস্থা, উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মূসা (আ.) রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? অন্যদেব ন্যায় কূপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেন? তারা জওয়াব দিল, আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে। তারা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোনো পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে একাজে আসতে হয়েছে? রমণীদ্বয় এই সম্ভাব্য প্রশ্নের জওয়াবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি একাজ করতে পারেন না। তাই আমরা করতে বাধ্য হয়েছি।

এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল : ১. দুর্বলদেরকে সাহায্য করা পয়গম্বরগণের সুন্নত। হযরত মূসা (আ.) দু'জন রমণীকে দেখলেন যে, তারা ছাগলকে পানি পান করাতে এসে ভিড়ের কারণে সুযোগ পাচ্ছে না। তখন তিনি তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। ২. বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশত : কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যন্ত কোনো অনর্থের আশঙ্কা না হয়। ৩. আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত করার পর মহিলাদের জন্যে পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও স্বভাবগত ভদ্রতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই রমণীদ্বয় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি এবং নিজেরাই কষ্ট স্বীকার করেছে। ৪. এধরনের কাজের জন্যে নারীদের বাইরে যাওয়া তখনও পছন্দনীয় ছিল না। একারণেই রমণীদ্বয় তাদের পিতার বার্ধক্যের ওজর বর্ণনা করেছে।

فَسَقٰى لَهُمَا : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) রমণীদ্বয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কূপ থেকে পানি তুলে তাদের ছাগলকে পান করিয়েছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, রাখালদের অভ্যাস ছিল যে, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর পর একটি ভারি পাথর দ্বারা কূপের মুখ বন্ধ করে দিত। ফলে রমণীদ্বয় তাদের উচ্ছিষ্ট পানি পান করাত। এই ভারি পাথরটি দশ জনে মিলে স্থানান্তরিত করত। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) একাকী পাথরটি সরিয়ে দেন এবং কূপ থেকে পানি উত্তোলন করেন। সম্ভবত : এ কারণেই রমণীদ্বয়ের একজন মূসা (আ.) সম্পর্কে পিতার কাছে বলেছিল, সে শক্তিশালী। –[কুরতুবী]

ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ : হযরত মূসা (আ.) সাতদিন থেকে কোনো কিছু আহার করেননি। তখন এক বৃক্ষের ছায়ায় এসে আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দোয়া করার একটা সূক্ষ্ম পদ্ধতি। خَيْرٌ শব্দটি কোনো কোনো সময় ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন اِنْ تَرَكَ خَيْرَا الْوَصِيَّةُ আয়াতে। কোনো কোনো সময় শক্তির অর্থেও আসে; যেমন اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ আয়াতে। আবার কোনো সময় এর অর্থ হয় আহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই উদ্দেশ্য। –[কুরতুবী]

فَجَاءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ : কুরআনি রীতি অনুযায়ী এখানে ঘটনা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এরূপ রমণীদ্বয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাড়ি পৌঁছে গেলে বৃদ্ধ পিতা এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কন্যাদ্বয় ঘটনা খুলে বলল। পিতা দেখলেন, লোকটি অনুগ্রহ করেছে; তাকে এর প্রতিদান দেওয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্বয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্যে প্রেরণ করলেন। বালিকাটি লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌঁছল। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পর্দার নিয়মিত বিধানাবলি অবতীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী রমণীগণ পুরুষদের সাথে বিনাদ্বিধায় কথাবার্তা বলত না। প্রয়োজনবশতঃ সেখানে পৌঁছে বালিকাটি লজ্জা সহকারে কথা বলেছে। কোনো কোনো তাফসীরে বলা হয়েছে যে, সে আস্তিন দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে কথা বলেছে। তাফসীরে আরও বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) তার সাথে পথ চলার সময় বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং রাস্তা বলে দাও। বলাবাহুল্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাকাই ছিল এর লক্ষ্য। সম্ভবতঃ এ কারণেই বালিকাটি তাঁর সম্পর্কে পিতার কাছে বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এই বালিকাদ্বয়ের পিতা কে ছিলেন, এ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যত : এ কথাই বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হযরত শোআয়ব (আ.)। যেমন এক আয়াতে আছে وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا –[কুরতুবী]

اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ : বালিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি; বরং তার পিতার পয়গাম জানিয়ে দিয়েছে। কারণ কোনো বেগানা পুরুষকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ জানানো লজ্জা-শরমের পরিপন্থি ছিল।

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ : অর্থাৎ হযরত শোআয়ব (আ.)-এর এক কন্যা তার পিতার নিকট আরজ করল, গৃহের কাজের জন্য আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। কারণ চাকরের মধ্যে দু'টি গুণ থাকা আবাশ্যক। (এক) কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং (দুই) বিশ্বস্ততা। আমরা পাথর তুলে পানি পান করানো দ্বারা তার শক্তি-সামর্থ্য এবং পথিমধ্যে আমাকে পশ্চাতে রেখে পথচলা দ্বারা তার বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

কোন চাকরি অথবা পদ ন্যাস্ত করার জন্য জরুরি শর্ত দুইটি : হযরত শোআয়ব (আ.)-এর কন্যার মুখে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত বিজ্ঞসুলভ কথা উচ্চারিত করিয়েছেন। আজকাল সরকারি পদ ও চাকরির ক্ষেত্রে কাজের যোগ্যতা ও

ডিগ্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হলেও বিশ্বস্ততার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ সাধারণ অফিস ও পদসমূহের কর্মতৎপরতায় পূর্ণ সাফল্যের পরিবর্তে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কারণে আইন-কানুন অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। আফসোস! এই কুরআনি পথ নির্দেশের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যেত।

قَالَ اِنِّیْٓ اُرِیْدُ اَنْ اُنْکِحَكَ اِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰتَیْنِ : অর্থাৎ বালিকাদ্বয়ের পিতা হযরত শোআয়ব (আ.) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে বিবাহ দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে পাত্রীর অভিভাবকের উচিত পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা। বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গম্বরগণের সুন্নত। উদাহরণত : হযরত ওমর (রা.) তাঁর কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর নিজেই হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত উসমান গণী (রা.)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন। -[কুরতুবী]

হযরত শোআয়ব (আ.) উভয় কন্যার মধ্য থেকে কোনো একজনকে নির্দিষ্ট করে কথা বলেন নি; বরং ব্যাপারটি অস্পষ্ট রেখে কোনো একজনকে বিবাহ দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই আলোচনা বিবাহের নিয়মিত আলোচনা ছিল না, যাতে ইজাব কবুল ও সাক্ষীদের উপস্থিতি জরুরি হয়; বরং এটা ছিল আদান-প্রদানের আলোচনা যে, এই বিবাহের বিনিময়ে তুমি আট বছর আমার চাকরি করতে স্বীকৃত হলে আমি বিবাহ পড়িয়ে দিব। হযরত মূসা (আ.) এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর নিয়মিত বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার কথা আপনা-আপনিই বুঝা যায়। কুরআন পাক সাধারণত ঘটনার সেই অংশ উল্লেখ করে না, যা পূর্বাপর বর্ণনা থেকে আপনা-আপনি বুঝা যায়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে এরূপ সন্দেহ অমূলক যে, বিবাহিত স্ত্রীকে নির্দিষ্ট না করেই বিবাহ কিরূপে হয়ে গেল অথবা সাক্ষীদের উপস্থিতি ব্যতিরেকেই বিবাহ কিরূপে সংঘটিত হলো? -(রূহুল মা'আনী, বয়ানুল কুরআন)

عَلٰٓی اَنْ تَاْجُرَنِیْ ثَمٰنِیَ حِجَجٍ : এই আট বছরের চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়। স্ত্রীর চাকরিকে স্বামী তার মোহরানা সাব্যস্ত করতে পারে কি না, এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে আহকামুল কুরআনের সূরা কাসাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে, মোহরানার এই ব্যাপারটি মোহাম্মদী শরিয়তে জায়েজ না হলেও হযরত শোআয়ব (আ.)-এর শরিয়তে জায়েজ ছিল। বিভিন্ন শরিয়তে এ ধরনের শাখাগত পার্থক্য হওয়া কুরআন হাদীসে প্রমাণিত আছে।

ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) থেকে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, স্ত্রীর চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা তো স্বামীর মান-সম্মানের খেলাফ; কিন্তু স্ত্রীর যে কাজ বাড়ির বাইরে করা হয়; যেমন পশুচারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি-এ ধরনের কাজে ইজারার শর্তানুযায়ী মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হলে এই চাকরিকে মোহরানা করা জায়েজ; যেমন আলোচ্য ঘটনায় আট বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই নির্দিষ্ট মেয়াদের বেতন আদায় করা স্ত্রীর জিম্মায় জরুরি। কাজেই একে মোহরানা গণ্য করা জায়েজ। -(বাদায়ে)

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য। স্ত্রীর পিতা অথবা অন্য কোনো স্বজনকে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে মোহরানা অর্থ হাতে হাতে দিয়ে দিলে মোহর আদায় হয় না আলোচ্য ঘটনায় اَنْ تَاْجُرَنِیْ শব্দ সাক্ষ্য দেয় যে, পিতা তাকে নিজের কাজের জন্য চাকর নিযুক্ত করেন। অতএব চাকরির ফল পিতা লাভ করেছেন। এটা স্ত্রীর মোহরানা কিরূপে হতে পারে? উত্তর এই যে, প্রথমত এটাও সম্ভবপর যে, এই ছাগলগুলো বালিকাদের মালিকানাধীন ছিল। অতএব চাকরির এই ফল বালিকারাই লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত যদি হযরত মূসা (আ.) পিতারই কাজ করেন এবং পিতার জিম্মায়ই তার বেতন আদায় করা জরুরি হয় তবে মোহরানার এই টাকা কন্যার হয়ে যাবে এবং কন্যার অনুমতিক্রমে পিতাও একে ব্যবহার করতে পারেন। বলা বাহুল্য, আলোচ্য ব্যাপারটি কন্যার অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

মাসআলা : اُنْکِحَكَ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপার পিতা সম্পন্ন করেছেন। ফিকহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কন্যার অভিভাবক তার বিবাহকার্য সম্পন্ন করবে; কন্যা নিজে করবে না। তবে কোনো কন্যা প্রয়োজন ও বাধ্য-বাধকতার চাপে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরস্ত হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আজম (র.)-এর মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোনো ফয়সালা দেয়নি।

শব্দ বিশ্লেষণ :

خَائِفًا : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ سَمِعَ বাব خَوْفٌ মাসদার (خ ـ و ـ ف) মূলবর্ণ اجوف জিনস واوى অর্থ– ভীত অবস্থায়।

تَوَجَّهَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَوَجُّهٌ মূলবর্ণ (و ـ ج ـ ه) জিনস مثال واوى অর্থ– তিনি ধরলেন।

تَذُوْدَانِ : সীগাহ تثنية مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার ذَوْدٌ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

حَتّٰى يُصْدِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصْدَارٌ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা দূরে সরে যায়।

سَقَيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَقْىٌ মূলবর্ণ (س ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আপনি পানি পান করিয়ে দিয়েছেন।

نَجَوْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَجَاةٌ মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি রক্ষা পেয়েছ।

اِسْتَأْجِرْهُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِجَارَةٌ মূলবর্ণ (أ ـ ج ـ ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– আপনি তাকে পরিচালক নিযুক্ত করুন।

اَنْ اُنْكِحَكَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْكَاحٌ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– আমি তোমার সাথে বিবাহ দিব।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ : এখানে وَجَدَ ফে'ল তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর হলো ফায়েল, আর عَلَيْهِ মুতা'আল্লিক হলো وَجَدَ-এর সাথে। اُمَّةً হলো مفعول به আর مِنَ النَّاسِ হলো اُمَّةً-এর সিফাত। আর يَسْقُوْنَ বাক্যটি اُمَّةً-এর দ্বিতীয় সিফাত অথবা حال আর يَسْقُوْنَ-এর মাফউল উহ্য রয়েছে বিষয়টি জ্ঞাত থাকার কারণে। অর্থাৎ مَوَاشِيَهُمْ –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড : পৃ. ৫৯১]

২৯. মোটকথা, মূসা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করলেন এবং স্বীয় স্ত্রীকে নিয়ে যাত্রা করলেন তখন তিনি তূর পর্বতের দিক হতে একপ্রকার অগ্নি (-রূপ আলো) দেখতে পেলেন, তিনি স্বীয় পরিজনবর্গকে বললেন, তোমরা (এখানে) অপেক্ষা কর, আমি একপ্রকার অগ্নি দেখতে পাচ্ছি, সম্ভবত আমি তথা হতে তোমাদের জন্য (পথের) সন্ধান অথবা আগুনের (জ্বলন্ত) কয়লা আনয়ন করতে পারব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।	فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّیْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْۤ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. যখন তিনি উক্ত আগুনের নিকটে পৌঁছলেন, তখন সেই উপত্যকার ডান দিক হতে সেই বরকতময় স্থানে– একটি বৃক্ষ হতে আওয়াজ আসল, হে মূসা! আমি আল্লাহ, সকল জগতের প্রতিপালক,	فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِیَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ یّٰمُوْسٰۤی اِنِّیْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. আর এ (কথাও) যে, তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর; (তিনি তা ফেলা মাত্র তা এক অজগরে পরিণত হলো) অতঃপর যখন তিনি তাকে (দ্রুতগামী) সরু সর্পের ন্যায় নড়াচড়া করতে দেখলেন, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলেন এবং পশ্চাতে ফিরেও তাকালেন না; (আদেশ হলো), হে মূসা সম্মুখে আস, ভয় করো না, নিশ্চয় তুমি নিরাপদে রয়েছ।	وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰی مُدْبِرًا وَّلَمْ یُعَقِّبْ ؕ یٰمُوْسٰۤی اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۫ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ ﴿٣١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ মোটকথা মূসা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করলেন وَسَارَ بِاَهْلِهٖ এবং স্বীয় স্ত্রীকে নিয়ে যাত্রা করলেন اٰنَسَ তখন তিনি দেখতে পেলেন مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ তূর পর্বতের দিক হতে نَارًا এক প্রকার অগ্নি قَالَ لِاَهْلِهِ তিনি স্বীয় পরিজনবর্গকে বললেন امْكُثُوْۤا তোমরা (এখানে) অপেক্ষা কর اِنِّیْۤ اٰنَسْتُ نَارًا আমি এক প্রকার অগ্নি দেখতে পাচ্ছি لَّعَلِّیْۤ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا সম্ভবত : আমি তথা হতে তোমাদের জন্য আনয়ন করতে পারব بِخَبَرٍ (পথের) সন্ধান اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ অথবা আগুনের কয়লা لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।

৩০. فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا যখন তিনি উক্ত আগুনের নিকটে পৌঁছলেন نُوْدِیَ তখন আওয়াজ আসল مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَیْمَنِ সেই উপত্যকার ডান দিক হতে فِی الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ সেই বরকতময় স্থানে مِنَ الشَّجَرَةِ একটি বৃক্ষ হতে اَنْ یّٰمُوْسٰۤی হে মূসা! اِنِّیْۤ اَنَا اللّٰهُ আমি আল্লাহ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ সকল জগতের প্রতিপালক।

৩১. وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ আর এই যে, তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ অতঃপর যখন তিনি তাকে নড়াচড়া করতে দেখলেন كَاَنَّهَا جَآنٌّ সরু সর্পের ন্যায়। وَّلّٰی مُدْبِرًا তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলেন وَّلَمْ یُعَقِّبْ এবং পশ্চাতে ফিরেও তাকালেন না یٰمُوْسٰۤی হে মূসা! اَقْبِلْ সম্মুখে আস, وَلَا تَخَفْ, ভয় করো না اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ নিশ্চয় তুমি নিরাপদে রয়েছ।

اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٢﴾	৩২. তুমি তোমার হাত জামার বুকের অংশের ভিতরে স্থাপন কর, তা কোনো প্রকার ব্যাধি ব্যতীত অতিশয় দীপ্তিমান হয়ে প্রকাশ পাবে এবং ভয় (দূরীকরণ) হেতু তোমার হাতটি পুনরায় তোমার (জামার ও) বগলের সাথে সংযুক্ত কর, (তাতে পূর্বরূপ প্রাপ্ত হবে,) সুতরাং এ দুটি হচ্ছে তোমার প্রভুর পক্ষ হতে সনদ, ফেরাউন এবং তার নেতৃবৃন্দের নিকট যাওয়ার জন্য; (কেননা,) তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।
قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٣﴾	৩৩. তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা ,করেছিলাম, অতএব, আশঙ্কা হয় যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।
وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ ؗ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٤﴾	৩৪. আর আমার ভ্রাতা হারূন আমার অপেক্ষা বাকপটু, সুতরাং তাঁকে আমার সাহায্যকারীরূপে আমার সাথে নবুয়ত প্রদান করুন, তিনি আমার সত্যতা প্রতিপাদন করবেন, আমার আশঙ্কা হয়, তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।
قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾	৩৫. আল্লাহ বললেন, আমি এখনই তোমার ভাইকে সঙ্গে দিয়ে তোমার বাহু সুদৃঢ় করে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের উভয়কে এক বিশেষ প্রভাব প্রদান করছি যে, তারা তোমাদের কাছেও পৌছতে পারবে না, তোমরা আমার মু'জিযাগুলোসহ যাও, তোমরা এবং যারা তোমাদের উভয়ের অনুসরণ করবে জয়ী থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. اُسْلُكْ يَدَكَ তুমি তোমার হাত স্থাপন কর فِيْ جَيْبِكَ জামার বুকের অংশের ভিতরে تَخْرُجْ بَيْضَآءَ তা অতিশয় দীপ্তিময় হয়ে প্রকাশ পাবে مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ কোনো প্রকার ব্যাধি ব্যতীত وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ এবং তোমার হাতটি পুনরায় তোমার বগলের সাথে সংযুক্ত কর مِنَ الرَّهْبِ ভয় (দূরীকরণ) হেতু فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ সুতরাং এদুটি হচ্ছে সনদ مِنْ رَّبِّكَ তোমার প্রভুর পক্ষ হতে اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ফেরাউন এবং তার নেতৃবৃন্দের নিকট যাওয়ার জন্য اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ তারা অত্যন্ত সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৩৩. قَالَ তিনি নিবেদন করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম فَاَخَافُ অতএব, আশঙ্কা হয় যে, اَنْ يَّقْتُلُوْنِ তারা আমাকে হত্যা করবে।

৩৪. وَاَخِيْ هٰرُوْنُ আর আমার ভ্রাতা হারূন هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا আমার অপেক্ষা বাকপটু فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ সুতরাং তাকে আমার সাথে নবুয়ত প্রদান করুন رِدْاً আমার সাহায্যকারী রূপে يُّصَدِّقُنِيْٓ তিনি আমার সত্যতা প্রতিপাদন করবেন اِنِّيْٓ اَخَافُ আমার আশঙ্কা হয় اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

৩৫. قَالَ আল্লাহ বললেন سَنَشُدُّ عَضُدَكَ আমি এখনই তোমার বাহু সুদৃঢ় করে দিচ্ছি بِاَخِيْكَ তোমার ভ্রাতাকে সঙ্গে দিয়ে وَنَجْعَلُ لَكُمَا এবং আমি তোমাদের উভয়কে এক বিশেষ প্রভাব প্রদান করছি যে, فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا তারা তোমাদের কাছেও পৌছতে পারবে না بِاٰيٰتِنَآ তোমরা আমার মু'জিযাগুলোসহ যাও اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا তোমরা এবং যারা তোমাদের উভয়ের অনুসরণ করবে الْغٰلِبُوْنَ জয়ী থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) চাকুরীর নির্দিষ্ট আট বছর বাধ্যতামূলক এবং দুই বছর ঐচ্ছিক মেয়াদ পূর্ণ করলেন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, হযরত মূসা (আ.) আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন, না দশ বছরের? সহীহ্ বুখারীতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, অধিক মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। পয়গম্বরগণ যা বলেন তা পূর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও প্রাপককে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশি দিতেন এবং তিনি উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকরি, পারিশ্রমিক ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করবে।

نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ .... اِنِّيْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ : এই বিষয়বস্তু সূরা তোয়াহা ও সূরা নামলে বর্ণিত হয়েছে। সূরা তোয়াহায় اِنِّيْ اَنَا رَبُّكَ সূরা নমলে نُوْدِيَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ এবং আলোচ্য সূরায় اِنِّيْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ বলা হয়েছে। বিভিন্ন সূরায় উল্লিখিত এসব আয়াতের ভাষা বিভিন্নরূপ হলেও অর্থ প্রায় একই। প্রত্যেক জায়গায় উপযুক্ত ভাষায় ঘটনা বিধৃত হয়েছে। অগ্নির আকারে এই তাজাল্লী ছিল রূপক তাজাল্লী। কারণ সত্তাগত তাজাল্লী এই দুনিয়াতে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সত্তাগত তাজাল্লীর দিক দিয়ে স্বয়ং হযরত মূসা (আ.)-কে لَنْ تَرَانِيْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। মানে, আমার সত্তাকে দেখতে পারবে না।

সৎকর্ম দ্বারা স্থানও বরকতময় হয়ে যায় : فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ তূর পর্বতের এই স্থানকে কুরআন পাক 'বরকতময় ভূমি' বলেছে। বলা বাহুল্য, এর বরকতময় হওয়ার কারণ আল্লাহ্‌র তাজাল্লী, যা আগুনের আকারে এ স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, যে স্থানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সে স্থানও বরকতময় হয়ে যায়।

ওয়াজে বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতা কাম্য : هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا এ থেকে জানা গেল যে, ওয়াজ ও প্রচারকার্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি কাম্য। এই গুণ অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো নিন্দনীয় নয়।

হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত লাভ : আলোচ্য আয়াতে اَلْبُقْعَةُ الْمُبَارَكَةُ বলে পবিত্র ও বরকতময় স্থান উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা এ স্থানেই আল্লাহ পাক হযরত মূসা ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁকে নবুয়ত ও রেসালত দানে ধন্য করেছেন।

তাফসীরকার আতা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মোবারাকাহ শব্দটির অর্থ হলো মোকাদ্দাস বা পবিত্র, কেননা অন্যত্র এর স্থলে 'আল মোকাদ্দাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

اَلشَّجَرَةُ অর্থ-বৃক্ষ। এ বৃক্ষটি ঐ পবিত্র স্থানের এক পার্শ্বে ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, এ **বৃক্ষটি ছিল সবুজে পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত চমকদার।**

তাফসীরকার কাতাদা, কালবী এবং মোকাতেল (র.) বলেছেন, এ বৃক্ষটির নাম ছিল আওজাহ। আর ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেছেন, এর নাম ছিল আলীক। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটি ছিল আজব বৃক্ষ।

আলোচ্য আয়াতে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ আর সূরা নামলে ইরশাদ হয়েছে– اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ এবং সূরা ত্বা-হায় ইরশাদ হয়েছে– اَنَا رَبُّكَ তাফসীরকারগণ বলেছেন, তিনটি সূরায় যদিও ভাষার পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য একই। যদিও বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপি একই অর্থ এবং উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট রয়েছে। অথবা কথা বলার সময় আল্লাহ পাক উল্লিখিত সমস্ত গুণাবলির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআনে কারীমে যখন এর বিবরণ প্রদান করেছেন, তখন অল্প অল্প করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা ত্বা-হায় ইরশাদ হয়েছে– فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى অর্থাৎ [হে মূসা!] তোমার জুতা খুলে নাও, কেননা তুমি পবিত্র ভূমিতে রয়েছে।

আর সূরা নামলে ইরশাদ হয়েছে– بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ "যিনি আগুনের অনুসন্ধানে রয়েছেন, তিনি মোবারক।" এমন অবস্থায় এর দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ "যারা তার চারপার্শ্বে" এর দ্বারা ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে নবুয়ত ও রেসালতের মর্যাদায় ধন্য করেছেন। আর এ আয়াত থেকে নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ তাঁকে যে মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে, তার উল্লেখ রয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ

হে মূসা! তোমার লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ কর! যখন হযরত মূসা (আ.) তার লাঠিটি ফেলে দিলেন, তখন তা সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট অজগরে পরিণত হলো।

এরপর যখন হযরত মূসা (আ.) তাকে সাপের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলেন, আর পশ্চাতে ফিরেও তাকালেন না। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ হলো– يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ অর্থাৎ হে মূসা! সম্মুখের দিকে এসো, আর ভয় করো না, নিশ্চয় তুমি নিরাপদে থাকবে, তোমার কোনো আশঙ্কা নেই।

অর্থাৎ এ অজগর দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, দুশমনকে ভয় প্রদর্শন করার নিমিত্তেই তোমাকে এ মু'জিযা দেওয়া হয়েছে। এ কথা শ্রবণ করা মাত্র হযরত মূসা (আ.)-এর অন্তরে মানুষ হিসেবে যে ভীতি ছিল তা দূরীভূত হয়।

বর্ণিত আছে যে, এ ভয়ংকর অজগরটি যখন মুখ খুলত, তখন মনে হতো এখনি সব কিছু গিলে ফেলবে। আর যেদিক থেকে তা যাতায়াত করত, সেদিকের পাথরগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। এসব দেখে হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত ভীত হলেন, এজন্য তিনি আর সেখানে দাঁড়াতে পারেননি, আর পেছনেও তাকাননি। যখন আল্লাহ পাক তাঁকে সম্বোধন করে অভয় দান করলেন, তখন তিনি নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হলেন এবং আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন।

قَوْلُهُ اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর একটি মু'জিযার উল্লেখ ছিল, আর এ আয়াতে তাঁর আরেকটি মু'জিযার কথা বলা হয়েছে। প্রথম মু'জিযা ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি যা মাটিতে ফেললেই ভয়ঙ্কর অজগরে পরিণত হতো এবং দুশমনের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াত। হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় মু'জিযা হলো তাঁর হাত থেকে নূর প্রকাশিত হওয়া। হযরত মূসা (আ.) যখন তাঁর বগলে হাত দিয়ে তা বের করে আনতেন, তখন তা আলোয় ঝলমল করত এবং তা থেকে নূর বিচ্ছুরিত হতো।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ মু'জিযাটি ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর আলোকময় অন্তরের আলোর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এ দু'টি হলো হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত ও রেসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ যা তাঁকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদান করা হয়েছে। লাঠি দ্বারা দুষ্টের দমন বা পাপাচার বন্ধ করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর দীপ্তিমান হাত দ্বারা মনকে আলোকিত করে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমনি নিদর্শন আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না। যেভাবে এ দু'টি নিদর্শন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে, ঠিক তেমনিভাবে তূর পর্বতে ঐ নূরানী বৃক্ষ থেকে তুমি যা শ্রবণ করেছ তা-ও আমারই বাণী। আর যে অগ্নি তুমি দেখেছ তা আমারই নূরের তাজাল্লী, যা তোমাকে অগ্নির আকৃতিতে দেখানো হয়েছে। যেহেতু তখন তুমি অগ্নির অনুসন্ধানে ছিলে, তাই তোমাকে অগ্নির আকৃতিতেই নূরের তাজাল্লী দেখানো হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) -এর হাত যে আলোকময় হতো, তা কোনো রোগের কারণে নয়; যেমন শ্বেতরোগের কারণে মানুষের হাত সাদা হয়ে যায়; বরং এটি ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা। যেহেতু পরিবর্তিত তাওরাতে হযরত মূসা (আ.)-এর হাতের মু'জিযাকে শ্বেতরোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এ বাক্যে দ্বারা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, এটা কোনো রোগ নয়; বরং আল্লাহ পাকের হুকুমে হযরত মূসা (আ.)-এর হাত নূরানী হতো। এটি ছিল তাঁর অন্যতম মু'জিযা।

قَوْلُهُ وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ : **ভয় দূর করার পন্থা :** তাফসীরকার আতা (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমার হাত দু'টি নিজের দিকে চেপে ধর। অর্থাৎ তোমার হাতকে তোমার বক্ষের উপর স্থাপন কর! যাতে করে তোমার মনের ভয় দূরীভূত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর পর যে কোনো ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তিই নিজ হাত তার বক্ষের উপর রাখে, তার ভয় দূর হয়ে যায়। আর তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এ দ্বারা শান্তি, দৃঢ়তা এবং সৎসাহস উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ যে এভাবে বক্ষের উপর হাত রাখবে, সে এসব গুণাবলি অর্জন করতে পারবে।

আল্লামা বগভী (র.) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তুমি তোমার ভয়কে দূর কর। কেননা ভীত ব্যক্তির মন চরম অস্থির হয় এবং তার দেহ কম্পমান হয়। আর বক্ষের উপর হাত রাখলে এ অবস্থা দূরীভূত হয়।

ফাররা (র.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যাংশে جَنَاحَ শব্দটি দ্বারা লাঠি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ লাঠিকে তোমার কাছে টেনে নাও। যেহেতু লাঠিটি অজগর সাপে পরিণত হয়েছে এবং লাঠিকে ছেড়ে দিয়ে হাতকে ছড়িয়ে রেখেছেন, তাই ইরশাদ হয়েছে যে, তুমি লাঠিকে নিজের দিকে টেনে নাও, আর তা করার সঙ্গে সঙ্গে অজগর রূপী লাঠিটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হয়।

فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ : অর্থাৎ এই লাঠি এবং আলোকময় হাত– এ দু'টি মু'জিযা তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমার নবুয়তের দলিল প্রমাণ হিসেবে প্রদান করা হলো। ফেরাউন ও তার দলবলের নিকট যাওয়ার জন্য এ দু'টি হলো তোমার নিকট দলিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা অত্যন্ত নাফরমান, পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়। তোমার নবুয়ত ও রেসালতের এ দুটি জীবন্ত নিদর্শন নিয়ে তুমি তাদের নিকট যাও!।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. পৃ. ১১৭-১১৮]

শব্দ বিশ্লেষণ :

سَارَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَيْرٌ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তিনি যাত্রা করলেন।

اٰنَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْنَاسٌ মূলবর্ণ (أ - ن - س) জিনস مهموز فاء অর্থ– তিনি দেখতে পেলেন।

اُمْكُثُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَكْثٌ মূলবর্ণ (م - ك - ث) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অপেক্ষা কর।

اٰنَسْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْنَاسٌ মূলবর্ণ (أ - ن - س) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমি দেখতে পাচ্ছি।

تَصْطَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِصْطِلَاءٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা আগুন পোহাতে পার।

نُوْدِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَة মাসদার نِدَاءٌ মূলবর্ণ (ن - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আওয়াজ আসল, তাকে ডাকা হলো।

اُضْمُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার ضَمٌّ মূলবর্ণ (ض - م - م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তুমি পুনরায় সংযুক্ত কর।

اَفْصَحُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব فَتَحَ মাসদার فَصَحٌ মূলবর্ণ (ف - ص - ح) জিনস صحيح অর্থ– অধিক বাকপটু।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ : এখানে اُسْلُكْ ফে'ল তার উহ্য যমীর ফায়েল يَدَكَ মাফউলে বিহী, আর فِىْ جَيْبِكَ হলো اُسْلُكْ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। تَخْرُجْ ফেল তার উহ্য যমীর هِىَ হলো ফায়েল আর بَيْضَاءَ হলো حال আর مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ হলো بَيْضَاءَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক।

৩৬. অতঃপর যখন মূসা তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ উপস্থিত হলেন, তখন তারা বলল, এটা তো কেবল একটা জাদু, (মু'জিযা আখ্যা দিয়ে) মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, আর আমরা এমন ব্যাপার কখনও শুনিনি যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগেও হয়েছিল।	فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. এবং মূসা বললেন, আমার প্রতিপালক সেই ব্যক্তিকে খুব ভালো করে জানেন, যেই ব্যক্তি তাঁর নিকট হতে সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছে এবং যার পরিণাম ইহজগত অপেক্ষা উত্তম হবে; নিঃসন্দেহে অনাচারীরা কখনও সুফল প্রাপ্ত হবে না।	وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. এবং ফেরাউন (নিজের লোকদেরকে) বলল, হে সভাসদবৃন্দ! আমি ভিন্ন তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে তো আমার মনে হয় না, হে হামান! তুমি আমার জন্য মৃত্তিকাকে আগুনে পোড়াও, (অর্থাৎ ইট প্রস্তুত কর,) অতঃপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর যেন আমি মূসার মা'বূদের সন্ধান নিতে পারি, আর আমি তো মূসাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি।	وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى অতঃপর যখন মূসা তাদের নিকট উপস্থিত হলেন بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ قَالُوْا তখন তারা বলল مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى এটাতো কেবল একটা জাদু وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا আর আমরা এমন ব্যাপার কখনো শুনিনি যে, فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগেও হয়েছিল।

৩৭. وَقَالَ مُوْسٰى এবং মূসা বললেন رَبِّيْٓ اَعْلَمُ আমার রব সেই ব্যক্তিকে খুব ভালো করে জানেন بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى যে ব্যক্তি সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছে مِنْ عِنْدِهٖ তাঁর নিকট হতে وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ এবং যার পরিণাম ইহজগত অপেক্ষা উত্তম হবে اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ নিঃসন্দেহে অনাচারীরা কখনও সুফল প্রাপ্ত হবে না।

৩৮. وَقَالَ فِرْعَوْنُ এবং ফেরাউন বলল يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ হে সভাসদবৃন্দ! مَا عَلِمْتُ আমার মনে হয় না لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ আমি ভিন্ন তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ হে হামান! তুমি আমার জন্য মৃত্তিকাকে আগুনে পোড়াও فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا অতঃপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى যেন আমি মূসার মাবূদের সন্ধান নিতে পারি وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ, আর আমি তো মূসাকে মিথ্যাবাদী বলেই মনে করি।

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٩﴾	৩৯. আর ফেরাউন ও তার বাহিনী পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিল, আর এরূপ মনে করত যে, তাদেরকে আমার সমীপে ফিরে আসতে হবে না।
فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾	৪০. সুতরাং আমি তাকে এবং তার অনুবর্তীদেরকে পাকড়াও করে নদীতে নিক্ষেপ করলাম (ডুবিয়ে মারলাম), অতএব, দেখুন, অনাচারীদের পরিণাম কেমন হলো।
وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾	৪১. আর আমি তাদেরকে এমন নেতা বানিয়েছিলাম, যারা (লোকদেরকে) দোজখের প্রতি আহ্বান করছিল এবং কিয়ামত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।
وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٤٢﴾	৪২. আর পৃথিবীতেও আমি তাদের পশ্চাতে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি, এবং কিয়ামত দিবসেও তারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾	৪৩. আর আমি মূসাকে পূর্ববর্তী উম্মতদের (নূহ-সম্প্রদায় এবং আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায়ের) ধ্বংস করার পর কিতাব দান করেছিলাম, তা মানুষের জন্য জ্ঞান লাভের উপকরণ এবং হেদায়েত ও রহমত ছিল যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ আর ফেরাউন ও তার বাহিনী অহংকার করেছিল فِى الْاَرْضِ পৃথিবীতে بِغَيْرِ الْحَقِّ অন্যায়ভাবে وَظَنُّوْٓا আর এরূপ মনে করত যে اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ তাদেরকে আমার সমীপে ফিরে আসতে হবে না।

৪০. فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ সুতরাং আমি তাকে ও তার অনুবর্তীদেরকে পাকড়াও করে فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ নদীতে নিক্ষেপ করলাম فَانْظُرْ অতএব দেখুন كَيْفَ كَانَ কেমন হলো عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ অনাচারীদের পরিণাম।

৪১. وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً আর আমি তাদেরকে এমন নেতা বানিয়েছিলাম يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ যারা (লোকদেরকে) দোজখের প্রতি আহ্বান করছিল وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ এবং কিয়ামত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

৪২. وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً আর পৃথিবীতেও আমি তাদের পশ্চাতে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ এবং কিয়ামত দিবসেও তারা مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৪৩. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا আর আমি দান করেছিলাম مُوْسٰى মূসাকে الْكِتٰبَ কিতাব مِنْۢ بَعْدِ পর مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى পূর্ববর্তী উম্মতদের ধ্বংস করার بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ তা মানুষের জন্য জ্ঞান লাভের উপকরণ وَهُدًى এবং হেদায়েত وَّرَحْمَةً এবং রহমত ছিল لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَأَوْقِدْ لِي يَـٰهَـٰمَـٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ : ফেরাউন সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিল। তাই সে উজির হামানকে মাটির ইট পুড়ে পাকা করার আদেশ করল। কারণ কাঁচা ইট দ্বারা বিশাল ও সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, ফেরাউনের এই ঘটনার পূর্বে পাকা ইটের প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম ফেরাউন এটা আবিষ্কার করেছে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে আছে, হামান এই প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে পঞ্চাশ হাজার রাজমিস্ত্রী যোগাড় করল। মজুর এবং কাঠ ও লোহার কাজ যারা করত, তাদের সংখ্যা ছিল এর অতিরিক্ত। প্রাসাদটি এত উচ্চ নির্মিত হয়েছিল যে, তখনকার যুগে এত উচ্চ প্রাসাদ কোথাও ছিল না। প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে পরে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.) কে আদেশ করলেন। তিনি এক আঘাতে একে ত্রিখণ্ডিত করে ভূমিসাৎ করে দিলেন। ফলে ফেরাউনের হাজারো সিপাহী এর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে –[কুরতুবী]

وَجَعَلْنَـٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের পারিষদবর্গকে দেশ ও জাতির নেতা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। এখানে অধিকাংশ তাফসীরকার জাহান্নামের দিকে আহ্বান করাকে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ জাহান্নাম বলে কুফরি কাজকর্ম বোঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল জাহান্নাম ভোগ করা। কিন্তু মাওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র.)-এর সুচিন্তিত অভিমত (ইবনে আরাবীর অনুকরণে) এই ছিল যে, হুবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বরযখে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন করে পদার্থের রূপ ধারণ করবে। সৎকর্মসমূহ পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান হয়ে জান্নাতের নিয়ামতে পর্যবসিত হবে এবং কুফর ও জুলুমের কার্যসমূহ সর্প, বিচ্ছু এবং নানারকম আজাবের আকৃতি ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও জুলুমের দিকে আহ্বান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহ্বান করে; যদিও এ দুনিয়াতে কুফর ও জুলুম জাহান্নাম তথা আগুনের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোনো রূপকতা নেই। এই অভিমত গ্রহণ করা হলে কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে রূপকতার আশ্রয় নেওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে; উদাহরণত : وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا আয়াতে এবং فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ আয়াতে।

وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ : مَقْبُوحِينَ শব্দের বহুবচন। مَقْبُوحٌ অর্থাৎ বিকৃত। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কালোবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ করবে।

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ : 'পূর্ববর্তী সম্প্রদায়' বলে হযরত নূহ, হুদ, সালেহ্ ও লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় সমূহকে বোঝানো হয়েছে। তারা হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। بَصَآئِرَ শব্দটি بَصِيرَةٌ-এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এখানে সেই নূর বোঝানো হয়েছে। যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দ্বারা মানুষ বস্তুর স্বরূপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ এখানে نَاسٌ শব্দ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মত বোঝানো হলে তাতে কোনো খটকা নেই। কারণ সেই উম্মতের জন্য তওরাতই ছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি نَاسٌ শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীসহ সমগ্র মানবজাতিকে বোঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর আমলে যে তাওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবে? এ ছাড়া এ থেকে জরুরি হয় যে, মুসলমানদেরও তওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত যে, হযরত ওমর ফারূক (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাওরাতের উপদেশাবলি পাঠ করার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে মূসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ করা। তাওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দেখা তোমার জন্যে ঠিক নয়। কিন্তু এর জওয়াবে একথা বলা যায় যে, সেই যুগের আহলে-কিতাবের হাতে তওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং যুগ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ; যাতে কুরআন-অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কুরআনের পূর্ণ হেফাজতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো সাহাবীকে

হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ কুরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোনো রহিত খোদায়ী গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপন্থি ছিল। এ থেকে জরুরি নয় যে, সর্বাবস্থায় তাওরাত ও ইনজীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সে সব অংশ পাঠ করা ও উদ্ধৃত করা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য সাহাবীগণও তাদের একাজ অপছন্দ করেননি। কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তওরাত ও ইনজীলে যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলাবাহুল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তাঁরাই উপকৃত হতে পারেন, যারা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারেন। তাঁরা হলেন বিশেষজ্ঞ আলেম শ্রেণি। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তা-ই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে কোনো ক্ষতি নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُفْتَرًى : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ افتعال বাব اِفْتِرَاءٌ মাসদার (ف - ر - ى) মূলবর্ণ জিনস ناقص يائى অর্থ– মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে।

فَاَوْقِدْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اِيْقَادٌ মাসদার (و - ق - د) মূলবর্ণ জিনস مثال واوى অর্থ– তুমি আগুনে পোড়াও।

اَطَّلِعُ : সীগাহ واحد متكلم مضارع معروف বহছ اِفْتِعَالٌ বাব اِطِّلَاعٌ মাসদার (ط - ل - ع) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– আমি সন্ধান নিতে পারি।

لَاَظُنُّهٗ : সীগাহ واحد متكلم فعل مضارع معروف বহছ ضَرَبَ বাব ظَنٌّ মাসদার (ظ - ن - ن) মূলবর্ণ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমি তো (মূসাকে) মনে করি।

اِسْتَكْبَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب فعل ماضى معروف বহছ اِسْتِفْعَالٌ বাব اِسْتِكْبَارٌ মাসদার মূলবর্ণ (ك - ب - د) জিনস صحيح অর্থ– সে অহংকার করেছিল।

اَتْبَعْنٰهُمْ : সীগাহ جمع متكلم ماضى معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اِتْبَاعٌ মাসদার (ت - ب - ع) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– আমি তাদের পশ্চাদে লাগিয়ে দিয়েছি।

اَلْمَقْبُوْحِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم مفعول বহছ كَرُمَ বাব قَبَاحَةٌ মাসদার (ق - ب - ح) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– দুর্দশাগ্রস্ত লোকজন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَعَلِّیْۤ اَطَّلِعُ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى اِنِّیْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ : এখানে لَعَلِّیْ -এর لَعَلَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর ياء হলো لَعَلَّ اسم আর اَطَّلِعُ বাক্যটি لَعَلَّ خبر আর اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى টা اَطَّلِعُ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর وَاِنِّىْ -এর واو টি হলো আতেফা اِنِّیْ হলো হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল ও اِنَّ اسم আর لَاَظُنُّهٗ ফে'ল, ফায়েল ও প্রথম মাফউলে বিহী মিলে اِنَّ خبر হয়েছে। আর مِنَ الْكٰذِبِيْنَ হলো দ্বিতীয় মাফউলের স্থানে।

[ই'রাবুল কুরআন ম খণ্ড : পৃ. ৬১৪]

৪৪. আর হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি তো (তূর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে ছিলেন না যখন আমি মূসাকে আদেশসমূহ (তাওরাত) দান করেছিলাম এবং আপনি তো সেই সমস্ত লোকদের মধ্যেই ছিলেন না, যারা (তখন) বিদ্যমান ছিল,	وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوْسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. কিন্তু (অবস্থা এই যে,) আমি (মূসার পরে) বহু সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাদের উপর বহুকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, আর আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও অবস্থানকারী ছিলেন না যে, আপনি আমার আয়াতগুলো এ সমস্ত লোককে পাঠ করে শুনাচ্ছেন, কিন্তু আমিই তো রাসূল প্রেরণকারী।	وَلٰكِنَّآ أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. আর আপনি তূর পর্বতের (পশ্চিম) পার্শ্বে তখনও ছিলেন না যখন আমি মূসাকে ডেকেছিলাম, কিন্তু এটা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ, যেন আপনি এমন লোকদের ভয় প্রদর্শন করেন, যাদের প্রতি আপনার পূর্বে কোনো ভয় প্রদর্শনকারী নবী আসেননি, যেন তারা নসিহত গ্রহণ করে।	وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. وَمَا كُنْتَ আর হে মুহাম্মদ! আপনি তো ছিলেন না بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ (তূর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে إِذْ قَضَيْنَآ যখন আমি দান করেছিলাম إِلَىٰ مُوْسَى মূসাকে الْأَمْرَ আদেশ সমূহ (তাওরাত) وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ এবং আপনি তো সে সমস্ত লোকদের মধ্যেই ছিলেন না, যারা (তখন) বিদ্যমান ছিল।

৪৫. وَلٰكِنَّآ أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا কিন্তু আমি বহু সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছি فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ অতঃপর তাদের উপর বহুকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ أَهْلِ مَدْيَنَ আর আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও অবস্থানকারী ছিলেন না تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا আপনি আমার আয়াতগুলো এ সমস্ত লোককে পাঠ করে শুনাচ্ছেন وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ কিন্তু আমিই তো রাসূল প্রেরণকারী।

৪৬. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ আর আপনি তূর পর্বতের পার্শ্বে তখনও ছিলেন না إِذْ نَادَيْنَا যখন আমি মূসাকে ডেকেছিলাম وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ কিন্তু এটা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ لِتُنْذِرَ قَوْمًا যেন আপনি এমন লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন مَّآ أَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ যাদের প্রতি কোনো ভয় প্রদর্শনকারী নবী আসেননি مِّنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ যেন তারা নসিহত গ্রহণ করে।

৪৭. আর আমি রাসূল না পাঠালে তাদের পূর্বকৃত কর্মের দরুন তাদের উপর কোনো মসিবত নাজিল হলে তখন তারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন পাঠালেন না, তাহলে তো আমরা আপনার আদেশাবলির অনুসরণ করতাম এবং ঈমান আনয়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।	وَلَوْلَآ أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾
৪৮. অতঃপর যখন আমার পক্ষ হতে তাদের নিকট সত্য (নবী) পৌঁছল, তখন তারা বলতে লাগল, তিনি সেরূপ কিতাব কেন প্রাপ্ত হননি? যেরূপ মূসা প্রাপ্ত হয়েছিলেন; যে কিতাব মূসা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এর পূর্বে, এরা কি তাকে অবিশ্বাস করেনি? তারা তো (কুরআন ও তাওরাত সম্বন্ধে) এরূপ বলে যে, উভয় গ্রন্থই জাদু, একটি অপরটির অনুরূপ এবং এইরূপও বলে থাকে যে, আমরা তো এ দুটির কোনোটিই মানি না।	فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَآ أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ مُوسٰى ؕ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَآ أُوتِيَ مُوسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۗ وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُونَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আপনি বলে দিন, আচ্ছা, তবে তোমরাই আল্লাহর নিকট হতে অন্য কোনো কিতাব নিয়ে আস, যা সৎপথ প্রদর্শনে এতদুভয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, আমিও তারই অনুসরণ করতে আরম্ভ করব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	قُلْ فَأْتُوا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ أَهْدٰى مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٤٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. وَلَوْلَآ আর আমি রাসূল না পাঠালে أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ তাদের উপর কোনো মসিবত নাজিল হলে بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ পূর্বকৃতকর্মের দরুন فَيَقُولُونَ তখন তারা বলত رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا আপনি আমাদের নিকট কেন রাসূল প্রেরণ করলেন না فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ তাহলে তো আমরা আপনার আদেশাবলির অনুসরণ করতাম وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ এবং ঈমান আনায়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

৪৮. فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ অতঃপর যখন তাদের নিকট সত্য (নবী) পৌঁছল مِنْ عِنْدِنَا আমার পক্ষ হতে قَالُوا তখন তারা বলতে লাগল لَوْلَآ أُوتِيَ সেরূপ কিতাব কেন প্রাপ্ত হননি مِثْلَ مَآ أُوتِيَ مُوسٰى যেরূপ মূসা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। أَوَلَمْ يَكْفُرُوا এরা কি তাকে অবিশ্বাস করেনি بِمَآ أُوتِيَ مُوسٰى যে কিতাব মূসা প্রাপ্ত হয়েছিলেন مِنْ قَبْلُ এর পূর্বে। قَالُوا তারা তো এরূপ বলে যে, سِحْرٰنِ উভয় গ্রন্থই জাদু। تَظٰهَرَا একটি অপরটি অনুরূপ, وَقَالُوٓا এবং এরূপও বলে থাকে যে, إِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُونَ আমরা তো এই দু'টির কোনোটিই মানিনা।

৪৯. قُلْ আপনি বলে দিন فَأْتُوا আচ্ছা, তবে তোমরাই নিয়ে আস بِكِتٰبٍ কোনো কিতাব مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট হতে هُوَ أَهْدٰى مِنْهُمَآ যা সৎপথ প্রদর্শনে এতদুভয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। أَتَّبِعْهُ আমিও তারই অনুসরণ করতে আরম্ভ করব إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৫০. অতঃপর যদি তারা আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে মনে করবেন যে, তারা শুধু স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে; আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট কে হবে- যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোনো দলিল ব্যতীত স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে; আল্লাহ এরূপ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۞

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ অতঃপর যদি তারা আপনার কথায় সায় না দেয় فَاعْلَمْ তবে মনে করবেন اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ তারা শুধু স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে وَمَنْ اَضَلُّ আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট কে হবে مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ যে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোনো দলিল ব্যতীত اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আল্লাহ এরূপ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا وَقَالُوْا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ [٤٨]

শানে নুযূল-১ : মাদায়েনী কিতাবুল আদদ গ্রন্থে ইয়াহয়া বিন সালামের বরাত দিয়ে বলেন যে, হযরত রাসূলে আকদাস ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে যাবার সময় ছাওর গুহা হতে রাত্রিকালে নিজের গোপনীয়তা রক্ষা করার লক্ষ্যে পাহাড়ী ও অপরিচিত পথ অতিক্রম করে যখন পথে উঠে জুহফা নামক স্থানের বাকো গুহায় অবস্থান করেন, তখন তিনি মক্কার পথ চিনেন। ফলে মক্কার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, সে সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আলোচ্য সূরা অবতরণ করেন। -[রূহুল মা'আনী ৪১/১০/২০]

শানে নুযূল -২ : হযরত সারওয়ারে কায়েনাত ﷺ যখন নবুয়তের দাওয়াত নিয়ে মক্কায় আবির্ভূত হন, তখন মক্কার কাফের মুশরিকেরা বলল যে, তিনি নবীই যদি হয়ে থাকেন, তাহলে মূসা নবী যেরূপভাবে বহু মু'জিযা যথা, লাঠি, শুভ্রহাত, রক্ত বন্যা, উকুন, ব্যাঙ ইত্যাদি সহ আগমন করেছিলেন, তিনি আমাদের সামনে সে ধরনের কোনো অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করাচ্ছেন না কেন? তাছাড়াও তারা রাসূল ﷺ -এর রেসালত বিষয়টি এবং কুরআন সম্পর্কীয় বিষয়াদি জানার জন্য মক্কা থেকে তাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় ইহুদি পণ্ডিত ও ধর্ম জাযকদের নিকট প্রেরণ করা হলো। তারা মদীনায় পৌছে রাসূল ﷺ-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, তারা বলল যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলি ও পরিচিতি তাওরাতে পেয়েছি। সুতরাং তারা ফিরে এসে ইহুদিরা যা বলেছে, সে সম্পর্কে তাদেরকে অবিহিত করল। মক্কায় নেতৃবর্গ তা শুনে অজ্ঞতা ও বিদ্বেষবশত : মন্তব্য করল যে, هٰذَانِ سِحْرَانِ এ দু'জন জাদুকর তারা একে অন্যের সাহায্য করছে তাদের এহেন বেআদবী মূলক উক্তির জাবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-[রূহুল মা'আনী ৯১/১০/২০, কুরতুবী ২৬১/১৩]

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ : এখানে কওম বলে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পর থেকে শেষ নবী ﷺ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনো পয়গম্বর প্রেরিত হননি। সূরা ইয়াসীনেও এই বিষয়বস্তু আলোচিত হবে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ অর্থাৎ এমন কোনো উম্মত নেই, যার মধ্যে আল্লাহর কোনো পয়গম্বর আসেননি। এই ইরশাদ, আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সুদীর্ঘকাল ধরে হযরত ইসমাঈলের পর তাদের মধ্যে কোনো নবী আসেননি; কিন্তু নবী-রাসূলের আগমন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই উম্মতও নয়।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ : وَصَّلْنَا تَوْصِيْل শব্দটি থেকে উদ্ভূত। এর আসল আভিধানিক অর্থ রশির সুতায় আরো সুতা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন-পাকে একের পর এক হেদায়েত অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বার বার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে শ্রোতারা প্রভাবান্বিত হয়।

তাবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি : এ থেকে জানা গেল যে, সত্য কথা উপর্যুপরি বলা ও পৌঁছাতে থাকা পয়গম্বরগণের তাবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাঁদের কাজে ও কর্মাসক্তিতে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তাঁরা পেশ করতে থাকতেন। কারও মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেওয়ার সাধ্য তো কোনো সহৃদয় উপদেশদাতার নেই। কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন আপোষহীন। আজকালও যারা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ : এ আয়াতসমূহে প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এমন এক মহান ব্যক্তি যিনি কোনো মানুষের কাছে কিছুই শেখেননি এবং পূর্বকালে অবতীর্ণ কোনো কিতাব সম্পর্কেও তিনি অবগত হননি এবং অতীতকালের ইতিহাস সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেফহাল হননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জ্ঞানের মহাসাগর, তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ স্পষ্ট অলংকারপূর্ণ ভাষায় অতীতের সঠিক তথ্য এবং ঘটনাসমূহ এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেন যেন ঐগুলো তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এর দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এসব কিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এসব কথা বলেছেন। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ

অর্থাৎ "আর [হে রাসূল!] আপনি তখন পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না, যখন আমি মূসার প্রতি নির্দেশ প্রদান করি, আর আপনি দর্শকও ছিলেন না।"

তাফসীরকার কাতাদা (র.) এবং সুদ্দী (র.) বলেছেন, পশ্চিম প্রান্ত বলে পশ্চিম প্রান্তের পাহাড়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর দ্বারা সে স্থানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেখানে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ পাকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আর আলোচ্য আয়াতের وَمَا كُنْتَ শব্দ দ্বারা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! আল্লাহ পাক যখন হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর الشّٰهِدِيْنَ শব্দ দ্বারা সেই ৭০ জন লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে তুর পর্বতে গিয়েছিলেন, সেখানেও আপনি তাদের সঙ্গে ছিলেন না; অথচ সেসব ঘটনা আপনি বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকই আপনাকে এসব গায়বি ইলম দান করেছেন। কেননা আপনি তাঁর প্রেরিত নবী, আর এসব সত্য ঘটনার সঠিক ইলম আল্লাহ পাক আপনাকে [মু'জিযা স্বরূপ] দান করেছেন। এজন্যেই প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– اُوْتِيْتُ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

অর্থাৎ আমাকে পূর্বকালের এবং পরবর্তী কালের সমস্ত ইলম দান করা হয়েছে। আর এজন্যেই পৃথিবীতে যত জ্ঞান-সাধনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার মূল উৎস হলো প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর মহান বাণী।

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ ...... وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নবী রাসূলগণের আবির্ভাব এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে বিষয়টিকে আরো দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করে পেশ করা হয়েছে যে, নবী রাসূল প্রেরণ একটি চূড়ান্ত দলিল। অর্থাৎ এটা সর্বশেষ দলিল যার মধ্যে দিয়ে বান্দার জন্য সকল প্রমাণ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে কাফেরদের কয়েকটি ওজর-আপত্তির উল্লেখ করে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, রাসূল প্রেরণ করার পর কাফেররা কিয়ামতের দিন আর এ ওজর পেশ করতে পারবে না যে, আমাদেরকে কেন অকারণে আজাব দেওয়া হচ্ছে। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন যে, দলিল পরিপূর্ণ হওয়ার পরই আজাব এসে থাকে এবং রাসূল প্রেরণই হচ্ছে এ পর্যায়ের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত দলিল। এরপর অপরাধীর জন্য আর কোনো ওজর আপত্তির সুযোগ থাকে না। তাই ইরশাদ হয়েছে .... وَلَوْلَآ اَنْ

অর্থাৎ "আর যদি রাসূল প্রেরণ না করা হতো এবং তাদের কীর্তিকলাপের পরিণতিতে কোনো বিপদ আপতিত হতো তবে তারা বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন প্রেরণ করলে না? যদি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরিত হতেন এবং তোমার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করতেন তবে আমরা সে অনুসারে সৎকাজ করতাম।"

এ দাবি অনুযায়ী তাদের উচিত রাসূলের আগমনকে একটি বড় নিয়ামত এবং সৌভাগ্য মনে করা এবং আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ দীনকে তৎক্ষণাৎ কবুল করে নেওয়া। কিন্তু তাদের অবস্থা হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যদি কোনো নবী প্রেরণের পূর্বে কাফেরদের পাপাচারের পরিণতি স্বরূপ তাদের উপর কোনো বিপদ আপতিত হয়, তবে তারা বলবে আমাদের নিকট কোনো রাসূল প্রেরিত হলে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম।

আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যখন তাদের নিকট রাসূলের আগমন হলো তখন তারা তাঁকে অবিশ্বাস করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। যখন তাদের কাছে 'সত্য' নিজেই এসে গেল, তখন তারা তাঁর প্রতি নানা রকম সন্দেহ পোষণ করে বলতে লাগল, আপনাকে সেই সকল মু'জিযা কেন দেওয়া হয়নি যা আপনার পূর্বে হযরত মূসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছিল? যেমন– হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি এবং আলোকময় হাত প্রভৃতি। যদি আপনার নিকটও এমন মু'জিযা থাকতো, তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতাম। শুধু তাই নয়, বরং কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ-কে একথাও বলতো, কুরআন যদি তাওরাতের ন্যায় একই সঙ্গে নাজিল হতো তবে আমরা আপনার প্রতি এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনতাম।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ কাফেরদের এসব মূর্খতাপ্রসূত প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, এসব প্রশ্ন নিতান্ত অমূলক। কেননা সকল নবী রাসূলের মু'জিযা একই প্রকার হওয়া জরুরি নয়, আর সমস্ত আসমানি গ্রন্থ একইভাবে নাজিল হওয়াও জরুরি নয়। অথচ পবিত্র কুরআন হলো সমস্ত আসমানি গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এটি হলো বিশ্বগ্রন্থ, সর্বকালের মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে এ মহান গ্রন্থে।

আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবি হাতেম মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ইহুদিরা মক্কার কুরাইশদেরকে বলতো যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তোমরা বল, ইনি কেমন রাসূল? যদি তিনি সত্য রাসূল হন, তবে তাঁকে মূসার ন্যায় মু'জিযা কেন দেওয়া হলো না, আর এই কিতাবই বা কেমন কিতাব, যদি এটি সত্যিই আল্লাহর কিতাব হয় তবে তা তাওরাতের ন্যায় এক সঙ্গে কেন নাজিল হয়নি? একটু একটু করে কেন নাজিল হয়?

আল্লাহ পাক তাদের এসব মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তার জবাবে ইরশাদ করেছেন– أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে অস্বীকার করে বলছে মূসা যেমন মু'জিযা পেয়েছিল এ রাসূল কেন তা পাননি, তাই তাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য হলো যে তারা কি ইতঃপূর্বে হযরত মূসা (আ.) কে অস্বীকার করেনি? প্রকৃত অবস্থা হলো, সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতা তাদের সম্পূর্ণ মজ্জাগত, তাই রাসূল প্রেরণ না করলে তারা বলতো, আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন প্রেরণ করা হলো না? যদি রাসূল প্রেরণ করা হতো তবে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম, আর যখন রাসূল প্রেরণ করা হলো তখন তারা এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলছে।

قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ : অর্থাৎ "তারা বলেছিল, দু'টিই জাদু; একে অপরকে সমর্থন করে এবং তারা বলেছিল, নিশ্চয় আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করছি।

তাফসীরকারগণ 'দু'টিই জাদু" -এ কথার তাৎপর্য সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারূন (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তাঁরা উভয়েই ফেরাউনের নিকট তাওহীদের বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য বাক্য দ্বারা হযরত মূসা (আ.) এবং প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো তাওরাত এবং কুরআনে কারীম; আর তাওরাত ও কুরআন একে অন্যের সত্যায়নকারী। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর উর্দূ পারা- ২০, পৃ. ৩৪]

আর তারা বলতো আমরা উভয়কেই মানি না। মক্কার কুরাইশরা যখন হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযার কথা শ্রবণ করতো তখন তারা বলতো, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর যদি অনুরূপ মু'জিযা থাকতো তবে আমরা ঈমান আনতাম। আর কাফেররা ইহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারতো যে, হুজুরে আকরাম ﷺ সত্য নবী, তাঁর প্রতিটি কথা সত্য, পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের মহান বাণী, ধ্রুব সত্য। তখন তারা বলতো, আমরা কিছুই মানি না, পবিত্র কুরআন ও তাওরাত আমরা উভয়টিকেই অস্বীকার করি, আর উভয়টিকেই জাদু মনে করি, [হযরত] মূসা এবং [হযরত] মুহাম্মদ ﷺ উভয়েই জাদুকর। –[নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক]

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا : অর্থাৎ "[হে রাসূল!] আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এমন কিতাব আনয়ন করা যা উভয় গ্রন্থ থেকে উত্তম তবে তা আমি মেনে চলবো।"

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তবে পবিত্র কুরআন ও তাওরাত থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কোনো কিতাব নিয়ে এসো, যা কোনো কিতাবেরই সমকক্ষ হবে না, তবে আমি তা মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করবো না।

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ : "এরপর [হে রাসূল] তারা যদি আপনার আহ্বান সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখবেন যে তারা শুধু নিজেদের খেয়াল খুশিরই অনুসরণ করে"।

অর্থাৎ যদি তারা তা আনতে না পারে আর একথা সত্য যে কখনও তা পারবে না, তবে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, তোমরা আসলে তোমাদের খেয়াল খুশিরই অনুসরণ কর, তোমাদের মন যা চায় তাই কর, তোমরা হেদায়েত কবুল করতে চাও না। এটি তোমাদের দুর্ভাগ্য যে, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রেরিত রহমত এবং হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকতে চাও আর যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয় তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?

শব্দ বিশ্লেষণ :

قَضَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قَضْىٌ মূলবর্ণ (ق - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি দান করেছিলাম।

فَتَطَاوَلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَطَاوُلٌ মূলবর্ণ (ط - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– অতঃপর (বহুকাল) অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

ثَاوِيًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার مَثْوى ও ثَوَاءٌ মূলবর্ণ (ث - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– অবস্থানকারী।

نَادَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার نِدَاءٌ মূলবর্ণ (ن - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি ডেকেছিলাম।

لِتُنْذِرَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ– যেন আপনি ভয় প্রদর্শন করেন।

أُوتِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– প্রাপ্ত।

فَأْتُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– আচ্ছা তবে তোমরাই নিয়ে আস।

لَمْ يَسْتَجِيبُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِجَابَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা সাড়া না দেয়।

أَضَلُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার ضَلَالٌ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– অধিকতর পথভ্রষ্ট।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِىَ مِثْلَ مَا أُوتِىَ مُوسَى : এখানে فاء টি আতেফা, আর لَمَّا টা رابطة বা حينية আর হলো جَاءَ হলো ফে'ল, আর هُمْ হলো مفعول به مقدم আর الْحَقُّ হলো فاعل موخر আর مِنْ عِنْدِنَا টা جَاءَهُمْ এর সাথে متعلق হয়েছে। আর قَالُوا বাক্যেটি لَمَّا-এর জওয়াব হয়েছে। আর لَوْلَا হলো حرف تحضيض অর্থাৎ هَلَّا আর أُوتِىَ হলো ফে'ল, তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ হলো নায়েবে ফায়েল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ আর مِثْلَ হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। আর مَا হলো ইসমে মাওসূল যা مِثْلَ-এর মুজাফ ইলাইহি হয়েছে। আর أُوتِىَ বাক্যটি হলো مَا মাওসূলের সেলাহ। আর مُوسَى হলো أُوتِىَ-এর নায়েবে ফায়েল।

[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬২৮]

৫১. আর আমি এ কালামকে (অর্থাৎ কুরআনকে) তাদের জন্য বিভিন্ন সময়ে ক্রমান্বয়ে নাজিল করেছি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে;	وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. কুরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি (তন্মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণ) তারা এর প্রতি ঈমান আনয়ন করছে।	اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. যখন তাদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন বলে আমরা এটার প্রতি ঈমান আনলাম, নিঃসন্দেহে তা সত্য, (যা) আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে (নাজিল হয়েছে), এর (আগমনের) পূর্বেও আমরা (একে) মান্য করতাম।	وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. তাদের দৃঢ়তার কারণে তারা দ্বিগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে, আর তারা সৎ (ব্যবহার ও ধৈর্যাবলম্বন) দ্বারা অসৎ (ব্যবহার ও ক্লেশ) -কে প্রতিরোধ করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দান করেছি তা হতে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।	اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. যখন তারা কোনো প্রকার বেহুদা কথা শ্রবণ করে, তখন তা এড়িয়ে চলে এবং (শান্তভাবে) বলে দেয়, আমাদের কৃতকর্ম আমাদের সম্মুখে আসবে এবং তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সম্মুখে আসবে, আমরা তোমাদেরকে সালাম করি, (ঝগড়া করো না,) আমরা নির্বোধ লোকদের সাথে লাগতে ইচ্ছা করি না।	وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؗ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ؗ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫১. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ আর আমি এই কালামকে তাদের জন্য বিভিন্ন সময়ে ক্রমান্বয়ে নাজিল করেছি لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে ।

৫২. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি مِنْ قَبْلِهٖ কুরআনের পূর্বে هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ তারা এর প্রতি ঈমান আনয়ন করছে।

৫৩. وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ আর যখন তাদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করা হয় তখন বলে اٰمَنَّا بِهٖ আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম اِنَّهُ الْحَقُّ নিঃসন্দেহে এটা সত্য مِنْ رَّبِّنَا আমাদের রবের পক্ষ থেকে (নাজিল হয়েছে) اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ এর (আগমনের) পূর্বেও আমরা (একে) মান্য করতাম।

৫৪. اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ তারা দ্বিগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে بِمَا صَبَرُوْا তাদের দৃঢ়তার কারণে وَيَدْرَءُوْنَ আর তারা প্রতিরোধ করে بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ সৎ দ্বারা অসৎ কে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দান করেছি তা হতে يُنْفِقُوْنَ তারা ব্যয় করে।

৫৫. وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ আর যখন তারা কোনো প্রকার বেহুদা কথা শ্রবণ করে اَعْرَضُوْا عَنْهُ তখন তা এড়িয়ে চলে وَقَالُوْا এবং (শান্ত ভাবে) বলে দেয় لَنَا اَعْمَالُنَا আমাদের কৃতকর্ম আমাদের সম্মুখে আসবে وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ এবং তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সম্মুখে আসবে سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ আমরা তোমাদের সালাম করি لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ আমরা নির্বোধ লোকদের সাথে লাগতে ইচ্ছা করি না।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আপনি যাকে চান হেদায়েত করতে পারবেন না, বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে চান হেদায়েত করেন এবং হেদায়েতপ্রাপ্তদের সম্বন্ধে অবগতিও তাঁরই রয়েছে।

وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. এরা বলে, যদি আমরা আপনার সঙ্গ অবলম্বন করে হেদায়েত অনুযায়ী চলতে থাকি, তবে তো আমাদেরকে আমাদের বাসভূমি হতে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হবে; আমি কি তাদেরকে শান্তি ও নিরাপদময় হেরেম শরীফে স্থান দেইনি? যেখানে সকল প্রকারের ফলাদি আমদানি হয়, যা আমার পক্ষ হতে রিজিকস্বরূপ পেয়ে থাকে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক জানে না।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আমি এমন বহু জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি যারা স্বীয় ভোগ-বিলাসের সরঞ্জামের প্রতি গর্বিত ছিল, বস্তুত এগুলোই তো তাদের বাসস্থান, তাদের পরে সেখানে কোনো (স্থায়ী) বসতি হয়নি, কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য এবং আমিইতো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৬. إِنَّكَ لَا تَهْدِي আপনি হেদায়েত করতে পারবেন না مَنْ أَحْبَبْتَ যাকে চান وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي ; বরং আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করেন مَنْ يَشَاءُ যাকে চান وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ এবং হেদায়েত প্রাপ্তদের সম্বন্ধে অবগতিও তাঁরই রয়েছে।

৫৭. وَقَالُوا আর এরা বলে إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ যদি আমরা হেদায়েত অনুযায়ী চলতে থাকি مَعَكَ আপনার সঙ্গ অবলম্বন করে نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا তবে তো আমাদেরকে আমাদের আবাসভূমি হতে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হবে أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ আমি কি তাদেরকে শান্তি ও নিরাপদময় হেরেম শরীফে স্থান দেইনি حَرَمًا آمِنًا যেখানে يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ সকল প্রকারের ফলাদি আমদানি হয় رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا আমার পক্ষ হতে রিজিক স্বরূপ পেয়ে থাকে وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ কিন্তু অধিকাংশ লোক لَا يَعْلَمُونَ জানেনা।

৫৮. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ আর আমি এমন বহু জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا যারা স্বীয় ভোগ বিলাসের সরঞ্জামের প্রতি গর্বিত ছিল فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ বস্তুত ঃ এগুলোই তো তাদের বাসস্থান لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ তাদের পরে সেখানে কোনো (স্থায়ী) বসতি হয়নি إِلَّا قَلِيلًا কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ এবং আমিইতো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

৫৯. আর আপনার রব জনপদগুলোকে (প্রথমেই) ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলগুলোতে কোনো পয়গম্বর প্রেরণ না করেন যিনি তাদের নিকট আমার আয়াতগুলোকে পড়ে শুনান, আমি ঐ জনপদগুলোকে ধ্বংস করি না, কিন্তু ঐ অবস্থায় যখন সেখানের অধিবাসীরা জুলুম করতে থাকে।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৯. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى আর আপনার রব জনপদগুলোকে (প্রথমেই) ধ্বংস করেন না حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলগুলোতে কোনো পয়গম্বর প্রেরণ না করেন يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا যিনি আমার আয়াতগুলো পড়ে শুনান وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰى আমি ঐ জনপদগুলোকে ধ্বংস করি না اِلَّا কিন্তু ঐ অবস্থায় وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ যখন সেখানের অধিবাসীরা জুলুম করতে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (٥١)

শানে নুযূল : জা'দাহ্ হযরত আতিয়্যা এবং কুরাযী মতান্তর রেফাআহ আল কুরাযী এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত দশজন মানব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। যে দশজন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয় তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।–[তাবারী ৮৪/১০, ইবনে কাছীর ৪০৭/৩ বাহরে মুহীত্ব ১১৯/৭]

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ (٥٢)

শানে নুযূল -১ : বর্ণিত রয়েছে, বনী ইসরাইল হতে কতিপয় মানুষ কুরআনের পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। পরবর্তীতে তারা কুরআনের প্রতিও ঈমান এনেছেন। যথা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম, সালমান, এবং খ্রিস্টান পাদ্রী যারা ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন। তারা ছিলেন ৪০ জন। তারা জা'ফর, বিন আবী তালেবের সাথে মদীনায় গমন করলেন। আবিসিনিয়া হতে ৩২ জন এবং সিরিয়া হতে আটজন খ্রিস্টান পণ্ডিত আসে, তাদের মধ্যে ছিলেন বুহাইরা রাহেব, আবরাহা, আশ্রাফ, আমের, আইমন, ইদ্রীস ও নাফে' তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল -২ : হযরত কাতাদাহ বলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম, তামীমে দারী, জারুদ আবদী ও সালমান ফার্সী (রা.) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল -৩ : হযরত রেফাআহ আল কুরাযী বলেন যে, দশজন লোক সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তন্মধ্যে আমিও একজন। উরওয়াহ বিন যুবাইর (রা.) বলেন যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী ও তাঁর সঙ্গী সাথিদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে এই যে, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ -এর সাথে বারজন মানুষ বসল। সে সময় আবূ জাহেল ও তদ্বীয় সহচরেরা তাদের নিকটতম স্থানেই ছিল। এমন মহূর্তেই তারা রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান গ্রহণ করে। অতঃপর তারা যখন রাসূল এর নিকট হতে চলে গেলেন, তখন আবূ জাহলও তার সহচরেরাও তাদের পিছু পিছু গিয়ে বলল, আল্লাহ তোমরা আরোহীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করুক, তোমরা প্রতিনিধি দলকে আল্লাহ কুৎসিত করুক, তোমরা তাকে সমর্থন ও বিশ্বাস করতে বিলম্ব করলে না তো মোটেই। তোমাদের অপেক্ষা অতি নিবোর্ধ ও বর্বর আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা। জবাবে তারা বললেন سَلَامٌ عَلَيْكُمْ আমরা কেন হেদায়েত পথ গ্রহণ করবনা? لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ আমাদের জন্য আমাদের আমল আর তোমাদের জন্য তোমাদের আমল। তখন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[কুরতুবী ২৬৩/১৩, ইবনে কাছীর ৪০৮, রুহুল মা'আনী ৯৪/১০/২০, তাবারী ১০, দুররে মানছুর ১৩১/১৫]

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٥٤)

শানে নুযূল -১ : মানসূর মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুশরিকদেরকে একটি সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাদের স্বজাতীয় ও স্বগোত্রীয় অন্যান্য লোকেরা তাদেরকে কষ্ট দিতে লাগল। তখন তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা সম্পর্কে আলেচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[তাবারী ৮৬]

শানে নুযূল –২ : ইমাম বুখারী তদীয় তারিখ গ্রন্থে ও ইবনে মুনজির আলী বিন রেফাআহ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আহলে কিতাবদের হতে দশজন মানুষ ঈমান গ্রহণ করেছিলেন, তন্মধ্যে আমার পিতা রেফাআহও একজন ছিলেন। তারা যখন আসল তখন লোকেরা তাদেরকে নিয়ে বিদ্রূপ ও রং তামাশা করতে লাগল। তাদের বিদ্রূপ ও রং তামাশা নীরবে সহ্য করে নেওয়ার মর্যাদা বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানসূর ১৩১/৫]

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ(٥٥)

শানে নুযূল : ইবনে ওহাব, ইবনে যায়েদ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এক শ্রেণির আহলে কিতাব রয়েছে তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান গ্রহণ করার পূর্বে তাদের নিজেদের কিতাবে যখন কোনো মিথ্যাচারিতা শুনতে পেত যে মিথ্যাচার তাদের গোত্রীয় লোকজনের হাতেই আমূল পরিবর্তন করে ঘোষণা করে দিত যে, এ-ই হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী। এ মিথ্যাচার ও তেলাওয়াত যখন তারা শুনতে পেত, তারা তা থেকে এড়িয়ে যেত এবং বলত أَنَا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ আমরা তো এর পূর্ব হতে মুসলমান। কারণ তারা দ্বীনে ঈসাইর ভিত্তিতে মুসলমান ছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। মুজাহিদ কর্তৃক একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মুশরিকদের একটি সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ফলে তাদের গোত্রীয় মুশরিক কাফের লোকেরা তাদেরকে কথায় কাজে আচার-ব্যবহারে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিচ্ছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[তাবারী ৮৬/১০]

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٥٦)

শানে নুযূল : হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব তদীয় পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন হযরত রাসূল আকরাম ﷺ-এর প্রাণপ্রিয় চাচা আবূ তালিবের যখন মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এসেছিল, তখন রাসূল ﷺ তার নিকট গমন করে দেখতে পান সেখানে আবূ জাহল ও আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যাহ বিন মুগীরা উপস্থিত রয়েছে। রাসূল ﷺ তখন বললেন যে, হে আমার চাচা! আপনি বলুন তো لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ কালিমাটি। এ কালিমা দ্বারা আমি আপনার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নিকট দলিল সহ সুপারিশ করতে সক্ষম হবো। আবূ জাহেল ও আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যাহ বিন মুগীরা বলল, হে আবূ তালেব! তুমি মুত্তালিবী ধর্ম ছেড়ে যাবে নাকি? রাসূল ﷺ তার নিকট কালিমার দাওয়াত দিতে লাগলেন। অপরদিকে আবূ জাহলও নিজ কৌশলগত কথা বলতে থাকে। সুতরাং আবূ তালিব বলল, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি জানি তুমি সত্যবাদী। তবে মৃত্যুকালে ভয় পেয়ে গেল, মানুষেরা এমন কথা বলবে তা আমি পছন্দ করিনা। কোনো দুর্নামের ভয় না থাকলে অবশ্যই আমি তোমার সামনে সে কালিমা পাঠ করে তা স্বীকার করে নিতাম। কারণ তোমার মাঝে অত্যন্ত ব্যাকুলতা ও হিতাকাঙ্ক্ষিতা প্রত্যক্ষ করতে পাচ্ছি। অতঃপর কবিতা আবৃত্তি করে বলতে লাগল।

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ * مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا

وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ * لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بَيِّنًا

"আর আমি জানি যে, দ্বীনে মুহাম্মদী সকল মাখলুকের ধর্ম অপেক্ষা অতি উত্তম, সমালোচনা ও মন্দাচারীর ভয় যদি না হতো, তাহলে আমাকে সুবক্তা পেতে"।

তবে আমি মুত্তালিবী ধর্মেই থেকে যাব। অতঃপর ইন্তেকাল করে। এতে করে রাসূল ﷺ অত্যন্ত ব্যথিত হন। রাসূল ﷺ কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[তাবারী ৮৮/১০,সাভী ২২১/৩, রূহুল মা'আনী ৯৬/১০/২০, কুরতুবী ২৬৬/১৩, ইবনে কাছীর ৪০৮/৩]

وَقَالُوٓا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى إِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٥٧)

শানে নুযূল -১ : ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরাইশের এক শ্রেণির মানুষেরা নবী করীম ﷺ কে বলেছিল যে, আমরা যদি আপনার অনুসরণ করি তাহলে মানুষেরা আমাদের উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। তখন সে প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

-[ফতহুল কাদীর ১৮০/৩]

শানে নুযূল -২ : আলোচ্য আয়াত হারিছ বিন উছমান বিন নাওফল বিন মানাফ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, একদা সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা তো মনে প্রাণে জানি যে, আমরা যদি আপনার আনুগত্য গ্রহণ করে নেই এবং আরবদের বিরোধিতা করি অপর দিকে আমরা হচ্ছি দরিদ্রতার শিকার তারা আমাদেরকে বহিষ্কার করে দেবে এমন আশঙ্কা রয়েছে বিধায় আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতে পারছিনা। তাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। [জালালাইন- ৩৩২, টীকা-৬]

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ : এই আয়াতে সেই সব আহলে কিতাবের কথা বলা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও কুরআন অবতণের পূর্বেও তাওরাত ও ইঞ্জীল প্রদত্ত সুসংবাদের ভিত্তিতে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তে বিশ্বাসী ছিল। এরপর যখন তিনি প্রেরিত হন, তখন সাবেক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালবিলম্ব না করে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর পরিষদবর্গের মধ্যে থেকে চল্লিশ জনের একটি প্রতিনিধি দল যখন মদীনায় উপস্থিত হয় তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তারাও জেহাদে অংশ গ্রহণ করল। কেউ কেউ আহতও হলো, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিহত হলো না। তারা যখন সাহাবায়ে কেরামের আর্থিক দুর্দশা দেখল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অনুরোধ জানাল যে, আমরা আল্লাহর রহমতে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি। আপনি অনুমতি দিলে আমরা দেশে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে কেরামের জন্য অর্থসম্পদ সরবরাহ করব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ থেকে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। -[মাযহারী]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত জাফর (রা.) মদিনায় হিজরতের পূর্বে যখন আবিসিনিয়ায় গমন করেন এবং নাজ্জাশীর দরবারে ইসলামি শিক্ষা পেশ করেন, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেন। তারা ছিল খ্রিস্টান এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমনের সুসংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত। -[মাযহারী]

'মুসলিম' শব্দটি উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ উপাধি, না সব উম্মতের জন্য ব্যাপক? إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ -অর্থাৎ আহলে কিতাবের এই আলেমগণ বলল, আমরা তো কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুসলমান ছিলাম। এখানে 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ [অনুগত,আজ্ঞাবহ] নিলে বিষয়টি পরিষ্কার যে, তাদের কিতাবের কারণে কুরআন ও শেষ নবী সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল, সেই বিশ্বাসকেই ইসলাম' ও মুসলিমীন' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তো পূর্বেই এতে বিশ্বাসী ছিলাম। পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীকে 'মুসলিম' বলা হয়, সেই অর্থ নিলে এতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলাম ও মুসলিম শব্দ কেবলমাত্র উম্মতে মুহাম্মদির বিশেষ উপাধি নয় ; বরং সব পয়গম্বরের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তারা সবাই ছিলেন মুসলিম। কিন্তু কুরআন পাকের কোনো কোনো আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইসলাম ও মুসলিম শব্দ এই উম্মতের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর উক্তি স্বয়ং কুরআনেই আছে যে, هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ - আল্লামা সুয়ূতী (র.) এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রবক্তা। এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। তাঁর মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম সব পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং এই উম্মতের জন্য বিশেষ উপাধি এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিন্ন ধর্ম হবে এবং 'মুসলিম' উপাধি শুধু এই উম্মতের বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণতঃ সিদ্দীক, ফারুক ইত্যাদি উপাধির কথা বলা যায়। এগুলো বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.) -এর উপাধি, কিন্তু গুণগত অর্থের দিক দিয়ে অন্যরাও সিদ্দীক ও ফারুক হতে পারেন।

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ : অর্থাৎ আহলে কিতাবের মুমিনদেরকে দুবার পুরস্কৃত করা হবে। কুরআন পাকে এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্রা বিবিগণের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে– وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ – সহীহ বুখারীর এক হাদীসে তিন ব্যক্তির জন্যে দুবার পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১. যে কিতাবধারী পূর্বে তার পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। ২. যে অপরের মালিকানাধীন গোলাম এবং আপন প্রভুরও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলেরও ফরমাবরদারি করে। ৩. যার মালিকানায় কোনো বাঁদী ছিল। এই বাঁদীর সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্য জায়েজ ছিল। কিন্তু সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই কয়েক প্রকার লোককে দুইবার পুরস্কৃত করার কারণ কি? এর জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের প্রত্যেকের আমল যেহেতু দুটি, তাই তাদেরকে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মুমিনের দুই আমল এই যে, সে পূর্বে এক পয়গম্বররের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছে। পবিত্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনুগত্য ও মহব্বত রাসূল হিসেবেও করেন এবং স্বামী হিসেবেও করেন। গোলামের দুই আমল তার দ্বিমুখী আনুগত্য, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য এবং প্রভুর আনুগত্য। বাদীকে মুক্ত করে যে বিবাহ করে তার এক আমল মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় আমল বিবাহ করা। কিন্তু এই জওয়াবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দুই আমলের দুই পুরস্কার ইনসাফ ভিত্তিক হওয়ার কারণে সবার জন্যে ব্যাপক। এতে কিতাবধারী মুমিন অথবা পবিত্রাগণের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই ; বরং যে কেউ দুই আমল করবে, সে দুই পুরস্কার পাবে। এই প্রশ্নের জওয়াব সম্পর্কে আমি আহকামুল কুরআন সূরা কাসাসে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করছি। কুরআনের ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এই যে, এখানে উদ্দেশ্য শুধু দুই পুরস্কার নয়। কেননা এটা প্রত্যেক আমলকারীর জন্য সাধারণ কুরআনির বিধি لَا يُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো আমলকারীর আমল বিনষ্ট করেন না। বরং সে যতই সৎকর্ম করবে, তারই হিসেবে পুরস্কার পাবে। তবে উল্লিখিত প্রকারসমূহে দুই পুরস্কার অর্থ এই যে, তাদেরকে তাদের প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হবে। প্রত্যেক নামাজের দ্বিগুণ, রোজা, সদকা, হজ্জ, ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ ছওয়াব তারা লাভ করবে। কুরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই পুরস্কারের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল أَجْرَيْنِ কিন্তু কুরআন এর পরিবর্তে বলেছে, أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ -এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এর উদ্দেশ্য তাদের প্রত্যেক আমল দুবার লিখা হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্য দুই ছওয়াব দেওয়া হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি ? এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা আছে যে, তিনি বিশেষ কোনো আমলকে অন্যান্য আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং এর পুরস্কার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারও এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আল্লাহ তা'আলা রোজার ছওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন? জাকাত ও সদকার ছওয়াব এত বাড়ালেন না কেন? এটা সম্ভপর যে, আলোচ্য আয়াতে ও বুখারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের চাইতে কোনো না কোনো দিক দিয়ে বেশি। তাই এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম যে দ্বিগুণ শ্রমকে এর কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আয়াতের শেষ বাক্য بِمَا صَبَرُوا এর প্রমাণ হতে পারে। অর্থাৎ শ্রমে সবর করা দ্বিগুণ ছওয়াবের কারণ।

وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ অর্থাৎ তারা মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করে। এই মন্দ ও ভালো বলে কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফসীরকারকদের অনেক উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কেউ বলেন, ভালো বলে ইবাদত এবং মন্দ বলে গোনাহ বোঝানো হয়েছে। কেননা পুণ্য কাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) কে বলেন إِتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا : অর্থাৎ গোনাহের পর নেক কাজ করো। নেককাজ গোনাহকে মিটিয়ে দেবে। কেউ কেউ বলেন, ভালো বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অনবধানতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা অপরের অজ্ঞতার জওয়াব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা এগুলো সবই ভালো ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ : প্রথম, কারও দ্বারা কোনো গোনাহ্ হয়ে গেলে তার প্রতিকার এই যে, এরপর সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সৎকাজ গোনাহের কাফফারা হয়ে যাবে ; যেমন উপরে হযরত মুয়ায (রা.)-এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় কেউ কারও প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরিয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ নেওয়া জায়েজ আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে মন্দের প্রত্যুত্তরে ভালো এবং উৎপীড়নের

প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। ইহকাল ও পরকালে এর উপকারিতা অনেক। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই পথনির্দেশটি আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে –

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ

অর্থাৎ মন্দ ও জুলুমকে উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিহত কর। [জুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ কর]। এরূপ করলে যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে যে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ : অর্থাৎ তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র এই যে, তারা কোনো অজ্ঞ শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শোনে, তখন তার জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে একথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ করো। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ইমাম জাস্সাস (র.) বলেন, সালাম দুই প্রকার। (এক) মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। (দুই) সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলে দেওয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নেব না। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ الخ : 'হেদায়েত' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) শুধু পথ দেখানো। এর জন্য জরুরি নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয়, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেই যাবে। (দুই) পথ দেখিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ; বরং সব পয়গম্বর যে হাদী অর্থাৎ পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং হেদায়েত যে তাঁদের ক্ষমতাধীন ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কেননা এ হেদায়েতেই ছিল, তাঁদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা তাঁদের ক্ষমতাধীন না হলে তাঁরা নবুয়ত ও রেসালতের কর্তব্য পালন করবেন কিরূপে? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেদায়েতের উপরে ক্ষমতাশালী নন। এতে দ্বিতীয় অর্থের হেদায়েত বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে সৃষ্টি করে দেবেন এবং তাকে মুমিন বানিয়ে দিবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাহীন। হেদায়েতের অর্থ ও তার প্রকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সূরা বাকারার শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমে আছে এই আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃব্য আবূ তালেব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে কোনোরূপে ইসলাম গ্রহণ করুন। এর প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, কাউকে মুমিন -মুসলমান করে দেওয়া আপনার ক্ষমতাধীন নয়। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে আছে, আবূ তালেবের ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে বিনা প্রয়োজনে আলোচনা, বিতর্ক ও তাকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনোকষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে।

وَقَالُوْا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا : অর্থাৎ হারিস ইবনে ওসমান প্রমুখ মক্কার কাফের তাদের ঈমান কবুল না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল যে, আমরা আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি, কিন্তু আমাদের আশঙ্কা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হবে। –[নাসায়ী] কুরআন পাক তাদের এই খোঁড়া অজুহাতের তিনটি জওয়াব দিয়েছে :

১. اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ : অর্থাৎ তাদের এই অজুহাত বাতিল। কারণ আল্লাহ বিশেষভাবে মক্কাবাসীদের হেফাজতের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। তা এই যে, তিনি মক্কার ভূখণ্ডকে নিরাপদ হারাম করে দিয়েছেন। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ কুফর, শিরক পারস্পরিক শত্রুতা সত্ত্বেও এব্যাপারে একমত ছিল যে, মক্কার হেরেমের অভ্যন্তরে হত্যা ও যুদ্ধবিগ্রহ ঘোরতর হারাম। হেরেমের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে পেলে পুত্র চরম প্রতিশোধস্পৃহা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করতে বা প্রতিশোধ নিতে পারত না। এতএব, যে প্রভু নিজ কৃপায় কুফরও শিরক সত্ত্বেও তাদেরকে এই ভূখণ্ডে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন, ঈমান কবুল করলে তিনি তাদেরকে ধ্বংস হতে দেবেন, এ আশঙ্কা চরম মূর্খতা বৈ কিছু নয়। ইয়াহইয়া ইবনে -সালাম বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা হেরেমের কারণে নিরাপদ ছিলে, আমার দেওয়া রিজিক স্বচ্ছন্দে খেয়ে যাচ্ছিলে এবং আমাকে পরিত্যাগ করে অন্যের ইবাদত করছিলে। এই অবস্থার কারণে তো তোমাদের ভয় হলো না উল্টা ভয় হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে। -[কুরতুবী] আলোচ্য আয়াতে হেরেমের দুটি গুণ বর্ণিত হয়েছে: ১. এটা শান্তির আবাসস্থল ২. এখানে বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে সর্ব প্রকার ফল মূল আমদানি হয়, যাতে মক্কার বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন সহজে মেটাতে পারে।

মক্কার হেরেমে প্রত্যেক প্রকার ফল-মূল আমদানি হওয়া বিশেষ বিশেষ কুদরতের নিদর্শন : মক্কা মুকাররমা, যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ গৃহের জন্য সারা বিশ্বের মধ্যে থেকে মনোনীত করেছেন, এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোনো বস্তু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কেননা গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফল-মূল তরকারি ইত্যাদির তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু মক্কার এসব বস্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক -বুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রতি বছর হজের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরও বারো থেকে পনের লাখ মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়, যারা গড়ে, দুই- আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্তু কখনও শোনা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোনো দিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে; বরং সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দিবা-রাত্রির সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণ তৈরি খাদ্য পাওয়া যায়। কুরআন পাকের ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরিভাষায় ثَمَرَاتٌ শব্দটি বৃক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থান ছিল এরূপ বলার : ثَمَرَاتُ كُلِّ شَجَرٍ -এর পরিবর্তে ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ বলার মধ্যে সম্ভবত : ইঙ্গিত আছে যে, ثَمَرٰتٌ শব্দের অর্থ এখানে শুধু ফল-মূল নয়; বরং এর অর্থ যে কোনো উৎপাদন। মিল কারখানায় নির্মিত সামগ্রী ও মিল-কারখানার ثَمَرَاتٌ তথা উৎপাদন এভাবে আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে মক্কার হেরেমে শুধু আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদিই আমদানি হবে না; বরং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সবকিছুই এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, মক্কায় যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোনো দেশেই বোধ হয় তদ্রূপ পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের অজুহাতের জওয়াব যে, যিনি তোমাদের কুফর শিরক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এ দেশে কোনো কিছুই উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী এখানে এনে সমাবেশ করেছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে– এরূপ আশঙ্কা করা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা বৈ নয়।

২. এরপর তাদের অজুহাতের দ্বিতীয় জওয়াব এই : وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا এতে বলা হয়েছে যে, জগতের অন্যান্য কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কুফর ও শিরকের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত-বাড়ি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শিরকই হচ্ছে প্রকৃত আশঙ্কার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, কুফর ও শিরকের কারণে বিপদাশঙ্কা বোধ কর না, ঈমানের কারণে বিপদাশঙ্কা বোধ করো!

৩. তৃতীয় জওয়াব এই : وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এতে বলা হয়েছে, যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ঈমান কবুল করার ফলে তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়েই যায়, তবে তা ক্ষণস্থায়ী। এ জগতের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ধন-দৌলত যেমন ক্ষণস্থায়ী, কারো কাছে চিরকাল থাকে না, তেমনি এখানকার কষ্টও ক্ষণস্থায়ী -দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, সেই কষ্ট ও সুখের চিন্তা করা যা চিরস্থায়ী, অক্ষয়। চিরস্থায়ী ধনও নিয়ামতের খাতিরে ক্ষণস্থায়ী কষ্ট সহ্য করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا : অর্থাৎ অতীত সম্প্রদায়সমূহের যেসব জনপদকে আল্লাহর আজাব দ্বারা -বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বসবাস করছে। বাজ্জাজের উক্তি অনুযায়ী এই 'সামান্য এর অর্থ যদি যৎসামান্য বাসস্থান কিংবা আবাস নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোনো বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়নি। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সামান্য' -এর অর্থ সামান্য ক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্য ক্ষণ থাকে, যেমন কোনো পথিক অল্পক্ষণের জন্য কোথাও বসে বিশ্রাম নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না।

حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا : اُمّ শব্দটির মূল ও ভিত্তির অর্থেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। اُمِّهَا -এর সর্বনাম দ্বারা قُرٰى বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জনপদসমূহের মূল কেন্দ্রস্থল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রধান-নগরীতে কোনো রাসূলের মাধ্যমে সত্যের পয়গাম না পৌঁছিয়ে দেন। সত্যের দাওয়াত পৌঁছার পর যখন লোকেরা তা কবুল করে না, তখন জনপদসমূহের উপর আজাব নেমে আসে।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বরগণ সাধারণত বড় বড় শহরে প্রেরিত হতেন। তাঁরা ছোট শহর ও গ্রামে আসতেন না। কেননা এরূপ শহর ও গ্রাম সাধারণত শহরের অধীন হয়ে থাকে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনেও। প্রধান শহরে কোনো বিষয় ছড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামে আপনা-

আপনি ছড়িয়ে পড়ে, এ কারণেই কোনো বড় শহরে রাসূল প্রেরিত হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও গ্রামে স্বভাবতই পৌঁছে যেতো। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার উপর আল্লাহর পয়গাম কবুল করা ফরজ হয়ে যেতো এবং অস্বীকার ও মিথ্যারোপের কারণে সবার উপর আজাব নেমে আসাই ছিল স্বাভাবিক।

নির্দেশ ও আইন-কানুনে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন : এ থেকে জানা গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহরের অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোনো নির্দেশ পালন করা সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না শুনার ওজর গ্রহণযোগ্য হয় না।

এ জন্যে রমজান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নেও ফিকহ্‌বিদগণ বলেন যে, এক শহরে শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রামণ দ্বারা বিচারপতির নির্দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের তা মেনে নেওয়া জরুরি। কিন্তু অন্য শহরবাসীদের জন্যে এটা তখন যদি শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই সাক্ষ্য প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারি না করা পর্যন্ত জরুরি হবে না।–[ফতোয়া গিয়াসিয়া]

শব্দ বিশ্লেষণ :

وَصَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْصِيْلٌ মূলবর্ণ (و ـ ص ـ ل) জিনস مثال واوى অর্থ– আমি বিভিন্ন সময়ে ক্রমান্বয়ে নাজিল করেছি।

يُؤْتَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءً মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– তারা প্রাপ্ত হবে।

يَدْرَئُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার دَرْءً মূলবর্ণ (د ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তারা প্রতিরোধ করে।

اَعْرَضُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَعْرَاضٌ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– তারা এড়িয়ে চলে।

اَحْبَبْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْبَابٌ মূলবর্ণ (ح ـ ب ـ ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আপনি চান।

نُتَخَطَّفُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع مجهول বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَخَطُّفٌ মূলবর্ণ (خ ـ ط ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– আমাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

يُجْبٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার جُبَايَةٌ মূলবর্ণ (ج ـ ب ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমদানি হয়।

بَطِرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার بَطَرٌ মূলবর্ণ (ب ـ ط ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– যারা গর্বিত ছিল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَوْلَا اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ : এখানে واو টি আতেফা, আর لَوْلَا হলো حرف امتناع لوجود আর اَنْ এবং তার অধীনস্থ শব্দগুলো হলো মুবতাদা আর তার খবর উহ্য। অর্থাৎ وَلَوْلَا اَصَابَتْهُمُ الْمُصِيْبَةُ لَهُمْ আর তার জওয়াব উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো لَمَّا اَرْسَلْنَا رَسُوْلًا আর مُصِيْبَةٌ হলো ফায়েল আর بِمَا টা تُصِيْبَهُمْ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর قَدَّمَتْ বাক্যটি সেলাহ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড; পৃ. ৬২৬]

৬০. আর তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা শুধু পার্থিব জীবনযাপনের সরঞ্জাম আর তার সৌন্দর্য, পক্ষান্তরে যা কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে তা এটা অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম এবং অধিক স্থায়ী; তবুও কি তোমরা বুঝ না?	وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. আচ্ছা, যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, অতঃপর সে তা প্রাপ্ত হবে, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে? যাকে আমি ইহজীবনের কয়েক দিনের সম্ভোগ দিয়ে রেখেছি, তৎপর সে কিয়ামত দিবসে ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে বন্দিরূপে উপস্থিত করা হবে।	اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾
৬২. আর যেদিন আল্লাহ সেই কাফেরদেরকে ডেকে বলবেন, আমার সেই শরিকরা কোথায় যাদেরকে তোমরা (উপাস্য) মনে করতে?	وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. যাদের প্রতি আল্লাহর বাণী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে তারা বলে উঠবে, হে আমাদের প্রতিপালক! নিঃসন্দেহে এরা ঐ সকল লোক যাদেরকে আমরা প্ররোচিত করেছিলাম, আমরা এদেরকে তদ্রূপ পথভ্রষ্ট করেছিলাম যদ্রূপ আমরা স্বয়ং পথভ্রষ্ট হয়েছি, আমরা আপনার সমীপে তাদের (সম্বন্ধ) হতে সম্পর্কহীন হচ্ছি, তারা (কেবল) আমাদেরই পূজা করত না।	قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬০. وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ আর তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا তা শুধু পার্থিব জীবন যাপনের সরঞ্জাম وَزِيْنَتُهَا আর তার সৌন্দর্য وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ পক্ষান্তরে যা কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে خَيْرٌ وَّاَبْقٰى তা এটা অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম এবং অধিক স্থায়ী।

৬১. اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا আচ্ছা যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি فَهُوَ لَاقِيْهِ অতঃপর সে তা প্রাপ্ত হবে كَمَنْ সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا যাকে আমি ইহজীবনের কয়েকদিনের সম্ভোগ দিয়ে রেখেছি ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ তৎপর সে কিয়ামত দিবসে ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ যাদেরকে বন্দিরূপে উপস্থিত করা হবে।

৬২. وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ আর যেদিন আল্লাহ সে কাফেরদেকে ডেকে বলবেন اَيْنَ شُرَكَآءِيَ আমার সেই শরিকরা কোথায় الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে করতে।

৬৩. قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ যাদের প্রতি আল্লাহর বাণী সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা বলে উঠবে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا নিঃসন্দেহে এরা ঐ সকল লোক যাদেরকে আমরা প্ররোচিত করেছিলাম اَغْوَيْنٰهُمْ আমরা এদেরকে তদ্রূপ পথভ্রষ্ট করেছিলাম যদ্রূপ كَمَا غَوَيْنَا আমরা স্বয়ং পথভ্রষ্ট হয়েছি تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ আমরা আপনার সমীপে তাদের (সম্বন্ধ) হতে সম্পর্কহীন হচ্ছি مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ তারা (কেবল) আমাদেরই পূজা করত না।

৬৪. (আরো) বলা হবে, তোমাদের সে শরিকদেরকে ডাক, তখন তারা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তারা সাড়াও দিবে না, এবং (তখন) এরা আজাবকে প্রত্যক্ষ করবে, হায়! তারা যদি (দুনিয়াতে) সত্য পথে থাকত।	وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আর যেদিন ঐ কাফেরদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা রাসূলদেরকে কি উত্তর দিয়েছিলে?	وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. বস্তুত সেদিন তাদের (অন্তর) হতে সমুদয় বিষয়ই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।	فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. অবশ্যই যে ব্যক্তি তওবা করে এবং ঈমান আনে ও নেক কাজ করতে থাকে, আশা করা যায় যে, এরূপ ব্যক্তি সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. আর আপনার রব যা ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি করেন এবং (যে বিধানকে ইচ্ছা) নির্বাচন করেন; (আর বিধানাবলি) নির্বাচন করার তাদের কোনো অধিকার নেই; আল্লাহ তাদের শিরক হতে পবিত্র এবং ঊর্ধ্বে।	وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৪. وَقِيْلَ আর বলা হবে اُدْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ তোমাদের সেই শরিকদেরকে ডাক فَدَعَوْهُمْ তখন তারা তাদেরকে ডাকবে فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ কিন্তু তারা সাড়াও দিবেনা وَرَاَوُا الْعَذَابَ এবং এরা আজাবকে প্রত্যক্ষ করবে لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ হায়! তারা যদি (দুনিয়াতে) সত্য পথে থাকত।

৬৫. وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ আর যেদিন ঐ কাফেদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ তোমরা রাসূলগণকে কি উত্তর দিয়েছিলে?

৬৬. فَعَمِيَتْ বস্তুতঃ বিলুপ্ত হয়ে যাবে عَلَيْهِمُ তাদের (অন্তরে) থেকে الْاَنْۢبَآءُ সমুদয় বিষয়ই يَوْمَئِذٍ যেদিন فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ তখন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।

৬৭. فَاَمَّا مَنْ تَابَ অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করে وَاٰمَنَ এবং ঈমান আনে وَعَمِلَ صَالِحًا ও নেক কাজ করতে থাকে فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ আশা করা যায় যে, এরূপ ব্যক্তি সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৬৮. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ আপনার রব সৃষ্টি করেন مَا يَشَآءُ যা ইচ্ছা করেন وَيَخْتَارُ এবং নির্বাচন করেন مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ নির্বাচন করার তাদের কোনো অধিকার নেই سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ আল্লাহ তাদের শিরক হতে পবিত্র এবং ঊর্ধ্বে।

৬৯. আর আপনার রব সমস্তই অবগত আছেন, যা কিছু তাদের অন্তরে গোপন থাকে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. এবং তিনিই আল্লাহ, তিনি ভিন্ন কেউই মা'বূদ (হওয়ার যোগ্য) নেই, ইহলোকে ও পরলোকে সমস্ত প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই, এবং আদেশের অধিকার একমাত্র তাঁরই এবং তোমরা সকলে তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করবে।

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৯. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ আর আপনার রব সমস্তই অবগত আছেন مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ যা কিছু তাদের অন্তরে গোপন থাকে وَمَا يُعْلِنُوْنَ এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে।

৭০. وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ এবং তিনিই আল্লাহ! তিনি ভিন্ন কেউই মাবুদ নেই لَهُ الْحَمْدُ সমস্ত প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ইহলোকে ও পরলোকে وَلَهُ الْحُكْمُ এবং আদেশের অধিকার একমাত্র তাঁরই وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ এবং তোমরা সকলে তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (٦١) اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

শানে নুযূল -১ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং আবূ জাহল বিন হিশাম সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত নবী কারীম ﷺ ও আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মুহাম্মদ বিন কা'ব বলেন হযরত হামযা (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এবং নরাধম আবূ জাহল ও আম্মার বিন ওয়ালীদ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারো মতে হযরত আম্মার (রা.) ও ওয়ালীদ বিন মুগীরা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল -২ : আল্লামা কুশাইরী বলেন, এবং নির্ভরযোগ্য মতামত হলো আলোচ্য আয়াত মু'মিন ও কাফের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মোদ্দাকথা আলোচ্য আয়াত সকল কাফের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা জাগতিক জীবনে ভোগ-বিলাসিতা এবং সুখ সাচ্ছন্দে থাকবে এবং পর জগতে তাদের জন্যে অবধারিত রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। এবং সকল মু'মিন সম্পর্কে যারা জাগতিক জীবনে বালা-মসিবতের উপর ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর দেওয়া প্রতি শ্রুতির উপর পূর্ণ আস্থা রাখে। পর জগতে রয়েছে বেহেশতের অনাবিল সুখ-শান্তি। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

–[কুরতুবী ২৮৬/ ১৩, রুহুল মা'আনী ৯৯/১০/২০, তাবারী ৯২/১০,বহরে মুহীত্ব ১২২, ইবনে কাছীর ৪১০/৩, দুররে মানছুর ১৩৪/৫]

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٦٨)

শানে নুযূল- ১ : ওয়ালীদ বিন মুগীরা মন্তব্য করছিল যে, মক্কার এ দু'টি বড় নগরী হতে কোনো ব্যক্তির প্রতি কুরআন নাজিল হলো না কেন? নরাধম ওয়ালিদের সে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল- ২ : মতান্তরে ইহুদিরা যখন মন্তব্য করছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি হযরত জিবরাঈল (আ.) ছাড়া অন্য কোনো ফেরেশতা যদি প্রেরিত হতো, তাহলে আমরা তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করতাম। ইহুদিদের এহেন মন্তব্য করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রুহুল মা'আনী ১০৩/ ১০/২০]

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى : অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস- বাসন সবাই ধ্বংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস বাসন থেকে গুণগত দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ধন সম্পদ- যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নস্তরের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়কও চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে না।

বুদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশি করে : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায় -সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের শরিয়তসম্মত প্রাপক হবে- যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতও আনুগত্যে মশগুল রয়েছেন। কেননা বুদ্ধির দাবি এটাই এবং দুনিয়ারর মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান তারাই। এই মাসআলা হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুররে মুখতারেও উল্লিখিত আছে।

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ الخ : হাশরের ময়দানে কাফের ও মুশরিকদেরকে প্রথম প্রশ্ন শিরক সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ যেসব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরিক বলতে এবং তাদের কথা মতো চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারে কি? জওয়াবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোনো দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি ; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং শয়তানদের মুখ থেকে একথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি ঠিকই, কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্যে আমরাও অপরাধী, কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে পয়গম্বরগণও তাঁদের নায়েবগণ তাদেরকে হেদায়েতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

তারা স্বেচ্ছায় পয়গম্বরগণের কথা অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবুল না করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া কোনো ধর্তব্য ওজর নয়।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ : এই আয়াতের এক অর্থ তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, وَيَخْتَارُ -এর বিধান জারির ক্ষমতা। আল্লাহ তা'আলা একাই যখন সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কোনো শরিক নেই, তখন বিধান জারিতেও তিনি একক। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধান জারি করেন। সারকথা এই যে, সৃষ্টিগত ক্ষমতায় যেমন আল্লাহর কোনো শরিক নেই, তেমনি বিধান জারি করার ক্ষমতায়ও তাঁর কোনো অংশীদার নেই। এর অপর এক অর্থ ইমাম বগভী (র.) তাঁর তাফসীরের গ্রন্থে এবং ইবনে কাইয়্যেম যাদুল মা'আদের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, يَخْتَارُ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান দানের জন্য মনোনীত করেন। বগভীর উক্তি অনুযায়ী এটা মুশরিকদের এই কথার জওয়াব لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ- অর্থাৎ এই কুরআন আরবের দু'টি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের মধ্যে থেকে কোনো প্রধান ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করা হলো না কেন? এরূপ করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হতো। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাজিল করার রহস্য কি? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, যে মালিক সমগ্র সৃষ্ট জগতকে কোনো অংশীদারের সাহায্য ব্যাতিরকে সৃষ্টি করেছেন, কোনো বান্দাকে বিশেষ সম্মান দানের জন্য মনোনীত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক যোগ্য নয়?

এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর এবং এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা : হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম এই আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান উদ্ভাবন করেছেন। তা এই যে, দুনিয়াতে এক স্থান কে অন্য স্থানের উপর অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব দান সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপার্জন ও কর্মের ফল নয় ; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি। তিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছে। তন্মধ্যে উর্ধ্ব আকাশকে অন্যগুলোর উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন। অথচ সবগুলো আকাশের উপাদান একই ছিল। তিনি জান্নাতুল ফেরদাউসকে অন্যসব জান্নাতের উপর, জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল প্রমুখ বিশেষ ফেরেশতাগণকে অন্য ফেরেশতাদের উপর, পয়গম্বরগণকে সমগ্র আদম সন্তানের উপর, তাঁদের দৃঢ়চেতা পয়গম্বরগণকে অন্য পয়গম্বরগণের উপর, ইবরাহীম খলীল ও হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ -কে অন্য দৃঢ়চেতা পয়গম্বরগণের উপর, হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর বংশধরকে সমগ্র মানবজাতির উপর, কোরাইশকে তাদের সবার উপর, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সব বনী হাশেমের উপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য মনীষীকে অন্য মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি।

এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর অনেক দিন ও রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করাও আল্লাহ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচছার প্রভাব। মোটকথা, শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ও

ইচ্ছাই। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অপর একটি কারণ মানুষের কর্মকাণ্ডও হয়ে থাকে। যেসব স্থানে সৎকর্ম সম্পাদিত হয় সেসব স্থান ও সৎকর্ম অথবা সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের বসবাসের কারণে পবিত্র ও পুণ্যময় হয়ে যায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব উপার্জন ইচ্ছা ও সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি দু'টি। একটি ইচ্ছাধীন, যা সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্র দ্বারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনকে সব সাহাবীর উপর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবূ বকর অতঃপর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) অতঃপর হযরত ওসমান গনী (রা.) অতঃপর হযরত আলী মু'তাযা (রা.) -এর ক্রমকে উপরিউক্ত উভয় মাপকাঠি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। হযরত শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলভী (র.) -এরও একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা, এই বিষয়বস্তুর উপর ফার্সী ভাষায় লিখিত আছে। "বো'দিত তাফসীল লি মাসআলাতিত তাফসীল" নামে মুফতি শফী (র.)- এর উর্দু তরজমা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া তিনি 'আহকামুল কুরআন" সূরা কাসাসে ও আরবি ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিষয়টি সুধীবর্গের জন্য রুচিকর। তাঁরা সেখানে দেখে নিতে পারেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَبْقٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার بَقَاءٌ মূলবর্ণ (ب - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অধিক স্থায়ী।

لَاقِيْهِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার لَقْىٌ ও لِقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে তা প্রাপ্ত হবে।

مَتَّعْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْتِيْعٌ মূলবর্ণ (م - ت - ع) জিনস صحيح অর্থ– যাকে আমি দিয়ে রেখেছি।

اَلْمُحْضَرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اِحْضَارٌ মূলবর্ণ (ح - ض - ر) জিনস صحيح অর্থ– যাদেরকে বন্দিরূপে উপস্থিত করা হবে।

كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى استمرارى معروف বাব نَصَرَ মাসদার زَعْمٌ মূলবর্ণ (ز - ع - م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা মনে করতে।

اَغْوَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِغْوَاءٌ মূলবর্ণ (غ - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– আমরা প্ররোচিত করেছিলাম।

تَبَرَّأْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَرُّءٌ মূলবর্ণ (ب - ر - أ) জিনস مهموز لام অর্থ– আমরা তাদের হতে সংস্রবহীন হচ্ছি।

فَعَمِيَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার عَمًى মূলবর্ণ (ع - م - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

اَلْمُفْلِحِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِفْلَاحٌ মূলবর্ণ (ف - ل - ح) জিনস صحيح অর্থ– সফলকাম ব্যক্তিগণ।

يَخْتَارُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِخْتِيَارٌ মূলবর্ণ (خ - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তিনি নির্বাচন করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَرَاَوُا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ : এখানে واو টি আতেফা, رَأَوْا ফে'ল তার যমীর ফায়েল হলো الْعَذَابَ মাফউলে বিহী। আর لَوْ হলো شرطية এবং اَنَّهُمْ -এর اَنَّ হলো হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল আর هُمْ হলো اسم ان আর كَانُوْا হলো ফে'লে নাকেস এবং তার যমীর اسم كَانَ এবং يَهْتَدُوْنَ হলো خبر كَانَ আর كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ হলো خبر اَنَّ –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড; পৃ. ৬৩৯]

৭১. আপনি বলুন, আচ্ছা! এটা বল তো, যদি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত একাধারে তোমাদের উপর রাত্রিকে স্থায়ী রাখেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত কে এমন উপাস্য আছে, যে তোমাদের জন্য আলো এনে দেবে? তবে কি (এমন স্পষ্ট প্রমাণসমূহ) তোমরা কর্ণপাত করবে না?	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧١﴾
৭২. আপনি বলুন, আচ্ছা বল তো যদি কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের উপর দিনকে স্থায়ী রাখেন, তবে আল্লাহ ভিন্ন কে এমন উপাস্য আছে, যে তোমাদের জন্য রাত্রি এনে দেবে? যাতে তোমরা আরাম পাও; তবুও কি তোমরা ভেবে দেখ না?	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. আর তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের জন্য রাত্রি ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা রাত্রিকালে আরাম কর এবং (দিবাভাগে) যেন তাঁরই (প্রদত্ত) জীবিকা অন্বেষণ কর এবং যেন (উভয়বিধ নিয়ামতের জন্য) তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. আর যেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে তারা কোথায় গেল?	وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٧٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭১. قُلْ আপনি বলুন اَرَءَيْتُمْ আচ্ছা! এটা বল তো اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ যদি আল্লাহ তা'আলা রাখেন الَّيْلَ রাত্রিকে سَرْمَدًا একাধারে স্থায়ী اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত পর্যন্ত مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ তবে আল্লাহ ব্যতীত কে এমন উপাস্য আছে يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ যে তোমাদের জন্য আলো এনে দেবে? اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ তবে কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?

৭২. قُلْ اَرَءَيْتُمْ আপনি বলুন, আচ্ছা! বলো তো اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ যদি আল্লাহ তোমাদের উপর রাখেন النَّهَارَ سَرْمَدًا দিনকে স্থায়ী اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত পর্যন্ত مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ তবে আল্লাহ ভিন্ন এমন কোন উপাস্য আছে يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ যে তোমাদের জন্য রাত্রি এনে দিবে? تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ যাতে তোমরা আরাম পাও اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ তবুও কি তোমরা ভেবে দেখ না।

৭৩. وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ আর তিনি স্বীয় অনুগ্রহে جَعَلَ لَكُمُ তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন الَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্রি ও দিনকে لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ যেন তোমরা রাত্রিকালে আরাম করো وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ এবং (দিবা ভাগে) যেন তারই (প্রদত্ত) জীবিকা অন্বেষণ করো وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৭৪. وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ আর যেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ডেকে বলবেন اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ তোমরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে তারা কোথায় গেল।

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٧٥﴾	৭৫. আর আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একজন সাক্ষী বের করে আনব, অতঃপর বলব, এখন তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থান কর, সুতরাং তারা জানতে পারবে যে, সত্য কথা আল্লাহরই ছিল, আর (পৃথিবীতে) যে সমস্ত মনগড়া উক্তি তারা করত তা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।
اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ۚ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٦﴾	৭৬. কারূন মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত (তাঁর চাচাতো ভাই) ছিল, অনন্তর সে তাঁদের সম্মুখে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগল এবং আমি তাকে এত অধিক পরিমাণ ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম যে, তার চাবিসমূহ কয়েকজন শক্তিশালী লোকের গুরুভার বোঝা হতো, যখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বলেছিল, তুমি গর্ব করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা গর্বকারীদেরকে পছন্দ করেন না।
وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾	৭৭. আর তোমাকে আল্লাহ যে পরিমাণ দান করেছেন, তাতে পরকালেরও আবাস অন্বেষণ কর এবং ইহলোক হতে নিজ অংশ (নিয়ে যেতে) ভুল করো না, আর যেরূপ আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তদ্রূপ তুমিও (তাঁর বান্দাদের প্রতি) অনুগ্রহ কর, এবং ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ফ্যাসাদী লোকদেরকে পছন্দ করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৫. وَنَزَعْنَا আর আমি বের করে আনব مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে شَهِيْدًا একজন সাক্ষী فَقُلْنَا অতঃপর বলব هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ এখন তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থাপন করো فَعَلِمُوْٓا সুতরাং তারা জানতে পারব যে, اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ সত্য কথা আল্লাহরই ছিল وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ আর (পৃথিবীতে) যে সমস্ত মনগড়া উক্তি তারা করত তা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।

৭৬. اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى কারূন মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল فَبَغٰى عَلَيْهِمْ অনন্তর সে তাদের সম্মুখে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগল وَاٰتَيْنٰهُ এবং আমি তাকে দান করেছিলাম مِنَ الْكُنُوْزِ এত অধিক ধনভাণ্ডার مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ তার চাবিসমূহ لَتَنُوْٓءُ بِالْعُصْبَةِ গুরুভার বোঝা হতো اُولِى الْقُوَّةِ কয়েকজন শক্তিশালী লোকের اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ যখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বলেছিলে لَا تَفْرَحْ তুমি গর্ব করো না اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা গর্বকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

৭৭. وَابْتَغِ আর তাকে অন্বেষণ করো فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ তোমাকে আল্লাহ যে পরিমাণ দান করেছেন الدَّارَ الْاٰخِرَةَ পরকালেরও আবাস وَلَا تَنْسَ, এবং ভুল করো না نَصِيْبَكَ নিজ অংশ (নিয়ে যেতে) مِنَ الدُّنْيَا ইহলোক হতে وَاَحْسِنْ আর তদ্রূপ তুমিও অনুগ্রহ করো كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ যেরূপ আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ এবং ভূ-পৃষ্ঠে ফ্যাসাদ কামনা করো না اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ফ্যাসাদী লোকদেরকে পছন্দ করেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ .... مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাত্রির সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ অর্থাৎ রাতে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে بِضِيَاءٍ বলে তার কোনো উপকারিতা উল্লেখ করেননি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সত্তাগতভাবে উত্তম। অন্ধকার থেকে আলোকে যে উত্তম তা সুবিদিত। আলোকের অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদতি যে, তা বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত্রি হচ্ছে অন্ধকার, যা সত্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়। বরং মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই দিনের ব্যাপারে শেষে اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ এবং রাতের ব্যাপারের শেষে اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, দিনের শ্রেষ্ঠত্ব বরকতও উপকারিতা এত বেশি যে, তা দৃষ্টিসীমায় আসতে পারে না, তবে শোনা যায়। তাই اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ বলা হয়েছে। কেননা মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সিংহভাগ কর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চোখে দেখা বিষয় সব সময় কানে শোনা বিষয়ের তুলনায় কম। রাতের উপকারিতা দিনের তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে পারে। তাই اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ বলা হয়েছে।–[মাযহারী]

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ : সূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের সাথে হযরত মূসা (আ.)–এর একক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্প্রদায়ভুক্ত কারূনের সাথে তাঁর দ্বিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এর মহব্বতে ডুবে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় : وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا কারূনের কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ধন-সম্পদ অর্জিত হওয়ার পর সে এই উপদেশ বেমালুম ভুলে যায়। এর নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃতঘ্নতা করে এবং ধন-সম্পদে ফকির-মিসকিনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও অস্বীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধন-ভাণ্ডার সহ ভূগর্ভে বিলীন করে দেওয়া হয়।

قَارُوْنَ : সম্ভবত: হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে কুরআন থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তার সম্পর্ক কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এক রেওয়ায়েতে তাকে হযরত মূসা (আ.)-এর চাচাত ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া আরও উক্তি আছে। –[কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী]

রূহুল মা'আনীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে যে, কারূন তওরাতের হাফেজ ছিল এবং তাওরাত তার অন্য সবার চাইতে বেশি মুখস্থ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হলো। তার কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পার্থিব সম্মান ও জাঁকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় মোহ। হযরত মূসা (আ.) ছিলেন সমগ্র বনী ইসরাঈলের নেতা এবং তাঁর ভ্রাতা হারূন (আ.) ছিলেন তার উজির ও নবুয়তের অংশীদার। এতে কারূনের মনে হিংসা জাগে যে, আমিও তাঁর জ্ঞাতি ভাই এবং নিকট স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন? সেমতে সে হযরত মূসা (আ.) -এর কাছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহ প্রদত্ত বিষয়। এতে আমার কোনো হাত নেই। কিন্তু কারূন এতে সন্তুষ্ট হলো না এবং হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে।

فَبَغٰى عَلَيْهِمْ : بَغْى কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ জুলুম করা। আয়াতের অর্থ এই যে, সে ধনসম্পদের নেশায় অপরের প্রতি জুলুম করতে লাগল। ইয়াহইয়া ইবনে সালাম ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন, কারূন ছিল বিত্তশালী। ফেরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। এই পদে থাকা অবস্থায় সে বনী-ইসরাঈলের উপর নির্যাতন চালায়।–[কুরতুবী]

এর অপর অর্থ অহংকার করা। অনেক তাফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন যে, কারূন ধন দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী-ইসরাঈলের মোকাবিলায় অহংকার করতে থাকে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে।

وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ : كُنُوْزٌ শব্দটি كَنْزٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডার। শরিয়তের পরিভাষায় كَنْزٌ এমন ধন-ভাণ্ডারকে বলা হয়, যার জাকাত দেওয়া হয়নি। হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, কারূন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডারপ্রাপ্ত হয়েছিল –[রূহুল মা'আনী]

لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ : نَاءَ শব্দের অর্থ বোঝার ভারে ঝুকিয়ে দেওয়া। আর اَلْعُصْبَةُ শব্দের অর্থ দল। উদ্দেশ্য এই যে, তার ধন-ভাণ্ডার ছিল বিরাট। এগুলোর দাবি এত অধিকসংখ্যক ছিল যে, তা বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য

ছিল। কারুনের কল্পনাতীত, চবি সাধারণতঃ হালকা ওজনের হয়ে থাকে, যাতে বহন করা ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিন্তু প্রচুর সংখ্যক হওয়ার কারণে কারুনের চাবির ওজন এত বেশি ছিল, যা একদল লোকও সহজে বহন করতে পারত না। –[রুহুল মা'আনী]

لَاتَفْرَحْ : فَرَحْ-এর শাব্দিক অর্থ আনন্দ, উল্লাস। কুরআন পাক অনেক আয়াতে এই فَرَحْ কে নিন্দনীয়রূপে ব্যক্ত করেছে, যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ অন্য এক আয়াতে আছে لَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ আরও এক আয়াতে আছে وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا কিন্তু কোনো কোনো আয়াতে এর অনুমতি বরং এক ধরনের আদেশও বর্ণিত আছে, যেমন فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا আয়াতে এবং وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ আয়াতে। এসব আয়াতের সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই আনন্দ ও উল্লাস নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ যা দম্ভ ও অহংকারের সীমা পর্যন্ত পৌছে যায়। এটা তখনই হতে পারে, যখন এই আনন্দকে নিজস্ব ব্যক্তিগত গুণ ও ব্যক্তিগত অধিকার মনে করা হয়– আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া মনে না করা হয়। যে আনন্দ এই সীমা পর্যন্ত পৌছে না, তা নিষিদ্ধ নয়, বরং একদিক দিয়ে কাম্য। কারণ এতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

অর্থাৎ ঈমানদারগণ কারুনকে এই উপদেশ দিল, আল্লাহ তোমাকে যে অর্থ -সম্পদ দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালীন শান্তির ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়াতে তোমার যে অংশ আছে তা ভুলে যেয়ো না। দুনিয়ার অংশ কি? এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এর অর্থ– দুনিয়ার বয়স এবং এই বয়সের মধ্যে করা হয় এমন কাজকর্ম, যা পরকালে কাজে আসতে পারে। সদকা -খয়রাতসহ অন্যান্য সব সৎকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে এ অর্থই বর্ণিত আছে। –(কুরতুবী) এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাগিদ ও সমর্থন হবে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, তোমাকে আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন অর্থাৎ টাকা-পয়সা, বয়স শক্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি এগুলোকে পরকালের কাজে লাগাও। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে তোমার অংশ ততটুকুই যতটুকু পরকালের কাজে লাগবে। অবশিষ্টাংশ তো ওয়ারিশদের প্রাপ্য। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাকে আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন, তা দ্বারা পরকালের ব্যবস্থা করো, কিন্তু নিজের সাংসারিক প্রয়োজনও ভুলে যেয়ো না যে, সবকিছু দান করে নিজে কাঙ্গাল হয়ে যাবে। বরং যতটুকু প্রয়োজন, নিজের জন্য রাখ। এই তাফসীর অনুযায়ী দুনিয়ার অংশ বলে জীবন ধারণের উপকরণ বোঝানো হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَتَبْتَغُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِغَاءٌ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যেন তোমরা অন্বেষণ কর।

نَزَعْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نَزْعٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি বের করে আনব।

كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা মনগড়া উক্তি করত।

فَبَغٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بَغْىٌ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অনন্তর সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগল।

لَتَنُوْءُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ فعل مضارع لام تاكيد বাব نَصَرَ মাসদার نَوْءٌ মূলবর্ণ (ن - و - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং اجوف واوى) অর্থ– তা গুরুভার বুঝা হতো।

لَاتَنْسَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার نِسْيَانٌ মূলবর্ণ (ن - س - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তুমি ভুল করো না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ : এখানে واو টি আতেফা, نَزَعْنَا ফে'ল ও ফায়েল এবং مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ-এর নَزَعْنَا-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর شَهِيْدًا হলো মাফউলে বিহী। আর فَقُلْنَا টা نَزَعْنَا টা كُلِّ اُمَّةٍ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর هَاتُوْا বাক্যটি قول-এর مقول হয়েছে। আর هَاتُوْا হলো ফে'লে আমর এবং তার যমীর হলো ফায়েল এবং بُرْهَانَكُمْ হলো মাফউলে বিহী। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড; পৃ. ৬৪৪]

قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ ؕ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ؕ وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۷۸﴾

৭৮. কারূন বলতে লাগল, এ সমস্ত (ধনসম্পদ) তো আমি নিজের বুদ্ধিমত্তাবলেই প্রাপ্ত হয়েছি; (এর খণ্ডনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,) সে কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার পূর্বে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যকার এমন এমন লোকদেরকে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে (-ও) তা অপেক্ষা বহুগুণে দৃঢ়তর ছিল এবং তাদের জনবল (-ও) অধিকতর ছিল; আর (অপরাধ প্রতিপাদন করার জন্য) পাপীদেরকে তাদের পাপ কার্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে হবে না।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿۷۹﴾

৭৯. অনন্তর সে স্বীয় জাঁকজমকের সাথে সম্প্রদায়ের লোকদের সম্মুখে বের হলো; যারা পার্থিব সম্পদের অভিলাষী ছিল তারা বলতে লাগল, আহ! কি উত্তম হতো যদি আমরাও সেইরূপ সাজসরঞ্জাম প্রাপ্ত হতাম যা কারূন প্রাপ্ত হয়েছে, বাস্তবিকই সে বড়ই ভাগ্যবান।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿۸۰﴾

৮০. আর যারা জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছে তারা বলতে লাগল, হায় সর্বনাশ! তোমরা কি বল? আল্লাহ্ তা'আলার দরবারের ছওয়াব বহু উত্তম, তা এমন লোকেরা পাবে যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আর তা কেবলমাত্র ধৈর্যশীল লোকদেরকেই দেওয়া হয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৮. قَالَ কারূন বলতে লাগল اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ এ সমস্ত (ধন-সম্পদ) তো আমার নিজের বুদ্ধিমত্তাবলেই প্রাপ্ত হয়েছি اَوَلَمْ يَعْلَمْ সে কি এটা অবগত নয় যে, اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ আল্লাহ তা'আলা ধংস করেছেন مِنْ قَبْلِهٖ তার পূর্বে مِنَ الْقُرُوْنِ পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যকার এমন এমন লোকদেরকে مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً যারা শক্তিতে তা অপেক্ষা বহুগুণে দৃঢ়তর ছিল وَّاَكْثَرُ جَمْعًا, এবং তাদের জনবল (ও) অধিকতর ছিল وَلَا يُسْـَٔلُ, আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ পাপীদেরকে তাদের পাপকার্য সম্বন্ধে।

৭৯. فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ অনন্তর সে সম্প্রদ্রায়ের লোকদের সম্মুখে বের হলো فِيْ زِيْنَتِهٖ স্বীয় জাকজমকের সাথে قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ যারা অভিলাষী ছিল তারা বলতে লাগল الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا পার্থিব সম্পদের يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ আহা! কি উত্তম হতো যদি আমরাও সেরূপ সাজ-সরঞ্জাম প্রাপ্ত হতাম مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ যা কারূন প্রাপ্ত হয়েছে اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ বাস্তবিকই সে বড়ই ভাগ্যবান।

৮০. وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ, আর যারা জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছে তারা বলতে লাগল وَيْلَكُمْ হায় সর্বনাশ! তোমরা কি বল? ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ আল্লাহ তা'আলার দরবারের ছওয়াব বহু উত্তম لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا তা এমন লোকেরা পাবে যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে وَلَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ, আর তা কেবলমাত্র ধৈর্যশীল লোকদেরকেই দেওয়া হয়।

৮১. অতঃপর আমি কারূনকে তার অট্টালিকাসহ জমিনে ধসিয়ে দিলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোনো দল ছিল না, যারা তাকে আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করত, আর সে নিজেও নিজকে রক্ষা করতে পারেনি।	فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾
৮২. এবং গতকাল যারা তার ন্যায় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিল তারা বলতে লাগল, মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাগণের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা প্রচুর জীবিকা দান করেন এবং (যাকে ইচ্ছা) সংকীর্ণ করে দেন, যদি আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানি না হতো, তবে আমাদেরকেও ধসিয়ে ফেলা হতো; ব্যস, জানা গেল, কাফেরদের সফলতা লাভ হয় না।	وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. এটা আখেরাতের সেই আবাস আমি ঐ সমস্ত লোকের জন্য নির্দিষ্ট করছি– যারা ভূপৃষ্ঠে বড় (অহংকারী) হতেও চায় না, অনর্থ ঘটাতেও চায় না এবং উত্তম পরিণাম পরহেজগার লোকেরাই প্রাপ্ত হয়।	تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮১. فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ অতঃপর আমি কারূন কে তার অট্টালিকা সহ জমিনে ধসিয়ে দিলাম فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ তার স্বপক্ষে এমন কোনো দল ছিল না يَنْصُرُوْنَهٗ যারা তাকে রক্ষা করত مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহর আজাব হতে وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি।

৮২. وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ এবং গতকাল যারা তার ন্যায় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিল يَقُوْلُوْنَ তারা বলতে লাগল وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ আল্লাহ তা'আলা প্রচুর জীবিকা দান করেন لِمَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা مِنْ عِبَادِهٖ নিজ বান্দাগণের মধ্যে হতে وَيَقْدِرُ এবং সংকীর্ণ করে দেন لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا যদি আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানি না হতো لَخَسَفَ بِنَا তবে আমাদেরকেও ধসিয়ে ফেলা হতো وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ব্যস, জানা গেল কাফেরদের সফলতা লাভ হয় না।

৮৩. تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ এটা আখেরাতের সেই আবাস نَجْعَلُهَا আমি ঐ সমস্ত লোকের জন্য নির্দিষ্ট করছি لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ যারা ভূপৃষ্ঠে বড় (অহংকারী) হতেও চায় না وَلَا فَسَادًا এবং অনর্থ ঘটাতেও চায় না وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ এবং উত্তম পরিণাম পরহেজগার লোকেরাই প্রাপ্ত হয়।

৮৪. যে ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) নেকি নিয়ে আসবে, সে তা অপেক্ষা উত্তম (বিনিময়) পাবে, আর যে ব্যক্তি পাপ নিয়ে আসবে, তবে- এরূপ লোকদেরকে যারা পাপ কাজ করে, সে পরিমাণ প্রতিফলই প্রদত্ত হবে যে পরিমাণ তারা করত।	مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. যে আল্লাহ আপনার প্রতি কুরআন ফরজ করেছেন, তিনি আপনাকে পুনরায় স্বদেশে পৌছে দিবেন; আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক খুব জানেন, কে সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।	اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّيْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٥﴾
৮৬. আর আপনার আশা ছিল না যে, আপনার প্রতি এ কিতাব নাজিল করা হবে, কিন্তু আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহেই এটা অবতীর্ণ হয়েছে, অতএব, আপনি এ কাফেরদের প্রতি একটুও সমর্থন করবেন না।	وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْۤا اَنْ يُّلْقٰۤى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. আর যখন আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন যেন তারা আপনাকে সে নির্দেশাবলি হতে নিবৃত্ত না রাখে এবং আপনি লোকদেরকে আপনার প্রতিপালকের দিকে ডাকতে থাকুন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।	وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৪. مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ যে ব্যক্তি নেকি নিয়ে আসবে فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا সে তা অপেক্ষা উত্তম (বিনিময়) পাবে وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ আর যে ব্যক্তি পাপ নিয়ে আসবে فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ আর এরূপ লোকদেরকে যারা পাপ কাজ করে, সে পরিমাণ প্রতিফল প্রদত্ত হবে যে পরিমাণ তারা করত।

৮৫. اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ যে আল্লাহ আপনার প্রতি কুরআন ফরজ করেছেন لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ তিনি আপনাকে পুনরায় স্বদেশে পৌছে দিবেন قُلْ আপনি বলে দিন رَبِّيْۤ اَعْلَمُ আমার রব খুব জানেন مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى কে সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছে وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ এবং কে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় রয়েছে।

৮৬. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْۤا আর আপনার আশা ছিল না যে اَنْ يُّلْقٰۤى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ আপনার প্রতি এই কিতাব নাজিল করা হবে اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ কিন্তু আপনার রবের অনুগ্রহেই এটা অবতীর্ণ হয়েছে فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ অতএব, আপনি এই কাফেরদের একটুও সমর্থন করবেন না।

৮৭. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ, আর তখন যেন তারা আপনাকে সেই নির্দেশাবলি হতে নিবৃত্ত না রাখে بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ যখন আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি অবতীর্ণ হয়েছে وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ, এবং আপনি লোকদেরকে আপনার রবের দিকে ডাকতে থাকুন وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

৮৮. আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকবেন না। তিনি ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই। তাঁর সত্তা ছাড়া সকল বস্তুই ধ্বংসশীল; রাজত্ব তাঁরই এবং সকলকে তাঁরই সমীপে ফিরে যেতে হবে।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟ كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৮. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ এবং আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকবেন না لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ তাঁর সত্তা ছাড়া সকল বস্তুই ধ্বংসশীল لَهُ الْحُكْمُ রাজত্ব তাঁরই وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ এবং সকলকে তাঁরই সমীপে ফিরে যেতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِیْنَ لَا یُرِیْدُوْنَ عُلُوًّا فِی الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ (۸۳)

শানে নুযূল : ইবনে মারদূভিয়া ও ইবনে আসাকির হযরত আলী (র.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ন্যায় ভিত্তিক ও বিনয়ী শাসক এবং সামর্থ্যবান মানুষদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী ১২৫/ ১০/ ২০ , ফাতহুল কাদীর ১৯০/৪]

قُلْ رَّبِّیْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰی وَمَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ (۸۵)

শানে নুযূল : হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ যখন দীনি দাওয়াতে আত্মনিয়োগ করেন, মানুষের মাঝেও এক নতুন জীবন সঞ্চারিত হতে লাগল, পথ হারা মানুষেরা পেতে লাগল মুক্তির এক সমুজ্জ্বল পথ। অশান্ত আরব বর্বর সমাজ সন্ধান পেল নব দিগন্তের দিশা। তখনই কাফের মুশরিকেরা রাসূলে আকদাস ﷺ -এর অগ্রগতি রোধ করার জন্যে এক চক্রান্তের জাল বিস্তার করল। তারা রাসূলে আকরাম ﷺ কে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ! তুমিতো সরাসরি ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছ। সেই পরিস্থিতিতে তাদের এ দাবির ভ্রান্ততা ঘোষণা করে তাদের জবাবে আল্লাহ আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[জালালাইন ৩৩৪]

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰی مَعَادٍ قُلْ رَّبِّیْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰی وَمَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ(۸۵)

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম জাহ্হাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন মক্কা হতে মদীনার পথে হিজরত করে যান, তখন তিনি অনুসন্ধান কারীর ভয়ে অপরিচিত পথে চলতেন; পরবর্তীতে তিনি যখন রাস্তায় উঠে জুহফায় আসেন তখন মক্কার পথকে চিনতে পান। ফলে তিনি প্রিয় মক্কার প্রতি অধির হয়ে পড়েন। হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি কি আপনার জন্মভূমির প্রতি উৎসুক ও ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন? রাসূল বললেন, হ্যাঁ! সে মুহূর্তে রাসূল ﷺ কে সান্ত্বনা দান করার জন্যে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। যা হযরত জিবরাঈল (আ.) পাঠ করে শোনালেন। এতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার সু-সংবাদও দান করা হয়েছে।

–(সাভী ২২৮/৩, দুররুল মানসূর ১৩৯/৫, ইবনে কাছীর ৪১৭/৩)

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ (۸۸)

শানে নুযূল : ইবনে মারদূভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ আয়াত যখন নাজিল হলো, তখন রাসূল ﷺ -এর নিকট জানতে চাওয়া হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতাদের পরিণতি কি হবে? সে প্রশ্নের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৩১/১০/২০]

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي : কারো কারো মতে এখানে 'ইলম' বলে তাওরাতের জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। যেমন রেওয়ায়েতে আছে যে, কারূন তাওরাতের হাফেজ ও আলেম ছিল। হযরত মূসা (আ.) যে সত্তরজনকে তূর পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন, কারূন তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে বসে। তার উপরিউক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি নিজেই এর প্রাপক। এতে আমার প্রতি কারো অনুগ্রহ নেই। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, এখানে ইলম বলে 'অর্থনৈতিক কলাকৌশল' বুঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কোনো দখল নেই। এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্খ কারূন একথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা শিল্প অথবা ব্যবসা বাণিজ্য–এগুলোও তো আল্লাহ তা'আলারই দান ছিল; –তার নিজস্ব গুণ-গরিমা ছিল না।

أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ : কারূনের উপরিউক্ত উক্তির আসল জওয়াব তো তা-ই ছিল, যা উপরে লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, তোমার ধনসম্পদ তোমার বিশেষ কর্ম তৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জন শক্তিও তো আল্লাহ্ তা'আলার দান। এই জওয়াব যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই কুরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জওয়াব দিয়েছে যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। অর্থের প্রাচুর্য কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসাবে কুরআন পাক অতীত যুগের বড় বড় ধনকুবদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহর আজাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসেনি।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ الاية : এই আয়াতে الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ অর্থাৎ আলেমদের মোকাবিলায় الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসম্ভার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয়। আলেমদের দৃষ্টি সর্বদা পরকালের চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই দুনিয়ার ভোগসম্ভার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا : এই আয়াতে পরকালের মুক্তি ও সাফল্য শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও অনর্থের ইচ্ছা করে না। عُلُوٌّ শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। فَسَادٌ বলে অপরের উপর জুলুম বুঝানো হয়েছে। –[সুফিয়ান সাওরী]

কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, গুনাহ্ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের শামিল। কারণ গুনাহের কুফলস্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যারা অহংকার, জুলুম অথবা গুনাহের ইচ্ছা করে, পরকালে তাদের অংশ নেই।

জ্ঞাতব্য ঃ যে অহংকারে নিজেকে অপরের চাইতে বড় ও অপরকে হেয় করা উদ্দেশ্য থাকে, আলোচ্য আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও কুফল বর্ণিত হয়েছে। নতুবা অপরের সাথে গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে ভালো পোশাক পরা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করা এবং সুন্দর বাসগৃহের ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়; যেমন সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

গুনাহের দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ্ ঃ আয়াতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে পরকাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, কোনো গুনাহের বদ্ধপরিকরতার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ্। (রূহুল মা'আনী) তবে পরে যদি আল্লাহর ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে গুনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় ছওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোনো ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে গুনাহ্ করতে সক্ষম না হয়; কিন্তু চেষ্টা ষোলআনাই করে, তবে গুনাহ্ না করলেও তার আমলনামায় গুনাহ্ লেখা হবে। -(গাযালী)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -এর সারমর্ম এই যে, পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের জন্য দুইটি বিষয় জরুরি। এক. ঔদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার এবং দুই. তাকওয়া তথা সৎকর্ম সম্পাদন করা। এই দুটি বিষয় থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট নয়; বরং যে সব ফরজ ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির জন্য শর্ত।

إِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ : সূরার উপসংহারে এসব আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে এবং রেসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল থাকার প্রতি তাকিদ দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্ক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর বিস্তারিত ঘটনা তথা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা, তাঁর ভয় এবং পরিশেষে স্বীয় কৃপায় তাঁকে ফেরাউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী করার কথা আলোচনা করেছেন। অতএব সূরার শেষভাবে শেষ নবী রাসূল ﷺ -এর এমনি ধরনের অবস্থার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার কাফেররা তাঁকে বিব্রত করেছে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলমানদের জীবন দুঃসহ করেছে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সবার উপর প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্কা থেকে কাফেররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ অর্থাৎ যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কুরআন ফরজ করেছেন তথা তেলাওয়াত, প্রচার ও মেনে চলা ফরজ করেছেন, তিনিই পুনরায় আপনাকে "মা'আদে" ফিরিয়ে নিবেন। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে 'মাআদ' বলে মক্কা মোকাররমাকে বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্য আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি বিশেষত হারাম ও বায়তুল্লাহকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে; কিন্তু যিনি কুরআন নাজিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরজ করেছেন, তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তাফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের সময় রাত্রিবেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মক্কা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে সফর করেন। কারণ শত্রুপক্ষ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিল। যখন তিনি মদীনার পথের প্রসিদ্ধ মনজিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহ্ফা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হলো এবং বায়তুল্লাহ্ ও স্বদেশের স্মৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে হযরত আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহ্ফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় মক্কীও নয়, মাদানীও নয়। –(কুরতুবী)

কুরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় ঃ আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কুরআন ফরজ করেছেন, তিনি আপনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআনের নির্দেশ পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ : এখানে وَجْهَهٗ বলে আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, وَجْهَهٗ বলে এমন আমল বুঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহর জন্য খাঁটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে–এছাড়া সব ধ্বংসশীল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أُوْتِيْتُهُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى مجهول বহছ افْعَالٌ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءً মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– আমি প্রাপ্ত হয়েছি।

لَايُلَقّٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّلْقِيَةُ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তা দেওয়া হয় না।

تَمَنَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَمَنِّىْ মূলবর্ণ (م - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছিল।

مَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَنٌّ মূলবর্ণ (م - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– মেহেরবানি।

فَلَا يُجْزٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءً মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাকে প্রতিফল দেওয়া হবে না।

لَرَادُّكَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার رَدٌّ মূলবর্ণ (ر - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিনি আপনাকে পুনরায় পৌঁছে দিবেন।

مَا كُنْتَ تَرْجُوْا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى فعل ماضى استمرارى معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجَاءً মূলবর্ণ (ر - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনার আশা ছিল না।

لَايَصُدُّنَّكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل نهى بانون ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার صَدٌّ মূলবর্ণ (ص - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা যেন আপনাকে নিবৃত্ত না রাখে।

لَاتَكُوْنَنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى بانون ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার كَوْنٌ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– আপনি কিছুতেই হবেন না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ : এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আতফ হয়েছে। আর مَنْ ইসমে শর্ত মুবতাদা جَاءَ ফে'ল আর بِالْحَسَنَةِ টা جَاءَ এর সাথে متعلق হয়েছে। আর ف হলো জওয়াবে শর্তের জন্য رابطة আর لَا يُجْزَى ফেল الَّذِيْنَ হলো নায়েবে ফায়েল عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ হলো সেলাহ اِلَّا হলো اداة حصر আর مَا হলো দ্বিতীয় মাফউল। كَانُوْا বাক্যটি সেলাহ। আর كَانُوْا হলো ফে'লে নাকেস তার যামীর اسم كان আর يَعْمَلُوْنَ হলো خبر كان –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড: পৃ. ৬৬৩]

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা আনকাবূত

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৬৯, রুকূ'– ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ লাম-মীম,	الٓمّٓ ﴿١﴾
২. মানুষ কি এটা ধারণা করেছে যে, এ কথা বলেই অব্যাহতি পাবে যে, আমরা ঈমান এনেছি, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?	اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿٢﴾
৩. আর আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং আল্লাহ সেই লোকদেরকে জেনে নিবেন যারা সত্যবাদী ছিল এবং মিথ্যাবাদীদেরকেও জেনে নিবেন।	وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣﴾
৪. হাঁ, যারা দুষ্কর্মসমূহ করছে তারা কি ধারণা করে যে, আমা হতে কোথাও পলায়ন করে যাবে? তাদের এরূপ সিদ্ধান্ত কত মন্দ।	اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓمّٓ আলিফ-লাম মীম

২. اَحَسِبَ النَّاسُ মানুষ কি এটা ধারণা করেছে اَنْ يُّتْرَكُوْٓا অব্যাহতি পাবে اَنْ يَّقُوْلُوْٓا একথা বলেই যে, اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না।

৩. وَلَقَدْ فَتَنَّا আর আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ সুতরাং আল্লাহ সেই লোকদেরকে জেনে নিবেন الَّذِيْنَ صَدَقُوْا যারা সত্যবাদী ছিল وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ এবং মিথ্যাবাদীদেরকেও জেনে নিবেন।

৪. اَمْ حَسِبَ তবে কি ধারণা করে যে, الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ যারা দুষ্কর্মসমূহ করছে اَنْ يَّسْبِقُوْنَا আমা হতে কোথাও পলায়ন করে যাবে سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ তাদের এরূপ সিদ্ধান্ত কত মন্দ

অনুবাদ	আয়াত
৫. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, বস্তুত (সে যেন বিপদাপদে পেরেশান না হয়। কেননা) আল্লাহ তা'আলার সেই নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই সমাগত হবে এবং তিনি সব শুনেন, সব জানেন।	مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۵﴾
৬. আর যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে সে নিজেরই (নিজের) জন্য পরিশ্রম করে থাকে; সমস্ত বিশ্ববাসীদের মধ্যে আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।	وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۶﴾
৭. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আমি তাদের হতে তাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দিব এবং আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহের উৎকৃষ্টতর বিনিময় প্রদান করব।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۷﴾
৮. এবং আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি; আর যদি তারা উভয় এ বিষয়ে তোমার উপর চাপ দেয় যে, তুমি এমন কোনো বস্তুকে আমার শরিক সাব্যস্ত কর, যার (উপাস্য হওয়া) সম্বন্ধে তোমার নিকট কোনো প্রমাণ নেই তবে তুমি তাদের কথা মানিও না; তোমাদের সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মগুলো জানিয়ে দেব।	وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. مَنْ كَانَ يَرْجُوْا যে ব্যক্তি আশা করে لِقَآءَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ বস্তুত: আল্লাহ তা'আলার সেই নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই সমাগত হবে وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ তিনি সব শুনেন সব জানেন।

৬. وَمَنْ جَاهَدَ আর যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ নিজেরই জন্য পরিশ্রম করে থাকে اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ সমস্ত বিশ্ববাসীদের মধ্যে আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।

৭. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তার যারা ঈমান আনে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করে لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ আমি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দিব وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ এবং আমি তাদেরকে প্রদান করব اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের কৃতকর্ম সমূহের উৎকৃষ্টতর বিনিময়।

৮. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ এবং আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে وَاِنْ جَاهَدٰكَ আর যদি তারা উভয়ে এ বিষয়ে তোমার উপর চাপ দেয় যে, لِتُشْرِكَ بِيْ তুমি এমন কোনো বস্তুকে আমার শরিক সাব্যস্ত করো مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ যার (উপাস্য হওয়া) সম্বন্ধে তোমার নিকট কোনো প্রমাণ নেই فَلَا تُطِعْهُمَا তবে তুমি তাদের কথা মানিওনা اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ তোমাদের সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে فَاُنَبِّئُكُمْ তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কৃতকর্মগুলো।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৯. আর যারা ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, আমি তাদেরকে নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করব।	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾
১০. আর কতক লোক এমনও আছে যারা বলে ফেলে, আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এনেছি, অতঃপর যখন তাদেরকে আল্লাহর পথে কোনো কষ্ট পৌছানো হয়, তখন তারা মানুষের প্রদত্ত কষ্টকে এমন (ভীষণ) মনে করে, যেমন আল্লাহ তা'আলার আজাব; আর যদি কোনো সাহায্য আপনার রবের পক্ষ হতে এসে যায় তবে তারা বলে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গে (মুসলমানই) ছিলাম। আল্লাহর কি সমস্ত বিশ্ববাসীর অন্তরের কথাসমূহ জানা নেই?	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾
১১. আর আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে জানিয়ে দিবেন এবং মুনাফেকদেরকেও জানিয়ে দিবেন।	وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾
১২. আর কাফেররা মুসলমানদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথে চল এবং তোমাদের পাপসমূহ আমাদের জিম্মায় রইল; অথচ এরা তাদের পাপগুলো হতে একটুও বহন করতে পারবে না; নিঃসন্দেহে এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَالَّذِينَ آمَنُوا আর যারা ঈমান আনবে وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং নেক কাজ করবে لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ আমি তাদেরকে নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করব।

১০. وَمِنَ النَّاسِ আর কতক লোক এমনও আছে مَن يَقُولُ যারা বলে آمَنَّا بِاللَّهِ আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এনেছি فَإِذَا أُوذِيَ অতঃপর যখন তাদেরকে কোনো কষ্ট পৌছানো হয় فِي اللَّهِ আল্লাহর পথে جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ তখন তারা মানুষের প্রদত্ত কষ্টকে এমন মনে করে كَعَذَابِ اللَّهِ যেমন আল্লাহ তা'আলার আজাব وَلَئِن جَاءَ আর যদি এসে পৌছে نَصْرٌ কোনো সাহায্য مِّن رَّبِّكَ আপনার রবের পক্ষ হতে لَيَقُولُنَّ তবে তারা বলে إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ আমরা তো তোমাদের সঙ্গে (মুসলমানই) ছিলাম أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ আল্লাহর কি জানা নেই بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ সমস্ত বিশ্ববাসীর অন্তরের কথাসমূহ।

১১. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا আর আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে জানিয়ে দিবেন وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ এবং মুনাফিকদেরকও জানিয়ে দিবেন।

১২. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا আর কাফেররা মুসলমানদেরকে বলে اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا। তোমরা আমাদের পথে চল وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ তোমাদের পাপসমূহ আমাদের জিম্মায় রইল وَمَا هُم بِحَامِلِينَ অথচ এরা বহন করতে পারবেনা مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ তাদের পাপগুলো হতে একটুও إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ নিঃসন্দেহে এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

১৩. আর তারা নিজেদের পাপ নিজেরা বহন করবে এবং নিজেদের পাপের সাথে আরো কিছু পাপ (বহন করবে), এবং এরা যেরূপ মিথ্যা কথা বানাত, কিয়ামত দিবসে সে সম্বন্ধে তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (এবং শাস্তিও দেওয়া হবে)।

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣﴾
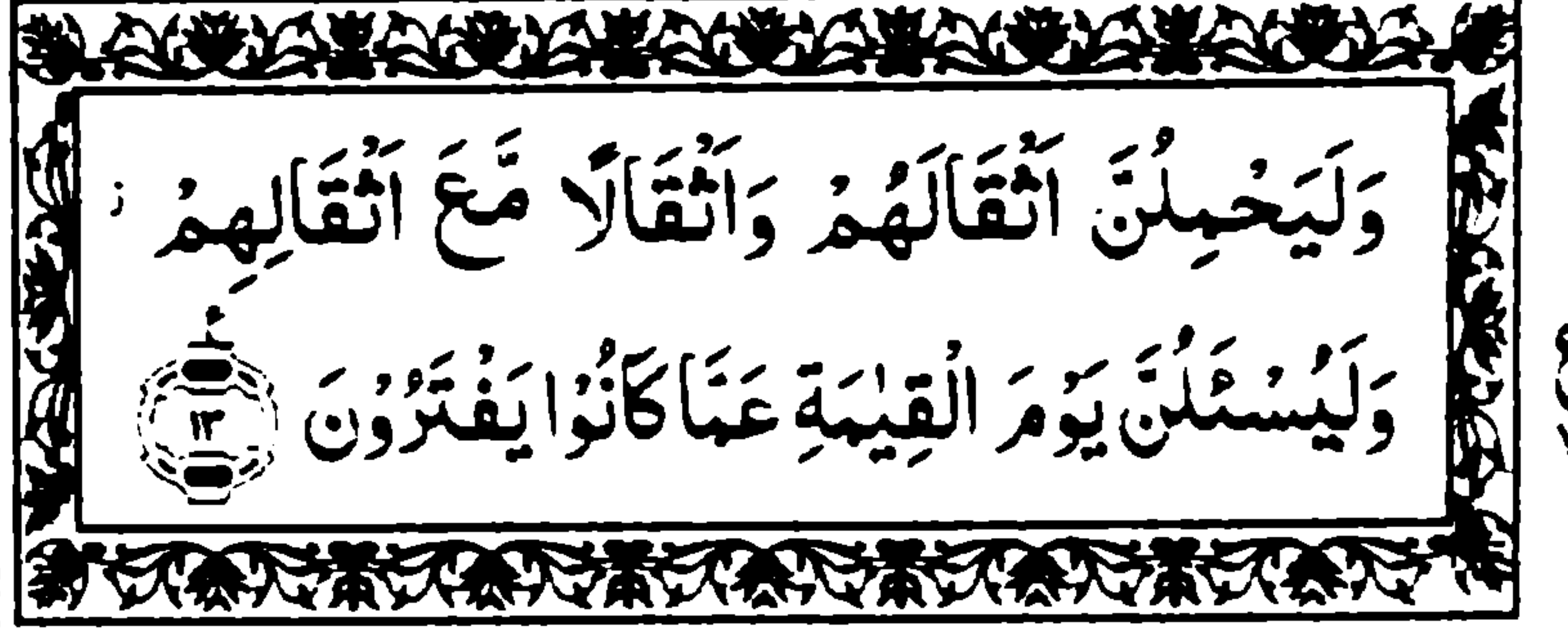
শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ আর তারা নিজেদের পাপ নিজেরা বহন করবে وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ এবং নিজদের পাপের সাথে আরো কিছু পাপ وَلَيُسْـَٔلُنَّ এবং তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ এরা যেরূপ মিথ্যা বানাত সে সম্বন্ধে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণ : এ সূরায় শিরকের বাতুলতা প্রকাশের জন্যে আল্লাহ পাক আনকাবূত তথা মাকড়সার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাই উক্ত সূরাটিকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ আয়াতে মক্কা বিজয়ের তথা মুসলমানদের বিরাট সাফল্যের সুসাংবাদ রয়েছে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, সাফল্য সহজলভ্য বস্তু নয়; তার জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম, অক্লান্ত সাধনা এবং ত্যাগ তিতিক্ষা, যা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ শুরু হয়, তাই এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া উচিত নয়; বরং ধৈর্য সহনশীলতার পরিচয় দেওয়াই একান্ত কর্তব্য। কঠোর সাধনা এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমেই ঈমান সুদৃঢ় হয়, শুধু মৌখিক লৌকিক ঈমানের দাবিদার হওয়াই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে এ দাবির সত্যতা প্রমাণিত না হয়। বিভিন্ন সময় ঈমানদারগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন, নির্যাতিত উৎপীড়িত হন, এসবকিছু ঈমানের পরীক্ষা স্বরূপ হয়। আর ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদীতা এ পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।

এতদ্ব্যতীত এ সূরায় মুমিনদের জন্যে এ মর্মে সান্ত্বনা রয়েছে যে কাফেরদের জুলুম অত্যাচারে যেন মুমিনগণ ভীত সন্ত্রস্ত না হয়। কেননা ফেরাউন বনী ইসরাঈলের উপরে যে জুলুম করেছে, তা ছিল বর্ণনাতীত; কিন্তু অবশেষে সেই জুলুমের অবসান হয়েছে এবং মজলুম বনী ইসরাঈল জাতি জালেম ফেরাউনের হাত থেকে নাজাত লাভ করেছে, ঠিক এমনিভাবে যদিও বর্তমানে মক্কার কাফেররা জুলুম করছে, কিন্তু অবশেষে মুসলমানগণ বিজয়ী হবে এবং কাফেররা পরাজিত ও ব্যর্থ হবে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, পূর্ববর্তী সূরায় ফেরাউনের ফেতনা- ফ্যাসাদের উল্লেখ ছিল, আর এসূরায় মক্কার কাফেরদের ফেতনা -ফ্যাসাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়াই উদ্দেশ্য যে, এসব সাময়িক কষ্টে কেউ যেন ভীত সন্ত্রস্ত না হয়।

যাহোক এ সূরার মূল বক্তব্য হলো মুসলমানগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে যা অবশেষে মক্কা বিজয়ের কারণ হবে। এরপর পারস্য সাম্রাজ্যের এবং রোমক সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে তোমারা লাভ করবে, সে সময় বেশি দূরে নয়, যখন পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্য তোমাদের করতলগত হবে।

এতএব, কখনো দুনিয়ার নিয়ামতে মুগ্ধ হয়ে আখেরাতের কথা ভুলে যাবে না, অহংকার করো না ; বরং নিয়ামতের জন্যে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর, আর একথা মনে রাখবে যে, দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ আখেরাতের অনন্ত অসীম নিয়ামতের তুলনায় মাকড়সার জালের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫ পৃ. ৩৫০]

الٓمّٓ ۚ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ١-٢

শানে নুযূল -১ : ইবনে আবি হাতেম শা'বীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে মক্কা মোয়াজ্জমায় কিছু সংখ্যক মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরাম মক্কাবাসী মুসলমানদের নিকট চিঠি লিখলেন, যে পর্যন্ত আপনারা হিজরত করে না আসবেন, সে পর্যন্ত আপনাদের ইসলাম পূর্ণ হবে না। এ চিঠি পাওয়া মাত্র মক্কা শরীফের মুসলমানগণ মদীনা শরীফের উদ্দেশ্য রওয়ানা হন। তখন কাফেররা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাদেরকে মক্কা শরীফ ফিরে যেতে বাধ্য করে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়– أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

অর্থাৎ "মানুষ কি মনে করে যে শুধুমাত্র 'ঈমান এনেছি' বললেই রেহাই পেয়ে যাবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?"

মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদের এ আয়াত লিখে পাঠান। তখন মক্কার মুসলমানগণ বলেন, এখন তো আমাদেরকে এখান থেকে চলেই যেতে হবে। যদি কেউ আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তবে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। তাই তারা মক্কা শরীফে থেকে মদীনা শরীফে উদ্দেশ্য বের হয়ে পড়েন। কাফেররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, পথে যুদ্ধ হয়, কয়েকজন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন, আর কিছু মুসলমান আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন এবং মদীনা শরীফ চলে যান। তাঁদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল -২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মক্কায় অবস্থানরত কতিপয় দরিদ্র ঈমানদার ছিলেন। কুরাইশ কাফের যারা ছিল, তারা তাঁদেরকে কষ্ট দিত এবং ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে তাঁদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালাত। নির্যাতনের শিকার যাঁরা ছিলেন তারা হলেন হযরত সালমা বিন হিশাম, আইয়াশ বিন আবী রবীআ, ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদ, আম্মার বিন ইয়াসির, তাঁর পিতা ইয়াসির, তাঁর মাতা সুমাইয়্যা ও আব্দাহ মাখযূমী প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। কাফেরদের নির্যাতন দুর্বিষহ ও শঙ্কাগ্রস্ত জীবন-যাপন করতে ছিলেন এবং কাফেরদের উপর ঈমানদারদের ক্ষমতা ও শক্তি-সামর্থ্য অর্জিত হওয়ার প্রত্যয় করতে ছিলেন। সে পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করার জন্যে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল -৩ : মুকাতিল বলেন, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) এর গোলাম মিহজানা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। তিনি বদর অভিযানে মুসলমানদের মাঝে সর্ব প্রথমে শহীদ হয়েছিলেন। আমের বিন হাজরামী তীর মেরে তাকে শহীদ করে। সে সময় রাসূল ﷺ বলেছিলেন, শহীদ সরদার হচ্ছে মিহজানা। এ উম্মতের মাঝে তাঁকেই সর্বপ্রথম বেহেশতের দরজায় ডাকা হবে। তখন তার স্ত্রী ও পিতা- মাতাদের অস্থিরতা বিরাজ করেছিল। সে পরিস্থিতিতে আলোচ্য আয়াত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ২৮৬ -৮৭/১৩]

শানে নুযূল -৪ : ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির দু'জন শা'বীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কায় অবস্থানরত কতকজন লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়। অতঃপর যখন জিহাদের আয়াতসমূহ নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাদের নামে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, হিজরত না করা পর্যন্ত তোমাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং তারা হিজরত করার উদ্দেশ্য বের হন। তখন কাফেররা তাদের পিছু তাড়া করে তাদেরকে কষ্ট দিতে থাকে। হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরামের প্রতি কাফের সম্প্রদায়ের নির্যাতনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অতঃপর তাদের মাঝে আবারও পত্র লিখে জানানো হলো যে, তোমাদের সম্পর্কে এধরনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তারা অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলল যে, আমরা তো বের হয়েই যাব। তবে কেউ আমাদের পিছু ধাওয়া করলে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। পরবর্তীতে তারা বের হলে মুশরিকরা তাঁদের পিছু ধাওয়া করার কারণে তাদের সাথে মোকাবিলা হয়, ফলে তাদের হতে কেউ শহীদ হলেন আবার কেউ বেঁচে গাজী হলেন। তখন তাদের সম্পর্কে আয়াত নাজিল হয় ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا –(কুরতুবী ২৮৭/১৩ দুররে মানছুর ১৪১/৫)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا .... فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٨)

শানে নুযূল –১ : আলোচ্য আয়াত হযরত সাআদ বিন ওয়াক্কাস (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে চারটি আয়াত নাজিল হয়েছে। অতঃপর দীর্ঘতম ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত সা'আদের মাতা তাকে বলে যে, আল্লাহ মায়ের সাথে সদারচণ করার কথা কি বলেন নি? আল্লাহর কসম! আমি কোনো প্রকারের খাবার খাবনা, কোনো পানীয় পান করব না এমন করে আমি মৃত্যুবরণ করব। না হয় তুমি মুহাম্মদের সাথে কুফরি করবে। তিনি বললেন,

মানুষেরা যখন তার মাকে খাওয়াবার চেষ্টা করত, তখন তাঁর মুখে তারা কাষ্ঠ খণ্ড দিয়ে মুখ খুলে আহার করাত। তখন আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল -২ : হযরত সা'আদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে তিনি বলেন, আমি আমার মাতার সহিত সদাচারণকারী পুত্র ছিলাম। পরবর্তীতে আমি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি অবশ্যই দীন পরিত্যাগ করবে, না হয় আমি খাদ্য ও পানীয় বর্জন করে মৃত্যুবরণ করব। ফলে তোমাকে একথা বলে হেয় করা হবে যে, হে মাতৃ হত্যাকারী এমনিভাবে ২/৩ দিন থেকে গেল। অবস্থা দৃষ্টে আমি আমার মাকে লক্ষ্য করে বললাম, হে আমার আম্মা! আপনার একশতটি আত্মাও যদি হতো, আর একটি একটি করে সব ক'টি আত্মা এ পথে বের হয়ে যেত, তার পরও আমি এ ধর্ম ত্যাগ করতাম না। অনন্তর আপনি খাদ্য গ্রহণ করুন আর না-ই করুন তা আপনার ইচ্ছা। অবস্থা এমন দেখে পরক্ষণে খাদ্য গ্রহণ করে অনশন ভঙ্গ করল। হযরত সা'আদ (রা.)-এর ঈমানের উপর এহেন দৃঢ়তার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল -৩ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আবূ জাহলের বৈমাত্রিক ভাই আইয়্যাশ বিন আবী রবীআ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। তার মাতাও এমন ঘটনা করেছিল।–[কুরতুবী ২৯১/১৩, বাহরে মুহীত্ব ১৩৭/৭, দুররে মানছুর ১৪১/৫, ইবনে কাছীর ৪১৯/৩, তাবারী ১২৪/১০, রূহুল মা'আনী ১৩৮/১০/২০]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ (١٠)

শানে নুযূল : -১ : মুজাহিদ বলেন যে, সে সকল মানুষেরা বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্ম প্রকাশ করত, অতঃপর তাদের উপর যখন নির্যাতন ও বিপদাপদ আসত, তখন ইসলাম থেকে তারা সরে দাঁড়াত। তাদের এহেন নড়বড়ে অবস্থা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল -২ : হযরত যাহ্হাক বলেন যে, মক্কায় এক শ্রেণির মুনাফিক ছিল। তারা ঈমান গ্রহণ করত। অতঃপর তাদের উপর যখন নির্যাতন চালানো হতো, তখন তারা তাদের নির্যাতনের ভয়ে কুফরির দিকে ফিরে যেত। তারা মানুষের নির্যাতনকে দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার আজাব তুল্য মনে করত, তাদের ভীরুতা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।–[কুরতুবী ২৯২/১৩, তাবারী ১২৪/১০]

وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ : يُفْتَنُوْنَ শব্দটি فِتْنَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা। ঈমানদার বিশেষত: পয়গম্বরগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাঁদেরই হাতে এসেছে। এসব পরীক্ষা কোনো সময় কাফের ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে, যেমন অধিকাংশ পয়গম্বর, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলি এ ধরনের ঘটনাবলি দ্বারা পরিপূর্ণ। কোনো সময় এই পরীক্ষা রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে। যেমন হযরত আইয়ূব (আ.)-এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেওয়া হয়েছে।

রেওয়ায়েতদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূল সেই সব সাহাবী, যাঁরা মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলেম, সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন।–[কুরতুবী]

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا : অর্থাৎ এসব পরীক্ষা বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা খাঁটিদের সাথে কপাট বিশ্বাসের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতিসাধিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ, অসৎ, এবং খাঁটি-অখাঁটি পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা রয়েছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব সাহেব (র.) থেকে এর আরও একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করে কুরআনে মাঝে মাঝে সেই পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাঁটি নয়. অথচ অনাদিকাল থেকেই এসব বিষয় আল্লাহ তা'আলার জানা আছে।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ -'হিতাকাঙ্ক্ষী' ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরকে কোনো কাজে করতে বলাকে وَصِيَّتْ বলা হয়।-[মাযহারী]

حُسْنًا : بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا শব্দটি ধাতু। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে حُسْن বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ : অর্থাৎ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরি যে, আল্লাহর নির্দেশাবলির অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্ত পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শিরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না; যেমন হাদীসে আছে, لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতা করে কোনো মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়।

আলোচ্য আয়াত হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবূ সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তারূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। -(মুসলিম ও তিরমিযী) এই আয়াত হযরত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল।

বগভীর রেওয়ায়েতে আছে হযরত সা'দের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিন দিন তিন রাত শপথ অনুযায়ী অনশন-ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সা'দ (রা.) উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল, কিন্তু আল্লাহর ফরমানের মোকাবিলায় তা ছিল তুচ্ছ। জননীকে সম্বোধন করে তিনি তিনি বললেন, আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা অনশন ভঙ্গ করল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : কাফেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কখনও শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনও সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমন একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, কাফেররা মুসলমানগণকে বলত, তেমরা অহেতুক পরকালের শাস্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালের শাস্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শাস্তি হবে, আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে আঁচড়ও লাগবে না।

এমনি ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজমের শেষ রুকুতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে اَفَرَاَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى এতে উল্লিখিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তিকে তার কাফের সঙ্গীরা এ বলে প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমরা কেয়ামতের দিন তোমার আজাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। সে কিছু অর্থ-কড়ি দেওয়া শুরু করেও তা বন্ধ করে দিল। তার নির্বুদ্ধিতা ও বাজে কাজ সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফেরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এর জওয়াবে বলেছেন, যারা এরূপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী وَمَا هُمْ بِحَامِلِيْنَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ আজাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন করতে সাহসী হবে না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। সূরা নজমে আরও বলা হয়েছে যে, তারা যদি কিছু পাপভার বহন করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা দেওয়া হবে না। কেননা একজনের পাপে অন্যজনকে পাকড়াও করা ন্যায়-নীতির পরিপন্থি।

দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল তাদের পাপভারও একসাথে বহন করবে।

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সে-ও পাপী, আসল পাপীর সে শাস্তি হবে, তার প্রাপ্যও তাই : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপ কাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। হযরত আবূ হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সৎকর্ম করবে, তাদের সবার কর্মের ছওয়াব দাওয়াতদাতার আমলনামায়ও লেখা হবে এবং সৎকর্মীদের ছওয়াব মোটেই হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা ও পাপ কাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপ কাজে লিপ্ত হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং আসল পাপীদের পাপ মোটেই হ্রাস করা হবে না। [কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَنْ يُّتْرَكُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার تَرْكٌ মূলবর্ণ (ت ـ ر ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– তারা অব্যাহতি পাবে।

لَايُفْتَنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنَةٌ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না।

اَجَلٌ : একবচন, বহুবচন اٰجَالٌ অর্থ– নির্দিষ্ট সময়।

لَاٰتٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– অবশ্যই সমাগত হবে।

لَنَجْزِيَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি তাদেরকে বিনিময় প্রদান করব।

فَلَا تُطِعْهُمَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তবে তুমি তাদের কথা মানিও না।

اُوْذِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْذَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ذ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– তাদেরকে কোনো কষ্ট পৌঁছানো হয়।

اِتَّبِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّبَاعٌ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা চল, তোমরা অনুসরণ করো।

لَيَحْمِلُنَّ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة درفعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার حَمْلٌ মূলবর্ণ (ح ـ م ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা নিজেরা বহন করবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ : এখানে واو টি আতেফা আর اَلَّذِيْنَ মুবতাদা আর اٰمَنُوْا বাক্যটি সেলাহ। আর وَعَمِلُوْا বাক্যটি اٰمَنُوْا-এর উপর আতফ হয়েছে। لَنُكَفِّرَنَّ-এর لام টি কসমের জন্য نُكَفِّرَنَّ ফে'ল, এবং তার উহ্য যমীর نَحْنُ হলো ফায়েল আর পূর্ণ বাক্যটি اَلَّذِيْنَ মুবতাদার খবর হয়েছে। আর عَنْهُمْ টা نُكَفِّرُ-এর সাথে متعلق হয়েছে আর سَيِّاٰتِهِمْ হলো মাফউলে বিহী। [ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড: পৃ. ৬৭১]

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১৪. আর আমি নূহকে (রাসূলরূপে) তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করলাম, অনন্তর তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর কম সহস্র বৎসর অবস্থান করলেন, অতঃপর প্লাবন এসে তাদেরকে পাকড়াও করল, আর তারা বড়ই সীমালঙ্ঘনকারী ছিল।	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾
১৫. অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকার আরোহীদেরকে রক্ষা করলাম এবং আমি এ ঘটনাটিকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ করে দিলাম।	فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾
১৬. আর আমি ইবরাহীমকে পাঠালাম, যখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর; এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ।	وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾
১৭. তোমরা কেবল মূর্তিসমূহের পূঁজা করছ আল্লাহকে ছেড়ে এবং মিথ্যা কথা রচনা করছ (যে, তারা তোমাদের জীবিকা প্রদান করে থাকে) ; তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে পূঁজা করছ তারা তোমাদেরকে রিজিক দেওয়ার কোনো ক্ষমতা রাখে না, অতএব, তোমরা আল্লাহর নিকট হতে রিজিক অন্বেষণ কর (তিনিই রিজিকের মালিক) এবং তাঁরই ইবাদত কর, আর তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; (এবং) তোমাদের সকলকে তাঁরই সমীপে ফিরে যেতে হবে।	إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ আর আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করলাম فَلَبِثَ فِيهِمْ অনন্তর তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করলেন أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا পঞ্চাশ বৎসর কম সহস্র বৎসর فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ অতঃপর প্লাবন এসে তাদেরকে পাকড়াও করল وَهُمْ ظَالِمُونَ আর তারা বড়ই সীমালঙ্ঘনকারী ছিল।

১৫. فَأَنجَيْنَاهُ অতঃপর আমি রক্ষা করলাম তাঁকে وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ এ নৌকার আরোহীদেরকে وَجَعَلْنَاهَا এবং আমি এই ঘটনাটিকে করে দিলাম آيَةً উপদেশ গ্রহণের উপকরণ لِّلْعَالَمِينَ সারা বিশ্ববাসীর জন্য।

১৬. وَإِبْرَاهِيمَ আর আমি ইবরাহীমকে পাঠালাম إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ যখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন اعْبُدُوا اللَّهَ তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর وَاتَّقُوهُ এবং তাঁকে ভয় কর ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এটাই তোমাদের জন্য উত্তম إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ যদি তোমরা বুঝ।

১৭. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ তোমরা কেবল পূঁজা করছ مِن دُونِ اللَّهِ আল্লাহকে ছেড়ে أَوْثَانًا মূর্তিসমূহের وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا এবং মিথ্যা কথা রচনা করছ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে পূঁজা করছ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا তারা তোমাদের রিজিক দেওয়ার কোনো ক্ষমতা রাখে না فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ অতএব, তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে রিজিক অন্বেষণ করো وَاعْبُدُوهُ এবং তাঁরই ইবাদত করো وَاشْكُرُوا لَهُ এবং তাঁরই শোকর করো إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ তোমাদের সকলকে তাঁরই সমীপে ফিরে যেতে হবে।

১৮. আর যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর, তবে (আমার কোনো ক্ষতি নেই,) তোমাদের পূর্বেও বহু সম্প্রদায় (তাদের নবীগণকে) অবিশ্বাস করেছিল; আর নবীর দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌছে দেওয়া।	وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٨﴾
১৯. তাদের কি এটা জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা কি প্রকারে সৃষ্টিকে প্রথমবারে সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন; এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে খুবই সহজ।	اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١٩﴾
২০. আপনি বলুন, তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং দেখ, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজগতকে কি প্রকারে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আবার আল্লাহ তা'আলা শেষবারেও পয়দা করবেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।	قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾
২১. তিনি যাকে ইচ্ছা আজাব দেবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করবেন, আর তোমরা সকলে তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে।	يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿٢١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَاِنْ تُكَذِّبُوْا আর যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ তবে তোমাদের পূর্বেও বহুসম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ আর নবীর দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেওয়া।

১৯. اَوَلَمْ يَرَوْا তাদের কি এটা জানা নেই যে, كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ আল্লাহ তা'আলা কি প্রকারে সৃষ্টিকে প্রথমবারে সৃষ্টি করেন ثُمَّ يُعِيْدُهٗ আবার তিনিই তাঁকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে খুবই সহজ।

২০. قُلْ আপনি বলুন سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর فَانْظُرُوْا এবং দেখ كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজগতকে কি প্রকারে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ আবার আল্লাহ তা'আলা শেষবারেও পয়দা করবেন اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

২১. يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ তিনি যাকে ইচ্ছা আজাব দিবেন وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করবেন وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ আর তোমরা সকলে তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী ও তাঁদের কিছু উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থিদের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কোনো সময় সাহস হারাননি। তাই আপনিও কাফেরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন না এবং রেসালতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গম্বর, যিনি কুফর ও শিরকের মোকাবিলা করেছেন। দ্বিতীয়ত তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোনো পয়গম্বর ততটুকু হননি। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন, এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাফেরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কুরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয় শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তাঁর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স; এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তাঁর আরো বয়স রয়েছে।

মোটকথা এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতি ক্ষেত্রেই কাফেরদের পক্ষ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা সত্ত্বেও কোনো সময় সাহস না হারানো- এগুলো সব হযরত নূহ (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় কাহিনীটিতে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরুদের অগ্নি অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে এক তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, স্বীয় আদরের দুলালকে জবাই করার ঘটনা ইত্যাদি। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত লূত (আ.)ও তাঁর উম্মতের ঘটনাবলি এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা আলোচিত হয়েছে। এগুলো সব রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উম্মতে মুহাম্মদীর সান্ত্বনার জন্য এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্য বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর জাতিকে যুক্তির ভাষায় তাওহীদের কথা বলেছিলেন। এ পর্যায়ে পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে "আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেন, আর যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করেন। আর তোমাদের সকলকে অবশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে যেতে হবে।"

এ পর্যায়ে কোনো দুরাত্মা কাফের, মুরতাদ যদি এ ভ্রান্ত ধারণা করে যে, আমি আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হবো না, আমার অন্যান্য ইচ্ছা যেমন কার্যকর হয়, তেমনি এ ইচ্ছা কার্যকর হবে। এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পেই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে- وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ আর তোমরা জমিনে ও আসমানে কোথাও আল্লাহ পাকের শাস্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে, যদি কেউ আল্লাহ পাকের আজাব থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, তবে তার দু'টি পন্থা হতে পারে। যথা-১. পালায়ন করার মাধ্যমে ২. হাজির থেকে আজাব মোকাবিলা করার মাধ্যমে। একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, পৃথিবীতে এমন কোনো সৃষ্টি নেই যে, আল্লাহ পাকের আজাবের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারে, অতএব এ পন্থা কল্পনাও করা যায় না। আর পলায়ন পৃথিবীতে কোথায় করবে? পৃথিবীর এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে পলায়ন করে থাকা যায়। তাই ইরশাদ হয়েছে- فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ জমিনের উপর কোনো স্থান নেই, যেখানে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়, এমনকি সমুদ্রের অতল তলেও যদি কেউ আত্মগোপন করে সেখানেও আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে- وَلَا فِى السَّمَآءِ অর্থাৎ জমিনে আত্মগোপনের স্থান না থাকার কারণে কেউ [রকেটে আরোহণ করে] আসমানে তথা মহাশূন্যে পলায়নের চেষ্টা করে তবে তা-ও সম্ভব হবে না। কেননা আসমান জমিনের কোনো স্থানই আল্লাহ পাকের গোপন নেই। অতএব কোনো অপরাধীই আল্লাহ পাকের আজাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَلَبِثَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার لَبْثٌ মূলবর্ণ (ل - ب - ث) জিনস صحيح অর্থ– অনন্তর তিনি অবস্থান করলেন।

سِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَيْرٌ মূলবর্ণ (س - ي - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা ভ্রমণ করো।

بَدَأَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার بَدْءٌ মূলবর্ণ (ب - د - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তিনি প্রথমবারে সৃষ্টি করেন।

يُنْشِئُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْشَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ش - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তিনি পয়দা করবেন।

يُعَذِّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْذِيْبٌ মূলবর্ণ (ع - ذ - ب) জিনস صحيح অর্থ– তিনি আজাব দিবেন।

تُقْلَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার قَلْبٌ মূলবর্ণ (ق - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সকলে প্রত্যাবর্তিত হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ : এখানে سِيْرُوْا হলো ফে'লে আমর তার যমীর হলো ফায়েল, আর فِى الْاَرْضِ হলো سِيْرُوْا-এর সাথে متعلق আর فَانْظُرُوْا টা سِيْرُوْا-এর উপর আতফ হয়েছে। আর كَيْفَ হলো حال আর بَدَأَ ফে'ল তার উহ্য যমীর هو হলো ফায়েল আর الْخَلْقَ হলো مفعول به এবং বাক্যটি নসবের স্থলে হয়ে মাফউল হয়েছে اُنْظُرُوْا ফে'লের। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড; পৃ. ৬৮৩]

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۡ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٢٢﴾	২২. এবং তোমরা আল্লাহকে আসমান ও জমিনে (কোনো স্থানেই) পরাভূত করতে পারবে না। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই।
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾	২৩. আর যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহে এবং (বিশেষ করে) তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে অবিশ্বাসী, তারা (কিয়ামত দিবসে) আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হবে এবং এরাই তারা– যাদের জন্য যন্ত্রণাময় আজাব রয়েছে।
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾	২৪. অতঃপর তাঁর সম্প্রদায়ের উত্তর কেবলমাত্র এই ছিল যে, তারা বলতে লাগল, হয় তাকে হত্যা করে ফেল অথবা তাকে পুড়িয়ে ফেল, (সেমতে তাঁকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করল) তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সেই অগ্নি হতে রক্ষা করলেন; নিঃসন্দেহে এ ঘটনার মধ্যে মুমিনদের জন্য কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে।
وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۡ	২৫. আর ইবরাহীম বললেন, তোমরা যে আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে মূর্তিসমূহকে (উপাস্য) সাব্যস্ত করেছ, এটা কেবল পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে, অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অন্যের প্রতি অভিসম্পাত করবে

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ আর না আসমানে وَلَا فِى السَّمَآءِ এবং না তোমরা পরাভূত করতে পারবে فِى الْاَرْضِ জমিনেও وَمَا لَكُمْ এবং তোমাদের না আছে مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত مِنْ وَّلِيٍّ কোনো অভিভাবক وَّلَا نَصِيْرٍ কোনো সাহায্যকারী।

২৩. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা অবিশ্বাসী بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহে وَلِقَآئِهٖ এবং তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ তারা আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হবে وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ এবং এরাই তারা যাদের জন্য যন্ত্রণাময় আজাব রয়েছে।

২৪. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ অতঃপর তাঁর সম্প্রদায়ের উত্তর কেবলমাত্র এই ছিল যে, اَنْ قَالُوا তারা বলতে লাগল اقْتُلُوْهُ হয় তাকে হত্যা করে ফেল اَوْ حَرِّقُوْهُ অথবা তাকে পুড়িয়ে ফেল فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সেই অগ্নি হতে রক্ষা করলেন اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ নিঃসন্দেহে এই ঘটনার মধ্যে কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে।

২৫. وَقَالَ ইবরাহীম বললেন اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ তোমরা যে সাব্যস্ত করেছ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলা ছেড়ে اَوْثَانًا মূর্তিসমূহকে مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ এটা কেবল তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কে কারণে فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ অতঃপর কিয়ামত দিবসে يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا এবং একে অন্যের প্রতি অভিসম্পাত করবে।

وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾	** এবং তোমাদের বাসস্থান হবে দোজখ, আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না,
فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾	২৬. অতঃপর কেবল লূত তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন এবং ইবরাহীম বললেন, আমি স্বদেশ ত্যাগ করে নিজ প্রতিপালকের (নির্দেশিত স্থানের) দিকে চলে যাব (তোমাদের দলে থাকব না); নিশ্চয় তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় ।
وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾	২৭. আর (হিজরতের পরে) আমি ইবরাহীমকে (পুত্র) ইসহাক ও (পৌত্র) ইয়াকূব দান করলাম এবং তাঁর বংশে নবুয়ত এবং কিতাব (ধারাবাহিকভাবে) স্থির করলাম, আর আমি দুনিয়াতে তাঁকে তাঁর পুরস্কার প্রদান করলাম এবং আখেরাতেও তিনি (উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন) নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন ।
وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ؗ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾	২৮. আর আমি লূতকে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করলাম, যখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা এমন অশ্লীলতার কাজ করছ যে, তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের কেউ তা করেনি ।

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ এবং তোমাদের বাসস্থান হবে দোজখ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ আর তোমাদেরকে কোনো সাহায্যকারী থাকবে না ।

২৬. فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ অতঃপর কেবল লূত তার প্রতি ঈমান আনলেন وَقَالَ ইবরাহীম বললেন اِنِّيْ مُهَاجِرٌ আমি স্বদেশ ত্যাগ করে চলে যাব اِلٰى رَبِّيْ আমার নিজ প্রতিপালকের –[নির্দেশিত স্থানের] দিকে اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ নিশ্চয় তিনি পরাক্রান্ত الْحَكِيْمُ প্রজ্ঞাময় ।

২৭. وَوَهَبْنَا لَهٗ আর আমি ইবরাহীমকে দান করলাম اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ (পুত্র) ইসহাক ও (পৌত্র) ইয়াকূব وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهٖ এবং তাঁর বংশে স্থির করলাম النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ নবুয়ত এবং কিতাব وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا আর দুনিয়াতে তাঁকে পুরস্কার প্রদান করলাম وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ এবং আখেরাতেরও তিনি হবেন لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ।

২৮. وَلُوْطًا আর আমি লূতকে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করলাম اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ যখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ তোমরা এমন অশ্লীলতার কাজ করছ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের কেউই তা করেনি ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুটি বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। যথা ১. তাওহীদ ২.আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগী। এরপর কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ হয়েছে। "এ পৃথিবীতে কেউ আল্লাহ পাকের হাত থেকে রেহাই পাবে না এবং কাফেরদের জন্যে কঠিন আজাব।" ইরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অর্থাৎ আর যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ তাওহীদকে অমান্য করে এবং তাঁর মোলাকাতের কথাও অবিশ্বাস করে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনও বিশ্বাস করে না, তারাই সেসব লোক যারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে। তাফসীরকারকগণ বলেছেন, প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে তাঁর স্রষ্টার প্রমাণ, তথা সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার নিদর্শন। অতএব, যে তাঁর সাথে শিরক করে সে আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে। আরসে হাশরের দিনকে অস্বীকার করে, সে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়, এমন লোকদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আয়াতের মর্মকথা : যারা আল্লাহ পাকের কথা মানে না, তাঁর, একত্ববাদে বিশ্বাস করে না, এ জীবন নিয়েই ব্যস্ত মুগ্ধ থাকে আখেরাতের ব্যাপারে চিন্তা করে না একদিন আল্লাহ পাকের দরবারে অবশ্যই হাজির হতে হবে- একথাও বিশ্বাস করে না, তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশাও করে না। তারা নিশ্চয় পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, এটি স্বাভাবিক, আর এ কথারই ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

কোনো কোনো তাফসীকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'রহমত' অর্থ- জান্নাত। অর্থাৎ তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা কাফের, মুশরিক ও মুরতাদরা জান্নাতে বিশ্বাস করে না, কিয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করে, তাই তারা আখেরাতে আল্লাহ পাকের রহমত তথা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। যাদের এ অবস্থা তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন শাস্তি।

পক্ষান্তরে, মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতের প্রতি তথা আল্লাহ তা'আলার সাথে মোলাকাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যেও নেক আমলও করে, তাই তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশাও করে।

আল্লাহর রহমত অনন্ত অসীম : তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের রহমত এবং গজব উভয়টিরই ঘোষণা রয়েছে। তবে রহমতকে আল্লাহ পাক তাঁর সাথে সম্পর্কিত করে ঘোষণা করেছেন- رَّحْمَتِيْ অর্থাৎ আমার রহমত। পক্ষান্তরে আজাবের ঘোষণায় বলেছেন– لَهُمْ عَذَابٌ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে আজাব। এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর আজাবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। কেননা তাঁর রহমত অনন্ত অসীম।

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ.২০ , পৃ. ১৪৯]

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দরদভরা উপদেশ ছিল, যা তিনি তাঁর জাতির উদ্দেশ্য পেশ করছিলেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জাতি তাঁর কথায় আদৌ কর্ণপাত করে নি; বরং তাঁর যুক্তিপূর্ণ এবং সারগর্ভ বক্তব্য শ্রবণ করে তারা অধিকতর উগ্র হয়ে উঠে, তারা তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে পড়ে। তারা বলে, আমাদের একই দাবি- হয়তো ইবরাহীমকে হত্যা কর, না হয় পুড়িয়ে ফেল।

বস্তুত যারা যুক্তিতর্কে পরাজিত হয়, সত্যের মুখোমুখি হতে যারা অপারগ হয়, সর্বদা এমন জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে, যা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি করেছিল।

قَوْلُهٗ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ : অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি সিদ্ধান্ত করল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পুড়িয়ে ফেলবে, এক জাতীয় অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তাঁকে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে রক্ষা করলেন, তিনি অগ্নিকে নির্দেশ প্রদান করলেন يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ অর্থাৎ হে অগ্নি শীতল হও এবং ইবরাহীমের প্রতি শান্তিদায়ক হও।

قَوْلُهٗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ : অর্থাৎ নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে। বস্তুত আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাগণের হেফাজত করেন, তার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ ঐতিহাসিক ঘটনায়।

দ্বিতীয়ত বস্তু মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া রয়েছে যেমন অগ্নি পুড়িয়ে ফেলে, পানি ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু পৃথিবীর বস্তুর সকল প্রতিক্রিয়া আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, আর এজন্যেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নমরুদের তৈরি করা অগ্নিকুণ্ড পুড়তে পারেনি। কেননা অগ্নি আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, তাঁর অনুগত। এতে একথা প্রমাণিত হয়, যাকে আল্লাহ পাক রক্ষা করেন, কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারে না, আর যাকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেন, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন নিরাপদে অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পুনরায় উপদেশ দিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর উপদেশেরই বিবরণই আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا-

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যে তোমাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলো পূজা করছো এবং তাদের সম্মুখে মাথানত করছো, কোনো সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী এমন অন্যায় কাজ সমর্থন করতে পারে না। কেননা এটি যে নিতান্তই অযৌক্তিক ও অসুন্দর কাজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা শুধু সামাজিক বন্ধন অটুট রাখার লক্ষ্যেই মূর্তিপূজার মতো কাজকে ধর্ম বলে গ্রহণ করছো। এর পেছনে কোনো যুক্তি যে নেই, একথা তোমরাও স্বীকার কর, শুধু প্রথা এবং পরস্পরের সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনেই তোমরা মূর্তিপূজা করছো। অথচ কিয়ামতের দিন তোমরাই একে অন্যকে অস্বীকার করবে, শুধু তাই নয় ; বরং কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে লা'নত দিবে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, ভক্তি, অনুরক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোসাবার অপব্যবহারই মূর্তিপূজা তথা পৌত্তলিকতার মূলভিত্তি। সাধারণত দেখা যায় কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে ভক্তরা তার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তার ছবি সংরক্ষণ করে এবং কিছুদিন তার প্রতি অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনকল্পে ঐ ছবিটির পূজা শুরু করে দেয়। বলাবাহুল্য, এভাবেই মূর্তি পূজার এ প্রথা শুরু হয়। এর পিছনে কোনো যুক্তি নেই ; বরং এর দ্বারা একটি প্রচলিত প্রথা অব্যাহত রাখা হয়। শুধুমাত্র পরস্পরের সম্পর্ক অটুট রাখার জন্যে, সামাজিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনে তোমরা মূর্তি পূজা করছো।

এরপর তাদের পরিণতি সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন- وَمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّصِرِيْنَ " আর তোমাদের সকলের ঠিকানা হবে দোজখ" অর্থাৎ মূর্তি এবং তার পূজারী সকলেরই ঠিকানা দোজখ। "আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না" যারা তোমাদেরকে দোজখের কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে। অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্ক ঘনিষ্টতর রাখার উদ্দেশ্যে, পরস্পরের ভালোবাসা অটুট রাখার প্রয়োজনে তোমরা যে মূর্তিপূজা করো মনে রেখো যে, তোমাদের এ বন্ধুত্বের সম্পর্ক অবশেষে টিকে থাকবে না, এটা শুধু দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পর্যন্তই। এরপর এ সম্পর্কের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষত কিয়ামতের কঠিন দিনে পরস্পরের এ প্রীতির সম্পর্ক শত্রুতায় পর্যবসিত হবে, তখন তোমরা একে অন্যকে লা'নত দিতে থাকবে। এজন্যে ইরশাদ হয়েছে-

يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে তারা একে অন্যের বিরোধিতা করবে একে অন্যকে লা'নত দিবে।

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাগ্নেয়। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে ইবরাহীম (আ.)-এর মু'জিযা দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি এবং পত্নী সারা, যিনি তাঁর চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গী হন। কূফার একটি জনপদ কাওসা ছিল তাঁদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ অর্থাৎ আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোনো জায়গায় যাব, যেখানে পালনকর্তার ইবাদতে কোনো বাধা নেই।

হযরত নাখয়ী ও কাতাদাহ (র.) বলেন, اِنِّىْ مُهَاجِرٌ বাক্যটি হযরত ইবরাহীমের উক্তি। কেননা এর পরবর্তী বাক্য وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ তো নিশ্চিতরূপে তাঁরই অবস্থা। কোনো কোনো তাফসীরকার اِنِّىْ مُهَاجِرٌ কে হযরত লূত (আ.)-এর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন ; কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তাফসীরই উপযুক্ত। হযরত লূত (আ.)-ও এই হিজরতে শরিক ছিলেন; কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হযরত লূত (আ.)-এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত : হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথম পয়গম্বর, যাঁকে দীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন। –(কুরতুবী)

কোনো কোনো কর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও পাওয়া যায় : وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا অর্থাৎ আমি ইবরাহীম (আ.)-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদি, খ্রিস্টান, প্রতিমাপূজারী সবাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদিগকে তাঁর অনুসৃত বলে স্বীকার করে। পরকালে তিনি সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে; কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেওয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎ কর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে। –(মা'আরিফুল কুরআন, খ. ৬, পৃ. ৭৫৯-৬০)

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ : এখানে লূত (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম, পুংমৈথুন, দ্বিতীয়, রাহাজানি এবং তৃতীয়, মজলিসে সবার সামনে প্রকাশ্যে অপকর্ম করা। কুরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোনো গুনাহ্ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গুনাহ্। কোনো কোনো তাফসীরকারক এ স্থলে সেসব গুনাহ্ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জেরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণত পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেওয়া। হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর এক হাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্য মজলিসে সবার সামনে করত। (নাউজুবিল্লাহ)

আয়াতে উল্লিখিত প্রথম গুনাহ্টিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে ব্যভিচারের চাইতেও গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

بِمُعْجِزِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْجَازٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ز) জিনস صحيح
অর্থ– তোমরা পরাভূত করতে পারবে।

يَئِسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার يَئِسٌ মূলবর্ণ (ى - ء - س) জিনস মুরাক্কাব (مهموز عين এবং مثال يائى) অর্থ– তারা নিরাশ হবে।

حَرِّقُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَحْرِيْقٌ মূলবর্ণ (ح - ر - ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাকে পুড়িয়ে ফেল।

فَاَنْجٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْجَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তখন তিনি তাকে রক্ষা করলেন।

يَلْعَنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার لَعْنٌ মূলবর্ণ (ل - ع - ن) জিনস صحيح অর্থ– অভিসম্পাত করবে।

مُهَاجِرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُهَاجَرَةٌ মূলবর্ণ (ه - ج - ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি স্বদেশ ত্যাগ করে চলে যাব।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا : এখানে ثُمَّ হরফে আতফ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ টা ظرف متعلق يَكْفُرُ-এর সাথে হয়েছে। يَكْفُرُ ফে'ল আর بَعْضُكُمْ হলো ফায়েল। আর بِبَعْضٍ হলো يَكْفُرُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। আর يَلْعَنُ ফে'ল بَعْضُكُمْ ফায়েল এবং بَعْضًا হলো মাফউলে বিহী।

[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড; পৃ. ৫৮৭]

২৯. তোমরা কি পুরুষদের সাথে (অপ-) কর্ম কর এবং (তদ্ব্যতীত) তোমরা ডাকাতিও কর? আর তোমরা তোমাদের ভরপুর মজলিসে অশ্লীল কাজ কর; তখন তাঁর সম্প্রদায়ের (শেষ) উত্তর এই ছিল যে, আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আজাব আনয়ন কর, যদি তুমি (এ কথায়) সত্যবাদী হও (যে, আমাদের এ কাজ আজাবের কারণ)।	أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۙ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾
৩০. লূত প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন।	قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾
৩১. আর আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ যখন ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছল, তখন ঐ ফেরেশতাগণ বলল, আমরা এই (লূত-সম্প্রদায়ের) জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করব, তথাকার অধিবাসীরা বড় জালেম।	وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾
৩২. ইবরাহীম বললেন, তথায় (সেই জনপদে) তো লূত (-ও) রয়েছেন; ফেরেশতাগণ বললেন, সে যে সেখানে আছে আমাদের সব জানা আছে। আমরা তাঁকে এবং তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত, কেননা সে পশ্চাতে অবস্থানকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ তোমরা কি পুরুষদের সাথে (অপ-) কর্ম কর وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ এবং তোমরা ডাকাতিও কর وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ আর তোমরা তোমাদের ভরপুর মজলিসে অশ্লীল কাজ কর فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا তখন তাঁর সম্প্রদায়ের (শেষ) উত্তর এই ছিল যে, ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আজাব আনয়ন কর إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৩০. قَالَ লূত প্রার্থনা করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! انْصُرْنِي আমাকে সাহায্য করুন عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

৩১. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا আর আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ যখন পৌঁছল إِبْرَاهِيمَ ইবরাহীমের নিকট بِالْبُشْرَىٰ সুসংবাদ নিয়ে قَالُوا তখন ঐ ফেরেশতাগণ বলল إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ আমরা এই জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করব إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ তথাকার অধিবাসীরা বড় জালেম।

৩২. قَالَ ইবরাহীম বললেন إِنَّ فِيهَا لُوطًا তথায় তো লূত রয়েছেন। قَالُوا ফেরেশতাগণ বললেন نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا সে যে সেখানে আছে আমাদের সব জানা আছে لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ আমরা তাঁকে এবং তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করব إِلَّا امْرَأَتَهُ তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ কেননা সে পশ্চাতে অবস্থানকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَلَمَّآ أَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِينَ ﴿٣٣﴾

৩৩. এবং যখন আমার সে প্রেরিতগণ লূতের নিকট পৌঁছল, তখন লূত তাদের কারণে চিন্তিত হলেন এবং তাদের নিমিত্ত তাঁর মন সঙ্কুচিত হলো এবং ফেরেশতাগণ বলল, আপনি ভয় করবেন না এবং চিন্তিতও হবেন না। আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব আপনার স্ত্রীকে ব্যতীত, কেননা সে আজাবে নিপতিতদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلٰٓى أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমরা এ জনপদের অধিবাসীদের উপর তাদের অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ এক আসমানি আজাব অবতীর্ণ করব।

وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. এবং আমি উক্ত জনপদের কিছু বাহ্যিক নিদর্শন রেখে দিয়েছি ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।

وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর মাদইয়ানের অধিবাসীদের নিকট আমি তাদের ভ্রাতা শোআয়বকে রাসূলরূপে প্রেরণ করলাম, তখন তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর এবং কিয়ামত দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا এবং যখন আমার সেই প্রেরিতগণ লূতের নিকট পৌঁছল سِيْٓءَ بِهِمْ তখন লূত তাদের কারণে চিন্তিত হলেন وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, এবং তাদের নিমিত্ত তাঁর মন সঙ্কুচিত হলো وَقَالُوا এবং ফেরেশতাগণ বলল لَا تَخَفْ আপনি ভয় করবেন না وَلَا تَحْزَنْ, এবং চিন্তিতও হবেন না اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব اِلَّا امْرَاَتَكَ আপনার স্ত্রীকে ব্যতীত كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ কেননা সে আজাবে নিপতিতদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩৪. اِنَّا مُنْزِلُوْنَ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ আমরা অবতীর্ণ করব عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ এ জনপদের অধিবাসীদের উপর এক আসমানি আজাব بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ তাদের অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ।

৩৫. وَلَقَدْ تَّرَكْنَا আর আমি রেখে দিয়েছি مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً উক্ত জনপদের কিছু বাহ্যিক নিদর্শন لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।

৩৬. وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا আর মাদইয়ানের অধিবাসীদের নিকট আমি তাদের ভ্রাতা শো'আয়বকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম فَقَالَ তখন তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়। اعْبُدُوا اللّٰهَ আল্লাহর ইবাদত কর وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ এবং কিয়ামত দিবসকে ভয় কর وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ, এবং পৃথীবিতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ : আলোচ্য আয়াতে اَلْمُفْسِدِيْنَ শব্দটির অর্থ হলো অশান্তি সৃষ্টিকারী। এশব্দটি দ্বারা এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তরা আল্লাহ পাকের আজাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং তাদের উপর অতি শীঘ্র আজাব হওয়া একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা সামূদ' নামক শহরের অধিবাসীরা অবৈধ পন্থায় পুরুষের যৌন সম্ভোগের যে জঘন্য পন্থা অবলম্বন করেছে, তা ইতঃপূর্বে আর কেউ করেননি। দ্বিতীয়ত হযরত লূত (আ) যখন তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাবের কথা বলেছেন, তখন তারা বিদ্রূপ করে বলেছে, "আজাব এখনই নিয়ে এসো। তাই তাদের প্রতি আজাব ত্বরান্বিত করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হয়েছে।[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ২০ পৃ. ১৫৪, তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৭১]

وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ : আল্লাহ পাকের প্রেরিত ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সাথে কথা বলার পর প্রিয়দর্শন আকর্ষণীয় চেহারা বিশিষ্ট নওজোয়ানের আকৃতি ধারণ করে হযরত লূত (আ.)-এর নিকট হাজির হয়। হযরত লূত (আ.) প্রথমে তাদেরকে চিনতে পারেননি, তাই তাদেরকে দেখে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। কেননা যদি সমাগত মেহমানদেরকে তাঁর নিকট অবস্থান করতে দেন, তবে কাফেররা খবর পেয়ে হাজির হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কষ্ট দিবে, আর যদি তাদেরকে তাঁর নিকট অবস্থান করতে না দেন তবুও কাফেররা তাদের পেছনে পড়বে এবং তাদের চরম কষ্টের কারণ হবে। কেননা তাঁর জাতির ঘৃণ্য আচরণ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। হযরত লূত (আ.)-এর এ ব্যাকুলতা দেখে ফেরেশতাগণ তাঁকে নিশ্চিন্ত করে বললেন- لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ অর্থাৎ "আপনি চিন্তা করবেন না, চিন্তিতও হবেন না, নিশ্চয় আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো, তবে আপনার স্ত্রী রক্ষা পাবে না, কেননা সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী যদিও মন্দ কাজে অংশীদার ছিল না, কিন্তু অন্যায়কারীদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল, আর সে তাদের প্রতি রাজি ছিল, তাই সে কোপগ্রস্ত লোকদের সাথেই থাকবে।

যাহোক, ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ.) -কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমাদের ব্যাপারে চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা আমরা মানুষ নই, ফেরেশতা।

اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ : অর্থাৎ আমরা এ জনপদবাসীর প্রতি আসমান থেকে বিশেষ আজাব অবতরণের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। অতএব, আমাদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা করার কোনো কারণ নেই যে, কাফেররা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে। কেননা তাদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি দেওয়ার জন্যে তথা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যেই আমরা হাজির হয়েছি।

তাফসীরকার মোকাতেল (র) বলেছেন رِجْزً -এর অর্থ হলো জমিনে ধসিয়ে দেওয়া, জমিনকে উল্টিয়ে দেওয়া, আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করা প্রভৃতি। এরপর হযরত জিবরাঈল (আ.) 'সামূদ' নামক জনপদটিকে পৃথিবী থেকে উপরে তুলে আসমান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং সেখানে থেকে উল্টিয়ে ফেলে দিলেন। আল্লাহ পাক এভাবে দুরাত্মা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিলেন। তারা চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হলো আর তাদের প্রতি পাথরও বর্ষণ করা হয়েছিল। যে আজাবকে তারা অনেক দূরে মনে করতো তা তাদের প্রতি আপতিত হলো।

وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ : বস্তুত যারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ পাকের নাফরমানিতে সীমালঙ্ঘন করে, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানকে উপেক্ষা করে, তাদের পরিণাম এভাবেই শোচনীয় হয়। এ পৃথিবীতে যারা বুদ্ধিমান, পরিণামদর্শী, বাস্তবাদী এবং কল্যাণকামী তারা এমনি ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আগত ভবিষ্যতের বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এ ঘটনাটি হয়েছে, অত্যন্ত বড় শিক্ষণীয় বিষয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো লূত সম্প্রদায়ের সেই বিরাট জনপদটি বিশ্ববাসীর জন্যে হয়েছে শিক্ষণীয়, আর আলোচ্য আয়াতে এগুলোকেই اٰيَةًۢ بَيِّنَةً তথা ' সুস্পষ্ট নিদর্শন' বলা হয়েছে।

তাফসীরকার হযরত কাতাদা (র) বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন বলতে সেই পাথরগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা আকাশ থেকে তাদের প্রতি বর্ষণ করা হয়েছিল। আল্লাহ পাক এ পাথরগুলোকে অনেকদিন রেখে দিয়েছিলেন, উম্মতে মুহাম্মদীর প্রথম যুগে অনেক লোকই সেগুলোকে দেখেছিলেন।

তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন বলে জমিনের অভ্যন্তরে থেকে যে কালো রং এর পানি বের হয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, দুরাত্মা কাফেরদের ধ্বংসের এ ঘটনা সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাই এটি হলো সুস্পষ্ট নিদর্শন।

قوله وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ : হযরত লূত (আ.) এর ঘটনার পর এ আয়াত থেকে হযরত শো'আয়ব (আ.) -এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। হযরত শু'আয়ব (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.) এর বংশধর ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর এক পুত্রের নাম ছিল মাদইয়ান, তাঁর নামেই এ শহরটির নামকরণ করা হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর কাতুরা নাম্নী স্ত্রীর ঘরে মাদইয়ানের জন্ম। হযরত শোআয়ব (আ.) তাঁরই সন্তানদের অন্যতম। আল্লাহ পাক হযরত শোআয়ব (আ.)-কে মাদইয়ান এলাকায় নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেন। এই শহরের অধিবাসীরা মূর্তি পূজা করতো কিয়ামতের কথা বিশ্বাস করতো না, হযরত শোআয়ব (আ.) তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে উপদ্রব বা অশান্তি সৃষ্টি করা কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়। হযরত শোআয়ব (আ.) তাদেরকে বলেছেন, তোমরা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করো, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুগত হও, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সকলকে একত্র করবেন, তখন তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহী করতে হবে এবং তোমাদের মন্দ কাজের জন্যে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে, আর আখেরাতের আজাব হবে অত্যন্ত কঠিন, কঠোর, যন্ত্রণাদায়ক ও অসহনীয়। কিন্তু হযরত শুআয়ব (আ.) -এর সম্প্রদায় মাদায়েনবাসী তাদের দৌরাত্ম্য এবং ঔদ্ধত্য অব্যাহত রাখলো।–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র) খ.৫. পৃ. ৩৬৮]

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَنُنَجِّيَنَّهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مستقبل معروف رفعل ثقيلة تاكيد بانون تاكيد লাম বাব تَفْعِيل মাসদার تَنْجِيَةً মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমরা তাকে রক্ষা করবই।

الْغَابِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার غُبُوْرٌ মূলবর্ণ (غ - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাদে অবস্থানকারীগণ।

سِيْئَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার سَوْءٌ মূলবর্ণ (س - و - أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং اجوف واوى) অর্থ– তিনি চিন্তিত হলেন।

ضَاقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার ضَيْقٌ মূলবর্ণ (ض - ى - ق) জিনস اجوف يائى অর্থ– সঙ্কুচিত হলো।

لَاتَخَفْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَوْفٌ মূলবর্ণ (خ - و - ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– আপনি ভয় করবেন না।

مُنَجُّوكَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيل মাসদার تَنْجِيَةٌ মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনাকে রক্ষা করব।

لَاتَعْثَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার عَثْىٌ মূলবর্ণ (ع - ث - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا : এখানে قَالَ হলো ফে'ল ও ফায়েল إِنَّ হরফে মুশাববাহ বিল ফেল, আর فِيْهَا হলো خبر مقدم আর لُوْطًا হলো اسم موخر আর قَالُوْا হলো ফে'ল তার যমীর হলো ফায়েল। আর نَحْنُ মুবতাদা। আর أَعْلَمُ হলো খবর। আর بِمَنْ হলো أَعْلَمُ-এর সাথে متعلق আর فِيْهَا হলো مَنْ মওসূলের সেলাহ।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. অতঃপর তারা শুআয়বকে মিথ্যাবাদী বলল, সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে ধৃত করল, তৎপর তারা স্ব স্ব গৃহে অধোমুখে পড়ে রইল।

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۟ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۫ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আর আমি আ'দ এবং ছামূদকেও ধ্বংস করেছি, আর এ ধ্বংসকাণ্ড তোমরা তাদের আবাসস্থলসমূহে দেখছ এবং শয়তান তাদের কৃতকার্যগুলোকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে রেখেছিল এবং তাদেরকে (সত্য) পথ হতে রুখে রেখেছিল, অথচ তারা বিচক্ষণ লোক ছিল।

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۫ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর আমি কারূন ও ফেরাউন এবং হামানকেও ধ্বংস করেছি। অথচ মূসা তাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণসমূহ নিয়ে এসেছিলেন, তবুও তারা ভূপৃষ্ঠে অবাধ্যতাচরণ করেছিল এবং তারা (আমার আজাব হতে) পলায়ন করতে সক্ষম হয়নি।

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ

৪০. তৎপর আমি তাদের প্রত্যেককে তার পাপের শাস্তি স্বরূপ ধৃত করলাম, সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কতক লোকের ('আদ সম্প্রদায়ের) উপর প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করলাম এবং তাদের কতককে (ছামূদ সম্প্রদায়কে) বিকট ধ্বনি এসে ধরল,

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. فَكَذَّبُوْهُ অতঃপর তারা শুআয়বকে মিথ্যাবাদী বলল فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে ধৃত করল فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ তৎপর তারা স্ব স্ব গৃহে অধোমুখে পড়ে রইল।

৩৮. وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۟ আর আমি আ'দ এবং ছামূদকেও ধ্বংস করেছি وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ আর এই ধ্বংসকাণ্ড তোমরা তাদের আবাসস্থলসমূহে দেখছ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ এবং শয়তান তাদের দৃষ্টিতে সুন্দর করে রেখেছিল اَعْمَالَهُمْ তাদের কৃতকার্যগুলোকে فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ তাদেরকে সত্য পথ হতে রুখে রেখেছিল وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ অথচ তারা বিচক্ষণ লোক ছিল।

৩৯. وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ আর আমি কারূন ও ফেরাউন এবং হামানকেও ধ্বংস করেছি وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى অথচ মূসা তাদের নিকট এসেছিলেন بِالْبَيِّنٰتِ প্রকাশ্য প্রমাণসমূহ নিয়ে فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ তবুও তারা ভূপৃষ্ঠে অবাধ্যতাচরণ করেছিল وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ এবং তারা পলায়ন করতে সক্ষম হয়নি।

৪০. فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ তৎপর আমি তাদের প্রত্যেককে তার পাপের শাস্তি স্বরূপ ধৃত করলাম فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কতক লোকের উপর প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করলাম وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ এবং তাদের কতককে বিকট ধ্বনি এসে ধরল

وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

** আর তাদের কাউকে (কারূনকে) আমি জমিনের মধ্যে ধসিয়ে দিলাম এবং তাদের কতককে (ফেরাউন ও হামানকে) নিমজ্জিত করে দিলাম, আর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কোনো অত্যাচার করেননি; কিন্তু এরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল।

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

৪১. যারা আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্যাকে অভিভাবক গ্রহণ করেছে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই মাকড়সার ন্যায় যে একটি ঘর প্রস্তুত করেছে এবং নিঃসন্দেহে মাকড়সার ঘরই ঘরসমূহের মধ্যে অধিকতর দুর্বল। যদি তারা (প্রকৃত অবস্থা) জানত, (তবে এরূপ করত না)।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾

৪২. আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন, আল্লাহ ভিন্ন যেই সমস্ত বস্তুর তারা পূজা করছে এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর আমি এ দৃষ্টান্তগুলো মানুষের (উপদেশ গ্রহণের) উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকি, বস্তুত ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত কেবল, জ্ঞানী লোকেরাই বুঝে।

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

৪৪. আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন; ঈমানদারদের জন্য এতে বড় প্রমাণ রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ এবং তাদের কাউকে আমি জমিনের মধ্যে ধসিয়ে দিলাম وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا এবং তাদের কতককে নিমজ্জিত করে দিলাম وَمَا كَانَ اللَّهُ আর আল্লাহ তা'আলা এমন ছিলেন না যে, لِيَظْلِمَهُمْ তাদের প্রতি অত্যাচার করছেন وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ কিন্তু এরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল।

৪১. مَثَلُ الَّذِينَ তাদের দৃষ্টান্ত اتَّخَذُوا যারা গ্রহণ করেছে مِن دُونِ اللَّهِ আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্যাকে أَوْلِيَاءَ অভিভাবক كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ সেই মাকড়সার ন্যায় اتَّخَذَتْ بَيْتًا যে একটি ঘর প্রস্তুত করেছে وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ - নিঃসন্দেহে মাকড়সার ঘরই ঘর সমূহের মধ্যে অধিকতর দুর্বল। لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ যদি তারা জানত (তবে এরূপ করত না)।

৪২. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ আল্লাহ ভিন্ন যে সমস্ত বস্তুর তারা পূজা করছে وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

৪৩. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ আর এ দৃষ্টান্তগুলো نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ মানুষের (উপদেশ গ্রহণের) উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকি وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ বস্তুতঃ ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত কেবল জ্ঞানী লোকেরাই বুঝে।

৪৪. خَلَقَ اللَّهُ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিনকে بِالْحَقِّ যথাযথভাবে إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً এতে বড় প্রমাণ রয়েছে لِّلْمُؤْمِنِينَ ঈমানদারদের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ - مُسْتَبْصِرٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চক্ষুষ্মানতা اِسْتِبْصَارٌ এর অর্থ চক্ষুষ্মানতা। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শিরক করে আজাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উন্মাদ ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও হুঁশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চালাকি বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তারা একথা বুঝেনি যে, সৎ ও অসতের পুরস্কার এবং শাস্তির কোনো দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালেম ও অপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘুরাফেরা করে এবং মজলুম ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কোনঠাসা হয়ে থাকে। এই সুবিচারের দিনকে কিয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজো।

সূরা রূমেও এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হবে। আয়াত: - يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ অর্থাৎ তারা জাগতিক কাজ কর্ম খুব বোঝে, কিন্তু পরকালের ব্যাপারে উদাসীন।

কোনে কোনো তাফসীরবিদ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ বাক্যের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং তাঁকে সত্য মনে করত; কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল।

وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ : মাকড়সাকে عَنْكَبُوْتٌ বলা হয়। মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার আছে। কোনো কোনো মাকড়সা মাটিতে বাসস্থান তৈরি করে। বাহ্যত: এখানে তা বুঝানো হয়নি এখানে সে মাকড়সা বুঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরি করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলাবাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জাল তার দুর্বলতার অবস্থা এই যে সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জাল সদৃশ, যা অত্যন্ত দুর্বল এমনিভাবে যারা কোনো প্রতিমা অথবা কোনো মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে।

মাসআলা : মাকড়সাকে হত্যা করা তার জাল পরিস্কার করা সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন উক্তি আছে। কেউ কেউ এটা পছন্দ করেন না। কেননা এই ক্ষুদ্র জন্তুটি হিজরতের সময় সওর গিরিগুহার মুখে জাল টেনে দেওয়ার কারণে সম্মানের পাত্র হয়ে গেছে। খতীব বাগদাদী (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সা'লাবী ও ইবনে আতিয়্যা হযরত আলী (রা.) থেকেই বর্ণনা করেন যে, طَهِّرُوْا بُيُوْتَكُمْ مِنْ نَسْجِ الْعَنْكَبُوْتِ فَاِنَّ تَرْكَهٗ يُوْرِثُ الْفَقْرَ অর্থাৎ মাকড়সার জাল থেকে তোমাদের গৃহ পরিষ্কার রাখ। গৃহে জাল রেখে দিলে এতে সংসারে দারিদ্র্য দেখা দেয়। উভয় রেওয়ায়েতের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে অন্যান্য হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের সমর্থন হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখ। –[রূহুল মা'আনী]

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ

মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তাওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলেমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তা-ভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় না।

আল্লাহর কাছে আলেম কে ? ইমাম বগভী হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, সেই আলেম যে, আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, তাঁর ইবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে।

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলে কেউ আল্লাহর কাছে আলেম হয়না, যে পর্যন্ত কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কুরআন অনুযায়ী আমল না করে। মুসনাদে আহমাদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে একহাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা

করেছি। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আস (রা.)-এর একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বুঝে। হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোনো আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা আল্লাহ বলেছেন : وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ -[ইবনে-কাসীর]

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَبَيَّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَيُّنٌ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– স্পষ্ট হয়েছে।

زَيَّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ز - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে শোভন করে রেখেছিল।

مُسْتَبْصِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব استفعال মাসদার اِسْتِبْصَارٌ মূলবর্ণ (ب - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা বিচক্ষণ লোক।

خَسَفْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خَسْفٌ মূলবর্ণ (خ - س - ف) জিনস صحيح অর্থ– আমি ধসিয়ে দিলাম।

اَوْهَنَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার وَهْنٌ মূলবর্ণ (و - ه - ن) জিনস مثال واوى অর্থ– অধিকতর দুর্বল।

اَلْعَنْكَبُوْتُ : একবচন, বহুবচন عناكب অর্থ– মাকড়সা।

مَا يَعْقِلُهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عَقْلٌ মূলবর্ণ (ع - ق - ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তকে বুঝে না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ : এখানে فاء টি আতেফা كَذَّبُوْهُ ফে'ল উহ্য যমীর هُمْ ফায়েল ة হলো مفعول به مقدم هم হলো فاء-এর আর فاخذتهم হলো আতেফা اَخَذَتْهُمْ ফে'ল ও هم হলো مفعول به আর اَصْبَحُوْا হলো ফে'লে নাকেস আর যমীর واو হলো اَصْبَحَ-এর اسم আর فِىْ دَارِهِمْ টা جٰثِمِيْنَ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর فَاَخَذَتْهُمْ-এর উপর আতফ হয়েছে। اَلرَّجْفَةُ হলো فاعل موخر আর فَاَصْبَحُوْا টা জ্ঞ جٰثِمِيْنَ হলো اَصْبَحَ-এর– خبر –[ই'রাবুল কুরআন ৫ম খণ্ড; পৃ. ৬৯৮]